তন্ত্রতত্ত্ব

(প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য

পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : রথযাত্রা, ১৩৮১.

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : এ. সাহা, দি প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের প্রকাশিত তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয়ের তন্ত্রতত্ত্ব প্রথম সংস্করণটি দ্বি-বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া যায়। বহু সাধক, সাধনেচ্ছু এবং আগ্রহী সুধী পাঠকবর্গের পুনঃপুনঃ অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রাত্যহিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মুদ্রণোপযোগী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিবিধ কারণ-বশতঃ প্রকাশন বিলম্বিত হইল। গ্রন্থটি সর্ব্বপ্রথম—প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ঐ দুইটি খণ্ডই একত্রে একখণ্ডে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

॥ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ॥

সিদ্ধ-তান্ত্রিকাচার্য্য বিশ্বে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে কিছু বলিবার প্রয়াস প্রদীপ সাহায্যে সূর্য্য প্রদর্শনের ন্যায় নিতান্ত শিশুসুলভ অর্ব্বাচীন চেষ্টারই সমতুল্য। তিনি স্বয়ং স্বীয় কৃতী কর্ম্মজীবন ও সাধনসিদ্ধি প্রভায় মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডবৎ প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর। তিনি তন্ত্রতত্ত্ববেত্তা ও তান্ত্রিক যোগীগুরু। জন্ম ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৭ সন— অবিভক্ত বাঙ্গলার নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে (অধুনা বাঙ্গলাদেশান্তর্গত)। অনেক সময় দেখা যায়, মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-পূর্ব্ব কাল অথবা জন্মলগ্ন অলৌকিক দৈবলীলাত্মক ঘটনার মাহাত্ম্যে মহিমামণ্ডিত। শিবচন্দ্রের মাতৃজঠরে আগমনের পূর্ব্বে তদীয় পিতৃদেবের এক শিবরাত্রির চতুর্থ প্রহরের পূজা-চলাকালে মাতা চন্দ্রময়ী দেবী শিবরাত্রির আরাধ্য দেবতা শিবের ধ্যানে নিমিলিত নেত্রে ধ্যান-নিমগ্ন, এমন সময় ধ্যান-তন্ময় নেত্রে তিনি দেখিলেন জটাজুট সমন্বিত ত্রিশূল ডমরুহস্ত এক বিরাট পুরুষ তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসরমান হইতে হইতে সমীপবর্ত্তী হইয়া 'আমি তোর ঘরে আসিলাম' এই দৈববাণী উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার দেহে বিলীন হইয়া গেল। বিদ্যার্ণব মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার কুমারনদ তীরবর্ত্তী মহিশালা গ্রাম (বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশান্তর্ভুক্ত)। পিতা চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশ, মাতা চন্দ্রময়ী দেবী। এই ভট্টাচার্য্য বংশ পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম্মীয় সাধনার সকল ধারার শাস্ত্রীয় শিক্ষা ও সর্ব্বদর্শন, বিশেষতঃ তন্ত্র ও বেদান্ততত্ত্ববেত্তা এবং যোগবিশারদ বলিয়া খ্যাত। নবদ্বীপ ও কলিকাতায় ব্যাকরণ-কল্প-কাব্য-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি শিক্ষা এবং পুরুষ পরম্পরাগত পরিবারে আচরিত কুলাচার ও কুলপ্রথানুসারে দীক্ষাগ্রহণ এবং যোগক্রমাভিষেকাদি সাধনক্রমসমূহ নিখুঁতভাবে সমাপনান্তে শিবচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং হিমালয় ও গির্ণারের গিরিগুহায় সুদীর্ঘকাল তন্ত্রসাধনায় রত ও নিমগ্ন থাকেন। তীব্র তপশ্চর্য্যা ও যোগসাধনার ফলে তিনি অচিরকাল মধ্যে আপ্তকাম ও সিদ্ধ হয়েন এবং ভারতের চতুষ্প্রান্তে সাধকমহলে তান্ত্রিক ও সিদ্ধযোগীরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হন। কাশীধামে অবস্থানকালে তিনি দক্ষিণভারতীয় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী রামরাম স্বামীর নিকট সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়ন ও বেদান্ততত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেন। তদনন্তর তিব্বতস্থ কৈলাস ও মানস-সরোবর হইতে কন্যাকুমারী এবং ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের সমুদয় তীর্থদর্শন এবং পরিব্রাজন সমাপনান্তে তন্ত্রসাধনা এবং তন্ত্রতত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বপ্রথম স্বগ্রাম কুমার-খালীতে প্রতিষ্ঠা করেন ৺শ্রী সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের বিগ্রহ ও সর্ব্বমঙ্গলা সভা। অতঃপর কলিকাতা, হাওড়া, শিবপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি আরও অনেকানেক স্থানে শাখাকেন্দ্র স্থাপন করতঃ স্বয়ং ও তৎস্থলাভিষিক্ত (নিয়োজিত) কর্ম্মীগণ দ্বারা নিয়মিত-ভাবে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে আলোচনা এবং তন্ত্রতত্ত্ব ও সাধনা বিষয়ে প্রচার

পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু আগ্রহশীল তন্ত্রসাধনেচ্ছু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকেন। অপর গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত বহু গৃহী এবং সাধকও তাঁহার নিকট ক্রমাভিষেকের বিভিন্ন পর্য্যায়-পরম্পরা নিষ্পন্ন করাইয়া তাঁহার প্রদত্ত প্রণালীবদ্ধ সাধনধারাবলম্বনে ক্রিয়ার ফলে সাধনায় অগ্রগতি ও ক্রমোন্নতি এবং বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তিতে পরমানন্দ অনুভব ও অনুভূতি লাভ করিয়া আনন্দিত আহ্লাদিত ও পরম পরিতৃপ্ত হন।

বিদ্যার্ণব মহোদয়ের নিকট দীক্ষাশ্রিত শিষ্যবর্গের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার্ জন্ উড্রফ্ (Sir John Woodroffe, Bar-at-Law)-এর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। সার্ জন্ উড্রফ্ তাঁহার (বিদ্যার্ণব) নিকট সস্ত্রীক তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। সদ্‌গুরু বিদ্যার্ণব এই দীক্ষা প্রদানান্তে গুরুদক্ষিণা বহুমূল্যবান বিষয়বস্তু ও ধনরত্নাদি গ্রহণের পরিবর্ত্তে নব-দীক্ষিত শিষ্য উড্রফ্‌কে সমগ্র বিশ্বে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রধর্ম্ম প্রচার মানসে তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে নিগূঢ় তন্ত্রাভিমত অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশার্থ উপদেশ-নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তিনিও তন্ত্রতত্ত্ব বিষয়ে আহুত বহু আলোচনা সভায় তন্ত্রতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা, বহু নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গুরূপদিষ্ট কার্য্যে সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। আর্থার এভেলন (Arthur Avalon) এই ছদ্ম নামে সকল গ্রন্থাদি প্রকাশপূর্ব্বক ভারতে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে ও পাশ্চাত্য জগতে তন্ত্রসাধনার ধারাকে নূতনালোকে ও মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার Principles of Tantra, Part I & II. গুরু বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্বেরই সারানুবাদ। বিশ্বে তন্ত্রের মহিমা ও মর্য্যাদা প্রচারে তাঁহার (বিচারপতি উড্রফ্) অবদান বিষয়ে Dr. Winternitz তাঁহার History of Indian Literature গ্রন্থে লিখিয়াছেন : It is Sir John Woodroffe (under pseudonym of Arthur Avalon) who by a series of essays and publication of the most important Tantra Texts has enabled us to form a just judgment and an objective historical idea of this religion and its literature.

তন্ত্রতত্ত্ব ছাড়াও শিবচন্দ্রের আরও কয়েকটি নিবন্ধ ও গ্রন্থের নাম : যথা—গঙ্গেশ, রাসলীলা, গীতাঞ্জলী (দুই খণ্ড), পাঠমালা, শৈবী, দুর্গোৎসব, মা, কর্ত্তা ও মন, স্বভাব ও অভাব, চণ্ডীতত্ত্ব (সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত), দশমহাবিদ্যা স্তোত্রম্ (শ্রীমতী সুদক্ষিণা মৈত্র, বি.এ. কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ও মূল সহ প্রকাশিত : Sanskrit College Magazine, 1979 : দ্রষ্টব্য), স্তোত্রমালা।

১৩২০ বঙ্গাব্দে স্বপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলা মাতৃবিগ্রহ বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া অনুপম নিরুপম লাবণ্যময়ী মাতৃবিগ্রহের মনোরম মুখমণ্ডলে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতঃ মাতৃগতপ্রাণ শিবচন্দ্র মাতৃনাম জপ ও ধ্যান করিতে করিতে নয়ন নিমিলিত করেন।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ ॥

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

।। কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা ।।

।। কলৌ জাগর্ত্তি কালী চ কলৌ জাগর্ত্তি পদ্মী ।।

।। কালী তারা মহাবিদ্যা মহাসিদ্ধি-প্রদায়িনী ।।

তন্ত্রতত্ত্ব

"আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাং।
নারাধয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি যে ত্বাং
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥"

৺সর্ব্বমঙ্গলা সভার সম্পাদক
সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত-প্রবর—

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য

মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

প্রথম ভাগ।

সহকারী সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
(দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ)
৺কাশীধাম মহালক্ষ্মী যন্ত্রে
শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৭। আষাঢ় মাস।

।। মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা ।।

॥ ৺শ্রীশ্রীশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা বিজয়তে ॥

অবতারণা

৺মা সর্ব্বমঙ্গলার প্রসাদে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে আবার যেন সনাতন ধর্ম্মের মধুর-মঙ্গল বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রাবলীর মন্দ্রমন্থর মন্ত্রগুণে বাদ্যবোধনিপুণ বুদ্ধিমান যেমন প্রতিলয়ে তাল দিতে স্বতঃ এব বাধ্য, ধ্বনিপ্রিয় স্বরমুগ্ধ অবোধ শিশুও তেমনই স্বভাবের আকর্ষণে শিরঃকম্পন অঙ্গুলীচালন করতালি নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা প্রতিলয়ে সেইরূপ তাল দিতে বাধ্য। আজ সনাতন ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলনে ভারতেও তেমনই সুবোধ হউন, অবোধ হউন আর্য্যসন্তান মাত্রেই সেই মোহন-মন্ত্রের মধুর স্বরে মত্ত হইয়া প্রতিলয়ে তাল দিয়া নাচিতেছেন। এই মহামহোৎসবে, ভারতের এই চিরন্তন দুর্গোৎসবে চণ্ডীমণ্ডপের বিশাল বিশ্বপ্রাঙ্গণে জ্যোতিষ দর্শন স্মৃতি পুরাণ বেদ বেদান্ত অনেক যন্ত্রই বাজিতেছে, কিন্তু দেখিয়া দুঃখ হয়, সকল যন্ত্র যাহার অন্তর্ভুক্ত এবং মুখাপেক্ষী সেই যন্ত্র মন্ত্রের একমাত্র প্রসবভূমি মহাযন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্র আজ নীরব। জানি ইহা মন্ত্রময় তন্ত্রশাস্ত্র মন্দিরের অভ্যন্তর ভিন্ন প্রাঙ্গণে বাজিবার যন্ত্র নহে; সিদ্ধ সাধকের হৃদয় ব্যতীত সভায়-সমাজে আলোচনার বস্তু নহে; কিন্তু কি করিব, আমরা যে বাহিরের বাদ্যকর। মন্দির মধ্যে সাধকের সিদ্ধমুখে মধুরমন্ত্রের মন্দ্রধ্বনি আর সেই সঙ্গে তাঁহারই হস্তে ঘণ্টার সেই জয়ধ্বনি না শুনিলে স্নান আরতি বলি ভোগ কি বাজাইব তাহা যে ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আজ এত আন্দোলন আলোচনা বক্তৃতা ব্যাখ্যার মধ্যেও যে ধর্ম্মপ্রচারের এত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার একমাত্র কারণ কেবল ঐ মন্ত্রহীন পূজার প্রাঙ্গণে বাদ্যযন্ত্রের বিষম কোলাহল। সে যন্ত্রে না আছে কাল, না আছে তাল, না আছে মান, না আছে গান। পূজাক্ষেত্রে হয়ত মহাস্নানের আরম্ভও হয় নাই, কিন্তু বহিরঙ্গনে হোমের পূর্ণাহুতি বাজিয়া উঠিল। অনুষ্ঠান-ধর্ম্মের নাম শুনিলে যে সমাজ সভয়ে কম্পিত মজ্জাগত-জ্বরগ্রস্ত, দুঃখের কথা বলিব কি, সেই সমাজ আজ নির্ব্বিকল্প সমাধি বিদেহ-কৈবল্য, তত্ত্বজ্ঞান, পরাভক্তি ও নির্ব্বাণ মুক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিগূঢ় তত্ত্বনির্ব্বাচনে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত। তাই অকালে এ বেতাল বাদ্য অসিদ্ধ এবং অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ, এই সিদ্ধিসাধনহীন সমাজের দর্শনবিজ্ঞানময় বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া অধিকাংশ স্থলেই আমাদের গ্রাম্য (বারোইয়ারি) পূজার কথা মনে হয়। পূজার অবস্থা দেখিয়া যেমন আশঙ্কা হয়, হয়ত কালে প্রতিমাখানিও উঠিয়া যাইবে, বর্ত্তমান সমাজের দশা দেখিয়াও তেমনই অনেক সময়ে আশঙ্কা হয়, হয়ত কালে

আর্যসমাজ হইতে সিদ্ধিসাধনার বার্ত্তা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু ভরসা এই যে, চন্দ্রসূর্য্যের গতিস্তম্ভ সম্ভব হইলেও এ পূজা কখন গ্রাম্য পূজা হইবার নহে। সাধারণের সম্পত্তি হইলেও ইহা চিরকাল অসাধারণ এবং চিরকাল অসাধারণ হইলেও চিরকাল আর্য্যসাধারণ প্রত্যেকে স্বয়ং স্বতন্ত্র সাধকরূপে এ পূজার পূর্ণাধিকারী। পুরোহিত ইহার প্রতিনিধি নহেন, পূজার অর্থও আত্মবঞ্চনা নহে, কিন্তু আত্মার সিদ্ধি ও সাধনা। এ সাধনার মন্দিরে আমরা যে মন্ত্রের মুখাপেক্ষী, পূজকগণ সে মন্ত্র পাঠ করিতে বিরক্ত নহেন, কিন্তু সন্দিগ্ধ; অসমর্থ নহেন কিন্তু আশঙ্কিত। তাই আশা হয়, এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিলে, আশঙ্কা দূর করিতে পারিলে এমন একদিন অচিরাৎ আসিতেছে যে দিন ভারতের দশ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া অসংখ্য আর্য্যকণ্ঠে সমস্বরে নিনাদিত হইবে—"ন চ তন্ত্রাৎ পরং শাস্ত্রং ন চ তন্ত্রাৎ পরো গুরুঃ। ন চ তন্ত্রাৎ পরঃ পন্থা ন চ তন্ত্রাৎ পরা গতিঃ" ॥ সেই আশায় উদ্যমেই আজ সাধকসমাজকে অবলম্বনস্তম্ভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে এই অভিনব অবতারণা। অনেকে বলিতে পারেন, সাধনশাস্ত্রে যখন সন্দেহ ঘটিয়াছে তখন তাহার অপনোদন সহজ ব্যাপার নহে। আমরাও এ কথা অস্বীকার করি না। তবে বলি এই যে, সহজ নহে বলিয়াই একেবারে অসম্ভব নহে, সন্দেহ ঘটিয়াছে ইহাই শুভসংবাদ। পিপাসা যখন জাগিয়াছে তখন জলের জন্য ভাবনা নাই, তীর পর্য্যন্ত নীরপূর্ণ অগাধ সরোবর সম্মুখে বিরাজিত, কেবল অবতারণার অপেক্ষা মাত্র। অনন্ততত্ত্ব-পীযূষপূর্ণ অপার তন্ত্রশাস্ত্র সম্মুখে সুসজ্জিত থাকিতে আর্য্যসন্দেহ-ভঞ্জনের ভাবনা নাই, কেবল ধীরে ধীরে তত্ত্বপথে অগ্রসর হইবার অপেক্ষা মাত্র। দুঃখের কথা এই যে, পিপাসা জাগিয়াছে, সরোবর সম্মুখে রহিয়াছে, এরূপ স্থলেও জলপানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার আবশ্যক হইয়াছে। ফলতঃ বিজ্ঞাপন জলপানের জন্য নহে, পথ পরিষ্কার করিবার জন্য। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের বড়ই বিচার বিবাদ বিতর্কের দিন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্তস্তত্ত্ব-প্রবেশের পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই জটিল, বড়ই সংশয়াচ্ছন্ন কন্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ কন্টক এ সংশয় সরোবরের দোষে নহে, গতিবিধির অভাবে। ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এককালে এমন সুখসৌভাগ্য-গরিমার দিন ছিল, যেকালে আর্য্যসাধকগণ গৃহে বসিয়াই গুরুদত্ত তত্ত্বামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন, স্বয়ং তীর্থে অবগাহন করিবার একান্ত আবশ্যক ছিল না। নিয়তিচক্রের কঠোর নিষ্পীড়নে ভারতবর্ষ আজ সেদিন হারাইয়াছে, একে একে সাধককুলচূড়ামণিগণ করুণাময়ীর কৈবল্যময় চরণাম্বুজে বিলীন হইয়াছেন। সদ্‌গুরুর অভাবে শিষ্যসম্প্রদায় ঘোরান্ধকারে হাহাকার করিতেছেন। জানিনা জগদীশ্বরী কতদিনে আবার করুণা-কটাক্ষের উজ্জ্বল আলোকে ভক্তহৃদয় আলোকিত করিবেন, কতদিনে আবার এই অধঃপতিত সমাজের মাতৃহারা অন্ধ

সন্তানগণ চৈতন্যনয়নে চৈতন্যময়ীর সৌন্দর্য্যছটায় ডুবিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মা মা বলিয়া আনন্দময়ীর ক্রোড়ে উঠিবে। কতদিনে আবার শুনিব "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ॥

তন্ত্রপথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু লোকের মুখে কেবল সেই বিভীষিকার বার্ত্তা শুনিয়া চিরকাল সভয়ে চিন্তা করিলেও তো কখন কণ্টক বিদূরিত হইবার নহে। পথ চাহিলেই পথে দাঁড়াইতে হইবে। পথের কণ্টক নহে, বাহিরের কণ্টক আসিয়া পথে পড়িয়াছে; ভয় নাই। অন্তঃসারহীন শুষ্ক কণ্টক সাধকের বীরপদনির্ভরে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কথায় যদি বিশ্বাস না হয় এই আশঙ্কায় সাধকমণ্ডলীর পদপ্রান্ত লক্ষ্য করিয়া পাদুকাস্বরূপ মধ্যস্থভাবে আমরা অগ্রসর হইলাম, ক্ষতবিক্ষত জর্জ্জরিত ছিন্নভিন্ন হই, আমরা হইব, তথাপি সাধকচরণ হৃদয়ে ধরিয়া তত্ত্বপথে উপনীত হইয়া একবার তন্ত্রামৃত মহাহ্রদে ডুবিব, অন্তরে এ আশা নিতান্ত বলবতী। ভরসা করি, সিদ্ধ সাধু সাধকমণ্ডলী আমাদের এ আশা পূর্ণ করিতে বিমুখ হইবেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ক্ষেত্রে অনেক তন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রে স্থান পাইয়াছে, অনেক তন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে, তন্মধ্যে মহাত্মা রামতোষণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয়ের প্রকাশিত 'প্রাণতোষিণী' যথার্থই সাধকসংসারের প্রাণতোষিণী। তৎপর রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি তন্ত্রের সহিত যে সানুবাদ 'তন্ত্রসার' প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আর্য্যসমাজ তাঁহার নিকটে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। অনেক তান্ত্রিকতত্ত্বের ছায়া সাধকবৃন্দের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সকল অস্ফুট ছায়াই নিবিড় সংশয়ময়ী বিভীষিকার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, অনধিকারে শাস্ত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু জটিল গ্রন্থিসকল বদ্ধমূল হইতেছে। তথাপি ইহা কল্যাণের হেতু বলিয়া বোধ হয়, কারণ এই সকল সংশয় হইতেই সমাজে আজ শাস্ত্রীয় তত্ত্বের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রাণতোষিণী ও তন্ত্রসার ব্যতীত তন্ত্র সম্বন্ধে আর যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছে, সেইগুলিই তত্ত্বপথের কণ্টক। কতকগুলি অপরিণামদর্শী নিরক্ষর ব্যবসাদার, কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক তত্ত্বের ধূর্ত্ত আবিষ্কর্ত্তা, আর কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নিরন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকর্ত্তা এই ত্রিপুষ্কর একত্র হইয়া তন্ত্রের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন। ইঁহাদেরই কল্যাণে আজ সমাজ রসাতলে যায় যায়। কত শত সরলহৃদয় সাধুপুরুষ ইঁহাদের বিষম প্রলোভনে প্রতারিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। তত্ত্ব না বুঝিয়া গুরুগম্য বিষয় সকলের অনুষ্ঠানপ্রণালী হাটে ঘাটে মাঠে আনিবার জন্য লোকের যে বিড়ম্বনা ঘটিতেছে, তাহাতেই শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে; এই অবিশ্বাস নির্ম্মূল

করিতে হইলে শাস্ত্ররূপ অস্ত্র ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্রের দ্বারে দাঁড়াইয়াই শাস্ত্রীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে। তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিয়াছেন তাহা একবার তন্ত্র হইতেই বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উপাসনা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ এই যে বিশ্বাস ঘটিলে তবে তো অনুষ্ঠান করিবার কথা, কিন্তু তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল গূঢ়াতিগূঢ়তম রহস্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা বিশ্বাস করা দূরে থাক শুনিয়াই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্র কেন এ সকল বিষয়ের অনুশাসন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধিবৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তখন মানবের ভ্রান্তিসুলভ বুদ্ধিমীমাংসায় বিরক্তি বিদ্বেষ অশ্রদ্ধা অভক্তি বই আর কিছুই স্থান পায় না। সাধারণে অবিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, যাহা সাধারণে বিখ্যাত এবং বিজ্ঞাত তাহারই মধ্যে দেখিতে পাই এক ষট্‌চক্র সম্বন্ধে কতই ব্যাখ্যা, কতই অনুভব, কতই প্রত্যক্ষসিদ্ধি তাহার স্থিরতা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিত্যনব ধর্ম্মতরঙ্গে উভয় কূল হারাইয়া যাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আজকাল কুলকুণ্ডলিনীর দোহাই দিয়া কূল পাইতেছেন।

এতদ্ভিন্ন আর একদল উপনিষদ্ভক্ত যোগবাশিষ্ঠ-শিষ্ট যোগী আছেন। তাঁহারা অনেক সময়েই বলিয়া থাকেন—সত্যসত্যই শরীরের মধ্যে স্বচ্ছ সরোবর আছে, সেই সরোবরের বিকশিত কমলদলই ষট্‌চক্র। এই দুঃখেই সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "মন! কি কর তত্ত্ব তাঁরে, ওরে উন্মত্ত। আঁধার ঘরে, সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাব কি তাঁয় ধর্‌তে পারে।" তিনি কিন্তু কমলমধুপানমত্ত, কষায়কণ্ঠে গাহিয়াছেন, "কালী, পদ্মবনে, হংস সনে, হংসীরূপে কর্‌ছে রমণ"। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শাস্ত্রের এ অবমাননা সহ্য করা কঠিন হইয়াছে। ইহার পর আর এক সম্প্রদায় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আছেন, যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন কালী বলিতে 'কসাই কালী', তন্ত্র বলিতে 'আবগারির দোকান', শিব গাঁজায় দম দিয়া তন্ত্রশাস্ত্র লিখিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল অনার্য্যের কথায় কর্ণপাত করিবার সময় আমাদের নাই, কারণ, দুর্গোৎসবের ঢাক বাজিলেই ছাগের কণ্ঠে চিৎকার আরম্ভ হয়, তাই বলিয়া দুর্গোৎসব উঠিয়া যাইবে না, যে সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল দক্ষযজ্ঞ তাহার ভাবনা স্বয়ং বীরভদ্র ভাবিবেন। জানি, এ সকল কথার হেতু আছে, তাই বলিয়া কালীর অপরাধ, শিবের অপরাধ, তন্ত্রের অপরাধ কি? দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা এই সকল কথা বলেন—তাঁহারাও তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু কি করিব? পতির অন্ন ধ্বংস করিয়া উপপতির গুণগান করা ব্যভিচারিণী সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহার ধর্ম্ম সে অধঃপাতে যায় যাক, তাহার জন্য দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে এই সকল নরাধমের আলোচনায় আন্দোলনে আদর্শে সাধক-

সমাজ নিরন্তর জর্জ্জরিত মর্ম্মাহত উৎসাদিত প্রায়। সন্তান হইয়া, রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া শক্তিসত্ত্বে বিশ্বজননী বিশ্বপিতার পবিত্র নামে এ কলঙ্ক গ্লানিগঞ্জনা কে সহ্য করিতে পারে? সিদ্ধিসাধনার মূলে এ কটূক্তি-কুঠারাঘাত কাহার হৃদয় না ব্যথিত করে? সাধকসমাজের সেই নিদারুণ মর্ম্মব্যথার অপনোদনের জন্যই আমাদের এ আরম্ভ। আশাকরি, অসুরনাশিনীর অভয়নামে এ বিজয়পতাকার আনন্দদণ্ড ধারণ করিতে আর্য্যকুলকুমারগণ কখন কুণ্ঠিত হইবেন না।

তৃতীয়তঃ, আর্য্যসমাজে যাঁহারা সম্প্রতি দীক্ষিত বা দীক্ষাভিলাষী, আমরা অনেক স্থানেই দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে অনেকেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ নানা পথে বিচরণ করিতেছেন। কাহারও গুরুদেব হয়ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষিত, কেহ বা নিজগুরুর অনুপযুক্ততা জানিয়া দুঃখিত, কেহ বা সন্ন্যাসীর শিষ্য, গুরুদেব কোন্ দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন, কাহারও বা গুরুপুত্র মাত্র আছেন, তিনিও অপ্রাপ্তবয়স্ক অকৃতবিদ্য বা অদীক্ষিত, কাহারও বা গুরুকুল নির্ম্মূল, আবার কেহ বা সানুবাদ সাধ্যাত্মিকবাদ ছাপার তন্ত্রশাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত দেখিয়া একটি-একটি করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন, ইহা কর, উহা করিও না; কিন্তু কেন ইহা করিব, কেন উহা করিব না এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেরই চক্ষুস্থির। শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস করিতেছি না, ইহা উহা করিলে কোন ফল হইবে না তাহাও বলিতেছি না, কেবল যাহা করিতেছি তাহা কি ইহাই জানিতে চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও জানিবার উপায় নাই। উন্নত সমাজের উচ্চ শীর্ষে এমনই নির্ঘাতবজ্র পড়িয়াছে যে, ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্রের আবার কোন অর্থ আছে, এ কথা জানা দূরে থাক, বিশ্বাস করিতেই অনেকে পরাঙ্মুখ। না জানিলাম তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের যাহা কিছু করি সেই শাস্ত্রই আবার বলিতেছেন, না জানিয়া, না বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলেও কোন ফল হইবে না, কেন না তাহা অবৈধ। কুলার্ণবে—

"দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাং।
কৃতার্চ্চনাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি"॥

শাম্ভবি! দেবতার স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব এবং মন্ত্রের শক্তি যাহারা জানে না তাহাদের কৃত অর্চ্চনাদি সমস্ত ব্যর্থ হয়।

শাস্ত্রের এ মহাবাক্য অবিশ্বাস করিতেও পারি না, কারণ যে শাস্ত্রের বিধি মানিব তাহার নিষেধ না মানিলে চলিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ না বুঝিয়া, না জানিয়া করিলেও যে কোন ফল হইবে না ইহার প্রমাণ তো হাতে হাতে, আমি যাহার সাক্ষী তাহা আমি অবিশ্বাস করিব কি করিয়া? না বুঝিয়া করিলে যে কোন ফল হয় না

তাহা তো নিজেই বিলক্ষণ বুঝিতেছি। তাই, এ নিষেধ মানিতে হইবে, নিষেধ মানিতে হইলেই জানিতে শুনিতে বুঝিতে হইবে। বুঝিব যাঁহাদিগের নিকটে তাঁহাদিগের দশা তো পূর্ব্বেই বলিলাম। এই সকল ঘটনাবশতঃ এক্ষণে এমন কোন উপায় উদ্ভাবনের একান্ত আবশ্যক হইয়াছে যাহাতে বোধের অভাবে অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে না হয়, বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া কেহ সীমন্তস্থিত স্যমন্তক মণিকে পদদলিত না করেন, নিত্যপূজাদির অনুষ্ঠানকে কেহ পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে না করেন। আমি অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারি বা না পারি, যে তত্ত্ব পাইয়াছি তাহা অভ্রান্ত সত্য, যে পথে যাত্রা করিয়াছি তাহাও সেই বিশ্ব-রাজেশ্বরীর রাজধানীর সুপ্রশস্ত রাজপথ এ বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ ফল অন্তরে অটল থাকা চাই। বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে যে পর্য্যন্ত সুযোগ সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়াই আমরা এই তন্ত্রতত্ত্বপ্রকাশরূপ মহাব্রতে অগ্রসর হইলাম। এ ব্রত অবশ্য মহৎ হইতেও মহৎ, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; ভিক্ষুকের গৃহে রাজসূয় যজ্ঞ মনে করিতেই হাসি পায়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব? পেটে ক্ষুধা মুখে লজ্জা চলে না। বিশেষতঃ এ পথে যে দাঁড়ায় তাহার লজ্জা না থাকিবারই কথা, কেন না যিনি নির্লজ্জের শিরোমণি দিগম্বর তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা। ভিক্ষুক বলিয়া তো এ পথে লজ্জার কোন কথাই নাই; যিনি প্রথমে এ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পথ দেখাইয়াছেন তিনি নিজেই ভিক্ষুকের চূড়ামণি। ত্রিভুবনে রাজরাজেশ্বর হইয়াও তিনি বিশ্বজননী অন্নপূর্ণার দ্বারে নিত্য ভিক্ষুক। আমরা সেই ভুবনবিখ্যাত ভিক্ষুক প্রভুর দাসানুদাস হইয়া লজ্জিত হইব কেন? ভিক্ষাই আমাদের রাজার রাজকর, মায়ের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া মায়ের উপাসনা (গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা) ইহাই আমাদের উপাসনার মূলতত্ত্ব, ইহাতে যদি ভিক্ষুক সাজিতে লজ্জিত হইতে হয়, তবে কে ভিক্ষুক নহেন, কে লজ্জিত নহেন তাহা তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভিক্ষুক ত্রিজগৎ; কিন্তু ভিক্ষাদাত্রী সেই জগদ্ধাত্রী বই আর কেহ নাই। সাক্ষাতে হউক, পরোক্ষে হউক, তিনিই একমাত্র ভরসা। তাই ভরসা করি সাধক-হৃদয়-বিহারিণী জীবযন্ত্র-পরিচালিকা বুদ্ধিরূপিণী মা অন্নপূর্ণা ভক্তবৃন্দের হস্তে তাঁহার প্রসাদান্ন দিয়া আমাদের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিবেন। বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদে বিশ্বমাতার প্রসাদে আমাদের এ নিঃস্ব গৃহেও তন্ত্রতত্ত্ব-রাজসূয়ের চরম দক্ষিণা দক্ষিণা-চরণাম্বুজে সমাহিত হইবে। ইতি।

৺কাশীধাম। শকাব্দ ১৮১১। শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্ম বিদ্যার্ণব

ফাল্গুন মাস।

নমঃ পরমদৈবত-শ্রীমদম্বায়ৈ সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ ॥

তন্ত্রতত্ত্ব

—*—

মঙ্গলাচরণম্

যা লীলামুরলীবিনোদমধুরঃ শ্রীরাধিকাবল্লভো
যা সূরঃ প্রভয়া প্রভাসিতজগদ্‌যার্দ্ধাঙ্গকামাঙ্গহা।
যা স্বাঙ্কে স্বয়মেব নন্দনতয়া হেরম্বরূপাম্বিকা
তাং ত্বাং কালবিলাসলালসতনূং বন্দে ত্রিলোকপ্রসূম্ ॥

মা সর্ব্বমঙ্গলে!

যিনি লীলাপ্রসঙ্গে মুরলীধ্বনি-বিনোদরঙ্গে মধুরমূর্ত্তি রাধিকাবল্লভ, নিজ প্রভায় ত্রিজগৎ প্রভাসিত করিয়া যিনি সূর্য্যমূর্ত্তি, নিজ নিত্য-দেহের অর্দ্ধাংশে [দক্ষিণাঙ্গে] যিনি কামাঙ্গহর [শশিশেখর] আবার অম্বিকা [জননী] হইয়াও যিনি আনন্দলীলায় নিজ অঙ্কে নিজেই নন্দনরূপে হেরম্বমূর্ত্তি, মহাকালের বিলাসলালসার লীলাভূমি এবং ত্রিলোকলোকবালকের প্রসবভূমি পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চমূর্ত্তি মা সেই তোমাকে প্রণাম করি।

মহাকালস্যোরঃস্থল-কুসুমশয্যাধিশয়িতা
পরানন্দশ্রান্তা জিতজলদকান্তা কুসুমিতা।
লতা কাচিৎ শ্যামা শিরসি ধৃতসোমার্দ্ধসুষমা
হৃদারামে সামে ফলতু কুলকৈবল্যমহিমা ॥

মহাকালের বক্ষঃস্থলরূপ সুকোমল কুসুমশয্যায় অধিশয়িতা, পরমানন্দরসোন্মত্তা, রূপে জলদকান্তির এবং লীলায় জলদকান্তার [সৌদামিনীর] বিজয়িনী, সীমন্ত-শোভিত-অর্দ্ধেন্দু-সুন্দরী সেই কুসুমিত শ্যামলতা আমার হৃদয়রূপ উপবনে কুলতত্ত্বরূপ কৈবল্যফলে ফলিতা হউন।

দিগম্বরনিতম্বিনীং ললিতনীলকাদম্বিনীং
চলৎকুটিলকুন্তলোচ্ছলিতকান্তিধারাধরাং।
মৃদূল্লসিত-বিভ্রমদ্-ভ্রমর-বিভ্রমাপাঙ্গয়ো-
র্বিমুগ্ধবরভৈরবাং শ্রয় হৃদয়! মাভৈ-রবাম্ ॥

চঞ্চল কুটিল কুন্তলচ্ছলে উচ্ছলিত কান্তিময় ধারাধরা, দিক্ এবং অম্বর-ময়-নিতম্বিনী (পক্ষান্তরে) দিগম্বর-নিতম্বিনী, বিভ্রমদ্‌ভ্রমর-বিভ্রমময় অপাঙ্গদ্বয়ের মৃদুমধুর উল্লাসভরে বরভৈরব-মোহিনী মাভৈ-রবধারিণী সেই ললিতনীলকাদম্বিনী জগদম্বাকে হৃদয় আশ্রয় কর ॥

সদানন্দ-হৃদানন্দ বিধায়ি-চরণদ্বয়ীং।
যন্ত্রস্থমন্ত্রপ্রতিমাং তন্ত্রতত্ত্বময়ীং নুমঃ ॥

মহাযন্ত্রস্থ-মন্ত্রমূর্ত্তি তন্ত্রতত্ত্বময়ী পরমদেবতার সদানন্দ-হৃদানন্দ-বিধান-নিদান চরণাম্বুজে প্রণাম ॥

মাতস্ত্বং নিগমাগমপ্রসবভূঃ শক্ত্যা চ শাক্তেন চ
ধাত্রী ত্বং নিগমাগমস্থিতিমতী শক্ত্যা চ শাক্তেন চ।
পাত্রী ত্বং নিগমাগমাশ্রয়ময়ী শক্ত্যা চ শাক্তেন চ
ভূয়া মে নিগমাগমপ্রলয়ভূঃ শক্ত্যা চ শাক্তেন চ ॥

মা! তুমি শক্তি এবং শাক্ত (শক্তিমান) এই উভয়রূপে নিগম ও আগম উভয় শাস্ত্রের প্রসবভূমি, পার্ব্বতীরূপে তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই নিগম এবং শিবরূপে যাহা বলিয়াছ তাহাই আগম। তুমিই শক্তি এবং শাক্ত উভয় মূর্ত্তিতে সেই নিগমাগমের ধাত্রী হইয়া পালন করিতেছ, শক্তিসাধিকা এবং শাক্তসাধক এই উভয়রূপেই শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে তুমিই তন্ত্রশাস্ত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছ। আবার তুমিই শক্তি এবং শাক্তরূপে নিগমাগমের আশ্রয়-স্বরূপা হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছ, তন্ত্রশাস্ত্রে যাহা কিছু সাধনপ্রণালী ব্যবস্থিত হইয়াছে সে সমস্তই শিব-শক্তি-স্বরূপে তোমাতে সমাহিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম মা! এ সংসারে নিগম-আগমের প্রসব, পালন ও রক্ষা তিন কার্য্যই তুমি করিতেছ, কিন্তু পার নাই কেবল সংহার করিতে। কেন না, মন্ত্রময় তন্ত্রশাস্ত্র তোমারই রূপান্তর মাত্র, তন্ত্রের ধ্বংস হইলে তোমারই ধ্বংস হইয়া যায়। বিশ্ব-সংহারিণী হইয়াও তন্ত্রের নিকটে তোমার সে সংহারশক্তি কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাই বলি মা! তোমার নিগমাগমের তো ধ্বংস হইবে না, একবার আমার নিগমাগমের ধ্বংস করিয়া দাও মা। শক্তিরূপে শাক্তরূপে প্রকৃতিরূপে পুরুষরূপে বার বার আমার এই সংসারে যাতায়াত—নিগমাগম ঘুচাইয়া দাও মা!

(পক্ষান্তরে) মা! শক্তিরূপে শাক্তরূপে (প্রকৃতি এবং পুরুষরূপে) তুমিই জীবের নিগমাগমের (সংসারে যাতায়াতের) সৃষ্টিকর্ত্রী, প্রকৃতিপুরুষ সংযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে ইহা তোমারই বিধান। তুমিই শক্তি শাক্ত (মাতাপিতা) উভয় রূপে জীবকে পালন কর। তাই জীবের নিগম-আগম আশ্রয়, সৃষ্টি-পালন-রক্ষা, শক্তি-শাক্ত উভয় রূপে তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। মা! তুমি যে শক্তি-শাক্ত উভয় রূপে সংসার-যাতায়াতের সৃষ্টি-পালন রক্ষা করিতেছ একবার দয়া করিয়া তোমার সেই শক্তি-শাক্ত-রূপে আমার সংসারের প্রলয়টি করিয়া দাও। নিখিল প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিতে শক্তিশিবজ্ঞান দাও। এইবার আমি নয়ন ভরিয়া

মন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, ভুবন ভরিয়া ভুবনমোহিনী মায়ের রূপ দেখিয়া লই ; দশ দিগন্ত আলো করিয়া মা তুমি অনন্তরূপে সাজিয়া দাঁড়াও, জন্মান্ধ সন্তানের চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনে উদ্ভাসিত করিয়া দাও, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে দিকে চাই, যেন মা। তোমার ঐ অপরূপ স্ব-স্বরূপে এ বিশ্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যাই।

মঙ্গলাচরণ

মা! এ জগতে সকলেই কিছু না কিছু করিবার পূর্ব্বে যাহা হয় একটা মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে, আমি তাহার কি করিব? সর্ব্বমঙ্গলার চরণ ভিন্ন আর তো মঙ্গলাচরণ জানি না। তন্ত্রতন্ত্রে আমার যত যাহা করিবার আছে তাহা তো অন্তর্য্যামিণী তুমি জান! যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু আমি স্বতন্ত্র না হইলেও স্বতন্ত্র থাকিতে চাই; তুমি যেমন ব্রহ্মময়ী বিশ্বময়ী তেমনই আবার লীলাময়ী নৃত্যময়ী, যেমন আনন্দময়ী তেমনই ইচ্ছাময়ী, চিন্ময়ী এবং মৃন্ময়ী; তাই বলিয়াই মা! তোমায় মনোময়ী নয়নময়ী প্রাণময়ী প্রেমময়ী দেখিতে চাই। যে শক্তিবলে তোমার নাম করিব সে শক্তিস্বরূপিণীও তুমি, তুমি আপন গান আপনি শুনিবে, আপন প্রেমে আপনি নাচিবে, আমার তাহাতে কিসের মঙ্গলাচরণ মা? তোমার অন্ন তোমায় ভোজন করাইব, আমি কেবল প্রসাদ পাইব। তুমি আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনি তাহাতে বিভোর হইবে, আমি তোমার সেই স্তিমিতগম্ভীর অদ্বৈত-সাগরে মা মা রবের দ্বৈত তরঙ্গ তুলিয়া সাঁতার দিব। বিরক্তি বোধ হয়, পদাঘাতে ডুবাইয়া দিও, তবু তো মহাকালের বক্ষঃস্থল হইতে শ্রীচরণ উত্তোলন করিতে হইবে। তুমি হয়ত কপট-কোপকুঞ্চিত-কুটিল-লোচনে চাহিয়া মহাকালকে বলিবে—"একে মার্"—আমি অমনি হাসিয়া করতালি দিয়া বলিব—"এ যে মা-র্!" চিদ্‌ঘন-শ্যাম-সুন্দরি! ঐ ভুবনমোহন রূপের ছটায় সে কোপের ঘটা একবার দেখাও মা! তোমার ঐ স্মিতশোভন বদনমণ্ডলে সে রোষারুণ-করুণ-কটাক্ষ-ভঙ্গী দেখিতে বড়ই সাধ মা! সে সাধ না পূর্ণ হইলে সাধনা কেবল বেদনাময়ী। ভক্ত-ভয়-ভঞ্জিনি! ভবহৃদয়রঞ্জিনি! তোমার খেলা তুমি জান, ভয় দেখাও আর হাসাও কাঁদাও, "মা" বলিতে শিখাইয়া দাও মা! মঙ্গলাচরণে হউক, অমঙ্গলাচরণে হউক, নাচিয়া নাচিয়া "জয় মা" বলিয়া মঙ্গলাচরণে শরণ লই।

জয় কুলেন্দ্র কুলানন্দ—কামদেব তার্কিক গুরুর জয়।
জয় সশিষ্য কুলদানন্দ—নাথ পরমগুরুর জয়।
জয় জয় জয়—কৃষ্ণানন্দ—পরাপর গুরুর জয়।
জয় পরমেষ্ঠি—গুরু—বিজয়—ভৈরব-ভৈরবীর জয়।
জয় সিদ্ধ সাধকের জয়, জয় সিদ্ধিদা সাধিকার জয়।
জয় যন্ত্র মন্ত্রের জয়, জয় তন্ত্র শাস্ত্রের জয়।
জয় তন্ত্রবক্তার জয়, জয় তন্ত্রেশ্বরীর জয়।
জয় সর্ব্বার্থ—সাধিকার জয়, জয় সর্ব্বমঙ্গলময়ীর জয়।
জয় জয় জয় "জগদম্বা—সর্ব্বমঙ্গলা" নামের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব ও উপযোগিতা

॥ শাস্ত্রের প্রয়োজন ॥

সংসার তাহাকেই বলে যাহাতে বহু ব্যক্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মে তিনিই প্রশংসিত গৃহস্বামী, যিনি ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক পরিজনকে সমদৃষ্টিভাজন করিয়া স্নেহ ও শান্তির ব্যবস্থা করেন। হয়ত সকলের প্রতি গৃহস্থের সমদৃষ্টি সমান স্নেহ আছে, কিন্তু পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ যদি ন্যায় পথ অতিক্রম করিয়া কর্ত্তাকে পক্ষপাতী মনে করেন তবে তাঁহার জন্যই শাসনের বিধান। মানবের ক্ষুদ্র রাজ্য গৃহমধ্যে ইহাই গৃহনীতি, এই নীতি আবার রাজত্বগত হইলে তাহারই নাম রাজনীতি ; ফলতঃ, বহুপ্রকৃতির একত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেই রাজার এই শান্তি-সন্তোষময় ব্যবস্থা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। প্রজাপুঞ্জ তাহা বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন রাজ্যরক্ষা করিতে হইলেই এই কোমলকঠোর রাজনীতিদণ্ড রাজাকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কে এমন ভারতবাসী আছেন যিনি বর্ত্তমান রাজরাজেশ্বরীর একচ্ছত্রাধিপত্য সাম্রাজ্যের অন্তঃকক্ষে বাস করিয়া এ কথা অস্বীকার করিবেন। এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংসারের রাজা তুমি আমি, তোমার আমার এই ক্ষুদ্র রাজত্বের সমষ্টি লইয়াই ভারতেশ্বরী আজ রাজরাজেশ্বরী, আবার এই অনন্ত কোটি বিশাল বিশ্বসংসার লইয়া যাঁহার রাজত্ব, ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে তিনিই এক অদ্বিতীয় অধীশ্বরী, ত্রৈলোক্য-রাজরাজেশ্বরী। তাঁহারই বিশ্ববিজয়ী অমোঘ শাসনবিধির নাম শাস্ত্র। তুমি আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিরক্ষর প্রজা, বিশ্বসম্রাজ্ঞীর অনন্ত ভুবন-রাজ্যের অগাধ রাজনীতিতত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য তোমার আমার নাই, সামর্থ্য আছে কেবল তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডলীলা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যাঁহারা সেই মহাবিদ্যাপ্রসাদে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে এই অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত দ্বৈততম পটল মধ্য দিয়া অদ্বৈত পরতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তুমি আমি কেবল তাঁহাদের পদাঙ্কলক্ষিত পথে অগ্রসর হইবার দায়িত্ব লইয়া সংসারে আসিয়াছি। রাজকীয় সভাসদ্‌গণ যেমন রাজনীতির প্রণেতা নহেন, কিন্তু বোদ্ধা, তদ্রূপ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণও কেহ সাধনশাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, কিন্তু অনুস্মরণকর্ত্তা। ইহা ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-বিজড়িত সীমাবদ্ধ মানববুদ্ধিসিদ্ধ শাস্ত্র নহে, ভ্রম যাঁহার নিকটে ভ্রান্ত, প্রমাদ যাঁহার নিকটে প্রমত্ত, বিপ্রলিপ্সা যাঁহার নিকটে স্বতঃপ্রতারিত, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান ভূত-ভাবন ইহার প্রকাশক, সর্ব্বান্তর্য্যামিণী ভগবতী জগদ্ধাত্রী

ইহার শ্রোত্রী, পরে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ হইতে নারদাদি ঋষিকদম্ব এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র গৌতম প্রভৃতি গুরুপরম্পরা এ তত্ত্ব অধিগত হইয়া তাঁহারাই এ বিশ্বরাজ্য-রাজসভার সভাসদ। তাঁহাদের প্রচারিত যাহা শাস্ত্ররূপ রাজনীতি, বিশ্বসাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রজা তুমি আমি তাহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস। রাজার সান্নিধ্য লাভ করিয়া স্বচক্ষে রাজকার্য্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা যাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের স্থানে না পৌঁছিয়া তাঁহাদের জ্ঞানে অধিকার না পাইয়া, তাঁহাদের নির্ণীত সেই সকল তত্ত্বে কূটকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ফুৎকারে হিমাচল উড়াইতে যাওয়া বুদ্ধিমানের পক্ষে হাসিবার, উন্মত্তের পক্ষে নাচিবার আর অবোধ অনার্য্যের পক্ষে অপমৃত্যু মরিবার কথা।

॥ শাস্ত্রবোধ ॥

"সেইখানে আমাকে লইয়া চল, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া পরীক্ষা করিব পদার্থ সত্য কি না" এ কথা তাঁহারই মুখে শোভা পায়, যাঁহার চক্ষু আছে, চরণ আছে, নাই কেবল পথের পরিচয়। আর আমার না আছে চক্ষু, না আছে চরণ, না আছে পথের পরিচয়, আছে কেবল দানবপ্রকৃতিসুলভ দুরন্ত অভিমান যাহার আবেগে আমার কি আছে, কি নাই, ইহাও আমার দেখিবার অবসর নাই। তথাপি কি জানি তাঁহার কেমন করুণা, পঙ্গু আমি তথাপি ত্রিভুবনজননী সেই দুরতিক্রম চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অতিক্রম করাইয়া জীবের এই স্বাধীনতার পূর্ণতম বিলাসভূমি ভারতক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যগোত্রে আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুরদৃষ্টের কেমন কঠোর চক্র! যেমন জননীর অঞ্চলচ্যুত হইয়াছি অমনি স্বাধীনতার তরঙ্গভরে হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এখন সাধের স্বাধীনতা-সাগরে যদি ডুবিয়া মরি সেও স্বীকার, তথাপি স্বচক্ষে আপন মরণ না দেখিয়া কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে "আমি মরিতেছি"। আর না মরিলেই বা কেমন করিয়া বুঝিব যে, "আমার পথ মন্দ, তোমার পথ ভাল"। এই তো আমার পথ-পরিচয়ের পরিচয়, এমন মরণান্ত প্রতিজ্ঞায় যে অভিমানকে সেবা করিতে বসিয়াছে, নিত্যকৃপানিধান ঋষিগণ তাহাকেও প্রেমমন্থর মধুর স্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন, "চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি" অর্থাৎ তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে না, অনুষ্ঠান করিয়া দেখ, চিকিৎসাশাস্ত্র (আয়ুর্ব্বেদ), জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্র পদে পদে প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে। পরম দেবতার আশীর্ব্বাদে এবং শাস্ত্রের প্রসাদে পঙ্গু হইয়াও আমি এইরূপে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলাম, বিশ্বাস না করিয়াও পথের পরিচয় পাইলাম,

তথাপি অভাব ঘুচিল না অজ্ঞান অন্ধকারে, চক্ষু তো থাকিয়াও নাই, কি উপায়ে দেখিব? কিরূপে পথের পরীক্ষা করিব? শাস্ত্র অমনি উঠিয়া বলিলেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

জীব! তুমি অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইলেও গুরুচরণে শরণাপন্ন হও, জ্ঞানরূপ অঞ্জনাঙ্কিত শলাকা দ্বারা তিনি তোমার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবেন যাহাতে তুমি সংসারে থাকিলেও সাংসারিক মায়ার অন্ধকার আর তোমার দিব্যদৃষ্টির ব্যাঘাত করিতে পারিবে না।

শাস্ত্র বলিলেন—'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন' আমি কিন্তু শুনিলাম 'চক্ষুরুন্মূলিতং যেন'। বল ভাই। এ দুরদৃষ্টের খণ্ডন কিসে হইবে? গুরুর নিকটে "বুঝি না" বলিতে অপমান বোধ হয়, এ অভিমানের উপায় কি? তাই বলিতেছিলাম, এ দুরন্ত অভিমানের অন্ত না হইলে শান্তির ব্যবস্থা নাই। যদি নিজেই বুঝিয়া থাকি তবে তো গুরুকরণ নিষ্প্রয়োজন, যদি না বুঝিয়া থাকি তবে আর "বুঝি না" বলিতে অপমান বোধ কেন? "আগে বুঝাইয়া দাও, পরে বিশ্বাস করিব" বলিয়া এ অনর্থক আবদার কেন? আর যদি এমন বুঝিয়াছি যে, নিজ বুদ্ধিবলে শাস্ত্রের ভ্রান্ত তত্ত্ব-সকল খণ্ডন করিব, যুক্তিতর্ক বিচারের শাণিত শরক্ষেপে খণ্ড খণ্ড করিয়া শাস্ত্রকে উড়াইব, তাহা হইলেও তো অনেক দূর অগ্রসর হইবার কথা। এ শাস্ত্র, দর্শন বা বিজ্ঞান নহে, সিদ্ধিমূলক সাধননীতি। ইহা যেমন বুঝিতে হইবে তেমনই সাধিতে হইবে, বোধের অভাবে সাধনের প্রভাবেও ইহা প্রত্যক্ষ হইবে; কিন্তু সহস্র বোধ সত্ত্বেও সাধনের অভাবে ইহা প্রত্যক্ষ হইবার নহে। দিগ্বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াও অনুষ্ঠানবিরত হইলে সাধনারাজ্যে তিনি কীটাণুকীট জীব বলিয়াও গণ্য নহেন। অবোধ মহামূর্খও যদি সাধনানুরক্ত বিশ্বাসী ভক্ত হয় তবে শাস্ত্র তাহাকেই সহস্রের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোঽপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

"সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কেহ একজন যদি সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে, যাহারা এইরূপ যত্ন করে তাহাদেরও সহস্র সহস্রের মধ্যে যদি কোন একজন আমাকে স্বরূপতঃ জানে।"

তপোবীর না হইলে সাধন-সংগ্রামে বিজয় লাভ করা বুদ্ধিবীরের কার্য্য নহে। চতুরঙ্গ সেনাসম্পন্ন মহারথীও যদি স্বয়ং নিরস্ত্র হয়েন তবে তাঁহার সমস্ত উদ্যম যেমন ব্যর্থ হয়, মহাধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতও তেমনই সাধনশক্তিহীন হইলে তাঁহার সমস্ত পাণ্ডিত্য ব্যর্থ হয়। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং, শরীরং বা পাতয়েয়ং"—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা

শরীর পতন," এই প্রতিজ্ঞার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে যিনি ঝাঁপ দিয়াছেন, ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের ন্যায় শাস্ত্র তাঁহাকেই অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। আজ যদি তপঃ-সংগ্রামবীরেন্দ্রকেশরী কামদেব তার্কিকের মত, অনন্যশরণ মাতৃময়জীবন গণেশ উপাধ্যায়ের মত, শক্তিচরণ-সরোরুহ-মত্তমধুপ রামপ্রসাদের মত বিশ্বাসের বল সকলের থাকিত তবে কি আর তন্ত্রতত্ত্বে এ সকল কুমন্ত্রণার গান গাহিতে হইত ? আজ সে দিন হারাইয়াছি, সাধনশাস্ত্র তন্ত্রের প্রতি সে অটল বিশ্বাস টলিয়াছে।

॥ শাস্ত্রে সন্দেহ ॥

"উপাসনা-শাস্ত্র বেদ তো রহিয়াছে, তবে আবার তন্ত্রশাস্ত্রের অবতারণা কেন হইল" ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী সমাজের প্রথম সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উত্তর আমরা পরে দিব। ততোধিক সন্দেহের বিষয় এই যে, যুগযুগান্ত কঠোর তপস্যা করিয়া মানব যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ, তন্ত্রশাস্ত্রে এক জন্মে এক বৎসরে এক সপ্তাহে সেই সিদ্ধি লাভ হইবে আদৌ ইহা শুনিলেই উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। ঘোর পাপাচারসঙ্কুল কলিযুগের প্রতি ভগবানের এত দয়া কিসে হইল যে, ইন্দ্রাদি দেবদুর্লভ পদ এক জন্মে এক সপ্তাহে সিদ্ধ হইবে ? যদি হয় তবে তো ঈশ্বর ঘোর পক্ষপাতী, এই সকল কথা শুনিলে অনেক সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়, কেন না তুমি আমি যেন ঈশ্বরের রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষক অথবা তাঁহার রাজনীতির যশ অপযশ যেন তোমার আমার সমালোচনার প্রতি নির্ভর করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি পক্ষপাতী হইলেন, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি কি ? যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্ববিভু তিনি পক্ষপাতী হইলে তুমি আমি তাহা নিবারণ করিব কি করিয়া ? বলিবে, আমরা নিন্দা করিব, তোমার আমার নিন্দায় তাঁহার আসে যায় কি ? যিনি কীটাণুকীটের অন্তর্য্যামী, তুমি আমি নিন্দা করিব তাহা কি তিনি জানেন না ? জানিয়া শুনিয়া এ নিন্দা স্বীকার করিয়া যিনি "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন—

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"
"কলাবস্মোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥"
"নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ॥"

"কলিযুগে আগমোক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য পথ-গমনে প্রবৃত্ত হয় তাহার গতি নাই, ইহা সত্য সত্য নিঃসংশয়।"

"কলিযুগে যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রোক্ত নানা পথে সিদ্ধিলাভ ইচ্ছা করে, সেই দুর্ম্মতি পুরুষ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পানের জন্য জাহ্নবীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করে।"

"ইহলোকে পরলোকে সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত এমন অন্য পথ নাই যেমন তন্ত্রোক্ত পথ সুখ মোক্ষ উভয়ের নিমিত্ত হইয়াছে।"

এই যাঁহার নিজমুখনির্গত অভ্রান্তসিদ্ধান্ত ও অমোঘ আজ্ঞা তাঁহাকে তুমি নিন্দার ভয় দেখাইয়া কি করিবে? যিনি নিন্দায় ভীত, স্তবে সন্তুষ্ট, তিনি তোমার ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু জগতের ঈশ্বর নহেন, যিনি জগতের ঈশ্বর তিনিই ঈশ্বর, লৌকিক যশ অপযশ নিন্দা সাধুবাদ সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিশ্বকর্ত্তৃত্ব দণ্ডায়মান, ইহাই তাঁহার বৈকুণ্ঠ বৈভব, তোমার ইচ্ছা হয় নিন্দা কর, তিরস্কার কর, হিমাচল পর্ব্বতের মূলে কঠোর মুষ্টি নিক্ষেপ কর, অটল অচলরাজ তাহাতে টলিবেন না; কিন্তু তোমার অঙ্গুলীগুলি চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া যাইবে। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া যাঁহারা তাহার ফল বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা ইহাতে নিরস্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা নিজের ন্যায় লইয়া ঈশ্বরকে ন্যায়পরায়ণ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবার নহেন। আমরাও বৈষম্যবাদী বা তাঁহাদের মতের বিরোধী নই, কিন্তু বলি এই যে, কলির জীবের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ভঙ্গ হয় নাই, বরং এ দয়া না করিলেই অন্যায় হইত। জিজ্ঞাসা করি, সত্যযুগের লোকসকলকে লক্ষ বৎসর পরমায়ু এবং মজ্জাগত প্রাণ দিয়া কলির মানুষের শত বৎসর পরমায়ু এবং অন্নগত প্রাণ দেওয়া ঈশ্বরের কোন্ ন্যায়পরায়ণতার কার্য্য হইয়াছে? একবার যখন অন্যায় হইয়াছে তখন না হয় আর একবারও অন্যায় হইল, তাহা বলিয়া কি করিবে? বাস্তবিক কিন্তু 'বিষস্য বিষমৌষধং', কলিযুগ অপেক্ষায় সত্যযুগে পরমায়ু সম্বন্ধে ন্যায়ের যে অভাব ঘটিয়াছিল, সত্যযুগ অপেক্ষায় কলিযুগে সাধনার ফল শীঘ্র দিয়া তিনি না হয় সেই অভাব পূরণ করিলেন, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? ফলতঃ তাঁহার অভাবও নাই, পূরণও নাই। নটনাট্যবৎ সংসার নাটকে তিনি স্বয়ংই নটরাজ এবং নটবর-রমণী। সর্ব্বাগ্রে নটনটীর সম্মিলনে এ নাটকের প্রারম্ভ, আবার তাঁহাদেরই অমোঘ ইচ্ছাক্রমে কালযামিনীর অবসানে ইহার উপসংহার। সংস্কৃত-নাটক-তত্ত্ববিদ্গণ অবগত আছেন, গোপুচ্ছসদৃশাকারে নাটকের বন্ধনরচনা হয়। জানিনা আলঙ্কারিক কবিগণ কোন্ আদর্শ অনুসারে এ রচনাপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া তো আমাদের বোধহয় যেন আদিকবি বিশ্বরচয়িতার আদর্শ নাটক দেখিয়াই নাটকবন্ধনে এ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। সেই আদর্শরচনা

বিশ্বনাটকের এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগের বিন্যাস দেখিয়া বোধহয় লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইতে এই কলির উপান্তকাল পর্য্যন্ত যেন গোপুচ্ছসদৃশাকারে রচিত হইয়াছে। লীলা সম্বরণের সময় হইয়া আসিয়াছে, অমনি যেন উপাদান উপকরণগুলি শীঘ্র শীঘ্র সংযত করিয়া সংসারের শেষ দৃশ্য ভস্মস্তোম-সমাকীর্ণ মহাশ্মশানে নটরাজ মহাকাল একবার মহাপ্রলয়ের বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিবেন, আর তাঁহারই বক্ষঃস্থলে দক্ষিণচরণ অর্পণ করিয়া নটবর-রমণী মহাকাল-মোহিনী বিশ্বজননী মা আমার আবার চিদ্‌ঘনানন্দ-প্রেমতরঙ্গে বিভোর হইয়া অশ্রান্ত নৃত্যভরে উন্মাদিনী সাজিবেন—কলিযুগের শীঘ্র শীঘ্র উপান্ত-সংহার কেবল সেই নৃত্যের সাজসজ্জা বই আর কিছুই নহে। অবিশ্বাসী অভক্তের প্রাণ এ দৃশ্য স্মরণ করিয়া সভয়ে কম্পিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে এ আনন্দবার্ত্তা পুলকে প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত করে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, কাহার সাধ্য তাহা নিরোধ করে।

দ্বিতীয়তঃ, সত্যযুগের জীব অপেক্ষা কলিযুগের জীবের প্রতি তাঁহার অপার করুণার উল্লেখ দেখিয়া যখন তোমার ঈর্ষা হয়, তখন বোধহয় যেন তোমার মতে সত্যের জীব কলির জীব বলিয়া কতগুলি জীবের সংখ্যাগণ্ডি দেওয়া আছে। সত্যের জীব কলিতে আসিবে না এবং কলির জীব সত্যে যাইবে না, না যাউক, না আসুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সত্য ত্রেতা দ্বাপরের জীব সকলেই কিছু সিদ্ধপুরুষ নহে, আর কলির জীব বলিতে সকলেই একেবারে অসিদ্ধ নহে, একথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। তবে সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যাঁহারা সাধক, অথচ সিদ্ধ নহেন এবং কলিতে যাঁহারা সাধনোন্মুখ অথচ সাধক নহেন, সে সকল জীবের গতি কি হইবে? তোমার মতে তো কলির জীব সত্যে যাইবে না এবং সত্যের জীব কলিতে আসিতে পারিবে না। সত্য ও কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে হয় তাহারা পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিল, না হয় অদৃষ্টচক্রের নিষ্পেষণে আবার সংসারের অশ্রান্ত যাতায়াত-পথে ধাবিত হইল। কলির জীব এক জন্মে সিদ্ধ হইবে শুনিয়া তুমি চমকিয়া উঠিয়াছিলে, এখন তোমার সত্যের জীব যে, সাধন আরম্ভ করিতেই নির্ব্বাণমুক্তি পায়! হয়ত একজন সত্যযুগের এক কোটি বৎসর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি পাইয়াছেন সৌভাগ্য-ক্রমে সত্যযুগের শেষে যিনি জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি বিনা পরিশ্রমে (যুগান্তের অনুরোধে) সেই জন্মেই সেই সিদ্ধি লাভ করিলেন; ন্যায়বাদিন্! বলিয়া দাও, তোমার এ কোন্ ন্যায়ের নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচার!

চতুরশীতিলক্ষ বারে কত শত কোটি কোটি বৎসরে যে ন্যায়ের চক্র একবার বিঘূর্ণিত হয়, তোমার আমার উর্দ্ধ সংখ্যা শত বৎসরের ন্যায় লইয়া তাহার সহিত বিচার হয় না। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"মানুষ্যসদৃশং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে।
দেবতাঃ পিতরঃ সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষম্‌॥
দুর্লভো মানুষো দেহঃ সর্ব্বদেহেষু সর্ব্বদা।
তস্মাচ্চ মানুষং জন্ম এতদ্‌যুক্তং সুদুর্লভম্‌॥
তত্রাপি সংশয়চ্ছেত্তা বিশেষেণ তু পার্ব্বতি।
মন্ত্রতন্ত্ররতঃ পুংসাং সোঽপি চেদতিদুর্লভঃ॥
তত্রাগমবিদঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বদেহেষু পূজিতাঃ।
তত্রাপি সাধকঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ॥" [বিশ্বসার-তন্ত্র]

মনুষ্যজন্মসদৃশ জন্ম কুত্রাপি নাই, দেবতা এবং পিতৃলোকসকল এই মনুষ্যজন্ম বাঞ্ছা করেন। দেহীর সমস্ত দেহ অপেক্ষা মনুষ্যদেহ সর্ব্বদা দুর্লভ, এইজন্য মনুষ্য-জন্ম সুদুর্লভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পার্ব্বতি! এই দুর্লভজন্মা মানবমধ্যে সংশয়চ্ছেত্তা ব্যক্তিবিশেষ দুর্লভ, সংশয়চ্ছেত্তৃগণের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্ররত পুরুষ অতিদুর্লভ; সেই মন্ত্রতন্ত্ররত ধার্ম্মিকগণের মধ্যে আবার সর্ব্বদেহিপূজিত তন্ত্রবিদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার যিনি সাধক তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বতন্ত্রে তাঁহারই সাধনানুষ্ঠান সুরক্ষিত।

"মানুষ্যং সফলং জন্ম সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোচরং।
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্‌॥
ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।
কদাচিল্লভতে জন্ম মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং জন্ম দুর্লভম্‌॥" [রুদ্রযামল-তন্ত্র]

শরীরীর চতুরশীতি লক্ষ শরীর-মধ্যে মনুষ্য জন্মই সফল, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত। মনুষ্যত্ব ব্যতিরেকে জীব অন্য জন্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পুণ্যসঞ্চয় থাকিলে কদাচিৎ মোক্ষমার্গের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।

"স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ।
ততো লভেৎ পরেশানি মানুষীং দুর্লভাং তনুম্‌॥" [নির্ব্বাণ-তন্ত্র]

শৈলজে! অব্যয় জীবাত্মা স্থাবর কীট পশু পক্ষী প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ জন্ম প্রাপ্ত হয়, পরমেশানি! তৎপরে দুর্লভা মানুষী তনু লাভ করে।

"স্থাবরা স্ত্রিংশলক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥ [কর্ম্ম-বিপাক]

ত্রিংশলক্ষ স্থাবর, নবলক্ষ জলজ, দশলক্ষ কৃমিজ, একাদশলক্ষ পক্ষী, বিংশলক্ষ পশু, চতুর্লক্ষ মানব, এই চতুরশীতি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া তবে জীব দ্বিজত্ব লাভ করে।

"ততো মানুষদেহশ্চ ততো ধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ।
ততোঽপি লভতে জন্ম পুনর্ম্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ।
চতুরশীতিলক্ষেষু নানাযোনিষু শৈলজে॥
যমাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযযৌ ব্রহ্মশাসনম্।
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদি স্যাদ্দুর্লভা তনুঃ॥
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাদ্ যদি প্রাপ্নোতি সদ্গুরোঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ॥
তদৈব পরমো মোক্ষো যাবদ্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্।
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি॥" [নির্ব্বাণ-তন্ত্র]

তৎপরে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে, তৎপরে ধর্ম্মাধিকারী হয়, তৎপর পুনর্ব্বার জন্ম লাভ করে, পুনর্ব্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপে জীব কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিত হইয়া চতুরশীতিলক্ষরূপ নানা যোনিতে জাত এবং মৃত হয়। যমের আজ্ঞাক্রমে এইরূপে পাপীর নানা জন্মে পাপের ফলভোগ শেষ হইলে পুণ্যফল ভোগের জন্য জীব ব্রহ্মশাসনে (ব্রহ্মলোকে) মতান্তরে (ব্রহ্মাবর্ত্তে*) গমন করে, তথা হইতে কর্ম্মানুসারে দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া সৌভাগ্যক্রমে যদি সদ্গুরু হইতে মহাবিদ্যার "মন্ত্রদীক্ষা" এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে—তবেই জীবের পরম মোক্ষ, যত কাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের স্থায়িত্ব, মহাবিদ্যার প্রসাদে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ জন্মে জীব নিজকর্ম্মানুরূপ পরমায়ু ভোগ করে, কাহারও শতবৎসর, কাহারও সহস্র বৎসর, কাহারও লক্ষ বৎসর, কাহারও বা ততোধিক কোটি কোটি বৎসর—ইহার ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সমস্ত জীব, পূর্ণ, অপূর্ণ, পূর্ণাপূর্ণ, ভুক্ত, অভুক্ত ভুক্তাভুক্ত নানাবিধ অদৃষ্ট সত্ত্বেই কেবল এক যুগান্তের অনুরোধে চরম সমাধি লাভ করে—ইহা নিতান্তই অপসিদ্ধান্ত। শেষের এক কথা আছে যে "চতুরশীতি লক্ষ জন্ম বিশ্বাস করি না" ইহাও অসঙ্গত, কেন না সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্যুগ যে প্রমাণে যে কারণে যে যুক্তিতে বিশ্বাস করি, অন্ততঃ সেই প্রমাণে সেই কারণে সেই যুক্তিতেই চতুরশীতি লক্ষ জন্ম বিশ্বাস করিতে আমি অবশ্য বাধ্য, কারণ উভয়ই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।

---

* সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেব-নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে দেশ, সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া মহর্ষিগণ নির্দ্দেশ করেন।

শাস্ত্রের একাংশ বিশ্বাস করি, অপরাংশ ভ্রান্ত—মানুষ দক্ষিণাঙ্গে সচেতন, বামাঙ্গে অচেতন, এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করিব ? শাস্ত্রের সকল অংশ বিশ্বাস করিব না কেন, অবিশ্বাসের কারণ কি হইয়াছে ? তুমি বলিবে, এই চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যাই অবিশ্বাসের কারণ—কেন না, এ চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অপ্রত্যক্ষ ; আমি কিন্তু বলিব, যে চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যা তোমার অবিশ্বাসের কারণ—সেই চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যাই আমার ধ্রুব বিশ্বাসের কারণ। কেন না, এই চতুরশীতি লক্ষ জন্ম তোমার আমার অপ্রত্যক্ষ—যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা নাই বলিবার তুমি কে ? তুমি ঊর্দ্ধ সংখ্যা বলিতে পার, আছে কি না তাহা জানি না—দেখি নাই বলিয়া আমি যেমন "আছে" বলিতে পারি না, দেখ নাই বলিয়া তুমিও তেমনি তাহা নাই বলিতে পার না। আর—আমি দেখি নাই বলিয়াই যদি "নাই" হয়, তবে ত অন্ধের দৃষ্টিতে জগৎও নাই, সে ত নিজকেও নিজে দেখিতে পায় না—তবে কি তাহার পক্ষে সেও নাই ? নাই তাহাতে ক্ষতি নাই, জিজ্ঞাসা করি, তবে এ "নাই" বলে কে ? যে নিজে নাই, তার বলাও নাই !! যে কারণে পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, সেই কারণ-সঙ্ঘটন সময়ে মানব ত শুক্রশোণিত-পরমাণুগত, সে ঘটনা ত তাহার প্রত্যক্ষ নহে, তবে না দেখিয়া পরের কথায় "পিতা মাতা" বিশ্বাস কর কেন ? হইতে পারে ইষ্টাপত্তি। বলিবে তাহাও বিশ্বাস করি না, এ অবিশ্বাসের কারণ কদাচিৎ সত্য হইতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমি মানুষ হইয়া সাহস করিয়া বলিতে পার ? জগতের সকল পিতা মাতাই এইরূপ সন্দেহের বিষয়। বলিতে পারিলেও তাহা উন্মত্ত প্রলাপ বই আর কিছুই নহে। চতুরশীতি লক্ষ জন্ম সম্বন্ধেও যদি তোমার সেইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু বলি এই যে—সন্দেহকে "সন্দেহ" বলিয়া স্থির রাখিও, নিশ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না, কেন না "আছে কিনা" ইহাই সন্দেহ, অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এই উভয়কোটিবিশিষ্ট জ্ঞান না হইলে সন্দেহ হয় না। যাহা "নাই" বলিয়া জানিয়াছ, তাহা কখনও "আছে কি না" হইতে পারে না। "নাই" ইহা সন্দেহ নহে, নিশ্চয়। তাই বলিতেছিলাম সন্দেহ যখন হইয়াছে, তখন ঊর্দ্ধসংখ্যা বলিতে পার—চতুরশীতি লক্ষ জন্ম আছে কি না জানি না। এই "আছে কি না" সন্দেহবশতঃ একেবারে "নাই" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্তির বিভীষিকা মাত্র। আমরা জন্মান্তরবাদে এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অগ্রসর হইব। এক্ষণে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যা যখন নির্দ্দিষ্ট আছে তখন বিশ্বাস করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কেহ আংশিক, কেহ অসম্পূর্ণ, কেহ ইঙ্গিতে, কেহ ভঙ্গীতে, যিনি যেরূপেই কেন জন্মান্তর স্বীকার না করুন, বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগে যে দেশের যে পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহার কোন্ দেশের কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থে চতুরশীতি লক্ষ জন্মের নাম শুনিতে পাও! কি চার্ব্বাক-দর্শন, কি

কোরাণ, কি বাইবেল, কাহার সাধ্য যে, মস্তক উন্নত করিয়া বলিতে পারে "জীবের জন্ম চতুরশীতি লক্ষ প্রকার" কাহার এমন ব্রহ্মাণ্ডবিস্ফারিণী দৃষ্টি যে, ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য, অতল বিতল সুতল তলাতল রসাতল মহাতল পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অণু পরমাণু ভেদ করিয়া প্রতিজীবের প্রকৃতি পরিচয় গ্রহণ করিয়া "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ" এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া অভ্রান্তরূপে তর্জনী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতে পারে যে জীবের জন্ম চতুরশীতি লক্ষ! দেখাইয়া দেওয়া দূরে থাক, কেহ কি সাহস করিয়া বলিতেও পারে বা কখনও বলিয়াছে যে, জীবের জন্মসংখ্যা চতুরশীতি লক্ষ। স্মৃতিপট-পরিবর্ত্তনে প্রতি জন্মে যে জীব, প্রতি জন্ম বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার সেই উন্মেষ-নিমেষ-বশবর্ত্তিনী বুদ্ধির সাধ্য নহে যে দর্শনে বিজ্ঞানে অনুভবে অনুমানে নিশ্চয় করিয়া বলিবে—জীবের জন্মসংখ্যা চতুরশীতি লক্ষ, কেবল বলিতে পারে সেই ধর্ম্ম, সেই শাস্ত্র, যে ধর্ম্ম এবং যে শাস্ত্র—সেই নিখিল জীবের অন্তর্যামিণী নিত্যচৈতন্যরূপিণীর ইচ্ছাময় হৃদয়ে আবির্ভূত এবং নিশ্বাসে অভিব্যক্ত। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড যাঁহার চরণতলে নিত্য নৃত্যক্রীড়ার আনন্দ-কন্দুক সেই আনন্দময়ীর নিজমুখনির্গত শাস্ত্র ভিন্ন কাহার এমন সাধ্য যে জীবজন্মের ইয়ত্তা করিবে? "চতুরশীতি লক্ষ জন্ম" এ কথা সাহস করিয়া সেই শাস্ত্র বলিতে পারে, যে শাস্ত্র পলকে পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা দেখিয়া পুলকভরে নাচিতে থাকে, অন্য জাতির শাস্ত্র স্তম্ভিত হয় হউক, তাহা দেখিয়া তোমার আমার মূর্চ্ছিত হইবার প্রয়োজন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখ যে—যে সহস্র সংখ্যা গণিতে পারে, সে সহস্র সংখ্যার অঙ্কসঙ্কেত অবশ্য জানিয়াছে, তদ্রূপ চতুরশীতি লক্ষ্য সংখ্যা যে বলিতে পারে সে চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অবশ্য দেখিয়াছে !!

॥ শাস্ত্রে যুক্তি ॥

তুমি হয় ত শুনিয়াছ—"যুক্তিযুক্তমুপাদীত বচনং বালকাদপি"—যুক্তিযুক্তবাক্য হইলে বালকের মুখ হইতেও তাহা গ্রহণ করিবে। আর শুনিয়াছ, "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"—যুক্তিহীন বিচার হইলে তাহার দ্বারা ধর্ম্ম-মীমাংসার হানি হয়, কিন্তু সে যুক্তির বিষয় কি এবং সে যুক্তি কোন্ যুক্তি, তাহা হয়ত বুঝিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। যে যুক্তির দ্বারা তোমাকে বিচার করিতে শাস্ত্র বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে—সে তোমার বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত এবং বিচারের অনুকূল ব্যবহারিক শাস্ত্রের যুক্তি নয়। পারমার্থিক শাস্ত্র—যাহার সাধনা করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইবে, যে শাস্ত্রের সাধনসিদ্ধ বুদ্ধি তোমার অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে, লৌকিক যুক্তির দ্বারা সে অলৌকিক শাস্ত্রীয় তত্ত্বের তুমি কি উপপত্তি করিবে? বুদ্ধি আছে বলিয়া দুঃখিত হইও না, বুদ্ধিসত্ত্বে বিচার করিতে

পারিলে না বলিয়া অপমান বোধ করিও না. বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু কোন্ বুদ্ধি-তাহা বুঝিবার বুদ্ধি নাই এইটুকুই দুঃখ!! কলিকাতা হইতে বাঙ্গলা চাবি কিনিয়াছ—সুখের কথা কিন্তু সেই চাবি দিয়া পাঞ্জাবী তালা খুলিতে যাও, ঐটুকুই ত দুঃখ। তুমি অপমান বোধ করিয়া দুঃখিত হইতে পার, তালা ত খুলিবে না—বেশী পীড়াপীড়ি কর, চাবিটি ভাঙ্গিয়া যাইবে, লাভেমূলে বাঙ্গলা তালাটি পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে—তাই বলিতেছিলাম, লৌকিক যুক্তির চাবি দিয়া যদি পারমার্থিক তত্ত্বের তালা খুলিতে যাও—স্বাভাবিক বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতো ভ্রষ্ট-স্ততো নষ্টঃ হইতে হইবে, এইজন্যই শাস্ত্র ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথায় দিব্য দিয়া সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ" অর্থাৎ যে-সকল বিষয় চিন্তার অতীত তাহা তর্কে যোজনা করিবে না।

তুমি আমি তর্ক করিয়া বিচার করিয়া যাহার মীমাংসা করিতে পারি—তাহার জন্য আর শাস্ত্র কেন? শাস্ত্র তাহারই নাম যাহা তোমার আমার অতীন্দ্রিয় অনধিগত অচিন্তিত বিষয়ের প্রদর্শন-কর্ত্তা, প্রত্যক্ষ যেখানে অন্ধ, অনুমান যেখানে পঙ্গু, সেই স্থানেই শাস্ত্রের একাধিপত্য। অগাধসমুদ্র-মধ্যচারী জলজন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করিবে, "চক্ষু আছে" বলিয়া তোমার আমার তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার নাই—সেই রাজ্যের দৃষ্টি স্বতন্ত্র, চক্ষু থাকিতেও তুমি আমি তথাতে অন্ধ! তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রমধ্যমগ্ন অগাধতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার জড় জগতের কীটাণুকীট তোমার আমার নাই। বিচার স্থলে অনেকে বলিয়া থাকেন—"যাঁহারা নিজ মনঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত পরমাত্মায় বিলীন করিয়া কেহ বা নির্ব্বিকল্পসমাধিযোগে যুক্তমুক্ত অবস্থায় অধিষ্ঠিত, কেহবা সবিকল্পধ্যানে অভীষ্ট দেবতার চরণচিন্তায় নিরন্তর নিরত থাকিতেন, তাঁহারা আবার চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুগত বস্তুতত্ত্বসকল দেখিবার সময় পাইতেন কখন? অদ্বৈততত্ত্বে দ্বৈতসত্তার ভান পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, এ অবস্থায় আবার যোগী ঋষি মুনিগণ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার অবসর পাইতেন কিরূপে? ব্রহ্মাণ্ড না ভুলিলে ব্রহ্মদর্শন হয় না, আবার ব্রহ্ম না ভুলিলেও ব্রহ্মাণ্ডদর্শন হয় না, এই পরস্পর-বিরুদ্ধ দর্শন-পদার্থদ্বয়ের একত্র সামঞ্জস্য অসম্ভব" একথা আমরাও অস্বীকার করি না, যদিও এ স্থানে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবসর নহে, তথাপি সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। কবিগণ বলিয়াছেন, "মুক্তা হি জবয়া রক্তা ন শুভ্রা মুক্তয়া জবা"—একটি মুক্তা এবং একটি জবাপুষ্প একত্র রাখিলে জবার রক্তিমচ্ছটায় মুক্তা আরক্ত হয়, কিন্তু মুক্তার বিশদ-প্রভায় জবা শুভ্র হয় না, কেননা, মুক্তা নির্ম্মল এবং জবা মলিন। যে পদার্থ স্বভাবত স্বচ্ছ, সে পরের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, যে মলিন সে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না—যেমন দর্পণে আমরা মুখের

প্রতিবিম্ব গ্রহণ করি, কিন্তু মুখে দর্পণের প্রতিবিম্ব পাই না, কেননা দর্পণ নির্ম্মল, মুখ মলিন ; মায়ামলীমস ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি সকল পদার্থই মলিন, নির্ম্মল কেবল সেই মায়ার অতীত একমাত্র ব্রহ্ম। মলিন ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মল ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু নির্ম্মল ব্রহ্মে মলিন ব্রহ্মাণ্ড স্বতঃ প্রতিবিম্বিত হয়।

আমরা পুষ্করিণী বা নদীর তীরে স্থলবিভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে শ্যামল ভূমি ও বনবিন্যাস বই জলরাশি দেখিতে পাই না, আবার তীর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যেমন নীরে নিক্ষেপ করি, অমনি তাহার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই, বৃক্ষের কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব ফল পুষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মূল অবধি শ্যামলভূমি পর্য্যন্ত সন্নিবেশ, আবার ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ততারাস্তবক-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের সেই প্রকাণ্ড কক্ষ পর্য্যন্ত সরোবরের অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু স্থলে যাহা ঊর্দ্ধমুখ, জলে তাহাই অধোমুখ, আবার স্থলে যাহা অধোমুখ, জলে তাহাই ঊর্দ্ধমুখ। যাঁহারা তত্ত্বময়ীর তত্ত্বসাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহাদেরও দৃশ্য এই—আমরা সরোবরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিলেও যেমন জলের দিকে চাহিলেই আকাশের কক্ষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারি—ঋষিগণও তদ্রূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি না চাহিয়া চাহিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতি, দেখিয়াছিলেন তাঁহারই সেই চিদ্‌ঘনানন্দ কলেবরের প্রতি রোমকূপবিবরে অনন্তকোটি জগৎ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় প্রতি নিমেষে একবার উদ্ভিন্ন একবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। পথশ্রান্তি ভোগ করিতে হয় নাই, পরমায়ু ক্ষয় করিতে হয় নাই, দুর্লঙ্ঘ্য ভুবনাঙ্গন উল্লঙ্ঘন করিতে হয় নাই, কারণ শরীরেও জীব যে তত্ত্ব অধিগত হইতে পারে না, সাধকগণ সাধনভবনে ধ্যানশয়নে জ্ঞাননয়নেই ত্রিভুবনের সেই সৌন্দর্য্যস্বপ্ন দেখিয়াছেন—সমাধিভঙ্গেও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তবে বিশেষ এই যে—তুমি আমি জড় জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববেত্তা যাহা কিছু দেখি, তাহাই উন্নত তাহাই ঊর্দ্ধমুখ—আমরা যাহা দেখি, ভাবি —ইহা অপেক্ষা উচ্চ বুঝি সংসারে আর কিছুই নাই—কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়াছেন, ভবভাবিনী মায়ের উদরে কারণসমুদ্রের রুধিরতরঙ্গে যাহা কিছু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এ সংসারে তাহার যাহা উন্নত, ব্রহ্মময়ীর চরণতলে তাহাই অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আবার যাহা সংসারে চিরকাল অবনত মুখে ছিল, সে আজ মায়ের নিকটে গিয়া কি জানি মায়ের কি সোহাগ পাইয়া আনন্দে মস্তক উন্নত করিয়া আনন্দময়ীর ব্রহ্মরূপ দেখিতেছে—পদার্থ একই রহিয়াছে কিন্তু স্থলে যাহা দেখিলাম, আধারভেদে জলে আবার তাহাই বিপরীত। তাই বলিতেছিলাম—ব্রহ্মাণ্ড পদার্থ এক হইয়াও আধারভেদে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডই দেখেন, তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মাণ্ড হইতে উচ্চ পদার্থ আর কি আছে ? কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন—ধ্রুবলোক চন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক হইতে

আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অভ্রভেদী সুমেরু শিখর পর্য্যন্ত তোমার ব্রহ্মাণ্ডের যত উচ্চ পদার্থ—সে-সকলকে স্তরে স্তরে সিংহাসন সাজাইয়া রাজরাজেশ্বরী ব্রহ্মময়ী তাহার উপরিভাগে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্ববিস্ময়-বিস্ফারিণী শক্তিলীলার সেই বিরাট তত্ত্ব দেখিয়াই দেবগণ ঋষিগণ ধরাতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া বলিয়াছেন—

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া যিনি অবস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার। তন্ত্রে—

"যানপাষাণধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতা।
জীবজন্তুষু দেবেশি! কিং বক্তব্যমতঃ পরম্।
যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে॥"

জড় যান পাষাণ ধাতু ইত্যাদিতেও যিনি তেজোরূপে অবস্থিতা, দেবেশি! জীব-জন্তুর শরীরে তিনি অবস্থিতা কি না, তাহা আর কি বলিব? এমন স্থান জগতে নাই যে স্থানে মহামায়ার সত্ত্বা নাই।

মানব! আজ তাঁহাদের সেই দৈবীদৃষ্টি আর তোমার আমার এই জৈবীদৃষ্টি এক হইবার আশা করিব কোন্ সাহসে? শাস্ত্র বলিয়াছেন—'বিশ্ববীচিবিলাসোঽয়ং চিৎসুধাব্ধে-রুদঞ্চতি' এ বিশ্ববিলাস কেবল সেই চৈতন্যসাগরের তরঙ্গলীলা বই আর কিছুই নহে, যাঁহারা সমুদ্রদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, তরঙ্গ দর্শনের জন্য যেমন তাঁহাদিগকে আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ যাঁহারা ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের জন্য আর তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। দূরবীক্ষণ স্থলযান ব্যোমযানের সাহায্যে তাঁহাদের বিশ্বদর্শন হয় নাই, বিশ্বেশ্বরীকে দর্শন করিতে গিয়াই তাঁহারা তাঁহার চরণাশ্রিত বিশ্বতত্ত্ব দেখিয়াছেন। আজকাল যাঁহারা ভূততত্ত্ব বিচার করিয়া বিজ্ঞানবিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগের দর্শনে আর ঋষিগণের দর্শনে প্রভেদ এই যে—ইঁহারা ক্ষুদ্র জীবনে ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিয়দংশ দর্শন করিয়াই ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন—কি জানি ইহার পরে কি আছে, যাহাই হউক এ লীলা দেখিয়া যাঁহার লীলা, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব বিচিত্র ইহা বই আর কিছু অনুভব হয় না এবং তাঁহার সেই বিচিত্র শক্তির পরিচয় জানিতে হইলে, বিশ্বদৃশ্য সন্দর্শন অপেক্ষা উচ্চতর উপায় মানবজীবনে আর কিছুই নাই। এই স্থানেই ঋষিগণ বলিয়া থাকেন—নিত্যনব লীলাময়ীর পক্ষে এ লীলা কিছুই বিচিত্র নহে—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের প্রতি নির্ভর করে, একটি জগতের অণুপরমাণুগত লীলাবিজৃম্ভন তাঁহার সম্বন্ধে কোন গণনীয় ঘটনার মধ্যেই নয়। এই পূর্ণলীলার

প্রসবভূমি সেই অনাদ্য আদ্যাশক্তিকে যিনি দেখিয়াছেন, বিশ্বদৃশ্য তাঁহার চক্ষে বিস্ময়-কর নহে। তাই ঋষিগণ নটনাট্য-বিলাস সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সেই নিখিল-নটনাটয়িত্রী বিশ্বসূত্রধাত্রীর অগাধ তত্ত্বসাগরে ডুবিয়াছেন—দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধ হইয়া উর্দ্ধহস্তে ডাকিয়া বলিয়াছেন—জগতের সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্য দেখিয়া মনঃ প্রাণ বিমুগ্ধ করিও না—এ আনন্দমোহ চিরদিন রহিবে না, যদি শান্তির আশা কর, তবে ঐ আনন্দময়ীর সদানন্দ-হৃদ্বিহারি তাপত্রয়হারি চারুচরণ-সরোরুহে মনঃ প্রাণ সমর্পণ কর—দেখিবে—জগদম্বার চরণাম্বুজের দলে দলে কিঞ্জল্কে কিঞ্জল্কে পরাগে পরাগে চৈতন্যরাগরঞ্জিত কত অনন্তভুবন-কোটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার ঐ কমলেরই আনন্দ-মকরন্দে ডুবিয়া ডুবিয়া বিলীন হইতেছে।

কথাগুলি সত্য হইলেও শুনিতে যেন কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের আনন্দ শোক উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মানন্দে ডুবিতে হইবে—সে ত পরের কথা, আপাততঃ এ কথা যে বলে, তাহাকেই যেন রসতত্ত্ব-বোধ-বিবর্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়, পুত্রের মৃতদেহ বক্ষঃস্থলে ধরিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া যে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, তাহার নিকটে বসিয়া যদি কেহ রঙ্গরসের গল্প করে অথবা বিবাহযাত্রায় সুসজ্জিত আনন্দোৎফুল্ল যুবাকে কেহ যদি শবসৎকারের জন্য অনুরোধ করে—তবে তাহা যেমন অসঙ্গত এবং অসহ্য, প্রত্যক্ষ-দৃশ্য সংসারকে অপ্রত্যক্ষতত্ত্বের অন্বেষণে ধাবিত হওয়ার এ উপদেশও তেমনই অসঙ্গত এবং অসহ্য। এই অসহ্যতানিবন্ধন তুমি আমি উপদেষ্টাকে উন্মত্ত মনে করিতে পারি, কিন্তু উপদেষ্টা তাহাতে ক্ষান্ত হইবার নহেন। মনে কর—তুমি আমি অভিনয় পদার্থ কি তাহা না জানিয়া রামায়ণের অভিনয় দেখিতে বসিয়াছি—কৌশল্যার শোকে, দশরথের মরণে, সীতার আর্ত্তনাদে, মন্দোদরীর ক্রন্দনে তুমি আমি একবার হু হু করিয়া কাঁদিতেছি—আবার লক্ষ্মণের বীরবিক্রমে, রামচন্দ্রের বিশ্ববিজয়ী রণনৈপুণ্যে, ইন্দ্রজিতের অহঙ্কারে, রাবণের হুহুঙ্কারে আনন্দিত পুলকিত ভীত চকিত স্তম্ভিত হইতেছি, আবার সেই সময়েই দেখিতেছি—আমাদেরই মধ্যে বসিয়া, কি জানি কে একজন এই-সকল দৃশ্য দেখিয়া কেবল হা হা করিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছেন, তুমি আমি হয়ত বলিব "লোকটা উন্মত্ত" কিন্তু তাহাতে তাহার হাসির বিরাম হইবে না—আমি বলিব লোকটাকে উন্মত্তই বল আর যাহাই বল তাহাতে আপত্তি নাই, তথাপি একবার ভাবিয়া দেখ লোকটা হাসে কেন? একই স্থান, একই দৃশ্য, একই বিষয়, সকল লোক একবার হাসে, একবার কাঁদে আর ঐ একটা লোক ক্রমাগত কেবলই হাসে, ইহার অর্থ কি? মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—হাসিকান্নার আর কোন কারণ নাই—কারণ এই যে, তুমি আমি অভিনয় না জানিয়া অভিনয় পদার্থ কি তাহা না বুঝিয়া, অভিনয় দেখিতে বসিয়াছি; আর ঐ ব্যক্তি, অভিনয় কি তাহা জানিয়া

শুনিয়া অভিনয় দেখিতে বসিয়াছে—তুমি আমি দেখিতেছি রাম সত্য, রাবণ সত্য, তাই কান্নাকাটির এত ঘটাঘট্ট, আর ঐ ব্যক্তি দেখিতেছে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রাবণ সাজিয়া বসিয়া আছে—আর পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী সীতা সাজিয়া চিৎকার করিতেছে—তোমার আমার চক্ষে যাহা রাবণ ও সীতা, উহার চক্ষে তাহাই নীলাম্বর আর পীতাম্বর, তাই উহার মুখে হাসি ধরে না, তুমি আমি ঘটনা দেখিয়া অধীর, ও ব্যক্তি ঘটনার মূল দেখিয়া ধীর। তুমি আমি উহাকে উন্মত্ত বলিয়া তিরস্কার করিতেছি, কিন্তু নিশ্চয় জানিও—ও তোমাকে আমাকে অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিতেছে, আমরা বারম্বার যাহাকে "ও ও" বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, উন্মত্ত নহেন—পরমার্থত উনিই পরমজ্ঞানী ভক্তকুলচূড়ামণি। এই অভিনয়ক্ষেত্র সংসারের নিখিলবস্তুকে যিনি অভিনয়ের সজ্জিত সামগ্রী বলিয়া জানেন, তিনি এই অভিনয় দেখিয়া অভিনয়ে মুগ্ধ হন না, কিন্তু অভিনয়ের মূল সেই নটনটীর খেলা দেখিয়া তাঁহাদেরই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন—ঋষিগণ ধীর হইলেও সেই প্রেমে উন্মত্ত, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন, সংসারের খুঁটিনাটি ভাবিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অপব্যয় করিও না, সেই ভাবনা ভাবিয়া লও যাহাতে আর ভাবিতে হইবে না। তাই সাধক প্রাণের কথা মনকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—

> "কাল ত গেল, কাল ত এল, চল্ ত রে বিরলে যাই।
> নিবিড় নির্জনে বসে কালকামিনীর গুণ গাই।"

তুমি আমি যে-দিন তাঁহাদের হইয়া সেই কথা বিশ্বাস করিব, তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত অধিকার পাইব—সেই দিন ভাই সকল ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে। আমরাও দেখিব সংসার বলিয়া যাহা দেখিতেছি, তাহা অভিনয়, যাহা দেখিতেছি তাহাও তিনি, যাহারা দেখিতেছে তাহারাও তিনি—সেই চিদ্ঘনানন্দ-ব্রহ্মময়ীই জীব সাজিয়া সংসারে আসিয়া এ আনন্দ-নাটকে মাতিয়াছেন, তোমার আমার সে চক্ষু নাই বলিয়াই বলিয়া থাকি—

> "মা! তোমার এ নাটক কি বা?
> এ ত নাটক নয় ফাটকের বাবা।
> নাটকের ত প্রথম দৃশ্য, নটনটীর সম্মুখে সভা,
> এর্ নটের সঙ্গেই দেখা নাই তার্, নটীর সন্ধান পাবে কেবা॥
> (নাটকের) প্রথমে হয় প্রথমাঙ্ক, শেষে গর্ভাঙ্কে আবশ্যক যে বা,
> এর্, কি বা প্রথম, কি শেষাঙ্ক গর্ভাঙ্কে আদ্যন্ত ছাবা॥
> যে গর্ভাঙ্কে আস্‌ছে ছেলে, আবার, সেই গর্ভাঙ্কে যাচ্ছে বাবা,
> অম্‌নি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পড়ছে সে ছিন্,
> তখন, কে ছেলে আর্ কে কার বাবা॥"

তুমি আমি চঞ্চলহৃদয়, তাই কাঁদিয়া অধীর, সুধীর ভক্তের হৃদয়ে কিন্তু এই নাটকই আবার প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত করে—তাই শান্ত সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

"জান না রে মন! পরমকারণ শ্যামা ত কখন মেয়ে নয়,
সে যে, মেঘেরি বরণ, করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজতনয়ে করে সভয়,
কভু, ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়,
ও সে, আপনারি মায়ায়, আপনি হয় বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয়।
যে রূপে যে জন করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার্ মানসে রয়,
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমল মাঝারে উদয় হয়।"

"আপনারি মায়ায় আপনি হয় বাঁধা যতনে এ ভবযাতনা সয়"—ভাই সাধক! তুমিই বল! এত যাতনা তাঁহার সৃষ্টিতে? না! তোমার আমার দৃষ্টিতে? যতনে যে যাতনা সয়, বুঝিতে হইবে—তাহার যাতনার বড়ই অভাব।

এইজন্য বলিতেছিলাম, শাস্ত্রবাক্যে বিচার করিবার কথা নাই, বিশ্বাস করিবার কারণ আছে—যাঁহার শাস্ত্র, ঋষিগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥"

সেই সনাতনী পরমাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারূপে মুক্তির হেতুভূতা এবং মায়ারূপে তিনিই আবার সংসার-বন্ধনের হেতুভূতা, অতএব তিনিই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী, যিনি সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরী, তাঁহার নিকটে কাহারও ঈশ্বরত্ব স্থান পায় না, তুমি আমি বুঝি আর নাই বুঝি, ইচ্ছাময়ী রাজরাজেশ্বরীর সে অমোঘ রাজনীতিচক্র জীবের চতুরশীতি লক্ষ জন্মে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। ইহার পরেও যদি বল, কেন হইবে, তাহার যুক্তি কি? তাহার উত্তরে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই; জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান জন্ম যে হইয়াছে ইহারই বা যুক্তি কি? সকল জন্মের মূলেই যুক্তি এক। যে যুক্তিতে এ জন্ম হইয়াছে, সেই যুক্তিতেই পরজন্ম হইবে—চক্রের এক কক্ষ ঘুরিলেই সকল কক্ষ ঘুরিবে, ইহা তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়ম, ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাবতার জীব সংসারে আসিয়াছে, ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরব্রহ্মে সমাহিত হইবে—ইহা জীবজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। কিরূপ নিয়মে, কোন্ প্রক্রিয়ায় তাহা সঙ্ঘটিত হইবে, আমরা জন্মান্তরতত্ত্বে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিব।

ইহার পরেও যিনি বলিবেন, "মরিলেই সকল ফুরাইল, আর জন্ম হইবে কাহার?" আমরা তাঁহাকেও সেই তত্ত্বেই বুঝাইব যে, জীবনমরণ কাহাকে বলে, তাহা হয়ত

আজও তাঁহার অবিদিত। কারণ, জীবনতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন—নির্ব্বাণমুক্তি ভিন্ন জীবের আর প্রকৃত মরণ নাই। তুমি আমি যাহাকে মরণ বলিয়া জানি তাহা তোমার আমার বুদ্ধির মরণ বই, জীবের মরণ নহে। ফল কথা, শৈশব কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য অতিবার্দ্ধক্য ইহার কোন একটি অংশ লইয়া যেমন একটি জীবনের বা জন্মের আমূল আলোচনা অসম্ভব, তদ্রূপ সমগ্র জীব-জীবনের অতিক্ষুদ্রাংশ কোন একটি জন্মের অন্যায় লইয়া চতুরশীতি লক্ষ জন্মের ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাও অসম্ভব। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্র সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিয়া শরাঘাতে মারীচকে সমুদ্র পারে নিক্ষেপ করিলেন—ইহা শুনিয়া একজন অপরিণামদর্শী অধীর-হৃদয় অনায়াসে ধারণা করিতে পারেন যে, বহুসংখ্যক রাক্ষস বধ করিতে করিতে বালক রামচন্দ্রের শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছিল, তাই মারীচকে বধ করিতে পারিলেন না, শরীরে যে পরিমাণে বল ছিল, তাহাতে তাহাকে যজ্ঞস্থান হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন. কিন্তু যিনি অযোধ্যাকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং যখন দেখিয়াছেন, সীতাহরণের সময় সেই মারীচই আবার মায়ামৃগ-রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে, তখন তিনিই বুঝিয়াছেন রামচন্দ্রের শরীরে বল ছিল কি না? ভূভারহারী বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবান রাবণনিধন-রূপ দেবকার্য্য সাধনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ, পরে এই মারীচ দ্বারাই সেই রাবণবধের সূত্রপাত করিতে হইবে—ইহা মনে করিয়াই তিনি তৎকালে মারীচকে বধ না করিয়া সাগরপারে তাড়িত করিয়াছিলেন, নতুবা লবণ-সমুদ্র-পারে পাঠান অপেক্ষা ভবসমুদ্রপারে পাঠাইতে তাঁহার অধিক বলের প্রয়োজন হইত না। অন্তর্যামী ভগবানের এ নিগূঢ় লীলারহস্য বুঝিতে হইলেই আমাকে অরণ্যকাণ্ডের ব্যাপার জানিতে হইবে, নতুবা ঐ যাহা বুঝিয়াছি—মারীচ বধ করিবার সময়ে সর্ব্বশক্তিমানের শরীরে শক্তি ছিল না, ইহার অধিক আর বুঝিব না। তদ্রূপ সত্যযুগ ও কলিযুগের জীবের প্রতি তাঁহার ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে হইলেও আমাকে ইহার শেষ কাণ্ড ব্রহ্মকৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে, তাহার পর সমগ্রজন্মের ন্যায়-অন্যায় বিচার। এইজন্য বলি, চল্লিশ বৎসরের পরমায়ু লইয়া নিত্য-সত্য-সনাতনীর বিশ্বরাজ্যের ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা বই আর কিছুই নহে।

যদি যুক্তিবলেই তাঁহার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারই করিতে হয়, তবে একবার কেন মনে কর না—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সাধক অথচ অসিদ্ধ পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারাই কালচক্রের আবর্ত্তনে নিজ পুণ্যপুঞ্জের আকর্ষণে কলিযুগে আবার সাধকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রায়ঃপরিপক্ক পুণ্যরাশি ফলোন্মুখ হইয়াছে, দেশ কাল পাত্রের সুযোগ অনুসারে এইবার তাঁহারা মায়ের সন্তান মায়ের ক্রোড়ে উঠিবেন।

তুমি বলিবে এক যুগে সিদ্ধি হইল, কিন্তু আমি ত দেখিতেছি তিন যুগ তপস্যা করিয়া তবে চতুর্থ যুগ কলিতে সিদ্ধি হইল। আষাঢ় মাসে কাঁঠাল পাকে বলিয়াই আষাঢ় মাসে জন্মে না, শীতে জন্মে, বসন্তে পুষ্ট হয়, তবে গ্রীষ্মে পাকে। বেল চৈত্র মাসে জন্মে এবং চৈত্র মাসেই পাকে, ইহা শুনিলে একজন বৈদেশিক পুরুষ (যিনি জন্মেও কখন বেল চক্ষে দেখেন নাই) তিনি হয়ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে এক মাসেই বেলের জন্ম মৃত্যু সমাধি শেষ—কিন্তু ভারতবাসী আর্য্যসন্তান বুঝিবেন যে—

"চৈত্র মাসে জন্মে বেল, চৈত্র মাসে পাকে,
এক চৈত্রে জন্মে কিন্তু অন্য চৈত্রে পাকে।"

॥ সাধক-দর্শন ॥

বলিতে পার কলিতে তবে সাধকের সংখ্যা এত অল্প কেন? আমি বলি, কে বলিল অল্প? বলিবে অল্প যদি না হয়, তবে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, যেখানে সেখানে দেখি না কেন? আমি বলি, যেখানে সেখানে দেখি না বলিয়া জনসংখ্যা অল্প হইতে পারে, সাধকের সংখ্যা অল্প হয় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুত্রী-রূপে অবতীর্ণা জগৎকর্ত্রী নিজপিতা হিমালয়কে বলিয়াছেন, "সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে একজন যদি সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে, যাহারা এইরূপ যত্ন করে, তাহাদেরও সহস্র সহস্রের মধ্যে যদি কেহ আমায় স্বরূপতঃ জানে"; কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে ভগবান বৈকুণ্ঠনাথও অর্জ্জুনকে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন 'অনেকজন্মসংসিদ্ধ-স্ততো যাতি পরাং গতিং" অনেক জন্মের পর সিদ্ধ হইয়া তবে জীব পরমাগতি লাভ করে। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ হইয়া তবে জীব আমাকে প্রাপ্ত হয়। নিরুত্তর তন্ত্রে—

"শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
বহূনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে।
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে॥"

দেবি! শিবশক্তিময় স্বরূপতত্ত্বই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, বহু জন্মের সাধনার পরে জীবের এই শক্তিজ্ঞানের উদয় হয়। শক্তি-জ্ঞান না হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় না।" শাস্ত্র যে পথের পথিককে এইরূপ অতিবিরল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তুমি আমি সেই পথে জনস্রোত দেখিতে চাই কোন ভরসায়? লক্ষ মানবের মধ্যে একজন সাধক থাকিলেই সাধকের সংখ্যা পূর্ণ হইল। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে। সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥"

প্রতি পর্ব্বতে মাণিক্য পাওয়া যায় না, প্রতি হস্তীর মস্তকে মৌক্তিক থাকে না, সাধুও সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, চন্দনও বনে বনে জন্মে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥"

নিরপেক্ষ নির্ব্বৈর সমদর্শন শান্ত মুনি গমন করিলে আমি তাঁহার অনুগমন করি, তাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইব এই আশায়। যাঁহার নাম করিয়া ভক্ত ত্রিভুবন পবিত্র করেন, আজ তিনি ভক্তের পদরজ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবেন এমন অপবিত্রতা ভগবানের কি হইয়াছিল? অপবিত্রতা হয় নাই, কিন্তু ভক্ত-প্রেমোন্মত্ত ভগবান্ ভক্ত-মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া দেখাইয়াছেন—আমারও যদি অপবিত্রতা সম্ভব হইত, তবে আমি ভক্তস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতাম—ইহাতেই বুঝিয়া লও—ভক্ত কি দুর্লভ পদার্থ! শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি-বাদিনম্।
বৎসং গৌরিব গৌরীশো ধাবন্তমনুধাবতি॥"

যাত্রাকালে মহাদেব—মহাদেব—মহাদেব বলিয়া যিনি কীর্ত্তন করেন, ধাবমান বৎসের পশ্চাতে গাভী যেমন ধাবিত হয়, গৌরীকে সঙ্গে করিয়া গৌরীশও তদ্রূপ সেই ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। কেন? যাঁহার চরণচ্ছায়ার অবলম্বনে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, ভক্তের পশ্চাতে পশ্চাতে সেই ভূতভাবন ভবানীপতির ধাবিত হইবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন আর কিছুই নহে, দেখাইয়াছেন—যেখানে ভক্ত, সেইখানেই আমি। তন্ত্র বলিয়াছেন—

"পাবনানীহ তীর্থানি সর্ব্বেষামিতি সম্মতম্।
তীর্থানাং পাবনঃ কৌলো গিরিজে বহু কিং বচঃ॥
তস্যৈব জননী ধন্যা ধন্যা হি জনকাদয়ঃ।
তস্য জ্ঞাতিকুটুম্বাশ্চ ধন্যা আলাপিনো জনাঃ॥
নন্দন্তি পিতরঃ সর্ব্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা।
অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি॥"

তীর্থই পবিত্রতার একমাত্র কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু গিরিজে! অধিক আর কি বলিব, সেই তীর্থেরও পবিত্রতার কারণ কুলাচার-সাধক। কৌলের জননী ধন্যা, জনক প্রভৃতি ধন্য, ধন্য তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ, ধন্য তাঁহার সহালাপিজন। কুলজ্ঞানীর পিতৃলোক আনন্দিত হইয়া স্বর্গধামে এই গাথা গান করেন, এইবার আমাদের নিজকুলে কেহ কুলজ্ঞানী হইবে।

"যত্র বীরো বসেদ্দেবি ! দিব্যো বা পরমেশ্বরি !
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি বীরসাধনে ॥
যো বীরঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্দেব এব ন সংশয়ঃ ।
যত্র বীরো বসেদ্দেবি তত্র কস্য ভয়ং ভবেৎ ॥
নাকাল-মরণং তত্র ন দুর্ভিক্ষ্য-ভয়ং তথা ।
রাজপীড়া-ভয়ং দেবি নাস্তি তত্র কদাচন" ॥ [উৎপত্তি-তন্ত্র]

দেবি ! যে স্থানে বীর [বীরাচার সাধক] অথবা দিব্য [দিব্যাচার সাধক] বাস করেন, পরমেশ্বরি ! সর্ব্ব তীর্থ সেইস্থানে বাস করেন, বীরসাধিতে ! যিনি বীর, তিনিই শিব, মনুষ্যদেহধারী হইয়াও তিনি সাক্ষাদ্দেবতা, তাহাতে সংশয় নাই। দেবি ! বীর যেখানে বাস করেন, সেই বীরাশ্রয়ে বাস করিলে কাহার ভয়ের সম্ভাবনা ? লৌকিক বীরের আশ্রয়ে থাকিলে লৌকিক ভয় থাকে না কিন্তু এই পারমার্থিক বীরের আশ্রয়ে যে বাস করে, তাহার অকালমরণের ভয় নাই, দুর্ভিক্ষ্যের ভয় নাই, রাজভয় নাই, পীড়াভয় নাই—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ ভয় তাহার উপশমিত হইয়া যায়।

দুর্ল্লভং সর্ব্বলোকেষু কুলাচার্য্যস্য দর্শনম্ ।
বিপাকেন প্রভূতানাং লভ্যতে নান্যথা প্রিয়ে । ১ ।
সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো দৃষ্টো বন্দিতো ভাষিতোঽপি বা ।
পুনাতি কুলধর্ম্মিষ্ঠ-শ্চাণ্ডালোঽপ্যধমোঽপি বা । ২ ।
যত্র দেবি কুলজ্ঞানী তত্রাহঞ্চ ত্বয়া সহ ।
নাহং বসামি কৈলাসে ন মেরৌ ন চ মন্দরে ।
কুলজ্ঞা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি ভাবিনি । ৩ ।
সুদূরমপি গন্তব্যং যত্র মাহেশ্বরো জনঃ ।
দ্রষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন তত্র ত্বং নন্দিতা হ্যহম্ । ৪ ।
অপি দূরস্থিতো বাপি দ্রষ্টব্যঃ কুলদেশিকঃ ।
সমীপে বর্ত্তমানোঽপি ন দ্রষ্টব্যঃ পশুঃ প্রিয়ে । ৫ ।
কুলজ্ঞানী ভবেদ্‌যত্র স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ ।
দর্শনাদর্চ্চনাত্তস্য ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ । ৬ ।
কুলজ্ঞানিনমালোক্য স্ব-সন্তানং গৃহে স্থিতম্ ।
শংসন্তি পিতরস্তস্য যাস্যামঃ পরমাং গতিম্ । ৭ ।
সমাশ্রয়ন্তি পিতরঃ স্বর্ব্বৃষ্টিমিব কর্ষকাঃ ।
যোঽস্মৎকুলেষু পুত্রো বা পৌত্রো বা কৌলিকো ভবেৎ ।

স ধন্যঃ খলু লোকেঽস্মিন্ পুরুষঃ ক্ষীণকল্মষঃ। ৮।
মৎসমীপং সমায়ান্তি কুলাচার্য্যা মুদা প্রিয়ে।
কৌলিকেন্দ্রে সমায়াতে কৌলিকাবসথং প্রতি।
সমায়ান্তি মুদা দেবি! যোগিন্যো যোগিভিঃ সহ। ৯।
প্রবিশ্য কুলযোগীন্দ্রং ভজন্তে পিতৃদেবতাঃ।
তস্মাৎ সংপূজয়েদ্ ভক্ত্যা কুলজ্ঞানরতান্ পরান্। ১০।
অভ্যর্চ্চয়িত্বা ত্বাং দেবি ত্বদ্ভক্তান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
পাপিষ্ঠাস্ত্বৎপ্রসাদস্য ভাজনং ন ভবন্তি তে। ১১।
নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দর্শনাৎ স্বীকৃতং ময়া।
সাধুভক্তস্য জিহ্বাগ্রাদশ্নামি কমলেক্ষণে। ১২।
ত্বদ্ভক্তপূজনাদ্দেবি পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ।
তস্মাচ্চ মৎপ্রিয়াকাঙ্ক্ষী ত্বদ্ভক্তানেব পূজয়েৎ। ১৩।
যৎ কৃতং কুলশিষ্যাণাং তদ্দেবানাং কৃতং ভবেৎ।
সুরাঃ কুলপ্রিয়াঃ সর্ব্বে তস্মাৎ কৌলিকমর্চ্চয়েৎ। ১৪।
ন তুষ্যাম্যহমন্যত্র তথা ভক্ত্যা সুপূজিতঃ।
কৌলিকেন্দ্রেঽর্চ্চিতে সম্যগ্ যথা তুষ্যামি পার্ব্বতি। ১৫।
যৎ ফলং নাপ্নুয়াত্তীর্থ-তপোদানমখব্রতৈঃ।
দত্তমিষ্টং হুতং তপ্তং পূজিতং জপ্তমম্বিকে।
কৌলিকস্য ভবেদ্ ব্যর্থং কুলজ্ঞং যোঽবমানয়েৎ॥ ১৬।

[কুলার্ণবতন্ত্র—নবমোল্লাস]

প্রিয়ে! সমস্ত লোকমণ্ডলমধ্যে কুলাচার্য্যের দর্শন দুর্লভ, প্রভূত পুণ্যরাশির ফলপরিপাক হইলেই তাহা লাভ করা যায় অন্যথা নহে। ১। চণ্ডাল বা ততোধিক অধম জাতিও যদি কুলাচার-ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়েন, তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহার নাম গুণ কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিলে, বন্দন করিলে এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলেও জীব পবিত্র হইয়া যায়। ২। ভাবিনি! কুলজ্ঞানী যে স্থানে অবস্থান করেন, তোমার সহিত আমি তৎথায় নিত্য বিরাজিত। কৈলাস পর্ব্বতে, সুমেরু পর্ব্বতে এবং মন্দর পর্ব্বতেও আমি নিত্য বাস করি না, কুলতত্ত্বের অভিজ্ঞ সাধককুল যে স্থানে বাস করেন, তাহাই আমার নিত্য বাসস্থান। অর্থাৎ কৈলাস সুমেরু এবং মন্দর পর্ব্বতেও যদি কখন আমার অধিষ্ঠান ত্যাগ করিতে হয় তবে তাহাও পারি, তথাপি কৌলিকের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারি না। ভক্ত সাধক ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন, কৈলাসের মাহাত্ম্য অতিরিক্ত, কি কৌলের মাহাত্ম্য অতিরিক্ত। ৩। যে স্থানে মাহেশ্বর (তান্ত্রিক) মহাপুরুষ বাস করেন, সে স্থান

দূর হইতে দূর হইলেও সে স্থানে গমন করিবে এবং প্রযত্নপূর্ব্বক দর্শন করিবে, যেহেতু সে স্থানে তুমি আমি উভয়ে আনন্দ সহকারে অবস্থিতি করি। একজন মনুষ্যকে দর্শন করিবার জন্য এত আয়াস কেন? স্বভাব-দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ে যদি এই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় ভগবান বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন যে, কুলসাধককে মানব মনে করিয়া তাঁহার দর্শনে বিরত হইও না, কৌলিকের দেহ মানবীয় নহে, শিব শক্তির যে কোন একটি মূর্ত্তি দর্শন জন্য জগজ্জন লালায়িত, কিন্তু কৌলিকগণ যে মূর্ত্তির উপাসক, তাহাতে আমরা উভয় মূর্ত্তি এক হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বররূপে পূর্ণানন্দ প্রমোদভরে কুলসাধক-কলেবরে বাস করি। সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করা, আর আমাদের অভিন্নযুগল মূর্ত্তি দর্শন করা একই কথা। ৪। কুলতত্ত্বের উপদেষ্টা দূরে থাকিলেও তাঁহাকে দর্শন করিবে। কিন্তু পশু নিকটে থাকিলেও তাহাকে দর্শন করিবে না, (উপাসকগণ এ স্থলে কৌলিক শব্দে কুলাচার সাধক মাত্র বুঝিয়া রাখুন, কুলাচারের লক্ষণ কি, তাহা আমরা আচার-তত্ত্বে ব্যাখ্যা করিব। যিনি ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্ট পাশবদ্ধ জীব, তাঁহারই নাম পশু এবং যিনি সেই অষ্টপাশবিনির্ম্মুক্ত তিনিই কৌল।) ৫। যে দেশে কুলজ্ঞানী জন্ম গ্রহণ করেন, সেই দেশ পুণ্য-ভাজন। কৌলিককে দর্শন করিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া জীব ত্রিসপ্ত (এক বিংশতি) কুল উদ্ধার করে। ৬। নিজ বংশজাত গৃহস্থিত কুলজ্ঞানীকে অবলোকন করিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ পিতৃলোক বলিয়া থাকেন, "এত দিনে আমরা পরমা গতি লাভ করিব"। ৭। কৃষকগণ যেমন সতৃষ্ণ-নয়নে আকাশ হইতে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষগণও তদ্রূপ উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণে প্রার্থনা করেন যে আমাদের কুলে পুত্র বা পৌত্র যদি কেহ কুলতত্ত্ব-দীক্ষিত হয়, তবেই সেই ক্ষীণপাপ মহাপুরুষ সংসারে ধন্য হইবে। ৮। প্রিয়ে! কুলাচার্য্যগণ দেহত্যাগ করিয়া সানন্দে আমার নিকটে আগমন করেন। কৌলিকেন্দ্র অন্য কৌলিকের গৃহে সমাগত হইলে তাঁহার নিকটে পূজা গ্রহণ করিবার জন্য যোগিগণ-সহিত যোগিনীবৃন্দ আগমন করিয়া থাকেন। ৯। পূজা প্রাপ্তির জন্য পিতৃগণ এবং দেবতাগণও কুলযোগীন্দ্রের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই হেতু কুলজ্ঞানরত পরম পুরুষগণকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্যক্ পূজা করিবে। ১০। দেবি! তোমার অর্চ্চনা করিয়া যাহারা তোমার ভক্তগণের অর্চ্চনা না করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ কখনও তোমার প্রসন্নতার ভাজন হইতে পারে না। ১১। সাধকগণ আমার সম্মুখে নৈবেদ্য স্থাপন করিলে আমি দর্শন দ্বারা কটাক্ষে তাহা স্বীকার করি মাত্র, কিন্তু কমলেক্ষণে! সাধুভক্তের জিহ্বাগ্রে আমি তাহা ভোজন করি। ১২। দেবি! তোমার ভক্তকে পূজা করিলে আমি পূজিত হই—ইহা নিঃসংশয়, সেই হেতু আমার প্রিয়কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা যে করে, সে যেন কেবল তোমার ভক্তগণেরই পূজা করে। ১৩। কুল-সাধকগণের

উদ্দেশে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহা দেবগণের উদ্দেশ্যে কৃত হয়, সমস্ত দেবতা কুলপ্রিয়, এজন্য কৌলিককে পূজা করিবে। ১৪। পার্ব্বতি, অন্যত্র ভক্তিপূর্ব্বক সুপূজিত হইলেও আমি সেরূপ প্রীতি লাভ করি না, কৌলিকেন্দ্র সম্যক্ অর্চ্চিত হইলে যেরূপ প্রীত হই। ১৫। তীর্থযাত্রা তপস্যা দান যজ্ঞ ব্রতসমূহের দ্বারাও যে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কৌলিককে পূজা করিয়া জীব তাহা লাভ করিবে। অম্বিকে! অন্যে পরে কা কথা, কৌলিকও যদি কুলজ্ঞের অবমাননা করেন তবে তাঁহার দান যজ্ঞ হোম তপস্যা পূজা জপ সমস্ত ব্যর্থ হয়। ১৬॥

এইরূপ লক্ষ লক্ষ প্রমাণে শাস্ত্র যাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি আমি লৌকিক জীব সেই অলৌকিক কৌলিক মহাপুরুষগণের দর্শন পাইব কোন্ পুণ্য বলে? কোন্ পর্ব্বতে, কোন্ তপোবনে, কোন্ মহাপীঠে, কোন্ মহাশ্মশানে গিয়াছি? কোন্ মুনির আশ্রমে, কোন্ সাধুর কুটীরে, কোন্ দণ্ডীর মঠে, কোন্ ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে শরণাপন্ন হইয়াছি? কোন্ মন্ত্র জপ করিয়াছি, কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়াছি, কোন্ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি? কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছি? শম দম উপরতি তিতিক্ষা ধ্যান ধারণা সমাধির কি অভ্যাস করিয়াছি? শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের কোন্ উপায় পাইয়াছি? বিবেক বৈরাগ্যের কি বুঝিয়াছি? দোহাই ধর্ম্মের, প্রাণের কপাট খুলিয়া বল ভাই। এমন কর্ম্ম কি করিয়াছি, যাহাতে দেব-দুর্লভ সাধু সাধকের সন্দর্শন পাইব। বলিবে, কিছুও যদি না করিয়া থাকি তথাপি তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, অন্তরে প্রণাম করি, দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মনে মনে প্রার্থনা করি। কথাটি নিতান্ত মিথ্যা নহে, মনে মনে প্রার্থনা করি কিন্তু কার্য্যে নয়—যদি কার্য্যে হইত, তবে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতাম না, উন্মত্ত প্রাণে অলক্ষিত পথে ছুটিতাম, যেখানে দর্শন পাইতাম, চরণে ধরিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম—কাঁদিয়া বলিতাম, "প্রভো! কোনও উপায় করি নাই, আমার উদ্ধারের কি হইবে?" সত্য করিয়া বল ভাই! কাহারও প্রাণ কি এমন ভাবে কাঁদিয়াছে? যদি কাঁদিত, তবে আর কাঁদিতে হইত না। এই স্থানেই ভক্ত কবি দাশরথি রায় জগদম্বার আগমনী তত্ত্বে বলিয়াছেন—

"মা কন্ বাছা"! পারিবি জানতে, আর তো কে হবে না কান্‌তে,
কেঁদে কেঁদে সাঙ্গ হল কান্না।
মাঝে মিলে মা বলে ডাকে, সেই ছেলেই ত বাঁধে মাকে,
লজ্জা পেয়ে মা তাকে কাঁদান না।
মা চায় না যে সব ছেলে, আর আর সঙ্গী পেলে,
আনন্দে বেড়ায় হেঁসে খেলে।
মাতা তার কাছে না যান, অনায়াসে অবকাশ পান,
কাঁদে যে ছেলে তাকেই করেন কোলে।

দীনদয়াময়ি! বলিয়া দাও মা! কত দিনে তোমার জন্য, তোমার সাধকের জন্য তেমন করিয়া কাঁদিব? যে দিনে তুমি আসিয়া বলিবে—"আর্ তোকে হবে না কান্‌তে, কেঁদে কেঁদে সাঙ্গ হল কান্না"।

সান্নিপাতিক বিকারের রোগীর দুঃখ বোধ নাই—কাঁদিতে শিখিব কেন? হরি হরি! তুমি আমি কাঁদিতে শিখিব? সাংসারিক কোন কার্য্যের সময়ে যদি সাধকের বেশ ধরিয়াও কেহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, অম্‌নি তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কতই না ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া তর্জ্জনে গর্জ্জনে তাহাকে নিজের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাড়িত করিয়া তবে শান্তি পাই, সেই তোমার আমার পাপপ্রাণ নরকের জন্য না কাঁদিয়া সাধকের জন্য কাঁদিবে? অন্তর্যামিণি! নিস্তারিণি! তুমি জান মা! এ পাপের নিস্তার কত দিনে হইবে? যে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিতে গেলে পাপের বিভীষিকায় অধীর হইয়া পড়িতে হয়, সেই হৃদয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া শাস্ত্রের অবমাননা, সাধুর অবমাননা, ধর্ম্মের অবমাননা করিতে যাই—আবার সেই হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া সাধুদর্শনে যাত্রা করি, ধন্য আমার নির্লজ্জতা! যদি আজ সাধু সাধক কেহ থাকিতেন, তবে একদিন না একদিন অবশ্য আমার গৃহে আসিয়া দর্শন দিতেন। ইহা কি অহঙ্কারের কথা নহে? আস্পর্দ্ধার আড়ম্বর নহে? কেন, তুমি আমি কি এমন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হইয়াছি যে, গৃহে বসিয়া সাধকের দর্শন পাইব। বলিবে—আমার বিদ্যা আছে, ধন আছে! জন আছে, আছে! তাহাতে তাঁহার কি? ভ্রান্তি তোমার আমার, তাই তাঁহার কাছে বলিতে যাই "আমার বিদ্যা আছে"। মহাবিদ্যার প্রসাদে অষ্টসিদ্ধি যাহার করতলে, তাঁহাকে আমি বিদ্যার পরিচয় দেই, ইন্দ্রত্বপদ তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা সেই তারাপদ সারসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে আমি ধনের অহঙ্কার করি, আর স্বয়ং শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যাঁহার কটাক্ষকিঙ্কর, সেই সর্ব্বেশ্বরী মায়ের সন্তানকে আমি জন-বল দেখাইতে যাই, ধন্য আমার বুদ্ধিবল! আর, গৃহে বসিয়া তীর্থে গিয়া শ্মশানে মশানে ঘুরিয়াও যদি কখন সাধু সাধকের দর্শন পাই, তাহা হইলেই কি তাঁহাদিগকে চিনিবার ক্ষমতা আমাদের আছে? গৃহে গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়াই কি আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি? ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া যখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিলেন, প্রহ্লাদ অমনি প্রার্থনা করিলেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতস্তন্মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

প্রভো! বিবেকহীন সাংসারিক পুরুষের যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়ে অবিনাশী প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহারা যেমন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সংস্কারের গুণে নিয়ত স্ত্রী পুত্রাদির অনুধ্যান করে, তদ্রূপ আমি যেন তোমাকে নিরন্তর অনুস্মরণ

করিতে থাকি, আমার হৃদয় হইতে যেন তোমার প্রতি তেমন প্রীতি কখনও অপসারিত না হয়।

পরম প্রেমাস্পদ মূর্ত্তিমান ভগবান সম্মুখে দণ্ডায়মান, তথাপি প্রহ্লাদ বলিলেন না যে, তোমাকে চাই। ভগবানকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তিকে ভিক্ষা করিলেন, কেন না তত্ত্বচতুরচূড়ামণি প্রহ্লাদ বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বব্যাপী ভগবান দুর্লভ নহেন, দুর্লভ তাঁহার চরণে ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে ভগবান যদি সম্মুখেও থাকেন, তবে তাঁহার সে থাকা আর না থাকা দুইই সমান। কেন না, ভক্তি ব্যতিরেকে তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, আর ভক্তি যদি অন্তরে থাকে, তবে ভগবান শতকোটি যোজনান্তরে থাকিলেও ভক্ত যখন যেখানে যেরূপে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেইখানে তাঁহাকে সেইরূপে দর্শন দিতে হইবে, সমুদ্রসঙ্গ-মিশ্রিত নদীর জল যেমন সমুদ্র হইতে পৃথক হয় না, ভগবৎ-সঙ্গমিলিত ভক্তের ভাবও তদ্রূপ ভগবদ্ভাব হইতে পৃথক হয় না। সর্ব্বথা দুর্লভ হইলেও ভগবান যেমন ভক্তির বশবর্ত্তী, সর্ব্বত্র বিরল হইলেও ভক্ত তেমনই প্রেমের বশবর্ত্তী। ভগবন্মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিতেও যেমন ভক্তির অভাবে আমরা তাঁহা হইতে শত যোজন দূরে, তদ্রূপ সাধু সাধক ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভ হইলেও আমরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ। জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত চর্ম্মচক্ষুতে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা দর্শন করিতে তুমি আমি চির অন্ধ। তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন—

"যথা স্ত্রী-পুত্র-মিত্রাদি দৃষ্ট্বা চেতঃ প্রহৃষ্যতি।
তথা চেৎ কৌলিকান্ দৃষ্ট্বা স ভবেদ্ যোগিনীপ্রিয়ঃ॥"

স্ত্রী পুত্র মিত্রাদি দর্শন করিলে যেমন স্বভাবতঃ হৃদয় আনন্দিত হয়, কুলসাধকগণকে দর্শন করিয়া যদি অন্তঃকরণ তদ্রূপ স্বতএব প্রেমপুলকিত হয়, তবেই তিনি জগদম্বার প্রিয়পদ লাভ করেন।

এখন সত্য করিয়া বলিতে গেলে আমি কি তদ্রূপ আনন্দ-বিস্ফারিত প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে সাধককে দর্শন করিয়া থাকি? যদি তাহাই করিব, তবে কোন প্রাণে সাধক-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরিজন-সঙ্গে বিমুগ্ধ হই? আবার সাধু-দর্শন পাইয়াও কেন পরিজন-বিরহে ব্যাকুল হই? এইজন্য বলিতেছিলাম, সাধু অবশ্য সাধু কিন্তু আমার দর্শন অসাধু, তাই সে দর্শন সাধক-দর্শনের সাধক নহে, বরং বাধক। তবে বল এখন, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সাধক দেখি না বলিয়া সাধক নাই মনে করা কি মহাপাপ নহে? দেখিতে পাই বা না পাই, সংসারে সাধক নাই বলিয়া নিজ নরকপথ প্রশস্ত করিও না। কলিযুগে তান্ত্রিক উপাসনায় সাধক একজন্মে সিদ্ধ হইবেন শুনিয়াও চমকিত হইও না। যে মুহূর্ত্তে বসিয়া তুমি আমি এই সাধক-তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করিতেছি, নিশ্চয় জানিও এই মুহূর্ত্তেই বিশাল বিশ্বরাজ্যে শত শত সাধক সেই সর্ব্বার্থ-সাধিকার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জন্ম ধন্য, জীবন ধন্য, জগৎ ধন্য করিতেছেন। ধন্য আমরা যে, তাঁহাদের পদস্পর্শ-পূত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেদ থাকিতে তন্ত্র কেন

এখন পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা, উপাসনা-শাস্ত্র বেদ থাকিতে আবার তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি কেন হইল? প্রথমে এই আপত্তি লইয়াই আমাদের আপত্তি, তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি কেন হইল, সে ত পরের কথা। জিজ্ঞাসা করি, তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল এ কথার সৃষ্টি হইল কোথা হইতে? আজকালকার শিক্ষিত সূক্ষ্ম-সমালোচক-সম্প্রদায় হয়ত আমাদের এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। বিস্ময়ের কারণ এই যে আমরা বলিতেছি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল এ কথা অসম্ভব! তবেই আমাদের মতে শাস্ত্র নিত্য পদার্থ। বুঝিতেছি যে, তুমি হয়ত বলিতেছ কি গোঁড়ামি! কি অন্ধদৃষ্টি! কি ভয়ঙ্কর কুসংস্কার! বল তাহাতে ক্ষতি নাই, বিপরীত কারণ সত্ত্বেও যদি কেহ তাহা না দেখিয়া অন্ধের ন্যায় একদিকে পক্ষপাত করে, তবে তাহারই নাম যেমন গোঁড়ামি, আবার কারণ সত্ত্বেও যদি তাহা উপেক্ষা করিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হওয়া যায়, তবে তাহারও নাম তেমনই নাস্তিকতা। শাস্ত্রকে অভ্রান্ত এবং নিত্য পদার্থ বলিলে তোমার মতে গোঁড়ামি হয়, কিন্তু আমার মতে শাস্ত্রকে অভ্রান্ত এবং নিত্য পদার্থ না বলিলেই নাস্তিকতা হয়! যে কারণের উপেক্ষা ও অপেক্ষা লইয়া নাস্তিকতা ও গোঁড়ামি—আমরা একবার সেই কারণকূট অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমত বিরোধের মূলভিত্তি এই যে, তুমি বলিতেছ জগৎ দেখিয়া তদনুসারে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। আর আমি বলিতেছি, শাস্ত্র দেখিয়া তদনুসারে জগৎ রচিত হইয়াছে। তাই তোমার মতে শাস্ত্রের কর্ত্তা মানুষ আর আমার মতে শাস্ত্রের কর্ত্তা কেহ নাই। কেবল তাহার প্রকাশক স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তদনুক্রমে ঋষি পরম্পরা। এই সময়ে হয়ত আমাদের দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়েরা একটু বিরক্ত হইবেন। কেন না তাঁহারা হয়ত শুনিয়াছেন বা বেদে দেখিয়াছেন যে, বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, যাহা কিছু সমস্তই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-মুখনির্গত, আমরাও সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, তাঁহারা যে বেদকে পরমেশ্বরের ভাষা বলিয়া জানেন, যাঁহারা বেদের প্রকাশক, সেই পরমারাধ্য দেবত্রয় কিন্তু সেই বেদকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বৃহন্নীলতন্ত্রে—

> "বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি!
> স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদস্তৎকর্ত্তা নাস্তি সুন্দরি॥

স্বয়ম্ভুবে ভগবতা বেদো গীতস্তথা পুরা।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ।" ॥

নগনন্দিনি! বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া জান, সুন্দরি! বেদ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, কেহ তাহার কর্ত্তা নাই। পুরাকালে ভগবান কর্ত্তৃক স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকটে বেদ গীত হয়। স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্য্যন্ত যুগে যুগে সকলেই বেদের অনুস্মরণকর্ত্তা, কেহ কর্ত্তা নহেন।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে ঋগ্বেদ সামবেদ আদি সমস্তই ব্রহ্মার নিশ্বাস-নির্গত। অনেকে ইহাকেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ-প্রণয়নের প্রবল প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি, ইহা প্রণয়নের প্রমাণ নহে কিন্তু বেদ-প্রকাশের এবং বেদের নিত্যতার প্রমাণ। বেদ নিশ্বসিত বলিয়া তাঁহার প্রণীত নহে। কারণ, নিশ্বাস কাহারও নিজ-প্রণীত পদার্থ নহে। আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসের নির্গম ও প্রবেশের যন্ত্ররূপ কারণ, কিন্তু কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নহি, কেন না, নিশ্বাসের যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার বিনাশ ত মহাপ্রলয়েও অসম্ভব। আমাদের দেহের ন্যায় ব্রহ্মার দেহ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত জড়পদার্থ নহে। সেই নিত্য-চৈতন্যলীলাময় দেহের সমস্তই তিনি, তাঁহা হইতে তাঁহারই অংশবিশেষ বেদ নিশ্বাসরূপে নির্গত হইয়াছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি!"

ভগবান সমস্ত সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাঁহার মত আর একটিকে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার মত বলিলেই বুঝিতে হইবে, তিনি নহেন, অথচ তাঁহার সদৃশ। রাম, কৃষ্ণ, গঙ্গা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, যাহাই কেন না বল, সমস্তই তাঁহার মত তিনি—তাঁহা হইতে ভিন্ন অথচ তাঁহার মত এমন কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না, যদি তাঁহার মত আর কেহ থাকিত বা হইত, তবে তিনি কখন এক অদ্বিতীয় অধীশ্বরী হইতেন না। আমার আমিত্ব লইয়া আমি যেমন কেবল আবির্ভূত তিরোহিত হইতে পারি অথচ আমার সদৃশ আর একজন 'আমিকে' আমি সৃষ্টি করিতে পারি না, তদ্রূপ ব্রহ্মার মূর্ত্ত্যন্তর বেদকেও ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে পারেন না। কেবল নিশ্বাসরূপ বেদকে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকাশ এবং মহাপ্রলয়ে প্রশ্বাস-রূপে সংহরণ করিয়া থাকেন এইমাত্র। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"দোষাঃ সন্তি ন সন্তীতি পৌরুষেয়েষু বিদ্যতে।
বেদে কর্ত্তুরভাবাত্তু দোষশঙ্কৈব নাস্তি চ॥"

দোষ আছে, না আছে, এ বিচার পুরুষ-নির্ম্মিত বাক্যে সম্ভবে, বেদে কর্ত্তার অভাব হেতু দোষের আশঙ্কা আদৌ নাই।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, তবে ত পরমেশ্বরের সৃষ্টিই অসম্ভব, কেননা তুমি আমি জীব মাত্র সমস্তই যখন তিনি, তখন আর সৃষ্টি করিবেন কাহাকে?

এইরূপে যদি ব্রহ্মের সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া উঠে তবে আমরা তাহাতে ভীত নই। কারণ, যে আর্য্যের নিখিল শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, মায়া-বিজৃম্ভন ব্যতীত পরমার্থত ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিছুই নাই, সে আর্য্যসন্তান কেবল এক সৃষ্টি নাই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন কেন? বস্তুত, পরমার্থত সৃষ্টি না থাকিলেও মায়িক জীব তোমার আমার পক্ষে তাহা অবশ্য আছে, সেই সৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি, বেদের সেরূপ সৃষ্টিও কিছু হয় নাই। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারও যেমন নিত্যব্রহ্ম, বেদও তেমনই নিত্যব্রহ্ম। স্বপ্রকাশ হইলেও তাঁহার যেমন মায়াবলম্বনে কৌশল্যার উদরে দেবকীর গর্ভে প্রকাশ, বেদ স্বপ্রকাশ হইয়াও তেমনই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাবলম্বনে ভগবানের হৃদয়ে আবির্ভূত এবং নিশ্বাস-নির্গত। বেদ তন্ত্র পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ—শব্দময় জড় ভাষা আপনি আপনার কর্ত্তা—এ কথা শুনিতেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, হোক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প। আমরা মন্ত্রতত্ত্ব প্রকরণে এ বিষয়ের যথাশাস্ত্র মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইব। আপাতত মধ্যবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদের জন্য সাধক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এস্থলে এক্ষণে বুঝিবার কথা এই যে, আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র মানব-প্রণীত হইলে দোষ কি? কোন্ দোষের ভয়ে ইহাকে স্বপ্রকাশ এবং ঈশ্বর-নিশ্বাস নির্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে? আমরা বলি, কোন দোষের ভয়ে নহে, বেদ স্বপ্রকাশ বলিয়াই স্বপ্রকাশ। অন্ধকারের ভয়ে প্রদীপের প্রভা স্বীকার করি না, অন্ধকার থাক আর না-ই থাক, প্রদীপ নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ। যাহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না অথচ যাহার দ্বারা সমস্ত প্রকাশ পায়, তাহারই নাম স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মাধুর্য্যাদি-স্বভাবানামন্যেষু স্বগুণার্পিণাং।
স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্॥"

মাধুর্য্যরহিত পদার্থে মাধুর্য্যের অর্পণকারী মধুর-স্বভাব যে সকল পদার্থ, তাহাতে অন্য পদার্থের অর্পণ করিয়া মধুর করিবার অপেক্ষা নাই এবং মধুর পদার্থে মাধুর্য্যের অর্পণ করিবে এমন কোন পদার্থও নাই। যেমন গুড় শর্করা সিতোপল মধু ইত্যাদি দ্বারা আমরা দুগ্ধ ক্ষীর দধি ইত্যাদি পদার্থকে মধুর করিয়া লই, তদ্রূপ মধুকে আর মধুর করিবার প্রয়োজন নাই এবং মধুকে মধুর করিতে পারে এমন কোন পদার্থও সংসারে নাই।

গৃহপ্রাঙ্গণ, গৃহাভ্যন্তর এবং গৃহস্থ বস্তু সমস্তকে আমরা প্রদীপ দ্বারা প্রকাশিত করিয়া লই, কিন্তু প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য আর অন্য প্রদীপ জ্বালিতে হয় না। প্রদীপ আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, তাই তাহার নাম স্বপ্রকাশ। সংসারে প্রকাশ-শক্তি কেবল তেজের। প্রদীপ নিজে সেই তেজঃ-পদার্থ, সুতরাং তাহাকে প্রকাশ করিবার আর কে আছে? এই মধু ও প্রদীপের ন্যায় বেদও স্বপ্রকাশ। বেদ

ব্রহ্মাণ্ডস্থিত নিখিল পদার্থ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিবেন কিন্তু তাঁহার প্রকাশক তিনি ভিন্ন আর কেহ নহেন। সকলকে যে প্রকাশ করিবে তাহার প্রকাশক কে? কেন না সকল হইতে অতিরিক্ত পদার্থ অসম্ভব।

অন্ধকারের ভয়ে প্রদীপের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও প্রদীপ যেমন স্বপ্রকাশ হইয়া অন্ধকারকে দেখাইয়া তাহা ধ্বংস করে, তদ্রূপ দোষের ভয়ে শাস্ত্রের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার না করিলেও শাস্ত্র স্বয়ং প্রকাশ হইয়া দোষ দেখাইয়া তাহা ধ্বংস করিয়া দেন। সে দোষ এই, আর্য্য দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—'ভ্রম—প্রমাদ—বিপ্রলিপ্সা—বিরহিতত্বমাপ্তত্বম্' ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) বিরহিত যাহা তাহাই আপ্ত। শাস্ত্রের নাম আপ্তবাক্য অর্থাৎ যাহা কিছু শাস্ত্র-বাক্য, তাহাই ভ্রম—প্রমাদ—প্রতারণা—পরিশূন্য। ধর্ম্মশাস্ত্র মানব-প্রণীত ইহা শুনিলেই আমাদের বোধহয় যেন আলোক আর অন্ধকার দুইজনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। শাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ অভ্রান্ত, মানব স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্ত, শাস্ত্র অপ্রমত্ত, মানব নিত্যপ্রমত্ত। শাস্ত্র নিত্য কৃপানিধান, মানব প্রতারণার নিদান। শাস্ত্র অনাদি অনন্ত, মানব অশ্রান্ত জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী। শাস্ত্র অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রদর্শক, মানব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ের দাস। শাস্ত্র নিঃস্বার্থ জগদ্গুরু, মানব স্বার্থ-কীট। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবসমূহের একত্র সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা কেবল অলীক কল্পনা বই আর কিছুই নহে। চাকচিক্যময় ভূত-বিজ্ঞানের তরল তরঙ্গে অধীর হইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন, শাস্ত্র কেবল ভূয়োদর্শনের প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যতদূর জানিয়াছে সে ততদূর বলিয়াছে বা লিখিয়া গিয়াছে, এ কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শাস্ত্র নিহিত তত্ত্বসকল সত্য হোক আর না হোক শাস্ত্রবক্তার অধ্যবসায়ের বলিহারি! আমরাও সে বলিহারি দিতে কাতর নহি, কিন্তু বলি এই যে নিজে অধঃপাতে গিয়া পরকে বলিহারি দেওয়া সুকঠিন। তুমি নিজে অন্ধ, তোমার আবিষ্কৃত কণ্টকাকীর্ণ পথে লইয়া গিয়া আমাকেও অন্ধকূপে ডুবাইবে, আর আমি তোমার ভূয়োদর্শিতার প্রমাণ দেখাইব এ আশা করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। স্বীকার করিলাম, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, তাহা যে অভ্রান্ত, অপ্রতিষিদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, ইহা কে বলিল? একদিন নদীতে গিয়া তুমি হয়ত দেখিয়াছ, বড়ই সুনির্ম্মল সুশীতল জল। তোমার সেই কথায় নির্ভর করিয়া স্নান করিতে নদীতে নামিলে আমাকে যে কুমীরে ধরিবে না, ইহা তোমায় কে বলিল? জল নির্ম্মল হইলেই তাহাতে বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না, ইহার প্রমাণ কি? নদীতে যাওয়া তোমার ভূয়োদর্শনের ফল হইতে পারে কিন্তু আমার জীবনের জন্য দায়ী কে?

দ্বিতীয়ত এইরূপ ভূয়োদর্শন অনেকটা "ভূত" দর্শন বলিয়া বোধ হয়। একে ত অন্ধের দর্শন, তাহার উপরে আবার কতদিনের দর্শন তাহার নিদর্শন পাওয়া কঠিন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চার যুগ ধরিয়া মানবের ভূয়োদর্শন যতদূর হইতে পারে তাহাতে আর্য্যাবর্ত্ত ভারতবর্ষ ঊর্দ্ধসংখ্যা জম্বুদ্বীপ ও তৎপরে হয়ত লবণ সমুদ্র পর্য্যন্ত আমাদের জানা আছে, এই ত চূড়ান্ত দর্শন। এখন জিজ্ঞাসা করি—"লবণেক্ষু-সুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ" এই লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধি সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, জল সমুদ্র, শাস্ত্রে এ সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ কে করিল? বলিবে, যে করিয়াছে সে ভ্রান্ত। আমি বলি সে ভ্রান্ত হয় হোক, তাহাতে ক্ষতি নাই—এ সপ্ত সমুদ্রের নাম কোথা হইতে আসিল? অপার সমুদ্র পার হইয়া তুমি আমি ত সে দেশে, সে সমুদ্রে যাই নাই। আজকাল বিদেশবাসী সুদক্ষ সমুদ্রপোতবাহি-সম্প্রদায় যাহার উপান্ত-প্রদেশ দর্শন করিয়াই পশ্চাৎপদ, সেই দুস্তর লবণ সমুদ্রের পারান্তরে পরম্পরা-ক্রমে অবস্থিত এই সপ্ত সমুদ্রের নাম এ দেশে আসিল কোথা হইতে? বলিতে পার —তোমার লবণ সমুদ্র মানি না কিন্তু যাহার লবণে শরীররক্ষা তাহার নিকট এ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইলে ভাষায় তোমাকে কি বলিবে, তাহা তুমি জান। রাখিয়া দাও তোমার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, রাখিয়া দাও তোমার দার্শনিক বিচার, রাখিয়া দাও তোমার বৈজ্ঞানিক যুক্তি, কাহারও কথা শুনিতে চাই না। প্রত্যক্ষের প্রতি অন্য প্রমাণ মানিব না! শাস্ত্র ভিন্ন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিব না। দশেন্দ্রিয় সংযুক্ত মানব হইয়া যাহারা শাস্ত্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সত্য এই সমস্ত পদার্থের অপলাপ করিতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কথা মনে হইবার পূর্ব্বেই যেন সমরসিংহ প্রতাপসিংহ শিবজীর কথা স্মরণ হয়। হাঁ! সনাতনধর্ম্মস্তম্ভ-বীরেন্দ্র-কেশরিগণ! আজ এ ঘোর সময়ে তোমরা কোথায়? অথবা তোমাদের সেই সাধন-পূত জ্বলন্ত জ্যোতিঃ মন্ত্রশাস্ত্রেই মিশিয়া আছে। অক্ষরে অক্ষরে মাত্রায় মাত্রায় আজ তোমরাই সে জ্যোতিঃ দেখাইয়া দাও—ভারত কুমারের তপস্তেজে ভারতের শাস্ত্র আবার দেদীপ্যমান হোক।

ইহার পরে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা—তাহারও প্রত্যেক দ্বীপে নয় নয়টি করিয়া বর্ষ; তাহার কোন বর্ষে কিরূপ ভূমি, কাহার কত পরিমাণ, তাহার উচ্চাবচ অবস্থা কিরূপ, তথায় কিরূপ আকৃতির কিরূপ প্রকৃতির লোকের বাস, কোন ধর্ম্ম, কোন আচার, কত বর্ষ পরমায়ু, কোথায় কোন দেবতার বিশেষ প্রভাব, তাহার কোন দেশ কোন দেবতার উপাসক, তৎপরে সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ বিবরণ এ সকল কথার ত উত্থাপনই হয় নাই। বল, এ সকল কি স্বপ্ন না মায়া, মোহ অথবা কেবল কল্পনা? কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দাও তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আপন মাথা বাঁচাইয়া চল, এ সকল কল্পনা হইলে লবণ সমুদ্র যেমন কল্পনা, ভারতবর্ষ যেমন কল্পনা, তুমি আমিও তেমনই কল্পনা। আমরা বলি, এত কল্পনা না বলিয়া একা তোমাকে তুমি কল্পনা বলিয়া মনে কর তাহা হইলেই সকল আপদ চুকিয়া যায়। তুমি আমি ত

কীটাণুকীট বই নই, যাঁহাদের তীব্রাভিভাবিনী ধীশক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, তাঁহারাও শেষে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অবতারণায় সকল প্রমাণ পদদলিত করিয়া জগৎকে ডাকিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—সমস্ত প্রমাণ যে স্থলে নিরস্ত, সেই নিবিড় অন্ধতম প্রদেশে একমাত্র শাস্ত্রই কেবল জ্বলন্ত জ্যোতিঃ। সেই শাস্ত্র যাহার মানব-প্রণীত বলিয়া সন্দেহ বা বিশ্বাস জন্মে, জানি না জন্ম জন্মান্তরের কুপ্রারব্ধ তাহার কতই প্রবল। চুরি করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না, ঈশ্বর আছেন, বিশ্বাস কর, প্রেম কর, অনন্ত শান্তি পাইবে ইত্যাদি কয়েকটি বাঁধা গতের উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের ধর্ম্মভিত্তি অবস্থিত, তাহাদের সেই ধর্ম্মশাস্ত্র ভূয়োদর্শনের ফল হইতে পারে, সেই সংস্কারের বাধ্য হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্ত্তি সনাতন ধর্ম্ম এবং সনাতন শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাস অপেক্ষা অধঃপাত আর কিছুই নাই। 'আহার-নিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ' এই আহারাদি চারিটি বৃত্তির নির্ব্বিবাদে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যে শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না ইত্যাদি কয়েকটি ব্যবস্থা দিয়া সে শাস্ত্র নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু চতুর্দ্দশভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু-তত্ত্ব যাহাকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে সেই শাস্ত্রের সত্য মিথ্যা বিচার করা তোমার আমার পক্ষে বড়ই ধৃষ্টতার কথা। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসকল আমরা পূজা প্রকরণে যথাসাধ্য প্রপঞ্চিত করিব। অপূর্ণ মানবের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে তাহাই অপূর্ণ। যাহা অপূর্ণ তাহা কখনও চরমসীমায় পৌঁছিতে পারে না, যাহা চরমসীমায় না পৌঁছিয়াছে তাহা পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বের পূর্ণ অপরিচিত, সেই অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস করিয়া অলক্ষিত পথে যাত্রা করিতে কে সাহসী হয়? তাই দেবগণ ঋষিগণ আত্মবাক্যে নির্ভর না করিয়া আপ্তবাক্য শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সন্তানের শিক্ষার জন্য পিতা মাতার চিরদায়িত্ব, কোনটি জীবনের পথ, কোনটি মরণের পথ, পিতা মাতা তাহা দেখাইয়া সন্তানকে সাবধান করিয়া না দিলে অবোধ শিশু কি উপায়ে রক্ষা পাইবে? সেই দায়িত্ব অনুসারেই নিখিল বস্তুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান স্বয়ং শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছেন—"শব্দ-ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনূ" অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম (শাস্ত্র) এবং পরব্রহ্ম (তুরীয় চৈতন্য) এ উভয়ই আমার নিত্য শরীর। পরমেশ্বরী নরলোচনের অগোচরা হইলেও শাস্ত্রমূর্ত্তি অবলম্বনে জগদ্ধাত্রী সাজিয়া জগৎকে ক্রোড়ে করিয়া বলিতেছেন আর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং, বেদান্ন প্রমদিতব্য-মাচারান্নাপগন্তব্যম্" অর্থাৎ প্রমাদভরে সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না, বেদ হইতে পরিচ্যুত হইও না, আচার হইতে উৎপথে গমন করিও না; সেই গম্ভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতে, প্রান্তরে, তপোবনে, নদীতীরে,

কুটীরে, মন্দিরে, রাজেন্দ্রগণের যজ্ঞমণ্ডপে, গৃহস্থগণের গৃহকক্ষে, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে, কোটি কোটি যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে, পৃথিবীর যজ্ঞাগ্নিপ্রভায় স্বর্গীয় সৌধশিখর রঞ্জিত হইয়াছে, দ্বাদশবার্ষিক, শতবার্ষিক, সহস্রবার্ষিক ব্রতে যজ্ঞসমাপন করিয়া তপোনির্দ্ধূত-কল্মষ-কলেবরে কত কোটি কোটি আর্য্য মহাপুরুষ ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে।

॥ তন্ত্রের অবতারণা ॥

দেখিতে দেখিতে কাল নাটকের কঠোর যবনিকা অবতীর্ণ হইতে লাগিল, মায়ামলীমস অধর্ম্ম বৃদ্ধি দিন ধীরে ধীরে ধর্ম্ম জগতে অনাচারের অন্ধকার ঢালিয়া দিতে লাগিল। জীবসকল অজ্ঞাতসারে সেই অন্ধকারে ডুবিয়া উৎপথে পদার্পণ করিতে আরম্ভ করিল, রোগে শোকে ক্ষোভে দুঃখে জগতের প্রাণ জর্জ্জরিত হইল। রুগ্নসন্তান রোগের বিকারে কুপথ্য ভোজন করিয়া আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনে, সে তাহা নিজে বুঝিতে না পারিলেও পরিণামদর্শিনী জননী তাহা বুঝিয়া থাকেন। তাই, সন্তানের অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল দর্শন করিয়া মঙ্গলমূর্ত্তি প্রসূতীর প্রাণ স্বতএব ব্যথিত হয়। সেই প্রাকৃতিক নিয়মলীলার অবলম্বন করিয়াই ত্রিলোক-জননী মা সর্ব্বমঙ্গলার স্নেহময় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, আপন লীলায় আপনি মুগ্ধ হইয়া কাতর হৃদয়ে বৈদ্যনাথকে বলিলেন "দেবদেব! জীব নিস্তারের উপায় কি?" কুলার্ণবে—

দেব্যুবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ পঞ্চকৃত্য-বিধায়ক।
সর্ব্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল।
কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধে॥
অসারে ঘোরসংসারে সর্ব্বে দুঃখ-মলীমসাঃ।
নানাবিধ-শরীরস্থা অনন্তা জীবরাশয়ঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ তেষামন্তো ন বিদ্যতে॥
ঘোরদুঃখাতুরা দেব ন সুখী জায়তে ক্বচিৎ।
কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মে প্রভো॥

দেবী বলিলেন, ভগবন্! তুমি দেবগণেরও দেবতা, ঈশ্বর, পঞ্চকৃত্যের বিধানকারী, সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তিসুলভ এবং শরণাগত-বৎসল, তুমি পরমেশ্বর হইয়াও কুলসাধকগণের ঈশ্বর এবং করুণারূপ অমৃতের একমাত্র বারিধি। দেব! এই অসার ঘোর সংসারে সমস্ত জীব দুঃখে মলিন, নানাবিধ শরীরস্থিত অনন্ত জীবরাশি নিরন্তর জন্মমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার অন্ত নাই। সকলেই ঘোর-দুঃখাতুর, কেহ সুখী হয় না, দেবেশ প্রভো! আমায় বল! কি উপায়ে ইহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। মা যে জন্য সাধ করিয়া জগতের মা হইয়াছেন, এইস্থানে আসিয়া তাহার

পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। জগতের দুঃখ দেখিয়া জগজ্জননীর প্রাণ আগে কাঁদিয়াছে। নিত্যনির্ব্বিকারা হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ অপারকরুণার উত্তালতরঙ্গ বিকারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। মা এ ব্রহ্মাণ্ডে তুমি বিশ্বস্বরূপিণী, বিশ্ব তোমার প্রতিবিম্ব, তুমি মায়াদর্পণে আপন মুখ আপনি দেখিয়া আপন প্রেমে আপনি বিভোর হও—যে দিন হইতে জগতের দুঃখ দেখিয়া তোমার ঐ চিরানন্দ বদনমণ্ডলে করুণাময়ী বিষাদচ্ছায়া দেখা দিয়াছে, সেইদিন হইতে তোমার সাধের সংসারে সন্তান সন্ততির মুখেও তোমার স্নেহের বিরহচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। মাতৃহারা জগৎ সেইদিন হইতে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বুঝিয়াছে। বিশ্বসন্তান সেইদিন হইতে তোমার দুর্গম সংসার সঙ্কটে পড়িয়া 'দুর্গা' বলিয়া, দুস্তর ভবাম্ভোধির উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া 'তারা' বলিয়া, করাল কাল-যন্ত্রনায় নিষ্পিষ্ট হইয়া, 'কালী' বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে—ধন্য দয়াময়ীর দয়ার স্রোত, ধন্য করুণাময়ীর করুণার তরঙ্গ! ধন্য মায়ের অপার স্নেহ! সেইদিন হইতে তোমার স্নেহের অনন্তস্রোত জীবের শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, প্রাণে প্রাণে প্রবাহিত হইয়াছে। তাই মা! আজ আমার মত ঘোর নারকী মহাপাতকীও বিপদে পড়িলে সকল ভুলিলেও মায়ের নাম ভুলিতে পারে না। বিপদের বিভীষিকা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেই কে যেন অন্তর হইতে প্রাণের কবাট খুলিয়া দেয়। অমনি "জয় জয় জয় তারা" ধ্বনি বিশ্ব-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া তুলে। জানি না, সে ধ্বনি অন্যে শুনিতে পায় কি না। কিন্তু মা! তুই ত নাদবিন্দু-ধ্বনিময়ী, তুই আর ধ্বনি শুনিবি কি? তুই শুনিস্ বা না শুনিস্, আমি ত শুনিতে পাই মা! আমার সেই "জয় তারা" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে প্রতিধ্বনি দিয়া উঠে, সে মা কে মা? ধন্য মা! তোর অনন্ত লীলা! তুই জানিস্ আর বাবা জানে।

যখন রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হয় অমনি 'মা' বলিয়া আরোগ্য পাই! কিন্তু কুপথ্যের নিত্য-সেবায় আবার যে রোগ বাড়িয়া উঠে, সংশয় সন্দেহ বিতর্ক আসিয়া আবার যে হৃদয় আক্রমণ করে আজকাল আমাদের সেই সান্নিপাতিক বিকারের প্রলাপেই কর্ণ জর জর। যে দিকে যাই সেইদিকেই শুনিতে পাই, বেদ থাকিতে আবার তন্ত্র কেন? বিকার যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সময় যে ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহা ত রোগী বুঝিতে চাহে না। এ দিকে বৈদ্যনাথের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব ভাণ্ডার খুঁজিয়া খুঁজিয়া রসায়নের ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্য সময়ে বিষ, বিষ হইলেও বিকারক্ষেত্রে তাহা অমৃত। নির্ব্বিকার শরীরে বিষ শমনের দূত কিন্তু বিকারে তাহাই আবার সঞ্জীবন-মহামন্ত্র। সাধক! তাই, তন্ত্রে তোমার আমার জন্য তীব্র শক্তি জ্বালাময় মন্ত্রসাধনার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন ঔষধে, কোন সাধনায় যখন ফল হয় নাই তখনই তন্ত্রশাস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছে। কেন না

শাস্ত্রের ভাণ্ডারে তন্ত্রের পর আর সাধন নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন "তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে" মলয়াচল হইতে যখন সবেগে দক্ষিণানিল বহিতেছে তখন আর তালবৃন্ত-ব্যজনের প্রয়োজন নাই। সাধনা বা উপাসনা বলিলেই তুমি আমি বুঝিয়া থাকি যেন বসন্তরোগের ভয়ে গায়ে টীকা দেওয়া, জন্মের মধ্যে একদিন দিলেই হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গলা টীকা দিতাম, আজকাল না হয় ইংরাজিই দিলাম। পূর্ব্বে বেদ তন্ত্র পুরাণ দেখিয়া সাধন ভজন করিতাম। আজকাল না হয় বাইবেল দেখিয়া কোরাণ দেখিয়াই করিলাম। তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি আর কিছুরই নাই, যাহা কিছু ক্ষতি জীবনের। ধর্ম্ম যাহাদের বিষ্টি—ভোগ (ব্যাগার দেওয়া) তাহাদের পক্ষে উহাই যথেষ্ট, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া দেখিতে চাহেন, ধর্ম্মময় সূক্ষ্মদর্শনে অতীন্দ্রিয় পদার্থের উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদের ত প্রতিজ্ঞা মরণান্ত, উদ্দেশ্য সিদ্ধি পর্য্যন্ত, গমন ব্রহ্মলোকান্ত, গন্তব্য ব্রহ্মান্ত। জগদম্বার সেই চন্দ্রশেখর-চূড়াচুম্বিত চরণাম্বুজ যাঁহাদিগের চরম লক্ষ্য, পার্থিব জীব! বুঝিয়া লও এই ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া তাঁহাদিগকে কোন সর্ব্বোচ্চ ধামে আরোহণ করিতে হইবে!

এই মহাসিদ্ধি জীবের সাধনার পূর্ণসম্পত্তি, বিনা সাধনায় সেই ভবারাধ্য সাধ্য ধন কেহ কখনও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। আবার সাধনা তাহারই নাম যাহার পরিণাম সিদ্ধি। সেই সিদ্ধি চাহিলেই আমাকে সাধনা করিতে হইবে। সাধনা সাধুর কার্য্য, সাধনা করিতে হইলেই আমাকে সাধু হইতে হইবে অথবা সাধনা করিলে আমি আপনিই সাধু হইয়া যাইব। কায়িক বাচনিক মানসিক ভেদে সেই সাধনা ত্রিবিধ। যাহা কিছু সিদ্ধি ও সাধনা, দেশ কাল পাত্রানুসারে তাহা আমার এই শরীর এই মন, এই ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে, এই বর্ণসঙ্কর-ম্লেচ্ছ-যবন-বিধর্ম্মি-বিপ্লাবিত দেশে, অনাচার-কদাচার-অত্যাচার-ব্যভিচার-স্বেচ্ছাচার-সঙ্কুল কলিকালে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ-ক্ষেত্র আমার এই অপবিত্র দেহে, চঞ্চল ইন্দ্রিয়ে, সন্দিগ্ধ হৃদয়ে, ঊর্দ্ধসংখ্যা শতবর্ষ পরমায়ুপূর্ণ প্রাণে, যাহা ঘটিয়া উঠিবে, তাহাই আমার সার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি। এই সম্পত্তি লইয়াই ভবের হাটে আমার যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয়। ইহারই মধ্যে মূলধন রক্ষা করিয়া লাভের অংশ দেখিতে হইবে। এখন বল দেখি, দ্বাদশ বার্ষিক, শত বার্ষিক, সহস্র বার্ষিক যজ্ঞব্রত সম্পাদন কে করিবে? তাহার মন্ত্রজ্ঞ বৈদিক হোতা ঋত্বিক অধ্বর্য্যু আচার্য্য কোথায় পাইব? বেদের সহস্র সহস্র শাখার মধ্যে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দুই দশটি ভিন্ন সমস্ত শাখা লোপাপন্ন, আজ তাহার কোন শাখার কোন মন্ত্র পাঠ করিয়া কে কোন্ স্বর্গস্থ দেবতাকে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত করিয়া দিবে? সেই দৈনিক লক্ষ লক্ষ সমিৎপুঞ্জের সংগ্রহ আজ কোথা হইতে হইবে? দৈনিক সহস্র

গোহত্যা আজ যে ভারতবর্ষের রাজধানীর নিত্য-কৃত্য; আর কি সেই ভারতবর্ষ হইতে স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় পয়স্বিনী গাভীগণের দুগ্ধস্রোত ঘৃতস্রোত প্রবাহিত হইবে? আর কি যজ্ঞীয় পশুর পর্ব্বতাকৃতি পবিত্র মাংসে মন্ত্রপূত আহুতির সংযোগে দেদীপ্যমান হুতাশনের তর্পণ-সাধন হইবে? আর কি প্রতি যজ্ঞ কুণ্ডমধ্য হইতে ভৈরবজ্বালাবলী-সঙ্কুল বহ্নিস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া জটাজূট-বিমণ্ডিত শ্মশ্রুল-মুখমণ্ডল স্রুক্-স্রুবধারী ব্রহ্মতেজোময়মূর্ত্তি ভগবান্ বৈশ্বানর "বরং বৃণু" বলিয়া যজমানের সম্মুখে দাঁড়াইবেন? আর কি যজ্ঞবিঘ্ন-ভয়ভীত রাক্ষসাসুর-বিদ্রাবিত ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ ভবন শূন্য করিয়া যজ্ঞ রক্ষার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন? আর কি যজ্ঞাগ্নি হইতে শুকদেবের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী, দ্রৌপদীর ন্যায় মহাশক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন? আর কি যজ্ঞভয়ে কম্পিতকলেবর নাগরাজ তক্ষক দেবরাজের শরণাপন্ন হইবেন? আর কি তক্ষক সহ সহস্রাক্ষ ব্রাহ্মণের তেজোবলে মন্ত্রের অদ্ভুত প্রভাবে ব্যোমকক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে যজ্ঞকুণ্ডে পতনোন্মুখ হইবেন? ভারত আজ সে তপোবল-বিক্রম হারাইয়াছে। আর সে বিশ্বাস নাই, বল নাই, ধৈর্য নাই, সাহস নাই, কি কুক্ষণেই কাল সর্পসত্র আরম্ভ হইয়াছিল, সেই যে পূজিত বহ্নি অপূজিত হইয়া ভারতের প্রতি বিরূপাক্ষ হইলেন, তক্ষক সহিত দেবরাজকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া সেই যে ব্রাহ্মণের মন্ত্রশক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিমুখ হইলেন, আজও হইলেন, কালও হইলেন। সে দিন আর ফিরিয়া আসিল না। জন্মের মত যাজ্ঞিক জগতের শেষ যবনিকাপাত হইল, আর উঠিল না। কি জানি কলিযুগের সংস্পর্শের কেমনই দোষ, দেবতা মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং উপকরণ সমস্ত পূর্ণ প্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিতেও যজ্ঞ পূর্ণ হইল না, যজ্ঞেশ্বরীর এ লীলা রহস্য কে বুঝিবে?

তাই বলিতেছিলাম, কলির জীব! মহারাজ পরীক্ষিৎ জনমেজয় যেখানে পশ্চাৎপদ সেখানে তুমি আমি অগ্রসর হই কোন সাহসে? আর হইলামই বা অগ্রসর, তাহাতেই কি সকলে সুখী। সুখৈশ্বর্য্য স্বর্গভোগ যাহাদের কামনা, যজ্ঞ তাহাদেরই সাধনা। যাহারা সুরত্ব ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করিয়া সেই শঙ্কর-সম্পদ পদের ভিখারী, তাহারা কি আর তোমার যজ্ঞের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়? তাহাদের উপায় কি? কোন সাধনায় তুমি তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবে? বলিবে, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান ধারণা সমাধি, তত্ত্বজ্ঞান লাভের এ সকল উপায় ত বৈদিক পথে রহিয়াছে। আছে সত্য, সমুদ্রে রত্ন আছে, তাহাতে তোমার আমার কি? রাবণের মত যাজ্ঞিক রাজা কে হইবে, যে বরুণদেব রত্নাকরের সকল রত্ন উদ্ধার করিয়া তাহাকে উপহার দিবেন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জাবালি, জনক, জৈমিনির মত তাপসরাজ্য-সম্রাট কে জন্মিবে, যে ভগবান বেদসাগর-গর্ভ মন্থন করিয়া নিখিল তত্ত্বজ্ঞানরত্ন তাঁহার করে অর্পণ করিবেন। নচিকেতার মত ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন

দিব্যদেহ কে লাভ করিবে, যে যমালয়ে গিয়া যমের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাইবে। "নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ" গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশান-কার্য্য পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ব্যাপার বেদমন্ত্রে সমাহিত হইবে সে আর্য্যজীবন আর নাই। বৈদিক নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফূর্ত্তি পাইবার উপযুক্ত সংযতেন্দ্রিয় দিব্যদেহ এক্ষণে অসম্ভব বলিলেও আর অত্যুক্তি হয় না। বলিতে কি, সে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পরব্রহ্ম-সমাহিত নির্ব্বিকল্প হৃদয়ে কেবল দৈবতেজঃসম্পন্ন পুত্রকামনায় ঋতুকালে একবারের জন্য মাত্র ধর্ম্ম-পত্নীর সহবাস আর নাই? শত শত পুরুষানুক্রমে যবনদাসত্ব-লব্ধ অন্ন উদরসাৎ করিয়া সে ব্রহ্মতেজ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তপোমন্ত্রানুভাবিত সে পবিত্র শুক্র-শোণিত আর নাই। সে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী পিতা মাতাও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, সেই অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞান-সৌধশিখর স্থাপিত করিবার দিন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনকে প্রকৃতিলীন করিয়া মুদ্রিত নয়নে সে পরব্রহ্ম ধ্যান আর নাই। আজ সেই ধ্যানের ভান করিয়া যাহারা নয়ন মুদ্রিত করিতে যায়, দেখিবে তাহাদের সেই মুদ্রণের মধ্যেও স্পন্দন আছে, অন্ধকারেও মিটি মিটি দর্শন আছে। এ ত সংযমের অভিনয় মাত্র, প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা যথার্থই ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়াছেন, কেবল চিরাভ্যাস বশতঃ অন্তঃকরণ হইতে সংস্কাররাশি বিদূরিত হয় নাই—গীতায় ভগবান তাঁহাদিগকেও বলিয়াছেন "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" "কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহকে যে মনে মনে স্মরণ করে, সেই বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে" এতদূর যাহার কঠোর শাসন, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা, সেই পথে তুমি আমি উত্তীর্ণ হইব, ইহা কি দাম্ভিকতার কথা নহে? দ্বাপরের উপান্ত কলির প্রারম্ভ, এই যুগ সন্ধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষাৎ নর-নারায়ণের অবতার অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ করিয়া যে তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয় বলিয়া যে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জুনের হৃদয়াধিকৃত করিতে পারেন নাই, আজ তুমি আমি সেই কলিযুগের পূর্ণাধিকারে ঘোরান্ধকারে ডুবিয়া যোগবাশিষ্ঠ গীতা পড়িয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব, ইহা যদি তোমার জাগ্রদবস্থা হয় তবে স্বপ্ন আর কাহার নাম তাহা ত জানি না।

আমরা চক্ষের উপর বিলক্ষণ দেখিতেছি, আজকাল দিনে দুই প্রহরে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষ বৈদিকপথে যোগী হইতে গিয়া শেষে না আস্তিক না নাস্তিক, সেই এক এক অদ্ভুত নরসিংহমূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়া আছেন। ধুঁয়ো ধুঁয়ো আকাশ চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় এমন শূন্য হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে না আছে বিশ্বাস না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি, না আছে প্রেম, আছে

কেবল কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আর মনে মনে "হা হতোঽস্মি" আর্ত্তনাদ। অনেকস্থানে দেখিয়াছি, তাঁহারা গোপনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এখন উপায় কি?" অনুপায় তাঁহাদের আর কিছুই নহে অর্থাৎ লোকের সাক্ষাতে শিখা সূত্র না রাখিয়া, ফোঁটা তিলক না দিয়া বাহিরে ব্রহ্মজ্ঞানের ঠাট বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মতে উপাসনা করিলে হয় কি না, ইহাই তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য। মনে কর এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে পরমায়ু শেষ করিয়া শেষে এই অনুতাপ কি শোচনীয় দশা নহে? ব্রহ্মদ্বারের নিষ্কণ্টক সোপানরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শেষে এই অপমৃত্যু মরিতে হইবে, ইহা জানিয়াই কোটি কোটি বর্ষ পূর্ব্বে অন্তর্য্যামিনী তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কি করিব, ঐ যাহা বলিয়াছি—কুপথ্যের নিত্যসেবায় আবার রোগ বাড়িয়া উঠে; তাই সঙ্গীতসাধক কাঁদিয়া বলিয়াছেন "দোষ কার নয় গো মা! আমি, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!" সেই মরণই কি সহজ? শত যমদণ্ড হইতেও যেন অনুতাপের যন্ত্রণা অধিক অসহ্য। আসন্ন মৃত্যুর সেই বিকট বিভীষিকা স্মরণ হইলে কঠিন পাষাণ হৃদয়ও বিদ্রাবিত হইয়া উঠে, মুমূর্ষুর মলিন মুখমণ্ডল বিপ্লাবিত করিয়া সে অজস্র অশ্রুধারা নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন অনিবার্য্য বেগে অন্তরের অন্তঃস্তর ভেদ করিয়া রোদনের উৎস ছুটিতে থাকে—

"মা গো! কি করিব বল্! দিনে দিনে ব্যাধি হল যে প্রবল্।
পিত্ত সত্ত্ব, বায়ু রজঃ, কফ তমঃ, ত্রিদোষ ক্ষেত্রে বিপদ্ ঘটিল বিষম,
এবার বিকার সন্নিপাত, (মা গো) আমার সন্নিপাত, কাঁদি তাই অবিরল।

এই আর্ত্তনাদপূর্ণ অবিশ্বস্ত অন্তিমজীবনে শম দম অসাধ্য, সমাধি অসম্ভব, অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বস্ফূর্ত্তি সুদূরপরাহত; সুতরাং এ অবসন্ন দেহ লইয়া সে দুর্গমপথ-যাত্রাও আমার পক্ষে দুর্ঘট। যে বৃক্ষের অগ্রশাখা অবলম্বন না করিলে ফল পাইব না, তাহার মূল মাত্র স্পর্শ করিয়া বৃক্ষকে নিষ্ফল মনে করা আর বৈদিক পথে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান না পাইয়া বেদকে নিস্ফল মনে করা একই কথা। বরং বৃক্ষস্পর্শ না করিয়াও যদি তাহার ফলের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে তবে তাহার ছায়াতে বাস করিলেও একদিন না একদিন অবশ্য ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। যাহার অগ্রশাখা স্পর্শ না করিলে ফল পাইব না তাহার মূল পর্য্যন্তও স্পর্শ না করিয়া কেবল বিশ্বাসের নির্ভরে তরুতলে বসিয়া থাকিলেই কোনদিন না কোনদিন অবশ্য ফল পাইব—এ রহস্য ভেদ করা যেন কিছু কঠিন বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু আমরা বলি, শুনিতে কঠিন হইলেও কার্য্যত কঠিন নহে। অনেক অনেক ধনাঢ্য ভূ-স্বামীর গৃহোদ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, সায়াহ্ন সমীরণ সেবনের জন্য পিতা মাতা হয়ত নিজ বালক বালিকার অঙ্গুলি ধারণ করিয়া সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন,

উদ্যানের কোন একটি বৃক্ষ পরিপক্ক ফলসমূহে সুসজ্জিত হইয়া আছে। চঞ্চল বালক বালিকার হৃদয় ফলের লোভে কেমন ব্যতিব্যস্ত হয়, ইহাই দেখিবার জন্য কৌতুক সহকারে তাঁহারা কুমার কুমারীকে সম্বোধন করিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে বলিলেন, "ঐ দেখিয়াছ। গাছে কেমন সুন্দর ফল পাকিয়াছে"। পিতা মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে যেমন দৃষ্টিপাত, বড়লোকের ঘরের আদুরে আবদারে ছেলে মেয়ে আর কি তখন থাকিতে পারে? "দাও দাও দাও!" বলিয়া ক্ষণার্দ্ধের মধ্যে কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। পিতা মাতা তাহার পরেও কৌতুক দেখিবার জন্য আবার বলিলেন, যাও! গাছে উঠিয়া পাড়িয়া আন। কিন্তু তাহারা জানে—আমরা পাড়িতে পারিব না, তাই এ ব্যঙ্গ শুনিয়া আরও অভিমানে জ্বলিয়া উঠিল। দুই জনে কাঁদিয়া যখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া পড়িল দেখিয়া স্নেহময়ী মায়ের প্রাণ গলিল, পতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর কেন? এখন উপায় কর, তখন পিতা মাতা দুই জনে দুই জনকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বৃক্ষশাখার সমকক্ষে দণ্ডায়মান করিয়া ধরিলেন। কুমার কুমারী পিতা মাতার হস্তে নির্ভর করিয়া স্বহস্তে সেই বাঞ্ছিত ফল চয়ন করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাই বলি, বড় লোকের ঘরের আদুরে ছেলে মেয়ের এ আবদার অসম্ভবও নহে, অপূর্ণও থাকে না। সাধক! এ জগতে তুমি কোন্ রাজাকে কোন্ রাণীকে সকলের বড় বলিয়া জান? ত্রিভুবন-রাজরাজেশ্বরের নিকটে আর রাজা কে? আর সেই উপেন্দ্র-সুরেন্দ্র-বন্দিত-চরণা যোগীন্দ্রমহিষীর নিকটে রাণীই বা কে? তুমি আমি সেই পিতা মাতার সন্তান, আমরা ছোট কিসে? কিসে আমাদের আদর আব্দারের সোহাগের ত্রুটি আছে? এ সংসারে প্রমোদবনে বেদবৃক্ষের মোক্ষ ফল দেখিয়া যে দিন জীব কাঁদিয়া অধীর হইয়াছে, যে দিন জগজ্জননী দেখিয়াছেন, এ দুর্ব্বল বালক বালিকা ঐ দুরারোহ বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিবে না, সেইদিনই সদয় হৃদয়ে দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আর আমোদ দেখিও না, শীঘ্র উপায় কর। উপায় আর কি করিবেন? ত্রৈলোক্যজনক জননী অমনি আগম নিগম উভয় অভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বিশ্ব-নরনারী কুমার কুমারীকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ধরিয়াছেন! তাহারা পিতা মাতার হস্তের উপর নির্ভর করিয়া সেই যোগিজন-দুর্লভ বেদবৃক্ষের মোক্ষফল স্বহস্তে চয়ন করিতেছে। সাধকগণ বেদবৃক্ষে আরোহণ না করিয়াও তন্ত্রশাস্ত্রের মন্ত্রবলে বেদের ফল কৈবল্য-সিদ্ধি অনায়াসে লাভ করিতেছেন। সকল সময়ে এত দয়া হয় কি না তাহা জানি না, সায়াহ্নসমীরণ-সেবনে ত না হইলেই চলে না। সূর্য্যদেব অস্তে চলিলেন, সম্মুখে প্রগাঢ়তমোময়ী ভীষণযামিনী, এ সময়ে ঘোর অন্ধকার বনমধ্যে মা কি কখনও সন্তানকে একাকী রাখিয়া যাইতে পারেন? মায়ের এক দিবসের তিন প্রহর সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, শেষ প্রহর কলি, তাহাও যায় যায়। কলির জীবের

পরমায়ু সূর্য্য আর কতক্ষণ থাকিবেন, তিনিও অস্তোন্মুখ, সম্মুখে নিবিড়তামসী মৃত্যুময়ী যামিনী। এ ঘোর-সঙ্কট সন্ধ্যাকালে মহাকালহৃদয়রঙ্গিনী ভবভয়ভঞ্জিনী মা কি সন্তানকে একাকী রাখিয়া যাইবেন? তিনি যখন তাঁহার সেই মণিদ্বীপমধ্যস্থিত পারিজাতমণ্ডিত চিন্তামণিমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন, জননীর অঞ্চল-সম্বল বালক বালিকার দলও তখন চঞ্চল চরণে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যধামে প্রবেশ করিবে। মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী, মা আমাদের করুণাময়ী, তাই আমাদের এত সোহাগ, এত অহঙ্কার, এত অভিমান! মাকে লইয়া যে অভিমান তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না, এ অভিমান ছাড়িয়া দিলে মায়ে পোয়ে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়—তাই ইহা জীবন থাকিতে ছাড়িতে পারিব না, এ অভিমান প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া রাখিব—মরণেও তাঁহার চরণে ইহা উপহার দিব। 'আমরা মায়ের, মা আমাদের' এই মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করিতে করিতেই সংসার হইতে বিদায় লইব। মায়ের প্রসাদে মায়ের সন্তান সাধকের ইহাই ইহলোকের পরলোকের চিরবিজয়-বৈজয়ন্তী। সাধক জানেন, যন্ত্রতন্ত্রস্বরূপিণীর এ মন্ত্রময় স্বতন্ত্রলীলা বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর, বড়ই মনপ্রাণ-বিমুগ্ধকর।

অদ্বৈতবাদ

॥ বেদান্ত ও শঙ্করাচার্য্য ॥

স্থানে স্থানে কতগুলি অদ্বৈতবাদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান বা অদ্বৈতসিদ্ধি বেদান্ত ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কেহ কখন লাভ করিতে পারে না এবং শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত অদ্বৈততত্ত্বের আচার্য্যও আর কেহ হইতে পারে না। ইঁহারা যদি নিজে বেদান্ত-মতসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া এ কথা বলিতেন, তাহা হইলেও আমাদের একদিন বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সেই সকল বাক্যই তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষী। বৈদান্তিক মত ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে না ইহা তাঁহারা কোন্ প্রমাণ অনুসারে স্থির করিলেন আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হইতে পারে, তাঁহাদের এমন বিশ্বাস আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তত্ত্ব-বোদ্ধা সংসারে আর কেহ নাই, কেননা শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাৎ—শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার। সে কথা আমরাও অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রচারিত বেদান্তদর্শন ভিন্ন আর কিছুতে তত্ত্বজ্ঞান-সিদ্ধি হইবে না, ইহার প্রমাণ কি? শঙ্করাচার্য্যের মত পুরুষ তুমি আমি হইতে পারি না, কিন্তু যাঁহার অবতার বলিয়া শঙ্করাচার্য্য গৌরবিত—পূজিত, তিনিও কি হইতে পারেন না? শিবাবতার

যাহার প্রচারক, স্বয়ং শিব কি সে তত্ত্বের অনভিজ্ঞ ? স্ফুলিঙ্গে সংসার ছার খার হইয়া যায় অথচ অগ্নিতে দাহিকা শক্তি নাই, ইহা বিশ্বাস করিব কেমন করিয়া ? ফলতঃ বেদান্ত দর্শনে অদ্বৈততত্ত্বের আবিষ্কার মাত্র হইয়াছে কিন্তু তাহার সমন্বয় হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্রে। এই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কত শত যোগী ঋষি, সাধু সাধক হত আহত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান ভূতভাবন প্রকৃতি বিকৃতির সমন্বয় করিয়া সেই দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধ যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, শান্তিকে তাহারা চিরকালই উপসর্গ বলিয়া মনে করে, তাই আজও পণ্ডিত-মণ্ডলীমধ্যে অনেক অদ্বৈতবাদীকে তন্ত্রবিরোধী দেখিতে পাই। শিবের সহিত জীবের বিরোধ এ কথা শুনিলে আমাদের কিন্তু হাসিও পায় লজ্জাও হয়। দার্শনিকের চক্ষে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়কে দেখিলে যেন পূর্ব্বাপর সমুদ্রবৎ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। একদিকে অদ্বৈতবাদ বলিতেছেন, সংসার কেবল মরুমরীচিকা, মায়া তরঙ্গ, রজ্জুসর্প, শুক্তিরৌপ্যবৎ অজ্ঞানবিজৃম্ভন মাত্র। জ্ঞানরূপী নিত্যশুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম অজ্ঞানের অতীত, গুণের অতীত, সংসারের অতীত। তাঁহার ইচ্ছা নাই, ক্রিয়া নাই, চেষ্টা নাই, ফলভোগ নাই, নাই বলিতে কিছুই নাই, আছেন কেবল 'তিনি' মাত্র। অন্যদিকে দ্বৈতবাদ বলিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা আছে, ক্রিয়া আছে, চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, ফলভোগ আছে—আছে বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই তাঁহাতে আছে। নাই কেবল 'নাই' এই শব্দটি। উভয়ই শাস্ত্র, কাহারও বলাবলের লাঘব গৌরব নাই, উভয়ই সমান প্রমাণ। কে কাহাকে পরাস্ত করিবে ? উভয়েরই সাক্ষীও ভগবান, বিচারকও ভগবান। লৌকিক মানব দ্বারা ইহার মীমাংসা অসম্ভব, তাই ত্রিলোক-সন্দেহভঞ্জন জন্য সর্ব্বান্তর্যামিনী নিজে প্রশ্নকর্ত্রী সাজিয়াছেন এবং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্ব-মঙ্গলাবল্লভ তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, স্বয়ং নারায়ণ তাহাকেই স্বরূপ-তত্ত্ব জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—

আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ॥

শিববক্ত্রবৃন্দ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত এই তিন কারণে আগত, গত ও মত এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের নামান্তর আগম। যে অংশের প্রশ্নকর্ত্রী পার্ব্বতী, উত্তরদাতা মহেশ্বর সেই অংশের নাম আগম। আবার লীলামাধুর্য্য-সম্বর্দ্ধন জন্য যে অংশে মহাদেব প্রশ্নকর্ত্তা এবং মহেশ্বরী উত্তরদাত্রী সেই অংশের নাম নিগম—

নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

গিরিজাবক্ত্র হইতে নির্গত, মহেশ্বরের পঞ্চমুখে গত এবং বাসুদেবের সম্মত।

এ স্থলেও নির্গত গত ও মত এই শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর লইয়া নামান্তর নিগম। তন্ত্রশাস্ত্র এই আগম নিগম রূপ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত, তন্ত্রের বক্তা এবং বক্ত্রী ভগবান ও ভগবতীর যেমন স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তাঁহাদের উক্তিরূপা আগম নিগমেরও তদ্রূপ স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই. উভয়েরই জীব-নিস্তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং দ্বৈতজগতের মধ্য দিয়া অদ্বৈততত্ত্বে গতিবিধিই ইহার প্রক্রিয়া। অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতঃ সত্য হইলেও দ্বৈতদৃশ্য সংসারে আপামর সাধারণের হৃদয়ে তাহার অনুভব অসম্ভব, এইজন্য স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সহস্র সহস্র শিষ্য পরম্পরায় অদ্বৈততত্ত্ব দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইলেও তাহা গন্তব্য পথ বলিয়া সাধারণ্যে গৃহীত হয় নাই। যাঁহারা সেই অদ্বৈত পথে যাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদেরও সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ একজন যদি নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে নিজধামে পৌঁছিয়া থাকেন, তবে সেই যথেষ্ট। এ স্থলে শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত অদ্বৈতপথ বলিতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাহা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদিবিরহিত এবং কেবল বেদান্তমতসিদ্ধ, তাহাই শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈত পথ। আমাদের কিন্তু বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সহিত বা রহিত তাহা আমরা এক্ষণে কিছু বলিতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, 'নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্' এই তীব্র বৈরাগ্যবেগে আক্রান্ত যে পথ তাহাই তাঁহার নিজ-প্রচারিত অদ্বৈতপথ। লক্ষ মানবের মধ্যে একজন কখনও এ পথে সিদ্ধ হইয়াছেন কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী কেহ আছেন কিনা জানি না, থাকুন আর নাই থাকুন, দণ্ডীর মঠে, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে, মহন্তের আখড়ায় এমন লোক এখনও অনেক আছেন যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের দোহাই দিয়া অদ্বৈতবাদের অভিমান করিয়া থাকেন, ইঁহাদের কথা বলিবার এক্ষণে সময় হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় যাঁহারা দার্শনিক মতে জগদ্বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক এবং এখনও যাঁহারা বেদান্ত দর্শনে অলৌকিক বিচারশক্তির পরিচয়ে নৈয়ায়িক নাস্তিক প্রভৃতি মত খণ্ড খণ্ড করিয়া গুরু-সম্প্রদায় বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহারা দার্শনিক জগতে গুরু হইলেও অদ্বৈততত্ত্বে কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাধকগণ তাঁহাদের পরমত খণ্ডন এবং স্বমত সংস্থাপন দেখিয়াই তাহা বুঝিয়া লইবেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বৈতজ্ঞান যাঁহার নাই, তিনি কেমন করিয়া বদ্ধপরিকরে নৈয়ায়িকের সঙ্গে বিচার করিতে যান তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দর্শন শাস্ত্রের কূট বিচারশক্তি আর সাধনালব্ধ অদ্বৈতসিদ্ধি দুই এক পদার্থ নহে। বিচার যাঁহার রহিয়াছে অদ্বৈতসিদ্ধি তাঁহার অনেক দূরে। স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গে যে পরিমাণ দ্বৈতবাসনার বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, দার্শনিকের সংসর্গে বিচার করিতে যে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অতিরিক্ত না হয় এ কথা কে বলিল? যাহা হউক এই সকল দার্শনিক দণ্ডিগণকে আমরা বিচারে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রণাম করিতে বাধ্য কিন্তু

অদ্বৈতসিদ্ধ বলিয়া গ্রীবা হেলায়িত করিতেও কুণ্ঠিত। যাঁহাদের গুরুবর্গের বিবরণ এই, সেই শিষ্য-সম্প্রদায়ের সিদ্ধি-বৃত্তান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বৈরাগ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবার অধিকার এ সংসারে অতি বিরল, তাই দ্বৈতজগতের প্রতিকূলে অদ্বৈতসিদ্ধি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদান্ত-পথিক অদ্বৈতবাদিগণও ইহা জানেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিলে তবে অদ্বৈত জ্ঞান-সিদ্ধি হইবে। নতুবা অদ্বৈতবাদে সমস্তই যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হওয়াও অসম্ভব। 'সর্ব্বত্রাদ্বৈতমন্বিচ্ছেন্নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।' গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ইহা দ্বৈতবাদেরই কথা। অদ্বৈত পথে যাইতে হইলেও আমাকে যেমন প্রথমত এই দ্বৈতপথেই মস্তক অবনত করিয়া যাত্রা করিতে হইবে, নতুবা যেরূপ গুরু ব্যতিরেকে কখনও সিদ্ধি সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—যদি ঐ অদ্বৈত পথের আশা থাকে তবে এই দ্বৈতজগতের মধ্যে দিয়াই যাত্রা করিতে হইবে, দ্বৈত-জগৎ উল্লঙ্ঘনের জন্য উল্লম্ফন দিও না। অনেক মহা মহারথী বীর এইরূপ উল্লম্ফন দিয়া পরিশেষে পঙ্গু হইয়াছেন। পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে শীঘ্র উঠিতে হইবে ইহা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া আকাশে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যাঁহারা ভুজবল-মদোন্মত্ত হইয়া এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, পরিণামে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদেরই অস্থিসন্ধি চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া গিয়াছে। পরিশেষে নির্ব্বিন্ন-হৃদয়ে তাঁহারাও বলিয়াছেন,

অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরুন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো। বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥

মহাসমুদ্রের সমস্ত জল পান যদি সম্ভবে, সুমেরু পর্ব্বতের উন্মূলন যদি সম্ভবে, অগ্নিভোজন যদি সম্ভবে, তবে হে সাধো! চিত্তনিগ্রহ তাহা অপেক্ষাও বিষম কঠিন। পরিশেষে এই শোচনীয় দশা হইতে, এই আর্ত্তনাদ হইতে সাধককে রক্ষা করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের অবতারণা। তাই তন্ত্রে এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ দ্বৈত জগৎকে প্রথমেই উপেক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই। সুদূরস্থিত পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতে হইলে যেমন এই পৃথিবীতেই পদক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে তদ্রূপ অদ্বৈততত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলেও ধীরে ধীরে দ্বৈত জগতের মধ্য দিয়াই প্রস্থান করিতে হইবে। দ্বৈত জগৎকে চিরকাল সাধনার শত্রু বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে অদ্বৈত-সিদ্ধি সুদূর-পরাহত। তন্ত্রশাস্ত্র সেই দ্বৈতজ্ঞানকে সাধনার শত্রু না বলিয়া মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধক সেই দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানকে সন্তানরূপে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের পরস্পর প্রেমলীলা দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। দ্বৈত

জগৎ মন্থন করিয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে ডুবিয়াছেন, দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের লীলা-মাধুর্য্য তিনিই বুঝিয়াছেন। সংসারের তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়াও তিনি তাহাতে মিশিয়া যান না। পবন-হিল্লোলে আন্দোলিত কমলদলের ন্যায় সংসারে থাকিয়াও বিপদে সম্পদে আলোড়িত হইয়াও সুখ দুঃখে তিনি নিত্য নির্লিপ্ত। কিছুতেই তাঁহার পূর্ণানন্দ হৃদয়ে নিরানন্দের মলিন ছায়া পতিত হয় না। তাই সদানন্দ ভক্তানন্দে অধীর হইয়া তন্ত্রে বলিয়াছেন—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতাঃ॥

জগতে কেহ অদ্বৈত জ্ঞান ইচ্ছা করেন, কেহ দ্বৈত জ্ঞান ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানেরই অতীত হইয়াছেন।

যাঁহারা দ্বৈত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা উড়াইয়া দিতে পারিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অনেকস্থলেই দেখিতে পাই দ্বৈত জগৎ উড়িয়া যাউক বা না যাউক, তাঁহারা ত উড়িয়াছেন। যে দ্বৈত জগৎকে কিছুই নয় বলিয়া ফুৎকারে উড়াইবে, তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া এত ভয় কেন? আর যাহা কিছুই নয়, তাহাকে উড়াইবার জন্য এত চেষ্টাই বা কেন? অদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া যে সকল আর্ত্তনাদ বহির্গত হয়, তাহা শুনিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাদিগকে বিভীষিকা দেখাইবার জন্যই দ্বৈত সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। সংসারে শান্তি নাই, প্রেম নাই, আরোগ্য নাই, আনন্দ নাই, আছে কেবল 'হা হতোঽস্মি' ধ্বনি, আর 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্ত্তনাদ, যেন দ্বৈত জগতের ভয়ে অদ্বৈতবাদ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া পালাইবার স্থান পাইতেছেন না; কোথায় গেলে রক্ষা পাইব, যেখানে যাই, সেইখানেই দ্বৈতজগৎ। দ্বৈততত্ত্ব লইয়াই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডলীলা। কাহার সাধ্য সেই ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিয়া দ্বৈত জগৎকে উপেক্ষা করিয়া অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইবে? রাজর্ষি জনক, শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে দ্বৈত জগৎকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তুমি আমি তাহাকে ভ্রূভঙ্গে উড়াইব—ইহা অপেক্ষা ব্যলীকতা আর কি আছে? অন্যে পরে কা কথা? সুরাসুরবন্দিতপদ চরাচরগুরু পরমেশ্বর পর্য্যন্ত দ্বৈতজগতের মায়ামোহের অভিনয় করিয়া যাঁহার মায়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছেন—

ভূমৌ নিপত্য দেবেশঃ পপাত চরণান্তিকে।
অযুতং দ্বাদশং দেবি পুস্তকঞ্চাবলোকিতম্॥
কলাং বক্তুং ন শক্নোমি বদ যোগং সুরেশ্বরি!
মাত র্মে কালিকে দেবি! প্রসীদ ভক্তবৎসলে॥

শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্যাপি হসিত্বোবাচ তারিণী।
ত্বদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
ইমং যোগং মহাদেব! ভাবয়স্ব দিনে দিনে। (তারারহস্য)

দেবদেব, জগদম্বার চরণাম্বুজ সন্নিহিত ভূমিভাগে নিপতিত এবং প্রণত হইয়া বলিলেন—দেবি! দ্বাদশ অযুত (এক লক্ষ বিংশ সহস্র) পুস্তক অবলোকন করিলাম, তথাপি কলাতত্ত্ব কি তাহা আমি বলিতে সমর্থ নহি। সুরেশ্বরি! সেই কলাযোগ আমাকে বল, দেবি! ভক্ত-বৎসলে! মাতঃ কালিকে! আমার প্রতি প্রসন্না হও। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবনতারিণী হাস্যসহকারে উত্তর করিলেন—ব্রহ্মাণ্ডের সকল পুরুষ তোমার স্বরূপ এবং সমস্ত স্ত্রী আমার স্বরূপ। মহাদেব! এই যোগ দিনে দিনে অভ্যাস কর।

সাধক বিশেষ সাবধান হইবেন—এ স্থানে স্বয়ং মহেশ্বরী গুরু, মহেশ্বর শিষ্য। মহাদেব সাধক, মহাদেবী উত্তর সাধিকা, সাধ্য—জগতের স্ত্রী পুরুষ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও স্বয়ং শিব এই জ্ঞানযোগ সাধন করিতে বসিয়াছেন—অন্তর্যামিনী আজ শিবের মত শিষ্যকেও সাবধান করিয়া বলিতেছেন—"ইমং যোগং মহাদেব! ভাবয়স্ব দিনে দিনে"। যোগীন্দ্র-চূড়ামণি যোগের অনুষ্ঠান করিবেন—তিনিও দিনে দিনে ভাবনা করিয়া এই যোগ অভ্যাস করিবেন। জগদীশ্বর হইয়া জগৎকে উপাসনা করিবেন—তবে তাঁহার হৃদয়ে শক্তিতত্ত্ব পরিস্ফুরিত হইবে। শক্তিতত্ত্বের সম্যক্ বিস্ফুরণ হইলে তবে শিব-শক্তির অভেদজ্ঞানে দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড ঘুচিয়া যাইবে, ব্রহ্মাণ্ড ঘুচিয়া গিয়া কেবল ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ সত্ত্বের উপলব্ধি হইবে। সাধক এইস্থানে বুঝিয়া লইবেন—কিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে। ইহাতেও এই আপত্তি থাকিতে পারে যে, কেবল স্ত্রী পুরুষ লইয়াই ত জগৎ নহে—নদ নদী সমুদ্র সরোবর, বন উপবন প্রান্তর পর্ব্বত, পৃথিবী বায়ু আকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র-মণ্ডল—এ সকলের লোপ হইবে কিসে? আমরা বলি, ইহার কিছুরই লোপ হইবে না, সমস্তই থাকিবে—তবে শক্তিতত্ত্বের প্রত্যক্ষজ্ঞান উপস্থিত হইলে সাধক দেখিবেন—নিখিল বিশ্বসংসার কেবল সেই বিশ্বেশ্বরীর বিচিত্র শক্তিবৈভব ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন দ্বৈত জগৎকে আর সাধনার শত্রু বলিয়া বোধ হইবে না, সংসারই তখন সাধনার উপকরণময় সুপ্রশস্ত পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া অনুভূত হইবে। আমরা সাকার উপাসনা এবং শক্তিলীলা পরিচ্ছেদে এ তত্ত্বের সম্যক্ অবতারণা করিব। এ স্থানে তন্ত্রের উপযোগিতা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

অতঃপর অনেকের আশঙ্কা এই যে, নিগূঢ় জ্ঞানযোগ-তত্ত্ব কলুষিত কলিযুগে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? এ কথারও সম্যক্ উত্তর করিবার ক্ষেত্র এ নহে—তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিতেছি যে, বিকারগ্রস্ত রোগীকে বিষ দ্বারা রসায়ন

করা যেমন উপযুক্ত আবার রসায়নের পক্ষে রোগীর বিকারগ্রস্ত অবস্থাও তেমনই উপযুক্ত। প্রকৃতির মঙ্গলময় নিয়মে বিকারের প্রভাবে তাহার শরীরে আজ এমন তীব্রাভিভাবিনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, যাহাতে রোগী অনায়াসে বিষপান করিয়া বিষের জীবনবিরোধিকা শক্তি নষ্ট করিয়া তাহার জীবনসাধিকা শক্তি গ্রহণ করিতেছে। তদ্রূপ কলিযুগের বিকারপ্রভাবেও জীবের শরীরে এমন তীব্রশক্তির সঞ্চার হইয়া আছে, যাহাতে যোগী ভৈরবজ্বালময় তান্ত্রিকমন্ত্র মহৌষধির জীবনবিরোধিকা শক্তির অপলাপ করিয়া সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে ভবরোগ-বিকারগ্রস্ত হইয়াও মৃত্যুঞ্জয়পদবী লাভ করিতেছেন। তাই কলিযুগের পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র যেমন উপযোগী, আবার তন্ত্রশাস্ত্রের পক্ষেও কলিযুগ তেমনই উপযোগী। প্রকৃতি পুরুষময় শিবশক্তি-জ্ঞানে অদ্বৈত-সিদ্ধি, ইহা তোমার আমার পক্ষে নূতন হইলেও সাধনারাজ্যে নিত্য-সত্যসনাতনী দৈববাণী। কুলার্ণবে—

শিবশক্তিময়ো লোকো লোকে কৌলং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং কৌলং সর্ব্বসাধারণং কথম্॥

লোকসংসার নিত্যশিবশক্তিময় অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষবিজড়িত; এ নিগূঢ়তত্ত্ব কাহারও জ্ঞানগোচর হউক বা না হউক লোকের অজ্ঞাতসারেও লোকসংসারে কৌল-ধর্ম্ম চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সার্ব্বভৌম অধিকার হেতু কৌলধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা সর্ব্বসাধারণ হইবে কিরূপে? অর্থাৎ অন্যান্য ধর্ম্মে সিদ্ধ হইলে তবে যে কৌলধর্ম্মে সাধনার অধিকার হইবে তাহা অন্যান্য সকল ধর্ম্মের সমান হইবে কিরূপে?

তান্ত্রিক সাধকসমাজ এই শিবশক্তিময় প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়াবলেই চিরকাল ভুবনবিজয়ী। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণবলে বলীয়ান্ হইয়াই সাধক শাস্ত্রান্তরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতে চাহেন না। জগন্ময় শিবশক্তিজ্ঞান যাঁহার নিত্যসিদ্ধ—তাঁহার চক্ষে জগৎ একটা অপ্রসিদ্ধ পদার্থ। সুরাসুর নরসমাজে স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, অনন্তকোটি চরাচরে "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ", "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" এই যাঁহার প্রত্যক্ষসিদ্ধি, ব্রহ্মাণ্ডময় পিতা মাতার সোহাগ যে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডেও ধরে না—সেই সোহাগে উন্মত্ত হইয়াই সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে—
এ কথা কি ভাঙ্গ্‌ব আমি হাঁড়ি চাতরে।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে,
অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে [তবু] জানকী তাঁর সমভিব্যাহারে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে,
রামপ্রসাদ বলে, বল্‌ব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে।

দ্বৈতজগতের অভ্যন্তর দিয়া অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র যে নিগূঢ় পথের আবিষ্কার করিয়াছেন, দ্বৈতকে অদ্বৈতে পরিণত করিয়া আবার সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব হইতে এই দ্বৈতলীলার অভিনয়ে যে ব্রহ্মানন্দরসস্রোতে সাধকজগৎকে ডুবাইয়াছেন —জড় ও চৈতন্যের পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে, পরমশিবপ্রেমময়ীর যে বিচিত্র মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা দেখিলেই বোধ হয়, যেন দ্বৈত অদ্বৈত দুইটি শিশু পরস্পর বিবাদ করিয়া দুই জনেই অভিমানে উন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল—মা কাহাকে আদর করেন, কাহাকে তিরস্কার করেন, জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্গ্রীব হইল—জননী অমনি উভয় অভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া উভয়কে উভয় ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন—আপন আপন সোহাগভরে উভয়েই গলিয়া পড়িল— মায়ের প্রেমে, মা-ময় হৃদয়ে, মাকে দেখিতে দেখিতে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া উভয়েই মায়ের ক্রোড়ে ঘুমাইল, মাকে পাইয়া বিবাদ বিসম্বাদ সব যেন মিটিয়া গেল। সাধক-বর্গ এইস্থানে 'তন্ত্র বেদের বিষম বিচার মাকে লয়ে' এই শীর্ষক প্রথমখণ্ড গীতাঞ্জলির শেষ সঙ্গীতটি দেখিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক অদ্বৈতবাদে অনিত্যবাদ

পূর্ব্বতন সিদ্ধ সাধকগণের অনেক চিত্রই আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইবে। এস্থানে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের দুইটি আনন্দ বিষাদ চিত্র আমরা আধুনিক ক্ষেত্র হইতেই উদ্ধৃত করিলাম—যদিও ইহা বেদান্তমতসিদ্ধ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের চিত্র নহে। তথাপি সেই ছায়ায় রচিত বলিয়া গৃহীত হইল। এরূপ গ্রহণ তন্ত্রতত্ত্বের পক্ষে সমুচিত না হইলেও ধর্ম্মবিপ্লবের বিকারে আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া সাধকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। দ্বৈত জগতের বিভীষিকাগ্রস্ত ভাবুক বলিতেছেন--

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনেও কি তা জান না॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে।
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না॥
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমোগুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না।

তান্ত্রিক সাধক মহাত্মা দিগম্বর ভট্টাচার্য্য এই গানেরই উত্তর দিয়াছেন—

ওঙ্কারে মত্ত মন অপার বাসনা,
দেহ সত্য, মন সত্য, সত্য শ্যামা-সাধনা।
শীত গ্রীষ্ম আদি হয়, আসে যায় রয় হয়,
পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা।
অতএব শুন বলি, ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি,
সত্যময়ীতথ্য লও, যাবে মিথ্যা ভাবনা।

সাধক একবার এইস্থানে উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়া লইবেন। অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন, অনিত্য যে দেহ মন জেনেও কি তা জান না? দেহ মনের অনিত্যতা জানিয়াও দিগম্বর বলিতেছেন, সংসারে অনিত্য হইলেও উপাসনা রাজ্যে দেহ সত্য, মন সত্য, সত্য শ্যামাসাধনা। দেহ মন যদি মিথ্যাই হয় তবে মিথ্যা উপকরণের সাধনায় সত্য-সনাতনী মাকে পাইব কিরূপে? আর মিথ্যা মন দিয়া তুমিই বা তোমার নিরঞ্জনকে ভাবিবে কি করিয়া? মিথ্যা সংসারের অনুসরণ করিলে যে দেহ মন মিথ্যা হইয়া যায়, সত্যতত্ত্বস্বরূপিণীর অনুসন্ধানে প্রবেশ করিলে সেই দেহের কার্য্য মনের কার্য্যই আবার সত্য হইয়া দাঁড়ায়; নতুবা তোমার

মতেও দেহ মন যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যা দেহের, মিথ্যা মনের, ভয় কেন এত সত্য হয়? তারপর অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা যাবে—একবার ভাবিলে না। এই কথাগুলি কিন্তু আস্তিকের মুখে শোভা পায় না। জগতের বার তিথি মাস আছে শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু আছে আমি যেন সে জগৎ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইব তাহার স্থিরতা নাই, জগতের আবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনশীল সমস্ত পদার্থই থাকিবে, কেবল আমিই আর থাকিব না, এই যেন আমার চরম সমাধি হইল। নাস্তিকেরা যেমন বলিয়াছেন—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে আর কি তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে? এও যেন ঠিক তাহাই। যাহাই হউক, আস্তিক সাধক কিন্তু এই অনিত্যবাদের প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া অটল হৃদয়ে বলিতেছেন, শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, আসে যায় রয় হয়, পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা কিছুই একেবারে কোথাও যায় না, যথাকার বস্তু তথাতেই থাকে, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন হইয়া আসে এইমাত্র। সংসারে সকল যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন হইয়া আসে, পুত্ররূপী জীবের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জগদম্বার করুণাও তেমনই ঘুরিয়া ফিরিয়া জন্মে জন্মে নূতন হইয়া আসে, কিছুই একেবারে চলিয়া যায় না। সাধক এইস্থানে একবার সিদ্ধভক্তের দৈবদৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া লইবেন, শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, ইহারা আসে যায় রয় হয়, কিন্তু পুত্রের সাধনা আর মায়ের করুণা ইহারা কেবলই রয়। তুমি যাহাকে অনিত্য বলিয়া জান, সেই অনিত্য জগতে সকলই অনিত্য, কেবল পুত্রের সাধনা আর মায়ের করুণাই সত্য; সেই সত্যের অধিকারে সাধকের চক্ষে অনিত্য জগৎও নিত্য হইয়া দাঁড়ায়। আবার অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমোগুণ, ভাবিলেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না। রজোগুণ তমোগুণ কেবলই সাধনার শত্রু, সুতরাং তাহাদিগকে ত্যাগ কর—যে পথে দস্যুর ভয় আছে, সে পথে চলিও না। পক্ষান্তরে ভাবিলেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না। যাঁহাকে ভাবিতে হইবে তিনি নিরঞ্জন, কোনরূপ অঞ্জন [কালিমা] তাঁহাতে নাই—একেবারে বিশদশ্বেত—সুন্দর। রজোগুণ তমোগুণ দুই-ই যেন অঞ্জনস্থানীয়, সাঞ্জন থাকিয়া নিরঞ্জনের ভাবনা হয় না, সুতরাং বুঝিলাম শুভ্র ব্রহ্মের চিন্তায় শুভ্র সত্ত্বগুণের প্রয়োজন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মায়ার মধ্যে সত্ত্বগুণ কি বন্ধন নহে? একদিন ত সে সত্ত্বগুণকেও তোমাকে ছাড়িতে হইবে। বলিবে, নিরঞ্জন ভাবিতে ভাবিতে সত্ত্বগুণ আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। আমি বলি, তোমার যে ভাবনা সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া দিতে পারে, সে কি রজোগুণ তমোগুণকে দেখিয়া এতই ভয় করে যে, তাহারা সেখানে থাকিতে নিরঞ্জনের ভাবনা একেবারে আসিতেই পারে না? ভাবুক! তোমার

ভাবনা কেবলই ভাবনাময়, তাই এত ভাবনা। রজোগুণ তমোগুণ কেবলই মিথ্যা সংসারের ভান করায়, তাই তাহাদিগকে ছাড়িতে হইবে এবং নিরঞ্জন ভাবিতে হইবে। এইস্থলেই সাধক বলেন, ভাই! যদি বীর হও—সাধনার শাণিত খড়্গ যদি হস্তে থাকে তবে দস্যুকে দেখিয়া ভয় কি? দুর্ব্বল কাপুরুষ যে, সেই দস্যু দেখিয়া ভীত হয়, তুমি অভয়ার অভয়নামে নির্ভর করিয়া জয় জগদম্বা রবে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হও, বিজয়ভৈরবীর প্রসাদে তোমার বিজয় অব্যাহত—কিন্তু দেখিও, রাজরাজেশ্বরীর রাজ্যে কাহাকেও বধ করিও না। নিজভুজবলে শত্রুকে পদদলিত করিয়া লও, তখন দেখিবে তোমার ধীর বীরদর্পে বিমুগ্ধ হইয়া সেই সকল শত্রুই আবার পুত্র মিত্র ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ দাস হইবে। তখন নিত্য অনিত্য উভয়ের লীলাখেলা একত্র দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িবে। মিথ্যা বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করিও না, তাই সাধক দিগম্বর বলিয়াছেন—'অতএব শুন বলি, ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি, সত্যময়ী তথ্য লও যাবে মিথ্যা ভাবনা'। যতক্ষণ সত্যময়ীর তত্ত্ব আসিয়া হৃদয় অধিকার না করে ততক্ষণই জগৎ মিথ্যা, কেননা জগৎ তখনও জগৎ। তাহার পর সত্যস্বরূপিণী মায়ের রূপের ছটা আসিয়া যখন হৃদয় ভরিয়া যায়, সাধকের চক্ষু যখন মা-ময় হইয়া উঠে তখন জগতের এ বিচিত্র-চিত্র মায়ের স্বরূপে মিশিয়া যায়। যে দিকে চাই, মা বই আর কিছু নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চক্ষের উপর মা নাচিতে থাকেন, তাই সাধকের চক্ষে মা-ময় জগৎ তখন সত্য হইয়া দাঁড়ায়। জগৎ যখন মা-ময় অথবা মা যখন জগন্ময়ী তখন সত্ত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ কেহই আর শত্রু নহে। কিছুই আর অঞ্জন নহে। জগৎকে অঞ্জন করিয়া জগৎ ছাড়া আর একজন নিরঞ্জন দেখিতে হয় না, অঞ্জনরুচিরঞ্জিনী ভক্তভয়ভঞ্জিনী মাকে হৃদয়ে ধরিলে অঞ্জন নিরঞ্জন যাহা কিছু তখন সে সমস্তই তাঁহার চরণাম্বুজ রঞ্জন বই আর কিছুই নহে। সাধকের প্রেমসাগরে যখন ভাবের উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিতে থাকে তখন সে তরঙ্গরঙ্গে ত্রিভুবন ডুবিয়া যায়। আর তাহারই উপরে ত্রিভুবনমোহিনীর সেই শ্যামসৌন্দর্য্যচ্ছটা আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া সাধক তখন গাহিতে থাকেন—

শ্যামা চরণ শরণ—
যে করে, সে নাহি হেরে শমনসদন।
শ্যামানামামৃত-পানে, যে মজেছে প্রাণে প্রাণে,
ধ্যানে জ্ঞানে শ্যামাময় জানে,
(তার্) জীবনে মরণে শ্যামা শমনের শমন
স্বর্গমর্ত্তের কপাট খুলে, শ্যামানামে নিশান তুলে,
সে ত শ্মশানে যায় স্ববলে, শবত্ব হয় না শিবত্ববলে,

শব হবে কি ? শত শত শব হয় তার যোগাসন।
হৃদয় পিঞ্জর মাঝে, শ্যামা পাখী যে পুষেছে,
শ্যামায় আমায় সদা হেরিছে, আমায় শ্যামায় এক করিছে,
শ্যামা ত তার আমা হয়ে প্রেমে নাচিছে তখন।
শ্যামা আমার এলোকেশী, শ্যাম করে শ্যাম অসি,
শ্যাম শিরে শোভে শ্যাম শশী, শ্যাম বদনে শ্যাম সুহাসি,
শ্যামাঙ্গিনীর শ্যাম কিরণে শ্যামাঙ্গ হয় ত্রিভুবন।
শ্যামা আত্মা শ্যামা দেহ, শ্যামা সংসার শ্যামা গেহ,
শ্যামা বই আর ভবে নাই কেহ, শ্যামা-বিকারে শ্যামাময় মোহ,
শ্যামারোগে ঔষধি তার শ্যামানাম সুধা সেবন।
নদনদী পারাবার, প্রলয়ে সব্ একাকার,
শ্যামা চরণে সব্ শবাকার, শ্যামাস্মরণে শ্যামাময় সংসার,
শবাকারে শিবাকারে শ্যামাকার দেখিব কখন্ ? (গীতাঞ্জলি)

শ্যামা আত্মা, শ্যামা দেহ—শ্যামা সংসার শ্যামা গেহ—নদ-নদী পারাবার—প্রলয়ে সব একাকার—এই দৃশ্য যাঁহার হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তিনি অদ্বৈতবাদী কি স্বয়ং অদ্বৈত তাহা সাধকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

বেদ ও তন্ত্রের ভেদ ও অভেদ

সাধক বৈদিক হউন বা তান্ত্রিক হউন আনন্দময়ীর প্রসাদে সিদ্ধ হইলে ত সকলের চক্ষেই জগৎ এইরূপ আনন্দময়, কিন্তু বিশেষ এই যে বৈদিক সাধকের ন্যায় তান্ত্রিক সাধককে সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ স্ত্রী পুত্র মিত্র ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনময় সংসারের যে ঘৃণিত বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্য্যকারণ প্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান-পরম্পরা বলিয়া তর্জনী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেছেন—ততোধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সংসারের যে বিষয়পঙ্কে লিপ্ত হইয়া তুমি আমি রসাতল যাত্রা করি, তান্ত্রিক সাধক সেই পঙ্কে ডুবিয়াও পঙ্কবিহারী মৎস্যের ন্যায় নিত্যনির্লিপ্ত। তাঁহার সেই স্বচ্ছ সুন্দর নির্ম্মল অন্তঃকরণ কিছুতেই কলুষিত বা কলঙ্কিত হয় না। ঘোরতর তরঙ্গলহরী উঠিলেও তিনি সেই 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'। বৈদিক সাধকের সিদ্ধি হইলে তিনিও তখন সংসারকে ব্রহ্ম বই আর কিছু বলেন না। তবে বিশেষ এইটুকু—

যেন বনমধ্যে অতি প্রাচীন রাজকীয় অট্টালিকার অভ্যন্তরে অনন্ত রত্নরাজি সুসজ্জিত রহিয়াছে। সেগুলিকে একবার যথেচ্ছা দর্শন বা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অট্টালিকার নিকটস্থ হইলাম। কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে যেরূপ পূতিগন্ধ উঠিতেছে, তাহাতে এক মুহূর্ত্তও তথায় অবস্থান করা কঠিন। কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকল দিকেই চাহিলাম। দেখিলাম পার্শ্বেই উপরে উঠিবার সোপান রহিয়াছে। নিম্ন ভিত্তিতে অনেক কারুকার্য্য আছে, কিন্তু যে দুর্গন্ধ তাহাতে তথাতে দাঁড়াইয়া একে একে সেই কারুকার্য্যের রচনা কৌশল দর্শন করিয়া সুখী হইব—সে সাধ্য নাই। বিশেষত কারুকার্য্য থাকিলেও তাহার মধ্যে অভ্যন্তর প্রবেশের দ্বারচিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা ধীরে ধীরে সেই সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্যক্রমে সৌধশিখরে উঠিয়া দেখিলাম, অট্টালিকা-প্রবেশের দ্বার যেন উন্মুক্ত কবাটে দর্শনার্থিগণকে আহ্বান করিতেছে। সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া আবার অভ্যন্তরস্থ নিম্ন সোপান-পরম্পরায় কক্ষে কক্ষে নামিয়া দেখিলাম—রাজাধিরাজের অতুল বৈভবের পূর্ণ পরিচয় নিজ সৌন্দর্য্যচ্ছটায় অট্টালিকার সমস্ত কক্ষ আলোকিত করিতেছে। বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে দেখিতে দেখিতে যখন নিম্ন কক্ষে অবতরণ করিলাম, অমনি দেখিলাম আমার পার্শ্বস্থিত ভিত্তি ভেদ করিয়া পক্ষদ্বারের দুইটি কবাট দুই দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল। আমার মত আর একজন দর্শক সহসা সেই দ্বার দিয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি চমৎকৃত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এখানে দ্বার ছিল তাহা ত জানি না। আমি আসিবার সময় অনেক লক্ষ্যও করিয়াছি, কিন্তু কৈ? কারুকার্য্য বই গৃহ-প্রবেশের দ্বার ত দেখিতে পাই নাই। আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন, দ্বার অবশ্য ছিল আপনি দেখিতে পান নাই, ইহাই সত্য। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি দেখিতে পাইলেন আমি দেখিতে পাইলাম না কেন? আগন্তুক বলিলেন, আপনি দক্ষিণ পথে আসিয়াছেন, আমি বাম পথে আসিয়াছি।

আমি। বাম পথে দক্ষিণ পথে বিশেষ কি?

আগন্তুক। দক্ষিণ পথের কারুকার্য্যে কেবলই ভিত্তিসৌন্দর্য্য, বাম পথে সৌন্দর্য্যের উপরে আবার দ্বারসন্ধির সম্মিলন-চাতুর্য্য।

আমি। আপনি এ চাতুর্য্য জানিলেন কিরূপে?

আগন্তুক। গুরুর উপদেশে।

আমি। গুরু জানিলেন কিরূপে?

আগন্তুক। যিনি এ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই শিল্পী-চূড়ামণির আদেশে।

আমি। ধাক্কা দিলেন আর অমনি কবাট খুলিয়া গেল, না! তালা চাবির আবশ্যক হইয়াছিল?

আগন্তুক। হইয়াছিল।

আমি। চাবি কোথায় পাইলেন?

আগন্তুক। গুরুদেব দিয়াছেন।

আমি। আপনি অমন দুর্গন্ধে দাঁড়াইলেন কি করিয়া?

আগন্তুক। দক্ষিণপথেই দুর্গন্ধ, বামপথ চিরকালই বিকশিত কুসুমের সৌরভে ও সুষমায় আমোদিত এবং আলোকিত।

আমি বিশেষ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! দুইটিই ত রাজকীয় অট্টালিকার পথ, তবে পরস্পর এত তারতম্য কেন?

আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন, বামাংশ অন্তঃপুর। যাহারা বিচারপ্রার্থী, ভিক্ষার্থী, করদাতা—তাহারাই দক্ষিণ পথের যাত্রী, তাহাদেরই অনুচিত ব্যবহারে কুসংসর্গে দক্ষিণপথের এ দুর্গতি। আর রাজসংসারের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ তাহাদেরই মধ্যে কেহ কখন রাজরাজেশ্বরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে এ পথে স্থান পায়।

আমি। রাজসংসারের সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কি?

আগন্তুক। রাণীমা আমার ধর্ম্ম-মা।

আমি। ধর্ম্ম-মা আর ধর্ম্মপুত্র, এ সম্বন্ধ ত আমাদের দেশে অতি দূরের, আপনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিলেন কি করিয়া?

আগন্তুক। আমি বলিয়াছি—আমার ধর্ম্ম-মা।

আমি। তাহাতে কি হইল?

আগন্তুক। আপনি ত বলিয়াছেন, আপনাদের দেশে ধর্ম্ম-সম্বন্ধ অনেক দূরের। আমাদের এ রাজবাটীতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধই অতি নিকট, তাই বলিতেছিলাম আপনার ধর্ম্মে মা নয়—আমার ধর্ম্মে মা।

আমি অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিলাম, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংযোগস্থানগুলি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে দেখিতে লাগিলাম—দেখিলাম রেখাগুলির পরস্পর সংযম দেখিলে কারুকরকে অজস্র ধন্যবাদ এবং নিজের অন্ধ নয়নকে সহস্র ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। পক্ষদ্বয়ের পার্শ্বভাগসকল পরস্পর এমন সংশ্লিষ্ট হইয়াছে যে, সঙ্কেত জানা না থাকিলে তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত হইবার উপায় নাই। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে ভিত্তির সৌন্দর্য্য বই আর কিছুই বোধ হয় না, অধিকন্তু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সর্পরেখা সকল দেখিলে ত সহসা বিভীষিকাই উপস্থিত হয়। যাহা হউক দেখিয়া শুনিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু মনে হইল—পথ থাকিতে এতদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া এ পণ্ডশ্রম করিলাম কেন?

সাধক! এই আমিটি বৈদিক সাধক আর ঐ আগন্তুকটি তান্ত্রিক সাধক। অট্টালিকাটি তোমার আমার এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ। অহঙ্কার মায়া মোহ মমতা

ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধ নিন্দা ইত্যাদি ইহার চতুর্দিকের পূতিগন্ধ। সাধনক্রম ইহার সোপান-পরম্পরা, সৌধশিখরস্থিত উন্মুক্ত-কবাট তত্ত্বজ্ঞান, সিদ্ধি বা ব্রহ্মবিভূতি ইহার অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি, বাম দক্ষিণ পথ তন্ত্র ও বেদ, চাবিটি গুরুদত্ত তান্ত্রিক মন্ত্র, ভিত্তির কারুকার্য্য মানবদেহের নির্ম্মাণ কৌশল, ভিত্তিস্থ কপাট মূলাধার, সর্পরেখা স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী, ইহার পর আর যাহা বুঝিবার আছে অথচ বলিবার নহে, সাধক তাহা আপনি বুঝিয়া লইবেন এই পর্য্যন্তই আমাদের ইঙ্গিত।

বৈদিক সাধক গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া ষট্‌চক্রতত্ত্ব সংস্পর্শ না করিয়া পূতিগন্ধের ভয়ে ক্ষণমাত্রও নিম্নতলে না দাঁড়াইয়া ঘোর বিরক্তি সহকারে এক উদ্যমে উপরে উঠিয়াছেন, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে পৌঁছিয়াছেন; কিন্তু আবার যখন সেই তত্ত্বমসি জ্ঞানে ব্রাহ্মণ্ডকে ব্রহ্মবিভূতিরূপে দর্শন করিতেছেন তখনই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জীবতত্ত্বে প্রবেশ করিতেছেন। পরে নিম্নতল (সংসার) কেন? তত্রত্য দুর্গন্ধময় ঘোর নরকও তাঁহার চক্ষুতে ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে। এই সিদ্ধ অবস্থার পর জগৎ তাঁহাকে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করে না। বৈদিক সাধক এইরূপে শেষে আসিয়া সংসারে ব্রহ্মবিভূতি সন্দর্শন করেন, অপরদিকে তান্ত্রিক সাধক সংসারেই ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করিতে করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সংসার পূতিগন্ধময় হইলেও তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিব্যগন্ধে আমোদিত, সংসারের সাধ্য নাই যে সে গন্ধ অভিভূত করিয়া নিজ দুর্গন্ধ তথাতে বিস্তৃত করিতে পারে। কস্তূরীমৃগ অতি কদর্য্যস্থানে গেলেও সে তাহার নিজ সৌগন্ধে পরিপূর্ণ, নৈসর্গিক নিয়মে তাহার নিজ নাভি-কুহর হইতে যোজনব্যাপী সৌরভ ছুটিতে থাকে, কাহার সাধ্য সে গন্ধের অভিভব করিতে পারে? তদ্রূপ তান্ত্রিক সাধকেরও নাভিকুহরপ্রান্তে মূলাধারবিবরে যখন কস্তূরীগন্ধ কুল-কুণ্ডলিনী মন্ত্র জাগিয়া উঠে তখন সে গন্ধে ভুবন ভরিয়া যায়, জগৎ মাতিয়া উঠে, সাধক আপন আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া সংসারময় আনন্দের ছটা বিকীর্ণ করিয়া দেন।

যদি সংসার নরক হইত তবে ত এই কথা, বস্তুত বিবেকের চক্ষুতে সংসার স্বর্গও নহে নরকও নহে, সংসার কেবল তাহাই যাহা সংসারের মূল পদার্থ। তুমি আমি ঘট কুম্ভ স্থালী কপাল যাহাই কেন না বলি, বস্তুত তাহা যেমন মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে, কটক কুণ্ডল হার কেয়ূর যাহাই কেন না বলি, বস্তুত তাহা যেমন স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, নদ নদী সমুদ্র সরোবর যাহাই কেন না বলি, বস্তুত তাহা যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ পতি পত্নী, পিতা পুত্র, আপন পর যাহাই কেন না বলি, বস্তুত এ ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি আমি তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, স্বীকার করি আর নাই করি, জগতে যত ধর্ম্ম,

যত ধর্ম্মশাস্ত্র, যত ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় আছেন, প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর—এ জলন্ত সত্যের অপলাপ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥ (চণ্ডী)

অখিলাত্মিকে! কোথাও যে কিছু সৎ বা অসৎ (চৈতন্য বা জড়) বস্তু আছে, যিনি সেই সমস্তের শক্তিস্বরূপিণী, সেই তুমি স্তবের বিষয়ীভূতা হইবে কিরূপে? সমস্ত জগৎ এই শাস্ত্রীয়তত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেই করিবে, তবে আর নরক বলিয়া দুর্গন্ধ বলিয়া ঘৃণা করিবে কাহাকে? বৈদিক পথে এই তত্ত্বজ্ঞান সাধনার ফলস্বরূপ, তান্ত্রিকপথে ইহা মূল এবং ফল উভয়স্বরূপ। বৈদিক সাধক ফলের স্বাদুতা অনুভব করিয়া শেষে মূলে জলসেচন করেন, তান্ত্রিক সাধক মূলে মিষ্টতা না পাইলেও ফলের মাধুর্য্য আকাঙ্ক্ষায় মূলে জলসেচন করেন—এইজন্য বৈদিকের বৃক্ষে মুকুলোদ্গম হইবার অনেক পূর্ব্বেই তান্ত্রিকের বৃক্ষে ফল পাকিয়া উঠে, বৈদিকের শত বৎসরে যে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই তান্ত্রিকের এক বৎসরে সে সিদ্ধি করতলস্থ হয়। এইজন্যই তন্ত্র বলিতেছেন—

কুলধর্ম্মমহামার্গে গন্তা মুক্তিপুরীং ব্রজেৎ।
অচিরান্নাত্র সন্দেহস্তস্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ॥

সংসারের যাত্রী জীব কুলধর্ম্মরূপ মহাপথে গমন করিলে অচিরাৎ মুক্তিপুরীতে প্রবেশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য কৌলধর্ম্মকে সম্যক্ আশ্রয় করিবে।

অনেকে বলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী এবং সর্ব্বভূতব্যাপিনী ইহা সকল শাস্ত্রেরই সার সিদ্ধান্ত, কিন্তু যতক্ষণ সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হয় ততক্ষণ তান্ত্রিকমতে সেইরূপ উপাসনাতে ফল কি? এরূপ আপত্তি শুনিয়া অনেক সময়েই হাসি পায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি 'তিনি সর্ব্বভূতব্যাপিনী' এ জ্ঞান যদি প্রথমেই প্রত্যক্ষ হইল তবে আর সাধনার প্রয়োজন কি? সে জ্ঞান হয় নাই বলিয়াই ত যত কিছু সাধ্য সাধনা। জ্ঞান হয় নাই বলিয়া সাধনানুষ্ঠান হইতে বিরত হইবার কথা নাই, বরং সাধনানুরাগ বর্দ্ধিত হইবারই কারণ আছে। রোগীর অরুচি হইয়াছে বলিয়া অন্ন পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে—বরং দিন দিন দুই একটি অন্ন উদরসাৎ করিয়া অভ্যাসবশে যাহাতে অরুচির অপনোদন হয়, সাধু বৈদ্যের তাহাই পরামর্শ। তন্ত্রশাস্ত্রে বৈদ্যনাথও সেই ব্যবস্থাই দিয়াছেন। রোগের অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে ভিন্ন ভিন্ন পথ্য বিহিত হইয়াছে, কিন্তু আজকাল তান্ত্রিক-সমাজে যত কিছু বিভ্রাট বিড়ম্বনা তাহার মূল কেবল ঐ পথ্যের বিশৃঙ্খলা, রোগী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কুপথ্য ভোজন করিবে—স্থানীয় চিকিৎসক যাঁহারা আছেন তাঁহারাও কোন না কোন স্বার্থের জন্য (হয়ত রোগীর অবস্থা জানিয়া শুনিয়াও)

ঐ মতে মত দিবেন, শেষে মরণের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে বাহিরের কতগুলি বাজে লোক আসিয়া বলিবে, আর কারও দোষ নয়—এ কেবল ঐ চিকিৎসাশাস্ত্রের দোষ। তদ্রূপ শিষ্যের লোভে গুরুর দোষে আজকাল সাধক-সম্প্রদায়ে যত অকালমরণ ঘটিতেছে, বাহিরের কতগুলি বাজারের লোক তাই দেখিয়া মনে করিতেছে—'কারও দোষ নয়, এ কেবল তন্ত্রশাস্ত্রের দোষ'; আবার তাই শুনিয়া অনেক বুদ্ধিমান আজকাল জিজ্ঞাসা করেন—তান্ত্রিকমতে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কি হয় না? বলিহারি সিদ্ধান্ত! আমরা বলি ঔষধ সেবন করিলেই পথ্যাপথ্যের বিচার করিতে হয়, কাজ কি অত গণ্ডগোলে? চিকিৎসা না করিলে কি হয় না? তুমি আমি শিবের দোষ দেই, শাস্ত্রের দোষ দেই, ভুক্তভোগী রোগী কিন্তু কাতরকণ্ঠে বলিতেছি—

আর কার দোষ দিব গো মা। আমি আপন দোষে আপনি মলে'ম্।
(আমি) আমার হয়ে, তোমার ক'য়ে, মিথ্যা দায়ে ধরা প'লেম্॥

প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন, রোগী ও রোগ দুই জনে যদি একদিকে হয় তবে চিকিৎসকের পিতা পিতামহেরও সাধ্য নাই যে তাহার আরোগ্য করে—কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে আজকাল রোগী রোগ এবং চিকিৎসক তিনজনেই একদিকে, এ অবস্থায় এখনও যে দুই একটি আরোগ্য পাইতেছে—ইহাও জানিও শাস্ত্রের অমোঘ উপযোগিতা!

তন্ত্র-প্রামাণ্য বিষয়ে শাস্ত্রান্তর-সম্মতি

"সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য" অগ্নি জ্বালিয়া দাও বলিয়া বায়ুকে কে অনুরোধ করিয়া থাকে? প্রধূমিত অগ্নি দেখিলে বায়ু যেমন আপনা হইতেই তাহাতে সহযোগী হইয়া গ্রাম নগর বন উপবন ভস্মসাৎ করে, কালের কুটিল প্রভাবে ধর্ম্ম-বিপ্লবের সূত্রপাত হইলেও তেমনই চতুর্দ্দিক হইতে সন্দেহ বিতর্ক অবিশ্বাস আসিয়া মানবের স্বর্গীয়বিভবপূর্ণ সুসজ্জিত অন্তঃকরণকে অধর্ম্ম-অনলে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করে। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অগ্নিসংযোগ হইলেও সেই অগ্নি ক্রমে যেমন রাজকীয় নিকেতন পর্য্যন্ত অঙ্গারময় করিয়া তোলে, ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও অন্তঃকরণে তদ্রূপ অবিশ্বাস অঙ্কুরিত হইলেও মহাধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতের হৃদয় পর্য্যন্ত তেমনই বিচলিত করিয়া তোলে। দাহ্য বস্তু নিজে দগ্ধ হয় আবার যে তাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেও দগ্ধ করে; তদ্রূপ অবিশ্বাসী পুরুষ নিজে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় আবার যে তাহার সংসর্গ করে তাহাকেও নাস্তিকরূপে পরিণত করে। এইজন্য বেদ তন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নীতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বদা

সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কালক্রমে সমাজ বহুদিন হইতে সাধুদর্শনে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, অধিকন্তু অসাধুগণ সদম্ভে সাধুর আসন আক্রমণ করিয়া নিজে প্রতারিত হইয়াও সমাজকে প্রতারিত করিতেছেন। সরোবরের তীরে বসিয়া ঋষিগণ দেবলোক পিতৃলোকের পূজা করিয়া জলমধ্যে নির্মাল্য বিসর্জ্জন দিতেন—সেই লোভে সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সলিলচারী মীনগণ দলে দলে তটসন্নিকটে আসিয়াছে—ঋষি চলিয়া গিয়াছেন, আজ যে সেই আসনে ধীবর আসিয়া জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, নির্ব্বোধ মীনদল তাহা জানে না। যাঁহারা তপস্যা করিয়া দেবতার প্রসাদ জীবজগতের কল্যাণের নিমিত্ত বিতরণ করিতেন তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছেন, আজ সেইস্থানে যাঁহারা স্বার্থজাল বিস্তার করিয়া আছেন তাঁহাদের অভিসন্ধি ভেদ করা সাধারণ সমাজের সাধ্য নহে। অধিকন্তু ইঁহারাই এক এক সম্প্রদায় এক এক শাস্ত্রের সেনাপতি। অধিকাংশ সময়ে ইঁহাদের মুখেই শুনিতে পাই তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত নাকি শাস্ত্রান্তরের সহানুভূতি নাই, সুতরাং উহা সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ প্রামাণিক শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রান্তর বলিতে প্রধানতঃ বেদ পুরাণ সংহিতা জ্যোতিষ ও তদনুবর্ত্তী ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র প্রভৃতি। রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের নিদারুণ আঘাতে সকল শাস্ত্রেরই কিয়দংশ কিয়দংশ অবশিষ্ট—আর সমস্তই লোপাপন্ন, তন্মধ্যে বিশেষ এই যে কতকগুলি অর্দ্ধলুপ্ত, কতকগুলি প্রায় লুপ্ত। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ব বেদ প্রায় লুপ্ত! তন্ত্র পুরাণ জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদের কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট। এই ভগ্নাবশেষ স্মৃতিস্তম্ভের প্রতি নির্ভর করিয়াই আজকালকার যাহা কিছু সমালোচনা। হয়ত একটি শাস্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ঘটনাক্রমে এখন হয়ত তাহার আদিভাগ মধ্যভাগ অথবা অন্তভাগের কিয়দংশ গ্রন্থ মাত্র পাওয়া যায়, সেই অংশবিশেষে যাহার উল্লেখ আছে তাহাই সেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, তদতিরিক্ত আর কিছু নাই—এরূপ মন্তব্য যে নিতান্তই অপসিদ্ধান্ত, বুদ্ধিমান মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যাহা কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে সেই ভগ্নাংশের মধ্যে তন্ত্রের প্রামাণ্য উল্লেখ থাকিলেই তন্ত্র সপ্রমাণ আর না থাকিলেই নয়, এরূপ মীমাংসাও একদেশদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতার পরিচয় মাত্র। তাহার পর এই সকল প্রচলিত শাস্ত্র যদি তন্ত্রকে কোথাও অপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলেও তন্ত্র সপ্রমাণ হইয়া উঠেন, কেন না যে শাস্ত্র তন্ত্রকে খণ্ডন করিতেছেন তিনি অবশ্যই তন্ত্রের পরবর্ত্তী—তাঁহার পূর্ব্বে তন্ত্রমত প্রচলিত না থাকিলে তিনি খণ্ডন করিবেন কাহার? আর্য্যমতে শাস্ত্রসকল অনাদিসিদ্ধ, সুতরাং কেহ কাহারও পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এখনও যাহা অবশিষ্ট এবং প্রচলিত আছে তাহার প্রায় সকল শাস্ত্রেই সকল শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই, পরস্পর পরস্পরের সহিত নিগূঢ়বন্ধনে সংশ্লিষ্ট—ইহার একটি বন্ধনচ্যুত হইলেই সমস্ত

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্র দ্বারা আর্য্যশাস্ত্রের খণ্ডন অসম্ভব। তথাপি আজকাল আমরা তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে 'শাস্ত্রান্তরের মত' বলিয়া যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখিতে পাই তাহা আর্য্যশাস্ত্রের মত নহে—অনার্য্য বুদ্ধির বৃত্তিবিকাশ মাত্র। বস্তুতঃ আর্য্যশাস্ত্রে তন্ত্রমতের বিরোধ কোথাও আছে কি না, তাহার উদাহরণস্বরূপ কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমরা সাধকবর্গের সম্মুখে উপনীত করিতেছি। ইহার দ্বারা তাঁহারাই তন্ত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রান্তরের অসম্মতি সম্মতি পরীক্ষা করিয়া লইবেন। উপনিষদের অনুবাদ—পরমশিব ভট্টারক শ্রুতি—অষ্টাদশবিদ্যা এবং সমস্ত দর্শনকে লীলা দ্বারা তত্তদবস্থাপন্ন হইয়া প্রণয়ন করিয়া সবিমতি ভগবতী স্বাত্মাভিন্না কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পঞ্চমুখের দ্বারা পঞ্চ আম্নায় পরমার্থ-স্বরূপ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভট্টারক (সর্ব্বশাস্ত্র-নিয়মকর্ত্তা) শ্রুতি-অষ্টাদশবিদ্যা (শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অষ্টাদশবিদ্যা)—ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ, যথাক্রমে চতুর্ব্বেদের উপবেদ চতুষ্টয়—আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, দণ্ডনীতি, ধনুর্ব্বেদ। বেদাঙ্গ ষট্—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ। পুরাণ—ন্যায় মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। ষড়্দর্শন—বেদান্ত যোগ সাংখ্য মীমাংসা বিশেষ ন্যায়। তত্তদবস্থাপন্ন (তত্তৎ শাস্ত্রকার ঋষিরূপে অবতীর্ণ) সবিমতি (উৎকণ্ঠিতা) ভগবতী (সচ্চিদানন্দরূপিণী) স্বাত্মাভিন্না (নিজ পরমাত্ম-স্বরূপা)।

ষট্চক্রভেদ যে তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব ইহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই, সেই ষট্চক্রভেদের আদিসূত্র উপনিষদ্ হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ বেদ-মন্ত্র পুস্তকে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। উদাহরণস্বরূপ তাৎপর্য্য মাত্র উল্লিখিত হইল—

একাধিক শত নাড়ী (শিরা) পুরুষের হৃদয়মূল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল এক সুষুম্না নাড়ী মস্তকভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, মৃত্যুকালে সেই নাড়ীর অবলম্বনে সঞ্জীবনী শক্তি ঊর্দ্ধগামিনী হইলে জীব সূর্য্যলোক দ্বার ভেদ করিয়া অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে। অন্যান্য সমস্ত নাড়ীই জীবের সংসারাবৃত্তির হেতু, একমাত্র সুষুম্নাই কেবল মুক্তিপথ।

প্রশ্নোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রেও এই তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। কালিকোপনিষদ্, তারোপনিষদ্, নারায়ণোপনিষদ্, শিবোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী প্রভৃতিতে কেবল তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি মন্ত্র ধ্যান উপাসনা ইত্যাদিরই সার-সংক্ষেপসূত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নাই। তদ্ভিন্ন, মারণ উচ্চাটন ইত্যাদি ব্যাপারের অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অথর্ব্ববেদে কথিত হইয়াছে, আবার বেদোক্ত অনেক মন্ত্রই তান্ত্রিক উপাসনায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর বেদের যে শত সহস্র শাখা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কত শত তান্ত্রিক

উপাসনাতত্ত্ব বিলীন হইয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? অন্য উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, বেদের সর্ব্বস্বসারসম্পত্তি প্রণবও যে তন্ত্রমন্ত্রাতিরিক্ত নহে—সাধকবর্গ মন্ত্রতত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন। নারদপঞ্চরাত্রে—তৃতীয়াধ্যায়ে,

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতং।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রঞ্চ বিভাব্য চ॥
কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরং।
সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুম্॥
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌষেয়বাসসং।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্॥

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধি আজ্ঞাখ্য এই ষট্‌চক্র বিভাবন পূর্ব্বক হৃদয়ে সহস্রদলপদ্মস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি-বেষ্টিত সস্মিত সুন্দর শুদ্ধ দ্বিভুজ নবীন-জলদপ্রভ পীতকৌষেয়বসন নিজপ্রভু (উপাস্যদেবতা) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

চতুর্থাধ্যায়ে—লক্ষ্মীর্মায়া কামবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং তথা।
বহ্নিজায়ান্ত-মন্ত্রঞ্চ মন্ত্ররাজং মনোহরম্॥

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র কথিত হইয়াছে।

সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোঽপি বা প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্ত-শ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥
এবং জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ।
বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে! আগমোক্তেন বা পুনঃ॥ (বরাহপুরাণ)

প্রিয়ে! চণ্ডালও যদি ভগবদ্ভক্ত হয়েন তবে তিনি সম্যক্ স্মৃত, কীর্ত্তিত, দৃষ্ট অথবা স্পৃষ্ট হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে জগৎ পবিত্র করেন। ভদ্রে! ভগবদ্ভক্তির এই অলৌকিক প্রভাব অবগত হইয়া বুধগণ বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধি দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করিবেন। কালিকাপুরাণে শারদীয়াধিকারে—

ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ।

দেবীকে দশভুজাধ্যান করিবে এবং দুর্গাতন্ত্র অনুসারে পূজা করিবে। ইহা দিঙ্‌নির্দ্দেশ মাত্র, সমগ্র কালিকাপুরাণই তন্ত্রানুগত।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে শিবকবচে ভগবান মহেশ্বরের যে সকল বীজমন্ত্র এবং মূর্ত্তি উল্লিখিত হইয়াছে সে সমস্তই তন্ত্রানুপ্রাণিত। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

অদীক্ষিতস্য বামোরু! কৃতং সর্ব্বমনর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাহীনো নরো মৃতঃ॥
বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং শ্রীগুরোর্বিনা।
বিনা শ্রীবৈষ্ণবং ধর্ম্মং কথং ভাগবতো ভবেৎ॥

বামোরু। অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত ধর্ম্মকার্য্য সমস্ত ব্যর্থ হয়। দীক্ষাহীন নর মরণের পর পশুযোনি লাভ করে। বৈষ্ণবী দীক্ষা ব্যতিরেকে, গুরুর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতিরেকে জীব ভাগবত হইবে কিরূপে? দেবীভাগবতে—

এবং সত্যযুগে সর্ব্বে গায়ত্রীজপতৎপরাঃ।
তারহৃল্লেখয়োশ্চাপি জপে নিষ্ণাতমানসাঃ॥

এইরূপে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপতৎপর এবং তার ও হৃল্লেখ মন্ত্রের জপে নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। হৃল্লেখ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র। এতদ্ভিন্ন দেবীভাগবতোক্ত উপাসনাকাণ্ড সমস্তই তান্ত্রিক বীজমালায় বিভূষিত।

মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি দক্ষং প্রতি শ্রীমন্মহেশ্বরবাক্যং —
ভূয়শ্চ তে বরং দদ্মি তং ত্বং গৃহ্লীষ্ব সুব্রত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা তদিহৈকমনাঃ শৃণু।
বেদাৎ ষড়ঙ্গাদুদ্ধৃত্য সাংখ্যযোগাচ্চ যুক্তিতঃ।
তপঃ সুতপ্তং বিপুলং দুশ্চরং দেবদানবৈঃ।
অপূর্ব্বং সর্ব্বতোভদ্রং বিশ্বতোমুখমব্যয়ং।
অব্দৈ র্দশার্দ্ধসংযুক্তং গূঢ়মপ্রাজ্ঞনিন্দিতং।
বর্ণাশ্রমকৃতৈর্ধর্ম্মৈ র্বিপরীতং ক্বচিৎ সমং।
গতান্তৈরধ্যবসিত-মত্যাশ্রমমিদং ব্রতং।
ময়া পাশুপতং দক্ষ! শুভমুৎপাদিতং পুরা।
তস্য চীর্ণস্য তৎসম্যক্ ফলং ভবতি পুষ্কলং।
তচ্চাস্তু তে মহাভাগ! ত্যজ্যতাং মানসো জ্বরঃ।
এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ সপত্নীকঃ সহানুগঃ।
অদর্শনমনুপ্রাপ্তো দক্ষস্যামিতবিক্রমঃ। (মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)

দক্ষযজ্ঞপ্রস্তাবে দক্ষের প্রতি ভগবান্ মহেশ্বরের বাক্য—হে সুব্রত! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর এবং প্রসন্নবদন ও একান্তমনা হইয়া সেই বরবার্ত্তা শ্রবণ কর। ষড়ঙ্গ বেদ এবং সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র হইতে যুক্তি পূর্ব্বক উদ্ধৃত, দেবদানবগণ কর্ত্তৃক দুশ্চর বিপুল তপস্যায় অনুষ্ঠিত, অপূর্ব্ব বিশ্বতোমুখ অব্যয়, দশার্দ্ধ (পঞ্চ) বর্ষে সম্পাদনীয় গূঢ় অপ্রাজ্ঞনিন্দিত (প্রাজ্ঞগণ কর্ত্তৃক অনিন্দিত অথবা অপ্রাজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত) বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপরীত এবং ক্বচিৎ তাহার সমান, অমৃত্যুভীত মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অধ্যবসিত আশ্রম ধর্ম্মের অতীত এই শুভ পাশুপত ব্রত পুরাকালে মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মহাব্রত সম্যক্ আচরিত হইলে যে বিপুল ফল হয়, মহাভাগ দক্ষ! সেই ব্রতের অনুষ্ঠান না করিয়াও আমার প্রসাদে তুমি তাহার ফলভোগী হও। যজ্ঞভঙ্গজন্য

মানসিক সন্তাপ পরিহার কর। অমিতবিক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষ প্রজাপতিকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া সপত্নীক এবং সহানুগ অন্তর্হিত হইলেন। সাধক মণ্ডলী বুঝিবেন, এ পাশুপত মহাব্রত তন্ত্রোক্ত কি না? এতদতিরিক্ত আরও অনেকস্থান আছে যাহা নিতান্ততন্ত্রানুগত, সমস্ত স্থানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর মহাভাগবত। জগদম্বার অধিষ্ঠান পদ্মের সহস্রদলে যাহা নিত্য-বিন্যস্ত, ভগবান বেদব্যাস যে মহাপুরাণকে তন্ত্রেরই রূপান্তর বলিয়া দর্শন এবং প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে তন্ত্রানুগত এ কথা বলাই পুনরুক্তি, উক্ত গ্রন্থের কোন একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই—আদ্যন্ত সমস্ত গ্রন্থই প্রমাণ। যোগশাস্ত্র পাতঞ্জলদর্শনে কথিত হইয়াছে—

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।

জন্মজ, ওষধিজ, মন্ত্রজ, তপোজ, সমাধিজ, এই পঞ্চপ্রকার সিদ্ধি। কেহ জন্মাবধি সিদ্ধ, কপিল প্রহ্লাদ শুক প্রভৃতি। কেহ ওষধি বিশেষের সেবনে সিদ্ধ, মাণ্ডব্যাদি ঋষি। কাহারও মন্ত্রজপের দ্বারা সিদ্ধি, সিদ্ধ সাধকবর্গ। কেহ তপোবলে সিদ্ধ, বিশ্বামিত্রাদি। কেহ বা সমাধিবলে সিদ্ধ, যোগিবর্গ।

এই পঞ্চ প্রকার সিদ্ধিই পূর্ব্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসের ফল, ইহজন্মে কেবল জন্ম ওষধি মন্ত্র প্রভৃতি কারণের সাহায্যে তাহা অভিব্যক্ত এইমাত্র। এই মন্ত্রজপ জন্য সিদ্ধি, মন্ত্র-শাস্ত্র তন্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত অসম্ভব। আবার তন্ত্রমতে ইহাও প্রধানা সিদ্ধি নহে, সিদ্ধির দ্বিতীয় অভ্যুদয়মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধামন্ত্রণ ধাতুঘটিত ঔষধ নির্ম্মাণ এবং পারদভস্ম প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল উপাসনার অনুষ্ঠান উল্লিখিত হইয়াছে সে সমস্তই তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া এবং তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রাদির অবলম্বনে বিহিত, ইহা সাধুবৈদ্য মাত্রেই অবগত আছেন, বিজ্ঞ সাধকমণ্ডলীরও তাহা অবিদিত নহে, আমরা প্রকাশ্যভাবে সে সকল বীজমন্ত্রাদির উল্লেখে অসমর্থ হইয়া বিরত হইলাম, অধিকারী অনুসন্ধিৎসুগণ উক্ত শাস্ত্রসকল অবলোকন করিলে ইহার রাশি রাশি প্রমাণ পাইবেন। জ্যোতিষে—

বিদ্যারম্ভকর্ণবেধৌ চূড়োপনয়নোদ্বহান্।
তীর্থস্নানমনাবৃত্তং তথানাদিসুরেক্ষণং।
পরীক্ষারামকূপাংশ্চ পুরশ্চরণ-দীক্ষণে।

মলমাসাদি অশুদ্ধকালে, বিদ্যারম্ভ, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, অনাবৃত্ত তীর্থে স্নান, অনাদিদেবতা দর্শন, পরীক্ষা, আরাম, কূপ, পুরশ্চরণ, দীক্ষা এই সকল কার্য্য বর্জ্জন করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র নিত্যপ্রমাণ না হইলে তন্ত্রসিদ্ধ দীক্ষা এবং পুরশ্চরণ প্রমাণ হইল কিরূপে? স্মৃতি—অগস্ত্যসংহিতা—

যদা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনো মনুং।

*   *   *   *   *

দদাতীষ্টং গৃহীতং যত্তস্মিন্ কালে গুরোর্নৃষু।

সিদ্ধি র্ভবতি মন্ত্রস্য বিনায়াসেন সেব্যতঃ।

সন্তুষ্ট এবং প্রসন্নবদন হইয়া গুরু যে কালে মন্ত্র প্রদান করেন, * * * ইত্যাদি উপক্রম করিয়া সূর্য্যগ্রহণ কালের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—সেইকালে গুরু হইতে মানব কর্ত্তৃক যে মন্ত্র গৃহীত হয়, সে মন্ত্র সাধকের অনায়াসে সিদ্ধ হয়। মহাকপিল পঞ্চরাত্রে—

এবং নক্ষত্রতিথ্যাদৌ করণে যোগবাসরে।

মন্ত্রোপদেশো গুরুণা সাধকস্য শুভাবহঃ।

উক্ত নক্ষত্র, তিথি, করণ, যোগ, বার ইত্যাদিতে গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেশ হইলে তাহা সাধকের শুভাবহ হয়। পিঙ্গলামতে—

নাধ্যাতো নার্চ্চিতো মন্ত্রঃ সুসিদ্ধোঽপি প্রসীদতি।

সুসিদ্ধ মন্ত্র অভ্যস্ত এবং অর্চ্চিত না হইলেও প্রসন্ন হয়। মন্ত্রমুক্তাবলী (অশৌচাধিকারে)—

জপো দেবার্চ্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।

নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকং বা যতাত্মনাম্।

দীক্ষিত মানবগণ যথাবিধি মন্ত্রজপ এবং দেবতার অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু দীক্ষিত যতাত্মার পাপ বা অশৌচ নাই। নারদ সংহিতোক্ত বচন—

অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাম্।

অনন্তর অশৌচবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে আগমোক্ত পূজার ব্যবস্থা কহিতেছি।

এতদ্ভিন্ন, ব্রহ্ম পুরাণ, শিব পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, মৎস্য-সূক্ত, শিবরহস্য, শিব সংহিতা, ঈশান সংহিতা, শিবধর্ম্ম শিবসূত্র ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহে এ সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। প্রতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে তন্ত্রতত্ত্বের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান দেওয়া কঠিন, এজন্য ইচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

অতঃপর যাঁহারা শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, নিয়ন্তা, স্থাপয়িতা, প্রতিশাস্ত্রের অভ্যাসে অধ্যয়নে সাধনা সিদ্ধিতে যাঁহারা গুরু-পরম্পরারূপে জগৎ-পূজিত, ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য লোকরক্ষার জন্য শাস্ত্র-প্রচারের জন্য যাঁহারা দেবীলোক দেবলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখন তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত সিদ্ধ সাধক সাধিকা ছিলেন

কিনা, প্রসঙ্গক্রমে সে কথারও উল্লেখ আবশ্যক। ইহাদের পরবর্ত্তী সাধক-সম্প্রদায়ের কথা আমরা এক্ষণে কিছু উল্লেখ করিব না, শাস্ত্র যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাই সম্প্রতি প্রদর্শনীয়।

উপাসকান্ মহাদেব শৃণুষ্বৈকমনাঃ স্বয়ং।
মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ মন্মথস্তদনন্তরং।
লোপামুদ্রা মণির্নন্দী শক্রঃ স্কন্দঃ শিবস্তথা।
ক্রোধভট্টারকশ্চৈব পঞ্চমী চ প্রকীর্ত্তিতা।
দুর্ব্বাসা ব্যাসসূর্য্যৌ চ বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
ঔর্ব্বো বহ্নির্যমশ্চৈব নিঋর্তো বরুণস্তথা।
অনিরুদ্ধো ভরদ্বাজো দক্ষিণা মূর্ত্তিরেব চ।
গণপাঃ কুলপাশ্চৈব লক্ষ্মীর্গঙ্গা সরস্বতী।
ধাত্রী শেষঃ প্রমত্তশ্চ উন্মত্তঃ কুলভৈরবঃ।
ক্ষেত্রপালো হনুমাংশ্চ দক্ষো গরুড় এব চ।
কাশ্যপঃ কৌৎসকুম্ভৌ চ যমদগ্নি র্ভৃগুস্তথা।
বৃহস্পতির্যদুশ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দ্রোণাচার্য্যো বৃষাকপিঃ।
দুর্য্যোধনস্তথা কুন্তী সীতা চ রুক্মিণী তথা।
সত্যভামা দ্রৌপদী চ উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা।
পুষ্পদন্তো মহাবুদ্ধো বালঃ কালশ্চ মন্দরঃ।
কৈলাসঃ ক্ষীরসিন্ধুশ্চ উদধি র্হিমবাংস্তথা।
নারদশ্চ মহাবীরাঃ কথিতা বীরসাধকাঃ।
মহাবিদ্যা-প্রসাদেন স্ব স্ব কর্ম্মসমাহিতাঃ। [কুল-চূড়ামণৌ]

মনু চন্দ্র কুবের মন্মথ লোপামুদ্রা মণি নন্দী শক্র স্কন্দ শিব ক্রোধভট্টারক পঞ্চমী দুর্ব্বাসা ব্যাস সূর্য্য বশিষ্ঠ পরাশর ঔর্ব্ব বহ্নি যম নিঋর্ত বরুণ অনিরুদ্ধ ভরদ্বাজ দক্ষিণামূর্ত্তি গণপগণ কুলপগণ লক্ষ্মী গঙ্গা সরস্বতী ধাত্রী শেষ প্রমত্ত উন্মত্ত কুলভৈরব ক্ষেত্রপাল হনুমান, দক্ষ গরুড় কাশ্যপ কুৎস কুম্ভ যমদগ্নি ভৃগু বৃহস্পতি যদুশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ভীমসেন দ্রোণাচার্য্য বৃষাকপি দুর্যোধন কুন্তী সীতা রুক্মিণী সত্যভামা দ্রৌপদী উর্ব্বশী তিলোত্তমা পুষ্পদন্ত মহাবুদ্ধ বাল কাল মন্দর কৈলাস ক্ষীরসিন্ধু উদধি হিমবান্ নারদ ইহারা বীরসাধক, মহাবীররূপে কথিত এবং মহাবিদ্যা-প্রসাদে ইহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে সমাহিত হইয়াছেন।

জ্ঞানার্ণবে—"বিদ্যেয়ং মনু-পূজিতা"।

মন্ত্রাধিকারে বলিয়াছেন, "উক্ত বিদ্যা মনু কর্ত্তৃক উপাসিতা"।

দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াং—'মধ্যে কঃ সূর্য্যপূজিতঃ'।

উল্লিখিত মন্ত্র সূর্য্য কর্ত্তৃক উপাসিত।

তথা—'বিদ্যাগস্ত্যপ্রপূজিতা'—এই বিদ্যা অগস্ত্য কর্ত্তৃক উপাসিতা।

মন্ত্রান্তরে—'দুর্ব্বাসঃপূজিতা ভবেৎ'—এই বিদ্যা দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক উপাসিতা।

এতদ্ভিন্ন দত্তাত্রেয় পশুরাম বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, স্বয়ং মহাকাল অক্ষোভ্য নারদ মতঙ্গ প্রভৃতি ভৈরববর্গ এবং সনৎকুমার গৌতম কপিল কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ, ইহাঁরাও সকলেই তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত এবং সিদ্ধ। ইহাঁরা দীক্ষিত বলিয়া অন্য সকলে অদীক্ষিত এরূপ নহে। ঘটনাচক্রের ইতিহাসে যাঁহারা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, শাস্ত্র প্রধানতঃ তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন এই মাত্র। যে সকল নাম উল্লিখিত আছে, তাহার মধ্যেও এই একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রমাত্রই উদ্ধৃত হইল। এক কথায় বলিতে গেলে আর্য্যশাস্ত্রে পুরাণ ইতিহাস স্মৃতি সংহিতায় যাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন, তাঁদের মধ্যে এমন পুরুষ অতি বিরল, যিনি তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন। মহাকাল অক্ষোভ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সীতা রুক্মিণী প্রভৃতি ইহাঁরাও তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের মহিমা ক্ষুদ্র হইয়া গেল, তোমার আমার মহিমার মত এক গণ্ডূষ মহিমা মাত্র তাঁহাদের সম্বল নহে যে, কথায় কথায় মহিমা শুকাইয়া যাইবে। অবাতবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রবৎ অনন্ত-প্রসারিত অগাধ গম্ভীর যে মহিমা, দুই এক তরঙ্গের উপচয়ে অপচয়ে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প। অন্যের উপাসনা করিলে তবে ত মহিমার খণ্ডন হইবে? তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও অন্য নহেন, তোমায় আমায় কথা হইতেছে তাই বাধ্য হইয়া 'তাঁহাদের' বলিতে হইতেছে, বস্তুতঃ পরমার্থতঃ একমাত্র 'তাঁহার' ভিন্ন, 'তাঁহাদের' এ কথাও অসম্ভব, তুমি আমি যাঁহাকে কালী বা কৃষ্ণ, হরি বা হর বলিয়া জানি, সাধক! নিশ্চয় জানিও, তোমার আমার সেই তিনিই নিজলীলার মাধুর্য্যরসে অধীর হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ ঢালিয়া দিবার জন্যই এক ব্রহ্ম পঞ্চরূপে বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ধার করিতেছেন, তিনি একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, বিশ্বপ্রপঞ্চ লইয়া তিনি এক অদ্বিতীয়, ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার দ্বিতীয় নাই, তিনি কোন্ দ্বিতীয়ের উপাসনা করিবেন? যখনই তিনি যে লীলায় যে অবতারে যে রূপে যে উপাসনা করিয়াছেন, তখনই জানিবে, তাহা কেবল বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণের তপস্যা, হিমালয়ে জগদম্বার পঞ্চতপঃ, বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পূজা, শ্রীরাধিকার কাত্যায়নী-ব্রত, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণকালী-পূজা এবং বেদব্যাসের নিকটে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাদেবের উপাসনা বই আর কিছুই নহে—"নমশ্চক্রেঽহমনাত্মনে" তিনি আপনি আপনাকে প্রণাম করিয়াছেন, তাহা পরের উপাসনার জন্য নহে, জগতে মন্ত্রবল, তপোবল, ধর্ম্মবল প্রচার করিবার জন্য।

ধর্ম্মজগতে যখন যে শক্তি প্রচার করিবার আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি পথপ্রদর্শকরূপে স্বয়ং সে শক্তির সাধনে সিদ্ধ হইয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সিদ্ধির উপাদানস্বরূপে উপাসনাকে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। ভগবান গুরুহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আপনি আপন মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার মহিমার লাঘব হয় না। পিতা মাতাকে কিরূপে প্রণাম করিতে হইবে, তাহা পিতা মাতা নিজে প্রণাম করিয়া দেখাইয়া না দিলে পুত্র শিক্ষা করিবে কাহার নিকটে? তাই জগতের পিতা মাতা আপন প্রণাম আপনি করিয়া জগৎকে শিখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে এইরূপে। মহাদেবের তপঃসিদ্ধি এবং তারকাসুর বধের নিমিত্ত নগেন্দ্রের নন্দিনী হইয়া গোপীগণের তপঃসিদ্ধি এবং কংসাদির বধার্থ নন্দের নন্দন বা নন্দিনী হইয়াও তাঁহার যেমন পূর্ণ ব্রহ্মত্বের হানি হয় নাই ব্রহ্মাণ্ডে মন্ত্রশক্তি প্রচার করিবার জন্য তান্ত্রিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনায় সিদ্ধ হইয়াও তেমনই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গ বা মাহাত্ম্য খণ্ডিত হয় নাই।

অতঃপর দত্তাত্রেয় গৌতম সনৎকুমার কপিল নারদ প্রভৃতি ঋষিবর্গ যে তান্ত্রিক ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ, দত্তাত্রেয় সংহিতা, গৌতম তন্ত্র, সনৎকুমার তন্ত্র, কপিল-পঞ্চরাত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। সাধক-সম্প্রদায়-মধ্যে মহর্ষি কাত্যায়ন বোধহয় কাহারও অবিদিত নহেন। যাঁহার উগ্রতপস্যা প্রভাবে মহিষাসুরবধার্থ দেবী আশ্বিনের শুক্লা-ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বিল্বমূলে স্বয়ং তেজোময়ী কুমারী মূর্ত্তি অবলম্বনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই হইতে মহিষমর্দ্দিনী কাত্যায়ন-কুমারী বলিয়া কাত্যায়নী নামে শরৎকালে ত্রিজগৎ-পূজিতা। এই কাত্যায়ন ঋষিই যজুর্ব্বেদের গৃহ্যকর্ত্তা।

তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রাধান্য

এইরূপে সৃষ্টিপ্রপঞ্চে আদি পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রলয়ের উপান্তকাল পর্য্যন্ত সাধনা-রাজ্যে নিখিল বিশ্বচরাচর যে তন্ত্রশাস্ত্রের ভুজচ্ছায়ায় জীবিত এবং রক্ষিত আজ সেই তন্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে শাস্ত্রান্তরের মতামতের অপেক্ষা আছে, ইহা মনে করাও যেন মহাপাতকের পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। স্মৃতি সংহিতা পুরাণ দর্শনকারগণ যুগ যুগান্ত কঠোর তপস্যা করিয়াও যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণে ভীত প্রণত ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছেন—'তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ, কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে!' অয়ি সকল-নিগমাগোচরগুণে! তোমার যে সৌন্দর্য্য পরমশিবের দৃষ্টিমাত্রের বিষয়, মা! আমরা তাহা বলিব কি করিয়া? আবার বলিয়াছেন—

ভবানি! স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভি র্ন বদনৈঃ
প্রজানামীশান-স্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্ভিঃ সেনানী র্দশশতমুখৈ-রপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ॥

ভবভাবিনি মা! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্ব্বদনে, ত্রিপুরমথন পঞ্চবদনে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ষড়াননে এবং অহিপতি অনন্তদেব সহস্রবদনেও তোমার যে গুণমহিমা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, বল মা! তাহাতে অন্য কাহার সামর্থ্য সাহস হইবে? পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুর-তরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

অঞ্জন-পর্ব্বতের সমান যদি কজ্জল হয়, সিন্ধু যদি তাহার পাত্র হয়, কল্প-বৃক্ষের অক্ষয় শাখা যদি লেখনী হয়, এই বিশালবিস্তৃত ধরিত্রীমণ্ডল যদি লেখার পত্র হয় আর সেই লেখনী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সরস্বতী যদি অনাদি অনন্ত কাল-পরম্পরায় লিখিতে থাকেন, হে ঈশ! তথাপি তিনি তোমার গুণের পরপারে যাইতে অসমর্থা। যিনি এইরূপে জীবজগতের অবাঙ্মানসগোচর, ত্রিভুবন যাঁহার করুণা কটাক্ষের ভিখারী, যোগী ঋষি মুনি সিদ্ধ সাধু সাধকগণ যাঁহার দাসানুদাস বলিয়া জগৎ-পূজিত, আজ সেই শিবশক্তির বাক্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রমাণ কি না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আবার সেই সকল ঋষিবাক্যের মতামতের অপেক্ষা করিতে হইবে, নগরপালের মত লইয়া সম্রাটের শাসন পরীক্ষা করিতে হইবে—এ বড়ই বিষম পাণ্ডিত্য! পণ্ডিত! তোমার এ পাণ্ডিত্য রাখিয়া দাও, ইহাতে অপমান হইবে না, আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, পণ্ডা বুদ্ধি লইয়া জগতে যদি কেহ আসিয়া থাকে তবে তুমিই তাহার অগ্রগণ্য।

তোমার আমার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবাদ বির্তক সংশয় সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিন্তু যাঁহাদিগের কথায় সংশয় নিরাকরণ হইবে কোন শাস্ত্রেও তাঁহাদিগের ত এ সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তিও দেখিতে পাই না। 'তন্ত্রশাস্ত্র প্রমাণ কি না' এমন প্রশ্ন ত কোথাও নাই, তুমি বলিবে, তাঁহাদের হয়ত এমন সার্ব্বভৌম দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু আমি বলিব, 'হয় ত' নহে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের এমন নাস্তিক্য—প্রকৃতি ছিল না। তুমি আমি ব্রাহ্মণের কুমার হইয়া আজ সংসর্গদোষে চণ্ডাল সাজিয়াছি, তাই পিতা মাতার চরণতলে মস্তক প্রণত করিতে অপমান বোধ হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণের কুমার ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই চণ্ডালস্বভাব-সুলভ নাস্তিকতার প্রশ্ন তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

যেখানে প্রশ্ন নাই, সেখানে উত্তর হইবে কাহার ? বার্ষিক করপ্রদানের সময় প্রজাগণ যেমন নির্ভয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করে কিম্বা কোন অনিবার্য্য বিপদ্ উপস্থিত হইলে রাজার দোহাই দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয় তদ্রূপ উপাসনাকাণ্ডের অধিকারে অথবা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যে কোন দুর্নিবার বিপদ্ উপস্থিত হইলেই সেই সময়ে সমস্ত শাস্ত্র তন্ত্রের দ্বারে দাঁড়াইয়া তন্ত্রের দোহাই দিয়া লোকরক্ষার উপদেশ করিয়াছেন, সময়ান্তরে লোকাচার বর্ণধর্ম্ম ইতিহাস ইত্যাদির বর্ণন উপস্থিত হইলেই রাজবার্ত্তার ন্যায় গুরুগম্ভীর দুষ্প্রবেশ-বোধে সভয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাই কথায় কথায় তন্ত্র লইয়া তাঁহাদের এত আন্দোলন নাই, ইহা অবিশ্বাসের কারণ নহে, পূর্ণভক্তির পরিচয় মাত্র।

'তন্ত্র তন্ত্র' বলিয়া বঙ্গদেশেই আজকাল দুই একটা যাহা কর্কশ চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্‌ভিন্ন মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে পুত্র যেমন 'পিতা' এই বিশেষণ ভিন্ন পিতার নিজনাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার উল্লেখ করেন না তদ্রূপ তন্ত্রের নাম তন্ত্র হইলেও কেহ তাহাকে মন্ত্রশাস্ত্র ভিন্ন বলেন না—তাহার অর্থই এই যে, পুরুষ-মাত্রেরই ঈশ্বরোপাসনা নিত্য-কৃত্য, উপাসনা করিতে হইলেই মন্ত্রের প্রয়োজন। মন্ত্রের প্রয়োজন হইলেই মন্ত্রশাস্ত্রের আশ্রয় অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রের বাক্য, ঋষিগণের জীবন, আবহমান কালপরম্পরায় লোকজগতের আচার-প্রবাহ, এ সকল নিত্য-সিদ্ধ প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা বলিবেন—অপ্রমাণ, শাস্ত্রের দাস হইয়া আমরাও তাঁহাদিগকে বলিব—

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণম্॥

বেদ সমস্ত প্রমাণ, স্মৃতি সমস্ত প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য প্রমাণ, এ সকল প্রমাণ যাহার প্রমাণ নহে, তাহার বাক্যকে কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে ? শাস্ত্রান্তরের সমন্বয়ে এই পর্য্যন্ত প্রমাণই যথেষ্ট, কিন্তু বিতর্কবাদীর সমন্বয়ের পন্থা স্বতন্ত্র। কলিযুগের এই স্বভাবসুলভ সংশয়সঙ্কট স্মরণ করিয়াই সর্ব্বনিয়ন্তা তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালোরেব সর্ব্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ॥

অশ্রদ্ধালু পুরুষের অবিশ্বাস উদাহরণ হইতে পারে না অর্থাৎ অবিশ্বস্ত ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তাহাতে কোন ফল প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তাহা দৃষ্টান্ত নহে। কেন না বেদোক্ত সকল কার্য্যেই শ্রদ্ধালু পুরুষের অধিকার। যে কোন কারণেই হউক আমি বিশ্বাস করিলে তবে শাস্ত্র তাহার ফল দিতে বাধ্য কিন্তু তন্ত্রের নিকটে এই কথাটি অন্যরূপ, কেন না, আমি আতিপাষণ্ড

মহানাস্তিক হইলেও তন্ত্রকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। বেদ মানি না শাস্ত্র মানি না, ঈশ্বর পরলোক ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বর্গ নরক কিছু মানি না, তথাপি তন্ত্রকে না মানিয়া থাকিতে পারি না।

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ (শাস্ত্র) এই তিন প্রধান প্রমাণের মধ্যে নাস্তিকগণ অনুমান এবং শব্দকে না মানিলেও প্রত্যক্ষকে অবনত মস্তকে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—আমি অতি বড় নাস্তিক হইলেও তন্ত্র সেই প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, তাঁহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। 'নহি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে' বস্তুর শক্তি কখনও বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। হয় তুমি বিশ্বাস কর না হয় অবিশ্বাস কর, ঔষধের শক্তি আছে রোগের বিনাশ করিবেই করিবে, সে তোমার বুদ্ধির অপেক্ষা করে না ; অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলেই সে তাহা দগ্ধ করিবে, অগ্নি কাহারও বিশ্বাস অবিশ্বাসের মুখাপেক্ষী নহে। তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেরও প্রত্যক্ষফল সিদ্ধি স্বাভাবিক-শক্তিসম্ভূত, তুমি আমি বিশ্বাস করি আর নাই করি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলেই তন্ত্রশাস্ত্র তাহার প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিবেন, তোমার আমার মত লক্ষ লক্ষ নাস্তিক একত্র বদ্ধপরিকর হইলেও তাহা রুদ্ধ হইবার নহে। যুক্তি বল, প্রমাণ বল, বিচার বল, সিদ্ধান্ত বল, নিজ ভুজবীর্য্য বলে তন্ত্র ইহার কাহাকেও কার্য্যকর বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। শাস্ত্র সমস্ত তন্ত্রের অনুকূল ব্যবস্থা দিয়া নিজ নিজ সম্মান রক্ষা করিয়াছেন মাত্র, নতুবা সমস্ত নদী অভিমানিনী হইয়া বিমুখী হইলে সমুদ্রের যেমন তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধবাদী হইলেও তন্ত্রের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প।

যূথে যূথে মত্তমাতঙ্গ সজ্জিত করিয়া মৃগেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হও, কিন্তু কেশরীর সেই স্তনিতস্তোমসংস্তম্ভী নিনাদের প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন কে কোথায় পলায়ন করিবে তাহার সন্ধান থাকিবে না তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রকে একদিকে দণ্ডায়মান করিয়া তন্ত্রকে অন্যদিকে রাখিয়া দাও, দেখিবে তন্ত্রের মন্ত্রময় সান্দ্রগম্ভীর প্রত্যক্ষ হুহুঙ্কারে কে কোথায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ধাবিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে তাহার নির্ণয় থাকিবে না। মন্ত্রশক্তির এই নিত্যপ্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রভাবে তন্ত্র এবং তন্ত্রের উপাস্য দেবতা নিত্যজাগ্রত। সেই ব্রহ্মাণ্ডবুদ্ধির বিভ্রামিণী আন্তর্যামিনী দেবতা যাহার বাগ্বাদিনী, কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখে কূট কুতর্কের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া নিস্তার পাইবে ? অনুমানের কপোল কল্পনা চিরকালই প্রত্যক্ষের পদদলিত—তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—

কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ।
প্রত্যক্ষঞ্চ প্রমাণায় সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে।

উপলব্ধিবলাত্তস্য হতাঃ সর্ব্বে কুতার্কিকাঃ।
পরোক্ষং কো নু জানীতে কস্য কিম্বা ভবিষ্যতি।
যদ্বা প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তমদর্শনম্। (কুলার্ণব)

কুলশাস্ত্র নিত্য প্রমাণ, যেহেতু, তাহা প্রত্যক্ষফলপ্রদ, নাস্তিক তার্কিক দূরে থাক্, প্রত্যক্ষ বিষয় পশু পক্ষী ইত্যাদি প্রাণিমাত্রের পক্ষেও প্রমাণ, সেই প্রত্যক্ষফলের উপলব্ধিবলে তন্ত্রের নিকট সমস্ত কুতার্কিক হত হইয়াছে। পরোক্ষে (জন্মান্তরে) কাহার কি হইবে তাহা ইহলোকে কে জানে, যাহা ইহলোকে প্রত্যক্ষফলপ্রদ, দর্শনের মধ্যে তাহাই উত্তম দর্শন।

শাস্ত্রের আজ্ঞা ত এই পর্য্যন্ত, কিন্তু যখন লোকসমাজে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিয়াও কোন ফল হয় না তখনই লোকের মনে নানা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা কিন্তু এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে বড়ই সুখী হই, কেন না, লোকে বলে ফল হয় না, আমরা দেখি, ফলের ত কোন অভাব নাই। স্বস্ত্যয়নে অভিচার ঘটে ইহা কি ফল নহে ? তোমার আমার কপালদোষে আমের গাছে আমড়া ফলে অথবা বুদ্ধির দোষে তুমি আমি আমড়ার গাছে আম চাই, তাই এত ফলাফলের বিড়ম্বনা। 'যথাশাস্ত্র কর্ম্ম করিলাম' বলিয়া তোমার আমার যাহা বিশ্বাস বস্তুতঃ তাহাই আমাদের দুরভিমান, শাস্ত্র এবং দেবতা সে ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই বিপরীত ফল দিয়া আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন, আমরা মনে করি 'হায় হইল কি ? বিশ্বাস যে টালিয়া গেল,' কিন্তু বুঝিতে গেলে—কুবিশ্বাস উড়িয়া গেল। যথাশাস্ত্র দেশ নাই, কাল নাই, পাত্র নাই, অথচ 'যথাশাস্ত্র' বলিয়া অনর্থক আব্দার আছে, শাস্ত্র এ অপবাদ সহ্য করিবেন কেন ? শাস্ত্রের আজ্ঞা মহানিশায় পূজা করিতে হইবে, তুমি হয়ত রাত্রি জাগরণের ভয়ে কিম্বা মহাপ্রসাদের প্রসাদে মহাপ্রদোষেই পূজায় বসিয়া গেলে, তবে আর যাহার আরম্ভ মহাপ্রদোষে তাহার উপসংহার মহাপ্র-দোষে না হইবে কেন ? এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা ন বা কেন প্রজপ্যতে।
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবাভাবাৎ প্রজায়তে।

মহাবিদ্যার পূজাই বা কে না করে ? তাঁহার মন্ত্রই বা কে না জপ করে কিন্তু কেবল এক ভাবের অভাবেই নিয়ত ফলের অভাব ঘটে। তদ্ভাবভাবিত অন্তঃকরণে তাঁহার আরাধনা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাব কি তাঁর ধর্‌তে পারে ?

বস্তুতঃ এই সকল আত্মগত অভাবে মন্ত্র বা দেবতার প্রতি সন্দেহ করা মহামূঢ়ের কার্য্য, জলসেচনে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার দাহিকাশক্তি নাই মনে করা বড়ই

মূর্খতা, তদ্রূপ শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করাও ঘোর মহাপাপ। কলহের জয় পরাজয়ে আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপন করা চিরকালই দুর্ব্বল স্ত্রী-প্রকৃতির কার্য্য, কিন্তু পুরুষের কার্য্য বাহুবলে দিগ্বিজয়, তদ্রূপ তর্ক বিচার মীমাংসা অন্য শাস্ত্রের কার্য্য হইলেও তন্ত্রের কার্য্য নিজমন্ত্রশক্তিবলে লোকাতীত দৈবঘটনার অবতারণা। মারণ উচাটন বশীকরণ প্রভৃতি ব্যাপার সকল এখনও নিত্য-প্রত্যক্ষ, এখনও লক্ষ লক্ষ তান্ত্রিক সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ তপঃ-প্রভাবে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বলিত করিয়া রহিয়াছেন, এখনও ভারতের শ্মশানে শ্মশানে প্রতি অমাবস্যার ঘোরঘোর মহানিশায় প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব ভৈরবীগণের জ্বলন্ত দৈবজ্যোতিঃ নৈশ-তমস্তরঙ্গ বিদার্ণ করিয়া গগনাঙ্গন আলোকিত করে, এখনও শ্মশানের জলমগ্ন মৃত পর্য্যুষিত শবদেহ সাধকের মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে পুনর্জাগ্রত হইয়া সিদ্ধি সাধনার সাহায্য করে, এখনও তান্ত্রিক যোগিগণ দৈবদৃষ্টি-প্রভাবে এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াই দেবলোকের অতীন্দ্রিয় কার্য্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এখনও ভবভয়ভীত প্রণত শরণাগত ভক্তসাধককে মুক্ত করিবার জন্য ভক্তভয়-ভঞ্জিনী মুক্তকেশী মহাশ্মশানে দর্শন দিয়া থাকেন, এখনও ব্রহ্মময়ীর সেই ব্রহ্মাদিবন্দিত পদাম্বুজে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থাপন করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপে মিশিয়া যান, এখনও মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত আকর্ষণে পর্ব্বতনন্দিনীর সিংহাসন টলিয়া থাকে। মুক্তিপুরীর অশান্তযাত্রী সাধকের চক্ষুতে ইহাই চিরপ্রশস্ত রাজপথ, শয্যাশায়ী মুমূর্ষু অন্ধের পক্ষে হয়ত তাহা অন্ধকার বই আর কিছুই নহে, কিন্তু অন্ধ! নিশ্চয় জানিও এ অন্ধকার তোমারই নয়নপথে।

আর একটি কথা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে। শিক্ষিত সমালোচক নামে বঙ্গদেশে একজাতীয় উচ্চশ্রেণীর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক, পৃথিবীর বয়ঃক্রম সর্ব্ব সমষ্টিতে ৫ হাজার বৎসর, তাহার মধ্যে ৩ হাজার বৎসর মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে কাহারও মতে পূর্ব্বপুরুষেরা বানর ছিলেন, কাহারও মতে ভেক ছিলেন এই সমস্ত যাঁহাদের প্রাচীন তত্ত্বোদ্ধার তাঁহাদের মতে তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক হইবে ইহা একটা কিছু অতিরিক্ত কথা নহে। আমরাও তাঁহাদের মতের বিরোধী বা অবিশ্বাসী হইতে পারি না, বিশ্বাস করিব না মনে করিলেও বুদ্ধি স্বত এব বিশ্বাস করে, কেন না পূর্ব্বপুরুষগণের সেরূপ দশা না হইলে আর পরবর্ত্তী পুরুষগণের সিদ্ধান্ত কেন এরূপ হইবে? হা বিধাতঃ! মনুর সন্তানগণের যে এমন করিয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয়, বর্ণবিপর্য্যয় ঘটিবে, ইহা তুমিও কখনও স্বপ্নে মনে করিয়াছ কিনা জানি না! সুসংস্কারই হউক আর কুসংস্কারই হউক, আমরা কিন্তু এখনও বলিয়া থাকি—

যাবন্মেরুস্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবত্তাবদ্ ব্রহ্মকুলে বয়ম্ ॥

সৃষ্টিকালে যে অবধি দেবগণ সুমেরুশিখরে সপ্তস্বর্গে অবস্থিত হইয়াছেন, সেই হইতে আমরা (ব্রাহ্মণগণ) ব্রহ্মকুলে রহিয়াছি। স্থিতিকালে যতদিন গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে আছেন ততদিন আমরা ব্রহ্মকুলে আছি। সংহারকালে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য গগনকক্ষে দেদীপ্যমান থাকিবেন সেই পর্য্যন্ত আমরা ব্রহ্মকুলে থাকিব। শাস্ত্রই ব্রাহ্মণের জীবন, সুতরাং ব্রাহ্মণের অবস্থান আর শাস্ত্রের অবস্থান একই কথা। তিন হাজার বৎসর হইতে যাহাদের মানুষ সৃষ্টি তাহাদের মতে আধুনিক হইতে হইলে বোধ হয় শতাবধি বৎসর তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন বুদ্ধিমানগণ বিবেচনা করিবেন, এই শতাবধি বৎসরের অভ্যন্তরে নাস্তিকের দ্বন্দ্বযুদ্ধে চারি পাঁচটি উপধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ব্যাপিয়া উদয়াচল হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তাচল পর্য্যন্ত চীন মহাচীন নেপাল কাশ্মীর দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধ পঞ্চাল উৎকল প্রভৃতি দেশ মহাদেশময় ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রতি নর নারীর কর্ণকুহরে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচার হইয়া গিয়াছে। ধন্য সমালোচনা! পরিণামদর্শী বৃদ্ধ বৈয়াকরণগণ এইজন্যই সমালোচনার প্রথমে অন্য কোন উপসর্গ না দিয়া "সং" এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতিহাসবিজ্ঞ সমালোচক! কি আর বলিব? বলিহারি! তোমার সাহস!

আর একটি দুঃখের কথা। উপাসক মণ্ডলী মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কাহারও কাহারও এমন বিশ্বাস আছে যে, তন্ত্র কেবল শৈব শাক্তগণেরই উপাসনা-শাস্ত্র এবং উহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কথার উত্তর আমরা কি করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের নিকটেই কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি, তন্ত্র কোন্ তন্ত্র? তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুদের নিকটে যে তন্ত্রের নাম শুনিয়া থাকেন তাঁহার নাম স্ব-তন্ত্র আর যাহা শাস্ত্র তাহার নাম তন্ত্র। পূর্ব্বেই তন্ত্রলক্ষণে উক্ত হইয়াছে 'মতং শ্রীবাসুদেবস্য' যাহা স্বয়ং বাসুদেবের অভিমত তাহাতে প্রকৃত বৈষ্ণবের আপত্তি হইবার ত কোন কথাই নাই। তবে যাঁহাদিগকে লইয়া আপত্তি তাঁহাদিগকেও বলিবার কিছু নাই—কেন না তাঁহারা প্রভু, ইঁহারা যখন ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন তখন বোধ হয় বৈষ্ণবেরই প্রভু, আবার যখন তন্ত্র খণ্ডন করিতে বসেন তখন বোধ হয় যেন বিষ্ণুরও প্রভু নতুবা প্রভুর প্রভু না হইলে আর প্রভুবাক্য খণ্ডন করিতে সাহস হইবে কেন? তাঁহারা যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবতার অভিমানে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি কূটদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তন্ত্রশাস্ত্র যদি বৈষ্ণবের বিরোধী হয় তবে জিজ্ঞাসা করি এ বিষ্ণুমন্ত্র তাঁহারা পাইলেন কাহার প্রসাদে? ফলতঃ তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করা বড়ই নাস্তিকতার পরিচয়। জানি

আমরা, সাধু সাধক বৈষ্ণবগণ কখনও তন্ত্রের বিদ্বেষী নহেন—তথাপি যাঁহাদের এরূপ ভ্রম আছে তাঁহাদের জন্য স্বয়ং তন্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহারও প্রদর্শন প্রয়োজন। তন্ত্র বলিতেছেন, কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা। কলিযুগে কেবল কালী, কলিযুগে কেবল কৃষ্ণ গোপাল আর কালিকা, ইঁহারাই কলিযুগে জাগ্রদ্দেবতা।

মহাকালী মহাকাল-শ্চণকাকার-রূপতঃ।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং তন্মধ্যে সমভাগতঃ॥
মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এব হি।
মহাব্রহ্মা স এবাত্মা নামমাত্র-বিভেদকঃ॥
একমূর্ত্তি-স্ত্রিনামানি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
নানাভাবে মনো যস্য তস্য মোক্ষো ন বিদ্যতে॥

মহাকালী এবং মহাকাল চণকাকারে অবস্থিত। চণকের যেমন উপরিভাগে আবরণ এবং অভ্যন্তরে সমভাগে বিভক্ত পরস্পরসংশ্লিষ্ট দ্বি-দল, পরব্রহ্ম-তত্ত্বও তদ্রূপ বহির্ভাগে মায়ার আবরণে আবৃত এবং অভ্যন্তরে শিব-শক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই শিব-শক্তিরূপে পরমাত্মাই মহারুদ্র, মহাবিষ্ণু, মহাব্রহ্ম। এক ব্রহ্মপদার্থই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামত্রয়ে অভিহিত এবং বিভিন্ন, কিন্তু এই নানা নামে নানা মূর্ত্তিতে নানা ভাবে যাহার মন ধাবিত হয় তাহার মুক্তি নাই। মুণ্ডমালাতন্ত্রে, ষষ্ঠপটলে—

যাবন্নানাত্মভাবশ্চ তাবদেবং পৃথগ্বিধং।
তাবৎক্রিয়া পৃথগ্‌ভাবা তাবন্নানাবিধা মতাঃ॥
তাবদ্ ভিন্নাশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ বহ্নির্ব্বরুণ এব চ॥
কুবেরশ্চাপি দিক্‌পালা এতৎ সর্ব্বং পৃথক্ পৃথক্।
তাবন্নানাবিধা চেষ্টা স্ত্রী-পুং-নপুংসকাত্মিকা॥
তাবদ্বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি! তুলসীদলাৎ।
তাবজ্জবাদ্রোণকৃষ্ণা করবীরাণি ভূতলে॥
বিভিন্নানি চ দেবেশি! সত্যং বৈ তুলসীদলাৎ।
তাবদ্দিব্যশ্চ বীরশ্চ তাবত্তু পশুভাবকঃ॥
তাবত্তন্ত্রে ভেদবুদ্ধিস্তাবদ্দেবে পৃথক্ ক্রিয়া।
হরৌ হরে ভেদবুদ্ধির্জায়তে জগদম্বিকে॥
করালবদনা কালী শ্রীমদেকজটা শিবে।
ষোড়শী ভৈরবী ভিন্না ভিন্না চ ভুবনেশ্বরী॥

ছিন্না ভিন্না ত্বন্নপূর্ণা ভিন্না চ বগলামুখী।
মাতঙ্গী কমলা ভিন্না ভিন্না বাণী চ রাধিকা॥
ভিন্না চেষ্টা ক্রিয়া ভিন্না ভিন্ন আচারসংগ্রহঃ।
যাবদৈক্যং পাদপদ্মে ভবান্যা নৈব জায়তে॥
অদ্বৈতে তারিণীপাদ-পদ্মে পরমপাবনে।
জ্ঞানসারে সমুৎপন্নে হৃৎপদ্মনিলয়ে তথা॥
ঐক্যং ভবতি চার্ব্বঙ্গি! সর্ব্বজীবেষু শঙ্করি!

দেবেশি। যতদিন পর্য্যন্ত নানা জীবে নানা আত্মার ভাবনা ততদিন পর্য্যন্তই জগৎ পৃথগ্-বিধ। সেই পর্য্যন্তই ক্রিয়াসকল পৃথক্, ভাবসমস্ত নানাবিধ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাবৎকাল পর্য্যন্তই পরস্পর বিভিন্ন। গণেশ দিনেশ বহ্নি বরুণ কুবের দিক্‌পাল এ সমস্তও ততদিনই পৃথক্। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ভেদে সেই পর্য্যন্তই নানাবিধ চেষ্টা। দেবেশি! সেই পর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে বিল্বদল বিভিন্ন, সেই পর্য্যন্তই তুলসীদল হইতে ভূতলে জবা দ্রোণ অপরাজিতা ভিন্ন। সেই পর্য্যন্ত দেবতাভেদে উপাসনার ভেদ, জগদম্বিকে! সেই পর্য্যন্তই হরিহরে ভেদবুদ্ধি। শিবে! করালবদনা কালী, শ্রীমৎ একজটা (তারা), ষোড়শী, ভৈরবী ইহারাও সেই পর্য্যন্তই পরস্পর বিভিন্না, সেই পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরী ভিন্না, ছিন্নমস্তা ভিন্না, অন্নপূর্ণা ভিন্না, বগলামুখী মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ভিন্না, সেই পর্য্যন্তই সরস্বতী এবং রাধিকা ভিন্না। ততদিনই চেষ্টা ভিন্না, ক্রিয়া ভিন্না, উপাসনার আচার ভিন্ন। যতদিন ভবানীর শ্রীপাদপদ্মে ঐক্যজ্ঞান না জন্মে, হে চার্ব্বঙ্গি! হে শঙ্করি! সাধকের নির্ম্মল হৃদয়-সরোবরে পরমপবিত্র অদ্বৈততত্ত্ব তারিণী-পাদপদ্মের সমুজ্জ্বল বিকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে দেবদেবীর কথা দূরে থাক্ সংসারের সমস্ত জীবেই সাধকের তখন একমাত্র ব্রহ্মদৃষ্টি বিস্ফারিত হয়।

গুরু-বিষ্ণু-মহেশানা-মভেদেন মহেশ্বরীং।
সমন্ত্রাং ভাবয়েন্মন্ত্রী মহেশঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥

গুরু বিষ্ণু মহেশ্বর এবং মন্ত্র, ইহাদের সহিত অভেদবুদ্ধিতে যিনি মহেশ্বরীকে ভাবনা করেন সেই মন্ত্রী (সাধক) জীব হইয়াও স্বয়ং মহেশ, তাহাতে সংশয় নাই

এই সর্ব্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত যে শাস্ত্রের সাধনা এবং সিদ্ধির বিষয় সেই শাস্ত্র বৈষ্ণবের বিরোধী ইহা বলিলে তন্ত্রের কোন ক্ষতি না থাকিলেও নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণব নামে চিরকলঙ্কপঙ্ক লেপন করা হয়।

এই সকল বিরোধের সামঞ্জস্যে মহিম্নস্তবে পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

ত্রয়ী (বেদ), সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত (তন্ত্রশাস্ত্র), বৈষ্ণব (নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র) এই পরস্পর প্রভিন্ন পথে রুচিভেদে 'এইটি সুপথ কি, ঐটি সুপথ' ইহা লইয়াই যত কিছু মতামত, কিন্তু প্রভো। সরল কুটিল নানাপথে ধাবিত নদ নদীর জলসকল যেমন পরিশেষে একমাত্র মহাসমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ যিনি যে পথেই কেন গমন না করুন, পরিণামে একমাত্র অদ্বৈতসমুদ্র তোমাতেই গিয়া সকলে মিলিত হইবেন। সাধক! বেদ বল, তন্ত্র বল, নিশ্চয় জানিও ইহাই সকল শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা নিত্য নূতন রসের ভাবুক অর্থাৎ ভগবানের দশাবতারমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ নারায়ণ, বাসুদেব বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি, অন্যে পরে কা কথা, পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিতেও যাঁহাদিগের মন উঠে না, এমন কি অনেকে পূর্ব্ব-পুরুষের উপাসিত এবং নিজেরও দীক্ষাকালে পরিগৃহীত বিষ্ণু কৃষ্ণের অচৈতন্য মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আজকাল স-চৈতন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন—তন্ত্রশাস্ত্রটা একেবারে উঠিয়া গেলেই মঙ্গল। এ কথা বলিতে তাঁহাদের সাহস ও সুবিধা বিলক্ষণ আছে। কারণ যে সকল নিত্য নবমন্ত্রে তাঁহারা দীক্ষিত হইয়া থাকেন তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্র থাকিলে সেও তাঁহাদিগের পক্ষে একটা বিপদ-বিশেষ। কেন না, তাঁহাদের সে মন্ত্র, না আছে বেদে, না আছে পুরাণে, না আছে তন্ত্রে। যাহা হউক, ইঁহাদের কথা লইয়া সময় কাটাইবার বড় একটা প্রয়োজন আমরা মনে করি না। হিন্দুজাতির একমাত্র আশ্রয় বেদবৃক্ষ, তান্ত্রিক পঞ্চোপাসনা তাহারই পঞ্চশাখা। এই বৃক্ষ শত শত মন্বন্তর কল্পান্তরের প্রাচীন। এখন কলির শেষে তাহার দুই একটা শাখায় দুই একটা পরগাছা জন্মিবে, ইহা একটা কিছু অসম্ভব নহে। যাঁহারা মূল গাছ চিনেন, পরগাছার পাতা দেখিলেই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক ইঁহাদিগকে পঞ্চোপাসকের কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইঁহাদের কোন মতামতকেও হিন্দুসমাজের মত বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারি না। তবে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত আমরা তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানি। তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে উচ্ছেদ করিতে বসিলে নিজেদিগেরই উচ্ছিন্ন হইবার কথা। কারণ, বিষ্ণুমন্ত্র-সমস্তও তন্ত্রেই অভিহিত। আচারপার্থক্যহেতু শাক্তের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ যদি তন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ হয়, তাহা হইলে ভ্রাতৃবিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া পিতাকেও সংসার হইতেই তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আর এক কথা—আমাদের ত ভাবিতেই লজ্জা হয়, অমন শিষ্ট শান্ত স্মিতশোভন মধুরমূর্ত্তি দেবতার উপাসক হইয়া নিত্য নিরামিষ

হবিষ্য আহার করিয়া বৈষ্ণবের এত রাগ এত বিদ্বেষ সত্য সত্যই যেন প্রাণে বাজে! এ পক্ষে তাঁহারা এরূপ স্বাধীন মত প্রচার না করিয়া নিজ নিজ গুরুসম্প্রদায়কেও যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলেও আমরা অব্যাহতি পাই। তন্ত্রশাস্ত্র যদি কেবলই শাক্তের শাস্ত্র হয় তবে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ দীক্ষাগুরু অদ্বৈতবংশ নিত্যানন্দবংশ প্রভৃতি গোস্বামিগণ এতকাল নিজ নিজ গুরু-গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন কোন শাস্ত্রের প্রসাদে? ক্রোধান্ধ হইলে লোকে সম্বন্ধ-বিচার পরিত্যাগ করিয়াও গালাগালি দেয়, সে কথা স্বতন্ত্র। ফলে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব সকলেই তন্ত্র-মন্ত্রে সমানদীক্ষিত। অন্যান্য তন্ত্রপুরাণাদির প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বিশেষ সমাদৃত, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥

যিনি আত্মগত হৃদয়গ্রন্থিকে শীঘ্র পরিহার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারেও ভগবানের উপাসনা করিবেন।

অপিচ, নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।

(নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ইতি স্বামী)। প্রথমে বেদ ও তন্ত্র উভয়-বিহিত উপাসনার উল্লেখ করিয়া পরে কলিযুগের জন্য আবার পৃথগ্‌ভাবে তান্ত্রিক উপাসনার উল্লেখ করিতেছেন—নানাতন্ত্র বিধান অনুসারে কলিযুগেও যেরূপে উপাসনা করিবে তাহা শ্রবণ কর। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—পুনর্ব্বার পৃথক উল্লেখ দ্বারা কলিযুগে তান্ত্রিক-পথের প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেছেন।

ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবের প্রতি ভগবানের স্বীয় উপাসনায় ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ—

যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়-ব্রতধারণম্ ॥

বার্ষিক পর্ব্বসমূহে আমার যাত্রা এবং বলিবিধান (উপচারাদিসহ কৃত পূজা) যথাক্রমে বৈদিক দীক্ষা ও তান্ত্রিক দীক্ষা এবং চাতুর্ম্মাস্য একাদশী প্রভৃতি মদীয় ব্রত ধারণ করিবে।

পাদ্যোপস্পর্শনার্হাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম ॥
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলং।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যন্তূভয়সিদ্ধয়ে ॥
(উভয়সিদ্ধয়ে বেদ-তন্ত্রোক্ত-ভুক্তি-মুক্তি-প্রাপ্তয়ে ইতি স্বামী)

পাদ্য আচমনাদি পূজার উপচার সকল প্রকল্পিত করিবে। ধর্ম্মাদি নবশক্তি দ্বারা আমার আসনপীঠ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বল অষ্টদল পদ্ম নিৰ্ম্মিত করিয়া বেদ ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রাবলীর দ্বারা উভয় সিদ্ধির নিমিত্ত আমার উপাসনা করিবে। এ স্থলে টীকায় শ্রীধরস্বামী আজ্ঞা করিয়াছেন, বেদ ও তন্ত্র উভয়শাস্ত্রে উক্ত যে ভুক্তি ও মুক্তি (ভোগ ও মোক্ষ) এই উভয়ের প্রাপ্তির জন্য বেদ তন্ত্র উভয় সহকারে উপাসনা।

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥

বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র (বেদ ও তন্ত্র উভয় মিশ্রিত অর্থাৎ পৌরাণিক) আমার উপাসনা এই ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ বিধানেই আমাকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিবে।

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥

এইরূপে উল্লিখিত বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগপথের অনুসরণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিলে সাধক বেদ ও তন্ত্র উভয়ের সিদ্ধি আমা হইতে লাভ করিবেন।

যাঁহারা ভগবানকে মানেন, ভাগবতকে মানেন, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা ভাগবতোক্ত ভগবানের এ সকল আজ্ঞাকে মানেন কি না? এখন মধ্যস্থ সাধক দেখিয়া লইবেন, শাস্ত্রানুযায়ী প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে তান্ত্রিক দীক্ষা ও তন্ত্রশাস্ত্র তাঁহার জীবনের অবলম্বন কি-না? গৃহবিচ্ছেদের সময় আসিলে ঘর পর দুইই তখন একরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাই বর্ত্তমান আর্য্যসমাজের অদৃষ্টদোষে ঘরের দশাও আমরা অনেক-স্থলে এইরূপ দেখিতে পাই।

গায়ত্রীতত্ত্ব ও সাকার উপাসনা

॥ গায়ত্রী-মন্ত্র ॥

শাস্ত্রোক্ত উপাসনার মূলভিত্তি গায়ত্রীতত্ত্ব। ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হইলেও কাল-মাহাত্ম্যে কথাটি একটু স্বতন্ত্র এবং স-তন্ত্ররূপে বুঝিবার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ আজকাল কেহ কেহ এরূপ প্রশ্নও করিয়া থাকেন যে, বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষা সত্ত্বে আবার তান্ত্রিক-মন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য এবং প্রদর্শনীয় এই যে, দীক্ষা পর্য্যন্তই যদি দীক্ষার প্রয়োজন হয় তবে আর প্রয়োজন নাই, অন্যথা দীক্ষামূলক উপাসনা যাঁহার আছে তাঁহাকে অবশ্য তান্ত্রিকমতে পুনর্দীক্ষিত হইতে হইবে। কেন

না, কেবল বেদোক্ত পথে গায়ত্রীর উপাসনা কলিযুগে অসম্ভব। তন্ত্রমন্ত্রে পুনর্দীক্ষিত না হইলে গায়ত্রীর উপাসনাই আদৌ সিদ্ধ হইবে না। তবে গায়ত্রী-দীক্ষার অবমাননা করা হইল বলিয়া কেহ যদি দুঃখিত হয়েন তাহা হইলে গায়ত্রীই তাহার বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু বলি, দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। পৌত্রকে ক্রোড়ে করিলে যে পুত্রের অপমান হয় সে পুত্র না থাকিলেও বংশ-লোপের আশঙ্কা নাই। জিজ্ঞাসা ত 'প্রয়োজন কি'? আমরা জিজ্ঞাসা করি, অপ্রয়োজনই বা কি? বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র কালে উপাধি পরীক্ষার উপযোগী অধ্যয়নে অধিকার পাইবে না, ইহা কে বলিল? যাহা হউক, সে সকল কথা পরে। এখন আর্য্য-বিশ্বাস অনুসারে গায়ত্রী বলিতে কি বুঝিব তাহাই আলোচ্য। গায়ত্রী ভাষা না মন্ত্র? যদি ভাষা হয় তবে গায়ত্রী এমন কি পরম পদার্থ যে তাঁহাকে উপাসনার মূলতত্ত্ব সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? গুরুগম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ শুদ্ধ সদর্থ-ঘটিত মহাবাক্য বলিয়াই যদি গায়ত্রীর গৌরব হয় তবে সেরূপ তত্ত্ব-সম্বলিত এবং ততোধিক রসভাব মাধুর্য্যপূর্ণ লক্ষ লক্ষ মহাবাক্য ত আর্য্যশাস্ত্রে রহিয়াছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গায়ত্রীকেই সর্ব্ববেদসারতত্ত্ব বলিয়া পূজা করি কেন? পণ্ডিত হই, মূর্খ হই, বুঝি আর নাই বুঝি, যথাশাস্ত্র গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই জগতে আমাকে ব্রাহ্মণ বলে কেন? জগৎ ত দূরের কথা, যিনি জগতের অধিপতি তিনি কেন বলেন—অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ। অবিদ্য হউন বা সবিদ্য হউন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই আমার শরীর।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদাজ্ঞায়াম্।

न ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজং।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্॥
দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চ্চাদাবিজ্যবুদ্ধয়ঃ॥

এই চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠমূর্ত্তিও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার প্রিয়তম নহে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব-বেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময়, অর্থাৎ বেদ ও দেবতা এই উভয়ের দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং উভয়েই সমান পূজ্য কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মদেহে সেই সর্ব্ববেদ এবং সর্ব্বদেবময় আমি উভয়ে একত্র সম্মিলিত বলিয়া তাহা পূজ্য অপেক্ষাও পূজ্যতম। অসূয়া-পরতন্ত্র দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষগণ এই তত্ত্ব না জানিয়া কেবল আমার প্রতিমাদিতেই পূজ্য-বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপে ব্রাহ্মণকে পূজা না করিয়া সর্ব্বভূতব্যাপী পরমাত্মা ত্রৈলোক্য-গুরু বিপ্ররূপী আমাকে অবজ্ঞা করে। মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্ম-কোষস্য গুপ্তয়ে॥

ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বভূতের ধর্ম্মকোষ রক্ষার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর পৃথিবীতে অধিজাত হয়েন। সেই গায়ত্রীচ্যুত হইলেই সেই শাস্ত্র আবার বলেন—

গায়ত্র্যাত্মক-জীবাত্মা পূজকো নান্য এব হি।
পূজকস্য তথা পূজ্যাঃ শক্তি-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ॥
গায়ত্রীরহিতো বিপ্রো ন স্পৃশেত্তুলসীদলং।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াদ্ গায়ত্রী-রহিতো দ্বিজঃ॥
মহাচণ্ডালসদৃশঃ কিন্তস্য কৃষ্ণপূজনে।
মন্ত্রত্যাগী গুরুত্যাগী দেবত্যাগী তথৈব চ॥
দুরদৃষ্টবশাদ্দেবাদ্ যস্য বংশে প্রজায়তে।
সগোত্র-বান্ধবস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
কুশপত্রশতৈঃ সার্দ্ধে নির্ম্মায় কুশপুত্তলীং।
বেদোক্তবিধিনা তস্য অগ্নিদাহং সমাচরেৎ॥
অন্যথা তস্য যৎ পাপং সগোত্রেষু বিশেদ্ দ্রুতং॥
তৎসংসর্গিনোঽপি যে লোকা স্তেঽপি তদ্দোষভাগিনঃ।
স পাপী বর্দ্ধতে নিত্যং কলিকালে বিশেষতঃ॥

দ্বিজাতির গায়ত্র্যাত্মক জীবাত্মাই দেবতার পূজক, দেহ ইন্দ্রিয়াদি ইহারা কেহ পূজক নহে। যিনি তথাবিধ পূজক, শক্তি বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা তাঁহারই পূজ্য। গায়ত্রীরহিত বিপ্র তুলসীদল স্পর্শ করিবে না, হরিনাম গ্রহণ করিবে না। গায়ত্রীরহিত দ্বিজ মহাচণ্ডালসদৃশ, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে তাহার কি ফলসিদ্ধি হইবে? দুরদৃষ্টবশতঃ মন্ত্রত্যাগী গুরুত্যাগী এবং দেবত্যাগী দুরাত্মা যাহার বংশে জন্ম গ্রহণ করে তাহার সগোত্র বান্ধব পর্যান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সার্দ্ধ শত কুশপত্র দ্বারা কুশপুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে তাহার অগ্নিদাহ কার্য্য করিবে। অন্যথা তাহার পাপ সগোত্র জ্ঞাতিবর্গে শীঘ্র প্রবেশ করিবে। যে সমস্ত লোক তাহার সংসর্গ করিবে তাহারাও তদ্দোষভাগী হইবে। কলিকালে এইরূপ পাপীর সংখ্যাই বিশেষ-রূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে।

শাঠ্যাদবজ্ঞয়া ভদ্রে ন জপেত্তু দ্বিজো হি যঃ।
যবনস্য তু বীর্য্যেণ তস্য জন্ম সুনিশ্চয়ঃ॥
গায়ত্রীষপ্যবিশ্বাসো যস্য বিপ্রস্য জায়তে।
স এব যবনো দেবি। গায়ত্রীং স কথং জপেৎ॥
স পাপী যবনো দেবি যদ্দেশে বিদ্যতে সদা।

তদ্দেশং পতিতং মন্যে রাজা পাতকসংযুতঃ ॥
তস্য সংসর্গিণো বিপ্রাঃ পতিতাস্তে চ নিন্দিতাঃ।
গায়ত্রীরহিতস্যান্নং যবনান্নাধমং স্মৃতং।
যবনান্নং বরং ভুঙ্‌ক্তে ন জলং তস্য পার্ব্বতি ॥

শঠতা বা অবজ্ঞা পূর্ব্বক দ্বিজ হইয়া যে গায়ত্রী জপ না করে নিশ্চয় যবনের ঔরসে তাহার জন্ম হইয়াছে। গায়ত্রীতেও যে বিপ্রের অবিশ্বাস হয়, দেবি। সেই যথার্থ যবন। যবন হইয়া কিরূপে গায়ত্রী জপ করিবে? সেই পাপাত্মা যবন যে দেশে অবস্থান করে সেই দেশ পতিত এবং সেই দেশের রাজা পাতকী। তাহার সংসর্গী ব্রাহ্মণগণ পতিত এবং নিন্দিত। গায়ত্রী-রহিত ব্যক্তির অন্ন যবনান্ন অপেক্ষাও অধম; বরং যবনান্ন ভোজন করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি গায়ত্রী-রহিত পাপাত্মার জল পর্য্যন্তও পান করিবে না।

কেন? কয়েকটি কথার প্রভাবেই মানব দেবতার পূজ্য আবার সেই কয়েকটি কথার অভাবেই মহাচণ্ডাল যবনের অধম হয় কেন? শাস্ত্রের সহিত জীবের কোন শত্রুতাও নাই মিত্রতাও নাই, তিনি তিরস্কারও করেন নাই আদরও করেন নাই, যাহা স্বরূপসত্য তাহাই তিনি বলিয়াছেন। সত্য বলিতে গেলে সে সত্য যদি কাহাকেও স্পর্শ করে তখন তাহারই মূলতত্ত্ব দেখিতে হইবে। শাস্ত্রানুসারে গায়ত্রীর সত্যতত্ত্ব দেখিলেই জীবের সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ফলতঃ গায়ত্রীর সত্যতত্ত্ব জানি না বলিয়াই যত কিছু কেন কেন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। গায়ত্রীর স্বরূপ বুঝিলে আর কোন কেনই থাকিবে না। তখন নিজেই বুঝিব, মূলতঃ ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি বিকৃত না হইলে গায়ত্রীতে অবিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সে অবস্থায় চণ্ডাল বা যবন বিশেষণ অতিরঞ্জিত নহে, স্বরূপ-কথন মাত্র। দুই একটা কথা বলিলে বা না বলিলে তাহার জন্য জগতে কিছু আসে যায় না। ইহা তুমি আমি যেমন বুঝি শাস্ত্র কর্ত্তারা তদপেক্ষা ন্যূন বুঝিতেন না। মৌনব্রতাবলম্বী মুনি পর্য্যন্ত মনে মনে যে গায়ত্রী জপ না করিলে দ্বিজত্ব-বিবর্জ্জিত হয়েন, তাহাকে ভাষা বা কথা বলিয়া মনে করা তোমার আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব এবং অভাবে যবনত্ব, বুঝিতে হইবে তাহা ভাষা নহে—অতীন্দ্রিয়তত্ত্বচারিণী ব্রহ্মাণ্ডবিদ্রাবিণী নিত্যচৈতন্য-রূপিণী মহামন্ত্রশক্তি। আর যাহাকে পদকদম্ব-সম্বলিত বাক্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাও বাক্য নহে, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম-তত্ত্বময় বর্ণরূপে অধিষ্ঠিত জ্যোতিঃপুঞ্জ মহামন্ত্র। বন্যকাষ্ঠহারী শবরের পক্ষে অরণি সাধারণ কাষ্ঠখণ্ড হইলেও সাগ্নিক যাজ্ঞিকের নিকটে তাহা যেমন তেজোময় বহ্নির অধিষ্ঠান-গর্ভ বই আর কিছুই নহে, তদ্রূপ অবিশ্বাসীর পক্ষে গায়ত্রী বর্ণমালা হইলেও দৈবদৃষ্টিশালী সাধকের নিকটে তাহা মন্ত্রময় তেজঃপুঞ্জ বই আর কিছুই নহে। যাজ্ঞিক যেমন অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়াও

অরণির সঙ্ঘর্ষণে অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া যজ্ঞের উপহার সম্ভার-সমস্ত তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া হোমের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন, সাধকও তদ্রূপ ঘোরান্ধকার সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়াও মনোবৃত্তির সহিত মহামন্ত্র সঙ্ঘর্ষণ করিয়া দেদীপ্যমান ব্রহ্মতেজে হৃদয়কন্দর আলোকিত করেন এবং ত্রিগুণমেখলাময় চিত্তরূপ চৈতন্যকুণ্ডে সেই প্রজ্বলিত পরব্রহ্ম-হুতাশনে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকৃত, সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক, কায়িক বাচনিক মানসিক, ত্রিবিধ কর্ম্মরাশিকে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া স্বয়ং নিত্য নির্ম্মুক্তরূপে অবস্থিত হয়েন। ভাষা বা বাক্যের ফল রসভাবমাধুর্য্য-চাতুর্য্যের আস্বাদন—আর মন্ত্রের ফল দৈবতেজে মনোবৃত্তিকে সঙ্কুক্ষিত করিয়া নিত্যপ্রত্যক্ষরূপে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-সমূহের পূর্ণ অনুভব। বাক্য জড়, মন্ত্র চৈতন্যময়। বাক্য বর্ণবিন্যাস, মন্ত্র তেজঃপুঞ্জ। বাক্য লোকসংসারের উপদেশক, মন্ত্র অলৌকিক শক্তির উদ্ভাসক—সুতরাং বাক্য জননমরণশীল জীবস্থানীয়, মন্ত্র অজর অক্ষর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যে জীবে ব্রহ্মে যতদিন ভেদ রহিয়াছে—বাক্য ও মন্ত্রের মধ্যে ততদিন এই আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম, বাক্য ও মন্ত্র যাহা এক বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা গায়ত্রীর স্বরূপসত্য নহে, আমারই ভ্রান্তিময় মিথ্যা-সিদ্ধান্ত মাত্র। এই অপসিদ্ধান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ মন্ত্র শব্দার্থ কি তাহা বুঝিয়া পরে আমরা মন্ত্রশক্তির অনুসরণ করিব। গায়ত্রীতন্ত্রে—

মননাৎ পাপতস্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গমশ্নুতে।
মননান্মোক্ষমাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গময়ো ভবেৎ॥

যাঁহার মনন হেতু জীব পাপ হইতে আত্মত্রাণ সাধন করেন, যাঁহার মনন হেতু জীব স্বর্গভোগ করেন, যাঁহার মনন হেতু জীব মোক্ষলাভ করেন, এইরূপে জীব যাঁহার অবলম্বনে চতুর্ব্বর্গময় হইয়া যান তাঁহার নাম মন্ত্র।

মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং গীয়তে মননাদ্ মতঃ।
মননাৎ ত্রাতি ষট্চক্রং গায়ত্রী তেন কীর্ত্তিতা॥

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যিনি মনন দ্বারা গীত হয়েন, অর্থাৎ চতুর্দ্দল হইতে সহস্রদল পর্য্যন্ত যিনি বীণাধ্বনি-বিনোদিনী হইয়া পঞ্চাশদ্বর্ণ-মাতৃকারূপে নিত্য-বিহারিণী, এতাবতা—গায়ৎ, মনন হেতু ষট্‌চক্রকোষ বিদীর্ণ করিয়া যিনি জীবের পরিত্রাণ-বিধায়িনী—এতাবতা ত্রী, এই উভয় শব্দের যোগে সেই মন্ত্রময়ী মহাশক্তির নাম গায়ত্রী। তন্ত্রান্তরে বলিতেছেন—

মননান্মন্ত্রমিত্যাহুর্ধ্যানাদ্ধ্যানং প্রচক্ষতে।
সমাধানাৎ সমাধিঃ স্যাদ্ধবনাদ্ধোম উচ্যতে॥

মনোবৃত্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সাধ্য বলিয়া মন্ত্র, ধ্যান (চিন্তন) হেতু ধ্যান। ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ আত্ম-সমাধান হেতু সমাধি এবং হবন হেতু হোম কথিত হইয়াছে।

মন এবং মনোবৃত্তির স্বরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতং।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ॥
অক্ষেষ্বর্থার্পিতেষ্বেতদ্ গুণদোষবিচারকং।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ॥
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ॥
আলস্য-ভ্রান্তি-তন্দ্রাদ্যা বিকারা-স্তমসোত্থিতাঃ।
সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ।
তামসৈ র্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃ-ক্ষপণং ভবেৎ॥ (—পঞ্চদশী)

মন, দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ এবং হৃৎপদ্ম মণ্ডলে অবস্থিত। সেই মনেরই নামান্তর অন্তঃকরণ। যেহেতু বাহ্য (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) বিষয়ে ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে মনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই অর্থাৎ কর্ণ যদি শব্দ শ্রবণ না করে, ত্বক্ যদি স্পর্শ অনুভব না করে, চক্ষু যদি রূপদর্শন না করে, জিহ্বা যদি রসাস্বাদন না করে, নাসিকা যদি গন্ধ গ্রহণ না করে, তবে মন ইহার কোন বিষয়েরই স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ নহে। তবে মনের অধ্যক্ষতা এই পর্য্যন্ত যে, ইন্দ্রিয়সমস্ত স্বীয় স্বীয় বিষয়ে অর্পিত হইলে মন তাহার দোষগুণের বিচার করিয়া থাকেন। কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ মন তাহার পরীক্ষক। মনের তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। এই ত্রিগুণ হইতেই মনের যত কিছু বিকার সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। গুণভেদে মনের বিকারও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বৈরাগ্য ক্ষমা উদারতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার। কাম ক্রোধ লোভ যত্ন ইত্যাদি রাজস বিকার। আলস্য ভ্রান্তি তন্দ্রা প্রভৃতি তামস বিকার। উক্ত সাত্ত্বিক বিকার দ্বারা কেবল পুণ্যের নিষ্পত্তি হয়, রাজস বিকার দ্বারা কেবল পাপের উৎপত্তি হয়, তামস বিকার দ্বারা পাপ পুণ্য কিছুই হয় না, কিন্তু বৃথা পরমায়ুঃক্ষয় হয়, জীবন ব্যর্থ যাপিত হয়।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণ-মান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত, অন্তঃকরণ এই চারি বিভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে সংশয় নিশ্চয় গর্ব্ব ও স্মরণ তাহার বিষয়। অর্থাৎ সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম অহঙ্কার এবং স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম চিত্ত। উপাসনাকাণ্ডে এই চিত্তবৃত্তিরই প্রথম আধিপত্য। মন্ত্রস্মরণ দেবতাস্মরণ মন্ত্রার্থ-চিন্তা দেবতাধ্যান ইত্যাদি যত কিছু ব্যাপার-পরম্পরা, সে সমস্তই চিত্ত-বৃত্তির প্রক্রিয়াসাধ্য। অক্ষ

শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। যে কোন ইন্দ্রিয় যে কোন পদার্থকে বিষয় করিলেই শাস্ত্রে তাহার নাম প্রত্যক্ষ। অচেতন ইন্দ্রিয়ের কোন উপলব্ধিশক্তি নাই। ইন্দ্রিয়বর্গকে দ্বার করিয়া অন্তঃকরণ সেই সকল প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি করে। এইজন্য সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও বিকার অবস্থায় ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও মন অভিভূত থাকে বলিয়া বিষয় নিকটে থাকিতেও তাহার অনুভব হয় না। ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া মন কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিলে যতক্ষণ অন্য বিষয়ক কোন বৃত্তি আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন না করে ততক্ষণ অন্তঃকরণে সেই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুস্মরণরূপ প্রবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু প্রাবৃট্‌কালের তটিনী-বক্ষে অনন্ত তরঙ্গমালার ন্যায় জীবের অন্তঃকরণ মধ্যেও সংসারের অসংখ্য বস্তু-বিষয়ক বৃত্তিনিচয় অশ্রান্তরূপে একবার উন্মজ্জিত একবার নিমজ্জিত হইতেছে, তাই কোন একটি বৃত্তি নিমিষের জন্যও স্থির হইতে পারে না। অপর বৃত্তি আসিয়া যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করে তখন সেই বৃত্তিকে বিদূরিত করিয়া পূর্ব্ব-বৃত্তিকে সমুদিত করিবার জন্য অন্তঃকরণের যে প্রক্রিয়া তাহারই নাম চিত্ত-বৃত্তির অনুস্মরণ।

এখন বুঝিবার কথা এই যে, চিত্ত স্মরণ করিবে কাহাকে? মন ও বুদ্ধি যাহাকে বিষয় না করিয়াছে, ইন্দ্রিয় দ্বারে যাহা প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, চিত্ত তাহাকে স্মরণ করিবে কি করিয়া? বিষয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ না হইলে অন্তঃকরণে তাহার উদ্বোধ বা স্মরণ কখনও হইতে পারে না। এক্ষণে সাধারণতঃ ইহা আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নে যে সমস্ত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব স্বর্গ বা তীর্থস্থান প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয় তাহা ত কখন কোন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় নাই, দেবদেবীর যে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি স্বপ্নে দর্শন করা যায় তাহাও কখন চর্ম্মচক্ষুর বিষয় হয় নাই, তবে স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণে তাহা প্রতিবিম্বিত হয় কিরূপে? এ আপত্তির কোনরূপ স্থায়িত্ব নাই। কারণ স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ যাহা কিছু পদার্থ, সে সমস্তই মনোময়। নিদ্রাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়া থাকে, তৎকালে কেবল একমাত্র মনই সচেতন। স্বপ্ননাট্যে একমাত্র মনই নটবর, সুতরাং সে নাটকের যে অঙ্কে যে গর্ভাঙ্কে যাহাই কেন দৃশ্য না হউক, বুঝিতে হইবে সে সমস্তই ঐ নট মহাশয়ের রূপান্তর লীলা-খেলা মাত্র। স্বপ্নের সিংহ ব্যাঘ্র ভুজঙ্গ ভল্লুক, স্ত্রী পুত্র মিত্র ভৃত্য, স্বর্গ নরক, সমস্তই অন্তঃকরণের পরিণাম বই আর কিছুই নহে। মন যখন যে পদার্থ দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, ভাবিয়াছে, পাষাণের রেখার ন্যায় মনোবৃত্তিতে তাহাই নিখাত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহার উপরে পরতঃপর যত বৃত্তিস্তর সজ্জিত ছিল নিদ্রাবস্থায় নানা কারণে সেগুলি যেমন অন্তর্হিত হইয়াছে অমনি সেই পূর্ব্বরেখা দেখা দিয়াছে। বহির্যবনিকা যেমন উত্তোলিত হইয়াছে অমনি অন্তরের দৃশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গ কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহা নহে—তবে তুমি আমি এই পর্য্যন্ত

বলিতে পারি যে ইহ জন্মে প্রত্যক্ষ হয় নাই, জন্ম জন্মান্তরে প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, তাহা বলিবার সাধ্য নাই। যাহা হউক জন্মান্তরবাদে সে সকল তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবে। এখন আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে স্বপ্নে যে স্বর্গ দেখি সে স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা মন। সে সময়ে ইন্দ্রিয়কে লইয়া মন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, তাঁহার যাহা কিছু উপাদান, উপকরণ, সম্বল বল ভরসা, সে সমস্তই পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ বিষয়। সেই উপাদান উপকরণ লইয়াই তিনি স্বপ্নে যাহা কিছু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল নির্ম্মাণ করিবেন, মন ইতিপূর্ব্বে চক্ষুকে লইয়া যাহা দেখিয়াছেন, কর্ণকে লইয়া যাহা শুনিয়াছেন, চক্ষু কর্ণের অভাবে-এখন সেই সকল বিষয় লইয়া তিনি লীলা খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, কেবল অন্তবৃত্তির সংযোগে অন্যরূপ ভান করাইতেছেন এই মাত্র। স্বপ্নে স্বর্গ দেখি সত্য, কিন্তু সে স্বর্গে স্বর্গ বলিয়া যাহা সংস্কার তাহাও বেদ বেদাঙ্গে যে স্বর্গ শ্রবণ-প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহারই প্রতিবিম্ব মাত্র। ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতিতে স্বর্গের সৌন্দর্য্যঃশ্রবণ না করিলে এবং মনে মনে সে স্বর্গ চিত্রিত না করিলে অন্তরে কখন স্বর্গের সংস্কার জন্মিত না। সংস্কার না জন্মিলে এ স্বর্গও কখন দর্শন করিতাম না। শ্রবণ-জন্য পূর্ব্বসংস্কার-হেতু স্বপ্নদৃশ্য চিত্রকে স্বর্গ বলিয়া অনুভব হইতেছে এইটুকুই স্বতন্ত্রতা, নতুবা তথায় যে সকল অট্টালিকা মন্দির বন উপবন দেখিতেছি, তাহা এই পৃথিবীতে যাহা দেখিয়াছি তাহারই প্রতিবিম্ব। কেবল সংস্কার-গুণে মন তাহাকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। স্বপ্নে যাহা জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী তাহার জ্যোতিঃও পূর্ব্বচিন্তিত, পুরীর চিত্রও পূর্ব্বচিন্তিত, মন কেবল সেই পৃথক্ পৃথক্ জ্যোতিঃ ও পুরীকে এক্ষণে একত্রে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে। হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ বিজন বন চিরকালই আছে—কিন্তু আজ সেই বনে মন আমাকে ব্যাঘ্রের সম্মুখে লইয়া গিয়াছে—এইটুকুই মনের কৃতিত্ব, এইটুকুই এ নাটকের নিগূঢ় রহস্য, এইটুকুই স্বপ্নের স্বপ্নত্ব। তাই বলিতেছিলাম, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটিরও যাহা কখন প্রত্যক্ষ না হইয়াছে, এমন পদার্থ কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হইতে পারে না। কেননা, প্রদর্শক মনের ভাণ্ডারে সে পদার্থের অস্তিত্বই আদৌ নাই। তবে সাধকের উপাস্য দেবতা-বিষয়ক স্বপ্নাদির প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। সাধকের অষ্টসিদ্ধি প্রকরণে আমরা সে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিব।

পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন ব্যাপারে ইহা প্রমাণিত যে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত যে কোন একটি পদার্থ ব্যতীত, কি জাগ্রদবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় চিত্ত অন্য কিছু স্মরণ করিতে পারে না। মন্ত্র-বিষয়ক মননেও এই পঞ্চতত্ত্বের কোন একটি পদার্থের অস্তিত্ব থাকা চাই, কিন্তু গায়ত্রীতত্ত্বে এই বিষয় লইয়াই বিষম বিভ্রাট্।

গায়ত্রী-উপাসনা ॥

আজকাল অনেকের বিশ্বাস এই যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্যদেবতা নির্গুণ-ব্রহ্ম। সুতরাং গায়ত্রী-মন্ত্র দ্বারা তাঁহার নির্গুণ স্বরূপই মন্তব্য। এখন বিভ্রাট্ এই যে, নির্গুণ-ব্রহ্ম জীবের অবাঙ্মানসগোচর অতীন্দ্রিয়, যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, মন তাহাকে মনন করিবে বা চিত্ত তাহাকে স্মরণ করিবে কি করিয়া? অপ্রত্যক্ষ পদার্থের উপলব্ধি স্বপ্নেও যদি অসম্ভব হয় তবে জাগ্রতে তাহার সম্ভব হইবে কিরূপে? তাই গায়ত্রীমন্ত্রের মনন ত অঘটন-ঘটন। দ্বিতীয়তঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম গুণেরও অতীত, যিনি গুণাতীত তাঁহার অনুগ্রহও নাই, নিগ্রহও নাই, সন্তোষও নাই, বিরাগও নাই। সুতরাং তাঁহা হইতে এ সংসারে আশাও নাই, ভরসা নাই। যাঁহার নিকটে কিছু পাইবারও নাই, চাইবারও নাই, যাঁহার নিকটও নাই, দূরও নাই, তাঁহার নিকটে যাইবার বা প্রয়োজন কি আছে? আমরা বলিব, গায়ত্রীতে যাইবারও কথা নাই—আসিবারও কথা নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া ধ্যান ধারণা করিবার কথা আছে। কিন্তু সে ধ্যান ধারণাও ত মনকে পরিত্যাগ করিয়া হইবার উপায় নাই। মন আমাদিগের ত্রিগুণ-বিজড়িত, ব্রহ্ম নির্গুণ, চিমটা দিয়া যেমন আকাশ ধরা অসম্ভব, সগুণ মন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও তদ্রূপ অসম্ভব। তৃতীয়তঃ জ্ঞানমার্গে হউক, ভক্তিমার্গে হউক, কর্ম্মমার্গে হউক, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্ববাদিবিরুদ্ধ, সর্ব্বযুক্তিবিরুদ্ধ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি (শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিনি (?))। সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানসিক ব্যাপারের নাম উপাসনা। এ জন্য গায়ত্রী প্রতিপাদ্য নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা না হইয়া আর কিছু হইলেই ভাল হইত। কিন্তু কি করিব? শাস্ত্র আবার বলিতেছেন—

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসতে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইঁহারা সকলেই শাক্ত, কেহ শৈব বা বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু সকলেই বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরে শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য যিনি যাহাই কেন না হউন, মূলে সকলেই শাক্ত। কারণ যে গায়ত্রীর প্রভাবে তাঁহাদের দ্বিজত্ব সেই দেবজননী গায়ত্রীই স্বয়ং মহাশক্তি-স্বরূপিণী।

এ' স্থানে বলিতেছেন, 'উপাসতে যতো দেবীং' সকলেই গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি নির্গুণা, তাঁহাকে সগুণ মনের শক্তি বিষয় করিবে কি করিয়া?

চতুর্থ কথা, আমরা ত মনে মনে বুঝিয়াছি—গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণ। শাস্ত্র কিন্তু গায়ত্রীর ধ্যানে বলিতেছেন—জপসময়ে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এই ত্রিকাল-ভেদে গায়ত্রীকে ত্রিমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। যথা, প্রাতঃকালে গায়ত্রী তরুণারুণ-রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধারিণী হংসবাহিনী কুমারী-রূপা ব্রহ্মাণী, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থা ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যাহ্নে—সাবিত্রী নীলোৎপলদল-শ্যামা চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণী গরুড়াসনসংস্থিতা যুবতীরূপা বৈষ্ণবী, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী যজুর্ব্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সায়াহ্নে—সরস্বতী বিশদশ্বেতসুন্দরী ত্রিশূল-ডমরু-ধারিণী ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতা বৃষভাসন-সংস্থিতা বৃদ্ধরূপা রুদ্রাণী, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্য-স্থায়িনী সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

শঙ্করাচার্য-কৃত যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাভাষ্যে—

ব্যাসঃ। গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা ॥

পূর্ব্বাহ্নে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী, ত্রিকালে তাঁহার এই নামত্রয় এবং তিনিই এই কালত্রয়-ভেদে ত্রিসন্ধ্যা-স্বরূপিণী।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পূর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা।
যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা সা তু দেবী সরস্বতী ॥

প্রাতঃসন্ধ্যা গায়ত্রী, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সাবিত্রী, সায়ং-সন্ধ্যা সরস্বতী।

ব্যাসঃ। রক্তা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী শুক্লবর্ণিকা।
কৃষ্ণা সরস্বতী জ্ঞেয়া সন্ধ্যাত্রয়মুদাহৃতম্ ॥
এবং তিসৃষু বেলাসু রূপমস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অন্যস্যামপি বেলায়াং ধ্যাত্যা শুক্লবর্ণিকা ॥

গায়ত্রী রক্তবর্ণা, সাবিত্রী (বেদভেদে) শুক্লবর্ণা, সরস্বতী (বেদভেদে) কৃষ্ণবর্ণা; ত্রি-সন্ধ্যায় গায়ত্রীর এই ত্রিবিধ রূপ উদাহৃত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত অন্য সময়ে ধ্যান করিতে হইলে তাঁহাকে শুক্লবর্ণা ধ্যান করিবে।

ত্রিপদা যা তু গায়ত্রী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরী।
সৈবোপাস্যা দ্বিজাদ্যনাং ত্রিমূর্ত্তিত্বে বিনিশ্চয়ঃ ॥

ত্রিপদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিশক্তিরূপিণী যিনি ত্রিপদা গায়ত্রী, দ্বিজাদিগণ তাঁহাকেই ত্রিমূর্ত্তিস্বরূপে নিশ্চয় করিয়া উপাসনা করিবেন।

আবার প্রাণায়াম-সময়ে এই শক্তিরূপিণী গায়ত্রীকেই পুরুষরূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা—

নীলোৎপলদলশ্যামং নাভিমাত্রে প্রতিষ্ঠিতং।
চতুর্ভুজং মহাত্মানং পূরকেণ বিচিন্তয়েৎ ॥

কুম্ভকেন হৃদিস্থানে ধ্যায়েচ্চ কমলাসনং।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহম্॥
রেচকেনেশ্বরং ধ্যায়েৎ ললাটস্থং ত্রিলোচনং।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নির্ম্মলং পাপনাশনম্॥

পূরক-সময়ে (বেদভেদে) নাভিমণ্ডলে নীলোৎপলদল-শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ মহাত্মাকে চিন্তা করিবে। কুম্ভক-সময়ে (বেদভেদে) হৃদয়স্থলে কমলাসন চতুর্ম্মুখ রক্তগৌর-কলেবর লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। রেচক-সময়ে ললাটতটে স্বচ্ছ সুন্দর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ ত্রিলোচন পাপনাশন মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে।

বেদাধিকারবিশিষ্ট গায়ত্রীর উপাসক ব্রাহ্মণ! বলিয়া দাও, এ সকল মূর্ত্তি কি ব্রহ্মের নির্গুণ রূপ?

ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, সাকার কি নিরাকার, সে বিচার পরে। এখন বুঝিয়া লইতে হইবে গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণ ইহাও শাস্ত্রবাক্য। জপ ও প্রাণায়াম সময়ে তাঁহার সগুণ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে ইহাও শাস্ত্র বাক্য। এ উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে? গায়ত্রীতে যদি তিনি নির্গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়েন তবে আবার কেন শাস্ত্র তাঁহাকে সগুণরূপে ধ্যান করিতে বলেন? এ পরস্পর বিরুদ্ধবাদের সমন্বয় কি? সমন্বয় কি তাহা পরে দেখিব। আমরা বলি, এ বিরুদ্ধবাদের সৃষ্টি হইল কেন? তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিজের কিছু ভাঙ্গিবার গড়িবার সাধ্য আছে? না, তিনি যাহা শাস্ত্র তাহাই বলিতে বাধ্য? মানবীয় অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া শাস্ত্র গঠিত হইলে অবশ্য তাহাতে ভাঙ্গিবার গড়িবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু আর্যমতে শাস্ত্র ত মানব-প্রণীত নহে। এ সকল তত্ত্বও যাঁহার শাস্ত্রও তাঁহার, তবে আর শাস্ত্র ইহা বলিলেন কেন? উহা বলিলেন না কেন? বলিয়া শাস্ত্রের প্রতি আপত্তি কেন? ভগবান আপন ছায়া-যন্ত্রে আপনি আপনার চিত্র তুলিতে বসিয়াছেন। যখন যে রূপ সাজিয়া বসিতেছেন তখন সেইরূপ দৃশ্য উঠিতেছে। তজ্জন্য একজনের মূর্ত্তি নানারূপ হইল কেন বলিয়া ছায়াযন্ত্রের কোন দায়িত্ব নাই, পুরুষের ইচ্ছাই কেবল এই মূর্ত্তি-বৈচিত্র্যের প্রতি একমাত্র কারণ। তাই বলিতেছিলাম, শাস্ত্র কেন বলিলেন? এই আপত্তিই আদৌ অসম্ভব।

মন্ত্রের বাচ্য-শক্তি ও বাচক-শক্তি

সাধকগণ অনুধাবন করিবেন, কেবল এক গায়ত্রী বলিয়া নহে, সমস্ত মন্ত্রেই দুই দুইটি করিয়া শক্তি নিহিত আছেন। প্রথম বাচ্য-শক্তি, দ্বিতীয় বাচক-শক্তি। যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা তিনি বাচ্য-শক্তি, আর যিনি মন্ত্রময়ী দেবতা তিনিই বাচক-শক্তি। যেমন শাস্ত্র বলিয়াছেন 'সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা', সমস্ত

বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। যেমন দুর্গা-সহস্রনাম স্তোত্র-মন্ত্রে দুর্গা দেবতা মহামায়া শক্তি। যেমন বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্রে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, দেবকী-নন্দন শক্তি ইত্যাদি। বীজ যেমন ফলের অন্তর্নিহিত বাচ্যশক্তিও তদ্রূপ বাচক-শক্তির অন্তর্নিহিত, বাহিরের ফলাংশ ভেদ না করিলে যেমন অভ্যন্তরের বীজাংশ লক্ষ্য হয় না তদ্রূপ বাচকশক্তির আরাধনা না করিলেও বাচ্যশক্তির স্বরূপ অনুভূত হইতে পারে না। মন্ত্র বাচ্য-শক্তি বলে জীবিত এবং বাচকশক্তি বলে রক্ষিত, জীবন ব্যতিরেকে রক্ষাতেও কোন ফল নাই, আবার রক্ষা ব্যতীত জীবনেরও কোন স্থায়িত্ব নাই। তাই এই উভয় শক্তির কোন একটিকে পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধি ত দূরের কথা, মন্ত্র চৈতন্যেরই উপায় নাই। বিশেষতঃ যে মন্ত্রবলে উপাসনার অধিকার জন্মিবে, বাচক-শক্তির আরাধনা ব্যতিরেকে সেই মন্ত্রেই আদৌ জীবনী শক্তির সঞ্চার হইবে না। মৃত সন্তান ক্রোড়ে করিয়া সংসারের উন্নতি চিন্তা করাও যে-কথা, অচৈতন্য মন্ত্র লইয়া সিদ্ধি সাধনার পরামর্শ করাও সেই কথা। তাই বলিতেছি, সাধক এই স্থানে উপাসনা বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর সংক্রামক উপাসনা না বুঝিয়া আর্য্য জাতির যাহা শাস্ত্রোক্ত উপাসনা তাহাই বুঝিবেন। কারণ আমরা এ উপাসনার ফল যাহা উল্লেখ করিব তাহা শাস্ত্রোক্ত, ইহার মন্ত্র প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন নহে যে শারদীয় মেঘের মত গর্জনে বজ্রপাতে ঝঞ্ঝাবাতে পর্য্যবসিত হইবে। ইহার উচ্চারণের ফল প্রথমে বিশ্ববিপ্লাবিনী দৈবদৃষ্টি-বৃষ্টি, পরিণাম ফল সিদ্ধিরূপ শস্যসম্পত্তি। পার্থিব জল যেমন সূর্য্যকিরণে সংক্রামিত এবং আকাশে সঞ্চিত হইয়া বৃষ্টিরূপে ধরাতলে পতিত হয় আবার সেই জল বিশুদ্ধ হইয়া যেমন সূর্য্যমণ্ডল অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য তেজোময় মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে এই দ্বৈত জগৎ আকৃষ্ট হইয়া অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানরূপে নীরস দ্বৈত সংসার আপ্লাবিত করিবে এবং আবার সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব হইতেই বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মানন্দরসস্রোতে দ্বৈত-ব্রহ্মাণ্ডকে ভাসাইয়া দ্বৈতভান স্বতন্ত্র রাখিয়া অদ্বৈত-বুদ্ধি সেই অদ্বৈতরূপিণীর অভিমুখে ধাবিত হইবে, ইত্যবসরেই কর্ম্মভূমির সুযোগ কৃষক সাধকের বিশাল বিশ্বক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া অষ্টসিদ্ধিরূপ শস্যসম্পত্তি অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত এবং সুপক্ব হইয়া যাইবে। তাই গায়ত্রী-মন্ত্র বলিতে ঝঞ্ঝাবাতের প্রারম্ভ না বুঝিয়া সেই জলভরমন্থর-জলধরসুষমা মাকেই বুঝিতে হইবে। তিনিই গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য বাচ্যশক্তি-স্বরূপিণী নির্গুণ দেবতা হইয়াও তাঁহার নির্গুণ-স্বরূপ সগুণ জীবের অগম্য জানিয়া সাধকের সিদ্ধি সাধনার অনুকূল সগুণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই ভক্তহৃদয়বিহারিণী সগুণ-মূর্ত্তিই গায়ত্রী-মন্ত্রের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী বাচকশক্তি। পঞ্চাশদ্বর্ণনাদিনী কুলকুণ্ডলিনীর বর্ণে বর্ণে কেবল তাঁহারই শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণচ্ছটা প্রতি বর্ণ কেবল তাঁহারই স্বরূপ-বর্ণনা। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মহাভাগবতে ব্যাস-জৈমিনি-সংবাদে—

মাহাত্ম্যমতুলং তস্যাঃ কঃ শক্তঃ কথিতুং মুনে।
শিবোঽপি পঞ্চভির্ব্বক্তে্র্যদ্ বক্তুং ন শশাক হ॥
শম্ভুর্বারাণসীক্ষেত্রে মুমুক্ষূণাং নৃণাং স্বয়ং।
তস্যা এব মহামন্ত্রং যদ্ যস্য গুরুণেরিতম্॥
স্বয়ন্তু তরসাগত্য তারকব্রহ্মসংজ্ঞকং।
কর্ণে ব্রুবন্মহামোক্ষং নির্বাণাখ্যং প্রযচ্ছতি॥
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং নির্বাণপদ-দায়িনী।
সৈকা হি বীজং বিপ্রর্ষে জৈমিনে মোক্ষদায়িনী॥
তত্র তত্র সমস্তানাং মন্ত্রাণাং তাং মহামতে।
বেদাঃ প্রাহুরধিষ্ঠাত্রী-দেবতাং মোক্ষদায়িনীম্॥
শশকা মশকাদ্যাশ্চ যে চান্যে প্রাণিনো ভুবি।
তেষাং মোক্ষপ্রদানায় শম্ভুর্বারাণসী-পুরে।
দুর্গেতি তারকং ব্রহ্ম স্বয়ং কর্ণে প্রযচ্ছতি॥

মুনে। সেই আদ্যাশক্তির নিরুপম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কাহার সাধ্য? স্বয়ং শিবও পঞ্চবক্ত্রে যাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বারাণসীক্ষেত্রবাসী মুমুক্ষু মানবগণের দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ং শম্ভু সত্বর তথাতে সমাগমন পূর্ব্বক যাহার যাহা গুরুদত্ত মন্ত্র তাহার কর্ণকুহরে সেই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বাণরূপ মহামোক্ষ প্রদান করেন। বিপ্রর্ষে জৈমিনে। সেই মহাশক্তিই জীবের নির্ব্বাণ-মোক্ষদায়িনী, যেহেতু একমাত্র তিনিই সমস্ত মন্ত্রের বীজরূপিণী। মহামতে। সমস্ত বেদ সেই মোক্ষদাকেই সমস্ত মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বারাণসীপুরে মহেশ্বর শশক মশক প্রভৃতি দীক্ষাহীন প্রাণিবর্গের মুক্তিবিধানার্থ মৃত্যুকালে স্বয়ং তাহাদের কর্ণকুহরে 'দুর্গা' এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র প্রদান করেন। তত্রৈব সৃষ্টিপ্রকরণে—

এবং সসর্জ ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বমিদং জগৎ।
তং প্রাপ প্রকৃতি র্দেবী স্বাংশেন মহামতে॥
সাবিত্রী যাং দ্বিজাঃ সর্ব্বে সন্ধ্যাত্রয়মুপাসতে।
তথাংশেন সমুৎপন্না লক্ষ্মীশ্চাপি সরস্বতী।
ত্রিজগৎ-পালকং বিষ্ণুং পতিং প্রাপ স্বলীলয়া॥

মহামতে। ভগবান ব্রহ্মা এইরূপে সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং দেবী প্রকৃতি অংশের দ্বারা সাবিত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিলেন, দ্বিজগণ ত্রিসন্ধ্যায় যে সাবিত্রীর উপাসনা করেন। এইরূপে দেবী পুনর্ব্বার অংশের

ছায়া লক্ষ্মী এবং সরস্বতীরূপে অবতীর্ণা হইয়া নিজলীলাক্রমে ত্রি-জগৎপালক বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিলেন।

এতদতিরিক্ত মাতৃকাবর্ণরূপে তাঁহার অনন্ত বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, আমরা যথাস্থানে সে সকল স্বরূপের উল্লেখ করিব। ফল কথা, বাচ্য-বাচক অবস্থাভেদে সেই সচ্চিদানন্দময়ীর স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। জলের ঘনীভূত অবস্থা যেমন মেঘমণ্ডলী, তদ্রূপ নির্গুণ বাচ্যশক্তির ঘনীভূত অবস্থাই বাচকশক্তির সগুণমূর্ত্তি। বায়ু-হিল্লোলে মেঘ যেমন তরল হইয়া জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ ভক্তের প্রেমের হিল্লোলে চঞ্চল হইয়াই মূর্ত্তিময়ী সগুণদেবতাও ব্রহ্মাণ্ডময় নিজ নির্গুণ-স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। সেই কৃতার্থতার জন্য যাহা কিছু প্রক্রিয়া তাহাই সিদ্ধি ও সাধনা। তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যখনই ভক্তকে একান্ত কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার নিজ পূর্ণ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তখনই নিঃস্বরূপ হইয়াও তিনি স্ব-স্বরূপ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচক-শক্তি যদি বাচ্য-শক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইতেন তবে সেই পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে অপরিছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডবিস্ফারিণী শক্তির আবির্ভাব সম্ভাবিত হইত কোথা হইতে? পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তির উদরে এ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড স্থান পাইল কি উপায়ে? তাই বলিতেছিলাম, ভক্ত! ও মেঘ কেবল জলের ঘনীভূত সমষ্টি বই আর কিছুই নহে। একবার হৃদয় খুলিয়া 'মা' বলিয়া ভক্তির বাতাস দিয়া দেখ, অজস্র অশ্রান্ত বর্ষণে ত্রিভুবন ডুবিয়া যাইবে। তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি, এ দ্বৈত জগৎ সেই অগাধ অদ্বৈততত্ত্ব-গর্ভে নিখাত নিমগ্ন হইয়া পড়িবে। সাধকের সাধনাবলে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সগুণ শক্তি জাগ্রত হইলে তিনি উঠিয়া অদ্বৈততত্ত্বের কপাট খুলিয়া দিবেন, তবে এ ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ-তত্ত্ব সন্দর্শন ঘটিবে। নট নটী স্বয়ং অভিনয় করিয়া না দেখাইলে যেমন তাহাদের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় না, এ বিশ্বনাটকের নট নটীও তদ্রূপ দয়া করিয়া আপন বিদ্যা আপনি না দেখাইয়া দিলে কাহারও সাধ্য নাই যে, সে ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। তবে যাঁহারা অভিনয়ের অভিনয় করিয়া প্রকারান্তরে নিজেরাই নট-নটী সাজেন, নাটক পড়িতে পড়িতে নিজেরাই নট-নটী হইয়া উঠেন, চক্ষু মুদ্রিত করিতে না করিতেই অমনি সগুণ ব্রহ্মাণ্ড লয় করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিতে থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা তাঁহারা নিজেরাই দর্শয়িতা, নিজেরাই দ্রষ্টা, দেখাইবেনও তাঁহারা, দেখিবেনও তাঁহারা, আপন মুখ আপনি দেখিবেন, দণ্ডে দশবার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া সাজিয়া দেখিতে পারেন, তাহাতে তোমার আমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। তবে তুমি আমি পরের মুখের কথা শুনিয়া যাহাই কেন মনে না করি, তাঁহারা কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিলক্ষণ জানেন যে, আমরা যাহা ছিলাম তাহাই আছি, তবে

রাজিয়াছি তাল। এইত গেল অভিনয় করিবার কথা, বাস্তবিক অভিনয় দেখিবার কথা ইহা হইতে পৃথক্। যাঁহাদের আশা আছে—তিনি অভিনয় করিবেন আমরা দেখিব, তিনি নাচিবেন আমরা নাচাইব, তিনি তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন আমরা প্রাণ ভরিয়া দেখিব, জলের এই অভিনয় দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মিটিবার নহে। তাঁহাদের গভীর প্রতিজ্ঞা যতদিন পার্থিব আকাশে সেই নবমধুর-কাদম্বিনীর অভ্যুদয় না হইবে ততদিন এই ত্রিতাপ-সন্তপ্ত জীবনে কাতরহৃদয়ে বিশুষ্ককণ্ঠে চাতকের ন্যায় নিরন্তর কাঁদিব, তথাপি মরুমরীচিকার ভ্রান্ত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞান মৃগযূথের ন্যায় ধাবিত হইয়া জ্বলন্ত তৃষ্ণানলে অকালে প্রাণ হারাইব না। আজ হউক কাল হউক এই মানবজীবন-বর্ষ-মধ্যে এমন দিন অবশ্য একদিন আসিবে, যে দিন সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল কাদম্বিনীর আনন্দময়ী ভুবনভরা রূপের ছটায় নয়ন জুড়াইবে, প্রাণ শীতল হইবে আর তাঁহারই অমৃতময় কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টিভরে জন্মের মত প্রাণের পিপাসা মিটিয়া যাইবে। তাই ভক্ত অনন্য-শরণ, তাই ভক্ত একান্ত-প্রণত, তাই ভক্ত পরযাচ্ঞা-পরাঙ্মুখ, তাই ভক্ত বলিয়া থাকেন—

> জানামি ত্বাং ব্রহ্মকৈবল্যরূপাং, জানামি ত্বাং নির্গুণাং জ্ঞানগম্যাং।
> জানামি ত্বাং ভক্তবাৎসল্যপূর্ণাং, জানামি ত্বামীশ্বরীং বিশ্বরূপাম্ ॥
> জানামি ত্বাং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিং, নানারূপৈঃ সাধকাভীষ্টদাত্রীং।
> জানামি ত্বাং লীলয়া লোকধাত্রীং, জানাম্যহ ত্বাং বিধীনাং বিধাত্রীম্ ॥
> তথাপি জানাম্যহমম্বিকে ত্বা-মনন্যসিদ্ধেঃ শরণাগতস্য।
> অনাথ-দীনার্ত্ত-বিপদ্গতস্য, মণিশ্চ মন্ত্রশ্চ মহৌষধশ্চ ॥

মা! জানি তুমি ব্রহ্মকৈবল্যরূপা, জানি তুমি নির্গুণা এবং জ্ঞানগম্যা, জানি তুমিই আবার ভক্তবাৎসল্য-পূর্ণা। জানি তুমি ঈশ্বরী এবং বিশ্বরূপা, জানি তুমি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি এবং নানারূপে সাধকের অভীষ্টদাত্রী, জানি তুমি লীলাবশবর্ত্তিনী হইয়াই ত্রিলোকলোকধাত্রী, জানি মা! তুমিই সকলবিধাতার বিধাত্রী। তথাপি ইহাও জানি মা! কোন উপায়ে যাহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবার নহে সেই অনাথ দীন আর্ত্ত বিপন্ন শরণাগতের সম্বন্ধে তুমিই একমাত্র মণি মন্ত্র এবং মহৌষধ, অনাথ দীনের সম্বন্ধে তুমি চিন্তামণি, অনন্য-সিদ্ধি শরণাগতের সম্বন্ধে তুমিই মহামন্ত্র, আবার আর্ত্ত বিপন্নের সম্বন্ধে তুমিই একমাত্র মহৌষধ। সাধকের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই এই বিশ্বাসের সত্যতা দেখাইবার জন্যই বাচ্য-শক্তিস্বরূপিণী নিত্যচৈতন্যময়ীর বাচক-শক্তিস্বরূপে লীলাময় মূর্ত্তি-পরিগ্রহ। কন্যারূপে সেই লীলামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই জগজ্জননী নিজ পিতা হিমালয়কে বলিয়াছেন—

> অনভিধায় রূপস্য স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
> অগম্যাং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্ দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥

পর্ব্বতরাজ। আমার স্থূলরূপের সম্যক্ ধ্যান না করিয়া কেহ আমার সেই সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, যে সূক্ষ্মরূপ দর্শন করিলে জীব সংসারবন্ধন-বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ-সমাধি লাভ করে।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ॥
শ্বল্পমালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপং মে পরমব্যয়ম্।

সেইহেতু মুক্তির অভিলাষী সাধক প্রথমে অবশ্য আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে এবং ক্রিয়াযোগ দ্বারা যথাবিধি সেই সমস্ত রূপের সম্যক্ উপাসনা করিয়া ধীরে ধীরে আমার অব্যয় পরম সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করিবে।

সাধক এইস্থলে বুঝিয়া লইবেন, সাকাররূপে তাঁহার যথাশাস্ত্র উপাসনা সম্পূর্ণ হইলে তবে সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনার অধিকার জন্মিবে। এখন কোথায় সেই সূক্ষ্মরূপ আর কোথায় এই তুমি আমি।

গায়ত্রীর ন্যায় সমস্ত মন্ত্রেরই বাচ্য-শক্তি নিগুর্ণ কিন্তু বাচক-শক্তি সগুণ। কারণ, বাচক-শক্তি উপাস্য, বাচ্য-শক্তি অধিগম্য, বাচক-শক্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং বাচ্য-শক্তিতে প্রবেশ করিতে হইবে। যতদিন আমার এই মন প্রাণ দিয়া আমি 'আমি' থাকিয়া অর্থাৎ 'আমি উপাসক তিনি উপাস্য' এই ভেদজ্ঞান স্থির রাখিয়া আমাকে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে ততদিন স্থূল সাকার সগুণ-মূর্ত্তি বই আমার গতি নাই। আর যে দিন আমার মন প্রাণ প্রকৃতি গর্ভে ডুবিয়া যাইবে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব তাঁহার স্বরূপে বিলীন হইবে, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া গিয়া সেই কি জানি কেমন 'না আমি, না তুমি' স্বরূপের মধ্যে পরিয়া আত্মহারা হইব সে দিন আর আমি কার, কে আমার? আমি থাকিলে তবে ত তুমি, আমি যখন আমি নাই তখন আর তুমি কে? অথবা 'তুমি' থাকলেও তখন আর সে তুমিকে খুঁজিয়া লইবে আমার এমন আমি কেহ থাকিবে না। তটিনী যতক্ষণ সাগরের বক্ষে গিয়া আত্মহারা হইতেছে ততক্ষণই 'তটিনী ও সাগর', তাহার পর তটিনী যখন সাগর সঙ্গে মিশিয়া গেল তখন সাগর থাকিলেও তটিনীর পক্ষে আর সাগরও নাই তটিনীও নাই; কেন না, সে নিজে তখন আর তটিনী নাই এবং কি যে হইয়াছে তাহাও আর তাহার বলিবার অধিকার নাই। কেন না, সে আর তখন 'সে'ও নাই। 'সে' বলিয়া তখন তাহাকে কাহারও সহিত পৃথক করিবার উপায় নাই, তাহারও পৃথক হইবার উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম, আমি যখন নাই তখন তিনি থাকিলেও আমার সম্বন্ধে আর নাই। কারণ, আমার আমিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমার পক্ষে তাঁহার তিনিত্বও ঘুচিয়া গিয়াছে। বল সাধক। এই নিগুর্ণ স্বরূপে ডুবিয়া তুমি কাহার উপাসনা করিবে? ইহা উপাসনা নহে, উপাসনার পূর্ণ পরিণাম।

ইহারই নাম নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মকৈবল্য। এ অবস্থায় উপাস্য ও উপাসক এক পদার্থ; অথবা উপাস্যও নাই উপাসকও নাই, আছেন কেবল তিনি মাত্র। এ অবস্থাও যদি তোমার উপাসনার ক্ষেত্র হয়, তবে মুক্তকেশীর রাজ্যে তোমার মুক্তির স্থান আর কোথায় আছে তাহা ত জানি না। যাহা হউক, যাঁহাদের তাহা হইয়াছে তাঁহারা সে ভাবনা ভাবিবেন। আমরা বলি, জীব! যতক্ষণ তোমার জীবত্ব রহিয়াছে ততক্ষণ উপাসনা না করিয়া উপায় নাই, যতক্ষণ উপাসনা আছে ততক্ষণ উপাসনাকে 'উপাসনা' রাখিবার জন্য উপাস্য-মূর্ত্তির আশ্রয় ভিন্ন উপায় নাই। ভয় নাই, 'উপায় নাই' বলিয়া তোমাকে যাহা হয় একটা কিছু ধরিয়া লইতে হইবে না। যিনি জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি পূর্ব্বেই জীবের প্রাণের ব্যথা বুঝিয়াছেন, ধরিতে হইবে বলিয়াই ধরাধর-কুমারী নানারূপে ধরা দিয়াছেন। তাই আজ ধরাতলে বসিয়াও তুমি আমি তাঁহাকে ধরিবার জন্য উর্দ্ধে কর প্রসারণ করিতে সাহসী হইতেছি। ধরাতলে রসাতলে নভস্তলে তিনিই এক অদ্বিতীয়া হইয়াও নানারূপে দ্বৈত জগতের জননী সাজিয়া বসিয়াছেন—ব্রহ্মময়ীর সেই বিরাট লীলা দেখিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। (কুলার্ণব-তন্ত্র—ষষ্ঠোল্লাস)

চিন্ময় অপ্রমেয় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্ম সাধকগণের হিতার্থ রূপকল্পনা করিয়াছেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেবীর প্রতি শ্রীসদাশিবের উক্তি—

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণং।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে॥
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরং।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানা-মস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবি কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ীতনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধা-স্তনূঃ॥
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্‌ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা-শস্ত্রাস্ত্র-ধারিণী॥
তত্তদ্রূপ-বিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদি-সাধনং।
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ॥ (মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—)

দেবি মহাভাগে! তোমার আরাধনার কারণ শ্রবণ কর, যে কারণে তোমার সাধন হইতে জীব ব্রহ্মসাযুজ্য (কৈবল্য) লাভ করে। তুমি পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি। শিবে! সমস্ত জগৎ তোমা হইতে জাত এ জন্য তুমি জগজ্জননী। ভদ্রে! মহৎ হইতে অণু পর্য্যন্ত এই সচরাচর জগৎ ত্বৎকর্তৃক উৎপাদিত এবং তোমারই অধীনতায় অবস্থিত। তুমিই সর্ব্ববিদ্যার (সর্ব্বশক্তির) আদ্যা অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, আমাদিগেরও (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির) জন্ম-ভূমি তুমি। নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপতত্ত্ব তুমি জান কিন্তু তোমার স্বরূপ কেহ জানে না। তুমি কালী তারা দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ধূমাবতী, তুমি বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তা, তুমি অন্নপূর্ণা তুমিই কমলাত্মিকা মহালক্ষ্মী। তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা, তোমার মূর্ত্তি সর্ব্বদেবময়ী, তুমিই সূক্ষ্মা, তুমিই স্থূলা, তুমিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়স্বরূপিণী, নিরাকারা হইয়াও তুমি সাকারা, কে তোমাকে স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হইবে? উপাসকগণের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত, নিখিল জগতের মঙ্গল সাধন জন্য এবং দানবগণের বিনাশার্থ তুমি নানাবিধ দেহ ধারণ কর। তুমি চতুর্ভুজা দ্বিভুজা ষড়্‌ভুজা এবং অষ্টভুজা। তুমিই বিশ্বরক্ষার্থ নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী, তোমার সেই সকল রূপ-ভেদে মন্ত্র যন্ত্র ইত্যাদি সাধন প্রকার এবং ভাবত্রয় অর্থাৎ পশু-বীর-দিব্যভাব সমস্ত তন্ত্রে কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ তত্রৈব—

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু॥
তব রূপান্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে॥
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু।
তেষামর্চ্চা-সাধনানি কথিতানি যথামতি॥

তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী পরমা আদ্যাশক্তি, তোমার শক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্যে শক্তিমান। তোমার অনন্ত রূপ, নানাবর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট এবং নানা প্রয়াসসাধ্য উপাসনার উপাস্য, কাহার সাধ্য তাহা বর্ণন করিবে? তোমারই করুণা-কণা লাভ করিয়া

সেই সমস্ত রূপের অর্চন এবং সাধন-প্রণালী কুলতন্ত্র আগম ইত্যাদি শাস্ত্রে আমা-কর্তৃক যথামতি কথিত হইয়াছে।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ অনুসারে দেখতে পাই, তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব জীবজগতের বাক্য মনের অগোচর জানিয়াই সাধকের সাধনসিদ্ধির জন্য, ত্রৈলোক্যকল্যাণবিধান জন্য, ভূভারহরণচ্ছলে ভূধরনন্দিনী স্বয়ং নানারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শাস্ত্রের অধীনতায় আত্মরক্ষা করিয়া যাঁহারা সাধনপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের ত ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত, কিন্তু যাঁহারা আত্ম-অধীনতায় শাস্ত্রকে রক্ষা করিয়া স্বার্থপথে ধাবিত তাঁহাদিগের মত স্বতন্ত্র। আপন আপন মত প্রচার করিলে কাহারও তাহাতে কোন আপত্তি ক'রিবার অধিকার নাই, কিন্তু শাস্ত্রের আবরণে আত্মগোপন করিয়া কদর্থ ও কূটার্থ ব্যাখ্যায় শাস্ত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে স্বার্থের বিষ ঢালিয়া দিয়া যাঁহারা বিকৃত এবং বীভৎসরূপে শাস্ত্রকে হত বা আহত করিয়া লোক সমাজে প্রচার করেন 'আমরা শাস্ত্রের চিকিৎসা করিতেছি', সেই আধুনিক সমাজ-সংস্কারক ধর্ম্মস্থাপক সমালোচক সহস্রমারী চিকিৎসক মহাশয়গণের শাণিত স্বার্থশস্ত্রপূর্ণ ব্যাখ্যা-কঞ্চুক একবার উন্মোচিত করিতে হইবে, একবার দেখাইতে হইবে—তাঁহারা কোন কোন উপাদেয় ঔষধি লইয়া ধর্ম্ম-জগতের চিকিৎসা-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে বসিয়াছেন। ইহাও দেখিতে হইবে যে তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসাপ্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তিমিত নিদ্রিত ভাবের আবিষ্কার করিয়াছেন, বস্তুতঃই তাহা ধর্ম্মের বিশ্রাম নিদ্রা, না মহানিদ্রা? চিকিৎসকগণ সাধন ধর্ম্মের ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে নূতন চিকিৎসাটি করিয়াছেন, উপস্থিত প্রকরণে আমরা সাধকবর্গকে তাহাই দেখাইব।

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

এই পূর্ব্বোক্ত বচনটির শাস্ত্রোক্ত অর্থ পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, চিকিৎসকগণ তাহার বিরুদ্ধবাদী। তাঁহারা বলেন যে, উপাসকগণ নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার কোন রূপ নাই। এ কথা সত্য হইলে সাধকগণ যে কেবল ব্রহ্মেরই রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এরূপ নহে, আমরা বলি, নিজ নিজ হিত অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধিরও রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, নতুবা এ কার্য্যসিদ্ধিই বা কিরূপ?

বস্তুতঃই যদি ব্রহ্মের কোন রূপ না থাকে, তবে তাঁহার মিথ্যা রূপ কল্পনা করিয়া আমার সত্য সত্য কার্য্য সিদ্ধি হইবে, ইহা বিশ্বাস করিব কি উপায়ে? অথবা বলিবে—রূপচিন্তায় কেবল চিত্ত স্থির হইবে, চিত্ত স্থির হইলে তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ হইবে। এইস্থানে আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্যই যে

রূপ "নাই" বলিয়া জানি, তাহাকে 'আছে আছে' বলিয়া চিন্তা করিতে গেলে স্বাভাবিক মানুষের কি হাসি পায় না? ইহা ধ্যানও নহে ধারণাও নহে, যেন ব্রহ্মকে লইয়া ছেলে খেলা করিতে বসিয়াছি। মাটির পুতুল কখনও সত্য হইবে না, ইহা বালিকা বিলক্ষণ জানে, সে যে নিজে অপ্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কুমারী ইহাও তাহার অবিদিত নহে; তথাপি বালিকা যেমন খেলিতে বসিয়া 'ছেলে আমার কেঁদে মলো গো' বলিয়া সকল ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া মাটির পুতুল কোলে করিয়া কত আদর কত সোহাগ করিতে করিতে তাহার মুখে কৃত্রিম দুধ দিয়া মনঃ প্রাণ স্থির করে, এও যেন ঠিক তাহাই। জানি, নির্গুণ ব্রহ্মের রোষ নাই, তোষ নাই, দোষ নাই, গুণ নাই, মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্য কিছু নাই, দ্বৈত সম্বন্ধ নাই; প্রেম নাই, স্নেহ নাই, বলিতে কি দেহটি পর্য্যন্তও নাই। তথাপি সেই নির্গুণ নিষ্কর্ম্মা নীরূপ ব্রহ্মের কল্পিত চিন্তা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বা প্রসাদ লাভের জন্য এ উপাসনা কি বিড়ম্বনা নহে? আবহমান কাল-পরম্পরায় অনাদিসিদ্ধ জগৎ-প্রবাহে আর্য্য উপাসকগণ চিরকাল এইরূপ বিড়ম্বনাগ্রস্ত, ইহা যাঁহাদিগের বিশ্বাস তাঁহারা যে উন্মাদগ্রস্ত নহেন, ইহা কে বলিবে?

দ্বিতীয়তঃ, চিত্ত স্থির করিবার জন্য যদি রূপের কল্পনা হয় তবে আমরা বলি, যে সকল রূপ চিন্তা করিবামাত্র মনঃ প্রাণ তাহাতে ডুবিয়া পড়ে সে স্বভাবসুন্দর স্বতঃ-প্রেমমন্দির রূপ-সকল পরিত্যাগ করিয়া দেব-দেবীগণের নানাবিধ অস্বাভাবিক অদ্ভুত রূপ সকল কল্পনা করিয়া চঞ্চল চিত্তকে আরও অস্থির করিবার প্রয়োজন কি?

যাঁহাদের কার্য্য-সিদ্ধি এইরূপ, তাঁহাদের রূপকল্পনাও ঐরূপ হইলে তাহাতে কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু যাঁহাদের কার্য্য-সিদ্ধি শাস্ত্রীয়-শাসনে অনুপ্রাণিত তাঁহাদের পক্ষে ত এরূপ সিদ্ধান্ত বড়ই ভয়ঙ্কর। উপাসনা করিবার সময়ে আমি আমার স্বেচ্ছাধীন আর তাহার ফলসিদ্ধির সময়ে শাস্ত্রের অধীন, এ বিকট রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন। সিদ্ধি-সাধন কি আমার আজ্ঞাবহ? আমি যেরূপে বলিব, সিদ্ধি সেইরূপ চলিবে, আমি যখন বলিব সিদ্ধি তখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমি যে মূর্ত্তি চিন্তা করিব সিদ্ধি সেই মূর্ত্তিরই অনুগামিনী হইবে—ইহা অলৌকিক আস্পর্দ্ধা, না উন্মত্ত-প্রলাপ? শাস্ত্রবাক্যে এ স্বাধীনতার অহঙ্কার একদিন অবশ্য চূর্ণিত হইবে বলিয়াই ভগবান বলিয়াছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে ১২ স্কন্দে, শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি॥

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে সাধক স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সাধনায় প্রবৃত্ত হয় সে কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না, অধিকন্তু নরকে গমন করিবে।

সিদ্ধি পাইবে না স্বেচ্ছাচার-দোষে, আর নরকে যাইবে শাস্ত্র লঙ্ঘন জন্ত মহাপাপে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপ যাঁহার স্বেচ্ছাকল্পিত, আজ তুমি আমি তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া লইব, মানুষ হইয়া একথা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ ইহাই তোমার ধন্যবাদ।

জিজ্ঞাসা করি এ কল্পনা, কল্পনা কর তুমি কোন প্রমাণে? বলিবে, শাস্ত্র বলিয়াছেন 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত কোন আপত্তি দেখি না, কিন্তু তুমি আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাতেই সর্ব্বনাশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ

ব্রহ্মের স্বরূপদর্শী শাস্ত্র বলিয়াছেন, সাধকগণের হিতসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজের রূপ নিজে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তুমি বুঝিয়াছ, উপাসকগণ নিজে তাঁহার রূপ-কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। 'সাধকানাং' এই সাধক শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠীর বহুবচন নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাকে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বুঝিয়াছ এবং ঐ সাধক শব্দের অন্বয় করিয়াছ 'রূপকল্পনা' এই পদের সহিত। আবার 'ব্রহ্মণঃ' এই ব্রহ্মণ্ শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠী আছে তাহাকে 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' বলিয়া বুঝিয়াছ অর্থাৎ সাধকগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মের সম্বন্ধে রূপ কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। সাধক শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠীর বহুবচন নির্দিষ্ট আছে তাহাই সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং হিতার্থায় এই পদের সহিত তাহার অন্বয়। আবার ব্রহ্মন্ শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠী আছে তাহাই কর্ত্তায় ষষ্ঠী এবং 'রূপকল্পনা' এই পদের সহিত তাহার অন্বয় অর্থাৎ সাধকগণের হিতার্থ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রূপ কল্পিত হইয়াছে। দুই পক্ষই শ্লোকার্থে বিপর্য্যয় ঘটাইতে সমান সমর্থ হইলেও আমার মতে শাস্ত্র-বাক্যের উপক্রম উপসংহারে কোন বিরোধ হইতেছে না। কারণ কুলার্ণবতন্ত্রে সাকার উপাসনাকল্পেই উক্ত বচন কথিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, দেবী প্রশ্ন করিয়াছেন—

দেব্যুবাচ। কুলেশ। শ্রোতুমিচ্ছামি পূজনস্য চ লক্ষণং।
কুলদ্রব্যাদিসংস্কার-মর্চ্চনং বদ মে শিব॥

দেবী বলিলেন, কুলেশ্বর। আমি এক্ষণে পূজার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, এতএব কুলদ্রব্যাদি সংস্কার রূপ অর্চ্চন-বিধি আমাকে বল। দেবীর এই প্রশ্নের পর ভগবান ভূতভাবন পূজা প্রকরণে দেবতার আবাহন পর্য্যন্ত ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া আবাহনের মূলতত্ত্ব সাকার রূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন, সেইস্থলেই পূর্ব্বোক্ত বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যথা সাকার-পূজার ব্যবস্থা করিতে বসিয়া সাকার মূর্ত্তি অসম্ভব, ইহা প্রতিপন্ন করা একতঃ ঘোর অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ, যাহা প্রতিপাদ্য তাহারই মূলচ্ছেদ, এজন্য সংস্কৃত বচনের কূটার্থ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির উপায় এস্থানে নাই। তৃতীয়তঃ, আমার পক্ষে অনুকূল কারণকূট যথেষ্ট রহিয়াছে। কেন না সাধকগণ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া লইলে অনাদিসিদ্ধ শাস্ত্র কেন তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন?

২য়। সাধকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে রূপ সৃষ্টি করিলে পরস্পর বিভিন্ন-প্রকৃতি অসংখ্য সাধকের সৃষ্টিরূপ কত হইয়াছে এবং কত হইবে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আবার সেই সকল রূপের উপাসনা করিলে যদি সিদ্ধি হয় তবে শাস্ত্র সেই সকল উপাস্য মূর্ত্তির ধ্যান মন্ত্র ইত্যাদি উপাসনা পদ্ধতির পৃথক পৃথক নির্দ্দেশ করে নাই কেন ?

৩য়। মূর্ত্তি কল্পনা বিষয়ে যদি আমার স্বেচ্ছাধীনতা থাকে তবে উপাসনার অনুষ্ঠান আমার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হইবে কেন ?

৪র্থ। আমি আমার মনোমত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইলে সেই মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের আবির্ভূত হইবার দায়িত্ব কি ?

৫ম। যদি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতে পারি তবে মন্ত্র কল্পনা করিয়া লইতে পারি না কেন ?

৬ষ্ঠ। আমার শক্তির দ্বারা যদি মন্ত্রশক্তি পরিচালিত হয় তবে সে শক্তি মন্ত্রে ব্যয় না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বনে উপাসনা করি না কেন ?

৭ম। আমি যাহা আপনি কল্পনা কবিয়া আপান উপাসনা করিব তাহার জন্য গুরুকরণ কেন ?

৮ম। জীবের এমন আত্মশক্তি কি আছে যাহাতে সে শাস্ত্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সিদ্ধি লাভ কবিবে ?

৯ম। এরূপ সিদ্ধিলাভ কাহার কবে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা যুক্তিবলে বুঝিয়াছি যে, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অন্তঃকরণ অগ্রসর হইবে ?

১০ম। এরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে গিয়া যদি আমার পতন ঘটে তাহার জন্য দায়ী কে ?

১১শ। কতকালে এ সিদ্ধি ঘটিবে তাহার নিশ্চয় কি ?

১২শ। আত্ম-মনোময়ী সিদ্ধিব জন্য আবার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রময়ী গায়ত্রীর উপাসনা কেন ? ইত্যাদি কারণকূট আমার পক্ষে যেমন অনুকূল তোমার পক্ষে আবার তেমনই প্রতিকূল। এখন এই সকল প্রতিকূল প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর না দিয়া 'সাধকের কল্পিত রূপ' বলিবে তুমি কোন্ সাহসে ?

গায়ত্রীতন্ত্রে গায়ত্রীধ্যানে উক্ত হইয়াছে 'স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং', তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে লীলাময় দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আবার যাঁহার রূপ তিনি স্বয়ং বলিতেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

অজ অব্যয়াত্মা এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়ার অবলম্বনে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই সেই সময়েই আমি আত্মাকে সৃষ্টি করি।

সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কৃত (অসাধু) গণের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।

যে যে ভক্ত আমার যে যে তনুকে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে সেই সেই মূর্ত্তিতেই আমি সেই সেই ভক্তের অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

সেই জগন্মূর্ত্তি-স্বরূপিণী দেবী নিত্যা, তৎকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তথাপি, তাঁহার বহুপ্রকারে উৎপত্তি আমা হইতে শ্রবণ কর। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে সময়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন সেই সময়েই তিনি নিত্যা (স্বরূপতঃ জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিতা) হইলেও 'উৎপন্না' বলিয়া ত্রিলোকে অভিহিতা হইয়াছেন।

তত্রৈব দেবীস্তবে—

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য,
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাং ॥
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং,
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥

অম্বিকে! অনেক রূপ অবলম্বনে আত্মমূর্ত্তিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মদ্বেষ্টা মহাসুরগণের এই যে কদন (বিনাশ) তোমা কর্ত্তৃক সাধিত হইল, এ অনুগ্রহ অন্য কে করিতে পারে।

মহাভাগবতে ভগবতীগীতায়াং শ্রীপার্ব্বতী হিমালয়-সংবাদে দেবীবাক্যম্—

সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ। ১ ॥

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিন-স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্বমেব পরাৎপরম্। ২ ॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরং।
সংহরামি মহারুদ্র-রূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া। ৩ ॥
দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে। ৪ ॥
অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামাদিরূপতঃ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি মহামতে। ৫ ॥
রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং তত্র চ স্মৃতং।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যং নেহাত্মনঃ স্থিতম্। ৬ ॥
রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কন্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু পূর্ব্বমুক্তং তবালয়ে। ৭ ॥
অনভিধায় রূপস্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ। ৮ ॥
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়া-যোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
শনৈমালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপং মে পরমব্যয়ম্ ॥ ৯ ॥

গিরিরুবাচ।

মাতর্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরি।
তেষু কিংরূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

দেব্যুবাচ।

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দেবী-মূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥ ১১ ॥
সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ১২ ॥
মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্না মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১৩ ॥
আসামন্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।

ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং ।
ন লভন্তে মহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর ॥ ১৫ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৬ ॥
যস্তু সংস্মৃত্য মামন্তে প্রাণং ত্যজতি ভক্তিতঃ ।
সোঽপি সংসারদুঃখৌঘৈ র্বাধ্যতে ন কদাচন ॥ ১৭ ॥
অনন্যচেতসা যে মাং ভজন্তে ভক্তিসংযুতাঃ ।
তেষাং মুক্তিপ্রদা নিত্যমহমস্মি মহামতে ॥ ১৮ ॥
শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপ-মনায়াসেন মুক্তিদং ।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ১৯ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদা ।
কিন্তু তাস্বেব যে ভক্তা-স্তেষাং মুক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ২০ ॥
ততো মামেব শরণং দেহবন্ধ-বিমুক্তয়ে ।
যাহি সংযতচেতাস্ত্বং মামেষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

পিতঃ নগশ্রেষ্ঠ! সৃষ্টির নিমিত্ত আমা কর্ত্তৃকই স্বেচ্ছাক্রমে নিজরূপ স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ১। তন্মধ্যে শিব প্রধান পুরুষ এবং শিবা পরমা শক্তি, মহারাজ! তত্ত্বদর্শী যোগিগণ এইরূপে আমাকে শিবশক্তি-উভয়াত্মক পরাৎপর ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ২। এই চরাচর জগৎকে আমি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করি এবং প্রলয়কালে মহারুদ্ররূপে নিজেচ্ছাক্রমে তাহার সংহার করি। ৩। মহামতে! আবার দুর্ব্বৃত্তগণের উপশমের নিমিত্ত পরমপুরুষ বিষ্ণুরূপে এই সৃষ্টি নিখিল জগৎকে আমিই পালন করি। ৪। মহামতে! আমিই ক্ষিতিমণ্ডলে বারংবার রামাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দানবগণকে নিহত করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করি। ৫। তাত! আমার এই সকল নিত্য এবং নৈমিত্তিক রূপের মধ্যে শক্ত্যাত্মক রূপ প্রধান, যেহেতু শক্তি ব্যতিরেকে পুরুষরূপী আত্মার কোন কার্য্যে সামর্থ্য নাই—ইহা স্থির। ৬। রাজেন্দ্র! ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত এবং তোমার প্রত্যক্ষ এই কন্যাদি-মূর্ত্তি এ সমস্তকেই আমার স্থূল রূপ বলিয়া জান, যাহা সূক্ষ্মরূপ তাহা পূর্ব্বেই তোমার নিকটে বলিয়াছি। ৭। পর্ব্বত-পুঙ্গব! এই স্থূল রূপের অভিধ্যান না করিয়া কেহ আমার সেই সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, যে রূপ দর্শন করিলে জীব নির্ব্বাণ-কৈবল্য লাভ করে। ৮। সেই-হেতু মুক্তির অভিলাষী সাধক প্রথমে অবশ্য আমার স্থূল রূপ আশ্রয় করিবে এবং

যথাবিধানে ক্রিয়াযোগ দ্বারা সেই সমস্ত রূপের সম্যক্ উপাসনা ধীরে ধীরে আমার অব্যয় পরম সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করিবে। ৯।

হিমালয় জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতঃ মহেশ্বরি! তোমার স্থূল রূপ ত বহুবিধ, তাহার মধ্যে কোন রূপকে আশ্রয় করিলে জীব সহসা মুক্তিভাগী হইবে। মহাদেবি! যদি আমাতে তোমার অনুগ্রহ থাকে, তবে তাহাই বল। ১০।

দেবী বলিলেন—ভূধর! স্থূলরূপে মৎকর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থূলরূপের মধ্যে দেবীমূর্তি আরাধ্যতমা এবং শীঘ্র মুক্তিদায়িনী। ১১। মহামতে! সেই দেবীমূর্তিও নানাবিধ, তন্মধ্যে আমার মহাবিদ্যামূর্তি অতিশীঘ্র-বিমুক্তিদা। মহারাজ! তাঁহাদিগের নাম আমা হইতে শ্রবণ কর। ১২। মহাকালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী বগলা, ছিন্নমস্তা মহাত্রিপুরসুন্দরী (কমলাত্মিকা) ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী, ইঁহারা সকলেই জীবের মোক্ষফল-প্রদায়িনী। এই সকল মূর্তিতে পরমা ভক্তি স্থাপন করিলে জীব নিঃসংশয় শীঘ্র মুক্তি লাভ করে। ১৩। তাত! ক্রিয়াযোগ দ্বারা ইঁহাদিগের মধ্যে কোন এক মূর্তি আশ্রয় কর, একমাত্র আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ করিলে নিশ্চয় আমাকে লাভ করিবে। ১৪। ভূধর! মহাত্মগণ আমাতে উপেত হইলে অশাশ্বত দুঃখালয় পুনর্জন্ম কদাচও লাভ করেন না। ১৫। রাজন্! অনন্যহৃদয় হইয়া সতত যে আমাকে স্মরণ করে আমি সেই ভক্তিযুক্ত যোগীরই মুক্তির বিধান করি। ১৬। অন্ততঃ অন্তকালেও যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে সেও কখন সংসারের দুঃখরাশিতে আর বাধ্য হয় না। ১৭। ভক্তিসংযুক্ত হইয়া অনন্য হৃদয়ে যাহারা আমার ভজনা করে, মহামতে! তাহাদিগের পক্ষে আমি নিত্য-মুক্তিপ্রদায়িনী। ১৮। মহারাজ! অনায়াসে মুক্তিদ আমার শক্তিরূপ আশ্রয় কর, তাহা হইলেই মোক্ষলাভ করিবে। ১৯। রাজেন্দ্র! যাহারা শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করে তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু আমিই সর্ব্বময়ী এবং সর্ব্বযজ্ঞ-ফলপ্রদা। অর্থাৎ আমি যখন সর্ব্বময়ী তখন পরমার্থতঃ দেবতা কেন? এ জগতে আমা হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। যে দেবতারই কেন উপাসনা না করুক্, সে সকল দেবতাই আমার বিভূতিমাত্র। সুতরাং যে, যে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেন না করুক্, সেই সেই যজ্ঞের আরাধ্যদেবতা-স্বরূপে আমিই তাহার ফল বিধান করি। কিন্তু মহারাজ! যাহারা কেবল তাহাতেই ভক্ত অর্থাৎ সেই সেই নিজ নিজ আরাধ্য দেবতাতেই ভক্তিপূর্ব্বক অন্যান্য দেবতাকে তাঁহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া তাহাতে উদাসীন বিরক্ত বা অভক্ত হয়, তাহাদিগের মুক্তি নিতান্ত দুর্লভ। ২০। অতএব দেহবন্ধ-বিমুক্তির নিমিত্ত সংযতচেতা হইয়া আমাতে শরণাপন্ন হও, আমাকে লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই। ২১।

নিরুত্তর তন্ত্রে—

শিবশক্তি র্দ্বিধা দেবি! নির্গুণা সগুণাপি চ।
নির্গুণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরং ব্রহ্ম সনাতনী॥
পরঞ্চ পুরুষং বিদ্ধি মহানীলমণিপ্রভং।
জ্যোতিশ্চ দক্ষিণা কালী দূরস্থা স্যাৎ প্রপঞ্চতঃ॥

* * *

অমা স্যান্নির্গুণে সাপি অনিরুদ্ধসরস্বতী।
সগুণা সুরগর্ভে চ মহাকালনিরূপিণী॥
নারীরূপং সমাস্থায় সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মী র্মোহয়ত্যখিলং জগৎ॥

* * *

সা শক্তি র্দক্ষিণা কালী সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিণী।
সিদ্ধবিদ্যাসু সর্ব্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিঃ পুমান্॥
অবিনাভাব-সম্বন্ধ স্তয়োরেব পরস্পরং।
শিবোঽপি তত্র যুক্তশ্চেৎ শক্তিঃ স্যাচ্ছিবযোগতঃ॥
তয়ো র্যোগময়ং তত্ত্বং তয়ো র্যোগেন চিন্তনং।
তয়ো র্যোগময়ং মন্ত্রং তয়ো র্যোগেন সংজপেৎ॥
তয়োর্ম্মন্ত্রং মহামন্ত্রং ভোগমোক্ষপ্রদায়কং।
ভোগেন লভতে মোক্ষং সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং॥
মহাকল্পতরুঃ কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভুক্তিমুক্ত্যেককরণং।
সা কালী গুরুতো রাধ্যা মন্ত্রতন্ত্রস্বরূপিণী॥

দেবি! সগুণ-নির্গুণ-ভেদে শিব এবং শক্তি দ্বিধা-বিভক্ত, তন্মধ্যে নির্গুণা পরব্রহ্মসনাতনী জ্যোতির্ম্ময়ী, নির্গুণ পরম পুরুষও মহানীলমণিপ্রভ জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই নির্গুণা জ্যোতির্ম্ময়ী দক্ষিণকালিকা প্রপঞ্চ হইতে দূরস্থা অর্থাৎ তাঁহার এই নির্গুণ স্বরূপ মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চের অবাঙ্মনসগোচর বলিয়া বহুদূরে অবস্থিত, যে-হেতু নির্গুণস্বরূপ মায়ার অতীত, সুতরাং মায়িক জীবের সম্বন্ধেও এই মায়াময় পারাবারের পারান্তরে অবস্থিত। নির্গুণস্বরূপে সেই অনিরুদ্ধ সরস্বতী অমা-অপরিমেয়-প্রভাবা কালী কপালিনী কুল্বা প্রভৃতি পঞ্চদশ শক্তিকলার মূলপ্রকৃতি। আবার সগুণ অবস্থায় মহাকারণার্ণবে নিজগর্ভে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিদেব প্রসব করেন, তখন তিনিই সর্ব্বাগ্রে মহাকালকে প্রসূত করেন। নারীরূপ অবলম্বন

করিয়া তিনিই এই নিখিল বিশ্বচরাচর প্রসব করিয়াছেন। আবার বিষ্ণুমায়াস্বরূপে মহালক্ষ্মীরূপে তিনিই এই অখিল জগৎ বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

সেই আদ্যাশক্তি দক্ষিণাকালীই সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপিণী এবং সমস্ত সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপে সেই দক্ষিণাই মূল প্রকৃতি এবং পুরুষস্বরূপিণী। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ একের:ব্যতিরেকে অন্যের স্বরূপসত্তা নাই। পুরুষ শক্তি-যুক্ত হইলে শিবস্বরূপ লাভ করেন, আবার শিব-যুক্ত হইলে প্রকৃতি শক্তিস্বরূপ লাভ করেন। তাঁহাদিগের এই পরস্পর যোগময় অভিন্ন-সম্বন্ধই পরব্রহ্মতত্ত্ব। এই যোগ-সম্বন্ধ অবলম্বনেই তাঁহাদিগের চিন্তন, এই যোগ-সম্বন্ধময়ই মন্ত্র, এই যোগ-সম্বন্ধের ধ্যান-যোগেই জপ করিবে। তাঁহাদিগের যোগসম্বন্ধময় মন্ত্রই মহামন্ত্র এবং ভোগ মোক্ষ উভয় প্রদায়ক। তন্মধ্যে ভোগাভিলাষী উপাসকও সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিবেন—মুমুক্ষু নির্ব্বাণকৈবল্যে বিলীন হইবে। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলাকাঙ্ক্ষীর সম্বন্ধে অনিরুদ্ধ সরস্বতী কালীই মহাকল্পতরু-স্বরূপিণী, যেহেতু তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ভোগ এবং মোক্ষের একমাত্র কারণস্বরূপা। অর্থাৎ যাহারা মায়াবদ্ধ অপূর্ণ জীব তাহারাই কল্পতরুর নিকটে নিজ নিজ কামনা অনুসারে প্রার্থনা করে। কিন্তু এ মহাকল্পতরুর বিশেষ এই যে, যাঁহারা মায়ার অধিষ্ঠাতা, মায়ার নিয়ন্তা, পরিপূর্ণ ঈশ্বর, তাঁহারাও নিজ নিজ ভোগমোক্ষ-সিদ্ধির নিমিত্ত ইঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। সাধক গুরুমুখে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারই প্রসাদবলে সেই মন্ত্র-তন্ত্র-স্বরূপিণী মহাকালকল্পলতা কালীর আরাধনা করিবেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেবীর প্রতি সদাশিবের বাক্য—

তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥
কালসঙ্কলনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী ॥
কালত্বাদাদিভূতত্বা-দাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতি।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেবৈকাবশিষ্যসে ॥
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদি-রনাদি-স্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিব-বাক্য)

জগৎ-সংহারকারক মহাকাল তোমারই রূপান্তর, মহাসংহার সময়ে কাল সকল বিশ্ব গ্রাস করিবেন, সেই সর্ব্বভূত সঙ্কলনহেতু তাঁহার নাম মহাকাল। তুমি সেই

মহাকালেরও সঙ্কলন কর বলিয়া তোমার নাম কালী, প্রসব সময়ে সর্ব্বাদি পুরুষ মহাকালেরও প্রসবিত্রী এজন্য আদ্যা, আবার সংহার সময়ে সর্ব্বসংহারক মহাকালেরও সঙ্কলনকর্ত্রী, এজন্য কালী বলিয়া ত্রিলোকে তোমার গান করে। আবার নিরাকার স্বরূপে অজ্ঞেয় রূপ অবলম্বনে বাক্যের অতীত মনের অগম্য তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট হও, সাকারা হইয়াও তুমি নিরাকারা অর্থাৎ সাকার জীবের ন্যায় কোন আকারে আবদ্ধা নও, যেহেতু নিজ মায়ার অবলম্বনে স্বেচ্ছানুসারে তুমি অনন্তরূপিণী। তুমি সকলের আদি অথচ স্বয়ং অনাদি অর্থাৎ তোমার আদি কেহ নাই। তুমিই জগতের কর্ত্রী হর্ত্রী এবং পালিকা।

নিরাকার-সাকার তত্ত্ব

সাধক! এই সকল শাস্ত্রবাক্যে কি বুঝিলে? ব্রহ্মের রূপ সাধকের কল্পিত না তাঁহার নিজ-কল্পিত? শাস্ত্রের নিকটে ইহা অপেক্ষা পরিস্ফুট প্রমাণ আর কি শুনিতে চাও? এইজন্যই বলিতেছিলাম, শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তোমার আমার বুদ্ধির দোষেই যাহা কিছু সর্ব্বনাশ। শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তোমার আমার তাহা বিশ্বাস করিতে লজ্জা বোধ হয়, কেননা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই প্রথম বোধের উদয় হইয়াছে—ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। সকল উদয়েই অস্ত আছে—কিন্তু বোধোদয়ে উদয় আছে, অস্ত নাই। ইহার উপক্রম উপসংহার উদ্দেশ্য পরিমাণ কেবলই যেন ঈশ্বরের স্বরূপ-পরিচয়ে পরিপূর্ণ। তাই অনেকে ভাবিয়া অস্থির যে শাস্ত্রও ঈশ্বরের বাক্য, বোধোদয়ও ঈশ্বরের বাক্য। এখন ইহার কোনটিকে অমান্য করিয়া নরকে যাইবে? ঊনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বর যথার্থই এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত পদার্থ, কেননা শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম আর ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ এক নহেন। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ ঈশ্বর সগুণ, ব্রহ্ম নিরাকার ঈশ্বর সাকার, নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নানাজাতীয় উপধর্ম্মের সংস্রবে আজকাল ব্রহ্ম আর ঈশ্বর এক হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কাঁঠালের আমসত্ত্ব আর কস্মিন্‌কালেও ঘটে নাই—ঈশ্বরের এও এক অনন্তলীলা। যাহা হউক, শাস্ত্রানুসারে যিনি ঈশ্বরপদবাচ্য তিনি কখনও নিরাকার হইতে পারেন না, কারণ ঈশ্বরত্ব ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বিশ্বকর্ত্তৃত্ব। এই কর্ত্তৃত্ব অভিমান যাঁহাতে রহিয়াছে, তিনি কখনও নির্গুণ হইতে পারেন না—নির্গুণ না হইলে নিরাকার হওয়াও অসম্ভব। আবার অভিমান মনেরই অবস্থা বিশেষ। অভিমান যাঁহার আছে তাঁহার মন অবশ্য আছে। মন যাঁহার রহিয়াছে দেহ তাঁহার অবশ্যম্ভাবী। দেহ যাঁহার নিত্যসিদ্ধ তিনি

যে সাকার এ কথা বলাই পুনরুক্তি। কি শাস্ত্রবলে, কি যুক্তিবলে, কি অন্বয়ে, কি ব্যতিরেকে বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরকে নিরাকার বলা আর জলনিধিকে জলহীন মনে করা কি একই কথা নহে? সাকার বিশ্ব-সৃষ্টির জন্যই সাকার ঈশ্বর, তিনি নিরাকার হইলে তাঁহার সৃষ্টিও নিরাকার হইত।

বাল্যকালে বিদ্যালয়ের গুরুকরণের ফ'ল ত এই পর্য্যন্ত বোধের উদয়। অতঃপর আত্মজ্ঞান-বিজ্ঞানবলে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতেও স্থিরতর ধারণা এই যে শরীরী ঈশ্বর কখনও সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বান্তর্যামী হইতে পারেন না। কারণ শরীরী হইলেই তাঁহাকে মায়াবদ্ধ এবং অল্পজ্ঞ হইতে হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে যোগী ঋষি জীবন্মুক্ত পুরুষগণ যে অভ্রান্তদর্শী ছিলেন ইহাও অপ্রমাণ হইয়া উঠে, কেননা তাঁহারাও শরীরী। ঈশ্বর ত অনেক দূরের বস্তু, কিন্তু যোগী ঋষি সাধু সাধকগণের সিদ্ধিশক্তি ত এখনও নিত্য-প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ সত্য যাহা নাস্তিকেরও অপরিহার্য্য, আস্তিক হইয়া তুমি আমি তাহা অবিশ্বাস করিব কি করিয়া? তবেই এটুকু কি বুঝিবার কথা নহে যে, যাঁহার উপাসনা করিয়া মায়া-নিয়ন্ত্রিত অল্পজ্ঞ জীবও মায়াপাশ বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি কি আত্মসর্ব্বজ্ঞতা রক্ষা করিতে অক্ষম? গৃহের কবাট উদ্‌ঘাটিত হইলে গৃহমধ্যস্থিত আকাশ যেমন সেই গৃহদ্বারপথে বাহিরের মহাকাশের সহিত এক হইয়া যায় তদ্রূপ তাঁহারা যাঁহার প্রসাদে ত্রিগুণাত্মক মনের কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া অন্তরের জীবতত্ত্ব পরব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন করিয়া তাঁহার স্বরূপে মিশিয়া গিয়াছেন, তিনি কি স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে শরীরের ধারণ করিয়া সেই মায়া সম্বন্ধে অসম্বন্ধ বা নির্লিপ্ত থাকিতে অসমর্থ? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তাঃ।
> যোগপ্রভাব-বিধূতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ॥
> স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
> স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত—রাসাধ্যায়)

যাঁহার পাদপঙ্কজপরাগ-নিষেবণে পরিতৃপ্ত হইয়া এবং যোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ পরিহার করিয়া মুনিগণ স্বচ্ছন্দচারী হইয়াও বন্ধনগ্রস্ত হয়েন না, তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছানুসারে শরীর পরিগ্রহ করিলে তাঁহার বন্ধন-সম্ভাবনা কোথায়?

তবে মায়িক শরীর পরিগ্রহ করিয়া মায়াসম্বন্ধ সত্ত্বেও ভগবান মায়াবদ্ধ নহেন, ইহা অবশ্য জীবলোকের অলৌকিক বার্ত্তা, কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব? এই অলৌকিকত্ব তাঁহাতে সম্ভবে বলিয়াই ত তিনি ঈশ্বর, এই লোকাতীত প্রভাবেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
> ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা।

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব, ইহাই ঈশ্বরের অষ্টসিদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে—

অণিমা মহিমা মূর্ত্তে র্লঘিমা প্রাপ্তি-রিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥
গুণেম্বসঙ্গো বশিতা যৎকাম-স্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্মতাঃ॥

অণিমা, অণুত্ব, অতীন্দ্রিয়- সূক্ষ্মত্ব, মহিমা, মহত্ব, লঘিমা, লঘুত্ব প্রাপ্তি—আমি সমস্ত প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং সর্বজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অবগতি। প্রাকাম্য—শ্রুত এবং দৃষ্ট ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের উপভোগ। ঈশিতা, শক্তি প্রেরণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জীবলক্ষ্যে নিজ মায়াশক্তি-বিস্তার। বশিতা, গুণে অসঙ্গ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই এই ত্রিগুণে নির্লিপ্ততা। কামাবসায়িতা কামের অবসায়িত্ব অর্থাৎ আমি যে কোন সুখ কামনা করি তাহারই অবসান—শেষ সীমা প্রাপ্ত হই। হে সৌম্য! ইহাই আমার স্বাভাবিক অষ্টসিদ্ধি। এই অষ্টসিদ্ধি যাঁহাতে নিত্য অধিষ্ঠিত তিনিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী, ভগবান বা ভগবতী। এখন জীব! বলিয়া দাও এ সকল কি লৌকিক শক্তি? এই অলৌকিক সর্ব্বশক্তি যদি তাঁহাতে না থাকে, তবে যে তিনিও তোমার আমার মত জীব হইয়া পড়েন। তুমি আমিও যেরূপ মায়াবদ্ধ তিনিও যদি তদ্রূপ মায়াবদ্ধ হয়েন, তবে আর জীবে ঈশ্বরে প্রভেদ কি? তিনি নিত্য-মায়াসম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলেও মায়া তাঁহার বশীভূত, তিনি মায়াময় হইয়াও মায়ার অতীত। তাই বেদান্তমতে কথিত হইয়াছে—

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য-স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥

চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসমন্বিতা সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধা—যথা, বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি মায়া এবং অবিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি অবিদ্যা। তন্মধ্যে মায়াতে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বের নাম ঈশ্বর এবং অবিদ্যাতে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্বের নাম জীব। মায়ার স্বরূপ এক, সুতরাং তাহাতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরেরও স্বরূপ এক। নানাগুণময়ী অবিদ্যার স্বরূপ অনেক, সুতরাং তাহাতে প্রতিফলিত জীবের স্বরূপও অনেক। জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর বশীকৃতমায়া অর্থাৎ মায়াকে তিনি বশীকৃত করিয়াছেন, আর জীব মায়াবশীকৃত অর্থাৎ মায়া (অবিদ্যা) জীবকে বশীকৃত করিয়াছেন। মায়া-সম্বন্ধ উভয়েরই

রহিয়াছে। মায়া ঈশ্বরের অধীন আর জীব মায়ার অধীন, এইমাত্র জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ। ঐশী শক্তির অলৌকিক প্রভাব মানব যতক্ষণ বুঝিয়া উঠিতে না পারে ততক্ষণই মনে করে, ঈশ্বর সাকার হইলে তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী হইবেন কিরূপে? মানবের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়াই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং ·
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (ভগবদ্গীতা)

আমি অবতাররূপে মানুষ-দেহধারী হইলে মূঢ়গণ আমার সেই পরম ভাবতত্ত্ব না জানিয়া, সর্ব্বভূত মহেশ্বর আমাকেও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ভগবতী-গীতায় জগদম্বাও হিমালয়কে ইহাই উপদেশ করিয়াছেন—

এবমন্যেঽপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা।
তামসা মত্ত উৎপন্না মদধীনাশ্চ তে ময়ি।
নাহং তেষামধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ ॥
এবং সর্ব্বগতং রূপ-মদ্বৈতং পরমব্যয়ং।
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া ॥
যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাব আছে, সে সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমার অধীনে আমাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পর্ব্বতর্ষভ! আমি কিন্তু কখনও তাহাদের অধীনা নই। মহারাজ! আমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবগণ আমার এই সর্ব্বব্যাপী পরম অদ্বৈত অব্যয় রূপ জানিতে পারে না। কিন্তু পিতঃ! একান্ত ভক্তি সহকারে যাহারা আমাকে ভজনা করে, কেবল তাহারাই এই দুস্তর মায়াসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া আমার সেই পরমরূপে প্রবেশ করে।

চন্দ্রালোকের সহিত চক্ষু সংযোজিত না হইলে যেমন চন্দ্রমণ্ডলের স্বরূপ-সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাঁহার উপাসনায় মনঃপ্রাণ উন্মত্ত না হইলেও তদ্রূপ তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। তাই শাস্ত্র সহস্র উপদেশ দিলেও অনধিকারীর পক্ষে তাহা বধিরের কর্ণে সঙ্গীত বই আর কিছুই নহে।

আজকাল আমাদের স্থূল আপত্তি এই যে, পরিচ্ছিন্ন আধারে কখনও অপরিচ্ছিন্ন আধেয় থাকিতে পারে না, সীমাবদ্ধ গৃহে কখনও অসীম আকাশ স্থান পায় না, যোজনব্যাপী সরোবরে কখনও বিশ্ববিপ্লাবনকারী জলরাশি পর্য্যাপ্ত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে কখনও অপরিচ্ছিন্ন ঐশী শক্তি থাকিতে পারে না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনায় কাব্য ইতিহাস বর্ণিত হইতে পারে,

কিন্তু অলৌকিক তত্ত্বে লৌকিক দৃষ্টান্ত সকল স্থলে সমান অধিকার পায় না। যাহা আমার দৃষ্টান্তের সহিত সম্মিলিত হইল তাহাই ধ্রুব সত্য, আর যাহার সহিত দৃষ্টান্ত মিলিল না তাহাই মিথ্যা, এরূপ সিদ্ধান্ত লইয়া তত্ত্ব-বিচারে অগ্রসর হওয়া বড়ই বিড়ম্বনার কথা। মনে করুন, লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যিনিই কেন যে-কোন কার্য্য না করুন, কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই তাহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে। কোন না কোন স্বার্থসিদ্ধিব প্ররোচনায় প্রণোদিত না হইলে কাহারও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তিই আদৌ হইতে পারে না, এখন এই দৃষ্টান্ত লইয়া যদি সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার করা যায় তবে বল, এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের কি স্বার্থ-সিদ্ধি হইয়াছে বা হইবে? বেদ তন্ত্র পুরাণ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি জগতে যত শাস্ত্র উপশাস্ত্র আছে প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, দেখি কাহার সাধ্য এ প্রশ্নের উত্তর করিতে অগ্রসর হয়? কে বলিবে যে তিনি এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতিবড .মহা-মহারথীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর 'কেন জগৎ সৃষ্টি হইল' এই প্রশ্ন যেমন উঠিবে অমনি তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবেন। কিরূপে জগৎ হইয়াছে, কিরূপে জগৎ রহিয়াছে, কিরূপে তাহার ধ্বংস হইবে, ইহা লইয়াই দর্শনশাস্ত্রের যত কিছু বিচার মীমাংসা বাদ বিতণ্ডা মতামত, কিন্তু কেন জগৎ সৃষ্টি হইল? এ কথা যেমন উঠিয়াছে অমনি ষড্‌দর্শন তখন অদর্শন, যোগবিশেষকার, মীমাংসক, আব ন্যায় সাংখ্যসার, বেদ বেদান্ত, কেন সংসার—এর মীমাংসার পথ দেখাতে সবাই অন্ধ। এই দুঃখেই সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—'ছয় কানাতে করল পুঁথি, নাম হল তার দর্শন'। শাস্ত্রের নিকটে যখন এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই তখন আমাকে বাধ্য হইয়া নাস্তিক হইতে হইবে, আর না হয় বলিতে হইবে তাঁহার কোন স্বার্থ অবশ্যই আছে। স্বার্থ আছে বলিলেই তাঁহাকে কতকটা খণ্ডিত করিয়া লওয়া হইল, নতুবা পর না থাকিলে স্ব সম্ভবে না, স্ব না হইলেও স্বার্থ হয় না। সুখ না থাকিলে যেমন দুঃখের অনুভব হয় না, দুঃখ না থাকিলেও যেমন সুখের অনুভব হয় না, আলোক না থাকিলে যেমন অন্ধকারের অনুভব হয় না, অন্ধকার না থাকিলেও যেমন আলোকের অনুভব হয় না, তদ্রূপ স্বার্থ না থাকিলেও পরার্থ থাকে না, আবার পরার্থ না থাকিলেও স্বার্থ থাকে না। তবেই ঈশ্বর যখন স্বার্থের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই সৃষ্টির পূর্বে পরার্থ অবশ্যই ছিল, নতুবা পর না থাকিলে কাহার অপেক্ষায় স্ব? যদি পর ছিল তবে তিনি কখনও এক অদ্বিতীয় নহেন। অবশ্যই কেহ না কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছে (দেখিতে দেখিতে আবার সেই মুসলমানের শয়তান আসিয়া উপস্থিত হইল)। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পূর্ব্বেও যদি কেহ তাঁহার পর ছিল তবে সে পরের সৃষ্টি করিল কে? যদি আর কেহ করিয়া থাকে, তবে ত ঈশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। আর যদি ঈশ্বরই তাহাকে

সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে একতঃ ঈশ্বর কি এতই নির্ব্বোধ যে, আপন ইচ্ছায় আপন শত্রু সৃষ্টি করিলেন? দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সৃষ্টি করিবার সময় ঈশ্বরের কোন স্বার্থ ছিল কি না? যদি থাকে তবে সে স্বার্থের পরার্থ কি? তখন আবার কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাইবার জন্য ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিলেন? এইরূপে ক্রমান্বয়ে পরতঃ পর পর কল্পনা করিতে করিতে পরেই যখন জগৎ ভরিয়া গেল, ঈশ্বর তখন যদি সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তবে ঈশ্বরও ত একজন বিশ্বামিত্রের মত সৃষ্টিকর্তা বই আর কিছুই নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, যদি নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার সময়ে তিনি এরূপ স্বার্থপর কেন? আর হয় তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধি হউক, না হয় না হউক—তজ্জন্য তিনি আমাকে এই সংসার চক্রে ফেলিয়া নিষ্পিষ্ট করিবার কে? বলিবে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। আমি বলিব—সর্ব্বশক্তিমান হউন বা না হউন, আমি দুর্ব্বল, আমাকে পদে পদে পিষ্টপেষিত করিবার সময়ে তিনি বিলক্ষণ শক্তিমান। তোমার মতে ঈশ্বর না ন্যায়পরায়ণ? তাঁহার বল আছে বলিয়াই তিনি আমাকে দিনরাত্রি পদে পদে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন, এ তাঁহার কোন্ ন্যায়পরায়ণতা? বলিবে, তুমি আপন কর্ম্মফল আপনি ভোগ করিবে তাহাতে তাঁহার দোষ কি? আমি বলিব, আমাকে সৃষ্টি করিয়া এ কর্ম্মের প্রবৃত্তি দিল কে? সেও ত তোমার ঈশ্বরেরই কীর্ত্তি, চক্ষুর মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়া 'কাঁদিস কেন' বলিয়া আবার প্রহার, করুণাময় ঈশ্বরের এ কেমন করুণা তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দৃষ্টান্তবাদিন্! বল, আমি এখন নাস্তিক হইব—না, বলিব ঈশ্বর ঘোর পক্ষপাতী বা মহাস্বার্থপর। তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া তাহার পরিণাম ত এই হইল। এখন একবার দৃষ্টান্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার আমার স্বার্থময় প্রবৃত্তির সহিত ঈশ্বরের স্বার্থ-প্রবৃত্তি মিলাইয়া দিতে পারে কি না? দেখিবে যে পথে বেদ বেদান্ত সেই পথেই দৃষ্টান্তও যাত্রা করিয়াছেন—বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধর, দৃষ্টান্ত বলিবে দোহাই ধর্ম্মের—আমার নাম দৃষ্টান্ত। যাহা দৃষ্ট আমি তাহারই অন্ত, যাহা দেখি নাই শুনি নাই তাহার অন্ত দূরে থাক প্রান্তও নাই। স্বাভাবিক নিয়মে আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, দৃষ্টান্ত তাহারই শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু বুঝিবার কথা এই যে, স্বাভাবিক নিয়ম কাহার? জীবের স্বভাব স্থিতি মাত্র, জগদম্বার স্বভাব সৃষ্টি স্থিতি সংহার। আমরা যাহার আদি জানি না অন্ত জানি না, কেবল আমাদের স্বভাব স্থিতি লইয়া তাঁহার স্বভাবের কি বিচার করিব? বুদ্ধির অতীত অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তের এক পদ অগ্রসর হইবারও সাধ্য নাই। এইস্থলেই দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া গীতাঞ্জলি মনের দুঃখে গাহিয়াছে—

বল খেলা কার? সংসার, অনিবার মায়াবন্ধ।
কে মোর নাচায়, এ সং সাজায়, কারে আমি বলি মন্দ ॥
যোগ বিশেষকার, মীমাংসক আর, ন্যায় সাংখ্যসার বেদ বেদান্ত,
কেন সংসার? এর মীমাংসার, পথ দেখাতে সবাই অন্ধ ॥

বিপক্ষদল দলিতে, জয়পতাকা উড়াইতে,
স্কন্ধে অন্ধ চড়াইতে, স্কন্ধ পাতে অন্ধ ;—
বিকট-দর্শন, এ ষড়্‌দর্শন, মেঘের গর্জ্জন, কেবল দ্বন্দ্ব ;
তাই বিপদ, মত ভেদ, বজ্রপাতে জীবনান্ত ॥

সত্য, তোমার লীলা অপার, বাজাও মায়াযন্ত্র আবার,
তাই সং সাজি, সবাই নাচি, ভোজের বাজি, এ সম্বন্ধ ;
ভূতের পালে, ধূলা খেলে, তোমার তালে, হ'য়ে অন্ধ ;
পঞ্চভূতে অনন্ত ভূত, সংসার কেবল ভূতানন্দ ॥

কিন্তু মা! জিজ্ঞাসি আবার, নাচাও তুমি নাচে সংসার,
নাচাইয়ে কি ফল তোমার, তাই, নাচাও অবিশ্রান্ত ;
যদি বল, না চাও ফল, তবে নাচাও হল ক্ষান্ত ;
কারে নাচাও? আপ্‌নি নাচ, আপনার মন্ত্রে আপ্‌নি ভ্রান্ত ॥

বিবেক বলে সব একাকার, না হয় হই স্বতন্ত্র তোমার,
তুমিই আমি, তোমার আমি, অভেদ আর ভেদ সম্বন্ধ ;
পরমার্থ, সব অনিত্য, (তবে) কেন সত্য? জীবের বন্ধ ;
সংসার-জ্বালায়, প্রাণ জ্ব'লে যায়? জীবের জীবনান্ত ॥

উন্মত্ত যে করে নৃত্য, সে নৃত্যে তার কিবা স্বার্থ?
তেমনি তোমার স্বভাব নৃত্য, নাই এ নৃত্যের আদি অন্ত ;
মহাকালের হৃৎকমলে, তোমার নৃত্য অবিশ্রান্ত ;
(ও সেই) নৃত্যভরে, কাল-উদরে; নাচে সংসার জীববৃন্দ ॥

যে হও ব্রহ্মময়ি! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-প্রসব-ভূমি,
তোমাতেই সব আমি তুমি,তুমি নইলে সকল অন্ধ ;
সর্ব্বভূতে, সর্ব্বহৃদে, নৃত্যময়ীর নৃত্যানন্দ ;
যে আনন্দের হ'লে অন্ত, ফুরায় জীবের জীব-সম্বন্ধ ॥

যা বল মা ! এ কর্ম্মফল, তোমার ইচ্ছার অধীন সকল,
তুমি ইচ্ছাময়ী ! কেবল, কর সৃষ্টি স্থিতি অন্ত ;
তুমি ছিলে, তুমিই হ'লে, আমাতে নাই আমার গন্ধ ;
তোমাতে হয়, তোমাতেই লয়, অধিক কেবল মা-সম্বন্ধ ॥
জীবরূপিণী তুমি যদি, নাচাও জীবকে নিরবধি,
হাসাও কাঁদাও কি তায় ক্ষতি ? কি আর ভাল মন্দ ?
তোমার বিধান, তুমিই নিদান, আছে এ জ্ঞান, মন ত অন্ধ ;
তাই বলে মা ! ঘুচাও শ্যামা ! শিবচন্দ্রের নিরানন্দ ॥ (ললিত বিভাস)

এইজন্যই বলিতেছিলাম, সকল স্থলে দৃষ্টান্ত সমান অধিকার পায় না। তবেই এখন দৃষ্টান্তের অভাবেও তুমি যদি নির্গুণ ঈশ্বরে এত গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পার, তবে দৃষ্টান্তের অভাবে সাকার ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে এত কুণ্ঠিত হইবে কেন ? দ্বিতীয়তঃ ক্ষুদ্র আধারে বহু আধেয় (শক্তি) স্বীকার করিতে তুমি কুণ্ঠিত, কিন্তু আধার যেখানে একেবারেই নাই, সেখানে স্বীকার করিবে কি করিয়া ? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা।
তমাহুরাদ্যং পুরুষং প্রধানম্ ॥

পাণি-হীন হইয়াও তিনি শীঘ্র গ্রহণকারী, পাদ-বিহীন হইয়াও তিনি শীঘ্রগামী, নেত্রহীন হইয়াও তিনি দর্শন করিতেছেন, কর্ণ-হীন হইয়াও তিনি শ্রবণ করিতেছেন, নিখিল বিশ্বকে তিনি জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারে এমন কেহ নাই, শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রধান এবং আদি পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একেবারে পাণিপাদ-চক্ষু কর্ণ-হীন হইয়াও যদি নিরাকার ব্রহ্ম গমন করিতে, গ্রহণ করিতে, দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে পারেন, তবে সাকার ব্রহ্ম পাণিপাদ-চক্ষু-কর্ণ বিশিষ্ট হইয়াও গমন করিতে, গ্রহণ করিতে, দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে পারেন —ইহা শুনিয়া তুমি বিস্মিত হও কেন ? ক্ষুদ্র আধারে বহুশক্তির অবস্থান অসম্ভব, এ দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনার আশা ত এখন শত যোজনান্তরে দাঁড়াইল। তারপর বলিবে, চক্ষু কর্ণ না থাকিলেও যদি তিনি দেখিতে শুনিতে পান, তবে চক্ষু কর্ণ গ্রহণ করিবেন কেন ? তাহার উত্তর স্বতন্ত্র। 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' এ শ্লোকের অর্থ কি তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ যে, সত্য সত্যই তাঁহার চক্ষু কর্ণ নাই এবং চক্ষু কর্ণ না থাকিলেও তিনি দেখিয়া শুনিয়া থাকেন ? যদি এরূপ বুঝিয়া থাক, তবে আরও কিছু বুঝিতে হইয়াছে। মনে কর, চক্ষু কর্ণ যে রাজ্যে আছে দেখা শুনা

সেই রাজ্যের কথা। যাঁহার কস্মিন্‌কালেও চক্ষু কর্ণ নাই, তিনি দেখিতে শুনিতে শিখিলেন কোথায় ? করণ নাই ক্রিয়া আছে, ইহা বিশ্বাস করিবে কে ? ফলতঃ তাঁহার করণও নাই ক্রিয়াও নাই। নিখিল করণ কারণের একমাত্র কারণ যিনি, তাঁহার করণে কোন অপেক্ষা নাই—তাঁহার চক্ষুও নাই কর্ণও নাই, দর্শনও নাই শ্রবণও নাই। তিনি নিত্যজ্ঞান-স্বরূপিণী চৈতন্যময়ী, অজ্ঞান তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপ নিরুদ্ধ করিতে পারে না। তাই জগতের নিখিল বস্তু-বিষয়ক কোন জ্ঞানের অভাব তাঁহাতে নাই।

তুমি আমি, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, ইন্দ্রিয়ের অভাবেও তিনি স্বয়ং সেই জ্ঞানময়ী। ইন্দ্রিয়ের অভাব জন্য তাঁহার জ্ঞানের অভাব হয় না। না দেখিয়া না শুনিয়াও তিনি সমস্ত জানেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা'। তিনি সকলকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। বস্তুতঃ চক্ষু না থাকিলেও তিনি দর্শন করেন, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। দর্শন না করিয়াও সমস্ত বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার আছে, ইহাই শাস্ত্রার্থ। অন্যথা দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, চক্ষু না থাকিলে তাহা অসম্ভব। তাই শাস্ত্র শেষে আসিয়া বলিলেন 'নহি তস্য বেত্তা'। প্রত্যেকটির শেষেই 'নহি তস্য গন্তা' 'নহি তদ্‌গ্রহীতা' 'নহি তস্য দ্রষ্টা' 'নহি তস্য শ্রোতা' বলা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার কোনটিরই কিছু উল্লেখ না করিয়া শেষে আসিয়া কেবল বলিলেন, 'নহি তস্য বেত্তা' অর্থাৎ 'স বেত্তি বিশ্বং' এইটুকুই সূত্র, আর সমস্তই তোমাকে আমাকে বুঝাইবার বৃত্তিমাত্র। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-জন্য জ্ঞানগুলি সংগ্রহ করিয়া বলিলেন, এই সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-জন্য তোমার আমার যে জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ের অভাবেও সেই সমস্ত জ্ঞান তাঁহাতে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। তাই কেবল শেষটিতে আসিয়া বলিলেন, 'নহি তস্য বেত্তা'। উপসংহারে তিনি সকলের অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞ কেহ নাই অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার তিনি, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের আধার কেহ নাই। তিনিই সর্ব্বজ্ঞানের নিধান এবং নিদান, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। চক্ষু না থাকিলেও তাঁহার দর্শন আছে, ইহা প্রতিপাদ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, পরিচ্ছিন্ন আকারে অনন্তশক্তি থাকিতে পারে না। এতাবতা তুমি এই বলিতেছ যে, তাঁহার সর্ব্বদর্শিতাশক্তি অনন্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ মূর্ত্তির চক্ষুটি ক্ষুদ্র, ইহা দ্বারা তুমি তাঁহার মূর্ত্তি বা চক্ষু মান না, ইহা ত প্রতিপন্ন হয় না। বরং আমি যে চক্ষু বলিয়াছি তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া যেন তুমি ক্ষুব্ধ, আমার উল্লিখিত মূর্ত্তি অপেক্ষা তুমি আরও অতি বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিতে চাও—যাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করিতে না পারে। তবে ত দেখি তুমি আমা অপেক্ষাও ঘোরতর সাকারবাদী। বস্তুতঃ সাকারবাদের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই ভগবান বা ভগবতী যখনই নিজ ভক্তকে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, যখন ভক্ত

ব্যগ্র-হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিয়াছেন, 'তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে চাই' তখনই ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন। সেই অসীম তেজোময় দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি সহজ চক্ষুর দৃষ্টিগম্য নহে, তাই করুণাময়ী ভক্তকে প্রথমে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া পরে তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতায়—

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥
অনেকবক্ত্রনয়ন-মনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেব-মনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদর-বক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

পরমেশ্বর। তুমি তোমার আত্মস্বরূপ যাহা বলিলে তাহা এইরূপই সত্য। হে পুরুষোত্তম। আমি তোমার সেই ঈশ্বর-বিভূতিময় রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা কার। যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার অধিকারী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে হে প্রভো, হে যোগেশ্বর। তোমার সেই উত্তম আত্মস্বরূপ আমাকে দর্শন করাও। শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ! আমার নানাবর্ণ, নানা আকৃতি, নানাবিধ শত শত সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দর্শন কর। ভারত! আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ অশ্বিনীকুমার মরুদ্গণ এবং এতদতিরিক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বহু আশ্চর্য্য দর্শন কর। গুড়াকেশ! অদ্য আমার এই দেহে একত্রস্থিত সচরাচর কৃৎস্ন জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা কর সে সমস্ত দর্শন কর। কিন্তু তোমার এই স্বাভাবিক চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বরিক বিভূতিযোগ দর্শন কর। সঞ্জয় বলিলেন, রাজন্! অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পরম ঐশ্বর রূপ পার্থকে দর্শন করাইলেন। অনেক বক্ত্র এবং অনেক নয়ন তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, অনেক অদ্ভুত দর্শন তাহাতে প্রকটিত হইয়াছে, অনেক দিব্য আভরণ তাহাতে শোভমান হইতেছে এবং অনেক দিব্য আয়ুধ তাহাতে উদ্যত হইয়াছে। সে রূপ দিব্যমালাম্বরধর, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় অনন্ত এবং বিশ্বতোমুখ। নভোমণ্ডলে একদা সহস্র সূর্য্যের প্রভা সমুদিত হইলে যদি সেই প্রভা সেই মহাত্মার দেহপ্রভার সমান হয়। পাণ্ডব সেই দেবদেবের বিরাট দেহে একত্রস্থিত কৃৎস্ন জগৎকে অনেকরূপ বিভক্ত দেখিলেন। অনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট ধনঞ্জয় পুলকাঞ্চিত-কলেবরে ভগবচ্চরণারবিন্দে মস্তক প্রণত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, দেব! তোমার এই বিরাট দেহে সমস্ত দেবতা এবং ভূতবিশেষ-সঙ্ঘ (স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি) তথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এবং সমস্ত দিব্য ঋষি এবং দিব্য উরগবর্গকে দর্শন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! তোমাকে সর্ব্বতঃ (সমস্ত দিক্ হইতে) অনেক বাহু উদর বক্ত্র নেত্রপুঞ্জে বিমণ্ডিত দর্শন করিতেছি। কিন্তু অনন্তরূপ! তোমার আদি মধ্য অন্ত কিছু দেখিতেছি না।

মহাভাগবতে ভগবতীগীতায়াং দেবী-হিমালয়-সংবাদে—

হিমালয় উবাচ।

মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মম সুতা জাতাসি নিত্যাপি যৎ,
ভাগ্যং মে বহুজন্মজন্মজনিতং সর্ব্বং মহৎপুণ্যদং ।
দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎপরতরং মূর্ত্তিং ভবান্যামপি,
মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপমৈশ্বরং।
ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞানমুত্তমং।
স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা ॥
শশিকোটিপ্রভং চারু-চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখরং।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ জটামণ্ডিত-মস্তকং ॥
ভয়ানকং ঘোররূপং বিস্মিতো হিমবান্ পুনঃ।
প্রোবাচ বচনং মাতা রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
রূপমন্যম্মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী ॥
শরচ্চন্দ্রনিভং চারু-মুকুটোজ্জ্বল-মস্তকং।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্তং নেত্রত্রয়োজ্জ্বলং ॥
দিব্য-মাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
যোগীন্দ্রবৃন্দ-সংবন্দ্য-সুচারু-চরণাম্বুজম্ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
দৃষ্ট্বা তদেতৎ পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমং।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ল-মানসঃ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমং।
বিস্মিতোঽস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥
ত্বং যস্য স হ্যশোচ্যোঽপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্ণীষ মাতর্মাং কৃপয়া ত্বাং নমো নমঃ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব হিমালয়কৃত-স্তবে—

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং,
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগে দেবোঽথবা মানুষঃ।
তৎ কিং স্বল্পমতি র্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈ র্গুণৈঃ,
নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি! তুভ্যং নমঃ॥

হিমালয় বলিলেন, মাতঃ! তুমি নিত্যা (জন্ম-মৃত্যুরহিতা) হইয়াও যে কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিলে, তোমার এই কৃপার মূল্যস্বরূপ আমার বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত সমস্ত পুণ্যপ্রদ ভাগ্য অবশ্যই ছিল। তাহারই ফলে তোমার এই ব্রহ্মময়ী কন্যামূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কোটি জন্মার্জ্জিত কঠোর তপস্যার ফল না থাকিলে আমার সহস্র বৎসরের প্রার্থনাতেও ইহা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তোমার এই মূর্ত্তি দর্শনেই আমার পুণ্যফলের দায়িত্ব ফুরাইয়া গিয়াছে। তাই মা! এইবার আমি নিঃসম্বল হইয়াছি, আর বলপূর্ব্বক বলিবার কিছু নাই। পূর্ব্বে তুমি আপনিই বাধ্য হইয়া কৃপা করিয়াছ। কিন্তু মা! এইবার আমি তোমার কৃপার ভিখারী হইয়াছি, একবার কৃপা করিয়া শীঘ্র তোমার সেই মাহেশ্বরী মূর্ত্তি দর্শন করাও। বিশ্বেশ্বরি! তুমি বিশ্বেশ্বরী, নিঃস্ব আমি তোমার কি করিব? আমার কি সাধ্য আছে মা? যাহা কিছু সাধ্য তাহা কেবল তোমার ঐ চারু চরণাম্বুজে চিরপ্রণাম। দেবী বলিলেন, পিতঃ! আমি তোমায় দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি সেই দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে আমার সর্ব্বেশ্বর রূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের সংশয় ছেদন কর এবং আমাকে সর্ব্বদেবময়ী বলিয়া জান।

শ্রীমহাদেব দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, দেবী সেই প্রণত পর্ব্বতরাজকে এই রূপে উত্তম বিজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রদান করিয়া তৎকালে নিজ দিব্য মাহেশ্বর স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। দেবীর সেই কোটি শশধর-প্রভাধর কলেবরে চারুচন্দ্রার্দ্ধ ভূষণে সুন্দর-শোভিত ললাটতট, বামহস্তে ত্রিশূল এবং দক্ষিণহস্তে বর, জটাজূটমুকুটে বিমণ্ডিত মস্তক তথাপি দুর্দ্দর্শ তেজঃপুঞ্জে ভয়ানক অপেক্ষাও ভয়ানক রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হিমালয় ভীত এবং অতৃপ্ত অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার বলিলেন, মাতঃ! অন্য রূপ প্রদর্শন কর।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বিশ্বরূপা সনাতনী পূর্ব্বরূপ সংহরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যরূপ প্রদর্শন করিলেন। সে অপরূপ রূপ শরদিন্দু-সুন্দরপ্রভ, চারুমুকুট-দীপ্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বলমস্তক, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সুশোভিত ভুজচতুষ্টয়, দেদীপ্যমান-ত্রিনেত্র-জ্বালায় উজ্জ্বলীকৃত, দিব্যাম্বর এবং দিব্যমালায় অলঙ্কৃত, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, যোগীন্দ্রবৃন্দ-বন্দিত সুচারু চরণাম্বুজপ্রভায় সুরঞ্জিত। গিরিরাজ দর্শন করিলেন, সেই বিরাটরূপের সমস্ত দিক হইতে অসংখ্য ভুজ প্রসারিত হইয়াছে, অনন্ত চরণ বিন্যস্ত হইয়াছে, সকল

বিভাগে চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে, সকল দিকে মুখমণ্ডল সুশোভিত হইতেছে। এই পরমোত্তম অদ্ভুত ঐশ্বর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লমানস নগেন্দ্র-নন্দিনীরূপিণী ব্রহ্মময়ীর চরণাম্বুজে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মাতঃ! তোমার এই উত্তম পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, পুনঃ প্রার্থনা রূপান্তর প্রদর্শন কর। পরমেশ্বরি! তুমি যাহার হইয়াছ সে জগতে অশোচ্য—শোকের অ-বিষয়ীভূত প্রত্যুত ধন্য। জগতে কোন না কোন অভাব যাহার না আছে, এমন কেহ নাই। কিন্তু মা! তুমি যাহার হইয়াছ, তুমি যাহার নিজের হইয়াছ, যাহার ক্ষুদ্র আত্ম-সম্বন্ধ তোমার বিরাট সম্বন্ধে মিশিয়া গিয়াছে অথবা যাহার ক্ষুদ্র-সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তুমি তোমার বিরাট সম্বন্ধ হারাইয়া ভক্ত-বৎসলা ভক্ত-হৃদয়ে বদ্ধা হইয়াছ, সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও শরণাগতের শরণাগতা হইয়াছ, নিখিল জগৎপালিকা কালিকা হইয়াও বালিকারূপে ভক্ত-সন্তোষের ভিক্ষার্থিনী সাজিয়াছ, আর অধিক কি মা! ত্রিজগতের জননী হইয়াও তুমি যাঁহার তনয়া হইয়াছ, তাঁহার কিসের অভাব মা? অভাব থাকিলে ত কোন না কোন বস্তুবিষয়ক অভাব থাকিবে। কিন্তু মা! তুমি থাকিলে আর সে অভাব থাকিতেই পারে না। 'যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে, তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা'—জড় জগতে কোথাও যে কোন সদসৎ-চৈতন্য বস্তু আছে, তুমি তাহার সকলের শক্তিরূপিণী। তাই বলি মা! বিশ্বরূপিণী তুমি যাঁহার হইয়াছ, এ বিশ্ব দূরে থাক্, তোমার প্রভাবে অনন্তকোটি বিশ্বচরাচরেও তাহার কোন অভাব থাকিতে পারে না, তাই সে জগতে অশোচ্য। যাহার কেহ নাই, তাহার জন্যই লোকে শোক করে। সর্ব্ব-স্বরূপিণী! তুমি যাহার সর্ব্বস্ব-রূপিণী তাহার জন্য শোক কিসের মা? তোমার ভাবে ডুবিলে জীব ভাব-অভাব এই উভয় ভাবের অতীত হইয়া যায়। সংসারে দীনহীন অকিঞ্চন হইয়াও তোমার প্রসাদে তোমার সম্মুখে সে যে রাজরাজেশ্বর, তাই তাহাকে দেখিয়া কাহারও কোন শোক হয় না। অধিকন্তু ঈর্ষা হয়, সেই ঈর্ষা চরিতার্থ করিতে না পারিয়াও জীবজগৎ তাহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া কীর্তন করে। মাতঃ! কৃপা করিয়া আমায় অনুগ্রহ কর অর্থাৎ এ কৃপার পরেও আমি আবার কৃপাপ্রার্থী, নতুবা কোন্ বলে অনন্তরূপিণীর রূপ দর্শন করিতে সাহস পাইব? সেই কৃপা করিবে জানিয়াই বলিতেছি, করুণাময়ি! তোমার চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম।

অন্যান্য রূপ দর্শনের পর হিমালয় নিজকৃত স্তবশেষে বলিয়াছেন, মাতঃ! দেব অথবা মানব হউক, ত্রিভুবনে কাহারও সাধ্য যে বহুযুগ ব্যাপিয়াও তোমার এই বিশ্বাত্মক রূপ এবং গুণের সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারে? দেবি! তোমার যে স্বরূপ ব্রহ্মাদিরও অগম্য, স্বল্পমতি আমি তাহার সম্বন্ধে কি বলিব? তবে আমার বলিবার এই যে, নিজ গুণে এই পর্য্যন্ত কর মা। যদি অনুগ্রহ করিয়াছ তবে

আর তোমার মহামায়ায় আমাকে মুগ্ধ করিও না, আর কিছু বলিবার নাই মা, বিশ্বেশ্বরি! তোমায় প্রণাম।

নিরাকার-বাদিন্! শাস্ত্রোক্ত এই সকল রূপ-গুণময় বিরাট্ লীলা দেখিয়াও কি তাঁহার মূর্ত্তি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার ক্ষোভ হয়? তুমি যে দিকে চাহিবে সেইদিকেই অনন্ত চক্ষু, অনন্ত চরণ, অনন্ত হস্ত, অনন্ত মস্তক, অনন্ত আকাশে স্থান পাইতেছে না, ইহা অপেক্ষা অনন্তের অনন্তলীলা আর কি দেখিতে চাও? ত্রিভুবন-বিজয়ী অর্জ্জুন যখন ভগবানের সেই করাল কালমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিতেছেন—

> নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং।
> দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥
> দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
> দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

বিষ্ণো! তোমার গগনমণ্ডলস্পর্শী বিবিধবর্ণরঞ্জিত বদনব্যাদানবিশিষ্ট প্রদীপ্ত-বিশালনেত্র রূপ দর্শন করিয়া প্রব্যথিত অন্তঃকরণে আমি ধৈর্য্য এবং শান্তি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তোমার দংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ মুখমণ্ডলসকল দর্শন করিয়া আমি দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিরহিত হইয়াছি। এ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছি না। দেবেশ! জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও। পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, তুমি দেব, কিন্তু এখন জানিলাম তুমি দেবেশ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, জগতে তোমার নিবাস, কিন্তু এখন বুঝিলাম, তোমাতে জগতের নিবাস। তাই বলি, প্রভো! আমার (জীবের) সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি আপন গুণে আপনি প্রসন্ন হইয়া তোমার স্বরূপ দর্শন করিবার অধিকার দাও।

সাধক! ইহা শুনিয়াও কি সে মূর্ত্তি দর্শন করিতে তোমার আমার সামর্থ্য বা সাহস আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়? এই ব্রহ্মাণ্ডবিদারী লোকক্ষয়কারী বিরাট প্রভাব কি তোমার মতে ক্ষুদ্র শক্তির পরিচয়? সমুদ্রে জল অল্প নহে, তোমার আমার কলসটি ক্ষুদ্র, ভগবন্মূর্ত্তিতে অপরিচ্ছিন্ন শক্তির এবং অনন্ত বিভূতির অভাব নাই। তোমার আমার মস্তিষ্কেই তাহার ধারণা-শক্তির অভাব। তাই কলসের জল দেখিয়া সমুদ্রের পরিমাণ লইতে গিয়া গৃহে বসিয়া অপার সমুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে—ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। কি জানি, যদি বল, অর্জ্জুনে জ্ঞাতিবধ-ভয়ভীত দুর্ব্বল মানব হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ণ ঐশ শক্তির পরিচয় নহে, এই আশঙ্কায় আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। নরলীলায় অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতেই অধর্ম্ম ভয়-ভীত। ইহা সত্য, কিন্তু সে ভয় ত জীবের। যিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের অতীত, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র যম চন্দ্র সূর্য্য নিরত ভীত, তিনি ত কাহাকেও দেখিয়া

ভয় করেন না। নিখিল দেবমণ্ডলীমধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া যিনি একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়, পরমেশ্বর নাম যাঁহার স্বরূপ-বিশেষণ, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়াও যিনি পূর্ণব্রহ্ম মহাকাল, স্বয়ং অজর অমর অব্যয় অক্ষয় রূপে নিত্য বিরাজিত, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরাৎপর পরমপুরুষের হৃদয় ত দুর্ব্বল বা কাহাকেও দেখিয়া ভীত হইবার নহে। কিন্তু একবার দেখিয়া লও, তিনি কেমন ভীতি-কম্পিত কলেবরে পলায়নের পথ না পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন, দেখিয়া লও—শাস্ত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন।

দক্ষযজ্ঞ যাত্রাকালে জগদম্বা বারংবার অনুমতি প্রার্থনা করাতেও মহাদেব যখন তাহা অনুমোদন করেন নাই, তখনই ভগবানের পতি-পত্নীভাব জন্য অভিমান অবলোকন করিয়া তাহা চূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী দাক্ষায়ণী যখন ভীমভৈরবী-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, শাস্ত্র তখনই বলিতেছেন, মহাভাগবতে—

শ্রীমহাদেব উবাচ

এবমুক্তা মহেশেন তদা দাক্ষায়ণী সতী।
চিন্তয়ামাস সংক্রুদ্ধা ক্ষণমারক্তলোচনা॥
সংপ্রার্থ্য মামনুপ্রাপ্য পত্নীভাবেন শঙ্করঃ।
মামবজ্ঞায় বচনং ভাষতেঽতি সুদারুণং॥
ত্যক্ত্বৈনমপি দর্পিষ্ঠং পিতরঞ্চ প্রজাপতিং।
সংস্থাস্যামি কিয়ৎকালং স্বস্থানং নিজলীলয়া॥
ততশ্চ প্রার্থিতানেন ভূত্বা হিমবতঃ সুতা।
শম্ভোঃ পত্নী ভবিষ্যামি ভূয়োঽহং স্বয়মেব হি॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা ক্ষণং দাক্ষায়ণী মুনে।
ভয়ানকৈ-স্ত্রিভির্নেত্রৈ র্মোহয়ামাস শঙ্করম্॥
শম্ভুঃ সমীক্ষ্য তাং দেবীং ক্রোধবিস্ফুরিতাধরাং।
কালাগ্নিতুল্যনয়নাং স্তব্ধাক্ষঃ সমভূন্মুনে॥
এবং সমীক্ষ্যমানা সা শম্ভুনা ভীতচেতসা।
সহসা ভীমদংষ্ট্রাস্যা সাট্টহাসং তদাকরোৎ॥
তন্নিশম্য মহাদেবো মহাভীতো বিমুগ্ধবৎ।
কষ্টেনোন্মীল্য নেত্রাণি তাং দদর্শ ভয়ানকাম্॥
এবং সমীক্ষ্যমানা সা সহসা তেন নারদ।
ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং প্রাসীদ্ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভা॥
দিগম্বরা গলৎকেশা ললজ্জিহ্বা চতুর্ভুজা।
কামানলসন্দেহা স্বেদাক্ততনুরুত্তমা॥

মহাভীমা ঘোররাবা মুণ্ডমালা-বিরাজিতা।
উদ্যন্মার্ত্তণ্ড-কোট্যাভা চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ-কিরীটোজ্জ্বল-মস্তকা॥

এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং, জাজ্জ্বল্যমানং নিজতেজসা সতী।
কৃত্বাট্টাহাসং সহসা মহাস্বনং, সোত্তিষ্ঠমানা বিররাজ তৎপুরঃ॥ ১॥
তথাবিধাকারবতীং নিরীক্ষ্য তাং, বিহায় ধৈর্য্যং সহচেতসা তদা।
চকার বুদ্ধিং স পলায়নে ভয়াৎ, সমভ্যধাবচ্চ দিশো বিমূঢ়বৎ॥ ২॥
তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্য বৈ, দাক্ষায়ণী বারয়িতুং পুনঃ পুনঃ।
চকার মাভৈরিতি শব্দমুচ্চৈঃ, সাট্টাট্টহাসং সুমহাভয়ানকম্॥ ৩॥
নিশম্য তদ্বাক্যমতীবসংভ্রমা-ত্তস্থৌ ন শম্ভুঃ ক্ষণমপ্যমুত্র বৈ।
দিগন্তমাগন্তমতীববেগতঃ, সমভ্যধাবদ্ ভয়বিহ্বলস্তদা॥ ৪॥
এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াতিভূতং, দয়ান্বিতা সা প্রতিবারণেচ্ছুঃ।
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষণমগ্রতঃ স্থিতা, তদা চ ভূত্বা দশমূর্ত্তয়ঃ পরা॥ ৫॥
সংধাবমানো গিরিশোঽতিবেগতঃ, প্রাপ্নোতি যাং যাং দিশমেব তত্র তাং।
ভয়ানকং বীক্ষ্য ভয়েন বিদ্রুতো, দিশাং তথান্যাং প্রতিচাভ্যধাবত॥ ৬॥
ন প্রাপ্য শম্ভুর্হি ভয়োজ্‌ঝিতাং দিশং, তত্রৈব সংমুদ্রিতচক্ষু-রাস্থিতঃ।
উন্মীল্য নেত্রাণি দদর্শ তাং পুরঃ, শ্যামাং লসৎপঙ্কজসন্নিভাননাম্॥ ৭॥
হসন্মুখীং পীনপয়োধরদ্বয়াং, দিগম্বরীং ভীমবিশাললোচনাং।
বিমুক্তকেশীং রবিকোটিসন্নিভাং, চতুর্ভুজাং দক্ষিণসম্মুখস্থিতাম্॥ ৮॥

এবং বিলোক্য তাং শম্ভুর্মহাভীত ইবাব্রবীৎ।
কা ত্বং শ্যামা সতী কুত্র গতা মৎপ্রাণবল্লভা॥ ৯॥

সত্যুবাচ।

ন পশ্যসি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাং।
কথং তবেদৃশী বুদ্ধিঃ মাং ত্বং লক্ষ্যসেঽন্যথা॥ ১০॥

শিব উবাচ।

ত্বং সা যদি সতী দক্ষকন্যা মৎপ্রাণবল্লভা।
কথং তদা কৃষ্ণবর্ণা কথং বাঽভূর্ভয়প্রদা॥
সর্ব্বাসু দিক্ষু এতাঃ কাঃ দেব্যোঽতিভয়দায়িকাঃ।
তৎকাসাং কতমা দেবি বদ মাং ভয়বিহ্বলম্॥

সত্যুবাচ।

অহন্তু প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিসংহারকারিণী।
অভবং দক্ষনিলয়ে ত্বদর্থে গৌরদেহিকা॥

ত্বামেব জিজ্ঞাসুঃ পুরুষং প্রাকৃতীকৃতবশাচ্ছিব।
সাহং পিতুর্মহাযজ্ঞ-বিনাশায় ভয়ানকা।
অভবং ত্বত্ত মা ভীতিং কুরু মত্তো মহেশ্বর॥
দশদিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্ত্তয়ঃ।
সর্ব্বা মমৈব মা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে॥
ত্বং মৎপ্রাণসমো ভর্ত্তা তবাহং বনিতা সতী।
ত্বাং দৃষ্ট্বাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশো ভয়াৎ।
পরিবার্য্য দিশঃ সর্ব্বাস্তবাহং দশধা স্থিতা॥

শিব উবাচ।

ত্বং মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্বামজ্ঞাত্বা মহামোহাত্তবাপ্রিয়তমং বচঃ॥
ময়োক্তং তন্মহাদেবি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি॥
মহাভয়ানকা এতা মূর্ত্তয়স্তব যাঃ শিবে।
আসাং নামানি মে ব্রূহি প্রত্যেকং ভীমলোচনে

দেব্যুবাচ।

এতাঃ সর্ব্বা মহাদেব মহাবিদ্যা মম প্রভো।
আসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু তানি মহেশ্বর॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সুন্দরী বগলামুখী।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নামান্যাসামিমানি বৈ॥

শিব উবাচ।

কস্যাঃ কিং নাম দেবি ত্বং বিশিষ্য চ পৃথক্ পৃথক্।
কথয়স্ব জগদ্ধাত্রি সুপ্রসন্নাসি মে যদি॥

দেব্যুবাচ।

যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা।
শ্যামবর্ণা তু যা দেবী স্বয়মূর্দ্ধে ব্যবস্থিতা।
সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকাল-স্বরূপিণী॥
সব্যে তবেয়ং যা দেবী বিশীর্ষাতিভয়প্রদা।
ইয়ং দেবী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে॥
বামে তবেয়ং যা দেবী সা শম্ভো ভুবনেশ্বরী।
পৃষ্ঠতস্তব যা দেবী বগলা শত্রুসূদনী॥
বহ্নিকোণে তবেয়ং যা বিধবারূপধারিণী।
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী॥

নৈর্ঋত্যাং তব যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরসুন্দরী।
বায়ৌ যা তে মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গিনামিকা ॥
ঐশান্যাং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
অধস্তু ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা ত্বং ভয়ং কুরু ॥
এতাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্ত্তয়ো বহুমূর্ত্তিষু।
ভক্ত্যা সংভজতাং নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাঃ ॥
সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাস্থিস্থঃ সাধকানাং মহেশ্বর।
মারণোচ্চাটন-ক্ষোভ-মোহন-দ্রাবণানি চ।
বশ্য-স্তম্ভন-বিদ্বেষা-দ্যভিপ্রেতানি কুর্ব্বতে ॥
ইমাঃ সর্ব্বা গোপনীয়া ন প্রকাশ্যাঃ কদাচন।
আসাং মন্ত্রং তথা যন্ত্রং পূজাহোমবিধিং তথা।
পুরশ্চর্য্যা-বিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা।
আচারং নিয়মং চাপি সাধকানাং মহেশ্বর।
ত্বমেব বক্ষ্যসি বিভো নান্যো বক্তাত্র বিদ্যতে।
তদেবাগমশাস্ত্রন্তু লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি ॥
আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম শঙ্কর।
তাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
যস্ত্বেতৌ লঙ্ঘয়েন্মোহাৎ কদাচিদপি মূঢ়ধীঃ।
সোঽধঃ পততি হস্তাভ্যাৎ গলিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥
যশ্চাগমং বা বেদং বা সমুল্লঙ্ঘ্যান্যথা ভজেৎ।
তমুদ্ধর্ত্তুমশক্তাহং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥
দ্বাবেব শ্রেয়সাং হেতূ দুরূহাবতিদুর্ঘটৌ।
সুধীভিরপি দুর্জ্ঞেয়ৌ পারাবার-বিবর্জ্জিতৌ ॥
বিবিচ্য চানয়োরৈক্যং মতিমান্ ধর্ম্মমাচরেৎ।
কদাচিদপি মোহেন ভেদয়েন্ন বিচক্ষণঃ।
আসাং যে সাধকাস্তে তু সভায়াং বৈষ্ণবা ইব।
ময্যর্পিতান্তঃকরণা ভবেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ॥
মন্ত্রং যন্ত্রঞ্চ কবচং দত্তং যদ্গুরুণা স্বয়ং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন তৎপ্রকাশ্যং ন কুত্রচিৎ ॥
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদশুভং ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥

ইতি তে কথিতং তত্ত্বং মহাদেব মহামতে।
অহং তব প্রিয়তমা ত্বঞ্চ মেতি প্রিয়ঃ পতিঃ ॥
পিতুঃ প্রজাপতের্দর্প-নাশায়াদ্য ব্রজাম্যহং।
তদাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বং ন গচ্ছসি চেদ্‌যদি ॥
ইতি দেব মমাভীষ্টং ত্বয়ৈবানুমতাপ্যহং।
গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতু-র্দক্ষপ্রজাপতেঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মহাভীত ইব স্থিতঃ।
প্রোবাচ বচনং শম্ভুঃ কালীং ভীমবিলোচনাম্‌ ॥

শিব উবাচ।

জানে ত্বাং পমেশানীং পূর্ণাং প্রকৃতিমুত্তমাং।
অজানতা মহামোহাদ্‌ যদুক্তং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতা,
স্বতন্ত্রা পরমা শক্তিঃ কস্তে বিধিনিষেধকঃ ॥
ত্বঞ্চেদ্‌ গমিষ্যসি শিবে দক্ষযজ্ঞবিনাশনে।
কা মে শক্তি-স্ত্বাং নিষেদ্ধুং কথং তত্রাস্মি বা ক্ষমঃ ॥
যচ্চোক্তমতিমোহেন মত্বাত্মানং পতিং তব।
তৎ ক্ষমস্ব মহেশানি যথা রুচি তথা কুরু ॥

দক্ষনন্দিনী সতী মহেশ্বর কর্তৃক এইরূপে উক্তা হইয়া ক্রোধভরে আরক্ত লোচনে ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিলেন। শঙ্কর বহু কঠোর তপস্যার দ্বারা প্রার্থনা করিয়া আমারই বরপ্রভাবে আমাকে পত্নীভাবে লাভ করিয়া আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আজ অতি সুদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। তাই আমার লীলাবতারে পতি হইলেও এই দর্পিষ্ট মহাদেবকে এবং দাম্ভিক পিতা প্রজাপতিকেও পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য স্ব-স্থান কৈবল্যধামে নিজের স্বরূপলীলায় অবস্থিতা হইব। তৎপর পুনর্ব্বার এই মহেশ্বর কর্ত্তৃক কঠোর সাধনায় সাধিতা ও প্রার্থিতা হইয়া হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া পুনর্ব্বার শম্ভুর পত্নী-রূপ পরিগ্রহ করিব। দাক্ষায়ণী ক্ষণকাল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভয়ঙ্কর ত্রিনেত্র বিস্ফারিত করিয়া শঙ্করকে মোহাক্রান্ত করিলেন। শম্ভু দেবীকে এইরূপে ক্রোধবিস্ফুরিতাধরা এবং কালাগ্নিতুল্য-নয়না নিরীক্ষণ করিয়া স্তব্ধাক্ষ (স্তম্ভিত-দৃষ্টি) হইলেন। ভীতচেতা মহেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপে নিরীক্ষ্যমাণা হইয়া দেবী সহসা ভীমবদনে ভীমদংষ্ট্রা বিকাশপূর্ব্বক অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। মহেশ্বর সেই ভীষণ হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাভীত এবং বিমুগ্ধবৎ হইয়া অতিকষ্টে ত্রিনেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক একবার মাত্র জগদম্বার সেই ভুবন-

ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এইরূপে দৃশ্যমানা দাক্ষায়ণী তৎক্ষণাৎ নিজ কনককান্তি পরিহারপূর্ব্বক সহসা দলিতাঞ্জনপুঞ্জপ্রভা ধারণ করিলেন। দেবীর সে মূর্ত্তি দিগম্বরা বিগলিতকেশা ললজ্জিহ্বা চতুর্ভুজা কামালসকলেবরা অত্যুগ্রা ক্রোধনিঃসৃত-স্বেদধারা-সমুজ্জ্বলা মহাভীমা ঘোররাবা মুণ্ডমালাবিমণ্ডিতা উদ্যৎকোটিমার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্তপ্রভা চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা এবং উদ্যদাদিত্য-কিরণারুণকিরীট-বিমণ্ডিতমস্তকা।

সতী এইরূপ নিজতেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সহসা মহানির্ঘোষ অট্টহাস্য করিয়া মহেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। মহাদেব দেবীকে তথাবিধ অদ্ভুত-মূর্ত্তিসম্পন্না নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্য পরিহারপূর্ব্বক মনে মনে 'পলায়ন করিবেন' ইহাই স্থির করিলেন এবং ভয়ে বিমুগ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্ত অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দাক্ষায়ণী কৈলাসনাথকে এইরূপে ভয়বিদ্রাবিত দেখিয়া তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য বারংবার মহাভয়ঙ্কর অট্ট-অট্ট-হাস্যপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে 'মা ভৈঃ, মা ভৈঃ' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেবীর সেই বিকট অট্ট-অট্ট-হাস্য-সহকৃত মাভৈঃ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমভরে মহাদেব আর ক্ষণমাত্রও তথাতে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তখন একেবারে ভয়বিহ্বল হইয়া অতিবেগে দিগন্তে পলায়ন করিবার জন্য পুনর্ব্বার ধাবিত হইলেন। পরমেশ্বরী পতিকে এইরূপ ভয়ে অভিভূত দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাঁহাকে প্রতিবারণের নিমিত্ত দশদিগন্ত পূর্ণ করিয়া দশ-মহাবিদ্যারূপে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা হইলেন। তখন অতিবেগে ধাবমান হইয়া গিরিশ যেদিকে উপস্থিত হন, সেইদিকেই দেখিতে পান সম্মুখে এক একটি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, ভয়ে সে দিক পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে ধাবিত হন, আবার সম্মুখে দেখিতে পান সেই মূর্ত্তি। এইরূপে বারংবার দশদিগন্তে ধাবিত হইয়াও যখন দেখিলেন কোন দিক আর ভয়শূন্য নাই, তখন নিতান্ত অনুপায় হইয়া নয়নত্রয় মুদ্রিত করিয়া ধরাতলে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আন্তরিক বিভীষিকা ভয়ে আবার যেমন ত্রিনয়ন উন্মীলন করিয়াছেন, অমনি সম্মুখে দেখিলেন বিকসিত-ইন্দীবর-সুন্দরাননা মন্দস্মিতবিম্বধরা পীনোন্নতপয়োধরা ভীমবিশাললোচনা বিমুক্তকেশী চতুর্ভুজা দিগম্বরী নবনীরদশ্যামকান্তি অথচ কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বলপ্রভা দক্ষিণ দিককে সম্মুখভাগে রাখিয়া অবস্থিতা দক্ষিণার দিব্যমূর্ত্তি। জগদম্বার এইরূপ ভুবনসুন্দর প্রশান্ত অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াও ভগবান শম্ভু যেন মহাভীত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শ্যামারূপিণী আপনি কে? আমার প্রাণবল্লভা সতী কোথায়? দেবী বলিলেন, মহাদেব! এই আমি তোমার সতী—তোমার সম্মুখেই রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না? মহাদেব! কেন তোমার আজ ঈদৃশ বুদ্ধি-বিভ্রান্তি উপস্থিত হইল? তুমি কি আমাকে তোমার সতী হইতে বিভিন্না বলিয়া লক্ষ্য করিতেছ?

মহাদেব বলিলেন, তুমি যদি আমার সেই প্রাণবল্লভা দক্ষকুমারী, তবে কৃষ্ণবর্ণাই বা কেন হইলে ? ভয়ঙ্করীই বা কেন হইলে ?

আমার সমস্তদিকে অতিভয়ঙ্করী ইঁহারাই বা কাহারা ? তুমিই ইঁহাদিগের মধ্যে কে—তাহা স্বরূপতঃ বল। আমি এই সকল অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া নিতান্তই ভয়বিহ্বল হইয়াছি।

সতী বলিলেন, আমি সূক্ষ্মা অবাঙ্‌মনসগোচরা সৃষ্টিসংহারকারিণী মহাপ্রকৃতি, কেবল তোমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত তপস্যার বরদানে অঙ্গীকার বশতঃ তোমাকেই পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত পত্নীরূপে তোমারই বিমোহনের নিমিত্ত, স্বরূপ সম্বরণ করিয়া দক্ষালয়ে গৌরাঙ্গীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলাম। সেই আমি আজ পিতা দক্ষ প্রজাপতির মহাযজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত এই মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি। কিন্তু মহেশ্বর। এ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দক্ষেরই ভয়োৎপাদনের জন্য, তোমার ভয়ের জন্য নহে। অতএব তুমি আমাকে দর্শন করিয়া ভীত হইও না। দশদিকে আমার এই যে মহাভীমা দশমূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, জানিও—এ সমস্ত আমারই মূর্ত্তি। শম্ভো! তুমি মহাজ্ঞানী, জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ দর্শন কর, ভয় করিও না। তুমি আমার সেই প্রাণসম স্বামী, আমিও তোমার সেই প্রিয়তমা সতী। আজ তোমাকে মহাভীত এবং দশদিগন্তে ধাবমান দেখিয়া দশদিকে তোমাকে বেষ্টন করিয়া আমিই এই দশবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থিতা হইয়াছি।

শিব বলিলেন, তুমি সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী সূক্ষ্মা, অবাঙ্‌মনসগোচরা। অবাঙ্‌মনসগোচরার অনভিজ্ঞান অসম্ভব নহে, মহাদেবি। তাই মহামোহবশতঃ তোমার স্বরূপতত্ত্ব ভুলিয়া তোমাকে যে সকল অপ্রিয় বাক্য আমি প্রয়োগ করিয়াছি, পরমেশ্বরি! আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর। শিবসীমন্তিনী! দশদিকে তোমার এই যে মহাভয়ঙ্করী দশবিধ মূর্ত্তি আবির্ভূতা, ভীমলোচনে! ইঁহাদিগের প্রত্যেকের নাম আমাকে বল।

দেবী বলিলেন, মহাদেব! এই সকল মহাবিদ্যা আমারই মূর্ত্তিভেদ। ইঁহাদের নামসকল কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী (কমলাত্মিকা), বগলামুখী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, ইহাই ইঁহাদিগের নাম।

শিব বলিলেন, দেবি! জগদ্ধাত্রি! যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া থাক, তবে এই প্রত্যক্ষ দশমূর্ত্তির মধ্যে কাহার কি নাম তাহা প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ কর।

দেবী বলিলেন, তোমার সম্মুখভাগে আমার এই যে কৃষ্ণবর্ণা মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, যাঁহার দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তোমার দৃষ্টি স্তম্ভিত হওয়ায় বার বার তুমি

যাঁহাকে ভীমলোচনা বলিয়া সম্বোধন করিতেছ, এই আমিই স্বয়ং সেই কালী। যিনি তোমার ঊর্দ্ধভাগে বিরাজিতা শ্যামবর্ণা, ইনিই মহাকাল-স্বরূপিণী মহাবিদ্যা তারা। মহামতে! যিনি তোমার দক্ষিণে এই শীর্ষহীনা অতিভয়ঙ্করী দেবী, ইনিই মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। শম্ভো! যিনি তোমার বামভাগে অবস্থিতা, ইনিই দেবী ভুবনেশ্বরী। যিনি তোমার পৃষ্ঠভাগে অবস্থিতা, ইনিই শত্রুসংহারকারিণী দেবী বগলামুখী। তিনি তোমার অগ্নিকোণে এই বিধবারূপ-ধারিণী, ইনিই সেই মহাবিদ্যা মহেশ্বরী দেবী ধূমাবতী। যিনি তোমার নৈঋ্র্ত কোণে অবস্থিতা, ইনিই ত্রিপুরসুন্দরী (কমলাত্মিকা)। যিনি বায়ুকোণে অধিষ্ঠিতা, ইনিই মহাবিদ্যা মাতঙ্গী। যিনি তোমার ঈশানকোণে অবস্থিতা, ইনিই মহেশ্বরী ষোড়শী। যিনি তোমার অধোভাগে অধিষ্ঠিতা আমার এই ভীমা মূর্ত্তিই ভৈরবী।
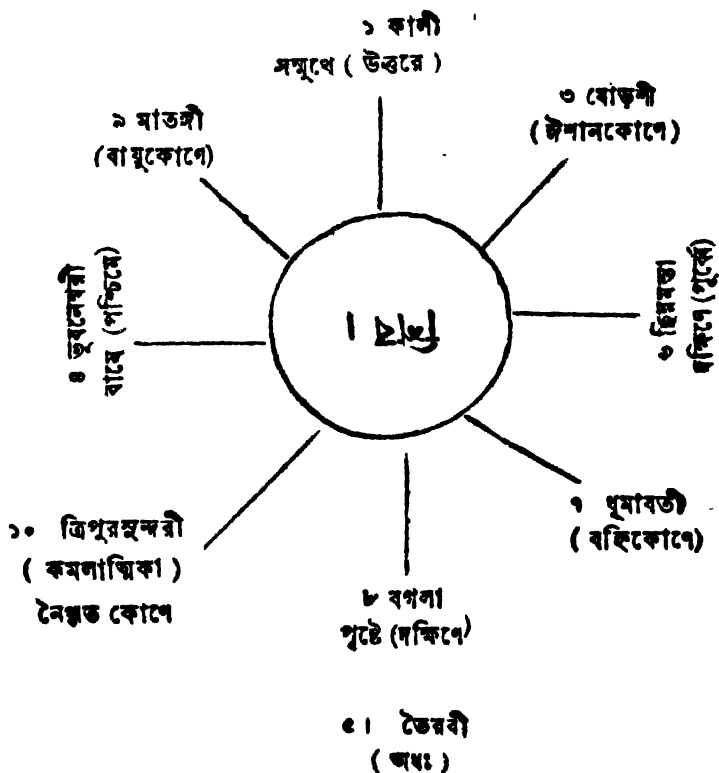
শম্ভো! ভবভয়হারিণী আমার এই দশবিধ বিভূতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তুমি ভীত হইও না। আমার বহুমূর্ত্তির (নবকোটি বিভূতিমূর্ত্তির) মধ্যে এই দশমহাবিদ্যামূর্ত্তিই প্রকৃষ্টা (পূর্ণবিভূতি) বলিয়া জানিবে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক

ইঁহাদিগকে ভজনা করে, সেই সকল ভক্ত সাধকের পক্ষে ইঁহারা নিয়ত চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। মহেশ্বর! মারণ উচ্চাটন ক্ষোভন মোহন দ্রাবণ বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষণ প্রভৃতি যাহা কিছু সাধকগণের অভিপ্রেত সে সমস্ত অভীষ্ট ইঁহারা প্রদান করেন। এই দশমহাবিদ্যা সকলেই গোপনীয়া, কেহ কদাচ প্রকাশ্যা নহেন। ইঁহাদিগের মন্ত্র যন্ত্র পূজা হোম পুরশ্চরণ স্তোত্র কবচ আচার নিয়ম ইত্যাদি যাহা কিছু সাধকগণের প্রয়োজনীয়, মহেশ্বর! তুমিই তাহার বিধানব্যাখ্যা করিবে, জগতে তাহার অন্য বক্তা কেহ নাই। তোমার মুখনির্গত আগমশাস্ত্র ত্রিলোক-বিখ্যাত হইবে। শঙ্কর! আগম এবং বেদ এই উভয় আমার উভয় বাহুস্বরূপ। সেই উভয় বাহু দ্বারাই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ আমি ধারণ করিয়া আছি অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতেছে। যে মূঢ়বুদ্ধি জীব মোহবশতঃ আমার সেই বাহুদ্বয় লঙ্ঘন করে, সে আবার এই ত্রিভুবন-নিস্তারহেতু হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। সেই আগম ও বেদই জীবজগতের কল্যাণের একমাত্র হেতু, কিন্তু এই উভয় শাস্ত্রই অতিদুরূহ এবং তদুক্ত অনুষ্ঠানও অতিদুর্ঘট। তাহার তত্ত্ব সুবুদ্ধিগণেরও দুর্জ্ঞেয় এবং ঐ উভয় শাস্ত্রই পারাপার-বিবর্জ্জিত অপার অনন্ত। আগম বা বেদকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য উপায়ে যে আমাকে উপাসনা করে, মহাদেব! তাহাকে উদ্ধার করিতে আমি অসমর্থা, ইহা অতিবাদ নহে—নিঃসংশয় সত্য বলিয়া জান। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক জানিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবেন, মোহবশতঃ বিচক্ষণ কদাচ এই উভয়কে বিভিন্ন জ্ঞান করিবেন না। যাঁহারা এই পূর্ব্বোক্ত দশমহাবিদ্যার উপাসক হইবেন, সাধারণ সমক্ষে তাঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করিবেন এবং অন্তঃকরণ আমাতে অর্পণ করিয়া সুসমাহিত হইবেন। ইঁহাদিগের মন্ত্র যন্ত্র কবচ ইত্যাদি যাহা কিছু গুরুদত্ত বস্তু, সাধক প্রযত্ন সহকারে তাহা গোপন করিবেন, কোথাও প্রকাশ করিবেন না। প্রকাশ হইলে সিদ্ধির হানি হইবে এবং অমঙ্গল ঘটিবে। এ জন্য সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা গোপন করিবেন। মহাদেব! প্রসঙ্গক্রমে এই উপাসনাতত্ত্ব তোমার নিকট কথিত হইল। আমার এই দশবিধ মূর্ত্তি দর্শনে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া স্বরূপতঃ আমার অভিন্ন প্রেম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইও না—আমি তোমার সেই প্রিয়তমা এবং তুমিও আমার সেই অতিপ্রিয় পতিরূপেই অবস্থিত রহিয়াছ। দেবদেব! অদ্য কেবল সেই দর্পান্ধ পিতা প্রজাপতির দর্পনাশ করিবার জন্য গমন করিব। তাই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যদি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত না হও তবে অনুমতি কর, আমি যাত্রা করিব। দেব! ত্বৎকর্ত্তৃক অনুমতা হইয়াই পিতা দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বিনাশ নিমিত্ত গমন করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমাকে ভয়প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে।

নারদের প্রতি মহাদেব বলিলেন, দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শম্ভু যেন মহাভীত হইয়া ভীমলোচনা কালীকে বলিলেন, দেবি! জানি তুমি পরমেশ্বরী পরমোত্তমা পূর্ণা-প্রকৃতি, মহামোহ-প্রযুক্ত তাহা বিস্মৃত হইয়া আমি তোমাকে যাহা অযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি সে অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আদ্যা পরমা বিদ্যা, সর্ব্বভূতে অবস্থিতা সর্ব্বন্তর্যামিনী, তুমি স্বতন্ত্রা, সত্যসঙ্কল্পরূপিণী স্বাধীন—ইচ্ছাময়ী। তুমি পরমা, সর্ব্বেশ্বরের অধীশ্বরী। তুমি শক্তি—নিত্যচৈতন্যরূপিণী সদানন্দময়ী। তুমি বিধি নিষেধের অতীতা তুরীয়ব্রহ্মরূপিণী, তোমার বিধি বা বিধানকর্ত্তা নিষেধ বা নিষেধকর্ত্তা কে আছে? শিবে! তুমি শিবশক্তিস্বরূপিণী, তুমি যদি স্বয়ং দক্ষযজ্ঞ বিনাশে গমন কর, তবে আর তোমাকে নিষেধ করিতে শিবের শক্তি কোথায়? আর সেই নিষেধ করিতেই বা আমি সাহসী হইব কেন? তোমারই মহামায়ায় অতিমুগ্ধ হইয়া 'পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে বা পতিনিন্দা শ্রবণ করিবে' ইত্যাদি 'বাক্যে আমি বারংবার আমাকে যে তোমার 'পতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, মহেশ্বরি! সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ইচ্ছাময়ি! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

শাস্ত্রার্থ-দর্শিন্! মহাপ্রলয়কারী মহারুদ্র পর্য্যন্ত যাহা দর্শন করিয়া ভীত কম্পিত স্তম্ভিত পলায়িত, সে বিভূতি বিস্তারও কি তোমার মতে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত। দেবীযুদ্ধে নিশুম্ভ নিপাতের পর ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী ইন্দ্রাণী কৌমারী বারাহী নারসিংহী চামুণ্ডা কৌষিকী এবং শিবদূতীকে রণোন্মাদিনী দেখিয়া শুম্ভ যখন সেই রণরঙ্গিনীকে ব্যঙ্গস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

বলাবলেপ-দুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥

ভুজবলগর্ব্বিতে দুর্গে! আর গর্ব্ব বহন করিও না, অন্যান্য দেবশক্তি-সমূহের সাহায্য অবলম্বন করিয়া যাহার যুদ্ধ, একাকিনী ত্রিভুবনবিজয়িনী বলিয়া তাহার এত অভিমানিনী হওয়া অনুচিত। অন্তর্যামিনী কৃপা করিতে বসিয়া আর কৃপণতা করিবেন কেন? সমরক্ষেত্রে শুম্ভকে আজ সেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, যাহা সিদ্ধ শুদ্ধ জীবন্মুক্ত যোগীন্দ্রগণেরও অশ্রুতপূর্ব্ব।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

জগদম্বা ইহা জানেন যে, দৈত্যরাজ দুষ্টবুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়াছেন অথবা স্বভাবতঃই দুষ্টপ্রকৃতি। কিন্তু কি জানি 'অপরাধ-পরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং'—পুত্র শতসহস্র অপরাধে আবৃত হইলেও জননী যেমন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না, অধিকন্ত সহাস্য কৃত্রিম-কোপ-কটাক্ষে চাহিয়া 'দুষ্ট!' বলিয়া হাসিয়া

যেমন আনন্দে তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লয়েন—আজ জগজ্জননীও তেমনই কৃত্রিমকোপ-কুঞ্চিত কৃপালোচনে চাহিয়া শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, দুষ্ট! আমি একাই আছি, এ জগতে আমার আর দ্বিতীয়া কে? কতকগুলি দেবশক্তি দেখিয়া তোমার সন্দেহ হইয়াছে, সে সন্দেহ এই ভঞ্জন করি (মা যেন আদর করিয়া বলিতেছেন, দুষ্ট! এত দেবশক্তি দেখিতেছ, তাই কৌশল করিয়া তাহার মূলতত্ত্ব জানিতে চাও?) এই দেখ। আমার বিভূতিসকল আমাতেই প্রবেশ করে।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ং।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥

অনন্তর ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামাত্রই ব্রহ্মাণীপ্রমুখ দেবীবর্গ ব্রহ্মময়ীর কলেবরে প্রবেশ করিলেন। শুম্ভ দেখিলেন, সমরাঙ্গনে একাকিনী অম্বিকা বই আর কেহ নাই। তখন দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন—

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।

বিভূতিবিস্তারপূর্ব্বক আমি যে বহুরূপে অবস্থিতা হইয়াছিলাম সে সমস্ত রূপ সংহরণ করিলাম, যুদ্ধস্থলে এই আমি একাকিনী রহিলাম—এই বার শুম্ভ! স্থির হও।

অনেক মা দেখিয়া বালক যেন আপন মাকে চিনিতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, তাই যেন মা নিজ-স্বরূপের পরিচয় দিয়া সন্তানকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, দেখিলে ত! আমিই মা, এখন স্থির হও। কিন্তু শুম্ভ ত নিজের পরিচয় না দিয়া কেবল তাঁহার পরিচয় পাইয়াই শান্ত হইবার পাত্র নহেন। তাই বীর-জননীর বীর সন্তান বীরাস্ত্রে বীর-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বীর-সাধনে অগ্রসর হইলেন। মা! যে আপন বাহুবলে দৌড়াইয়া গিয়া তোমার কোলে উঠিতে পারে, সে ত তোমার করুণার ভিখারী নহে। তাই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসতল বিকম্পিত করিয়া তুমুল রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, ইহলোক পরলোকের জয়-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চিরবিজয়ী দৈত্যরাজ সম্মুখ-সমরে দণ্ডায়মান হইলেন। শাস্ত্র বলিতেছেন, যিনি দেবীর শূলাগ্র-বিক্ষত হৃদয়ে গতাসু হইয়া নভঃকক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইলে তাঁহার দুর্ব্বহ দেহভারে সপ্তকুলাচল সপ্তসমুদ্র সপ্তদ্বীপ-সম্বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল বিচলিত হইয়াছিল, যিনি হত হইলে অখিল লোক প্রসন্ন হইয়াছিল এবং নিখিল জগৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিল, ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন নভোমণ্ডল নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে যে সকল উৎপাত-মেঘ ইতস্ততঃ কেবল উল্কাবমন করিতেছিল তাহারা প্রশমিত হইল। যাঁহার ঘনঘোর কোদণ্ডটঙ্কারে এবং বজ্রনিস্বন-হুহুঙ্কারে স্রোতস্বতী নদীকুল স্তম্ভিত হইয়া স্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন তাঁহারই

নিপাতে নিশঙ্ক হৃদয়ে নিজ নিজ পথে যাত্রা করিলেন। দেবগণ নিজ নিজ অন্তঃকরণে অপার আনন্দভরে আক্রান্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ ললিতস্বরে সঙ্গীতসাধনে নিযুক্ত হইলেন। কিন্নর সিদ্ধ সাধ্যগণ বাদ্য-বিনোদে রত হইলেন। অপ্সরোগণের নৃত্য আরম্ভ হইল। পবিত্র বায়ুসকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবাকর এতদিনে নিজ প্রখর প্রভা ধারণ করিলেন। অগ্নিগণ এতদিনে শান্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। এতদিনে দিগ্-দিগন্তে তাঁহাদিগের প্রতিধ্বনি প্রশান্ত হইল।

সাধক! যাঁহার ভয়ে জগতের এই বিধিনিয়ত নৈসর্গিক প্রক্রিয়া-দ্বারসকল রুদ্ধ হইয়াছিল, কাহার সহিত তাঁহার প্রতাপের তুলনা হয়? আজ সেই ত্রৈলোক্য-সম্রাট্ মায়াবী শুম্ভ যাঁহার মহামায়ায় বিমুগ্ধ, তাঁহার বিভূতি অল্প বলিয়া মনে করা কি তোমার আমার জীবনের অল্পতা, বুদ্ধির অল্পতা, সৌভাগ্যের অল্পতা, সাধনার অল্পতা বলিয়া মনে হয় না? শতস্কন্ধ রাবণবধে ভগবান রামচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহার মায়ায় আত্মবিস্মৃত, তাঁহার সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি কি ক্ষুদ্র? মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ অবতারে যাঁহার লীলায় বেদ উদ্ধৃত, জগৎ ধৃত এবং ধরিত্রীমণ্ডল দংষ্ট্রাগ্রে সংস্থাপিত, তাঁহার সে লীলা কি পূর্ণ ঐশ শক্তির পরিচয় নহে? ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া অদ্ভুত নৃসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব, মাতা যশোদার সম্মুখে নিজ বদনমণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন, স্তন্য আকর্ষণে পূতনা-প্রাণনিধন, সপ্তমবর্ষীয় বালকের এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ, মায়িক গোবৎস গো গোপাল সঞ্চারণে ত্রিভুবনের অজ্ঞাতসারে বৎসরাবধি ব্রহ্মার বিমোহন, নবকৈশোর বয়ঃক্রমে বহুযুগান্ততপঃসিদ্ধা প্রেমোন্মাদিনী অসংখ্য গোপকামিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যুগপৎ সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রহ লীলাচ্ছলে কন্দর্পদর্প-নির্ম্মূলন, যমুনাজলে অক্রূরকে বিরাট রূপ প্রদর্শন, যদিও পূর্ণব্রহ্মের পক্ষে ইহাই পূর্ণ বিভূতির পরিচয় নহে। তথাপি, মানব! জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমি কি ইহার অতিরিক্ত কিছু স্বপ্নেও কখন চিন্তা বা ধারণা করতে পারি? জীবজগৎ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকটে ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত পরিচয় অনেক পাইতে পারিত; কিন্তু সে ইচ্ছা করিতে তাহার সাধ্য নাই। এতদূর তোমার ঐশী শক্তির পরিচয় দাও, এইরূপে তাঁহার মহিমার 'এতদূর'—এই ইয়ত্তা করিতে জীবের বুদ্ধি অসমর্থ। তাই ভক্তগণের তপস্যার ফলে ভূভারহরণচ্ছলে তিনি যে পর্যন্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই জীবের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। তাই বলি, আধার ক্ষুদ্র বলিয়া দুঃখ করিও না। আধার স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র নহে, ক্ষুদ্র জগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্য্যোদ্ধারের জন্যই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ। ক্ষুদ্র জগতের জীব তুমি আমি তাঁহার চক্ষে কীটানুকীট পরমাণু বলিয়াও গণ্য নই। তাঁহার সেই ব্রহ্মাদিদেবদুর্লভ বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে তোমার আমার অধিকার কি? দ্বিতীয়তঃ, মহত্ত্ব বৃহত্ত্ব লইয়া তুমি আমি যেমন অন্তের

নিকটে প্রভুত্ব প্রদর্শন করি বিশ্বপ্রভুর সেরূপ প্রভুত্ব-প্রদর্শনের প্রয়োজন কিছু নাই। শুম্ভ নিশুম্ভ রাবণ কুম্ভকর্ণই যাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার না করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই, তুমি আমি আর তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার-করিয়া কি করিব ? তাই বলি বামন-দেবকে 'বামন' বলিয়া মহাবলী বলিরাজ যখন নিস্তার পান নাই, তখন তুমি আমি বামন হইয়া আর সে ভক্তহৃদয় আকাশের চন্দ্রে হস্তক্ষেপ করিতে যাই কেন ? জলের দৃষ্টান্ত লইয়া তুমি যেমন বলিবে, ক্ষুদ্র আধারে বৃহৎশক্তি থাকিতে পারে না, অগ্নির দৃষ্টান্ত লইয়া আমি তেমনই বলিতে পারি, অতি ক্ষুদ্র আধারের অভ্যন্তরেও অনন্ত শক্তি নিত্য-নিগূঢ় রহিয়াছে। কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ তোমার পর্ব্বতাকৃতি তৃণের উপর ফেলিয়া দাও দেখিবে, দাহ্যবস্তুর সংযোগে সেই স্ফুলিঙ্গে তৃণপর্ব্বত ব্যাপিয়া গিয়াছে, গগনাঙ্গন-সংস্পর্শি বিপুলশিখা নিজপ্রভাপটলে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিতেছে, তখন স্ফুলিঙ্গ আর স্ফুলিঙ্গ নাই—দিগ্‌দাহকারী ভৈরবজ্বালাবলী-সঙ্কুল কালানলে পরিণত হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবানের অবতারমূর্ত্তি তুমি যত কেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে না কর, ঐশ বিভূতি-পরিচয়ের উপযুক্ত পদার্থ আনিয়া দাও, তখন দেখিবে প্রহ্লাদের নৃসিংহের ন্যায়, অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, যশোদার গোপালের ন্যায়, গোপিকার শ্যামসুন্দরের ন্যায়, অক্রূরের নন্দনন্দনের ন্যায়, শুম্ভের শ্যামার ন্যায়, হিমালয়ের উমার ন্যায়, রামের সীতার ন্যায়, শিবের সতীর ন্যায়, শক্তি শক্তিমানের অনন্ত ব্রহ্মলীলায় ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া যাইবে। সেইদিন বুঝিবে তাঁহার মহিমা ক্ষুদ্র নহে, জীবের অধিকার ক্ষুদ্র, তাঁহার রূপ ক্ষুদ্র নহে জীবের চক্ষু ক্ষুদ্র, তিনি ক্ষুদ্র নহেন, ক্ষুদ্র কেবল তুমি আমি। তাই বলি সাধক ! ক্ষুদ্র আধারে অনন্ত শক্তি থাকিতে পারেন না, এ সিদ্ধান্ত সহায় করিয়া সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়ার মহিমা পরীক্ষা করিতে আর অগ্রসর হইও না। এই সময়ে সময় থাকিতে চরণে শরণাপন্ন হইয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া বল, মা ! আমার বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধান্ত সব ফুরাইয়াছে, এখন তুমি আপনি কৃপা করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায়, শুম্ভের ন্যায় আমার এই সন্দেহ-সমরে দাঁড়াইয়া একবার তোমার স্বরূপ-রূপে ভুবন ভরিয়া দাও, দেখিয়া জীবন সার্থক, জন্ম সার্থক, নয়ন সার্থক করিয়া লই, মা ! আমি তোমার হইয়া তোমাতেই ডুবিয়া পড়ি।

সাধক ! অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আবার বলিতে হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকগণ-মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতে আরও চারিটি বচন তাঁহাদের অনুকূল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। উক্ত চারিটি বচন তাঁহাদের প্রমাণ হইলেও 'প্রমাণ যে কেমন প্রমাণ' তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য ঐ চারিটি বচনের আদ্যন্তস্থিত দেবীর প্রশ্ন এবং সদাশিবের প্রত্যুত্তরাত্মক সমস্ত অংশটিই আমাদিগকে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে। ইহা দেখিলেই সুবুদ্ধিগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, সহস্রমারী না হইলে চিকিৎসক হওয়া কেমন দুর্ঘট ! মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্দ্দশোল্লাসে—

শ্রীদেব্যুবাচ

যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্ বিভো।
বিধেয়ং তত্র কিং ভূত্যৈ তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥
অপূজনীয়া কৈর্দোষৈঃ ভবেয়ুর্দ্দেবমূর্ত্তয়ঃ।
ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ।
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বিগুণং দিনত্রয়ে ॥ ৩ ॥
ততঃ ষন্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ।
তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥ ৪ ॥
ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্সংস্কারবিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৫ ॥
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা।
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্ বুধঃ ॥ ৬ ॥
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥
মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ৮ ॥
যদ্ যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯ ॥
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০ ॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥ ১১ ॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১২ ॥
যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেম্বাসক্তচেতসঃ।
প্রয়ান্ত্যয়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ ১৫ ॥

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥ ১৬॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥ ১৭॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥ ১৮॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১৯॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ২০॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ২১
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥ ২২
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৩॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃ'ণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥ ২৪॥
মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥ ২৫॥
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥ ২৬॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়া ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ ২৭॥
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা॥ ২৮॥
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥ ২৯॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ-স্তপোভি র্নিয়মব্রতৈঃ॥ ৩০॥
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দ-মেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যান-ধারণা॥ ৩১॥

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ৩২ ॥
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ৩৪ ॥
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ৩৫ ॥
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
জন্ম-যৌবন-বার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে ॥ ৩৮ ॥
যথা সলিল-চাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ৩৯ ॥
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ৪০ ॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽন্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ৪৫ ॥
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।
চতুর্ব্বিধাবধূতানামেতদেব পরং ধনম্ ॥ ৪৬ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে চতুর্দশ উল্লাসে শ্রীমন্মহাদেব কর্তৃক দেবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার বিধি ব্যবস্থা কথিত হইলে দেবী কহিলেন, বিভো! যদি অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতার

পূজা বাদ হয়, তাহা হইলে তৎকালে ভক্তগণের কর্ত্তব্য কি তাহা আমাকে স্বরূপতঃ বল। ১। কোন কোন দোষে দেব-মূর্ত্তিসকল পূজার অযোগ্য হয়েন, কোন দোষে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয় এবং সেই সকল দোষ পরিহারের উপায় কি তাহাও বল ॥ ২ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন, একদিন পূজা বাধ হইলে দেবতাকে দ্বিগুণ অর্চ্চনা করিবে, দুইদিন বাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ পূজা করিবে। তিনদিন পূজা বাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিবে। ৩। তারপর ছয়মাস পর্য্যন্ত যদি পূজা বাধ হয় তাহা হইলে স্ব স্ব মন্ত্রাভিমন্ত্রিত অষ্টকলসপূর্ণ জল দ্বারা দেবতার অভিষেক করিয়া পূজা করিবে। ৪। ছয় মাসের পরেও যদি পূজা বাধ হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠাকালীন বিধি অনুসারে দেবতাকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া পূজা করিবে। ৫। দেবমূর্ত্তি খণ্ডিত স্ফুটিত কিম্বা ভগ্ন হইলে জলে বিসর্জ্জন দিবে, বিশেষ দোষযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে সেই দেবমূর্ত্তি আর পূজা করিবে না। ৬। হীনাঙ্গ, স্ফুটিত এবং ভগ্ন দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন দিবে, কিন্তু অস্পৃশ্যজাতির সংস্পর্শ প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলে তাঁহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিবে। ৭। মহাপীঠ এবং অনাদি-লিঙ্গ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষ হইলেও তাহাতে দেবত্বের হানি হয় না, অতএব অভিলষিত সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাপীঠে এবং অনাদি লিঙ্গে সর্ব্বদা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। ৮। মহামায়ে! কর্ম্মাধিকারী মানবগণের মুক্তির নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সবিশেষরূপে সে সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। ৯। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যেন ভবিষ্য কাললক্ষ্যে ভগবান মহাকালের ললাটনেত্র বিস্ফারিত হইল।

আজকাল কর্ম্মত্যাগী এমন তত্ত্বজ্ঞানী অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, 'কর্ম্মকাণ্ডও ত কেবল অজ্ঞানের জন্য বই নয়, যাহার জ্ঞানের দয় হইয়াছে সে কর্ম্ম করিবে কেন ?' দুঃখের কথা বলিব কি, যাঁহারা এই সকল কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মকারী। তবেই এখানে কর্ম্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, দেবতার উপাসনার জন্য যে কর্ম্ম তাহাই অজ্ঞানগণের নিমিত্ত। তদ্ভিন্ন স্ত্রী পুত্রাদির জন্য যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন তাহা জ্ঞানীকেও অবশ্য করিতে হইবে। কেন না তাঁহাদিগের শাস্ত্র তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন—'তৎপ্রিয়-কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব'। যাহা হউক, এই সকল ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই যেন সকল জ্ঞানীর অন্তর্যামী ভগবান্ আবার বলিতেছেন—

দেহধারী জীবমাত্রেই কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণার্দ্ধও অবস্থিত হইতে পারে না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীব বাধ্য হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ কেহ যেমন বায়ুর গতি রুদ্ধ করিতে না পারিয়া সকলেই তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ

কর্ম্মের অনিবার্য্য গতি কেহ রোধ করিতে না পারিয়া সকলেই তাহার অনুবর্ত্তী হয়। ১০। জীব কর্ম্ম দ্বারাই সুখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশেই জাত মৃত এবং অবস্থিত হয়। ১১। এজন্য সাধনযোগে আমি বহুবিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, অল্পজ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্য অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির পরবর্ত্তী অবস্থায় উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য এবং দুশ্চেষ্টিত নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ সর্ব্বদা সাধু-সঙ্কল্পে হৃদয় ব্যাপৃত থাকিলে দুষ্কার্য্যের চিন্তাই আদৌ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে না এইজন্য। ১৩। (এতক্ষণে কর্ম্ম-সূত্রটি যেন একটু বিশদবিস্তৃতরূপে ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন) যেহেতু কর্ম্ম দ্বিবিধ—শুভ এবং অশুভ ; অশুভ কর্ম্ম হইতে জীব কর্ম্মফলে আসক্ত-চিত্ত হয় ; সুতরাং কর্ম্মপাশ-নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহলোকে পরলোকে বারংবার যাতায়াত করে, অর্থাৎ ঐ যে বুঝিয়াছ, দেব-দেবীর উপাসনার জন্য কর্ম্ম করিলে তাহা হয় বন্ধনের জন্য, আর সংসারের জন্য যাহা করি তাহা কেবল বন্ধন-মোচনের জন্য ! এই দ্বি-বন্ধনের গ্রন্থিটি একটু শিথিল করিতে হইবে—বুঝিতে হইবে, যাহার জন্য যাহা কর তাহাই জানিবে কর্ম্ম ; তন্মধ্যে যাহা সৎ তাহাই জানিবে শুভ, আর যাহা অসৎ তাহাই অশুভ। এই শুভ অশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই জীবের সংসার-বন্ধনের মূল। ১৪। এই শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় যতকাল না হয়, শতকল্প গত হইলেও ততকাল জীবের মুক্তি হয় না। অর্থাৎ সৎকর্ম্মের যেমন ক্ষয় হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অসৎ কর্ম্মেরও তেমনই ক্ষয় হইবে। নতুবা তোমার সৎকর্ম্মগুলি সব উঠিয়া যাইবে অথচ অসৎকর্ম্মের প্রবাহ সমানই থাকিবে অথবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে—এরূপ কর্ম্মক্ষয়ে সংসার-বন্ধন মোচন হইবে না অধিকন্তু সৎকর্ম্মের অভাবে স্বর্গের বন্ধন ছিন্ন হইবে, অসৎকর্ম্মের প্রভাবে নরকের বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে। ১৫। শৃঙ্খল লৌহময় হউক অথবা স্বর্ণময় হউক, তাহাতে যেমন বন্ধনের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মও শুভ হউক বা অশুভ হউক জীবকে বন্ধন করিতে উভয়েই সমান সমর্থ, তাহাতে কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। সৎ হউক বা অসৎ হউক, কর্ম্ম সঞ্চিত থাকিলেই সে জীবকে সংসারে পুনরাবৃত্ত করিবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১৬। সতত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নানা কষ্ট ভোগ করিয়াও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না করে তাবৎ মুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন না থাকে, তবে সে কর্ম্ম কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি বিধান করিতে পারে না। ১৭

তত্ত্ব-বিচার (ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিভূতি ভিন্ন জগৎ স্বতন্ত্র নহে এই বিচার) এবং নিষ্কাম কর্ম্ম এই উভয় দ্বারা পাপের ক্ষয় এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তবে জ্ঞানের উদয় হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন এবং কর্ম্মফলের কামনা পরিহারপূর্ব্বক নিরন্তর ভগবদারাধনা করিতে করিতে যখন দেখিবে অন্তঃকরণে

পাপের প্রবৃত্তিই আর হয় না, রজোগুণ এবং তমোগুণের কোন বৃত্তি-বিকাশ না হইয়া কেবলই শুদ্ধ সত্ত্বের অনুভব হয়, অন্তঃকরণ এইরূপ নির্ম্মল হইলে তখনই তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় জানিবে। ১৮। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়াকল্পিত, কেবল পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য—এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তবে জীব প্রকৃত সুখ লাভ করে অর্থাৎ দ্বৈত জগতের এই যাহা কিছু বিচিত্রতা পরিদৃশ্যমান, এ সমস্তই স্বপ্ন বা ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যবৎ মায়া-রচিত। একমাত্র ঐন্দ্রজালিক পুরুষ ভিন্ন তাহার কৃত ক্রিয়া সমস্তই যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহার কৃত এই সংসার-দৃশ্য সমস্তই মিথ্যা। লৌকিক নিদ্রার ভঙ্গ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল স্বপ্ন তিরোহিত হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রসাদে মায়ানিদ্রার ভঙ্গ হইলেও সেই সঙ্গেই এই মায়াময় সংসারও তখন তিরোহিত হইয়া যায়। জাগিলে জীব যেমন দেখিতে পায় —কেবল সে নিজেই রহিয়াছে, আর নিদ্রাও নাই স্বপ্নও নাই, তদ্রূপ জীবের আত্মচৈতন্যের উদয় হইলেও তিনি তখন দেখিতে পান কেবল একমাত্র পরমাত্মা আমিই রহিয়াছি আর মায়াও নাই সংসারও নাই। জীব যখন এইরূপে তত্ত্বসমুদ্রে ডুবিয়া যান তখনই তিনি সেই সুখে সুখী যে সুখের পর আর কখনও দুঃখ নাই। ১৯। সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সত্য নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত-তত্ত্ব হইয়াছেন, তিনিই কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ২০।

সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চল সত্য ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত-তত্ত্ব হইতে হইবে, ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম যদি সত্য এবং নিশ্চল, তবেই নামরূপ মিথ্যা এবং চঞ্চল। যাহা সত্য তাহাই চিরস্থায়ী, যাহা মিথ্যা তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং সত্যে পৌঁছিতে হইলেই মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে, মায়াতীত ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবিতে হইলেই মায়াময় নাম-রূপ পরিহার করিতে হইবে। নামরূপ বলিতে এখানে স্বরূপ নামরূপ বুঝিতে হইবে না, বুঝিতে হইবে তাহাই যাহা বিকার-জন্য নামরূপ, যেমন মৃত্তিকার স্বরূপতঃ মৃত্তিকা এই নাম—এবং সাধারণ ভূভাগ তাহার রূপ। কিন্তু এই মৃত্তিকা দ্বারা যখন ঘট কুম্ভ কপাল শরাব স্থালী প্রভৃতি গঠিত হয় তখনই সেই সকল বস্তুর রূপ এবং নাম কেবল মৃত্তিকার বিকার জন্য বই আর কিছুই নহে, অর্থাৎ স্বরূপ মৃত্তিকা যদি আজ এই বিকৃত ঘটাদি-রূপে পরিণত না হইত তাহা হইলে মূল মৃত্তিকায় কখনও ঘট কুম্ভ ইত্যাদি নামের ব্যবহার হইত না। আবার ঐ ঘট কুম্ভ ইত্যাদি যখন চূর্ণিত হইয়া সাধারণ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইবে তখন তাহার সেই সেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই নামও বিলুপ্ত হইবে। এই ঘট কুম্ভ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা, সত্য স্বরূপ একমাত্র মৃত্তিকা, মৃত্তিকাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেমন আমি ঘট ইত্যাদি স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলেও আমি নাম-রূপাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে পারি না। ঘট সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেও

মৃত্তিকাই ছিল পরেও মৃত্তিকাই হইল, মধ্যে যে, কয়েকদিন 'ঘট ঘট' বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল তাহাই জানিবে মিথ্যা। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—'আদাবন্তেঽপি যন্নাস্তি মধ্যকালেঽপি তত্তথা'। পূর্ব্বেও যাহা ছিল না, পরেও তাহা থাকিবে না, মধ্যে যদি কয়েক দিন তাহার ভান হয় তবে তাহাও জানিবে মিথ্যা। এই মিথ্যাটি কিন্তু আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে। স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ মিথ্যা বলিয়া স্বপ্নও মিথ্যা নহে নিদ্রাও মিথ্যা নহে, তদ্রূপ এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া জগতের মূল মায়া কখনই মিথ্যা নহে। কেননা, নিদ্রা যদি মিথ্যা হয় তবে স্বপ্ন দেখায় কে? মায়া যদি মিথ্যা হয় তবে সংসার সৃষ্টি করে কে? মায়া মিথ্যা হইলে সংসার আবার সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তাই মায়া আছে এবং থাকিবে। এই মায়ার মধ্য হইতেই মহামায়া মাকে দর্শন করিতে হইবে। তাই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে—'বেদ বলে বৃথা চেষ্টা সকলি ভাই মায়া। তন্ত্র বলে মায়ার মধ্যে হাসে মহামায়া, এ যে মায়ের মায়া'। বেদ বলিয়াছেন, 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং'। যাহা কিছু বাক্যের ব্যবহার, যাহা কিছু নামধেয় সে সমস্তই বিকার, কেবল মৃত্তিকাই সত্য। বিকার মিথ্যা নহে স্বরূপের অন্যথা-ভাব মাত্র, বিকৃত পদার্থও স্বরূপের অবস্থান্তর মাত্র। এই বিকৃত নাম রূপেরই যাহা কিছু আবির্ভাব তিরোভাব। তদ্‌ভিন্ন স্বরূপ রূপের কোন আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই, যেমন ঘট কুম্ভ স্থালী কপাল যাহাই কেন গঠিত না কর, স্বরূপতঃ মৃত্তিকা, মৃত্তিকাই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। কাঞ্চী কেয়ুর কটক কুণ্ডল যাহাই কেন গঠিত না কর, মূল স্বর্ণ যাহা স্বর্ণ-ই থাকিবে, তদ্রূপ এই নানাবিধ নামরূপময় বিচিত্র দ্বৈত জগতে পিতা মাতা সহোদর সহোদরা স্ত্রী পুত্র কন্যা তুমি আমি স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ ইত্যাদি যত যাহা নাম রূপ দেখিতেছ, এ সমস্তই সেই পরব্রহ্মের মায়া-বিকৃত রূপান্তর মাত্র। স্বরূপতঃ এ সমস্তই সেই ব্রহ্মবিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে জীবদেহে এই ব্রহ্ম-বিভূতি প্রকট নহে, ঈশ্বর-দেহে প্রকট—এইমাত্র বিশেষ। তাই বলিতেছিলাম, বিকৃত নাম রূপ মিথ্যা বলিয়া স্বরূপ নামরূপ মিথ্যা নহে। সাধনার রাজ্যে ইহাই ব্রহ্ম-দৃষ্টি। তাই গীতাঞ্জলি নগেন্দ্রমহিষী মেনকার মুখে বলিয়াছে—

এ যে জগন্নন্দিনী, উমা নয় নন্দিনী।

ঐ যে রত্ন-সিংহাসনে হর-ব্রহ্ম সনে,

একাসনে পরব্রহ্ম সনাতনী॥

কোটি প্রভাকর জিনি প্রভাধর দিগম্বর তোমার ত্রিপুর-সুন্দর।

(আমার) শতকোটি-শশধর-লজ্জাকর—

হেমাঙ্গিনী হরের বামাঙ্গসঙ্গিনী (উমা)।

(ঐ যে) সদানন্দের কোলে হাসে ষড়ানন, জগদম্বার কোলে দোলে গজানন,
শম্ভুর ডম্বুরে কুমার হাসে ঘন,
গণেশ নাচে শুনে উমার কর-ধ্বনি।
যুগল ব্রহ্মের কোলে যুগল-ব্রহ্ম কুমার, তুমি আমি ব্রহ্মের পিতামাতা আবার,
এ যে ব্রহ্মানন্দ সংসার, কেবল ব্রহ্ম-বিকার,
তাই পূর্ণ ব্রহ্ম আমার, ব্রহ্ম-মন্মোহিনী।
আর এক কথা গিরি! শুনি চমৎকার বিধি-বিষ্ণু-হর উমার কুমার,
উমা নহে কেবল তোমার আমার,
এই চরাচর-বিশ্ব-সর্ব্বস্ব-রূপিণী।
পিতামহ বলেন পিতামহী ইনি পীতাম্বর-দিগম্বর-প্রসবিনী,
(উমা) তোমার আমার মুখে 'মেয়ে' রব শুনি,
হাসে মনে মনে কতই বা না জানি।
মেয়ে বলতে যখন এত লজ্জাভয় রাণী বুঝি এবার মেয়ের মেয়ে হয়,
(কিন্তু) ও মেয়ে ত একা রাণীর মেয়ে নয়,
গিয়ে ভিখারিণীর ঘরে ও মেয়ে হয় আপনি। (সাধলে)।
শিবচন্দ্র বলে নগেন্দ্ররমণি! জেনে শুনে কেন বল আর নন্দিনী,
একবার মেয়ে হয়ে নিজে, মেয়ের পদাম্বুজে,
জবাঞ্জলি দিয়ে বল 'জয় জননি!'। (রাণি।)

সমস্ত নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরনিষ্ঠিত-তত্ত্ব হইতে হইবে—কেননা দৃশ্যমান নাম রূপ ত্যাগ করিতে হইলেই বিবেকের প্রয়োজন। বিবেক আর কিছুই নহে, বস্তুর স্বরূপ-বিবেচনা। নাম রূপের মূলতত্ত্ব বিচার করিতে গেলেই পরব্রহ্মে একাগ্রদৃষ্টি পতিত হইবে—যেমন ঘটের বস্তুতত্ত্ব বিচার করিতে হইলেই মৃত্তিকা লক্ষ্য করিতে হইবে। নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিলেই, যে ব্রহ্মাণ্ডে নাম রূপ আছে সে ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া বাস করিতে হইবে, এরূপ অর্থ নহে। বিচারের কর্ত্তা তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডেই যাও না কেন, তোমার নাম রূপ তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে, তাই নাম রূপ ছাড়িয়া নাম রূপের বিচার হইবে না। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না, তদ্রূপ এই নাম-রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও অদ্বৈততত্ত্ব অবগত হওয়া যাইত না—দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্ত্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছু নাই সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে এরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই দেখিতে হইবে যে ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছু নহে। এইরূপে মৃত্তিকাতত্ত্ব যিনি

বুঝিয়াছেন তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু মৃত্তিকার বিচিত্র শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হয়েন। তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নামরূপাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নামরূপ সকল ভুলিয়া গিয়া প্রতিরূপে সেই রূপ দেখিতে থাকেন, যে রূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্ম-রূপের আবির্ভাব হয়। তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারময় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাকে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না। নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইলে, নামের নামত্ব রূপের রূপত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল ব্রহ্মেরই স্বরূপ-শক্তি-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে— ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই নাম রূপ ত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত-তত্ত্ব হইয়াছেন।

জপ হোম এবং শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হইবে না, 'ব্রহ্মই আমি' ইহা জানিয়া জীব মুক্ত হইবে। ২১। প্রমত্ত বা প্রগাঢ় নিদ্রাক্রান্ত পুরুষ যুবতী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও যেমন তাহার কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ ঘোর মোহ মদোন্মত্ত মায়া-নিদ্রায় আক্রান্ত পুরুষ সাধনা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইলেও তাহার আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ববোধ জন্মে না। যে জপে, যে হোমে, যে ব্রত উপবাসে আত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞান না আছে, শত শত বৎসর তাহার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ফল হইবে না, অন্যথা জপ হোম উপবাসে মুক্তি হইবে না। ইহা যদি নিশ্চয়ই আছে, তবে আবার 'মুক্তি হইবে না' এ কথা বলা কেন? বাস্তবিক ত জপ হোম উপবাস ইত্যাদি সমস্তই আত্মজ্ঞানের সাধন পরম্পরা। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, সেই মূলতত্ত্ব আত্মজ্ঞান অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সাধারণ কর্ম্মাংশের অনুষ্ঠান করিলে শত বৎসরেও তাহার দ্বারা কখনও মুক্তি সাধিত হইবে না, ইহার দ্বারা আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান নাই, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। বরং আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অন্য কেহ কর্ম্মের অধিকারীই হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মা, সাক্ষী (মায়ারচিত বিশ্বকার্য্যের কেবল দর্শনকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা নহেন) বিভু পূর্ণ সত্য অদ্বৈত পরাৎপর। গৃহস্থিত আকাশের ন্যায় দেহস্থিত হইয়াও আত্মা দেহস্থ নহেন, অর্থাৎ দেহের অন্তর্গত হইলেও দেহগুণে নিত্য-নির্লিপ্ত—এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। ২২। বালকের ক্রীড়ার ন্যায় সমস্ত নামরূপাদি কল্পনা পরিহারপূর্ব্বক যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন তিনি মুক্ত, তাহাতে সংশয় নাই। ২৩।

বালক যেমন ক্রীড়া-পুত্তলী মধ্যে পুত্র কন্যা বৈবাহিক ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ক্রীড়াভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্ত নাম রূপ অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ এই

সংসাররূপ ক্রীড়াক্ষেত্রে মায়া-পুত্তলী জীবগণের মধ্যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক যতই কেন নামরূপের কল্পনা না কর, নিশ্চয় জানিবে তোমার এই ভবলীলা-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সে সমস্ত নাম রূপ ঘুচিয়া যাইবে। তাই এই বেলা, বেলা থাকিতে খেলা ভাঙ্গিয়া মায়াময় নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার অতীত পরব্রহ্মে যিনি আত্মমনঃ-সমাধান করিয়াছেন, পরমাত্মার অভিন্ন সম্বন্ধে যিনি মিশিয়াছেন, এই মায়িক দেহে অবস্থিত হইয়াও তিনি ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য নির্ম্মুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি জীবের মোক্ষসাধিকা হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্য লাভ করিয়াও মানবগণ রাজা হইতে পারে ॥ ২৪ ॥ মায়িক দেহে অবস্থিত হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানে জীব যেমন জীবন্মুক্ত হইয়া যান এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই যেমন তাহার একমাত্র কারণ, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান সহকারে, ভক্তহিতার্থে জগদম্বার মায়া-গৃহীত মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াও সাধক নির্ব্বাণ-কৈবল্য লাভ করেন এবং তাঁহার মূর্ত্তি-মহিমার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনন্তরূপিণীর অনন্তরূপে অনন্তশক্তি সঞ্চার সন্দর্শনই তাহার একমাত্র কারণ। বাম করে অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্বরথ-রশ্মি-সংযম এবং দক্ষিণ করে কশাবেত্র গ্রহণপূর্ব্বক পীতাম্বরে কটিতট দৃঢ়তর সম্বন্ধ করিয়া ভক্তগৌরব-গৌরবিত 'পার্থসারথি' নাম গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবসখা রূপে যিনি রথ-মধ্যবেদীস্থলে উপবিষ্ট, অর্জ্জুনের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং মায়া মোহের একান্ত অভিভব দেখিয়া স্বধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ সখাকে যিনি এইমাত্র সদুপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, অমনি দেখিতে দেখিতে তাঁহার সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হইল। নবজলধর-শ্যামসুন্দর ভুবন-মন-প্রাণহর সে মধুর মূর্ত্তি কোথায় লুক্কায়িত হইল—দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট দেহের সহস্র সহস্র কর চরণে দশদিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, বিস্ফারিত সহস্র সহস্র লোচনের উৎকট জ্যোতিঃপুঞ্জে সূর্য্যকিরণ প্রতিহত হইল, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও বীরেন্দ্র-চূড়ামণি অর্জ্জুন ভীতিকম্পিত গদ্‌গদ্ স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস'!

বলি-যজ্ঞে বামনবটুর ত্রিপাদ-চ্ছায়ায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল আচ্ছন্ন হইল, সর্ব্বশক্তিমানের অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবতারাও অদৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চরণ বলির অদৃষ্টক্রমে ভগবানের নাভিকুহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরমার্থ-চতুরা সহধর্ম্মিণীর উপদেশক্রমে বলিরাজ প্রণত হইলেন, ভক্তের ধন অভয়চরণ ভক্তমস্তকে সংস্থাপিত হইল, ভাগ্যবান বলিরাজ সেই রসাতলে গমন করিলেন, বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়াও ভূভারহারী ভগবান যে রসাতলে স্বয়ং তাঁহার দ্বারপাল হইলেন। আজ তাঁহার আজ্ঞা পাইলে, তিনি কৃপা করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিলে তবে বলিরাজের দর্শন পাইবার কথা, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার দর্শনার্থী হইয়া বৈকুণ্ঠ-দ্বারে নিত্য দণ্ডায়মান সেই রাজরাজেশ্বর

বৈকুণ্ঠনাথ রসাতলে আসিয়া স্বয়ং বলির দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। ভক্ত-জীবনসর্ব্বস্ব! ভূতভাবন ভগবন্! ভক্তের মহিমা, প্রভো! তুমিই বুঝিয়াছ। আর বলি, বলিরাজ! দৈত্যরাজ হইয়াও তুমি ভক্তরাজ। কি জানি কি রাজত্ব তুমি লাভ করিয়াছ যে রাজ্য রক্ষার জন্য বিশ্বরাজ-রাজেশ্বর নিজে তোমার দ্বারপাল!

আবার যমুনাকূলে কদম্বমূলে মধুর মুরলী বাজিয়া উঠিল। মহারস-রসোন্মাদিনী ব্রজপুরসুন্দরীগণ কি জানি কি গুপ্তসাধন-মন্ত্রবলে সহস্র সহস্র যূথে সুসজ্জিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র-পার্শ্ববর্ত্তিনী তারকারাজির ন্যায় ভগবান নন্দ-নন্দনের পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়ালেন, দেখিতে দেখিতে বিচিত্র বৈষ্ণবীমায়ার প্রভাবে সকলের অলক্ষিতে সকলের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকের নিকটে ভগবান স্বতন্ত্র মূর্ত্তি অবলম্বনে আবির্ভূত হইলেন, যমুনার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপের অতুল প্রভা নিরীক্ষণ করিতে বৃন্দাবনের নভোমণ্ডলে দেববৃন্দ সমাগত হইলেন, তাঁহাদের সভক্তি কুসুমাঞ্জলি-বর্ষণে, বিদ্যাধর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সর যক্ষ চারণগণের নৃত্যগীত বাদ্য-ধ্বনির আনন্দোচ্ছ্বাসে, গোপীগণের জয়কীর্ত্তনে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের পূর্ণ-মহিমার প্রকটনে, মদনরণ-সাগরে মদনমোহনের বীরবিক্রম-ঘোরতরঙ্গলহরী উদ্বেলিত হইল।

মহিষাসুর-নির্জ্জিত দেবদলের দুর্গতি দেখিয়া দীন-দয়াময়ীর স্নেহার্দ্র হৃদয় ব্যথিত হইল, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী নিজশক্তি বিস্তারপূর্ব্বক নিখিল-দেবমণ্ডলীর ক্রোধজনিত তেজঃপুঞ্জচ্ছলে স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন, চৈতন্যরূপিণীর সেই চিন্ময়মূর্ত্তির চারুচরণকমল-ভরে বসুন্ধরা নত হইলেন, কিরীট-সংস্পর্শে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইল, সহস্রভুজ প্রসারণ করিয়া রণরঙ্গিনী সমরাঙ্গনে দাঁড়াইলেন, অমরগণ ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া 'জয় জয় জয়' ধ্বনি করিয়া আনন্দে আনন্দময়ীর চরণাম্বুজ-পূজায় রত হইলেন। আবার শুম্ভনিশুম্ভ-নিপাতনের প্রারম্ভে সেই কনকচম্পকগৌরকান্তি পার্ব্বতীর অঙ্গকোষ বিদীর্ণ করিয়া কৌষিকী যখন নিষ্ক্রান্তা হইলেন, দেখিতে দেখিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে কান্তি অন্তর্হিত হইল, ইন্দীবর-নিন্দিত সুন্দর শ্যামপ্রভায় উমা সেই শ্যামা সাজিলেন, যে শ্যামারূপের জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া দৈত্যরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মসাৎ হইলেন, আবার চণ্ডমুণ্ড-সমরে এই শ্যামার বদনমণ্ডল হইতেই কোপকুঞ্চিত ললাটতট বিদীর্ণ করিয়া চামুণ্ডা-শক্তি নির্গতা হইলেন, রক্তবীজ-যুদ্ধে এই মূলপ্রকৃতি শ্যামা হইতেই শিবদূতী আবির্ভূতা হইলেন, শুম্ভ-সমরে আবার ইহাঁরই কলেবরে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিসমূহ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। দক্ষযজ্ঞ-গমন কালে ভগবান মহেশ্বরের সম্মুখে এক সতীমূর্ত্তি হইতেই দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, আবার তাঁহাতেই তাঁহাদের তিরোভাব। পুনশ্চ যজ্ঞবিধ্বংসন-সময়ে মূল সতীমূর্ত্তি হইতেই ছায়া-সতীর আবির্ভাব এবং যজ্ঞানলে মায়াদেহ পরিত্যাগ। তৎপরে আবার হিমালয়-গৃহে সদ্যঃপ্রসূত কন্যামূর্ত্তি হইতেই হিমালয়কে বিশ্বরূপ প্রভৃতি

ব্রহ্মবিভূতি প্রদর্শন, আবার সেই মূর্ত্তিতেই সেই বিভূতি সম্বরণ, তাঁহার একরূপে এইরূপ লীলাময় অনন্তরূপের আবির্ভাব তিরোভাব দর্শন করিলেই ইহা সুস্পষ্ট অবগতি হয় যে, সচ্চিদানন্দময়ীর মূর্ত্তিও সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বই আর কিছুই নহে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত মায়া-বৈচিত্র্যেই যাহা কিছু রূপের বৈচিত্র্য ; তদ্ভিন্ন স্বরূপতঃ ইদন্তা-রূপে তাঁহার কোন রূপকে স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। এক হইতে অনন্ত এবং অনন্ত ঘুচিয়া আবার এক। এইরূপে রূপতত্ত্বে যাঁহার পলকে সৃষ্টি, পলকে প্রলয়—সেই বিশ্বরূপিণীর রূপের নিশ্চয় আর সাগরের তরঙ্গ গণনা একই কথা। আবার ইহার পরেও সিদ্ধসাধকগণের হৃদয়ে অনন্তকাল তাঁহার অনন্তরূপের আবির্ভাব তিরোভাব, নিমেষে নিমেষে রূপের আবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তন—ইহাই যাঁহার স্বরূপ-পরিচয় কোন এক রূপে তিনি স্বরূপতঃ আবদ্ধ, এ সিদ্ধান্ত তাঁহাতে সম্ভবে না। তাই তাঁহার রূপ-তত্ত্ব জানিতে হইলেই বুঝিতে হইবে তাঁহার স্বরূপ রূপের অতীত অর্থাৎ অনন্তরূপে বিজড়িত হইয়াও স্বরূপতঃ সকলরূপে নিত্য-নির্লিপ্ত। ইচ্ছাময়ী ইচ্ছানুসারে যখন যে মায়া অবলম্বন করেন, তখন তাহাতেই তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত রূপের তাদৃশ প্রতিবিম্ব পতিত হয়। মায়া-দর্পণে সে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আপন রূপে আপনি বিভোর হইয়া বিমুগ্ধা বালিকার ন্যায় আনন্দে আনন্দময়ী করতালী দিয়া নাচিতে থাকেন, জীব-ব্রহ্মে দ্বৈত-সম্বন্ধ ঘটাইয়া আপন সুখে আপনি নাচিয়া আপনি তাহাতে ডুবিয়া যান—তাঁহার সেই খেলার ভাবে বিভোর হইয়াই সাধক বলিয়াছেন—

> মহাকালের সম্মোহিনী সদানন্দময়ি কালি!
> ও তুই, আপন সুখে আপনি নাচিস্ আপনি দিস্ মা করতালী।

ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপ-সাধনার অভ্যন্তরে এই ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার না আছে, বস্তুতঃ তিনি সাকার উপাসনার অধিকারী নহেন, সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কার্য্য-কারণ-প্রক্রিয়া অনুসারে যখন যে রূপের আবশ্যক হইয়াছে তখনই তিনি সেই ইচ্ছাময় রূপে প্রবেশ করিয়াছেন ; আবার যখন কার্য্য শেষ হইয়াছে অমনি তৎক্ষণাৎ সে মায়ামূর্ত্তি তিরোহিত হইয়াছে। তবে যে সকল মূর্ত্তির সহিত অনাদি জগৎপ্রবাহের নিত্য-সম্বন্ধ এবং সৃষ্টি স্থিতি সংহার—এ তিন তত্ত্বই যে সকল মূর্ত্তির অন্তর্নিহিত, সে সকল মূর্ত্তিও নিত্যসত্য-সনাতন। সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহা যেমন অনাদি আবার মহাপ্রলয়ের পরেও তাহা তেমনই অনন্ত। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন, সে সকল নিত্যমূর্ত্তি অনিত্য মায়িক জগতের অবিদিত অদ্বৈতধামে অবস্থিত। বেদ বলিয়াছেন, 'একমাত্র অগ্নি যেমন ভুবনগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী রূপে রূপে প্রতিরূপ অবলম্বন করিয়াছেন।' পঞ্চভূত-রচিত জগতে প্রতি পদার্থেই অগ্নি সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত, বহির্ভাগ হইতে তাহার কিছুমাত্র

প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাত-রূপ পরস্পর-সংযোগে কিম্বা বাহ্য অগ্নির সংস্পর্শে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা কদাচ আবির্ভূত হইতে পারে না, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। যদি জগতের প্রতি বস্তুতে অগ্নির সূক্ষ্ম অবস্থান না থাকিত তাহা হইলে সমস্ত পদার্থ কখনও দাহ্য হইত না। তাই বুঝিতে হইবে, প্রতিবস্তুর প্রতি পরমাণুতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অগ্নি নিত্যসন্নিহিত এবং সেই পরমাণু পরম্পরার সমষ্টিরূপ প্রত্যেক বস্তুর আদ্যন্ত ভাগ ব্যাপিয়া সেই সেই বস্তুর স্থূলরূপেও অগ্নি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। এজন্য পঞ্চভূতাত্মক কাষ্ঠখণ্ডের অবয়ব যাহা দেখিতেছি তাহা অন্যতর ভূত অগ্নিরও অবয়ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মাও প্রতিবস্তুতে এইরূপ প্রবেশ করিয়া সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের রূপে অবস্থিত হইয়াছেন। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন, 'যানপাষাণধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতা', যান পাষাণ ধাতুরও শক্তিরূপে তিনি অধিষ্ঠিতা—এই আত্মজ্ঞান যাঁহার না জন্মিয়াছে সাকার উপাসনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বলিয়াছেন—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাঽষ্টবিধা স্মৃতা ॥

শৈলী (পাষাণময়ী), দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা (সিন্দুর-চন্দনাদিময়ী), লেখ্যা চিত্রিতা, সৈকতা সিকতাময়ী বালুকা নির্ম্মিতা, মনোময়ী এবং মণিময়ী, এই অষ্টবিধ প্রতিমা। সাধক উপাসনাকালে প্রথমতঃ অন্তর্যাগে মনোময়ী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সেই অন্তরের ব্রহ্মতেজঃ সম্মুখস্থ প্রতিমায় সংক্রামিত করিয়া পরে বাহ্যপূজা আরম্ভ করেন, আবার প্রতিমার অভাবে যাঁহারা যন্ত্রাদিতে পূজা করেন তাঁহাদের সে উপাসনা সময়েও মনোময়ী দেবতামূর্ত্তিই আরাধ্য। যন্ত্র বা প্রতিমাদিতে তাঁহার নিত্য অবস্থানের ও প্রকাশের এই মূলতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং আন্তরিক তেজের সংক্রামণ না বুঝিয়া কেবল মনে মনে দেবমূর্ত্তি-কল্পনা মাত্র করিয়া যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সে মুক্তি কেবল স্বপ্ন-সন্দর্শন মাত্র। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'আত্মজ্ঞান এবং সাধনার অভাবে কেবল মনে মনে মুক্তি কল্পনা করিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্যলাভ করিয়াও লোকে রাজা হইত'। মূর্ত্তি-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তির সমস্ত মূলতত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ করিয়া আবার তেজস্তত্ত্ব প্রতিমায় সংক্রামিত করিতে হইবে—তবে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইবে। দেবতা এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে সেই পার্থিব-মূর্ত্তি ভেদ করিয়া চৈতন্যময়ীর চৈতন্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইবে এবং সেই আলোকে সাধকের হৃদয় আলোকিত, প্রাণ পুলকিত, আত্মা জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে। সাধক সাধারণ উপাসনাকালে এ তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে লক্ষ্য করিবেন।

পূর্ব্ব শ্লোকটিকে সূত্ররূপে রাখিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান স্বয়ংই তাহার বিশদ-বৃত্তিরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন, মৃত্তিকা ধাতু দারু ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার ক্লেশ অনুভব করিয়াও জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহারা মুক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার মূলতত্ত্ব অবগত না হয়, কর্ম্মপাশক্ষয়-কারণ পরতত্ত্বের জ্ঞানোদ্বোধ না হয় তবে সে কর্ম্ম নিষ্ফল। কোন্ প্রক্রিয়াবলে আমার এই আরাধ্য মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ীরূপে পরিণত হইবেন তাহা যদি না জানি তবে আমার সে মূর্ত্তিপূজা আর মৃত্তিকাপূজা একই কথা। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন. কঠোর কায়ক্লেশ অনুভব করিলেও জ্ঞান ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানবিজ্ঞান-স্বরূপিণীর স্বরূপ-দর্শন ঘটিবে না, তাঁহার দর্শন ব্যতীত বন্ধন মোচনের উপায়ও আর নাই। তাই এরূপ অজ্ঞানী কখনও মূর্ত্তিপূজার অধিকারী নহে।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল তপস্যার কায়ক্লেশ বা কেবল ভোগসুখেও মুক্তি হইবে না। তাহাই দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিয়াছেন—নিয়ন্তর আহার সংযম করিতে করিতে যাঁহাদের কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট এবং যথেষ্ট আহার করিতে করিতে যাঁহারা লম্বোদর হইয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে এই ভজন এবং ভোজনের প্রসাদেই তাঁহাদের মুক্তি হইবার কথা ছিল। বাস্তবিক কি তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন? ॥ ২৬ ॥

বায়ু, পর্ণ, তণ্ডুল-কণা এবং তোয়মাত্র আহার-ব্রত ধারণ করিলেই যদি মুক্তিভাগী হয়, তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী এবং জলচরগণও জ্ঞানের অভাবেও কেবল আহারব্রত প্রভাবেই মুক্ত হইয়া যাইত ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানের চতুর্ব্বিধ অবস্থাভেদে ভাব-নামে উপাসনারও চতুর্বিধ ভেদ হয়। যথা—সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি, ইহা উত্তম ভাব। নিরন্তর হৃদয়ে দেবতার ধ্যান, ইহাই মধ্যম ভাব। জপ এবং স্তব অধম ভাব এবং কেবলমাত্র বাহ্যপূজা অধমাপেক্ষাও অধম ভাব ॥ ২৮ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মায় ঐক্যবুদ্ধি, ইহাই ব্রহ্ম-ভাব; যোগক্রিয়াবলে দেবতায় চিত্ত-ধারণা, ইহাই ধ্যান-ভাব। সেবক এবং ঈশ, উপাস্য এবং উপাসক—এই উভয়জ্ঞান-ঘটিত ভাবই পূজা। কিন্তু 'সর্ব্বং ব্রহ্ম', এই যাঁর জ্ঞান তাঁহার যোগও নাই পূজাও নাই, কারণ তাঁহার অধিকার যোগ এবং পূজা এই উভয় ভাবের অতীত। যাঁহার জ্ঞানে উপাস্যও ব্রহ্ম উপাসকও ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম তাঁহার দৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং সাধক বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই। যেখানে পার্থক্য নাই সেখানে উভয়ের যোগ বা একের দ্বারা অন্যের উপাসনা অসম্ভব। তাই স্তব জপ ধ্যান ধারণা ব্রত নিয়ম ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানীর অধিকার-বহির্ভূত ॥ ২৯ ॥

পরমজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, জপ যজ্ঞ তপ নিয়ম ব্রত ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার কোন ফল নাই। কেবল ফল নাই তাহা নহে, কর্ম্মাধিকাররূপ মূল পর্য্যন্তও নাই ॥ ৩০ ॥

এই ব্রহ্মজ্ঞানী কে? সাধক এখন ক্রমে তাহা দেখিয়া লউন। বিজ্ঞান—বিশুদ্ধ-জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ তদ্ভিন্ন যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এ সমস্তই মিথ্যা মায়াবিজৃম্ভন মাত্র, এই যাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, সে-ই স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে পরিণত পুরুষের পূজা ধ্যান ধারণা কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই ॥ ৩১ ॥

'আমি জীব' এই বলিয়া যাঁহার হৃদয়ে অভিমান নাই সে-ই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পাপও নাই পুণ্যও নাই, স্বর্গও পুনর্জন্মও নাই। 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' এই যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ধ্যেয়ও নাই ধ্যাতাও নাই, ধ্যানের বিষয় ঈশ্বরও নাই ধ্যানের কর্ত্তা জীবও নাই ॥ ৩২ ॥

এই চৈতন্যরূপ আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত এবং সর্ব্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত, তাঁহার বন্ধনই বা কি? দুর্ব্বুদ্ধিগণ কেনই বা তাঁহার মুক্তি কামনা করে? ॥ ৩৩ ॥

বিশ্ব তাঁহার নিজমায়া-রচিত এবং দেবগণেরও বিতর্ক দ্বারা অজ্ঞেয়। আত্মা তাহাতে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত ॥ ৩৪ ॥

সমস্ত বস্তুরই অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে আকাশ যেমন অবস্থিত তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাও সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিভাগে সাক্ষীরূপে দেদীপ্যমান ॥ ৩৫ ॥

আত্মার জন্ম বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বদাই একরূপ চৈতন্যমাত্র এবং বিকার-পরিবর্জিত ॥ ৩৬ ॥

জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্য যাহা কিছু সে সমস্তই স্থূলদেহের, আত্মার কিছুই নহে। মায়াচ্ছন্নবুদ্ধি জীবগণ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না ॥ ৩৭ ॥

শরাবস্থিত জলমধ্যে যেমন সূর্য্যের বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায়, বস্তুতঃ সূর্য্য এক ভিন্ন বহু নহেন তদ্রূপ জীবের স্থূলদেহ-রূপ শরাবে মায়াজল মধ্যে আত্মাকেও বহু বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন ॥ ৩৮ ॥

জলমধ্যে চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে নিত্যচঞ্চল তরঙ্গের স্পন্দন দেখিয়া নির্ব্বোধ যেমন মনে করে চন্দ্রমণ্ডল স্পন্দিত হইতেছে, তদ্রূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্য দেখিয়া অজ্ঞানগণ তাহা আত্মার চঞ্চলতা বলিয়া মনে করে ॥ ৩৯ ॥

ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন পূর্ব্বরূপ সমভাবে অবস্থিত তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমরূপেই অবস্থিত ॥ ৪০ ॥

দেবি! মুক্তির একমাত্র সাধন এই পরম আত্মজ্ঞান অবগত হইলে, জীব ইহলোকেই মুক্ত হইয়া যায়—ইহা সত্য এবং নিঃসংশয় ॥ ৪১ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠান, ধনদান বা সন্ততি দ্বারা মুক্তি হয় না, আত্মার দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই মানব মুক্ত হয় ॥ ৪২ ॥

আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম—আত্মা অপেক্ষা অপর কিছুই প্রিয় নহে। শিবে! আত্ম-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সংসারে অন্য যাহা কিছু (স্ত্রী পুত্রাদি) প্রিয় হয় ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) জ্ঞাতা (জ্ঞানের কর্ত্তা) কেবল মায়া-বিকারেই এই তিনকে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এই তিনের তত্ত্ব বিচার করিলে পরিণামে একমাত্র জ্ঞানরূপী আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ৪৪ ॥

চৈতন্যময় আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয় এবং আত্মাই স্বয়ং বিজ্ঞাতা—যিনি ইহা জানিয়াছেন তিনিই তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৫ ॥

সাক্ষাৎ নির্ব্বাণ-মুক্তির কারণ এই জ্ঞানতত্ত্ব তোমাকে কহিলাম, চতুর্ব্বিধ অবধূতের ইহাই পরমধন ॥ ৪৬ ॥

আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মচিকিৎসকগণ উক্ত বচনাবলীর মধ্য হইতে 'বিহায় নাম রূপাণি সত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে। পরিনিষ্ঠিততত্ত্বাত্মা যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নামরূপাদিকল্পনং। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধিনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ মৃচ্ছিলা-ধাতু-দার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ, ক্লিশ্যন্ত-স্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে' ॥ এই চারিটি বচনকে নিরাকারবাদের প্রবল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। শ্লোকানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই চারিটি বচনের পূর্ব্বাপর-সমন্বয়-সহকৃত এবং উপক্রম উপসংহার ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাবার্থ যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইতেই সাধকগণ বুঝিয়া লইবেন আজকাল স্বার্থান্ধ ব্যাখ্যাতৃগণের কদর্থব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কিরূপ অপলাপ ঘটিতেছে! শাস্ত্র বলিতেছেন—এই মায়াকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের এই আংশিক মায়াবদ্ধ জীবত্বভাব ভুলিয়া গিয়া 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য জীব-ব্রহ্মের একত্ব-তত্ত্বে ডুবিতে হইবে; দ্বৈত-জ্ঞানের উপাদান নিখিল নামরূপ বিস্মৃত হইতে হইবে, তবে জীব মুক্ত হইবে! কিন্তু আমরা সেই তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্য হইতে নিজেদের ও পরিবারবর্গের এবং সেই সঙ্গে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের নামরূপ স্থির রাখিয়া কেবল সার বুঝিয়াছি এইটুকু যে, 'দেবতার নামরূপই মিথ্যা, ঐ-টিই উঠাইতে হইবে'। সকল মিথ্যা হইয়া গেলেও একদিন যে নাম-রূপ সত্যসনাতন রহিয়া যাইবে, আজ সকল নাম-রূপ ভরপুর বজায় থাকিতে সর্ব্বাগ্রে সেই নামরূপটি উঠাইবার এত সত্বর প্রয়োজন কি উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—যেন ব্রহ্মজ্ঞানের বাজারে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, ইহার পরে দ্রব্য সমস্ত অগ্নিমূল্য হইয়া যাইবে, এই বেলা যাহা কিছু ক্রয় করা যায় তাহাই লাভ। আমরা সে লাভেও তাঁহাদিগকে

বঞ্চিত হইতে বলি না। তবে দুঃখ এই যে যাহাদের নামরূপ লইয়া সংসার-বন্ধন তাহাদের নামরূপ রহিয়াই গেল, আর যে নাম রূপ লইয়া সংসার-বন্ধনচ্ছেদন হইবে তাহাই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া গেল। উত্তরোত্তর দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইবে শুনিয়া আমাদের ক্রেতৃবর্গ এত সত্বর হইয়াছেন যে যেন মূল্য পর্য্যন্তও সঙ্গে আনিতে ভুলিয়াছেন। যাঁহার আরাধনা করিলে সেই তপস্যার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই বিস্মরণ। জানি তাঁহারা বলিয়া থাকেন 'স্বভাবাদ্ ব্রহ্ম-ভূতস্য কিং পূজা-ধ্যান-ধারণা ?' স্বভাবতঃ যিনি ব্রহ্মভূত তাঁহার আবার ধ্যান ধারণা পূজা কি ? আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য স্বভাবাৎ ক্ষণিক-ধ্যানাদিবিরহাৎ'। স্বভাবতঃ অর্থাৎ ক্ষণিক ধ্যানাদির অভাবেও আহার নিদ্রাদির ন্যায় নৈসর্গিকভাবে যিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, এইরূপে যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ জীবত্ব ঘুচিয়া ব্রহ্মত্বে পরিণত, তাঁহার আর ধ্যান ধারণা পূজা কিছুরই প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট-দোষে আজকাল ঘটিয়াছে 'স্বভাবাদ্' ব্রহ্ম ভূতস্য— ধ্যানও নাই ধারণাও নাই, পূজাও নাই অর্চ্চাও নাই—ইহাঁরা স্বভাবতঃই ব্রহ্মভূত। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। বস্তুতঃই শাস্ত্রার্থের অপলাপকারী, এইরূপ স্বেচ্ছাচারীও ধ্যান ধারণা পূজা জপ কিছুতেই অধিকারী নহে, তাই তাহার পক্ষেও কিছুই নাই। যাহার আদিতে 'ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্য-মেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ', মধ্যস্থলে 'আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽ-দ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈব মোক্ষভাগ্ ভবেৎ', অন্তভাগে 'আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥' সেই চারিটি বচন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ না হইয়া 'ব্রহ্ম সাকার হইতে পারে না' ইহার প্রমাণ হইল কিরূপে, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শাস্ত্র অবশ্য বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম'— বিরাট ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ সমস্তই মায়াকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা, কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য। আমরাও সে কথা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে জগতে মিথ্যা, সে জগতে কি সাকার-নিরাকারবাদী তুমি আমিও সত্য ? এই মিথ্যার অর্থ যদি 'একেবারেই নাই' হইয়া যায়, তবে ত তুমি আমিও নাই। পরমার্থতঃ তুমি আমি নাই ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু স্বীকার করি বলিয়াই কি তাহা স্বরূপতঃ অনুভব করিতে পারি ? সেই অনুভব যাহারা করিতে পারে তাদের কি আবার সাকার নিরাকার বিচার থাকে ? তুমি আমি যেখানে মিথ্যা হইয়া গেলাম, তোমার তুমিত্ব আমার আমিত্ব যেখানে লোপ পাইল সেখানে ত দুই বলিতে কোন পদার্থই নাই। যেখানে দুই নাই সেখানে কাহার সহিত কাহার বিচার ? কিন্তু তাই বলিয়া কি এখন তোমার আমার ব্রহ্ম-

জ্ঞানের অনুরোধে দ্বৈত জগৎ উঠিয়া যাইবে? শাস্ত্র ত বলিয়াছেন, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যা। এখন জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে কখনও কি একটি তৃণও মিথ্যা করিতে পারিয়াছি? যদি তাহাই না পারিলাম, তবে তৃণটি উঠাইবার ক্ষমতা যাহার নাই সে ব্রহ্মাকে উঠাইতে যায় কেন? একথা মনে করিতেও কি লজ্জাবোধ হয় না? দুঃখের কথা বলিব কি, যে শাস্ত্র দ্বারা সাকার ব্রহ্ম দেব-দেবীর অস্তিত্ব উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন, 'ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত' ব্রহ্ম যদি সাকার না হয়েন, তবে এ ব্রহ্মা কে? আর যদি 'ব্রহ্মা আদি' না হইয়া 'ব্রহ্ম আদি' হয়, তবে ত সমূলে নির্ম্মূল; সত্য বলিয়া কোন পদার্থই থাকে না।

শাস্ত্র দেবতার আজ্ঞা, জীবের পক্ষে তাহা শাসন ও উপদেশ। শাস্ত্র জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়া সেই তালে তাল দিয়া তুমি আমি নৃত্য করিতে পারি না। শাস্ত্রের বক্তা সর্ব্বান্তর্যামী মায়াতীত ভগবান এবং তাহার শ্রোত্রী সর্ব্বান্তর্যামিনী তুরীয়-চৈতন্যরূপিণী নিখিল মায়ার অধীশ্বরী, মহেশ্বরী। তাঁহাদের কথোপকথনে জগৎ মিথ্যা ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি। কিন্তু তোমার আমার পক্ষে তাহা বহু যুগযুগান্ত সাধনসাধ্য অবাঙ্মনস-গোচর ব্রহ্মতত্ত্ব। যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী জানেন, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ রণযাত্রা করিতে হইবে এই পর্য্যন্তই সৈনিকের দায়িত্ব, তদ্রূপ আমাদিগেরও সেই ত্রিভুবন-রাজদম্পতির আজ্ঞানুসারে সাধন-সমরে অগ্রসর হইতে হইবে, এই পর্য্যন্তই দায়িত্ব। রাজা রাণী বুঝিয়াছেন এ যুদ্ধে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা সে বিষয়ের কথোপকথন লইয়া আনন্দ উল্লাস করিতে পারেন, কিন্তু সৈনিক যদি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া 'বিজয় ত হইবেই হইবে তবে আর যুদ্ধ কেন?' এই ভাবিয়া সেই আমোদে মাতিয়া যান, তবে ত বিজয়-পতাকা ধরাশয়নে উড্ডীন হইবারই কথা। মহাদেব বলিয়াছেন জগৎ মিথ্যা, তবে আর মিথ্যা নামরূপের ভজন সাধন কেন? এই বলিয়া যদি প্রথমেই সব ছাড়িয়া দিয়া জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া সাধক কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করেন তবে ত যে ব্রহ্মজ্ঞান ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। বেদ বলিয়াছেন, 'যে সময়ে জীবের সম্বন্ধে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে তখন আর তিনি কিসের দ্বারা কি দেখিবেন, কি ঘ্রাণ করিবেন, কি শুনিবেন' ইত্যাদি অর্থাৎ মন বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্তই যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে ক্রিয়া অসম্ভব, ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মশ্রবণ ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত-পরিভাষাকার তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন 'ন তু সংসারদশায়াং বাধঃ,' জগৎ মিথ্যা হইলেও সংসারদশায় মিথ্যা নহে অর্থাৎ যখন স্বপ্ন দেখিতেছি তখন স্বপ্ন মিথ্যা নহে। যদি স্বপ্ন তখনই মিথ্যা হইবে তবে আর স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠি কেন?

শ্রুতি আবার বলিতেছেন, 'যখন দ্বৈত জগতের ভান হয় জীব তখনই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জগৎকে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করে।' তাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, 'দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ, লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণন্ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ। আ-আত্ম-নিশ্চয়াৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।' দেহে আত্মপ্রত্যয় পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও তাহা যেমন সাংসারিকদশায় প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া লোকে যেমন বলিয়া থাকে 'আমি কৃশ হইয়াছি, আমি স্থূল হইয়াছি, আমি সুস্থ হইয়াছি, আমি রুগ্ন হইয়াছি' ইত্যাদি। পরমার্থতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা যেমন কখনও কৃশ বা স্থূল রুগ্ন বা সুস্থ হয়েন না, কারণ সুখ দুঃখ রোগ শোক স্থূলত্ব কৃশত্ব এ সকল শরীরেরই ধর্ম্ম, আত্মা চিরকালই নির্ব্বিকার, তথাপি সেই আত্মাকেই শরীররূপে বিশ্বাস করিয়া লোকের এই সকল ব্যবহার সংসারদশায় যেমন প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, তদ্রূপ দ্বৈত জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও যতদিন আত্ম-নিশ্চয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন তাহা স্বতন্ত্র-রূপেই প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। জানি চিরকালই পূর্ব্বদিক হইতে সূর্যোদয় হইয়া থাকে, তথাপি অপরিচিত স্থলে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে যেমন নিশ্চয় বোধ হয় যে পশ্চিম বা উত্তর কিম্বা দক্ষিণ দিক হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছে, জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাস না করিলেও যেমন তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া দৃঢ়প্রতীতি জন্মে—এই দিগ্‌ভ্রম যেমন অপরিহার্য্য, পরব্রহ্মে এই দ্বৈত জগতের ভানও তদ্রূপ অপরিহার্য্য। অনুগ্রহ করিয়া দ্বৈত জগৎকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে, যতদিন এই মায়াস্বপ্ন তিরোহিত না হইতেছে, যতদিন কর্ম্মপাশ ক্ষয় না হইতেছে, যতদিন 'তুমি আমি' ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে, ততদিন মিথ্যাই বল, স্বপ্নই বল, আর কল্পনাই বল, এ দ্বৈতবিশ্ব বিশ্বাস না করিয়া কিছুতেই জীবের অব্যাহতি নাই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্মফলে সংস্কারের গুণে বাধ্য হইয়া আমাকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। জলের মধ্যে থাকিয়া জালবদ্ধ হইয়া দুর্ব্বল মীন যতটুকুই কেন গতিবিধি না করুক্, সে যেমন কিছুতেই জাল অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে পারে না, তদ্রূপ সাংসারিক জীবও সংসারে থাকিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া কিছুতেই মায়াপাশ ছেদন করিয়া মায়ার বহির্ভাগে অগাধ ব্রহ্মতত্ত্ব-জলে প্রবেশ করিতে পারে না। জলমধ্যে থাকিলেও জালবন্ধন হেতু মীনের যেমন গতি রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মময় বিশ্বমধ্যে থাকিলেও মায়াবন্ধন হেতু জীব স্বচ্ছন্দ গমনে সেই আনন্দ স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও মায়িক জীব তুমি আমি এই দ্বৈত-জগৎ-সংসারে থাকিয়া তাহা নিত্য সত্য বলিয়া অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

উপাসকমাত্রেরই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একান্ত সাধ আছে, কিন্তু সাধ আছে বলিয়াই সকলের তাহা সাধ্য নহে। সেই সাধ সিদ্ধ করিবার জন্যই

যত কিছু সাধনা। সাধনার অভাবে তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে। গর্ভস্থ সন্তানের অবশ্য এমন সাধ জন্মিতে পারে যে মায়ের স্বরূপ দর্শন করিব, কিন্তু গর্ভে থাকিয়া গর্ভধারিণীর রূপ দর্শন করা অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে নির্ব্বিঘ্নে যিনি প্রসূত হইয়াছেন তাঁহারই সে সাধ মিটিবার কথা। তদ্রূপ মহামায়ার এই বিশ্বসংসার-মায়াগর্ভে থাকিয়াও তাঁহার সেই মৃত্যুঞ্জয়-মনোহারিণী রূপমাধুরী দর্শন করাও অসম্ভব। জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্যপুঞ্জবলে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যিনি সেই বিশ্বজননীর মায়াময় গর্ভকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপ দর্শন করিবার উপযুক্ত সন্তান। সেই সন্তানই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাদি দেবদুর্লভ পয়োধর-পয়ঃপানের প্রকৃত অধিকারী, তিনিই সেই গুহ-গজানন-সেবিত অভয়-ক্রোড়ের ভাগহারী। তবে সন্তানের উৎকট সাধনার যন্ত্রণা দেখিয়া করুণাময়ী যদি কাহাকেও কৃতার্থ করেন, কালভয়হারি কালজলদকান্তিপুঞ্জে গর্ভস্থ কালরাত্রির ঘোরান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া জরায়ুযোগস্থ সন্তানের হৃদয়ে যোগীন্দ্র-হৃদিচারিণী যদি স্বয়ং দর্শন দেন, নিজ মায়া-খড়্গের খরধারে সংসার-মায়াপাশ ছেদন করিয়া ভক্ত সাধক সন্তানকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লয়েন, তবে তাহাও জানিবে জন্মজন্মান্তরের বহু কঠোর সাধনার অমোঘ ফল, বিনা সাধনায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃত সাধন ব্যতিরেকে সে রাজ্যে পৌঁছিবার উপায় নাই। বাহিরে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইলেও জীব যে গৃহে রুদ্ধ সে গৃহের কবাট তাহার হস্তায়ত্ত নহে। জীব ঊর্দ্ধ সংখ্যা মায়া-শয্যায় শয়ন করিয়া রোদন করিতে পারে, কিন্তু কবাট খুলিয়া দিবার অধিকার জননীর। তবে জীবের এই পর্য্যন্ত সাধ্য যে, সে উৎকট রোদন করিয়া মায়ের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতে পারে। সাধক কঠোর সাধনার বলে মূলাধারে নিদ্রিতা জননী কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে পারেন। তিনি যদি উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের কবাট খুলিয়া দেন তবেই একদিন বাহির হইবার কথা আছে, নতুবা জানিবে সাধন ভজন সকলই অরণ্যে রোদন বই আর কিছুই নহে। ষট্‌চক্রভেদে সাধনার যে সিদ্ধি উপস্থিত হইবে, সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া তাহা দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রহ্মের নাম রূপ আছে বা নাই—ইহা বলিবার অধিকার জীবের নাই বলিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেননা সে তত্ত্ব জীবের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। তবেই অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়াছেন বলিয়াই জগতের যাহা কিছু বিশ্বাস অবিশ্বাস। এখন জিজ্ঞাসা করি, যে শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রহ্মের নাম নাই, রূপ নাই সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন 'ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ' ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়ার দ্বারা কল্পিত। 'কল্পিত' বলিলেই যদি তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না থাকে তবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের অস্তিত্ব থাকে কেন?

জগৎ ত জীবের অপ্রত্যক্ষ নহে। কল্পিত জগতে যদি তৃণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে ইহা ধ্রুব সত্য হয়, তবে ব্রহ্মার অবস্থান বা অস্তিত্ব অসম্ভব হইল কিসে তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি কেহ বলেন—এ 'ব্রহ্মন্' শব্দে তোমার চতুর্ম্মুখ রক্তবর্ণ সাকার ব্রহ্মা নহেন তবে ত আরও মঙ্গল, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যদি তৃণের সঙ্গে সঙ্গে মায়া-কল্পিত মিথ্যা হইয়া উঠেন তবে আর সত্য ব্রহ্ম থাকিলেন কে? বৃক্ষের শাখা ছেদন করিতে গিয়া যে শাখায় বসিয়া আছি সর্ব্বাগ্রে তাহারই ছেদন, সাকার ব্রহ্ম উঠাইতে গিয়া নিরাকার ব্রহ্মের মূলোৎপাটন—এ সকল কালিদাসী বিদ্যার পরিণাম কেবল ব্যাখ্যাকর্ত্তার আত্মপতন। সুতরাং সাবধান করা ভিন্ন সে সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। আমরা সেই শাস্ত্রের বাক্যে নির্ভর করিয়াই বলিতেছি, জগতের ব্যাপারের মধ্যেই ব্রহ্মাদি—তাই যতদিন জগৎ রহিয়াছে ততদিন ব্রহ্মা আছেন বা যত দিন ব্রহ্মা আছেন ততদিন জগৎ রহিয়াছে। মায়া-কল্পিত বলিয়া জগৎ যেমন তোমার আমার পক্ষে মিথ্যা নহে, তদ্রূপ সাধকের চক্ষে ব্রহ্মাদি দেবতাও মিথ্যা নহেন।

তৃতীয়তঃ। তর্ক বিচার যুক্তি প্রমাণে অসিদ্ধ হইলেও যদি স্বীকার করিয়া লই—নিরাকারবাদের ব্যাখ্যাই স্থির, ব্রহ্মের নাম রূপ নাই, ইহাই সত্য তাহা হইলেও ত নিস্তার নাই, ব্রহ্মের যদি নাম রূপ নাই থাকে তবে 'ব্রহ্মের নাম রূপ নাই' এ কথা বলিতেছেন কে? মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের বক্তা সদাশিব, শ্রোত্রী আদ্যাশক্তি, তাঁহারা নিজেরাই নাম রূপ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ।
> পূর্ব্বোত্তরপদৈ র্বাক্যৈ-স্তন্ত্রান্ সমবতারয়ৎ॥

স্বয়ং মহেশ্বর 'গুরুশিষ্য' পদে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন এবং উত্তর বাক্য দ্বারা তন্ত্র-সমূহের অবতারণা করিয়াছেন, অর্থাৎ আগমের অবতারণা সময়ে শিষ্যরূপে দেবী প্রশ্ন করিয়াছেন, মহাদেব গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার উত্তর করিয়াছেন, আবার নিগমের অবতারণা সময়ে মহাদেব স্বয়ং শিষ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, দেবী গুরুরূপে তাহার উত্তর করিয়াছেন। অথবা দেবীর অভিন্ন স্বরূপে দেবই উভয়স্থলে গুরুশিষ্যরূপে তন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্মের যদি নাম রূপ নাই থাকে তবে ত এ দেব-দেবী সকলই মিথ্যা, দেব-দেবী মিথ্যা হইলে তন্ত্রশাস্ত্র সত্য কিসের? মহাদেব এবং মহাদেবী বলিয়াছেন বলিয়াই ত সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব—আজ সেই বক্তা এবং বক্ত্রী দেব-দেবীই যদি মিথ্যা হইয়া যান—তবে তন্ত্রের সে গৌরব সে প্রামাণ্য কোথায় থাকে? তন্ত্র যদি দেবতার আদেশ না হয়, তাহা হইলে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মানবের ভ্রান্ত বাক্য উড়াইতে কতক্ষণ? তখন মহানির্ব্বাণ-

তন্ত্র বলিয়াছেন বলিলে আর কাহারও মস্তক নত হইবে না। নিরাকারবাদী যেমন বলিবেন ব্রহ্মের নাম রূপ মানি না, সাকারবাদী তৎক্ষণাৎ গর্ব্বিত মস্তকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিবেন, তোমার মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রই মানি না। তবেই বিচার বিবাদ সব ঘুচিল, ব্যাখ্যা বৃত্তি সব মিটিল, বচন প্রমাণ সব উড়িল। তাই বলিতেছিলাম— যেখানে আত্মরক্ষার উপায় নাই, সেখানে কৌশলে স্বার্থের অভিসন্ধি করাই অতি নির্ব্বোধের কার্য্য।

আর একটি কথা, শাস্ত্রকে যদি প্রমাণ-স্বরূপে রাখিয়া বিচার করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের আদ্যন্ত সমস্তই সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির রাখিতে হয়। অন্যথা মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া দিয়া কেবল যদি ধ্যান ধারণাই করা যায় তাহা হইলেও ত সেস্থলে মনঃ-কল্পিত মনোময়ী মূর্ত্তিই সাধকের ধ্যেয় এবং আরাধ্য। মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি সাধকের মুক্তি-সাধিকা নাই হয়, তবে ত মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ধ্যান ধারণা করিলেও মুক্তি হইবার কোন কথা নাই, কেন না সে ধ্যানেও ত মনোময়ী মূর্ত্তিই সাধকের অবলম্বন। ধ্যানেও যদি সাধনা সিদ্ধি না হয়, তবে ত দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি যোগি-যোগীন্দ্র মুনিগণও চিরকালই পণ্ডশ্রমে পণ্ডিত হইয়া উঠেন, সিদ্ধসাধক মহাপুরুষগণও সকলেই অসিদ্ধ হইয়া উঠেন—আর মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রই বা তাহা হইলে 'ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ' এ কথা বলিলেন কি করিয়া? উত্তর পূর্ব্ব উভয় খণ্ড সমগ্র মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের মধ্যে এই চারিটি বচনই প্রমাণ, আর সমস্তই অপসিদ্ধান্ত এ কথা কে বলিল? যদি সত্য হয় তবে আদ্যন্ত সমস্তই সত্য, আর যদি মিথ্যা হয় তবে সমস্তই মিথ্যা, আমার মনের মত চারিটি বচন সার সত্য আর সমস্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ইহা কোন্ নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচার? গঙ্গার মধ্য হইতে আমি যে চারি গণ্ডূষ জল উঠাইয়া লইয়াছি তাহাই সেই ব্রহ্ম-কমণ্ডলুবাসিনী ব্রহ্মময়ী গঙ্গা, তদ্ভিন্ন হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত এ অপ্রতিহত প্রবাহে সমস্তই মর্ত্ত্যভূমির খাদজল, এ কোন্ আস্তিক্য-বিশ্বাস? মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, বর্ণাশ্রম, যুগধর্ম্ম, যোগতত্ত্ব, ষট্‌চক্র, রাজনীতি, ব্যবহার ধর্ম্ম, সাধন ধর্ম্ম, সৃষ্টি স্থিতি সংহার, ব্রহ্মাণ্ড-বিভাগ, চতুর্দ্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, দেবদেবীর নাম ধাম উপাসনা, দিব্য বীর পশ্বাচার, দেবতার মন্ত্র যন্ত্র মন্দির, মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা মুক্তি-বিভাগ ইত্যাদি রাশি রাশি বিধি-ব্যবস্থায় সঙ্গঠিত, এ সমস্তই মিথ্যা, সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কেবল ঐ চারিটি বচন, তাও আবার নিজ মতানুসারে অপার্থ কূটার্থ কদর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তবে সত্য, ইহার নাম সিদ্ধান্ত নহে—বিশ্বাসঘাতকতা, ঘোর স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মত্ত-প্রলাপ! কি তন্ত্র, কি বেদ, কি পুরাণ, সর্ব্বত্রই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিকাণ্ড-ভেদে সাধন ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সেই প্রণালী অনুসারেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত-শুদ্ধির পর জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারে ভগবান্ যাহা উপদেশ দিয়াছেন,

আজকালকার কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাখ্যাতার হস্তে পড়িয়া তাহা হইতেই এই সকল 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' নাস্তিকতার আবির্ভাব হইতেছে, স্বভাবখল সর্পের মুখে দুগ্ধ দিলেও তাহা গরলরূপেই পরিণত হয়, তদ্রূপ স্বভাব-নাস্তিক স্বার্থপরের হস্তে শাস্ত্র পড়িলেও তাহা হইতে এইরূপ নাস্তিকতারই আবিষ্কার হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থ ব্যাখ্যায় এইরূপে আর্য্যসমাজের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাঁহারাও যে নিজ বিশ্বাসঘাতকতা নিজে বুঝিতে না পারেন, তাহা নহে। কিন্তু বুঝিলেও দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ের স্বার্থপরতা তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইতে দেয় না। তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাহাদিগের অন্তরে, আর নিরক্ষর মূর্খ পল্লীকে যাহা বুঝাইতে বসিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের বাহিরে; তাই আজকাল আমরা কেবল কথায় ইঁহাদিগকে অন্তরে বাহিরে 'দ্বিজিহ্ব' বলিতে পারি। কিন্তু বলিতে কি, আজ যদি আর্য্যরাজত্ব থাকিত তাহা হইলে এই সকল ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাতৃগণ তৎক্ষণাৎ দ্বি-জিহ্ব হইতেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। অথবা—

ন বেত্তি যো যস্য গুণ-প্রকর্ষং, স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
যথা কিরাতী করিকুম্ভজাতাং, মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাং॥

যে যাহার গুণের প্রকর্ষ না জানে, সে তাহাকে সতত নিন্দা করিবে ইহা বিচিত্র নহে— যেমন কিরাত-কামিনী করিকুম্ভ-সম্ভবা মুক্তাকে পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জার হারে সজ্জিতা হয়েন। তাই আর্য্য কবিগণ বলিয়াছেন, ইহার জন্য দুঃখ করিতে নাই; কেননা, যাহার যাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই, সে তাহাকে উপেক্ষা করে বলিয়াই অনাদর করে না—যেমন 'মালতী-মল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনং', মালতী এবং মল্লিকার সৌরভ ভুবনমোহন হইলেও নাসিকাই তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু চক্ষু পারে না, তাই বলিয়া চক্ষু অপরাধী নহে কিন্তু অশক্ত; তদ্রূপ সাকার উপাসনার উপযুক্ত জ্ঞানভক্তি চিত্তশুদ্ধি যাহার জন্মান্তরেরও পরপারে অবস্থিত, সে যদি 'সাকার উপাসনা মিথ্যা' বলে, তবে বুঝিতে হইবে সে অপরাধী নহে, দণ্ডনীয় নহে, প্রত্যুত সর্ব্বসাধারণের কৃপাপাত্র। কেননা সাকার উপাসনার গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ধারণা করিবার শক্তি তাহাকে ভগবান এখনও দেন নাই, বুঝিতে হইবে বাহ্য আকারে মানব হইলেও অন্তরে তাহার মানবত্ব (মনুর সন্তানত্ব) এখনও অপূর্ণ, সে এখনও মানব-জগতে অপরিচিত এবং নিম্নস্তর হইতে অচিরাৎ উত্থিত। সে যাহাই হউক, দস্যুকে সদুপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে পথিককে সাবধান করা উচিত, এ সকল বাদ প্রতিবাদ স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাজকে সাবধান করা উচিত। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে, অযথা হুঙ্কার করিয়া দস্যুগণ আপন পরিচয় আপনিই দিয়াছেন, পথিকগণ তাঁহাদের সে স্বর চিনিয়াছেন—আর্য্যসমাজ তাঁহাদিগের এ সকল শাস্ত্র-ব্যাখ্যার নিগূঢ় অভিসন্ধি অনেকদিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন,

দৈত্যদলনী জগজ্জননী ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া এ সকল কলির দৈত্য হইতে জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন!

শ্রীমদ্ভাগবতে ভূতভয়হারী ভগবান সে সময়ে সাধন-ধর্ম্মের অধিকারে ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে ভক্ততত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেইস্থলে বলিয়াছেন—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

জলময় তীর্থসমস্ত তেমন তীর্থ নহেন, মৃণ্ময় এবং শিলাময় দেব-মূর্ত্তি সমস্তও তেমন দেবতা নহেন, সাধুগণ যেমন তীর্থ এবং যেমন দেবতা; কারণ, জলময় তীর্থকে বহুকাল সেবা করিলে এবং মৃৎপাষাণ-মূর্ত্তিময় দেবতাকেও বহুকাল আরাধনা করিলে তবে তাঁহারা পাপীকে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণের এমনই বিচিত্র প্রভাব যে তাঁহারা দর্শনমাত্রেই জীবকে পবিত্র করেন।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী আত্মা ঈশ্বর, এইরূপে আমাকে মোহবশতঃ না জানিয়া যে আমার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে, সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে!

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকগণ এই দুইটি শ্লোককেও নিরাকারবাদের প্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রথম শ্লোক হইতে তাঁহারা ইহাই সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে, জলময় তীর্থ তীর্থই নহেন এবং মৃণ্ময় দেবতা দেবতাই নহেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি তাহাই হয় তবে আবার 'তে পুনন্ত্যুরুকালেন' এ কথা কেন? যিনি তীর্থই নহেন, দেবতাই নহেন, বহুকাল সেবা করিলেই বা তিনি জীবকে পবিত্র করিবেন কোন্ শক্তি-বলে? ভগবান যখন বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্রতা বিধান করিবেন তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তীর্থ এবং দেবমূর্ত্তি অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তের প্রভাব অতিরিক্ত। কারণ তীর্থ এবং দেবতা পবিত্র করিলেও তাহাতে জীবের সেবা ও আরাধনার অপেক্ষা আছে; কিন্তু স্বচ্ছন্দকৃপাময় ভক্তের কৃপাদৃষ্টিপাতে সে অপেক্ষা নাই, ভক্তে এবং তীর্থে ও ভগবন্মূর্ত্তিতে ইহাই বিশেষ। যে শ্লোকের তৃতীয় পাদে এইরূপে ধরা পড়িতে হয়, সেই শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যাহারা চুরি করিতে অগ্রসর হয়, ভরসা করি, সাধকবর্গ সেই সকল সুবুদ্ধি চতুর চোরকে অবশ্য ক্ষমা করিবেন।

আবার দ্বিতীয় শ্লোক হইতে তাঁহারা সার-সংগ্রহ করিয়াছেন যে, 'ঈশ্বর সর্ব্বভূতব্যাপী' এইরূপ উপাসনা না করিয়া যাহারা মূর্ত্তি পূজা করে তাহারা কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে। দুঃখের কথা বলিব কি, ইহাঁদের এই দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনা দেখিয়া হাসিও পায়, লজ্জাও হয়। যাহারা পূজা জপ স্তব হোম কিছুই মানে

না, তাহারা আবার ভস্মে আহুতি দেওয়া বলিয়া দৃষ্টান্ত দেয় কেন? স্বরূপতঃ অগ্নিতে আহুতি আছে বলিয়াই তাহার বিপরীত বাক্য ভস্মে আহুতি দেওয়া—অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, ইহা সাকার উপাসনারই কথা; যদি মূলে সেই সাকার উপাসনাই মিথ্যা হয় তবে এ হোমের দৃষ্টান্ত আসিল কোথা হইতে? যাহা হউক ভগবান বলিয়াছেন, আমি সর্ব্বভূত-ব্যাপী আত্মা ঈশ্বর—এই জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া যে আমার মূর্ত্তি উপাসনা করে সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে। কেননা আমি জড় চৈতন্য সর্ব্বভূতে অবস্থিত, এ জ্ঞান না থাকিলে প্রতিমায় আমার অধিষ্ঠান ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাহার বিশ্বাস হইবে কিরূপে? অর্থাৎ আমি নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম—এ জ্ঞান যাহারা না আছে, মূর্ত্তিপূজায় সে আদৌ অধিকারীই নহে। এ শ্লোকের ফলিতার্থে যাহা দাঁড়াইল তাহাতে ত মূলে ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে মূর্ত্তিপূজাই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কালক্রমে ইহারই অর্থ হইয়াছে যে, মূর্ত্তিপূজা যে করে সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে। মহাজন! তোমার অর্থ তোমার গৃহেই থাকুক্, আর অকারণ বদান্যতা প্রকাশ করিয়া লোককে এ অর্থ দেখাইয়া পথের কাঙ্গাল সাজাইও না, অর্থের নামে এ অনর্থ সৃষ্টি আর করিও না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শক্তি-তত্ত্ব

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি সংশয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে। যুগ-মাহাত্ম্যেই হউক বা দল-মাহাত্ম্যেই হউক বঙ্গদেশে এরূপ কতগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতা বা অভিনেতা আছেন যাঁহারা আপনাকে এবং আপন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সর্ব্বতত্ত্ব-মীমাংসক এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধকের দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করেন এবং প্রচার করেন। কি জানি ভগবানের কিরূপ বিরূপ দৃষ্টি—ভগবান আর ভগবতীকে এক পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করাকে তাঁহারা অখণ্ডনীয় মহাপাতক বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকেও নারকীয় কীট-সদৃশ্য মনে করিয়া ঘৃণার আকারে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। মানব হইয়া মানবের প্রতি এরূপ ব্যবহার একান্ত অসম্ভব নহে, কিন্তু ইঁহাদিগের নিকটে দেবতারও নিস্তার নাই, ঈশ্বরকেও ক্ষমা নাই। বলিব কি, সাধকগণ একটু গুপ্ত অনুসন্ধান করিলেই অধিকাংশস্থলে দেখিতে পাইবেন, ইঁহারা স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া সেই নিবেদিত নির্মাল্য দ্রব্যাদি শ্রীরাধিকাকে নিবেদন করেন, কেননা সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ প্রভু এবং শক্তিরূপিণী শ্রীরাধিকা তাঁহার দাসী। প্রভুর পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করাই দাসীর কার্য্য এবং উক্ত উচ্ছিষ্ট প্রভুর অনুগ্রহ চিহ্ন-স্বরূপ; অতএব দাসীর পক্ষে অতি আদরণীয় এবং বিশেষ প্রীতিপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণের সহচারিণী অন্ততঃ দাসী বলিয়াও রাধিকার সম্মান যেরূপে হউক এই একরূপে রক্ষা পাইল। কিন্তু একাকিনী গায়ত্রীর আর উদ্ধার নাই, গায়ত্রীর সঙ্গে কেহ থাকিলে তাঁহাকেও ইঁহারা অনায়াসে এই দলভুক্ত করিতে পারিতেন কিন্তু কি করিবেন, ত্রিবেদ-জননী ত্রিদেব-প্রসবিত্রী গায়ত্রী কাহারও সহচারিণী নহেন। তাঁহাকে কাহারও দাসী বলিবার সুযোগ নাই, এজন্য 'নিতান্তই শক্তি' বলিয়া ইঁহারা গায়ত্রীকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও গায়ত্রী জপ কিম্বা গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করাও ইঁহাদিগের মতে মহাপাপ এবং সাধনতত্ত্বের এই একান্ত গুপ্তনিষ্ঠা সাধারণ্যে প্রকাশ করাও গর্হিত। তবে প্রকাশ্যে লৌকিক এবং কৌলিক প্রথা ও জাতিভেদ রক্ষার জন্য পুরোহিত ভট্টাচার্য্য দ্বারা পুত্রাদির উপনয়ন হইয়া থাকে এইমাত্র। উপনয়নের পর কদাচিৎ পুরোহিত ব্রাহ্মণের অমবসর বশতঃ তিনি উপনীত বালকের পিতা বা পিতামহকে যদি তাহার সন্ধ্যা গায়ত্রী শিখাইবার জন্য অনুরোধ করেন, তবেই

সর্ব্বনাশ। অনেকস্থলেই এরূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুই একটি দার্শনিক পণ্ডিতও এরূপ আছেন যাঁহারা সুযোগ বিশেষে বলিয়া থাকেন, শক্তি-উপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা নহে। তাঁহাদের মতে আবার এরূপ সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয়ও নহে। বেদান্তমতে যাঁহার নাম মায়া বা অবিদ্যা, ইঁহারা তাঁহাকেই 'আদ্যাশক্তি মহামায়া' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই মায়া বা অবিদ্যা জড় পদার্থ, তাহার নিজের চৈতন্য নাই, তবে চৈতন্যরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পাইয়া কার্য্যকালে ইনি চেতনার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকেন এইমাত্র। এইজন্য ইঁহারা বলিয়া থাকেন, শক্তিমান চৈতন্যময় এবং শক্তি জড় পদার্থ। সুতরাং ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাও জড় বই আর কি?

এখন দেখিতে হইবে তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুমোদিত কি না? শক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহা পরে বিবেচ্য, কারণ তন্ত্রশাস্ত্র শক্তিপ্রধান বলিয়াই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এজন্য প্রথমতঃই তান্ত্রিক প্রমাণ দিলে হয়ত তাহা তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইবে না। এজন্য আমরা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণই উদ্ধৃত করিতেছি। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষযজ্ঞ-প্রস্তাবে ব্রহ্মকৃত-শিবস্তবে—

শ্রীব্রহ্মোবাচ। জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যত্তদ্ ব্রহ্ম নিরন্তরম্ ॥
ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপদো যথা ॥

আপনি বিশ্বের ঈশ্বর ইহা জানি, আবার এই নিখিল চরাচর জগতের যোনি এবং বীজস্বরূপ শক্তি এবং শিব এই উভয়ের অভিন্নরূপ পরব্রহ্মও যে আপনি তাহাও জানি। ভগবন্! উর্ণনাভির ক্রীড়ার ন্যায় আপনিই শিব-শক্তি উভয় স্বরূপে বিভিন্ন হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার ক্রীড়া করিতেছেন। এস্থানে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন, শিবশক্তির যাহা অভিন্ন-তত্ত্ব তাহাই পরব্রহ্ম। তিনিও শক্তির অংশ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

প্রকৃতির্যস্যোপাদান-মাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥

এই বিদ্যমান জগতের উপাদানরূপা প্রকৃতি, আধাররূপ পরমপুরুষ এবং তাহার অভিব্যঞ্জক কাল, এই ত্রিভাগে বিভক্ত ব্রহ্ম আমি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মনঃ বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে। এই অষ্টধা-বিভক্ত প্রকৃতি অপরা। হে মহাবাহো! আমার চৈতন্যরূপিণী পরাপ্রকৃতিকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া জান—যে পরাশক্তি জীবের জীবনস্বরূপা এবং যৎ কর্ত্তৃক এই জগৎ ধৃত হইয়াছে। এস্থলে ভগবান অষ্টধা বিভক্ত জড়প্রকৃতির নির্দ্দেশ করিয়া নিত্য-চৈতন্যরূপিণী নিখিল-জীবের সঞ্জীবনী-শক্তিই পরা-প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতাবতা জড় ও চৈতন্য ভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা।

অপিচ—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়ার অবলম্বনে আবির্ভূত হইয়া থাকি। এস্থলেও ভগবান স্বরূপ-প্রকৃতি ও মায়াকে বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্কন্দ-পুরাণে কাশীখণ্ডে—পূতাত্মকৃতশিবস্তবে—

বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদ-স্ত্বমেকঃ সর্ব্বগো যতঃ।
স্তুত্যং স্তোতা স্তুতি-স্ত্বঞ্চ সগুণো নির্গুণো ভবান্॥
সর্গাৎ পুরা ভবানেকো রূপনাম-বিবর্জ্জিতঃ।
যোগিনোঽপি ন তে তত্ত্বং বিদন্তি পরমার্থতঃ॥
যদৈকলো ন শক্নোষি রন্তুং স্বৈরচরপ্রভো।
তদেচ্ছা তব যোৎপন্না সৈব শক্তিরভূত্তব॥
ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তি-প্রভেদতঃ।
ত্বং জ্ঞানরূপো ভগবান্ স্বেচ্ছাশক্তি-স্বরূপিণী॥
উভাভ্যাং শিবশক্তিভ্যাং যুবাভ্যাং নিজলীলয়া।
উৎপাদিতা ক্রিয়াশক্তি-স্ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ॥
জ্ঞানশক্তি-র্ভবানীশ ইচ্ছাশক্তি-রুমা স্মৃতা।
ক্রিয়াশক্তিরিদং বিশ্ব-মস্য ত্বং কারণং ততঃ॥

পুনশ্চ তত্রৈব—

ত্বং পুংপ্রকৃতিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডমসৃজঃ পুরা।
মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিশ্বমেতচ্চরাচরম্॥
অতস্ত্বত্তো ন মন্যেঽহং কিঞ্চিদ্ভিন্নং জগন্ময়।
ত্বয়ি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বভূতময়ো ভবান্॥

হে বিশ্বেশ্বর! তুমিই বিশ্ব-স্বরূপ, তোমাতে এবং বিশ্বে কোন ভেদ নাই, যেহেতু একমাত্র তুমিই সর্ব্বব্যাপী, স্তবের বিষয়, স্তবের কর্ত্তা এবং স্তব-স্বরূপও তুমি,

তুমিই সগুণ এবং নির্গুণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে রূপনামবিবর্জ্জিত একমাত্র তুমিই অবস্থিত ছিলে, যোগিগণও পরমার্থতঃ তোমার সে তত্ত্ব অবগত নহেন। হে স্বৈরচর প্রভো। যে সময়ে তুমি একাকী আত্মরমণে অসমর্থ হইয়াছিলে, সেই সময়ে যিনি তোমার ইচ্ছারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন তিনিই তোমার শক্তি। স্বরূপতঃ এক হইলেও শিব-শক্তি প্রভেদে তুমি দ্বিত্ব-রূপ লাভ করিয়াছ, তুমি জ্ঞানরূপ ভগবান্ এবং ইচ্ছা তোমার শক্তি-রূপিণী। এই শিব-শক্তি ভেদে উভয়রূপ তোমাদিগের কর্তৃক নিজলীলা ক্রমে ক্রিয়াশক্তি উৎপাদিতা হইয়াছেন এবং সেই ক্রিয়াশক্তি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি স্বয়ং জ্ঞানশক্তিস্বরূপ, উমা ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপিণী এবং এই বিশ্ব ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। অতএব বিশ্বের একমাত্র কারণস্বরূপ তুমি।

পুনশ্চ, পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপে তুমি প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অখিল বিশ্বচরাচর অবস্থিত হইয়াছে। অতএব হে জগন্ময়! আমি কিছুই তোমা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি না, সর্ব্বভূত তোমাতে অবস্থিত এবং তুমি সর্ব্বভূতময়। তথাচ অদ্ভুতরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকি-বাক্যং—

জানকী প্রকৃতিঃ সাক্ষাদাদিভূতা সনাতনী।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধি-র্ভূতি র্ভূতিমতাং সতী॥
বিদ্যাঽবিদ্যা চ মহতী গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ঋদ্ধিঃ সিদ্ধির্গুণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড-সংভূতা সর্ব্বকারণ-কারণং।
প্রকৃতি র্বিকৃতি র্দেবী চিন্ময়ী চিদ্বিলাসিনী॥
মহাকুণ্ডলিনী সর্ব্বানুস্যূতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা।
তস্যা বিলসিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥
যামাধায় হৃদি ব্রহ্মন্ যোগিন-স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বিঘট্টয়ন্তি হৃদ্‌গ্রন্থিং ভবন্তি চ স্বমূর্ত্তিকাঃ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি সুব্রত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা প্রকৃতি-সম্ভবঃ॥
রামঃ সাক্ষাৎ পরং জ্যোতিঃ পরমং ধাম পরঃ পুমান্।
আকৃতৌ পরমো ভেদো সীতারাময়োর্যতঃ॥
রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো,
নাণু র্ভেদো হ্যেতয়োরস্তি কশ্চিৎ।
সন্তো বুদ্ধ্যা তত্ত্বমেতদ্ বিবুদ্ধাঃ,
পারং যাতাঃ সংসৃতে র্মৃত্যুবক্ত্রাৎ॥

রামোঽচিন্ত্যো নিত্যচিৎ সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈক-কর্ত্তা।
ভর্ত্তা হর্ত্তা নন্দমূর্ত্তি র্বিভূমা, সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ সঃ॥

*　　*　　*　　*

তয়োঃ পরং জন্ম উদাহরিষ্যে, যয়ো র্যথা কারণদেহধারিণোঃ।
অরূপিণো রূপবিধারণং পুন-র্নৃণামহোঽনুগ্রহ এব কেবলম্॥

অপি চ অত্রৈব কালিকারূপয়া সীতয়া সহস্রবদন-রাবণবধানন্তরং শ্রীরামচন্দ্রকৃত-তদীয়স্তবে—

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
যন্মে সাক্ষাৎ ত্বমব্যক্তা প্রসন্না দৃষ্টিগোচরা॥
ত্বয়া সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং প্রধানাদ্যং ত্বয়ি স্থিতং।
ত্বয্যেব লীয়তে দেবি! ত্বমেব চ পরা গতিঃ॥
বদন্তি কেচিত্ত্বামেব প্রকৃতিং বিকৃতেঃ পরাং।
অপরে পরমার্থজ্ঞাঃ শিবেতি শিবসংশ্রয়ে॥
ত্বয়ি প্রধানঃ পুরুষো মহান্ ব্রহ্মা তথেশ্বরঃ।
অবিদ্যা নিয়তি র্মায়া কালাদ্যাঃ শতশোঽভবন্॥
ত্বং হি সা পরমা শক্তি রনন্তা পরমেষ্ঠিনী।
সর্ব্বভেদ-বিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বভেদাশ্রয়া নিজা॥
ত্বামধিষ্ঠায় যোগেশি! পুরুষঃ পরমেশ্বরীং।
প্রধানাদ্যং জগৎ কৃৎস্নং করোতি বিকরোতি চ॥
ত্বয়ৈব সঙ্গতো দেবঃ স্বমানন্দং সমশ্নুতে।
ত্বমেব পরমানন্দ-স্ত্বমেবানন্দদায়িনী॥
ত্বমেব পরমং ব্যোম মহাজ্যোতি র্নিরঞ্জনং।
শিবং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

জানকী আদিভূতা সনাতনী সাক্ষাৎ প্রকৃতি, তিনিই তপঃসিদ্ধি স্বর্গসিদ্ধি এবং বিভুগণের নিত্যা বিভূতি। ব্রহ্মবাদিগণ সেই মহাশক্তিকেই বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই উভয়রূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনিই ঋদ্ধি সিদ্ধি গুণময়ী গুণাত্মিকা এবং গুণাতীতা। তিনি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়রূপে সম্মিলিতা, সমস্ত কারণের কারণস্বরূপা, প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয়রূপে নিত্য ক্রীড়াময়ী চিন্ময়ী এবং চিদ্বিলাসিনী। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিনী ব্রহ্মরূপিণী মহাকুণ্ডলিনী, এই চরাচর নিখিল জগৎ কেবল তাঁহারই বিলাসমাত্র। হে ব্রহ্মন্! যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া তত্ত্বদর্শী যোগিগণ হৃদয়-গ্রন্থি বিঘট্টিত করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়েন। সুব্রত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, সেই সেই সময়ে সেই

মহাপ্রকৃতি নিজ মায়াবলম্বনে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। রামচন্দ্রও সাক্ষাৎ পরম-জ্যোতিঃ পরমধাম এবং পরমপুরুষ, যেহেতু সীতা এবং রামচন্দ্রের স্বরূপতঃ পরমভেদ কিছু নাই। রামচন্দ্রই সীতাস্বরূপ এবং জানকীই রামভদ্র-স্বরূপ, ইঁহাদিগের পরস্পর অণুমাত্রও কোন ভেদ নাই। সাধুগণ এই তত্ত্ব বুঝিয়াই মায়ানিদ্রার ভঙ্গ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়াছেন এবং মৃত্যুবক্ত্র হইতে সংসার-সাগরের পারান্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রামচন্দ্র অচিন্ত্য নিত্যচৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্বলোকের একমাত্র কর্ত্তা ভর্ত্তা এবং হর্ত্তা, আনন্দমূর্ত্তি বিভুমা। যোগিগণ সীতা সহকারে অভিন্নরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই অজ হইয়াও কারণ-দেহধারী প্রকৃতি-পুরুষের পরম বিচিত্র জন্মবৃত্তান্তের যথাযথ উদাহরণ করিব। স্বরূপতঃ অরূপ হইলেও তাঁহাদের এই লীলারূপ ধারণ কেবল মানবকুলের উদ্ধার জন্য অপার অনুগ্রহ বই আর কিছুই নহে।

অনন্তর কালিকামূর্ত্তিধারিণী সীতা কর্ত্তৃক সহস্রবদন রাবণ হত হইলে রামচন্দ্র তাঁহার স্তবস্থলে বলিয়াছেন--

অদ্য আমার জন্ম সফল, তপস্যা সফল হইল যেহেতু তুমি চরাচরের অব্যক্ত-রূপা হইয়াও প্রসন্নরূপে আমার দৃষ্টিগোচরা হইলে। সমস্ত জগৎ তোমারই সৃষ্ট এবং প্রধান প্রভৃতি-তত্ত্ব তোমাতেই অবস্থিত। মহাপ্রলয়কালে এ জগৎ তোমাতেই বিলীন হয়—তুমিই জীবের পরমাগতি, কেহ তোমাকে বিকৃতি হইতে স্বতন্ত্রা প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, হে শিবসংশ্রয়ে। আবার অপর পরমাত্মজ্ঞানিগণ তোমাকে শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রধান পুরুষ মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মা, ঈশ্বর অবিদ্যা নিয়তি মায়া এবং কাল প্রভৃতি শত শত অবয়ব তোমা হইতেই উৎপন্ন এবং তোমাতেই অবস্থিত হইয়াছে। তুমিই সেই পরমেষ্ঠিরূপা অনন্তা পরমাশক্তি, সর্ব্বভেদ বিনির্ম্মুক্তা এবং সর্ব্বভেদে আশ্রয়রূপা ও স্ব-স্বরূপা। হে যোগেশ্বরি! পরমেশ্বরীরূপা তোমাকে অধিষ্ঠান করিয়াই পুরুষ এই প্রধানাদি কৃৎস্ন জগৎকে কৃত এবং বিকৃত করেন। পুরুষ-রূপ পরমদেব তোমার সহিত সঙ্গত হইয়াই নিজ আনন্দ ভোগ করেন, তুমিই পরমানন্দস্বরূপিণী এবং পরমানন্দদায়িনী, তুমিই পরমব্যোম মহাজ্যোতিঃ নিরঞ্জন শিব সর্ব্বগত সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম সনাতন। মহাভাগবতে—

যামারাধ্য বিরিঞ্চিরস্য জগতঃ স্রষ্টা হরিঃ পালকঃ,
সংহর্ত্তা গিরিশঃ স্বয়ং সমভবদ্ধ্যেয়া চ যা যোগিভিঃ।
যামাদ্যাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয়-স্তত্ত্বার্থবিজ্ঞাঃ পরাং,
তাং দেবীং প্রণমামি বিশ্বজননীং স্বর্গাপবর্গপ্রদাম্॥ ১॥
যা স্বেচ্ছয়াস্য জগতঃ প্রবিধায় সৃষ্টিং,
সংপ্রাপ্য জন্ম চ তথা পতিমাপ শম্ভুং।

উগ্রৈস্তপোভিরপি যাং সমবাপ্য পত্নীং।
শম্ভুঃ পদং হৃদি দধে পরিপাতু সা বঃ ॥ ২ ॥

* * * *

সূত উবাচ।

মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসঃ সর্ব্ববেদবিদাম্বরঃ।
অশেষধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বক্তা জ্ঞানী মহামতিঃ ॥
কৃত্বা সপ্তদশৈতানি পুরাণানি মহামুনিঃ।
ন তৃপ্তিমভিলেভে স কথঞ্চিদপি ধর্ম্মবিৎ ॥
মহাপুরাণং পরমং যৎপরং নাস্তি ভূতলে।
ভগবত্যাঃ পরং তত্ত্বং মাহাত্ম্যং যত্র বিস্তৃতম্ ॥
তৎকথং বর্ণয়িষ্যেঽহমিতি চিন্তাপরায়ণঃ।
দেব্যাস্তত্ত্বমবিজ্ঞায় ক্ষুব্ধচিত্তো বভূব সঃ ॥
যস্যাস্তত্ত্বং ন জানাতি মহাজ্ঞানী মহেশ্বরঃ।
তস্যাঃ কথং পরং তত্ত্বং জ্ঞাতব্যমতিদুষ্করম্ ॥
বিচিন্ত্যৈবং মহাবুদ্ধি-শ্চচার পরমং তপঃ।
গত্বা হিমবতঃ পৃষ্ঠং দুর্গাভক্তিপরায়ণঃ ॥
তেনৈব তপসা তুষ্টা শর্ব্বাণী ভক্তবৎসলা।
অদৃষ্টরূপা চাকাশে স্থিত্বেদং বাক্যমব্রবীৎ ॥
যত্রাস্তে শ্রুতয়ঃ সর্ব্বা ব্রহ্মলোকং মহামুনে।
গচ্ছ তত্র পরং তত্ত্বং মম বেৎস্যসি নিষ্কলম্ ॥
প্রত্যক্ষতাং গমিষ্যামি তত্রৈব শ্রুতিভিঃ স্তুতা।
তচ্চ সম্পাদয়িষ্যামি তবাভিলষিতঞ্চ যৎ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্যাসো ব্রহ্মলোকং তদা যযৌ।
বেদান্ প্রণম্য পপ্রচ্ছ কিং ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥
ঋষেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনয়াবনতস্য বৈ।
বেদাঃ প্রত্যেকতঃ প্রাহু-স্তৎক্ষণান্মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদ উবাচ। যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহু-স্তৎপরং তত্ত্বং সাক্ষাদ্ভগবতী স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

যজুর্ব্বেদ উবাচ। যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশা যোগেন চ সমিজ্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥

সামবেদ উবাচ। যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি র্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী ॥ ৭ ॥

অথর্ব্ববেদ উবাচ। যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ। শ্রুতীরিতং নিশম্যেত্থং ব্যাসঃ সত্যবতী সুতঃ।
দুর্গাং ভগবতীং মেনে পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্ ॥
শ্রুতয়স্ত্বেবমুক্ত্বা তাঃ পুনরূচুর্মহামুনিং।
প্রত্যক্ষং দর্শয়িষ্যামো যথাস্মাভিরুদাহৃতম্ ॥ ৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রুতয়-স্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরীং।
সর্ব্বদেবময়ীং শুদ্ধাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহাম্ ॥ ১০ ॥

শ্রুতয় উচুঃ।

দুর্গে! বিশ্বময়ি! প্রসীদ পরমে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যত্রয়ে,
ব্রহ্মাদ্যাঃ পুরুষা-স্ত্রয়ো নিজগুণৈ-স্তৎ স্বেচ্ছয়া কল্পিতাঃ।
নো তে কোঽপি চ কল্পকোঽত্র ভুবনে বিদ্যেত মাত র্যতঃ,
কঃ শক্তঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণান্ লোকে ভবেদ্ দুর্গমান্ ॥ ১১ ॥
ত্বামারাধ্য হরি র্নিহত্য সমরে দৈত্যান্ রণে দুর্জয়ান্,
ত্রৈলোক্যং পরিপাতি শম্ভুরপি তে ধৃত্বা পদং বক্ষসি।
ত্রৈলোক্যক্ষয়-কারকং সমপিবৎ যৎ কালকূটং বিষং,
কিন্তে বা চরিতং বয়ং ত্রিজগতাং ব্রূমঃ পরেশ্যম্বিকে ॥ ১২ ॥
যা পুংসঃ পরমস্য দেহিন ইহ স্বীয়ৈ গু'ণৈ র্মায়য়া,
দেহাখ্যাপি চিদাত্মিকাপি চ পরিস্পন্দাদিশক্তিঃ পরা।
তন্মায়াপরিমোহিতা-স্তনুভৃতো যামেব দেহস্থিতাং,
ভেদজ্ঞানবশাদ্বদন্তি পুরুষং তস্যৈ নমস্তেঽম্বিকে ॥ ১৩ ॥
স্ত্রীপুংস্ত্বপ্রমুখৈ-রুপাধিনিচয়ৈ-র্হীনং পরং ব্রহ্ম যৎ,
ত্বত্তো যা প্রথমং বভূব জগতাং সৃষ্টৌ সিসৃক্ষা স্বয়ং।
সা শক্তিঃ পরমোঽপি যচ্চ সমভূন্মূর্ত্তিদ্বয়ং শক্তিত-
স্তন্মায়াময়মেব তেন হি পরং ব্রহ্মাপি শক্ত্যাত্মকম্ ॥ ১৪ ॥
তোয়োত্থং করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট্বা যথা নিশ্চয়ঃ,
তোয়ত্বেন ভবেদ্ গ্রহো মতিমতাং তথ্যং তথৈব ধ্রুবং।
ব্রহ্মোত্থং সকলং বিলোক্য মনসা শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মত-
চ্ছক্তিত্বেন বিনিশ্চিতা পুরুষধীঃ পারম্পরা ব্রহ্মণি ॥ ১৫ ॥
ষট্‌চক্রেষু লসন্তি যে তনুভৃতাং ব্রহ্মাদয়ঃ ষট্ শিবাঃ,
তে প্রেতা ভবদাশ্রয়াচ্চ পরমেশত্বং সমায়ান্তি হি।
তস্মাদীশ্বরতা শিবে নহি শিবে ত্বয্যেব বিশ্বাত্মিকে।
ত্বং দেবি ত্রিদশৈকবন্দিতপদে দুর্গে প্রসীদস্ব নঃ ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যেবং স্তুতিবাক্যৈস্তু শ্রুতিভিঃ সংস্তুতা সতী।
স্বরূপং দর্শয়ামাস জগদাদ্যা সনাতনী ॥ ১৬ ॥
জ্যোতীরূপা হি যা দেবী সর্ব্বপ্রাণিষ্ববস্থিতা।
ব্যাসস্য সংশয়ং ছেত্তুং স্বতন্ত্রাকৃতিমাদধে ॥ ১৮ ॥
স্ফুরৎসূর্য্য-সহস্রাভাং চন্দ্রকোটি-সমদ্যুতিং।
সহস্রবাহুভির্যুক্তাং দিব্যাস্ত্রৈরপি সাবৃতা ॥ ১৯ ॥
দিব্যালঙ্কারভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া কদাচিচ্ছববাহনা ॥ ২০ ॥
চতুর্ভির্বাহুভির্যুক্তা নবীনজলদপ্রভা।
দ্বিভুজা চ চতুর্হস্তা তথা দশভুজা ক্ষণে ॥ ২১ ॥
অষ্টাদশভুজা কাপি শতসংখ্যভুজা তথা।
অনন্তবাহুভির্যুক্তা দিব্যরূপধরা ক্ষণে ॥ ২২ ॥
কদাচিদ্বিষ্ণুরূপা চ বামে চ কমলালয়া।
রাধয়া সহিতাকস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী ॥ ২৩ ॥
বামাঙ্গাধিগতা বাণী কদাচিদ্ ব্রহ্মরূপিণী।
কদাচিচ্ছিবরূপা চ গৌরী বামাঙ্কসংস্থিতা ॥ ২৪ ॥
এবং সর্ব্বময়ী দেবী কৃত্বা রূপাণ্যনেকধা।
ব্যাসস্য সংশয়োচ্ছেদং চকার ব্রহ্মরূপিণী ॥ ২৫ ॥

সূত উবাচ।

এবং রূপাণি সংলোক্য পরাশরসুতো মুনিঃ।
তাং জ্ঞাত্বা পরমং ব্রহ্ম জীবন্মুক্তো বভূব হ ॥
ততো ভগবতী দেবী জ্ঞাত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতং।
স্বপাদতল-সংলগ্নং পঙ্কজং সমদর্শয়ৎ ॥
মুনিস্তস্য সহস্রেষু দলেষু পরমাক্ষরং।
মহাভাগবতং নাম পুরাণং সমলোকয়ৎ ॥
প্রণম্য শিরসা দেবীং নানাস্তুতিভিরাদরাৎ।
জগাম স্বাশ্রমং ভূয়ঃ কৃতকৃত্যঃ স্বয়ং দ্বিজাঃ ॥
যথা তৎ পঙ্কজে দৃষ্টং পুরাণং পরমাক্ষরং।
মহাভাগবতং পুণ্যং প্রকাশমকরোত্তথা ॥

অপি চ তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

নারদ উবাচ। ত্রিজগদ্বন্দ্য দেবেশ! ভক্তানুগ্রহকারক।
ত্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ শুদ্ধাত্মব্রহ্মসংজ্ঞকঃ ॥ ২৬ ॥
ত্বমেব বস্তুনস্তত্ত্বং জানাসি পরমেশ্বর।
ন জানন্ত্যপরে দেবা ঋষয়ো বা জগৎপতে ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগৎপাবনীং গঙ্গাং মূর্দ্ধ্না বহসি সাদরং।
শশাঙ্কং রম্যমালোক্য তং শিরোভূষণং কৃতঃ ॥ ২৮ ॥
ত্বং মে কথয় সর্ব্বজ্ঞ যত্ত্বাং পৃচ্ছামি সাম্প্রতং।
যুষ্মাকং তপসোপাস্যং দৈবতং কিং মহেশ্বর ॥ ২৯ ॥
ত্বং তথা ভগবান্ বিষ্ণু র্ব্রহ্মাপি জগতাং পতিঃ।
এতান্ সম্ভজতাং ভক্ত্যা জায়তে পরমং পদং।
যাদৃক্ তদ্বচসা কোঽপি শক্তো বক্তুং ন ভূতলে ॥ ৩০ ॥
এবম্বিধানাং ভবতাং যদুপাস্যং হি দৈবতং।
তদবশ্যং ময়া জ্ঞেয়ং ব্রূহি মে তৎ কৃপাময় ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহাদেবঃ পুনঃ পুনঃ।
বিচার্য্য তমুবাচেদং জৈমিনে মুনিপুঙ্গব ॥ ৩২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ। যত্ত্বয়া প্রস্তুতং তাত তত্তু গুহ্যতমং পরং।
ন প্রকাশ্যং কথং বৎস বক্ষ্যামি মুনিপুঙ্গব ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ। ইত্যুক্তো দেবদেবেন নারদস্তত্র সংস্থিতঃ।
প্রাঞ্জলি র্জগতাং নাথং প্রাহ নারায়ণং বিভুম্ ॥ ৩৪ ॥
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
বক্তুং কৃপণতাং ধত্তে স্বমুপাস্যং হি দৈবতং।
ত্বমাজ্ঞাপয় দেবেশ প্রণতানাং কৃপাকর ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ। কিং কার্য্যং তেন তে তাত যুষ্মাকং দেবতা বয়ং।
অস্মানেব সমারাধ্য পরং পদমবাপ্স্যসি।
অস্মাকং দৈবতেনাত্র ভবতঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ। এবং তস্যাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য মুনিসত্তমঃ।
তুষ্টাব স্তুতিবাক্যৈস্তৌ শিববিষ্ণু কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৭ ॥

নারদ উবাচ। প্রসীদ বিশ্বেশ্বর দেব দেব প্রসীদ নারায়ণ বাসুদেব।
প্রসীদ সর্পাভরণোজ্জ্বলাঙ্গ প্রসীদ মাং কৌস্তুভভূষিতাঙ্গ।
প্রসীদ গঙ্গাধর মাং শরণ্য প্রসীদ চক্রায়ুধ মাং বরেণ্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বর মাং দিগম্বর প্রসীদ পীতাম্বর মাং গদাধর।

নমস্ত্রিপুর-নাশায় বকাসুর-নিঘাতিনে।
অন্ধকাসুর-নাশায় কংসাসুর-নিঘাতিনে ॥
নমস্তে পঞ্চবক্ত্রায় বৃষারূঢ়ায় তে নমঃ।
গরুড়াসন-সংস্থায় বিষ্ণবে তে নমো নমঃ ॥

ব্যাস উবাচ। ইত্যেবং সংস্তুবন্তং তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষি-সত্তমং।
বিলোক্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুরুবাচ। ভক্তোঽয়ং জ্ঞানবান্ দেব বিনীতো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
অনুগ্রাহ্য-স্ত্বয়াবশ্যং যতস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ। মহেশ্বরোঽপি তেনোক্তং বাক্যমাকর্ণ্য বিষ্ণুনা।
ভদ্রমেবেতি তং প্রাহ প্রণতানাং কৃপাকরঃ ॥ ৪০ ॥
ততঃ পুনর্মহাদেবং শুদ্ধজ্ঞানী মহামতিঃ।
নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ দেবদেবং কৃপানিধিম্ ॥

নারদ উবাচ। ত্বামুপাস্য তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিং।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সম্প্রাপ্তাঃ পরমাস্পদাঃ ॥
যুষ্মাকং যৎ সমারাধ্যং দৈবতং পূর্ণমব্যয়ম্।
তন্মে কথয় দেবেশ যদি তে ময্যনুগ্রহঃ ॥
এতাদৃশং মহৈশ্বর্য্যং যৎপ্রসাদাচ্চ লব্ধবান্।
তচ্চেদ্বদসি মে দেব তদা সানুগ্রহো ময়ি ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবং প্রতিভাষিতো মুনিবরং শ্রীশঙ্করো নারদং,
কৃত্বাসৌ প্রণিধানমেব সততং যোগীশ্বরঃ সাদরঃ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্বুজং হৃদি মুহুর্ধ্যায়ন্ যদেকং পরং,
পূর্ণং ব্রহ্ম তদেব নির্ম্মলমতির্বক্তুং সমারব্ধবান্ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ। যা মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা জগদাদ্যা সনাতনী।
সৈব সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সাস্মাকং দেবতাপি চ ॥ ৪১ ॥
অয়মেকো যথা ব্রহ্মা যথা চায়ং জনার্দ্দনঃ।
যথা মহেশ্বরশ্চাহং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ৪২ ॥
এবং হি কোটি-কোটীনাং নানাব্রহ্মাণ্ডবাসিনাং।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং বিধাত্রী সা মহেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥
অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী।
তয়ৈতৎ সৃজ্যতে বিশ্বং তয়ৈব পরিপাল্যতে।
বিনাশ্যতে তয়ৈবান্তে মোহ্যতে চ তয়া জগৎ ॥ ৪৪ ॥

সৈব স্বলীলয়া পূর্ণা দক্ষকন্যাঽভবৎ পুরা।
তথা হিমবতঃ পুত্রী তথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥
অংশেন বিষ্ণোর্বনিতা সাবিত্রী ব্রহ্মণস্তথা ॥ ৪৫ ॥

নারদ উবাচ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ ময়ি প্রীতিরনুত্তমা।
তদা কথয় মে নাথ বিস্তরেণ মহামতে ॥
যথা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা দক্ষকন্যাঽভবৎ পুরা।
যথা চ তাং হরঃ প্রাপ পত্নীং ব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥
পুনশ্চ সা যথা জাতা হিমালয়গৃহে সুতা।
যথা ভূয়োঽপি তাং প্রাপ মহাদেব-স্ত্রিলোচনঃ ॥
যথা সা সুষুবে পুত্রৌ মহাবল-পরাক্রমৌ।
কার্ত্তিকেয়-গণেশানৌ ষড়ানন-গজাননৌ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আসীজ্জগদিদং পূর্ব্ব-মনর্কশশিতারকং।
অহোরাত্রাদি-রহিত-মনগ্নিকমদিঙ্মুখং।
শব্দস্পর্শাদিরহিত-মন্যতেজোবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৬ ॥
তৎসদ্ ব্রহ্মেতি যৎ শ্রুত্যা সদেকং প্রতিপাদ্যতে।
স্থিতা প্রকৃতিরেকা সা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহা ॥ ৪৭ ॥
শুদ্ধা জ্ঞানময়ী নিত্যা বাচাতীতা সুনিষ্কলা।
দুর্গম্যা যোগিভিঃ সর্ব্ব-ব্যাপিনী নিরুপদ্রবা।
নিত্যানন্দময়ী সূক্ষ্মা গুরুত্বাদিভি-রুজ্ঝিতা ॥ ৪৮ ॥
সৃষ্টীচ্ছা সমভূত্তস্যা যদা সদ্যস্তদৈব হি।
অরূপাপি দধে রূপং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ পরা ॥ ৪৯
ভিন্নাঞ্জননিভা চারু-ফুল্লাম্ভোজ-বরাননা।
চতুর্ভুজা রক্তনেত্রা মুক্তকেশী দিগম্বরা ॥
পীনোত্তুঙ্গস্তনী ভীমা সিংহপৃষ্ঠ-নিষেদুষী ॥ ৫০ ॥
ততঃ সা স্বেচ্ছয়া স্বীয়ৈ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
সসর্জ্জ পুরুষং সদ্য-শ্চৈতন্যপরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫১ ॥
তং জাতং পুরুষং বীক্ষ্য সত্ত্বাদিত্রিগুণাত্মকং।
সিসৃক্ষামাত্মনস্তস্মিন্ সমাক্রাময়দিচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥
ততঃ স শক্তিমান্ স্রষ্টা পুরুষত্রয়ং গুণত্রয়ৈঃ।
ত্রয়ো বভূবুঃ পুরুষা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাহ্বয়াঃ ॥ ৫৩ ॥

তথাপি জায়তে নৈব সৃষ্টিরেবং বিলোক্য সা।
দ্বিধা চক্রে পুমাংসং তং জীবঞ্চ পরমং তথা ॥ ৫৪ ॥
ত্রিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
মায়া বিদ্যা চ পরমেত্যেবং সা ত্রিবিধাঽভবৎ ॥ ৫৫ ॥
মায়া বিমোহিনী পুংসাং যা সংসার-প্রবর্ত্তিকা।
পরিস্পন্দাদিশক্তি র্যা পুংসাং সা পরমা মতা।
তত্ত্বজ্ঞানাত্মিকা চৈব সা সংসার-নিবর্ত্তিকা ॥ ৫৬ ॥
মায়াবৃতো হি জীবস্তাং পরমাং নেক্ষতে মুনে।
তাভ্যাং সমাশ্রিতাস্তেঽপি পুরুষা বিষয়ৈষিণঃ ॥
বভূবু র্ম্মুনিশার্দ্দূল মুগ্ধা-স্তন্মায়য়া তদা।
সা তৃতীয়া পরা বিদ্যা পঞ্চধা যাঽভবৎ স্বয়ং ॥
গঙ্গা দুর্গা চ সাবিত্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী।
সা প্রাহ প্রকৃতি র্ব্বিদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥
প্রত্যক্ষগা জগদ্ধাত্রী বিনিযোজ্য পৃথক্ পৃথক্।
সৃষ্ট্যর্থং পুরুষা যূয়ং ময়া সৃষ্টা নিজেচ্ছয়া ॥
তৎকুরুধ্ব মহাভাগা যথেচ্ছা মম জায়তে।
ব্রহ্মা সৃজতু ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
বিবিধানি বিচিত্রাণি চাসংখ্যেয়ানি সংযতঃ ॥
বিষ্ণুরেষ মহাবাহুঃ করোতি পরিপালনং।
নিহত্য জগতাং ক্ষোভ-কারকান্ বলিনাং বরঃ ॥
শিবস্তমোগুণাক্রান্তঃ শেষে সর্ব্বমিদং জগৎ।
নাশয়িষ্যতি নাশেচ্ছা যদা মে সম্ভবিষ্যতি ॥
পরস্পরঞ্চ সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যেষু ত্রিষু বৈ ধ্রুবং।
বিধাতব্যং হি সাহায্যং যুষ্মাভিঃ পুরুষত্রয়ৈঃ ॥
অহঞ্চ পঞ্চধা ভূত্বা সাবিত্র্যাদ্যা বরাঙ্গনাঃ।
ভবতাং বনিতা ভূত্বা বিহরিষ্যে নিজেচ্ছয়া ॥
তথাংশতশ্চ সম্ভূয় সর্ব্বজন্তুষু যোষিতঃ।
প্রসবিষ্যামি ভূতানি বিবিধানি নিজেচ্ছয়া ॥
ব্রহ্মংস্ত্বং মানসীং সৃষ্টিং করোতু মম শাসনাৎ।
সাম্প্রতং নান্যথা সৃষ্টি র্বিস্তৃতেয়ং ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা তান্মহাবিদ্যা প্রকৃতিঃ সা পরাৎপরা।
স্বয়মন্তর্দধে তেষাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥

যাঁহাকে আরাধনা করিয়া বিরিঞ্চি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হরি পালনকর্ত্তা এবং গিরিশ সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন, যিনি যোগিগণের ধ্যেয়া, তত্ত্বার্থবিজ্ঞ মুনিগণ যাঁহাকে আদ্যা এবং পরমাপ্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই স্বর্গাপবর্গপ্রদা বিশ্বজননী দেবীকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যিনি স্বেচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়া সেই নিজসৃষ্ট জগতে নিজে জন্ম গ্রহণ করিয়া শম্ভুকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন এবং উগ্র তপঃসমূহের অনুষ্ঠানে শম্ভুও যাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সেই ভবারাধ্যা ভবভাবিনী ত্রিভুবন রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

সূত বলিলেন, অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা সমস্ত বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য তত্ত্বজ্ঞানী মহামতি মহর্ষি ভগবান ব্যাস সপ্তদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াও যখন কোনও প্রকার তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না তখনই তাঁহার চিন্তা উপস্থিত হইল যে, যে পুরাণ অপেক্ষা পরম পুরাণ ভূতলে আর নাই, ভগবতীর পরমতত্ত্ব যাহাতে বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত, আমি সেই পুরাণ কিরূপে বর্ণিত করিব? মহামুনি ব্যাস এইরূপে চিন্তাপরায়ণ হইয়াও দেবীর তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, মহাজ্ঞানী মহেশ্বর পর্য্যন্ত যাঁহার তত্ত্ব জানেন না, সেই পরমতত্ত্ব কি করিয়া আমার দ্বারা জ্ঞাত হইবে? ইহা ত অতি দুষ্কর ব্যাপার! এইরূপে চিন্তা করিয়া মহাবুদ্ধি ব্যাস আর কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীদুর্গার চরণাম্বুজে আত্যন্তিক ভক্তিপরায়ণ হইয়া হিমালয় পর্ব্বতপৃষ্ঠে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাসের সেই পরম তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া ভক্তবৎসলা শর্ব্বাণী অদৃশ্যরূপে আকাশে অবস্থিতা হইয়া বলিলেন, মহামুনি ব্যাস! সমস্ত শ্রুতিগণ যেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন তুমি সেই ব্রহ্মলোকে গমন কর, সেইখানে তুমি আমার নিষ্কল পরমতত্ত্ব অবগত হইবে। ব্রহ্মলোকে শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক স্তুতা হইয়া আমি তোমার প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়ীভূতা হইব এবং তোমার যাহা অভিলষিত তাহাও তথাতেই সম্পাদিত করিব। ভগবান বেদব্যাস সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং মূর্ত্তিমান বেদচতুষ্টয়কে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব কি? ॥ ৩ ॥

মুনিপুঙ্গব! বিনয়াবনত ঋষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে যথাক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদ কহিলেন। সমস্ত ভূত যাঁহার ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরের অন্তর্গত, যাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত, ত্রিজগৎ যাঁহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই দেবী ভগবতী স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যজুর্ব্বেদ বলিলেন। যে ঈশ্বরী নিখিল যজ্ঞের দ্বারা এবং যোগের দ্বারা আরাধিতা হইয়া থাকেন, যাঁহার প্রভাবে আমরা (বেদগণ) প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, সেই একমাত্র ভগবতী স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

সামবেদ বলিলেন। যৎকর্ত্তৃক এই নিখিল বিশ্ব ভ্রামিত হইতেছে, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন, যৎকর্ত্তৃক এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই একমাত্র জগন্ময়ী দুর্গা পরমব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

অথর্ব্ববেদ বলিলেন। ভক্তিহেতু অনুগৃহীত জনগণ যে সুরেশ্বরীকে দর্শন করিয়া থাকেন, সর্ব্বশাস্ত্রে সেই দুর্গাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৮ ॥

সূত বলিলেন। সত্যবতী-সূত ব্যাস মূর্ত্তিমতী শ্রুতিগণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ভগবতী দুর্গাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। শ্রুতিগণ এইরূপ বলিয়া মহামুনি ব্যাসকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমরা যাহা বলিলাম তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইব ॥ ৯ ॥

এইরূপ বলিয়া শ্রুতিগণ সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপিণী সর্ব্বদেবময়ী পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

পরমে বিশ্বময়ি দুর্গে! প্রসন্না হও. সৃষ্ট্যাদি কার্য্যত্রয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষত্রয় তোমার ইচ্ছাক্রমে নিজগুণে কল্পিত, কিন্তু মাতঃ! এই ত্রিভুবনে তোমার কল্পক কেহ নাই, অতএব জীববুদ্ধির দুরধিগম্য তোমার গুণসকল বর্ণন করিতে সংসারে কে সমর্থ হইবে? ॥ ১১ ॥

ত্রিজগদম্বিকে! তোমাকে আরাধনা করিয়া হরি রণদুর্জ্জয় দৈত্যগণকে নিহত করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করিতেছেন, শম্ভু তোমারই চরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যক্ষয়কারী কালকূট বিষ পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তোমার সেই অচিন্তনীয় চরিত্র প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কি বলিব? ॥ ১২ ॥

যিনি মায়াবলম্বনে স্বীয়গুণের উপাদানে পরমপুরুষ পরমাত্মার দেহরূপিণী চৈতন্যরূপিণী পরিস্পন্দাদিরূপিণী পরমাশক্তি, আবার তাঁহারই মহামায়ায় পরিমোহিত হইয়া ভেদজ্ঞানবশতঃ জীবগণ যে দেহস্থিতা চৈতন্যরূপিণীকে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অম্বিকে! সেই তোমাকে প্রণাম ॥ ১৩ ॥

স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব প্রভৃতি উপাধি-বিহীন-তোমার যে স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব; অতঃপর ত্রিজগতের সৃষ্টিবিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা প্রথমতঃ স্বতঃ প্রাদুর্ভূতা হয়েন, তিনিই শক্তি এবং সেই শক্তিরই অর্দ্ধভেদে পরম পুরুষ আবির্ভূত হয়েন। অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষ উভয়মূর্ত্তিই শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই প্রকৃতিপুরুষ উভয়লীলা তোমারই মায়াবিলাস মাত্র। অতএব যাহা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাও তোমার শক্তিস্বরূপ বই আর কিছুই নহে ॥ ১৪ ॥

জল-জাত অথচ জলের কাঠিন্যময়মূর্ত্তি করকাদি দর্শন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাহা যেমন জল বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই নিখিল জগতের বস্তুতত্ত্ব বিবেচনা করিলেও একমাত্র শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের আর কোন স্বরূপসত্ত্বা থাকে না। শক্তি-স্বরূপে বিনিশ্চিত বুদ্ধিকে পুরুষস্বরূপে ধারণা করিলে তাহা পরম্পরা-রূপে ব্রহ্মে উপস্থিত হয় অর্থাৎ পুরুষরূপে পরিণত বুদ্ধিকে শক্তিরূপে নিশ্চয় করিলে তবে তাহা ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, কেননা, শক্তিই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

জীবের দেহে ষট্‌চক্র-পদ্মে ব্রহ্মাদি ষট্ শিব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তোমা হইতে স্বতন্ত্র গণনা করিলে তাহারা সকলেই প্রেত অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে জড়রূপ। কেবল তোমাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা পরমেশ্বরত্ব লাভ করিতেছেন অর্থাৎ শক্তি-প্রভাবে শিবরূপে পরিণত হইতেছেন। অতএব হে শিবে! ঈশ্বরত্ব যাহা তাহা শিবে নাই, কিন্তু তোমাতেই নিয়ত অবস্থিত। তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঈশ্বর। হে সুরকুলবন্দিত-চরণারবিন্দে বিশ্বাত্মিকে দেবি দুর্গে! মা! আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হও ॥ ১৬ ॥

সূত বলিলেন। মূর্ত্তিমতী শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুতিবাক্য দ্বারা সংস্তুতা হইয়া সনাতনী জগদম্বা তাঁহাদিগকে স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৭ ॥

যদিও সেই মহাদেবী জ্যোতিঃ (চৈতন্য) রূপে সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিতা তথাপি ব্যাসের সংশয়চ্ছেদন নিমিত্ত স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

সে আকৃতি সহস্র সূর্য্যের প্রভাময়ী, চন্দ্রকোটিসমানকান্তি, দিব্যাস্ত্রসমূহ-সংবৃত সহস্রবাহুযুক্ত, দিব্য অলঙ্কার ও ভূষণে ভূষিত, দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত এবং সিংহপৃষ্ঠে সমারূঢ় ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

আবার কখনও শববাহনা চতুর্ভুজা নবীনজলদপ্রভা, এইরূপে কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও দশভুজা অষ্টাদশভুজা শতভুজা এবং কখনও অনন্তভুজযুক্তা দিব্যরূপধারিণী ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

কখনও বিষ্ণুরূপা—বামাঙ্গে লক্ষ্মী, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপা—রাধিকা তাঁহার বামাঙ্গসঙ্গিনী ॥ ২৩ ॥

কখনও ব্রহ্মরূপিণী—সরস্বতী তাঁহার বামাঙ্গসংস্থিতা, কদাচিৎ শিবরূপিণী—গৌরী তাঁহার বামাঙ্গ-বিলাসিনী ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বময়ী ব্রহ্মরূপিণী দেবী এইরূপে অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিয়া ব্যাসের সংশয়োচ্ছেদ করিলেন ॥ ২৫ ॥

সূত বলিলেন। পরাশর-সূত মহামুনি ব্যাস জগদম্বার এই সকল অপরূপ রূপ বিলোকন করিয়া তাঁহাকে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন। তদনন্তর

অন্তর্যামিনী দেবী ভগবতী ব্যাসের অভিবাঞ্ছিত বিষয় জানিয়া তাঁহাকে নিজচরণতল-সংলগ্ন সহস্রদল পঙ্কজ প্রদর্শন করিলেন, মহর্ষি ব্যাস সেই পদ্মের সহস্রদলে পরমাক্ষরময় মহাভাগবত নামক পুরাণ অবলোকন করিলেন এবং কৃতকৃত্য হইয়া নানাবিধ স্তুতিপূর্ব্বক ভূ-লুণ্ঠিত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিয়া নিজের আশ্রমে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। অনন্তর জগদম্বার চরণাম্বুজ-সংস্পৃষ্ট সেই সহস্রদলপদ্মে অক্ষরময় পরম পবিত্র মহাভাগবত পুরাণ তিনি যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেইরূপই প্রকাশ করিলেন। আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে--

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ত্রিজগদ্বন্দ্য দেবেশ! ভক্তকৃপা-নিধান! আপনি জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ আত্মস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ॥ ২৬ ॥ পরমেশ্বর! বস্তুতত্ত্বের অভিজ্ঞান বিষয়ে আপনিই পরম পণ্ডিত, হে জগৎপতে! আপনি ভিন্ন অপর দেবগণ এবং ঋষিগণ কেহই তাহা অবগত নহেন ॥ ২৭ ॥

ত্রিজগৎপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য জানেন বলিয়াই সমস্ত দেবতার মধ্যে কেবল আপনিই তাঁহাকে মস্তকে সাদরে ধারণ করিতেছেন, শশাঙ্কের সার-সৌন্দর্য্য আপনি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে শিরোভূষণ করিয়াছেন। অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ! যাহা আমি এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা বলুন, মহেশ্বর! আপনাদিগেরও তপস্যার উপাস্য দেবতা কে? ২৯ ॥

যেমন আপনি তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণু এবং জগৎপতি ব্রহ্মা—আপনাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিলে যেরূপ পরমপদ লাভ হয়, ভূতলে কেহ তাহা বর্ণনা করিতেও সমর্থ নহে ॥ ৩০ ॥

আপনাদিগেরই ঈদৃশ অলৌকিক প্রভাব, সেই আপনাদিগেরও যিনি উপাস্য দেবতা তাঁহাকে জানিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। কৃপাময়! আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মুনিপুঙ্গব জৈমিনে! নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩২ ॥

তাত! তুমি যাহার প্রস্তাব করিলে তাহা অতি গুহ্যতম পরমতত্ত্ব। বৎস! সেই অপ্রকাশ্য তত্ত্ব কিরূপে বলিব? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবদেব কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া নারদ সেইস্থলেই অবস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জগন্নাথ বিভু নারায়ণকে বলিলেন ॥ ৩৪ ॥

ভগবান দেবদেব মহেশ্বর ভক্তানুকম্পী হইয়াও নিজ উপাস্য দেবতার পরিচয় প্রদানে কৃপণতা করিতেছেন। অতএব হে প্রণতকৃপাকর! দেবেশ! আপনি তাহা প্রকাশ করুন ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণ বলিলেন, তাত! সে তত্ত্ব শ্রবণ করিতে তোমার প্রয়োজন কি? আমরাই তোমাদিগের দেবতা, আমাদিগকে আরাধনা করিলেই তোমরা পরমপদ লাভ করিবে। আমাদিগের উপাস্য দেবতা কে তাহা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবান বিষ্ণুরও এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম নারদ অনন্যোপায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতিবাক্য দ্বারা শিব এবং বিষ্ণু উভয়কে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

নারদ বলিলেন, দেবদেব বিশ্বেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, বাসুদেব নারায়ণ! আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে সর্পাভরণোজ্জ্বলাঙ্গ শম্ভো! প্রসন্ন হউন, কৌস্তুভভূষিতাঙ্গ বিষ্ণো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শরণ্য গঙ্গাধর! হে বরেণ্য চক্রায়ুধ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দিগম্বর বিশ্বেশ্বর! পীতাম্বর গদাধর! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ত্রিপুরাসুরনাশক! আপনাকে প্রণাম, বকাসুর-নিঘাতিন্! আপনাকে প্রণাম, অন্ধকাসুর-বিনাশক! আপনাকে প্রণাম, কংসাসুর-নিঘাতিন্! আপনাকে প্রণাম, বৃষারূঢ় পঞ্চবক্ত্র! আপনাকে প্রণাম, গরুড়াসন-সংস্থিত বিষ্ণো! আপনাকে প্রণাম।

দেবর্ষিসত্তম নারদকে এইরূপে স্তব করিতে দেখিয়া ভগবান বিষ্ণু দেবদেব মহেশ্বরের প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

দেব! ব্রহ্মার পুত্র নারদ ভক্ত জ্ঞানবান এবং বিনীত, আপনাকে অবশ্যই ইহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে হইবে, যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, প্রণত-কৃপাকর মহেশ্বরও বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 'ভাল' এই পর্য্যন্তই বলিয়া নারদের প্রতি কহিলেন ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর শুদ্ধজ্ঞানী মহামতি নারদ কৃপানিধি দেবদেব মহাদেবকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদ বলিলেন, আপনাকে বিষ্ণুকে এবং জগৎপতি ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াই ইন্দ্রাদি লোকপালগণ স্বর্গাদি রাজ্যসম্পদ লাভ করিয়াছেন। দেবেশ! আপনাদিগেরও যিনি আরাধ্য সেই পরিপূর্ণ অব্যয় দেবতা কে? যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে তবে তাহাই বলুন। যাঁহার প্রসাদে আপনি এইরূপ মহা-ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব যদি আমাকে বলেন, তবেই বুঝিব আপনার সম্পূর্ণ অনুগ্রহ আমাতে উপস্থিত হইয়াছে।

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে প্রতিভাষিত হইয়া ভগবান যোগীশ্বর শঙ্কর, নারদবাক্যে আদরপূর্ব্বক নিজের হৃদয়ে সকল তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া এবং হৃদয়াম্বুজে শ্রীদুর্গার চরণাম্বুজ বারংবার ধ্যান করিয়া, যাহা সেই একমাত্র পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম, নির্ম্মলমতি মহাদেব মুনিবর নারদকে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যিনি শুদ্ধা সনাতনী মূল-প্রকৃতি, তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং তিনিই আমাদিগের উপাস্য দেবতা ॥ ৪১ ॥

যেমন এই এক ব্রহ্মা, এই এক জনার্দ্দন এবং এই এক মহেশ্বর আমি, আমরাই, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ॥ ৪২ ॥

নানাব্রহ্মাণ্ডবাসী এইরূপ কোটি কোটি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একমাত্র বিধাত্রী সেই মহেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥

সেই মহাদেবী অরূপা হইয়াও লীলাক্রমে দেহ ধারণ করিয়াছেন। এই নিখিল বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্ট, এই বিশ্ব তৎকর্ত্তৃকই পরিপালিত হইতেছে, আবার প্রলয়কালে এ জগৎ তৎকর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইবে এবং বর্ত্তমানেও তাঁহার কর্ত্তৃকই জগৎ মোহিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

তিনি নিজ লীলাবলম্বনে পূর্ব্বকালে পূর্ণরূপে দক্ষ প্রজাপতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তিনিই হিমালয়ের পুত্রী উমারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। লক্ষ্মী এবং সরস্বতীরূপে নিজ অংশে বিষ্ণুর বনিতা এবং সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মার দয়িতা হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

নারদ বলিলেন, দেবেশ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন আর যদি আমাতে আপনার অনুত্তমা প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে নাথ! বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে তাহাই বলুন, যেরূপে সেই পূর্ণা-প্রকৃতি পূর্ব্বকালে দক্ষ প্রজাপতির কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং যেরূপে মহেশ্বর সেই ব্রহ্মস্বরূপিণীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তিনি যেরূপে হিমালয়-গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার ত্রিলোচন মহাদেব সেই ত্রিলোচনাকে অর্দ্ধাঙ্গহারিণীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যেরূপে সেই জগজ্জননী মহাবল-পরাক্রান্ত ষড়ানন কার্ত্তিকেয় এবং গজানন গণেশ এই পুত্রদ্বয়ের জননী হইয়াছিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ চন্দ্রসূর্য্যতারকা-বর্জ্জিত এবং অহোরাত্রাদি রহিত ছিল। ইহাতে অগ্নি ছিলেন না এবং দিগ্‌দিগন্তের কোন নির্ণয় ছিল না; ব্রহ্মাণ্ড তখন শব্দস্পর্শাদিরহিত অন্যতেজোবিবর্জ্জিত অন্ধকারময় ছিল ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে যাহা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য একমাত্র নিত্যব্রহ্ম, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহা প্রকৃতিই অবস্থিতা ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তিনি শুদ্ধা জ্ঞানময়ী নিত্যা বাক্যের অতীতা নিষ্কলা যোগিগণেরও দুর্গম্যা সর্ব্ব-ব্যাপিনী নিরুপদ্রবা নিত্যানন্দময়ী সূক্ষ্মা গুরুত্ব এবং লঘুত্ব প্রভৃতি গুণবর্জ্জিতা ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই আনন্দময়ীর নিজ আনন্দলীলা প্রচার জন্য যে সময়ে সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ সেই পরমা প্রকৃতি অরূপা হইয়াও স্বীয় ইচ্ছা-শক্তির অবলম্বনে রূপ ধারণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই রূপময়ী দেবী দলিতাঞ্জনসন্নিভা, মনোহর প্রফুল্ল-অম্ভোজ-বর-সুন্দরাননা, চতুর্ভুজা আরক্তলোচনা মুক্তকেশী দিগম্বরী পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরা ভয়ঙ্করা এবং সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা ॥ ৫০ ॥

অনন্তর তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ একটী পুরুষ (মহাকাল) সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি তখনও চৈতন্যহীন ॥ ৫১ ॥

সেই ত্রিগুণাত্মক পুরুষকে অচৈতন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিজ ইচ্ছায় নিজের সিসৃক্ষা (সৃষ্টির ইচ্ছা) তাঁহাতে সংক্রামিত করিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর মহাশক্তির ইচ্ছাসংক্রমে শক্তিমান্ হইয়া সেই মূল-পুরুষ আনন্দ সহকারে নিজ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগ অনুসারে পুরুষত্রয়কে সৃষ্ট করিলেন এবং সেই সৃষ্ট পুরুষত্রয়ই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে শব্দিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তথাপি সৃষ্টিকার্য্যের প্রারম্ভ হইল না দেখিয়া দেবী সেই মূল পুরুষকে জীব এবং পরমপুরুষ এই দ্বিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতি স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ংও আত্মাকে মায়া, বিদ্যা এবং পরমা, এই ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তন্মধ্যে যিনি জীবের বিমোহনকারিণী সংসার-প্রবর্ত্তিকা শক্তি তিনিই মায়া। আর যিনি জীবের পরিস্পন্দনাদি ব্যাপার-বিধায়িনী চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনী-শক্তি তিনিই পরমা। আবার যিনি তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপা সংসার-নিবৃত্তিকারিণী শক্তি তিনিই বিদ্যা ॥ ৫৬ ॥

দেবীভাগবতে দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা,
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চ মুনিভি র্ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা,
প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥ ১ ॥
সৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসৎ-স্বরূপং,
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বং।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা,
তাং সর্ব্ব-বিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সৃজত্যখিলমেতদিতি প্রসিদ্ধং,
পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিদ্ভিঃ।
বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম,
তৈরুক্তমেব সৃজতে ন হি স স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতীতি কালে,
তন্নাভিপদ্মমুকুলে কিল তস্য জন্ম।
আধারতাং কিল গতোঽত্র সহস্রমৌলিঃ,
সংবোধ্যতাং স ভগবান্ হি কথং মুরারিঃ ॥ ৪ ॥
একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব,
পাত্রং বিনা নহি রসস্থিতিরস্তি কচ্চিৎ।
যা সর্ব্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা,
তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোঽস্মি ॥ ৫ ॥
যোগনিদ্রা-মীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বাম্বুজে স্থিতং।
অজস্তুষ্টাব যাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৬ ॥

অপি চ তত্রৈব চতুর্থাধ্যায়ে—

সূত উবাচ। ইতি ব্যাসেন পৃষ্টস্তু নারদো বেদবিন্মুনিঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ ॥ ৭ ॥

নারদ উবাচ। পারাশর্য্য মহাভাগ যত্ত্বং পৃচ্ছসি মামিহ।
তমেবার্থং পুরা পৃষ্টঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ ॥ ৮ ॥
ধ্যানস্থং চ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিস্ময়ং গতঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশং শ্রীনাথং জগতঃ পতিম্ ॥ ৯ ॥
কৌস্তুভোদ্ভাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্র-গদাধরং।
পীতাম্বরং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিত-বিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥
কারণং সর্ব্বলোকানাং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মোবাচ। দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো।
তপশ্চরসি কস্মাত্ত্বং কিং ধ্যায়সি জনার্দ্দন ॥ ১২ ॥
বিস্ময়োঽয়ং মমাত্যর্থং ত্বং সর্ব্বজগতাং প্রভুঃ।
ধ্যানযুক্তোঽসি দেবেশ কিঞ্চ চিত্রমতঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥
ত্বন্নাভিকমলাজ্জাতঃ কর্ত্তাহমখিলস্য হ।
ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্ত্যত্র তং দেবং ব্রূহি মাপতে ॥ ১৪ ॥
জানাম্যহং জগন্নাথ ত্বমাদিঃ সর্ব্বকারণং।
কর্ত্তা পালয়িতা হর্ত্তা সমর্থঃ সর্বকার্য্যকৃৎ ॥ ১৫ ॥
ইচ্ছয়া তে মহারাজ সৃজাম্যহমিদং জগৎ।
হরঃ সংহরতে কালে সোঽপি তে বচনে সদা ॥ ১৬ ॥
সূর্য্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুর্বাতি শুভাশুভঃ।
অগ্নিস্তপতি পর্জ্জন্যো বর্ষতীশ ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ১৭ ॥

ত্বন্তু ধ্যায়সি কং দেবং সংশয়োঽয়ং মহান্ মম ।
ত্বত্তঃ পরং ন পশ্যামি দেবং বৈ ভুবনত্রয়ে ॥ ১৮ ॥
কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য ভক্তোঽস্মি তব সুব্রত ।
মহতাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥ ১৯
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিরাহ প্রজাপতিং ।
শৃণুষ্বৈকমনা ব্রহ্মংস্ত্বাং ব্রবীমি মনোগতম্ ॥ ২০ ॥
যদ্যপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং ।
তে জানন্তি সুরাঃ সর্ব্বে সদেবাসুর-মানুষাঃ ॥ ২১ ॥
স্রষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ ।
কৃতাঃ শক্ত্যেতি সংতর্কঃ ক্রিয়তে বেদপারগৈঃ ॥ ২২ ॥
জগৎ সংজননে শক্তি-স্ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী ।
সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৩ ॥
তয়া বিরহিত-স্ত্বং ন তৎকর্ম্মকরণে প্রভুঃ ।
নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্ত্তুং নাপি শঙ্করঃ ॥ ২৪ ॥
তদধীনা বয়ং সর্ব্বে বর্ত্তামঃ সততং বিভো ।
প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চ দৃষ্টান্তং শৃণু সুব্রত ॥ ২৫ ॥
শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে পরতন্ত্রো ন সংশয়ঃ ।
তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশং গতঃ ॥ ২৬ ॥
তপশ্চরামি সততং তদধীনোঽস্ম্যহং সদা ।
কদাচিৎ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিহরামি যথাসুখম্ ॥ ২৭ ॥
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং সংগ্রামং প্রকরোম্যহং ।
দারুণং দেহদমনং সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্করম্ ॥ ২৮ ॥
প্রত্যক্ষং তব ধর্ম্মজ্ঞ তস্মিন্নেকার্ণবে পুরা ।
পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতং ॥ ২৯ ॥
তৌ কর্ণমলজৌ দুষ্টৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ।
দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৩০ ॥
তদা ত্বয়া ন কিং জ্ঞাতং কারণন্তু পরাৎপরং ।
শক্তিরূপং মহাভাগ কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩১ ॥
যদিচ্ছাপুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহার্ণবে ।
কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৩২ ॥
ন কস্যাপি প্রিয়ো লোকে তির্য্যগ্‌যোনিষু সম্ভবঃ ।
নাভবং স্বেচ্ছয়া রাম-বরাহাদিষু যোনিষু ॥ ৩৩ ॥

বিহায় লক্ষ্ম্যা সহ সংবিহারং, কো যাতি মৎস্যাদিষু হীনযোনিষু।
শয্যাঞ্চ মুক্ত্বা গরুড়াসনস্থঃ, করোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩৪ ॥
পুরা পুরস্তেঽজ শিরো মদীয়ং, গতং ধনুর্জ্যা-স্খলনাৎ ক চাপি।
ত্বয়া তদা বাজিশিরো গৃহীত্বা, সংযোজিতং শিল্পিবরেণ ভূয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
হয়াননোঽহং পরিকীর্ত্তিতশ্চ, প্রত্যক্ষমেতত্তব লোককর্ত্তুঃ।
বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধ্যে, কথং ভবেদাত্মপরো যদি স্যাম্ ॥ ৩৬ ॥
তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মি শক্ত্যধীনোঽস্মি সর্ব্বথা।
তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামি চ নিরন্তরং।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভব ॥ ৩৭ ॥

নারদ উবাচ। ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্ত সন্নিধৌ।
তেন চাপ্যহমুক্তোঽস্মি তথৈব মুনিপুঙ্গব ॥ ৩৮ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণ পুরুষার্থাপ্তিহেতবে।
অসংশয়ং হৃদাম্ভোজে ভজ দেবী-পদাম্বুজম্ ॥ ৩৯ ॥

দেবীভাগবতে দ্বিতীয় অধ্যায় সূতের উক্তি—

যে পরমা আদ্যাশক্তি শ্রুতিপথে বিদ্যা নামে অভিহিতা, যিনি সর্ব্বান্তর্যামিনী, সর্ব্বহৃদয়স্থায়িনী, সংসার-বন্ধ-বিনাশিনী, দুরাত্মগণ কর্ত্তৃক দুর্জ্ঞেয়া এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক ধ্যানপদবী-প্রাপিত হইয়া যিনি নিত্যপ্রত্যক্ষরূপিণী, সেই সচ্চিদানন্দময়ী ভগবতী জীবজগতের সাধুবুদ্ধি বিধান করুন ॥ ১ ॥

স্বকীয় ত্রিগুণময়ী শক্তির দ্বারা সৎ ও অসৎ, জড় ও চৈতন্যস্বরূপ অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া যিনি তাহার পরিপালন করিতেছেন, আবার কল্পান্ত সময়ে এ বিশ্ববিলাস সংহরণপূর্ব্বক একাকিনী আত্মানন্দে অভিরতা হইতেছেন, সেই নিখিল-বিশ্বজননীকে হৃদয়ে স্মরণ করি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এই কথাই লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু পৌরাণিক এবং বেদবিদ্গণ বলিয়াছেন, বিষ্ণুর নাভিকমলে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ। ইহাতে তাঁহারাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাও স্বাধীনভাবে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কারণ তাঁহাকেও অন্যের ইচ্ছাবশতঃ অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে ॥ ৩ ॥

যেহেতু মহাপ্রলয়ে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করিলে তাঁহারই নাভিপদ্ম-মুকুলে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। এস্থলেও সহস্রমৌলি অনন্তদেব বিষ্ণুর আধার হইয়াছেন, যিনি-অন্য আধারে নির্ভর করিয়া অবস্থিত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই বা কিরূপে স্বাধীনশক্তিমান বলিয়া বুঝিব ॥ ৩ ॥

মহাপ্রলয়কালে জগৎ যখন একার্ণবে পরিণত সেই একার্ণবের জল অবশ্যই রসরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাত্র ব্যতিরেকে কখনও রসের অবস্থিতি হয় না,

ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ ; কিন্তু ব্রহ্মার আধার বিষ্ণু, বিষ্ণুর আধার অনন্তদেব, আবার অনন্তদেবের আধার একার্ণবের জলরাশি। এখন এই জলরাশির আধার কে ? এই তত্ত্বই দুরধিগম্য। তন্ন তন্ন করিয়া সকল আধারের অবশেষ হইলে সর্ব্বভূতের আধার-স্বরূপা যে জগদ্ধাত্রী মহাশক্তির পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়, জগতের সকল আধার যাঁহার নিকটে আধার বই আর কিছুই নহে, আমি সেই সর্ব্বাধার-স্বরূপিণী সর্ব্বভূত-জননীর শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫ ॥

মধুকৈটভবধ সময়ে বিষ্ণুকে যোগনিদ্রাভরে মুদ্রিতলোচন দর্শন করিয়া তাঁহার নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখিয়া যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই পরমাশক্তির শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৬ ॥

আবার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সূত বলিলেন, মহানন্দ বেদবেত্তা নারদমুনি ব্যাসকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া পরমপ্রীতি সহকারে বলিলেন ॥ ৭ ॥

মহাভাগ পরাশর-কুমার ! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবান মধুসূদনও এই বিষয়েই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

জগৎপতি দেবদেব শ্রীনাথকে ধ্যানস্থ দর্শন করিয়া আমার পিতা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই কৌস্তুভোদ্ভাসিত-বক্ষঃস্থল শঙ্খচক্র-গদাধর পীতাম্বর চতুর্ভুজ শ্রীবৎসাঙ্কিত-কলেবর সর্ব্বলোককারণ জগদ্‌গুরু জগন্নাথ দেবদেব বাসুদেবকে মহাতপস্যায় নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

দেবদেব জগন্নাথ জনার্দ্দন ! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ঈশ্বর হইয়াও কি জন্য তপস্যা করিতেছেন এবং কাহাকেই বা ধ্যান করিতেছেন, ইহা আমার অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। আপনি সমস্ত জগতের প্রভু, তথাপি অন্য কাহাকেও ধ্যান করিতেছেন, হে দেবেশ ! ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি আছে ? ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

আপনার নাভিকমল হইতে জাত হইয়াই 'আমি অখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ আপনি, আবার আপনা হইতে অধিক দেবতা এ জগতে কে আছেন ? কমলাপতে। তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৪ ॥

জগন্নাথ ! আমি জানি, আপনি সকলের আদি, সকলের কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকর্ত্তা, সর্ব্বকার্য্যকর সর্ব্বশক্তিমান। মহারাজ। আপনারই ইচ্ছাক্রমে আমি এই জগৎ সৃষ্টি করি, প্রলয়কালে হর ইহার সংহরণ করেন—তিনিও সর্ব্বদা আপনার বাক্যের বশবর্ত্তী ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ঈশ ! আপনারই আজ্ঞাক্রমে সূর্য্য আকাশে ভ্রমণ করেন, বায়ু শুভ এবং অশুভ-রূপে বহমান হয়েন। অগ্নি তাপ প্রদান করেন এবং পর্জ্জন্য বর্ষণ করেন ॥ ১৭ ॥

এইরূপ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও আপনি কোন্ দেবকে ধ্যান করেন, ইহাই আমার সংশয়ের বিষয়। আমি ত এ ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কাহাকেও দেখি না ॥১৮॥

হে সুব্রত! আমি আপনাকে ভজনা করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমাকে এ তত্ত্ব বলুন, যেহেতু মহাপুরুষগণের প্রায়শঃ কিছুই গোপনীয় নহে—ইহাই স্মৃতি ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মন্! একমনা হইয়া শ্রবণ কর, মনোগত তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি ॥ ২০ ॥

যদিও দেবাসুরমানবগণ তোমাকে, আমাকে এবং মহাদেবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা বলিয়া জানেন তথাপি বেদবেত্তৃগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, শক্তি কর্ত্তৃকই তুমি সৃষ্টি-কর্ত্তা, আমি পালন-কর্ত্তা এবং মহাদেব সংহার-কর্ত্তা হইয়াছেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

জগজ্জননকারিণী রাজসী শক্তি তোমাতে অবস্থিতা, সাত্ত্বিকী জগৎপালিনী শক্তি আমাতে অবস্থিতা এবং সংহারকারিণী তামসী শক্তি মহারুদ্রে অধিষ্ঠিতা ॥ ২৩ ॥

সেই শক্তি-বিরহিত হইলে তুমিও আর সৃষ্টি-কার্য্যে প্রভু নও, আমি জগৎ-পালনে সমর্থ নহি, মহাদেবও সংহারে সমর্থ নহেন ॥ ২৪ ॥

বিভো! কি প্রত্যক্ষে, কি পরোক্ষে আমরা সকলেই সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বেশ্বরীর অধীন, হে সুব্রত! তাহার দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রলয়কালে আমি অনন্তশয্যায় শয়ন করি সত্য, কিন্তু সে সময়েও আমি পরতন্ত্র, তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু সেই মহাশক্তিরই অধীনতায় কাল-বশবর্ত্তী হইয়া আবার যথাকালে জাগরিত হই ॥ ২৬ ॥

তাঁহারই অধীনস্থ হইয়া আমি সতত তপস্যার অনুষ্ঠান করি, আবার তাঁহারই অধীনতায় কখনও লক্ষ্মীর সহিত যথাসুখ বিহারে রত থাকি ॥ ২৭ ॥

কখনও দানবগণের সহিত সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর-দেহপীড়নকারী দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ! পুরাকালে সেই একার্ণবে পঞ্চসহস্রবর্ষব্যাপী বাহুযুদ্ধ আমি করিয়াছি, তাহা ত তোমার প্রত্যক্ষই ॥ ২৯ ॥

সেই কর্ণমলজাত মদগর্ব্বিত মধু-কৈটভ নামক দুষ্ট দানবদ্বয় সেই দেবদেবীর প্রসাদে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

সে সময়েও কি তুমি জানিতে পার নাই যে, পরাৎপর শক্তিরূপই নিখিলকার্য্যের কারণ, মহাভাগ! তবে আর পুনঃ পুনঃ কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ? ॥ ৩১ ॥

যাঁহার ইচ্ছা-নির্ম্মিত পুরুষ হইয়া আমি মহার্ণবে বিচরণ করি এবং যুগে যুগে কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ বামন রূপে অবতীর্ণ হই, তিনিই সেই সর্ব্বকারণ-কারণস্বরূপা ॥ ৩২ ॥

তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করা ত্রি-জগতে কাহারও প্রিয় নহে, আমিও স্বেচ্ছাক্রমে সেই বরাহাদি যোনিতে আবির্ভূত হই নাই ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠবিহার পরিহার করিয়া মৎস্যাদি হীন যোনিতে কে ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে? কোন্ স্বাধীনপুরুষ সুখ-শয্যা ত্যাগ করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া দুরন্ত দৈত্যদলের সহিত বিপুলযুদ্ধে অগ্রসর হয়? ॥ ৩৪ ॥

হে অজ! পূর্ব্বকালে তোমারই সাক্ষাতে ধনুর্জ্যা স্খলিত হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় গিয়াছিল তাহার সন্ধান ছিল না। তৎকালে তুমি অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা আমার স্কন্ধে তাহা পুনঃ সংযোজিত করিয়াছিলে ॥ ৩৫ ॥

সেই হইতে আমি হয়গ্রীব নামে পরিকীর্ত্তিত। লোকস্বামিন্! তাহা ত তোমারই প্রত্যক্ষ ঘটনা। আমি স্বাধীন হইলে লোকমধ্যে আমার এরূপ বিড়ম্বনা কেন হইল? ॥ ৩৬ ॥

অতএব জানিও, আমি স্বাধীন নহে, সর্ব্বথা শক্তির অধীন হইয়া আছি এবং নিরন্তর সেই মহাশক্তিকেই ধ্যান করিতেছি, কমলোদ্ভব! ইহার অতিরিক্ত তত্ত্ব আমি আর কিছু জানি না ॥ ৩৭ ॥

নারদ বলিলেন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক পদ্মযোনির নিকটে এইরূপ কথিত হইয়াছে। মুনিপুঙ্গব! অনন্তর পদ্মযোনি সেই তত্ত্ব আমাকে বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

অতএব তুমিও পুরুষার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিঃসংশয়রূপে হৃদয়াম্বুজে দেবী-পদাম্বুজ ভজনা কর।

সাধক! শক্তিপক্ষে যাঁহার কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নাই, বিষ্ণুপক্ষেও কোন বিদ্বেষ নাই, এরূপ কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানিলে তিনি কি কখনও এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়াও শক্তিপক্ষে জড়বাদীকে আস্তিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? চিরকাল বিশেষতঃ কলিযুগে ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবাহ অনিবার্য্য। চৈতন্যদেব যে সময়ে হরিনামের উত্তাল তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশের প্রায়িক অবসাদ দেখিয়া নব-শাখ শূদ্রপূর্ণ সমাজের অবস্থানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া তাহাদের বৈদিক তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনধিকার প্রযুক্ত তিনি একমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। সেই সময়ে শূদ্র ও অন্ত্যজপূর্ণ সমাজে ব্রাহ্মণের অধঃপাত হেতু শক্তিমাহাত্ম্য-প্রধান দেবীভাগবত মহাভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রচার বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। অধিকন্তু যুগমাহাত্ম্যে অন্ত্যজ জাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হেতু কর্ম্মান্তর পরিহার পূর্ব্বক কেবল হরিনাম প্রচারে যাহা অনুকূল, সকল দেবদেবী অপেক্ষা যাহাতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রধান এবং প্রচুররূপে বর্ণিত আছে, সেই সকল পুরাণ শাস্ত্রাদিরই পাঠ পারায়ণ ব্যাখ্যা কথকতা প্রভৃতির আরম্ভ হয়। দেশীয় অধ্যাপক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অনেকে শক্তিমন্ত্রে উপাসক হইলেও অধিকাংশই শূদ্রোপজীবী হইয়াছিলেন। সুতরাং শক্তিপ্রধান শাস্ত্রাদি

তাঁহাদের অজ্ঞাত না হইলেও উপজীবিকার ভয়ে তাহা তাহারা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তৎপরে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইলে যাঁহারা তাহাতে প্রভুরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রের একদেশদর্শী হইয়াই আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও শাস্ত্রের একদেশ স্পর্শ করিয়াই চরিতার্থ এবং নিজ সম্প্রদায়ে সার সত্য বলিয়া ভক্তি সহকারে আদৃত এবং পূজিত। প্রভুবর্গের এই একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত হইতেই বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সাধারণ বৈষ্ণবসম্প্রদায় বুঝিয়াছেন যে শক্তিমান প্রভু এবং শক্তি তাঁহার দাসী, তাই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিয়া তাঁহারা রাধিকার পূজা নির্ব্বাহ করেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থই সাধারণতঃ শক্তিপ্রধান শাস্ত্ররূপে প্রচলিত। প্রভুগণ সেই চণ্ডী হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন শক্তির নাম 'বিষ্ণুমায়া', এজন্য তিনি পরমবৈষ্ণবী। শক্তিকে এইরূপ পরমবৈষ্ণবী স্থির করিয়াই আধুনিক বৈষ্ণবগণ শিবকে 'পরমার্থ ভাই' বলিয়া কৃপা করিয়া থাকেন, সে সকল বিচার ভগবানের হস্তে। এক্ষণে যে যে প্রমাণে ভগবতী পরমবৈষ্ণবী হইয়াছেন, আমরা কেবল সেই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি দেখিব। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ১ ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥ ২ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৩ ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধ-হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫ ॥

সংসার-স্থিতিকারী ভগবানের মহামায়া প্রভাবে জীবগণ তথাপি মমতারূপ আবর্ত্তযুক্ত মোহগর্ত্তে নিপাতিত হইতেছে ॥ ১ ॥

অতএব ইহাতে বিস্ময় বোধ করিও না। জগৎপতি হরির যোগনিদ্রাই মহামায়া, তৎকর্ত্তৃকই এই জগৎ মোহিত হইতেছে ॥ ২ ॥

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তবৃত্তি সকল বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

তৎকর্ত্তৃক এই নিখিল চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতেছে এবং সেই বরদা প্রসন্না হইলেই জীবের মুক্তি বিধান করেন ॥ ৪ ॥

সেই সনাতনী পরমাবিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা, আবার তিনিই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু এবং তিনিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫ ॥

এইস্থানেই তাঁহারা বলেন, জগৎপতির যোগনিদ্রা এবং হরির মহামায়া এই দুই বিশেষণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মহামায়া বা শক্তি অবশ্য হরির অধীন; নতুবা শাস্ত্র হরির মহামায়া বা জগৎপতির যোগনিদ্রা বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিবেন কেন? যিনি যাঁহার নামে পরিচিত তিনি অবশ্য তাঁহার অধীন। যেমন মানবের নিদ্রা, মানবের বুদ্ধি, মানবের শক্তি বলিলে মানবের অধীন নিদ্রা বুদ্ধি এবং শক্তিই বুঝায়। এ সকল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মীমাংসা যাহা আছে আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিবার আবশ্যক হইয়াছে যে, ভগবানের এই যোগনিদ্রা এবং তোমার আমার নিদ্রা বস্তুতঃ এক পদার্থ কি না? স্বীকার করিয়া লইলাম, যোগনিদ্রা ভগবানের অধীনস্থ নিদ্রাশক্তি বই আর কিছুই নহে, কিন্তু এখন জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, যেস্থানে যোগনিদ্রার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, সেই মধুকৈটভবধ অধ্যায়ে ভগবানের নাভিকমলাস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রবোধনের জন্য বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন কেন? এমন নির্ব্বোধ জগতে কে আছে যে, কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইলে সেই নিদ্রিত সচেতন পুরুষকে ত্যাগ করিয়া তাহার অচেতন নিদ্রাকে স্তব করে। আবার ভগবান মধুকৈটভকে বধ করিলেন, ইহাতে ভগবানেরই মাহাত্ম্য। চণ্ডীতে শক্তি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহার প্রথমেই মধুকৈটভ-বধরূপ বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্ত্তনই বা করিলেন কেন? মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি অতি-প্রসঙ্গদোষ-দূষিত, ইহা বিশ্বাস করাও পাপ বলিয়া বোধ হয়। তবে এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা কি? চণ্ডীর কোন কোন টীকাকার সেই মীমাংসার জন্য ঐ সকল বচনের কূটার্থ কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা শক্তি-মাহাত্ম্য সংস্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, শাস্ত্রবাক্যের কূটার্থ কল্পনা করিয়া যে মীমাংসা উদ্ভাবিত হয় তাহা কখনও সুমীমাংসা হইতে পারে না। আর এমন ঘোরতর বিপদই বা কি উপস্থিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রবাক্যের কূটার্থ কল্পনায় বিশ্বস্ত জগৎকে বঞ্চিত না করিলেই চলিতেছে না। শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণু প্রধান হইয়া শক্তি যদি তাঁহার অনুগতা হয়েন, তবে তোমার আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? বস্তুতঃ তাঁহারা যাহাকে বিপদ বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা আদৌ বিপদই নহে, বরং সম্পদ। কেহ অধীনও হয়েন নাই, প্রধানও হয়েন নাই। যিনি যাহা তিনি তাহাই রহিয়াছেন, কেবল তুমি আমি আপন বুদ্ধির দোষে নিজের নিজের প্রাধান্য ও অধীনতা দেবতার

স্কন্ধে চাপাইয়া শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতত্ত্বসকল বুঝিতে না পারিয়া অধঃপাতে যাইতেছি। তোমার আমার মায়াময় শক্তিতত্ত্ব আর ভগবানের মায়াতীত শক্তিতত্ত্ব এক পদার্থ নহে, তোমার আমার মোহমায়াময়ী নিদ্রা আর ভগবানের নিত্য-চৈতন্যরূপিণী নিদ্রা এক পদার্থ নহে। তুমি আমি যেমন নিদ্রাবশে অভিভূত, তোমার আমার নিদ্রাও তদ্রূপ জড়বিকারে বিকৃত, কিন্তু ভগবান নিদ্রাবশে অভিভূত হইলেও তাঁহার যোগনিদ্রা সেই জাগ্রজ্জ্যোতির্ময়ী মহাশক্তি। জীব যখন সেই আভাস-নিদ্রায় আক্রান্ত হয় তখন অন্য কেহ তাহাকে যে কোন উপায়ে জাগাইতে পারে। কারণ শব্দ স্পর্শাদির কোনরূপ গুরুতর সংযোগ হইলেই জীবের ইন্দ্রিয় সেই অপূর্ণ নিদ্রা শক্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া নিজ চেতনাভরে জাগ্রত হইয়া উঠে—তাই তুমি আমি কাহাকেও ডাকিয়া বা গায়ে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে পারি, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাহা নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান কোন শক্তি তাঁহাতে অপূর্ণ নহেন। এইজন্য জীবের নিদ্রা 'নিদ্রা', আর ঈশ্বরের নিদ্রা 'যোগনিদ্রা'। তোমার আমার মায়ার নাম 'মায়া', তাঁহার মায়ার নাম 'যোগমায়া'। তুমি আমি ঊর্দ্ধ, সংখ্যা যোগী, ভগবান সর্ব্বযোগেশ্বর, তাই তাঁহার শক্তি সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বরী। জীব যোগবলে কদাচিৎ যে শক্তির কণাংশ লাভ করিতে পারে, ভগবানে সে শক্তি নিত্য বিরাজিত। জীব অপূর্ণ, তাই জীবের শক্তিও অপূর্ণ। ভগবান পূর্ণ, তাই তাঁহার শক্তিও পূর্ণ। জীব জড়তা-প্রধান, জীবের শক্তিও জড়তায় অভিভূতা, ভগবান চৈতন্যময়, তাই তাঁহার শক্তিও চৈতন্যময়ী। তোমার আমার নিদ্রাশক্তি জড়তাময়ী হইলেও ভগবানের নিদ্রাশক্তি চেতনাময়ী। তিনি ঘুমাইলেও তাঁহার নিদ্রা জাগিয়া থাকেন, কারণ তোমার আমার নিদ্রা কেবল তমোগুণময়ী কিন্তু তাঁহার নিদ্রা তমোগুণময়ী হইয়াও তমোগুণের অতীতা। তাই জগদম্বা নিদ্রারূপিণী হইয়া মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল কুমার কুমারীকে আপন ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়ান কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং জাগিয়া থাকেন। সমস্ত দিন খেলা করিয়া বালক যখন অবসন্নকলেবরে সন্ধ্যাকালে মায়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, মা অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইয়া তাহার সমস্ত দিনের শ্রান্তি শান্তি করেন, মধুকৈটভবধ মাহাত্ম্যে এই তত্ত্বই সুচিত্রিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের পর জগৎ যখন একার্ণবে নিমগ্ন, সেই ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লাবী জলরাশির অভ্যন্তরে ভগবান অনন্তশয্যায় যুগান্তকালোচিত যোগনিদ্রাভরে মুদ্রিতনয়নে সুষুপ্ত। বিষ্ণু জগতের পালনকর্ত্তা, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে আর পালন করিবেন কাহাকে? আবার সৃষ্টি হইবে তবে পালনের কথা—এই সুদীর্ঘকাল বিষ্ণুর বিশ্রাম সময়। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিষ্ণুর খেলা, সন্তানের যেমন খেলা শেষ হইয়াছে অমনি জননী তাঁহাকে বিশ্রাম শয্যায় শায়িত করিয়া গভীর নিদ্রায়

অভিভূত করিয়াছেন, অন্য জননীর ন্যায় ইহাঁকে চেষ্টা করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় নাই। বিশ্বব্যাপিনী নিজেই নিদ্রারূপিণী, সময় অনুসারে সেইরূপে আবির্ভূতা হইয়াই ভগবানকে ক্রোড়ে করিয়াছেন। তাই অন্য নিদ্রিতের ন্যায় ডাকিয়া তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিবার উপায় নাই, নিদ্রারূপিণী দেবী যখন তাঁহাকে নিজ তামস-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন তখনই তাঁহার উঠিবার কথা। তাই ভগবান ব্রহ্মা প্রথমতঃ স্তব স্তুতি ইত্যাদির দ্বারা কিছুতেই যখন বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন নাই তখনই বুঝিয়াছেন, এ চৈতন্যরূপিণী নিদ্রা আভাসময়ী নহেন। তাই জগদম্বা যোগনিদ্রার করুণা-কটাক্ষ বই উপায়ন্তর না দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকেই স্তব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে স্তবস্তুতি উচ্চ আহ্বান ইত্যাদির দ্বারা কিছুতেই যখন বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন নাই তখনই বুঝিতে হইবে, বিষ্ণুর অধীন নিদ্রা নহেন, নিদ্রার অধীন বিষ্ণু ; বিষ্ণুর নিদ্রা হইলে সহজেই তাহার ভঙ্গ হইত, নিদ্রার অধীন বিষ্ণু বলিয়াই তাহা ঘটে নাই। আবার মধুকৈটভ-যুদ্ধে ভগবান পরিশ্রান্ত হইলে, শাস্ত্র তখন বলিতেছেন—

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥

সেই অতিবলোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া কেশবকে বলিল, তুমি আমাদিগের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর। মহামায়া কর্তৃক এই বিমোহনই বা কিরূপ? তিনি কোন সময়ে, কি উপায়ে অসুর-মোহন করিলেন আর দৈত্যদ্বয়ই বা কেন অকস্মাৎ ভগবানকে বর গ্রহণ করিতে বলিল, চণ্ডীতে তাহার বিশেষ উল্লেখ কিছুই নাই। বস্তুতঃ চণ্ডীতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। তাই এই সকল কূট প্রশ্নের সদুত্তর চণ্ডী হইতে পাইবার উপায় নাই। এজন্য দেবী-ভাগবত হইতে মধুকৈটভ বধ মাহাত্ম্যের আবশ্যকীয় অংশগুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ তাহা হইতেই মধুকৈটভবধের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া নিজ নিজ সন্দেহ বিদূরিত করিবেন।

সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর মধুকৈটভ দেবীর নিকটে ইচ্ছা-মরণ বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কমলাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে ব্রহ্মা মহাভীত হইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিয়াও যখন জাগরিত করিতে পারিলেন না, সেইস্থলে শাস্ত্র বলিতেছেন—

এবং স্তুতোঽপি ভগবান্ ন বুবোধ যদা হরিঃ।
যোগনিদ্রাসমাক্রান্ত-স্তদা ব্রহ্মা হ্যচিন্তয়ৎ ॥ ১ ॥
নূনং শক্তিসমাক্রান্তো বিষ্ণু র্নিদ্রাবশং গতঃ।
জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিং করোম্যদ্য দুঃখিতঃ ॥ ২ ॥

হন্তুকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি নাস্তি মে শরণং ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ৪ ॥
বিচার্য্য মনসাপ্যেবং শক্তি র্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়াদ্য চেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোঽস্তি স্পন্দবর্জ্জিতঃ ॥ ৫ ॥
ব্যসু র্যথা ন জানাতি গুণান্ শব্দাদিকানিহ।
তথা হরি র্ন জানাতি নিদ্রামীলিতলোচনঃ ॥ ৬ ॥
ন জহাতি যদা নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোঽপ্যসৌ।
মন্যে নাস্য বশে নিদ্রা নিদ্রয়ায়ং বশীকৃতঃ ॥ ৭ ॥
যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল।
তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাধবে হরেঃ ॥ ৮ ॥
সিন্ধুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ।
নূনং জগদিদং সর্ব্বং ভগবত্যা বশীকৃতম্ ॥ ৯ ॥
অহং বিষ্ণু-স্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রী চ রমাপ্যুমা।
সর্ব্বে বয়ং বশেঽপ্যস্যা নাত্র কিঞ্চিদ্বিচারণা ॥ ১০ ॥
হরিরপ্যবশঃ শেতে যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
যয়াভিভূতঃ কা বার্ত্তা কিলান্যেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥
স্তৌম্যদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধে চ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১২ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং ব্রহ্মা পদ্মনালস্থিত-স্তদা।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ। দেবি ত্বমস্য জগতঃ কিল কারণং হি,
জ্ঞাতং ময়া সকল বেদবচোভিরম্ব।
যদ্ বিষ্ণুরপ্যখিললোক-বিবেককর্ত্তা,
নিদ্রাবশঞ্চ গমিতঃ পুরুষোত্তমোঽদ্য ॥ ১৪ ॥
কো বেদ তে জননি মোহবিলাসলীলাং,
মূঢ়োঽস্ম্যহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে।
ঈদৃকৃতয়া সকলভূত-মনোনিবাস,
বিদ্বত্তমো বিবুধকোটিষু নির্গুণায়াঃ ॥ ১৫ ॥
সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যাং তাং,
চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কর্ত্রীং।

কিং তাদৃশাসি কথমত্র জগন্নিবাস,
চৈতন্যতাবিরহিতো বিহিতস্ত্বয়াদ্য ॥ ১৬ ॥
নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধপ্রকারং,
নো বেত্তি কোঽপি তব কৃত্যবিধান-যোগং।
ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং,
সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবানি ॥ ১৭ ॥
বুদ্ধির্হি বোধকরণা জগতাং সদা ত্বং,
শ্রীশ্চাসি দেবি সততং সুখদা সুরাণাং।
কীর্ত্তিস্তথা মতি-ধৃতী কিল কান্তিরেব,
শ্রদ্ধা রতিশ্চ সকলেষু জনেষু মাতঃ ॥ ১৮ ॥
নাতঃ পরং কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং,
প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন।
ত্বক্সাত্র সর্ব্বজগতাং জননীতি সত্যং,
নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাত্র দৃষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

* * *

উত্তিষ্ঠ দেবি কুরু রূপমিহাদ্ভুতং ত্বং,
মাং বা ত্বিমৌ জহি যথেচ্ছসি বাললীলে।
নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ য-
স্ত্বৎসাধ্যমেতদখিলং কিল কার্য্যজাতম্ ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ। এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
নিঃসৃত্য হরিদেহাত্তু সংস্থিতা পার্শ্বতস্তদা ॥ ২১ ॥
ত্যক্ত্বাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
নির্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তদা।
বিস্পন্দিতশরীরোঽসৌ যদা জাতো জনার্দ্দনঃ।
ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো মুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ২২ ॥

অপি চ তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে—মধুকৈটভ-যুদ্ধে—
পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি যদা যাতানি যুধ্যতা।
হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১ ॥
পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল।
ন শ্রান্তৌ দানবৌ ঘোরৌ শ্রান্তোঽহং চৈতদদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥

ক্ব গতং মে বলং শৌর্য্যং কস্মাচ্ছেমাবনাময়ৌ।
কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা ত্বিহ ॥ ৩ ॥
ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্ষপরাবুভৌ।
উচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীর-নিঃস্বনৌ ॥ ৪ ॥
তব নো চেদ্ বলং বিষ্ণো যদি শ্রান্তোঽসি যুদ্ধতঃ।
ব্রূহি দাসোঽস্মি বাং নূনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্ ॥ ৫ ॥
ন চেদ্ যুদ্ধং কুরুষ্বাদ্য সমর্থোঽসি মহামতে।
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যমি পুরুষঞ্চ চতুর্ম্মুখম্ ॥ ৬ ॥

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্ ভাষিতং বিষ্ণু-স্তয়ো তস্মিন্ মহোদধৌ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সামপূর্ব্বং মহামনাঃ ॥ ৭ ॥

হরিরুবাচ।

শ্রান্তে ভীতে ত্যক্তশস্ত্রে পতিতে বালকে তথা।
প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ৮ ॥
পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি কৃতং যুদ্ধং ময়া ত্বিহ।
একোঽহং ভ্রাতরৌ বাং চ বলিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ৯ ॥
কৃতং বিশ্রমণং মধ্যে যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তথা বিশ্রমণং কৃত্বা যুধ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্ বলবন্তৌ মদোৎকটৌ।
বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বাং ন্যায়মার্গতঃ ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশ্রব্ধৌ দানবোত্তমৌ।
সংস্থিতৌ দূরতস্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ১২ ॥
অতিদূরে চ তৌ দৃষ্ট্বা বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ।
দধ্যৌ চ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১৩ ॥
চিন্তনাজ্ জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ।
কামং বাঞ্ছিতমরণৌ ন মন্নতুরতস্ত্বিমৌ ॥ ১৪ ॥
বৃথা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোঽয়ং মে বৃথা গতঃ।
করোমি চ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ১৫ ॥
অকৃতে চ তথা যুদ্ধে কথমেতৌ গমিষ্যতঃ।
বিনাশং দুঃখদৌ নিত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ১৬ ॥

ভগবত্যা বরো দত্ত-স্তয়া সোঽপি চ দুর্ঘটঃ।
মরণং চেচ্ছয়া কামং দুঃখিতোঽপি ন বাঞ্ছতি ॥ ১৭ ॥
রোগগ্রস্তোঽপি দীনোঽপি ন মুমূর্ষতি কশ্চন।
কথঞ্চেমৌ মদোন্মত্তৌ মর্ত্তু কামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ১৮ ॥
নন্বদ্য শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং সুকামদাং।
বিনা তয়া ন সিধ্যন্তি কামাঃ সম্যক্ প্রসন্নয়া ॥ ১৯ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্যমানস্তু গগনে সংস্থিতাং শিবাং।
অপশ্যদ্ ভগবান্ বিষ্ণু র্যোগনিদ্রাং মনোহরাম্ ॥ ২০ ॥
কৃতাঞ্জলিরমেয়াত্মা তাং চ তুষ্টাব যোগবিৎ।
বিনাশার্থং তয়োস্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

নমো দেবি মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি।
অনাদিনিধনে চণ্ডি ভুক্তি-মুক্তিপ্রদে শিবে ॥ ২২ ॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে ॥ ২৩ ॥
অনুভূতো ময়া তেঽদ্য প্রভাবশ্চাতিদুর্ঘটঃ।
যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সংজাতোঽস্মি বিচেতনঃ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মণা চাতিযত্নেন বোধিতোঽপি পুনঃ পুনঃ।
ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিত-ষড়িন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অচেতনত্বং সংপ্রাপ্তঃ প্রভাবাত্তব চাম্বিকে।
ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোঽহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রান্তোঽহং ন চ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ।
ব্রহ্মাণং হন্তুমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ২৭ ॥
আহূতৌ চ ময়া কামং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় মানদে।
কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে ॥ ২৮ ॥
মরণে বরদানং তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্ভুতং।
জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্ত-স্ত্বামদ্য শরণপ্রদাম্ ॥ ২৯ ॥
সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোঽহং যুদ্ধকর্ম্মণা।
দৃপ্তৌ তৌ বরদানেন তব দেবাত্তিনাশনে ॥ ৩০ ॥
হন্তুং মামুদ্যতৌ পাপৌ কিং করোমি ক যামি চ।
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্মিতপূর্ব্বমুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

প্রণমন্তং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনং।
বঞ্চয়িত্বা স্থিমৌ শূরৌ হন্তব্যৌ চ বিমোহিতৌ ॥ ৩২ ॥
মোহয়িষ্যাম্যহং নূনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা।
জহি নারায়ণাশু ত্বং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তস্যাঃ প্রীতিরসান্বিতং।
সংগ্রামস্থলমাসাদ্য তস্থৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ৩৪ ॥
তদায়াতৌ চ তৌ বীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুং স্থিতং তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৫ ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ।
দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নূনং জয়পরাজয়ৌ ॥ ৩৬ ॥
সবলো জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।
সর্ব্বথৈব ন কর্ত্তব্যৌ হর্ষশোকৌ মহাত্মনা ॥ ৩৭ ॥
পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা।
অধুনা চানয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহু যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণু র্জঘানাসৌ মুষ্টিনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ৩৯ ॥
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ জঘ্নতু র্মুষ্টিনা হরিং।
এবং পরস্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ৪০ ॥
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্ট্বা নারায়ণস্তদা।
অপশ্যৎ সম্মুখে দেব্যাঃ কৃত্বা দীনাং দৃশং হরিঃ ॥ ৪১ ॥
উবাচ। তং বীক্ষ্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসসংযুতং।
জহাসাতীবতাম্রাক্ষী বীক্ষ্যমাণা তদাসুরৌ ॥ ৪২ ॥
তৌ জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাণৈরিবাপরৈঃ।
মন্দস্মিতযুতৈঃ কামপ্রেমভাবযুতৈরনু ॥ ৪৩ ॥
দৃষ্ট্বা মুমুহতুঃ পাপৌ দেব্যা বক্রবিলোকনং।
বিশেষমিতি মন্বানৌ কামবাণাতিপীড়িতৌ ॥ ৪৪ ॥
বীক্ষ্যমাণৌ স্থিতৌ তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাং।
হরিণাপি চ তদ্ দৃষ্টং দেব্যাস্তত্র চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪৫ ॥
মোহিতৌ তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্ কার্য্যবিত্তমঃ।
উবাচ তৌ হসন্ শ্লক্ষ্ণং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥

বরং বরয়ত বীরৌ যুবয়ো র্যোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
দদামি পরমপ্রীতো যুদ্ধেন যুবয়োঃ কিল ॥ ৪৭ ॥
দানবা বহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা।
যুবয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্মাত্তুষ্টোঽস্মি কামং বৈ নিস্তুলেন বলেন চ।
ভ্রাত্রোশ্চ বাঞ্ছিতং কামং প্রযচ্ছামি মহাবলৌ ॥ ৪৯ ॥

সূত উবাচ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাতুরৌ।
বীক্ষ্যমাণৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীম্ ॥ ৫০ ॥
তমূচতুশ্চ কামার্ত্তৌ বিষ্ণুং কমললোচনং।
হরে ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৫১ ॥
দদাব তুভ্যং দেবেশ দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ।
প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ মনোঽভিলষিতং বরম্ ॥ ৫২ ॥
তুষ্টৌ স্ব-স্তব যুদ্ধেন বাসুদেবাদ্ভুতেন চ ॥ ৫৩ ॥
তয়োস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ।
ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৫৪ ॥

সূত উবাচ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণো র্দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ।
বঞ্চিতাবিতি মন্বানৌ তস্থতুঃ শোকসংযুতৌ ॥ ৫৫ ॥
বিচার্য্য মনসা তৌ তু দানবৌ বিষ্ণুমূচতুঃ।
প্রেক্ষ্য সর্ব্বং জলময়ং ভূমিং স্থলবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
হরে যোঽয়ং বরো দত্ত স্ত্বয়া পূর্ব্বং জনার্দ্দন।
সত্যবাগসি দেবেশ দেহি তং বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৫৭ ॥
নির্জ্জলে বিপুলে দেশে হনস্ব মধুসূদন।
বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ ভব মাধব ॥ ৫৮ ॥
স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণু স্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ।
হন্ম্যদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জ্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৫৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ ঊরূ কৃত্বাতিবিস্তরৌ।
দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৬০ ॥
নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ।
সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাং তথা ॥ ৬১ ॥

তদাকর্ণ্য বচ-স্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ।
বর্দ্ধয়ামাসতু র্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৬২ ॥
ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা।
শীর্ষে সংদধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে ॥ ৬৩ ॥
রথাঙ্গেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥ ৬৪ ॥
গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্ত-স্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৬৫ ॥
মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্যাঃ সমন্ততঃ।
অভক্ষ্যা মৃত্তিকা যেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ ॥ ৬৬ ॥
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽস্মি সুনিশ্চিতং।
মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৬৭ ॥
আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৬৮ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
পূজনীয়া পরা শক্তিঃ সগুণা নির্গুণাথবা ॥ ৬৯ ॥

যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত ভগবান হরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়াও যখন চৈতন্য লাভ করিলেন না, ব্রহ্মা তখন চিন্তা করিলেন, বিষ্ণু নিশ্চয় সেই মহাশক্তি কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। ধর্ম্মস্থাপক হইয়াও ইনি যখন এই অধর্ম্ম-সঙ্কটে জাগরিত হইলেন না তখন আমি দুঃখার্ত্ত হইলেই বা কি করিব?। ১—২। মদগর্ব্বিত দানবদ্বয় আমার বধাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার রক্ষাকর্ত্তা কোথাও নাই। ৩। ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক উপায় স্থির করিয়া একাগ্র-হৃদয়ে সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৪। তৎকালে মনে মনে তাঁহার ইহাই বিচারিত হইয়াছিল যে, এই অপরিহার্য্য বিপৎকালে সেই একমাত্র মহাশক্তিই আমাকে রক্ষা করিতে সক্ষমা, যৎকর্ত্তৃক নিত্যচৈতন্যময় বিষ্ণু পর্য্যন্তও স্পন্দবর্জিত হইয়াছেন। ৫। মৃত ব্যক্তি যেমন শব্দাদি ভূতগুণ সকল কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ নিদ্রা-মুদ্রিত-লোচন হরিও আজ মৎকৃত স্তবাদি কিছুই অবগত হইতে পারিতেছেন না। ৬। মৎকর্ত্তৃক বহু প্রকারে সংস্তুত হইয়াও ইনি যখন নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখনই ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে নিদ্রা ইহাঁর বশীভূতা নহেন, কিন্তু ইনি নিদ্রা কর্ত্তৃক বশীকৃত। ৭। যিনি যাঁহার বশতাপন্ন হয়েন, নিশ্চয় তিনি তাঁহার

কিঙ্কর, সেইহেতু এই যোগনিদ্রা ভগবান শ্রীপতি হরিরও অধীশ্বরী ।৮। ভগবান বিষ্ণু কেবল সেই পূর্ণতমা পরমেশ্বরী কর্ত্তৃক অধিকৃত ইহাই নহে, তাঁহার অংশাবতারেও ইনি বশংবদ, তাই সিন্ধুনন্দিনী কমলার প্রেমে কমলাক্ষ নিত্যবদ্ধ। অতএব শক্তিরূপে ভগবতী কর্ত্তৃক এইরূপে নিখিল জগৎ বশীকৃত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত।৯। কি আমি, কি বিষ্ণু, কি শম্ভু, কি সাবিত্রী, কি রমা, কি উমা আমরা সকলেই সেই সর্ব্বেশ্বরীর বশে অবস্থিত, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।১০। যৎকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া ভগবান্ হরিও প্রাকৃতজনের ন্যায় অবশ অঙ্গে নিদ্রিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে অন্য মহাত্মাগণ মুগ্ধ হইবেন ইহার আর কথা কি?।১১। স্তব দ্বারা অদ্য আমি সেই যোগনিদ্রাকেই প্রসন্না করিব, যৎকর্ত্তৃক মুক্ত হইলে জনার্দ্দন বাসুদেব যুদ্ধ ঘটনায় নিযুক্ত হইবেন ।১২। ভগবান ব্রহ্মা এই বুদ্ধি স্থির করিয়া বিষ্ণু-নাভিকমল-নালেই অবস্থিতিপূর্ব্বক নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা সেই যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।১৩। মাতঃ। সকল বেদবাক্য দ্বারা আমি ইহাই অবগত হইয়াছি যে, দেবি! আপনিই এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র কারণ, যেহেতু অখিল-লোকস্থিতি-জাগরূক পুরুষোত্তম বিষ্ণুও অদ্য ত্বৎকর্ত্তৃক নিদ্রার বশতাপন্ন হইয়াছেন ।১৪। সর্ব্বভূতান্তর্যামিনি! জননি! তুমি গুণাতীতা, কোটি কোটি দেবমণ্ডলী মধ্যে এমন জ্ঞানিপ্রবর কে আছেন যিনি তোমার মোহবিলাসলীলাকে ঈদৃক্তা-স্বরূপে ('এইরূপ' বলিয়া নিশ্চয় সহকারে) অবগত হইবেন? যে বিষয়ে আমি (ব্রহ্মা) বিমুগ্ধ এবং স্বয়ং নারায়ণ বিবশ-দেহে নিদ্রিত।১৫। সাংখ্যগণ যাঁহাকে চিন্ময় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন তাঁহাকেই আবার চৈতন্যভাবরহিতা জগৎকর্ত্রী প্রকৃতি বলিয়াও স্বীকার করেন, তুমি কি যথার্থই সেই প্রকৃতিরূপা? অন্যথা, তুমি স্বয়ং চৈতন্যভাবরহিতা না হইলে জগচ্চৈতন্য-নিধানভূমি নারায়ণ কেন অদ্য তোমার সংশ্রয়ে চৈতন্যবিরহিত হইবেন? (ব্যাজ-স্তুতি) অচৈতন্যা না হইলে মা হইয়া আজ কোন প্রাণে সন্তানের এ দুঃখ দেখিতেছ? ১৬। ভবানি! তুমি সগুণা হইয়া বিবিধ প্রকার নাট্য বিস্তার করিতেছ, কাহার সাধ্য সেই তোমার সৃষ্টিযোগ-প্রক্রিয়া অবগত হইবে, মুনিগণও ত্রিকালে 'সন্ধ্যা' এই নাম এবং গুণ সকল পরিকল্পনা করিয়া নিয়ত যাঁহার ধ্যান করেন ।১৭। মাতঃ! তুমিই সর্ব্বদা ত্রিজগতের জ্ঞাননিমিত্তভূতা বুদ্ধিরূপিণী। দেবি! তুমিই সতত সুরকুল-সুখদায়িনী লক্ষ্মীরূপিণী এবং ত্রিভুবনজন-হৃদয়ে কীর্ত্তি-মতি-ধৃতি-কান্তি-শ্রদ্ধা-রতি-স্বরূপিণী ।১৮। এই দুঃখ-দুর্গতিগত হইয়া শত বিতর্ক দ্বারাও আমি ইহার পর আর প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম না। তুমিই সর্ব্বজগতের একমাত্র জননী, ইহাই সত্য প্রমাণ, অন্যথা ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিত্রী ব্রহ্মাদিজননী না হইলে কাহার সাধ্য ব্রহ্মময় সন্তানকে নিদ্রিত করিতে পারে?।১৯।

দেবি! নারায়ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে উত্থিতা হও, অদ্ভুত রূপ ধারণ কর। বাললীলে। বালকের ন্যায় ইচ্ছাময় লীলা তোমার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। হয় আমাকে অথবা এই দৈত্যদ্বয়কে বধ কর, আর যদি স্বয়ং বধ না কর তবে হরিকে প্রবোধিত কর যিনি জাগরিত হইয়া ইহাদিগকে হত করিবেন। তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই বধ কর অথবা পরোক্ষে থাকিয়া বিষ্ণুর দ্বারাই বধ কর, উভয় প্রকারে উহা একমাত্র তোমারই কার্য্য। ২০। সূত বলিলেন, ভগবান ব্রহ্মা কর্ত্তৃক একার্ণব-সলিলমধ্যে সেই তামসী (নিদ্রারূপিণী) দেবী এইরূপে স্তুতা হইয়া দৈত্যদ্বয়ের বিনাশার্থ অতুলতেজা বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভগবৎ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। ২১। দেবী এইরূপে ভগবানের দেহ হইতে নিঃসৃতা হইলে জনার্দ্দন যখন বিস্পন্দিত-শরীর হইলেন তৎকালে নারায়ণের চেতনা-সঞ্চার দেখিয়া বিধাতাও পরমানন্দ লাভ করিলেন। ২২।

পুনশ্চ অষ্টমাধ্যায়ে মধুকৈটভ যুদ্ধ প্রসঙ্গে—যুদ্ধ ব্যাপারে যখন পঞ্চসহস্রবর্ষ সম্পূর্ণ হইল তখন নারায়ণ তাহাদিগের মরণের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১। পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই যুদ্ধ করিলাম তথাপি ভয়ঙ্কর দানবদ্বয় শ্রান্ত হইল না, কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য। ২। অশ্রান্ত যুদ্ধ ব্যাপারে আমার সেই বলবীর্য্য কোথায় গিয়াছে, কিন্তু ইহারা উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি তাহাও চিন্তার বিষয়। ৩। নারায়ণকে এইরূপ চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া মদোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় আনন্দভরে অধীর হইয়া মেঘগম্ভীর নিঃস্বনে বলিতে লাগিল। ৪। বিষ্ণো! যদি তোমার বল না থাকে, যদি যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তবে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বল—নিশ্চয় তোমাদিগের দাস হইলাম। অন্যথা যদি সমর্থ হও তবে যুদ্ধ কর, অগ্রে তোমাকে বধ করিয়া পরে এই চতুর্ম্মুখ পুরুষকে হত করি। ৫। ৬। সূত বলিলেন, মহোদধি মধ্যে একাকী যোদ্ধা মহাবুদ্ধি বিষ্ণু তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাম উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বচন-বিন্যাসে বলিলেন, শ্রান্ত ভীত ত্যক্তশস্ত্র পতিত এবং বালক, ইহাদিগের প্রতি বীরগণ কখনও প্রহার করেন না ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৭। ৮। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই যুদ্ধ করিলাম কিন্তু আমি একাকী, তোমরা উভয় ভ্রাতা, তাহাতে আবার উভয়েই বলী এবং উভয়েই সমান শক্তিসম্পন্ন; তোমরা ক্রমান্বয়ে এক এক জন আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ। সুতরাং যুদ্ধমধ্যে পুনঃ পুনঃ তোমাদের বিশ্রাম ঘটিয়াছে কিন্তু আমি আদ্যন্ত একাকী। অতএব ন্যায়ানুসারে আমিও তোমাদের উভয়ের পরিমাণে বিশ্রাম করিয়া তবে যুদ্ধ করিব। ৯। ১০। যদিও তোমরা বলবান এবং মদোন্মত্ত তথাপি ন্যায়ানুসারে আমার বিশ্রামকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তোমরা অবশ্য বাধ্য, বিশ্রামান্তে ন্যায়ানুসারে আমিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। ১১। সূত বলিলেন, ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

দানবদ্বয় বিশ্বস্ত এবং সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত হইল। ১২। তখন দৈত্যদ্বয়কে অতিদূরে অবস্থিত দেখিয়া বাসুদেব মনে মনে তাহাদিগের মরণের কারণ অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের জ্ঞান উৎপন্ন হইল যে, দেবী ইহাদিগের উভয়কেই ইচ্ছা-মরণ বর দান করিয়াছেন, এইজন্যই ইহারা যুদ্ধশ্রমে ম্লান হয় নাই। ১৩। ১৪। এই মূলতত্ত্ব অনুস্মরণ না করিয়া বৃথা আমি যুদ্ধ করিলাম, বৃথা আমার পরিশ্রম গত হইল আর এখনও এ তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়া যুদ্ধ করিই বা কিরূপে? আবার যুদ্ধ না করিলেই বা দেবকুলের নিত্য দুঃখদ বর-দর্পিত দানবদ্বয় নিহত হইবে কি উপায়ে? । ১৫ । ১৬ । ভগবতী ইহাদিগকে যে বর দান করিয়াছেন তাহাও ত অতি দুর্ঘট। কারণ নিতান্ত দুঃখিত হইলেও কেহ ইচ্ছাক্রমে মৃত্যুকে বাঞ্ছা করে না। ১৭। রোগগ্রস্ত এবং দরিদ্র হইলেও যখন কেহ মরণ ইচ্ছা করে না, তখন এই মদোন্মত্ত অসুরদ্বয় ইচ্ছাক্রমে মরণ কামনা করিবে কেন? । ১৮। যাহা হউক, অদ্য আমি সেই সর্ব্বকামপ্রদাত্রী শক্তিরূপিণী মহাবিদ্যার শরণাপন্ন হই। কারণ তিনি সম্যক্ প্রসন্না না হইলে কোন কামনাই সিদ্ধ হয় না। ১৯। ভগবান বিষ্ণু এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, শিবসীমন্তিনী যোগনিদ্রা মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগন-মণ্ডলে সংস্থিতা রহিয়াছেন। অনন্তর অনন্তশক্তিমান যোগেশ্বর নারায়ণ অসুরদ্বয়ের বিনাশার্থে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বরদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। । ২০ । ২১ । অয়ি অনাদিনিধনে! সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণি! ভোগমোক্ষদায়িনি! শিবনিতম্বিনি! মহামায়ে! চণ্ডি! দেবি! তোমাকে প্রণাম । ২২ । দেবি! তোমার কি সগুণ কি নির্গুণ কোন রূপই জানি না, যাঁহার রূপের তত্ত্বই জানি না তাঁহার সংখ্যাতীত চরিত্র সকল জানিব কিরূপে? তবে তোমার প্রভাবের অনুভব দুর্ঘট হইলেও অদ্য আমা কর্ত্তৃক এই পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছে যে আমি তোমার প্রভাবেই নিদ্রালীন এবং বিচেতন হইয়াছিলাম। ২৩ । ২৪ । ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অতি যত্ন-সহকারে বারংবার বোধিত হইয়াও আমি জাগরিত হইতে পারি নাই। অম্বিকে! তোমারই প্রভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সঙ্কোচিত হওয়ায় আমি সর্ব্বথা চৈতন্যহীন হইয়াছিলাম, আবার তৎকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াই জাগরিত হইয়াছি এবং বহু যুদ্ধও করিয়াছি। ২৫ । ২৬ । এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধে আমি শ্রান্ত হইলাম। কিন্তু মাতঃ! তোমার প্রদত্ত বর-প্রভাবে বীরবর অসুরদ্বয় কিছুতেই শ্রান্ত হইল না। মদগর্ব্বিত দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হত করিবার নিমিত্ত আগত হইলে যথেচ্ছাদ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলাম এবং মহার্ণব মধ্যে তাহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধও করিলাম। ২৭ । ২৮ । কিন্তু মানদে! তুমি যাহাদিগকে সম্মান দিয়াছ, কাহার সাধ্য তাহাদিগকে অপমানিত করে? পঞ্চসহস্র বৎসর যুদ্ধের পরেও

যখন দেখিলাম, তাহারা ক্লান্ত বা ক্ষান্ত হইল না তখনই জানিলাম, তাহাদিগের মরণ সম্বন্ধে তুমি অদ্ভুত বর দান করিয়াছ। তাহা জানিয়াই অদ্য অশরণ-শরণদায়িনীর শরণাপন্ন হইয়াছি। ২৯। মাতঃ! এই অতিদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধকার্য্যে আমি খিন্ন হইয়াছি, দেবার্ত্তিনাশিনি! দেবকার্য্যে আমার সাহায্য কর। তোমার বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়াই পাপাবতার অসুরদ্বয় আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মাতঃ! বল, আমি এ ঘোর সঙ্কটে তোমার শরণাগত না হইয়া কি করিব, কোথায় যাইব? ৩০। ৩১। দেবী এইরূপে উক্তা হইয়া মৃদুমন্দ হসিত-বদনে প্রণত জগৎপতি বাসুদেবকে বলিলেন, এই বীরদ্বয়কে বিমোহিত এবং বঞ্চিত করিয়া বধ করিতে হইবে। ৩২। নারায়ণ! কুটিল কটাক্ষক্ষেপে আমি ইহাদিগকে মোহিত করিব, তৎপরে আমার মায়ামোহিত অসুরদ্বয়কে তুমি শীঘ্র বিনাশ করিবে। ৩৩। সূত বলিলেন, দেবীর সেই প্রীতিস্নেহ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান পুনর্ব্বার সেই মহার্ণব মধ্যে সংগ্রাম স্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ৩৪। অনন্তর সেই মহাবল ধীর বীরদ্বয় যুদ্ধার্থী হইয়া সেইস্থলে সমাগত হইল এবং বিষ্ণুকে পূর্ব্বেই তথাতে অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল। ৩৫। মহাকাম! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমরা দ্বিভুজ তুমি চতুর্ভুজ, তথাপি জয় পরাজয় দৈবাধীন। ইহা নিশ্চয় জানিয়া অদ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। ৩৬। সবল চিরকালই জয়লাভ করে দুর্ব্বল দৈবাৎ কদাচিৎ জয়ী হয়। ৩৭। দানববৈরিন্! পূর্ব্বে তোমাকর্ত্তৃক বহু দৈত্য পরাজিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমিই পরাজিত হইলে। ৩৮। সূত বলিলেন, এই বলিয়া মহাবাহু দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া বিষ্ণু অদ্ভুত প্রক্রিয়াবলে তাহাদিগকে বিষম মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, তাহারাও উভয়ে ভুজবল-মদোন্মত্ত হইয়া ভগবানের অঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে পরস্পর পরম দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ৩৯। ৪০। মহাবীর্য্য দানবদ্বয়কে এইরূপে যুধ্যমান দেখিয়া নারায়ণ তৎকালে কাতরনয়নে দেবীর মুখমণ্ডলে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। ৪১। সূত বলিলেন, বিষ্ণুকে তাদৃশ কাতরাক্ষ এবং দুঃখাপন্ন দেখিয়া স্বভাব-তরুণারুণ-নয়না দেবী নয়নত্রয়কে সমধিক আরক্ত করিয়া অসুরদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্য করিলেন এবং মৃদুমন্দ হাস্যচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে কাম-প্রেম-ভাব-সংমিশ্রিত কন্দর্পের পঞ্চবাণাতিরিক্ত শর-সদৃশ ঘন ঘন কুটিল কটাক্ষে তাহাদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিলেন। ৪২। ৪৩। কামবাণ-প্রপীড়িত পাপমূর্ত্তি দানবদ্বয় দেবীর সেই বঙ্কিম বিলোকনকে বিশেষ অনুকূল মনে করিয়া মুগ্ধ হইল এবং নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া বিশদপ্রভা দেবীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কার্য্যকৌশলবিত্তম বিষ্ণুও তৎকালে দেবীর সেই অভিপ্রেত কার্য্য দর্শন করিলেন এবং দৈত্যদ্বয়কে বিমোহিত জানিয়া হাস্যপূর্ব্বক মধুর মেঘগম্ভীর নিনাদে বলিলেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬। বীরদ্বয়! তোমাদিগের যুদ্ধে পরম প্রীত

হইয়াছি, যাহা তোমাদিগের অভিবাঞ্ছিত সেই বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব। ৪৭। পূর্ব্বে আমি যুধ্যমান বহু দানবকে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমাদিগের সদৃশ যোদ্ধা কাহাকেও দেখি নাই এবং শুনি নাই। এজন্য তোমাদিগের উভয় ভ্রাতার অতুল বীর্য্যবলে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতেছি। ৪৮-৪৯। সূত বলিলেন, দৈত্যদ্বয় একতঃ জগদানন্দনিদান-ভূমি মহামায়াকে দর্শন করিয়াই তাঁহার মায়া-প্রভাবে কামার্ত্ত, দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে অভিমানান্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিল, হরে! তুমি আমাদিগকে কি দান করিতে চাও? আমরা যাচক নই, বরং আমরা তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদিগকে দাতা বলিয়া জানিও, যাচক বলিয়া নহে। হৃষীকেশ। তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, বাসুদেব। আমরাও তোমার অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। জনার্দ্দন তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে প্রার্থনা করিলেন, যদি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে অদ্য আমাকে এই বর প্রদান কর যে, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হইবে। ৫৪। সূত বলিলেন, দানবদ্বয় বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণে অতিবিস্মিত হইয়া এবং আত্মাকে বঞ্চিত মনে করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থিত হইল। ৫৫। অনন্তর সমস্ত জগৎ জলময় এবং ভূমিকে স্থল-বিবর্জ্জিত দেখিয়া মনে মনে বিচারপূর্ব্বক বিষ্ণুকে বলিল, দেবেশ! জনার্দ্দন হরে! তুমি সত্যবাদী, ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে যে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, সেই বাঞ্ছিত বর এক্ষণে প্রদান কর, জলশূন্য এবং অতিবিস্তৃত এরূপ কোন স্থলে আমাদিগকে বধ কর। আমরা তোমার বধ্য হইয়া নিজ সত্য রক্ষা করিলাম, এক্ষণে তুমি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হও। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ভগবান বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্র স্মরণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, মহাভাগদ্বয়। তাহাই স্বীকার করিলাম, নির্জ্জল এবং বিপুলস্থলেই তোমাদিগকে বধ করিব, এই বলিয়া দেবাধিদেব নারায়ণ নিজ উরুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া সেই একার্ণব-জলোপরি তাহাই নির্জ্জলস্থল-স্বরূপে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, দানবদ্বয়! এস্থলে ত জল নাই, অতএব এইস্থানেই নিজ নিজ মস্তক ত্যাগ কর, আমিও সত্যবাদী হই, তোমরাও সত্যবাদী হও। ৫৯। ৬০। ৬১। ভগবানের সেই সত্যানুরূপ বাক্য শ্রবণে মনে মনে কৌশল স্থির করিয়া দৈত্যদ্বয় সহস্র যোজন ব্যাপিয়া নিজ নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিল, তদ্দর্শনে ভগবানও নিজ জঘনদ্বয় তাহার দ্বিগুণ বিস্তৃত করিলেন। মায়ানিধান নারায়ণের সেই অচিন্ত্য মায়াবল সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মধু ও কৈটভ ভগবানের সেই অদ্ভুত বিস্তৃত জঘনদ্বয়ে নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিল, অনন্তর মহাপ্রভাব বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা নিজ জঘনস্থিত বিশাল দৈত্যঃ মস্তকদ্বয় সবেগে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ৬২। ৬৩। ৬৪। মস্তকচ্ছেদনে মধু এবং কৈটভের প্রাণ নির্গত হইল, তৎকালে তাহাদিগের মেদঃপুঞ্জে সাগরের সকল জল

পরিব্যাপ্ত হইল। সেই হেতু পৃথিবীর 'মেদিনী' নাম জগদ্বিখ্যাত এবং সেই কারণে (মেদোরাশির সংমিশ্রণে ঘনীভূত বলিয়া) মৃত্তিকা অভক্ষ্যা। ৬৫। ৬৬। হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই মধুকৈটভ-বধ বৃত্তান্ত সুনিশ্চিতরূপে সমস্ত কথিত হইল। দেবীর এই অচিন্ত্য প্রভাব অবগত হইয়া বুধগণ সর্ব্বদা সেই মহামায়া মহাবিদ্যার উপাসনা করিবেন। সুরাসুর-কিন্নর-নর নিখিলজীব জগতে তিনিই সকলের আরাধ্যা পরমাশক্তি। ইহার পর আর অধিক তত্ত্ব ত্রিভুবনে কিছু নাই—ইহা সত্য সত্য পুনঃ সত্য। বেদশাস্ত্রের ইহাই পরমার্থ নিশ্চয় যে, সগুণ অথবা নির্গুণরূপে সেই পরমাশক্তিই পূজনীয়া। ৬৭। ৬৮। ৬৯।

অষ্টম্ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে যাঁহারা শক্তিকে বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং 'পরম-বৈষ্ণবী' বলিয়া জানিয়াছেন, এই উভয় সম্প্রদায়েরই বিচারের ভার আমরা উভয়পক্ষীয় সাধকবর্গের হস্তে বিন্যস্ত করিতেছি। তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন যে, পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়দ্বয় উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইয়াছেন কি তাঁহাদের মতানুকূল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে বলিয়া —না, সে সকল শাস্ত্রবাক্যের গুরুগম্ভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া অথবা এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে ইহা কখনও দেখেন নাই বা শুনেন নাই বলিয়া, অথবা থাকিলেও অভিমানভরে তাহা দেখিতে শুনিতে চাহেন না বলিয়া? উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তিতত্ত্ব দ্বিভাগে বিভক্ত—এক, ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি; দ্বিতীয়, গুণাতীতা আনন্দঘনরূপিণী চিৎশক্তি, তন্মধ্যে মায়াশক্তি বলে এই বিচিত্র সংসারনাটকনিকেতন বিরচিত হইয়াছে। চিৎশক্তি সেই নাটকে পুরুষ প্রকৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্ব-স্বরূপে নির্লিপ্ত থাকিয়াও জীবরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডলীলার অভিনয় করিতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীটানুকীট পর্য্যন্তের প্রসবিনী হইয়া জড় চৈতন্য উভয়াংশে আত্ম-বিভূতি বিস্তার করিয়া জগন্ময়ী সাজিয়াছেন, মায়ের সেই মুনি-মানসমোহিনী মায়া যদি তুমি আমিই বুঝিব, তবে আর আনন্দময়ী জড় জগতের খেলা খেলিবেন কাহাকে লইয়া? অন্ধ! তুমি যদি দর্শনশাস্ত্রের অভিমান কর, আর ভাক্ত! তুমি যদি শক্তি-বিদ্বেষী হইয়াও আপনাকে ভক্ত পণ্ডিত বলিয়া মনে কর, তাহাতে শাস্ত্রের গৌরব খণ্ডিত হউক বা না হউক তোমাকে দণ্ডিত হইবার কথা আছে। তুমি আমি যে শাক্তকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়াও আপনাকে পাপী বলিয়া মনে করি না, স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সেই শাক্ত হইয়া বলিতেছেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ-মহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।

অখিলাত্মিকে। নিখিল জগতের যে কোন স্থানে সৎ বা অসৎ (চৈতন্য বা জড়) যে কোন পদার্থ আছে, যিনি সেই সকলের শক্তিস্বরূপিণী, সেই তুমি স্তবের বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে? যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা সেই ভগবানও যখন তোমা কর্ত্তৃক নিদ্রাবশীকৃত হইয়াছেন তখন তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? বিষ্ণু, আমি এবং ঈশান, আমরাও তোমা হইতেই শরীর গ্রহণ করিয়াছি, অতএব সেই ব্রহ্মাদিরও নিদানভূতা তোমাকে স্তব করিতে কে শক্তিমান হইবে? দেবি। সেই অনির্ব্বচনীয়-প্রভাবা তুমি নিজ উদার প্রভাবে নিজে সংস্তুতা হইয়া এই দুরাধর্ষ অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে মোহিত কর। আবার বিষ্ণু বলিতেছেন—

ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে ॥

দেবি! তোমার কি সগুণ নির্গুণ কোন রূপই জানি না, যাঁহার রূপ পর্য্যন্ত জানি না তাঁহার সংখ্যাতীত চরিত্র সকল জানিব কিরূপে?

মহিষাসুর যুদ্ধের পর নিখিল দেব, দেবযোনি এবং মহর্ষিমণ্ডল প্রত্যক্ষরূপিণী কাত্যায়নীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা,
নিঃশেষদেবগণশক্তি-সমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকা-মখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং,
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ১ ॥
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো,
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ-পরিপালনায়,
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ২ ॥
* * *
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ,
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা,
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি-স্ত্বমাদ্যা ॥ ৩ ॥

দেবগণের দেহ হইতে শক্তিসমূহকে নিঃশেষ-নিক্রান্ত করিয়া যিনি মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন, যৎকর্ত্তৃক আত্মশক্তি দ্বারা এই চরাচর জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ভক্তিভরে আমরা সেই অখিলদেব-মহর্ষিপূজ্যা অম্বিকার চরণাম্বুজে প্রণত হইতেছি, তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ১। যাঁহার অতুল্য প্রভাব এবং বল, স্বয়ং ভগবান্

অনন্ত, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, সেই অচিন্ত্য-বিক্রমা চণ্ডিকা এই অখিল জগৎ পরিপালনের নিমিত্ত এবং অশুভ ভয় নাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন। ২। জগদম্বে! তুমি সমস্ত জগতের হেতুভূতা হইলেও ত্রিগুণধারিণী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত তোমার সেই ত্রিগুণে বিজড়িত, তাহার আবরণদোষ ভেদ করিয়া হরি হর প্রভৃতিও তোমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন না, কারণ তোমার মহিমা অপার; তুমি সর্ব্বভূতের আশ্রয়রূপিণী, এ অখিল জগৎ তোমারই অংশভূত, আবার তুমিই এ জগতের অতীতা অবিকৃতা অব্যক্তা আদ্যা পরমাপ্রকৃতি। ৩।

জড়বাদিন্! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁহার তত্ত্ব অবাঙ্মনসগোচর অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্ত জীব মানব হইয়া সেই শক্তিতত্ত্বকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে জিহ্বা কি তোমার জড হয় না? 'জগতের প্রকৃতি' বলিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি জড় হইয়া গিয়াছে। তাই আজ সচ্চিদানন্দ-রূপিণী মহাপ্রকৃতিকে জড় বলিতে সাহসী হইয়াছ, কিন্তু 'জগতের প্রকৃতি' না বলিয়া 'প্রকৃতির জগৎ' বলিয়া কখনও কি প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছ? যদি করিতে তাহা হইলে আর প্রকৃতির প্রকৃত সিদ্ধান্তে এরূপে ভ্রান্ত হইতে না, দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দাও, যদি ভাষার শব্দব্যুৎপত্তিজ্ঞানও তোমার থাকে তবে জিজ্ঞাসা করি, ভাষায় যে তুমি 'প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত তথ্য' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কর তাহার অর্থ কি প্রকৃত মিথ্যা না প্রকৃত সত্য? প্রকৃতের অর্থও যদি প্রকৃত না হয়, তবে 'বিকৃত' বলিবে কাহাকে? সংসারে দুইই পদার্থ—এক প্রকৃতি, দ্বিতীয় বিকৃতি; তন্মধ্যে যাহা প্রকৃতির অনুপ্রাণিত তাহাই প্রকৃত, অন্যথা বিকৃত। প্রত্যয় জন্য লিঙ্গভেদ ছাড়িয়া দিলে প্রকৃতি আর প্রকার একই কথা। যাহা যাহার স্বরূপ তাহাই তাহার প্রকার, যথা—অমুক বস্তু কি প্রকার, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি? স্বরূপ আর কিছুই নহে, প্রকৃতির নামই স্বরূপ। তবেই যে যাহা তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইলেই প্রকৃতির পরিচয় দিতে হইবে। এইজন্য লোকব্যবহারে যাহা যাহার প্রকৃতি তাহাই তাহার স্বভাব। স্বভাব শব্দের বিশ্লেষণ করিলে 'স্ব' শব্দের প্রতিপাদ্য আত্মা, ভাব শব্দের প্রতিপাদ্য সত্ত্বা, স্বরূপ প্রকৃতি বা শক্তি। ফলিতার্থে যাহা আত্মার স্বরূপ তাহাই স্বভাব বা প্রকৃতি। এখন জড়বাদী দার্শনিক বলিয়া দাও যাহা ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, শক্তি, প্রকৃতি অথবা স্বরূপ তাহা কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা না হয় তবে শক্তিকে তুমি জড় বল কোন্ প্রমাণে? নিত্য চৈতন্যময় ব্রহ্ম ত সত্যস্বরূপ। মিথ্যা না হইলে শক্তি কখনও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইতে পারেন না. চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও তাঁহাকে কখন জড় বলিতে পার না। তবেই এখন জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াল যে, চৈতন্যময় ব্রহ্মের যাহা স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে হইবে তাহাই জড়। দার্শনিক! ধন্যবাদ তোমার শক্তিজ্ঞানে, বলিহারি

তোমার আস্তিকতায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সাধক বলিয়াছেন, 'কে জানে ও সে কালী কেমন। ষড়দর্শনে যার না পায় দর্শন।'

'জগতের প্রকৃতি' বলিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে গিয়াই চার্ব্বাকগণ নাস্তিক হইয়াছেন। আস্তিকের বুঝিবার প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র। আস্তিককে বুঝিতে হইবে—জগতের প্রকৃতি নহে প্রকৃতির জগৎ। জগতের প্রকৃতি বলিলে মানবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। কারণ জগৎ অনন্তবিস্তৃত এবং কল্পান্তস্থায়ী, ক্ষুদ্রদেহ মানবের পরমায়ুঃ উর্দ্ধ সংখ্যা লক্ষ বৎসর, বিশেষতঃ মানব পার্থিব জীবের মধ্যে প্রধান হইলেও ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল ক্ষুদ্রবুদ্ধি মাত্র-সম্বল, তাহাতেও আবার ক্ষুৎপিপাসা-বাল্য-যৌবন জরা-রোগশোক-ভয় পীড়িত তাই শফরীর সমুদ্রতত্ত্ব সন্ধান আর মানবের ব্রহ্মাণ্ড-বস্তু বিচার একই কথা। আর্য্য সাধককে জগতের প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে হইলেই জগতের দাস না হইয়া জগজ্জননীর দাস হইতে হইবে। শাস্ত্রদর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াই তাঁহার জগন্ময় মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। মায়ের রূপ দেখিয়াই সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহার সৌসাদৃশ্য পরীক্ষা করিতে হইবে, ব্রহ্মময়ীর স্বরূপে ডুবিয়াই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রণালীতে তাহা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই মরজীবনে অমর পদবী লাভ করিয়া পরমেশ্বরীর পদাম্বুজে জীবনাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছেন। সে প্রণালী সাধকের সাধন-পরম্পরা। 'জগতের প্রকৃতি' বলিলে স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই প্রথম সন্দেহ হয় যে জগৎ যদি পঞ্চভূতের প্রপঞ্চ রচনা বই আর কিছুই না হয় তবে ত ঈশ্বর, দেবতা, ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা শক্তি বলিয়া গুণাতীত মায়াতীত জগতের অতীত কোন পদার্থ থাকিবার কথাই আদৌ নাই। কেননা যাহা জগৎ তাহাই প্রকৃতি। তবেই দেখিতে দেখিতে আবার সেই নাস্তিকতাই আসিয়া দাঁড়াইল। নাস্তিকের চক্ষুতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ তাহাই যেন সংসারের যথাসর্ব্বস্ব। কিন্তু আস্তিকের দৃষ্টিতে 'প্রকৃতির জগৎ' বলিয়া বুঝিলে আর সে সন্দেহের আশঙ্কা নাই। কেননা জগৎ পঞ্চভূতময় জড়, অচেতন যাহাই কেন না হউক, জগতের পরিচয়ে পরিচিত বলিয়া প্রকৃতির স্বরূপে সে ভৌতিকত্ব জড়ত্ব অচেতনত্ব থাকিবেই থাকিবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। সন্তানের মা বলিয়া তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, সৌসাদৃশ্য মায়ের শরীরে থাকিবেই থাকিবে এমন কোন কথা নাই, বরং মায়ের কিছু না কিছু সাদৃশ্যই সন্তানে অবশ্য থাকিবে। তদ্রূপ জগতের স্বরূপ জগদম্বায় থাকুক বা না থাকুক, জগদম্বার কোন না কোন বিশেষ শক্তি জগতে থাকিবেই থাকিবে। তত্ত্বজ্ঞানীর পরমার্থদৃষ্টিতে জগতে এবং জগদম্বায় কোন বিশেষ না থাকিলেও ভেদজ্ঞানীর পক্ষে ইহাই বুঝিবার প্রণালী। দ্বিতীয়তঃ কেবল জগৎ বুঝিতে হইলে জগৎ এবং জগতের শক্তি এই দুই-ই বুঝিব, কিন্তু জগদম্বাকে লক্ষ্য করিয়া জগৎ বুঝিতে হইলে জগৎ, জগতের শক্তি এবং জগদতীত

মহাশক্তি এই তিনই বুঝিব। জগতে আমি অপূর্ণ হইলেও জগতের জননী পূর্ণ-ব্রহ্মসনাতনী। তাই তাঁহাকে বুঝিতে গেলে অপূর্ণ জগতের অপূর্ণ তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া আমাকে সেই পূর্ণতম তত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহার নিকটে এক তিনি ভিন্ন আর সকলেই অপূর্ণ, অথচ যত কিছু অপূর্ণ সে সকলই তাঁহার পূর্ণতায় পরিপূর্ণ। এইজন্য আস্তিককুল-চূড়ামণি আর্য্য-উপাসক পূর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া অপূর্ণ জ্ঞানের আদর করিতে চাহেন না, ভূতভাবন-ভাবিনীর পরমতত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া ভূতের তত্ত্ব বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না।

আর এক কথা, প্রত্যক্ষ জগৎকে জড় দেখিয়া যদি সেই জগদুদ্ভাবিনী মহাশক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সে ত এক বিষম রহস্য। জগৎকে যদি জড় বলিয়া বুঝিয়া থাক তাহাতে আপাততঃ কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু জগৎ-পরিচালিনী শক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়াছ কোন প্রমাণে তাহাই বুঝিতে চাই। একদিকে দার্শনিক বলিতেছেন 'চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা' অর্থাৎ জগৎশক্তি জড় হইলেও চিৎশক্তির ছায়ার আবেশ বশতঃ চেতনার ন্যায়ই প্রকাশ পান। অন্যদিকে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন 'যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।' সৎ অসৎ (জড় চৈতন্য) যাহাই কেন না হউক, তুমিই সে সকলের শক্তিস্বরূপিণী, এই উভয় মতেই শক্তির উভয় অবস্থা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ এই যে দার্শনিক বলিতেছেন, চিচ্ছায়ার আবেশে তাঁহাকে চেতনার ন্যায় বোধ হয়, আর ব্রহ্মা বলিতেছেন, জড়ের আভাস বশতঃ তাঁহাকে জড়ের ন্যায় বোধ হয় (নতুবা অসৎ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না)। দার্শনিকের মতে জগৎশক্তি স্বরূপতঃ জড়, চিৎ-শক্তির আভাসে তিনি চেতনবৎ প্রতীয়মান। ব্রহ্মার মনে জগৎশক্তি স্বরূপতঃ চেতনা, কিন্তু জড়ের আভাস বশতঃ জড়বৎ প্রতীয়মান। এখন জগৎশক্তি চৈতন্যাবেশময়ী হউন বা জড়াভাসময়ী হউন—ফলতঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে না হইলেও ব্যবহারিক দশায় উভয় মতেই জড় ও চৈতন্য বলিয়া উভয় বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার আছে। আস্তিক মতে ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধান্ত যে, চৈতন্য হইতেই জড়ের সৃষ্টি বা প্রকাশ হইয়াছে, চিৎ-শক্তি হইতেই জগৎশক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং, বাসুদেবময়ং জগৎ, শিবশক্তিময়ং বিশ্বং, বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদঃ, হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ, অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং, যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে, ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং—এই সকল শাস্ত্রীয় মহাবাক্য যদি সত্য হয়, এক তিনি ভিন্ন যদি কোন দ্বিতীয় পদার্থ না থাকে তবে এ জড় জগৎ এবং জগতের শক্তি কোথা হইতে আসিলেন? ইহার উত্তরে হয় বলিতে হইবে, জগৎ বা জগৎশক্তি সমস্তই সেই মহাশক্তির ব্রহ্মবিভূতি নতুবা বলিতে হইবে জগৎ বা জগৎ-

শক্তি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অন্যথা কিছুতেই ব্রহ্ম বা শক্তির অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা পায় না। প্রত্যক্ষ জগৎ 'নাই' বলিবার উপায় নাই, আবার ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন পদার্থ আছে, ইহাও আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে জগৎ বা জগৎ-শক্তি যাহাই কেন না বল, সমস্তই সেই মহাশক্তির পূর্ণবিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলেই প্রকারান্তরে বলা হইল যে, স্বরূপতঃ চিৎশক্তি বই আর কোন পদার্থ নাই। তবে মায়াময় জগতে 'জড়' বলিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয় তাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে, ভ্রান্তি-বিলাস মাত্র। সেই ভ্রান্তিও আবার ব্রহ্মশক্তিরই বিভূতি-বিশেষ। সেই বিভূতিরই নামান্তর মায়া এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারই রজস্তমোগুণ-প্রধান অংশের নাম অবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ত্বগুণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ পর্য্যন্ত অবস্থার নাম বিদ্যা। সেই বিদ্যার মধ্যে আবার যিনি তত্ত্বাতীত তুরীয়া শক্তি, কেবল আনন্দ মাত্র যাঁহার স্বরূপ সত্ত্বা—তিনিই মহাবিদ্যা। তাই সর্ব্বেশ্বর সদানন্দ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়ীর প্রেমানন্দে অধীর হইয়া তন্ত্রে বলিয়াছেন : চামুণ্ডাতন্ত্রে—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

কালী এবং তারা ইহাঁরা মহাবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতী ইহাঁরা বিদ্যা, বগলা মাতঙ্গী এবং কমলাত্মিকা ইহাঁরা সিদ্ধবিদ্যা। এই দশ মহাশক্তিই যথাক্রমে মহাবিদ্যা বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যা অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বের পূর্ণপ্রকট-মূর্ত্তি। এই দশ মহাশক্তি মধ্যেই মহাবিদ্যা বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যার উক্ত ক্রমানুসারে সমন্বয় বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্তই উক্ত বচনের যথাশ্রুত স্বারসিক অর্থ, অতঃপর শ্যামারহস্যে কথিত হইয়াছে—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা॥
ধূমাবতী চ বগলা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

এস্থানে সাধারণতঃ সকলকেই মহাবিদ্যারূপে নিরূপিত করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন, মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা। এস্থলেও 'সর্ব্বাসু' এই পদ ঘটিত 'সর্ব্ব' শব্দের অভিব্যঞ্জিত সমুচ্চয়রূপ অর্থ এবং বহুবচন নির্দ্দেশ হেতু প্রকারান্তরে সকলই মহাবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। বিশেষতঃ বিশ্বসারতন্ত্রে পরিস্ফুটরূপেই কথিত হইয়াছে 'মহাবিদ্যা মহাপূর্ব্বা'। এজন্য তান্ত্রিক আচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এই যে, চামুণ্ডাতন্ত্রোক্ত বচনের শেষে 'এতা দশ মহাবিদ্যাঃ

সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ'। এস্থানের ভঙ্গ্যন্তরে সাধারণতঃ সকলকেই মহাবিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব বিশ্বসার তন্ত্রানুসারে কালী এবং তারা, ইহাঁরা মহা-মহা-সিদ্ধবিদ্যা; ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতী ইহাঁরা মহাসিদ্ধবিদ্যা, বগলা মাতঙ্গী এবং কমলাত্মিকা ইহাঁরা সিদ্ধ-মহাসিদ্ধবিদ্যা। তুরীয় চৈতন্যরূপে ইহাঁদের আনন্দঘন স্বরূপ কি তাহা সম্ভবতঃ শক্তিলীলাদি প্রকরণে যথাসাধ্য প্রকটিত হইবে। এক্ষণে তিনি মায়া কি তাঁহার মায়া, শাস্ত্রানুসারে সেই অংশই আলোচ্য।

মায়ের নাম মহামায়া, এও তাঁহার এক মহা-মায়া। এই মায়াতে অন্ধ হইয়াই অপক্কবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভ্রান্তসিদ্ধান্ত-কূপে পড়িয়া আত্মহারা হয়েন, বুঝিয়া থাকেন মায়া কেবল জড়-জগতের উপাদান বই আর কিছুই নহে এবং যিনি সেই মায়ায় আশ্রয়ভূতা মূলরূপা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী, তিনিও মায়া। তিনিও যদি মায়া, তবে আর 'মহামায়া' নাম কেন? মায়া আর মায়াবী যদি একই পদার্থ, বীজ আর বৃক্ষ যদি একই বস্তু, তবে আর অবস্থার বৈষম্য কেন? নামের ভেদ কেন? স্বরূপেরই বা পার্থক্য কেন? ফলতঃ সেই মহাশক্তির মায়াংশ লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র যেখানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেও 'মহামায়া' নাম দিয়াছেন। আবার যেখানে ব্রহ্মস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থানেও 'মহামায়া' বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। উভয়স্থলেই মহৎ শব্দ মায়ার বিশেষণ। তবে বিশেষ এই যে, মায়াংশে কর্ম্মধারয় সমাস অর্থাৎ যিনি মহতী মায়া তাঁহারই নাম মহামায়া, আর ব্রহ্মাংশে বহুব্রীহি-সমাস অর্থাৎ মহতী মায়া যাঁহার তিনিই মহামায়া। লূতা (গুটি পোকা) যেমন তন্তুবয়ন কার্য্যের প্রতি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ অর্থাৎ তাহার সূত্রজাল বিস্তাররূপ কার্য্য তাহারই ইচ্ছাক্রমে ঘটিতেছে, এইস্থানে সে নিমিত্ত কারণ। আবার সে সূত্রসৃষ্টি তাহারই শরীর হইতে সম্পন্ন হইতেছে, এইস্থানে সে উপাদান কারণ। তদ্রূপ এই জগৎ-কার্য্যের প্রতি সেই মহাশক্তি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ অর্থাৎ যখন সেই ইচ্ছাময়ী নিজ আনন্দময় সত্য সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছেন তখনই তিনি নিমিত্ত-কারণ। আবার যখন আত্মবিভূতিরূপিণী মায়ার বিস্তার করিয়া তাহা হইতে এই প্রপঞ্চ চরাচর বিরচিত করিয়াছেন তখনই তিনি উপাদান-কারণ। এই নিমিত্ত-রূপ অংশ শক্তি বা ব্রহ্ম, উপাদান-রূপ অংশ মায়া। সৃষ্টি-প্রক্রিয়াতেও জীবদেহে ব্রহ্মাংশ আত্মা, মায়াংশ অন্তঃকরণ। গুটিপোকার দৃষ্টান্তেই মায়ার আর একটি অবস্থা আছে—গুটিপোকা নিজসূত্ররচিত জালে নিজে বদ্ধ হইয়া আবার সমস্ত সূত্র আত্মসাৎ করিয়া কিছুকাল সেই সূত্র মধ্যে বেষ্টিত অথচ সমাহিত হইয়া থাকে, কালক্রমে সেই সূত্রাবরণ মধ্যেই তাহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। কিছুদিন পরে সেই গুটিপোকাই আবার

প্রজাপতি-রূপ ধারণ করিয়া নিজ সূত্র-গর্ভকোষ বিদীর্ণ করিয়া সেই সুন্দরাদপি সুন্দরতম বিচিত্র দেহটি লইয়া স্বচ্ছ সূক্ষ্ম পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক নির্ম্মুক্ত-জীবনে স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে পরমানন্দে অনন্ত আকাশকক্ষে উড্ডীন হইয়া যায়, পৃথিবীতে কেবল সেই বিদীর্ণ সূত্রকোষটি মাত্র পড়িয়া থাকে। মায়াংশ মনও তদ্রূপ নিজ-রচিত সংসারসূত্রে নিজে বদ্ধ হইয়া সেই সংসারেই আকৃষ্ট এবং পিষ্টপেষিত হইয়া আত্মসংযমপূর্ব্বক সংসারের সমস্ত স্নেহ মায়া মমতা নিজবশে আনিয়া সংসারগর্ভে বদ্ধ থাকিয়াই সেই বিশ্বগর্ভধারিণী বিশ্বেশ্বর-হৃদিচারিণীর চারুচরণাম্বুজ চিন্তায় সমাহিত হইলে ত্রৈলোক্যের অজ্ঞাতসারে অন্তরে অন্তরেই তাহার রূপান্তর ঘটিতে থাকে। তখন কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে নিজবলে সংসার মায়াকোষ বিদীর্ণ করিয়া সেই কালভয়হারিণী মহাকালমোহিনীর কৃপাকটাক্ষ-লাভে বিবেক বৈরাগ্য দুইটি পক্ষ বিস্তার করিয়া নিজদেহরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আত্মাটি লইয়া মনোরূপিণী শুদ্ধ সাত্ত্বিকী নির্ম্মলা মায়া তখন প্রজাপতি (শক্তি বলে ব্রহ্মাণ্ডপতি) সাজিয়া বিদ্যারূপে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবিদ্যার সচ্চিদানন্দধাম লক্ষ্যে অনন্ত আকাশকক্ষে অসীম ঊর্দ্ধে ধাবিত হয়, দাবানলের সূক্ষ্ম শিখা সূর্য্য-মণ্ডলে মিশিয়া যায়, কক্ষচ্যুত সৌদামিনী তখন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দঘন-কাদম্বিনীর অঙ্গে বিলীন হয়। মনের এই ভগ্ন পিঞ্জর পাঞ্চভৌতিক দেহটি মাত্র সংসারে পড়িয়া থাকে, মায়ার এই তত্ত্বজ্ঞানাত্মক অবস্থার নামই বিদ্যা। এই বিদ্যাবলে যাঁহাকে লাভ করা যায় তিনিই সেই ভবারাধ্যা সাধকসাধ্যা মহাবিদ্যা। সাধক! তিনিই সংসারে সার্থক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার বিদ্যা লৌকিক অর্থ ধনের জন্য বিড়ম্বিত না হইয়া পরমার্থ-ধন মহাবিদ্যার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। অকূল সমুদ্র সংসারে পড়িয়া যিনি কুলকুণ্ডলিনীর ঘাটে নৌকা বাঁধিতে পারিয়াছেন, জানিও ভবপারান্তর-যাত্রার বিদ্যায় তিনিই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি। তাই বলি সাধক! মা ত তোমার, আমি কি তবে মা-হারা? ত্রিজগতের মা থাকিতেও আমার কি মা নাই? তবে বল মা! তুমি ত সাধকেরই মা। আমি যে মূর্খাদপি মূর্খতম সিদ্ধিসাধন-বিবর্জ্জিত, আমার উপায় কি হইবে? মহাবিদ্যার সন্তান হইয়াও অবিদ্যাঘোরে অন্ধ হইয়া মা! আমি ঘোর মূর্খ, আমার গতি কি হইবে? সংসারের প্রবৃত্তি-ভাটায় এ নৌকা ভাসিয়া যায়, কিছুতেই আর রাখিতে পারিলাম না, নিবৃত্তির উজানে টানিবার সাধ্য নাই—না মা! ভাসিতেও আর পারিল না! একে এই ক্ষুদ্র নৌকা, তায় আবার নয়টি ছিদ্র, অবিরল সমুদ্রের জল উঠিয়া ভরিয়া গেল, আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, এইবার ডুবিলাম, জন্মের মত ডুবিলাম, ধরাধর-কুমারী! মা! আমায় ধর-ধর, এ ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তে আর বল নাই! মা! তুমি একবার ঐ বরাভয়ের উভয় হস্ত বাড়াইয়া দাও, দয়াময়ি! একবার ফিরিয়া চাও! অজ্ঞান অনাথ শিশুর এ অকূল সমুদ্রে মা আমার 'আমার' বলিতে আর

কেহ নাই। মা! কুলকুণ্ডলিনি মাগো! মা হইয়া একবার কোলে তুলিয়া লও। এ নৌকা জন্মের মত ডুবিয়া যাক্। শাস্ত্র বলে, বিদ্যাবলে তোমায় লাভ করা যায়, তাই তুমি মহাবিদ্যা। আমি বলি, অবিদ্য সন্তানকে যদি উদ্ধার করিতে না পার তবে তুমি কিসের মহাবিদ্যা? আমার বিদ্যায় আমি ত ডুবিলাম, এইবার তোমার বিদ্যায় উদ্ধার করিয়া মহাবিদ্যা নামের পরিচয় দাও, এ পাপাত্মার অধঃপাতের বিদ্যার অভিমান ঘুচিয়া যাক্। জয় জননি মহাবিদ্যে! আমার সাধ্য থাক বা না থাক তুমিই জগতে সাধনার সাধ্য ধন।

সাধক! মায়ামূর্ত্তি মনঃশক্তি যখন সংসারপাশ মুক্ত হইয়া সেই মুক্তকেশী মহাশক্তির তত্ত্বলক্ষ্যে ধাবিত হয় তখন তাহার নাম যেমন বিদ্যা, আবার সে তত্ত্ব ভুলিয়া যখন সাংসারিক স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়রসে উন্মত্ত হয় তখন তাহার নাম তেমনই অবিদ্যা। এইস্থানেই শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ মার্কেণ্ডেয় পুরাণে—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥

অপিচ।

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ! জগতঃ পরিপালনম্ ॥
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টি র্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মী র্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মী র্বিনাশায়োপজায়তে ॥
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈ র্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্ ॥

কিঞ্চ—

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমহাত্ম্যমুত্তমং।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া॥
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে॥
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীং।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥

রাজন্! সেই দেবী ভগবতী নিত্যা হইয়াও এই (পূর্ব্বোক্ত) রূপে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করিতেছেন। তৎকর্তৃক এই বিশ্ব মোহিত হইতেছে এবং তিনিই বিশ্ব প্রসব করিতেছেন। তিনিই প্রার্থিতা এবং তুষ্টা হইয়া ত্রি-জগতের ঋদ্ধি এবং বিজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। হে মনুজেশ্বর! মহাপ্রলয়কালে মহামারী স্বরূপা সেই মহাকালী কর্ত্তৃক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে। কালে তিনিই মহামারী, কালে তিনিই সৃষ্টিস্বরূপিণী, আবার কালে সেই অনাদি সনাতনীই সর্ব্বভূতের স্থিতিকারিণী। অভ্যুদয়কালে তিনিই মানবের গৃহে বৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মীরূপিণী, আবার অভাবকালে তিনিই মানবের বিনাশের নিমিত্ত অলক্ষ্মীরূপিণী। (এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবের নিয়তি অনুসারেই যদি তিনি অভ্যুদয় এবং অভাবকালে লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীরূপে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের বিধান করেন, তবে আর উপাসনা কেন? সেই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই আবার বলিতেছেন) তিনি স্তুতা এবং পুষ্প ধূপ গন্ধাদির দ্বারা পূজিতা হইলে সকাম সাধকের পক্ষে বিত্ত ও পুত্রাদি এবং নিষ্কাম সাধকের পক্ষে মঙ্গলময়ী ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আবার বলিয়াছেন, রাজন্! কীর্ত্তনীয় বস্তূত্তম দেবীমাহাত্ম্য এই তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম, যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ ধৃত হইতেছে, সেই দেবী এইরূপ অলৌকিক-প্রভাবা। তৎকর্ত্তৃক মায়া মোহ বিস্তার দ্বারা যেমন জগৎ ধৃত হইতেছে, আবার সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বিদ্যাও (তত্ত্বজ্ঞানও) তদ্রূপই সম্পাদিত হইতেছে। মহারাজ! সেই ভুবনমোহিনী মায়ার প্রভাবেই তুমি এবং এই বৈশ্য ও অন্যান্য বিবেকিগণ মোহিত হইয়াছেন, হইতেছেন এবং ভবিষ্যদ্বিবেকিগণও মোহিত হইবেন। সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও, তিনিই আরাধিতা হইলে মানবের ভোগ স্বর্গ এবং অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করেন। এ স্থানেও ঋষি শক্তিতত্ত্বের দুইটি অংশই লক্ষ্য করিয়াছেন। সংসার-বন্ধন সময়ে মায়ারূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আবার সংসারবন্ধন মোচনের জন্য আরাধনার সময়ে তাঁহার ব্রহ্মরূপেরই নির্দ্দেশ

করিয়া বলিয়াছেন, শরণং পরমেশ্বরীং, সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে, সম্মোহিতং দেবি। সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।

জগদম্বা যখন মায়ারূপে ভুবনমোহিনী সাজিয়াছেন তখনই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ ভেদে নানামূর্ত্তি অবলম্বনে সংসার-নাটকের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক বিষ্কম্ভক প্রভৃতির অভিনয় করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার সেই সকল মূর্ত্তিই বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা ছায়া শক্তি তৃষ্ণা ক্ষান্তি জাতি লজ্জা শান্তি শ্রদ্ধা কান্তি লক্ষ্মী বৃত্তি স্মৃতি দয়া তুষ্টি মাতা ভ্রান্তি মেধা ধরা পুষ্টি প্রভা ধৃতি প্রভৃতি অনন্ত শক্তি। এই সকল মূর্ত্তির মূলশক্তি সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী, আবার মায়ারূপে ত্রিভুবনে তাঁহারই নাম বিষ্ণুমায়া। দেবগণের দৈব-দৃষ্টিতেই এ দৃশ্য শোভা পায়, তাই তাঁহারা শুম্ভনিশুম্ভ-ভয়ভীত হইয়া যখন সেই শম্ভুহৃদয়বিলাসিনীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই প্রথমে 'মায়ারূপে তুমি জগদ্বিধাত্রী' ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে 'রক্ষাকর্ত্রী' বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। তাই স্তবের প্রথমে দেখিতে পাই—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা—ইত্যাদি।

জড়বাদী দার্শনিকগণ এইস্থানে আসিয়াই বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, জীবদেহ-গত এই সকল শক্তিকেই তাঁহারা জড়শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন। দেবগণ বলিয়াছেন, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে, চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা শক্তি বলিয়া অভিহিতা, চৈতন্যরূপে যিনি এই কৃৎস্ন জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। দেবগণ বলিতেছেন, তিনি, চৈতন্যরূপিণী কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম- (একেবারেই নাই) দর্শী দার্শনিক বুঝিতেছেন তিনি জড়, এ জন্য দার্শনিককে আমরা দোষ দিতে পারি না। কারণ দার্শনিকের কথা কখনও প্রমাণ-শূন্য হয় না, বুদ্ধি স্মৃতি ইত্যাদি রূপেও তিনি যদি জড় না হইবেন তবে দার্শনিকের এ বুদ্ধি আসিল কোথা হইতে? তাই দার্শনিক সত্যবাদী, তবে দেবতার চক্ষুতে যাহা চৈতন্য মানুষের চক্ষুতে যদি তাহা জড়ই না হইবে তবে আর দেব দানবে মানবে প্রভেদ কি? একদিকে কান্তিময়-কলেবর শিশুকে দেখিয়া জননীর স্তনদুগ্ধ প্রস্রুত হয়, অন্যদিকে তাহাকে দেখিয়াই শৃগালের লোলজিহ্বা ঘন ঘন স্পন্দিত হয়, তিনি যাহাকে যেমন বৃত্তি দিয়াছেন সে তাঁহার স্বরূপ তেমনই অনুভব করে। মধুকৈটভ-ভয়ভীত ভগবান ব্রহ্মা এই নিদ্রারূপিণী তামসী জড়শক্তির উপাসনা

করিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই চৈতন্য-পরিহারিণী নিদ্রা তখন চৈতন্য-রূপিণী হইয়া চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি অবলম্বনে গগনাঙ্গনে দাঁড়াইলেন। দার্শনিক! যদি আস্তিক হও, যদি দেববাক্যে বিশ্বাস থাকে, তবে একবার যুক্তি প্রমাণ অনুমানে বুঝাইয়া দাও এ শক্তিকে তুমি জড় শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছ কোন্ কারণে? তোমাকে আর কি বলিব? বলি তাঁহাকে মা। তুমি সকল বিভূতি শক্তি একবার বিস্তার আবার সম্বরণ করিয়া সত্যযুগের দৈত্য শুম্ভ নিশুম্ভ নিপাত করিলে, এ সকল কলির দৈত্য আর কতকাল রাখিবে? অথবা দেবদলের মত আরাধনা করিয়া তোমাকে ভূতলে আনিবে এমন সাধক কলিতে আর কে আছে? তাই বলি মা! এমন বলী কবে জন্মিবে? যে দিন এই সকল বলির রক্তে ভারতবর্ষে আবার তোমার পূজার স্রোত বহিবে।

দার্শনিকগণ ত এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন। ইহার পর সাধকবর্গ শুনিয়া চমকিত হইবেন, কথাগুলি মনে করিতেই বোধ হয় যেন নরকের হ্রদে ডুবিতেছি। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম-দৈত্যদল আবার আর এক সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন, বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম উভয়ের সংযোগে শাক্তধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। এই দুঃখেই কবিগণ বলিয়াছেন—

> অধিগগনমনেকা-স্তারকা দীপ্তিভাজঃ,
> প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবং।
> দিশি দিশি বিলসন্তঃ ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ,
> সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্ব্যলোকি॥

সূর্য্যদেব অস্ত গেলে গগনের মস্তকে তারকাও তখন দীপ্তি পান, গৃহে গৃহে প্রদীপও তখন প্রভাব দেখান, আর অধিক বলিব কি? ক্ষুদ্র খদ্যোতের ডিম্ব সকল তাঁহারাও তখন দিগ্‌দিগন্তে বিলাস করেন, এক সূর্য্য অস্ত গেলেই লোকে তখন কত কি না দেখে! যাহা হউক এ সকল কথায় হাসিবার বই উত্তর দিবার কিছু নাই।

আজ ভারতের ধর্ম্মসূর্য্য ভারতরূপ সুমেরু প্রদক্ষিণ করিতেই পার্শ্বান্তরে অন্তর্হিত, তাই অন্ধকারে সুযোগ পাইয়া এ সকল দৈত্য দানব পিশাচের আবির্ভাব। সাধক-সমাজ! আর অধিকক্ষণ নহে, সুমেরুশিখরে তরুণ অরুণ-রশ্মিরেখা দেখা দিয়াছে, সর্ব্বার্থসাধিকা স্বয়ং উত্তরসাধিকা হইয়া ঊর্দ্ধ্বভুজ প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন—মাভৈঃ মাভৈঃ, আর এক মুহূর্ত্তকাল এ মহাশ্মশানে শবসাধনে বীরাসনে বসিয়া অটলভাবে মহাশক্তির মহামন্ত্র জপ কর, তান্ত্রিক জগতের সিদ্ধিসূর্য্য অচিরাৎ উদিতপ্রায়। যাঁহার তন্ত্র তিনি বলিয়াছেন, ন হ্যাস্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি।

বিড়ম্বনার কথা বলিব কত ? মায়াময়ীর মায়াবিভূতিতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া দেবগণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যে সকল স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহারই শেষাংশে গিয়া বলিয়াছেন, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। কিন্তু দেবগণের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের এ তত্ত্বকথা উপধর্ম্মের উচ্চ হৃদয়ে স্থান পায় নাই, চোরের গৃহিণী রাজরাণীর গৃহে গিয়া অলঙ্কার চুরি করিতে পারে কিন্তু গৃহে আসিয়া কোথাকার অলঙ্কার কোথায় পরিবে তাহা যেমন স্থির পায় না, তদ্রূপ সর্ব্বশাস্ত্রের সারসংগ্রহহারী সর্ব্বসমন্বয়কারী ভায়ার দলও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে মায়াব্রহ্মের এই স্বরূপকীর্ত্তনটুকু চুরি করিয়া তাঁহাদের সেই আধ-অগুণ আধ-সগুণ নূতন ব্রহ্মের মাথায় চাপাইয়াছেন। শেষে দেখিয়াছেন—এ কি কথা যে, দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা। সর্ব্বনাশ! ইহা হইতে পারে না, দয়াল পিতা কখনও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত হইতে পারেন না, কেননা উপধর্ম্মের দল বল সকলেই অভ্রান্ত, কেহ ভ্রান্তির ধার ধারেন না, এ জন্য তিনি 'ভ্রান্তিরূপেণ' পাঠটি কাটিয়া 'মঙ্গলরূপেণ' পাঠ বসাইয়াছেন। ব্যুৎপত্তিই বা কত, যেমন ব্রহ্মজ্ঞান তেমনই ছন্দোজ্ঞান। সংসারে যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, যাহা কিছু বীভৎস, যাহা কিছু প্রচণ্ড, যাহা বিপদ, যাহা অন্ধকার, যাহা কিছু দুঃখ শোক রোগ মালিন্য জঘন্য নরক পাতক, সে সমস্ত বাধ দিয়া যাহা কিছু ব্রাহ্মমতে ভাল, কেবল বাছিয়া বাছিয়া সেইগুলি গোছাইয়া লইয়া—নিরাকার শান্তিনিকেতনে নিরাকার নিরাময় নির্-ময় ব্রহ্ম একাকী তূষ্ণীম্ভূত বসিয়া আছেন, আর তাঁহারই চতুষ্পার্শ্বে অনন্ত জগতের অনন্ত জীব নিরন্তর পাপে তাপে শোকে দুঃখে রোগে ভোগে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে, ব্রহ্ম ঈশ্বর বা ভগবান তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না, ঘৃণার ধিক্কারে সে দিকে ফিরিয়াও চাহিতে পারিতেছেন না। বল ভাই ব্রহ্মজ্ঞানিন্! বিশ্বব্যাপী বিশ্বকর্ত্তার পক্ষে ইহা কি একদেশ-স্পর্শিতা নহে? ভাই! ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান কর, ব্রহ্ম শব্দের অর্থটি কি? বৃংহ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই নাম ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহাতে মন্দগুলি নাই, ভালগুলি আছে—কান্নাটুকু নাই হাসিটুকু আছে, নরকটি নাই স্বর্গটি আছে, পাপে তিনি নাই পুণ্যে আছেন। ব্রহ্মও কি কখন এমন পাশঘেসা হইয়া থাকিতে পারেন। যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভাই! ব্রহ্ম নাম বাহির করিয়াছ, সেই আর্য্যশাস্ত্রের ব্রহ্ম আমাদের স্বতন্ত্র পদার্থ, তিনি স্বর্গেও যেমন নরকেও তেমনি, পাপেও যেমন পুণ্যেও তেমনি, প্রবৃত্তিতেও যেমন নিবৃত্তিতেও তেমনি, মঙ্গলেও যেমন অমঙ্গলেও তেমনি, সৃষ্টিতেও যেমন সংহারেও তেমনি, জাগরণেও যেমন নিদ্রাতেও তেমনি, আত্মাতেও যেমন মনেও তেমনি, প্রাণেও যেমন ইন্দ্রিয়েও তেমনি, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে সর্ব্বত্র সমান তিনি, জড় চৈতন্য চিদাভাসে

সর্ব্বত্র তাঁহার অবস্থিতি, বন্ধনেরও কর্ত্রী তিনি, মুক্তিরও বিধাত্রী তিনি—তাই মহিষাসুর-বধের পর দেবগণ যখন দেখিয়াছেন, দেবতার হৃদয়ে তাঁহার আরাধনার বুদ্ধিও তিনি যেমন দিয়াছেন, আবার মহিষাসুরের হৃদয়ে তাহার প্রহারবুদ্ধিও তিনি তেমনই দিয়াছেন; দেবগণের অভ্যুদয়ময়ী স্বর্গলক্ষ্মীরও বিধাত্রী তিনি, মহিষাসুরের মৃত্যুময়ী কালরাত্রিরও কর্ত্রী তিনি, তখনই বলিয়াছেন—

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেম্বলক্ষ্মীঃ,
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা,:
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্‌।

যিনি সুকৃতিগণের ভবনে লক্ষ্মী, পাপাত্মগণের গৃহে অলক্ষ্মী-স্বরূপা, সাত্ত্বিকী ধার্ম্মিকগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, সাধুগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং সংকুলপ্রভব জনগণের লজ্জারূপা, দেবি। সেই তোমার চরণাম্বুজে আমরা প্রণত হইতেছি, বিশ্ব পরিপালন কর। তিনি অবিদ্যারূপে ভ্রান্তিময়ী হইয়া বন্ধন করিতে পারেন বলিয়াই বিদ্যারূপে জ্ঞানময়ী হইয়া আবার বন্ধন মোচন করিতেও পারেন, নতুবা যাঁহার বন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই, মুক্তি দিবার তিনি কে? কারাবাসের অনুমতি করিবেন বিচারপতি আর তাহাকে মুক্তি দিবেন কারারক্ষক, ইহা কখনও হইতে পারে না। কারা প্রবেশের সময়েও তাঁহার যেমন অনুমতির অপেক্ষা, আবার কারামুক্তির সময়েও তাঁহার তেমনই অনুমতির অপেক্ষা। আর্য্যশাস্ত্র এত অন্ধ, এত অবোধ, এত ভ্রান্ত নহেন যে 'তিনি ভ্রান্তিরূপিণী' শুনিলেই আতঙ্কে বিভীষিকা দেখিয়া উঠিবেন। তাই শাস্ত্রে আবার বলিয়াছেন,

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

কারাগারের নিয়ম অনুসারে কারাবাসী কখনও কারাগারের প্রান্ত-ভূমিতে বিচরণরূপ ক্ষণিক মুক্তিলাভ করিতে পারিলেও তাহাতে একান্ত বন্ধনচ্যুতি ঘটে না। কারণ সে অবস্থাতেও হস্তপদে লৌহ-শৃঙ্খল দৃঢ়-সম্বদ্ধই থাকে তদ্রূপ পুণ্যকর্ম্ম-ফলে স্বর্গাদিলোকবাস ঘটিলেও তাহাতে মায়াবন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। মায়াময় বন্ধনের উপকরণ ত্রিগুণরজ্জু যাঁহার হস্তে অবস্থিত সেই ত্রিগুণময়ী মহামায়া স্বয়ং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বন্ধন খুলিয়া না দিলে কাহার সাধ্য জগতে তাহাকে মুক্ত করে? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী' অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও নিজ নিজ মায়াবন্ধন ছেদন জন্য যে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন তিনিই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা কান্তি স্মৃতি মেধা ধৃতি প্রভৃতি জীবদেহগত যে সকল শক্তিকে স্থুল দৃষ্টিতে আপাততঃ জড় শক্তি বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ ইহার কোন শক্তিই জড় নহেন। আলোক যেমন অন্ধকার হয় না, শক্তিও তদ্রূপ কখন জড় হইতে পারেন না। তবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির অংশবিশেষে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগ অনুসারে তারতম্য হয় এইমাত্র। যথা, দয়া শান্তি কান্তি লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা ইত্যাদি শক্তিসকল সত্ত্বগুণ-প্রধানা, কাম ক্রোধ লোভ যত্ন মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি বৃত্তি-শক্তিসকল রজোগুণ-প্রধানা, আবার মোহ আলস্য ভ্রান্তি তন্দ্রা নিদ্রা প্রভৃতি শক্তিসকল তমোগুণ-প্রধানা। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী শক্তিসকল নিয়তই প্রকাশ এবং চৈতন্য-স্বভাবা। তামসী শক্তিসকল নিয়তই অপ্রকাশরূপা এবং জড়বৎ মোহমূর্চ্ছাময়ী। রাজসী শক্তিসকল প্রকাশ অপ্রকাশ ও জড় চৈতন্য উভয় ভাবের সংমিশ্রণময়ী। উক্ত তামসী শক্তি দেখিয়া মানব তাহাকে অনায়াসে জড়শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে কিন্তু একবারের জন্যও ইহা চিন্তা করে না যে, এ শক্তির আবির্ভাব কোথা হইতে? অদৃষ্টের ফলে জীবের দেহ-ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ ভোগের নিত্য সম্বন্ধ, জীবদেহের ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণবৃত্তি সমস্তই সেই ভোগানুকুল ব্যবস্থায় বিহিত, এ জন্য আহারেরও যেমন আবশ্যক নিদ্রারও তেমনই প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুসারে যেমন তিনি জীবরূপিণী, যেমন জীবের ভোগ-রূপিণী তেমনই আবার নিদ্রারূপিণী। নিদ্রার মূলে যদি চৈতন্যরূপিণী না থাকেন তবে এ নিদ্রা কাহার নিয়োগে নিয়োজিত? চন্দ্রে জ্যোৎস্না, সূর্য্যে প্রভা, অনলে দাহিকা, অনিলে গতি, জলে শীতলতা, পৃথিবীতে গন্ধ—এ সকল শক্তি সাধারণ দৃষ্টিতে জড় বলিয়া বুঝিলেও বস্তুতঃ ইহা জড় নহে—জড়ের অভিনয় মাত্র, স্বরূপতঃ এ সকল শক্তিকে জড় বলিয়া স্বীকার করিলে নাস্তিকতা আর অধিক দূরে নহে, কারণ বস্তুশক্তির স্বতঃসম্ভব আর স্বভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার একই কথা। আস্তিকের দৃষ্টিতে চৈতন্যময়ী মায়ের রাজ্যে স্বরূপতঃ জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। আমরা যাহা কিছু জড় বলিয়া জানি, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিন্ময়ীর চৈতন্যচ্ছটা বই, আর কিছুই নহে। কেবল ত্রিগুণাত্মক জগতের উপযোগিতা অনুসারে নীল কাচ-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তমোময় আলোকে আলোকিত এইমাত্র। বিশেষ এই যে, সূর্য্যরশ্মি এবং কাচ পরস্পর বিভিন্ন কিন্তু এ আলোকে সূর্য্য রশ্মি এবং কাঁচ তিনিই এক পদার্থ। মূলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বৃক্ষে তিনি মায়াময়ী, পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী, আবার ফলে তিনিই মুক্তিময়ী। ব্রহ্ম ঈশ্বর মায়া অবিদ্যা—এই চারি তাঁহারই স্বরূপ। একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দলীলার অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনিই তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব

হইয়া আপনিই তিনি বিলাসিনী। আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল-যুবতী, আপনি রতি মতি গতি, পরমানন্দনন্দিনী। আপনি মায়া, আপনি অমায়া, আপনি মায়ারূপিণী ; আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি সাধ্যা সনাতনী। বেদ-বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তিনিই তাঁহার এই অদ্বৈত-বিভূতির বিস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সাধক সেই শাস্ত্রীয় আস্তিক-দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়রূপে ব্রহ্মাণ্ডলীলা দেখিয়া কি বন্ধনে কি মোচনে উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন। জগতে দেখে মায়ার বন্ধন, তিনি দেখেন মায়ের বন্ধন, বন্ধন তখন তাঁহার সোহাগ এবং অভিমান, তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া আদরে মায়ের কোলে বসিয়া বন্ধনবদ্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া গদ-গদ স্বরে বলিতে থাকেন, মা! তুই বড় পাগলী মেয়ে। তাই মত্ত সাধক নীলাম্বর উন্মত্তা মাকে বলিয়াছেন, 'সাধে কি তোয় বলি কালি! (ও তুই) ছিলি বাজীকরের মেয়ে। নইলে, ভুবন ভুলিয়ে রেখেছিস্ একটা মায়া-ভেল্কী লাগিয়ে দিয়ে'? আবার শান্ত সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন—

সেই কথা আমারে বল,
তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল ॥
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারেও কর পরিত্রাণ,
কারেও অবিদ্যায় আবৃত করে, মোহগর্ত্তে টেনে ফেল।
যে সদানন্দ, তারে কেন নিরানন্দ হ'তে হল ?
জীব মাত্র শিব বটে, এ কথা অনেকে রটে,
কমলাকান্তের কালি! মনের কথা মায়ে বলি,
কারো সুখের উপরে সুখ, কারো দুঃখে জনম গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার কথা এইমাত্রই আছে যে—

মায়াতীতাং মায়িনীং বিশ্বমায়াং,
নিত্যাং শুদ্ধাং নিষ্কলাদ্বৈতরূপাং।
পুনর্ম্মায়য়া বিশ্বনিস্তারহেতুং,
প্রপদ্যে সদা ত্বাং ভবাম্ভোধিসেতুম্ ॥

শক্তিতত্ত্বের এই বিদ্যা অবিদ্যা এবং পরমা, এই বিভাগত্রয় না বুঝিয়া মায়াশক্তি এবং ব্রহ্ম-শক্তির অবান্তর ভেদ না জানিয়া যাঁহারা শক্তি নাম শুনিলেই মায়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন তাঁহাদিগকে অন্য প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন ; তাঁহাদের সেই মায়া এবং মায়াবী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। হিমালয়-গৃহে জগৎ-প্রসূতী মেনকার প্রসূতিরূপে আবির্ভূতা হইলে তাঁহার সেই কোটিসূর্য্যপ্রভাময়ী চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা বিশালাক্ষী অষ্টভুজা মূর্ত্তিদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট গিরিরাজ ধরাতলে

মস্তক প্রণত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদ বচনে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগবতে ভগবতীগীতায়াং—

কা ত্বং মাত বিশালাক্ষী চিত্ররূপা সুলক্ষণা।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাম্ ॥

মাতঃ! বিশালাক্ষী সুলক্ষণা এই আশ্চর্য্যরূপা তুমি কে? বৎসে! আমি স্বরূপতঃ তোমাকে জানিতে পারিতেছি না, তোমার যথাযথ তত্ত্ব তুমি স্বয়ং আমাকে বল। হিমালয়ের এই প্রশ্নের পর দেবী উত্তর করিতেছেন—

জানীহি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বরকৃতাশ্রয়াং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্য-বিজ্ঞানমূর্ত্তিং সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকাং।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাম্ ॥
অহং সর্ব্বান্তরস্থা চ সংসারার্ণবতারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতি চ ॥
যুবয়োস্তপসা তুষ্টা পুত্রীভাবেন ভাবিতা।
জাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব ॥

মহেশ্বর কর্ত্তৃক কৃতাশ্রয়া শাশ্বত ঐশ্বর্য্য এবং বিজ্ঞানঘন-মূর্ত্তি, সর্ব্বপ্রবৃত্তি-কারণরূপা সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের বিধাত্রী, জগজ্জননী পরমা শক্তি বলিয়া আমাকে জান। আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিনী সংসারার্ণবতারিণী নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপা এবং ঈশ্বরী। পিতঃ! তোমার এবং মাতা মেনকার তপঃপ্রভাবে পরিতুষ্টা এবং কন্যারূপে আরাধিত হইয়া তোমাদের বহু ভাগ্যবশতঃ তোমার গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম। এস্থলেও তিনি মায়ার অতীতা পরমা শক্তি বলিয়াই আত্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে জন্মান্তর-তত্ত্বে বলিয়াছেন—

ততো মন্মায়য়া মুগ্ধ-স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।

অর্থাৎ জীব মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই সকল গর্ভবাস জন্য যাতনা বিস্মৃত হইয়া যায়। পুনশ্চ—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেককারণম্ ॥
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভি-স্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে ॥

কিঞ্চ—

এবং সর্ব্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ং।
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া।
যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

তাত! দেহবন্ধ-বিমুক্তির নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ কর্তৃক আমার নিষ্কল সূক্ষ্ম, বাক্যের অতীত সুনির্ম্মল নির্গুণ পরমজ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টি স্থিতি সংহারের একমাত্র কারণ নির্ব্বিকল্প নিরারম্ভ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ ধ্যেয়।

মহারাজ! আমার মায়া-প্রভাবে মোহিত হইয়াই জীবগণ আমার এই সর্ব্বগত অদ্বৈত পরম অব্যয় রূপ জানিতে পারে না, কিন্তু যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে তাহারাই এ মায়ারূপ অপার পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এতভিন্ন হিমালয় নিজেও বলিয়াছেন—

নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি! তুভ্যং নমঃ।

তোমার পরমা মায়া প্রভাবে আমাকে আর মুগ্ধ করিও না, বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে প্রণাম। দেবীভাগবত প্রভৃতিতেও এইরূপই কথিত হইয়াছে। এখন মায়াবাদিগণ বলুন, শক্তি যদি স্বয়ং মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহেন তবে তিনি আবার আমার মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কোন মায়াকে? মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ত্রয়োদশোল্লাসে—

দেব্যুবাচ। মহদ্যোনেরাদিশক্তে র্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্॥
রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহত্তত্ত্বাদিরও উৎপত্তির নিদানরূপা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতা মহাদ্যুতি আদিশক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ হইল কিরূপে? যাহা কিছু প্রকৃতির কার্য্য তাহাতেই রূপ সম্ভবে, কিন্তু তিনি ত প্রকৃতিতত্ত্বেরও অতীতা সাক্ষাৎ পরাৎপরা; দেব! আমার এই সংশয় বিশেষরূপে ছেদন করুন। এখন তিনি যদি কেবল প্রকৃতিরূপা, তবে আবার প্রকৃতি-সম্ভব রূপ তাঁহাতে অসম্ভব বলিয়া দেবী আশঙ্কা করিলেন কেন? কুলার্ণবে—

পশ্যন্নপি ন পশ্যেৎ স শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ॥

মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন, যে তোমার মায়ায় বিমোহিত হয়, সে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, পাঠ করিয়াও তত্ত্ব জানিতে পারে না। এস্থলেও দেবী যদি মায়ারূপা, তবে মহাদেব আবার তোমার 'মায়া' বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? শাস্ত্র বলিতেছেন, তিনি মায়া, মায়াময়ী এবং মায়াতীতা। মায়াবাদিন্! মায়ার মায়া ভুলিয়া গিয়া একবার মায়ের মায়ায় মুগ্ধ হও! এ মায়াকে শুধু মায়া না বুঝিয়া মায়ের মায়া বুঝিয়া লও, মায়ের মায়াময় খেলা দেখিয়া মায়ার মাধুর্য্যে ডুবিয়া যাও, এই মায়া আছে বলিয়াই মা আমাদের মা

হইয়াছেন। এই মায়া আছে বলিয়াই আমরা মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে উঠিতে যাই। এই মায়াবাদ লক্ষ্য করিয়াই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে, 'বেদ বলে বৃথা চেষ্টা সকলি ভাই, মায়া। তন্ত্র বলে মায়ার মধ্যে হাসে মহামায়া। (এ যে মায়ের মায়া)।' সংসারে যে মায়া কেবল বন্ধনের কারণ বই আর কিছুই নহে, একটু বিবিক্ত দৃষ্টিতে দর্শন করিলে সেই মায়াই তখন আনন্দের নন্দনবন-শোভা বলিয়া বোধ হয়। সাধক! যে মায়ার আকর্ষণে সংসারে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রেমে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হই সেই মায়ার অবলম্বনেই মায়াময়ী মায়ের প্রেমে আসক্ত হইলে কি মুক্ত হইবার কথা নাই? এই মায়া আছে বলিয়াই উপাস্য-উপাসক ভেদ রহিয়াছে, মায়ে পোয়ে, ভক্তে ভগবানে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে—এই মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া গেলে সংসারে যেমন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির সম্বন্ধ ছুটিয়া যাইবে, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধও তেমনই ঘুচিয়া যাইবে। তাই ভক্তের প্রাণে ভয় হয়, মায়া যদি ঘুচিয়া যায় তখন মা বলিব কি উপায়ে? জ্ঞানী মায়া ত্যাগ করিতে চাহিলেও ভক্ত সংসারের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া অন্তরে অন্তরে অতিগোপনে অতিসন্তর্পণে মায়ের মায়া পোষণ করেন, মায়ার সংসার ছাড়িয়া দিয়া মায়ের সংসারে প্রবেশ করেন; যে সংসারের সাংসারিকগণ নিয়ত গাহিয়া থাকেন—

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো ভৈরবাঃ সর্ব্বে ভবনং ভুবনত্রয়ম্ ॥
মা আমাদের পার্ব্বতী, পিতা দেব মহেশ্বর।
ভাই আমাদের ভৈরব সব, ত্রিভুবন আপন ঘর ॥

কিন্তু কি জানি, মায়ের মায়াবিরোধী নামের দোষে যদি এ মায়া ঘুচিয়া যায়, তখন ত আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় থাকিবে না। তাই ইচ্ছা হয়, এই বেলা সময় থাকিতে প্রাণ ভরিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া লই—কি জানি যদি মায়ে-পোয়ে দেখা হইলে তখন আর মা বলিবার অবসর নাই থাকে, তবে ত এইবারেই আমার জন্মের মত মা বলা ফুরাইল। তাই গীতাঞ্জলি কাঁদিয়া বলিয়াছে—

গেল এ দিন আর ত রহে না।
মা! কত দিন আর স'ব? ভববন্ধন-যন্ত্রণা।
মায়াময় এ সংসারে, মা! আমায় মায়াঘোরে,
ঘুরাও কত বারে বারে, বিদরে প্রাণ আর সহে না।
সংসারে সকলি মায়ায় যদি, তবে দে মা আমায়,
সেই মায়া, সন্তান যে মায়ায়, মা বই আর কিছু জানে না।
খুলে দে এ মায়াগুণে, বাঁধ মা সেই মায়াগুণে,
যে মায়াগুণের গুণে, মায়াগুণ আমায় ছোঁবে না।

ত্রিগুণ আগুন ঠেলে ফেলে, ধর্ মা আমায়, কর্ মা কোলে,
জন্মের মত মা মা ব'লে, এই ডে'কে নেই আর ডাক্‌ব না।
প্রাণ জ্বলে যায় দারুণ ক্ষুধা, দে মা তোর্ ঐ স্তন্য সুধা,
তাপানল দাবানল সদা, সে সুধা বই নিভিবে না।
সুধা পেলে সুধাই কি না, শিবে আর সে ভয় ক'রো না,
হাবা মেয়ে, তাও জান না? খেলেও সুধার ক্ষুধা যায় না।

শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পৌরাণিক প্রমাণের যে কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শক্তিই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী এবং হর্ত্রী কর্ত্রী বিধাত্রী, তিনিই একমাত্র পরমা প্রধানা এবং জগদারাধ্য দেবগণেরও পরমারাধ্যা। এতাবর্তা শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য ইহা মনে করিবেন না যে, তবে বুঝি শিব বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ ইহাঁরা কোন কর্ম্মেরই নহেন। বস্তুতঃ পঞ্চোপাসনার উপাস্য দেবতার মধ্যে সকলেই সমান-শক্তিময়, কাহারও কোনরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। ঋষিগণ যখন যে পক্ষের সাধকের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রগাঢ় করিবার নিমিত্ত যে পুরাণে যে দেবতার স্বরূপলীলাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন তখন সেই পুরাণ-প্রতিপাদ্য দেবতার মহিমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি, দেবী-ভাগবত স্কন্দপুরাণ কালিকাপুরাণ কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতিতে পূর্ব্বাংশে শিব শক্তি বা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আবার অপরাংশে বিষ্ণু শক্তির বা শিবের মাহাত্ম্য এরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন উভয় অংশ পরস্পর বিরোধী। এ বিরোধ কেবল আমাদেরই ভেদজ্ঞানময় মানবদৃষ্টিতে, মহর্ষিগণের অভেদ-তত্ত্বময় দৈব-দৃষ্টিতে ইহাতে কোন বিরোধের লেশও স্থান পায় নাই। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন 'কালী' বা 'শিব' বলিয়া যাঁহার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছি তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু, আবার বিষ্ণু বলিয়া যাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেছি তিনিই স্বয়ং কালী বা শিব। তাই ইহাতে বৈষম্য, প্রাধান্য, অত্যুক্তি বা মিথ্যাবাদ বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। প্রত্যক্ষ-ব্রহ্মবিভূতিদর্শী মহর্ষিগণ দৈব-দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন, পঞ্চোপাসকের কৈবল্য-কল্যাণ কামনায় স্ব স্ব উপাস্য দেবতার লীলাকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কেবল সেই সেই বিভূতিই প্রকটিত করিয়াছেন। 'পঞ্চোপাসনার সমন্বয়' প্রকরণে এ বিষয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এক্ষণে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে যে স্থলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, সাধকগণ অনুসন্ধান করিলে আবার সেই সেই স্থলেরই অব্যবহিত পরে বা পূর্ব্বে পূর্ব্বে শিব বিষ্ণু প্রভৃতিরও এইরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে তন্ত্রতত্ত্বের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান দেওয়া কঠিন, বিশেষতঃ সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। কেবল শক্তিকে যাঁহারা মায়া জড় অবিদ্যা পরমবৈষ্ণবী ইত্যাদি

উপাধি দিয়া মহাবিদ্যার বিদ্বেষে বিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই সকল অকালপ্রসূত অবিদ্যাগর্ভভূত মাতৃদ্বিট্‌ সম্প্রদায়ের বিদ্যা বুদ্ধি সাধকবর্গের বিদিত করিবার জন্যই জগন্মাতার তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লিখিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত 'শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে' ইহা তন্ত্রশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত, আপাততঃ স্থূলদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তটি দেখিলে ইহাই বোধ হয় যেন শক্তি ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই নির্ব্বাণ মুক্তিদাতৃত্ব নাই। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র যে উদ্দেশে যে প্রণালীতে এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন তদনুসারে বুঝিলে সে রূপ বোধ হইবার কোন কারণ নাই। অতএব শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহারই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথা এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। কুব্জিকাতন্ত্রে প্রথমপটলে—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি! ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥ ১
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥ ২
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি! রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥ ৩
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্॥ ৪

ব্রহ্মাণীই সৃষ্টিকর্ত্রী, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। অতএব মহেশ্বরি! ব্রহ্মা প্রেত (শবদেহমাত্র) তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ১॥ বৈষ্ণবীই রক্ষাকর্ত্রী, বিষ্ণু জগতের রক্ষক নহেন। অতএব মহেশ্বরি! বিষ্ণু প্রেত, তাহাতে সংশয় নাই॥ ২॥ রুদ্রাণীই সংহারকর্ত্রী, রুদ্র কখনও সংহারকর্ত্তা নহেন। অতএব মহেশ্বরি! রুদ্র প্রেত, তাহাতে সংশয় নাই॥ ৩॥ শক্তি-অংশ ত্যাগ করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সকলেই জড়, কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে সকলেই নিজ নিজ কার্য্যসাধনে অক্ষম ইহা ধ্রুব নিশ্চিত॥ ৪॥

এক্ষণে সেই শক্তি পদার্থের স্বরূপ কি, ইহাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বড়ই বিষম কথা এই যে, সর্ব্বশাস্ত্র যাঁহার সর্ব্বপ্রকার স্বরূপ-নির্দ্দেশের চরম সীমায় আসিয়া 'শক্তি' এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রণাম করিয়া একান্ত অবসর লইয়াছেন, আমরা সেই শক্তিরূপ স্বরূপের আবার স্বরূপ নির্দ্দেশ করি কি উপায়ে?

রসের পরিপাক গুড়॥ ১॥ গুড়ের পরিপাক শর্করাসৈকত (দ'লো)॥ । শর্করাসৈকতের পরিপাক সিতশর্করা (সাদা চিনি)॥ ৩॥ সিতশর্করার পরিপাক সিতোপল (মিছরি)॥ ৪॥ সিতোপলের পর ত আর রসের কোন পরিপাক নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মের পরিণাম ব্রহ্মাণ্ড॥ ১॥ ব্রহ্মাণ্ডের পরিণাম মায়া॥ ২॥ মায়ার পরিণাম ঈশ্বর॥ ৩॥

ঈশ্বরের পরিণাম শক্তি ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ কারণে কি আছে না আছে তাহা জানিতে হইলেই প্রথমতঃ কার্য্যে কি আছে না আছে তাহা দেখিতে হইবে, ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইলেই প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ জগতের আদ্যন্ত মধ্য বিচার করিলে তাহার একমাত্র শেষ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইবেন 'মায়া' ॥ ২ ॥ মায়ার মূলতত্ত্ব বুঝিতে গেলেই তাহার লক্ষ্য হইবেন মায়াবী ঈশ্বর ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরের মূল স্বরূপ জানিতে হইলেই তাহার লক্ষ্য হইবেন শক্তি ॥ ৪ ॥ শক্তির পর ত আর তত্ত্ব-বিচার নাই, সকলের স্বরূপ শক্তি কিন্তু শক্তির স্বরূপ, শক্তি বই আর কিছুই নহে। যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক সূর্য্য কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশক স্বয়ং সূর্য্য বই আর কেহই নহে। যাহা হউক তথাপি বৃক্ষের ফল কুসুম পত্র পল্লব কাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিয়া বীজশক্তির অনুমানের ন্যায় তাঁহার নিত্যলীলা-নিকেতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-প্রক্রিয়া দেখিয়া আমরা তাঁহার তত্ত্বমন্দিরের তন্ত্রকবাট উদ্ঘাটিত করিতে অগ্রসর হইলাম। প্রার্থনা করি, বিশ্বজননী তাঁহার স্বপ্রকাশরূপ প্রদীপটি হস্তে লইয়া মাতৃহারা সন্তানগণকে স্ব-স্বরূপের পথ-প্রদর্শন করিয়া কোলে তুলিয়া লউন।

শক্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'শক্তি' এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শক্ ধাতুর অর্থ শক্তি যেমন গম্ ধাতুর অর্থ গতি। দার্শনিকগণ বিচার দ্বারা শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন, সে ত পরের কথা। বৈয়াকরণ মহাশয় শক্তি পদের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া এইস্থানেই হতবুদ্ধি হইয়া আরম্ভেই উপসংহার করিয়াছেন। শক্ ধাতুর অর্থও শক্তি, ভাববাচ্যের অর্থও ধাতুরই স্বরূপ। সুতরাং তাহাও শক্তি, আর প্রকৃতি প্রত্যয় উভয়ের সংযোগে পদ নিষ্পন্ন হইল তাহাও শক্তি। তবেই এক্ষণে বলিতে হইতেছে, বৈয়াকরণ মহাশয় শক্তি শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন—শক্তি শক্তি শক্তি, যেন ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন 'দোহাই ধর্ম্মের, শক্তির অর্থ—শক্তি শক্তি শক্তি। সাধকগণ এক্ষণে বুঝিয়া লইবেন, যাহার পদের ব্যাখ্যাই এতদূর আসিয়াছে তাহার পদার্থের ব্যাখ্যা না জানি কতদূরেই যাইবে। দার্শনিকের চক্ষে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বলিয়া পরিগণিত কিন্তু বৈয়াকরণের পক্ষে উহাই জীবনরক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়া অবলম্বিত। বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য ব্যবহারের অনুকূলে বস্তুর স্বরূপ-রক্ষা, দার্শনিকের উদ্দেশ্য বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুব্যাখ্যা বৈয়াকরণ সহজ কথায় বলিলেন গম্ ধাতুর অর্থ গতি, দার্শনিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে তাহারই অর্থ করিলেন "পূর্ব্বদেশাবচ্ছিন্ন-সংযোগাভাব-সহকৃতোত্তরদেশাবিচ্ছিন্ন-সংযোগানুকূল-ব্যাপারবিশেষো গমনং"—অর্থাৎ পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানের সহিত সংযোগের নাম গমন। শব্দটি ছিল 'গতি' এই দুইটি অক্ষর মাত্র, কিন্তু এই দুই অক্ষরের ব্যাখ্যা হইল ৩৫টি অক্ষরে, ইহার পর ইচ্ছা করিলে আরও পাঁচ সাত দশটি ত্বত্বাবচ্ছিন্ন বসান যাইতে পারে—এত চেষ্টার ফল হইল কি না—বৈয়াকরণ যদি

দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করেন 'ভোজন করিলে'? হয়ত অবশ্য তাঁহাকে উত্তর করিতে হইবে 'অন্ন গমন করাইলাম'—অর্থাৎ অন্নকে পাত্র পরিত্যাগ করাইয়া উদরসাৎ করিলাম। আবার সেই অন্ন যখন উদর পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইতে চলিল, (বমন) তখনও পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ এবং অপর স্থানের সংযোগ লইয়া যদি ব্যবস্থা করিতে হয় তবেই ত বিষম বিভ্রাট। এত টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যার পরিণামেও ভোজন গমন বমন একই দাঁড়াইল। এই সকল বিভ্রাট বারণের জন্যই সুচতুর দার্শনিক বলিয়াছেন "ব্যাপারবিশেষঃ"—অর্থাৎ পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর স্থানের সংযোগ-ব্যাপারমাত্রকেই তুমি 'গমন' বলিতে পারিবে না. ব্যাপার-বিশেষকে গমন বলিতে হইবে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে বিশেষটি কি? তাহা হইলেই দার্শনিক মহাশয় দেখাইয়া দিবেন, পদ দ্বারা অন্যস্থান স্পর্শ করিলে তাহার নাম 'গমন'। তাহা হইলে পদাঘাতের নামও 'গমন' হইয়া উঠে—অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে লোকে যাহাকে বলে গমন, তাহারই নাম গমন। তবেই গমনের অর্থ গতি, গতির অর্থ গমন। এই মরণ পরে মরিতে হইবে বলিয়াই বুদ্ধিমান বৃদ্ধ বৈয়াকরণ পূর্ব্বেই মরিয়া বসিয়া আছেন—সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন, গমনের অর্থ গতি।

কিন্তু দার্শনিক তাহা সহজে শুনিবেন কেন? শেষে তিনিও সেই মরণই মরিলেন. অধিকন্তু ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া। ইহারই নাম অতিবুদ্ধি। সেই ইতরেতরাশ্রয় বই গতি নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত করাই দার্শনিকের বিদ্যা; তাই বুঝিতে হইবে, বাচাল দার্শনিক আর বস্তুতত্ত্ববিৎ সাধক এক পদার্থ নহেন। সাধনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সিদ্ধিলাভ আর দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব দৃষ্টি-বিস্ফোরণ মাত্র। তাই উপস্থিত শক্তিতত্ত্ব-বিচারে আমরা দর্শনশাস্ত্রের সংশ্রব না রাখিয়া সাধন-শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইলাম। কারণ কোটি কোটি দর্শন অদর্শন হইলেও সাধন শাস্ত্রের একটি বিন্দু বা মাত্রাও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। যাহা হউক, ব্যাকরণ অনুসারে আমরা যাহা বুঝিতেছি তাহাতে গতির ন্যায় শক্তিকেও শক্তি ভিন্ন আর কোন বিশেষণ দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। সাধারণ ভাষায় আমরা শক্তি শব্দের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই তাহাতে ধীশক্তি মেধাশক্তি স্মৃতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রাণশক্তি ইত্যাদি শক্তির বিশেষণসমূহ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বিশেষ বিশেষ স্থানে শক্তির প্রকাশ হইলেই ঐ সকল বিশেষ বিশেষ নাম হয় এইমাত্র। ফলতঃ শক্তি পদার্থ যাহা তাহা স্বরূপতঃ এক ভিন্ন দুই নহে। এই সকল শাখা পল্লব ফল কুসুম স্থানীয় শক্তির মূল কি? কোন্ শক্তির অন্তর্ভাবে এ সকল শক্তি তিরোহিত হয় আবার কোন্ শক্তির প্রভাবেই বা এ সকল শক্তি আবির্ভূত হয় তাহার অনুসন্ধানে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মাই এই সকল শক্তির মূল।

এখন এই আত্মা পদার্থ কি তাহাও বুঝিবার বিষয় হইয়াছে। কিন্তু একদিকে একদল আস্তিক আছেন যাঁহারা উপনিষদের মুখে আত্মার নাম শুনিলেই 'নির্গুণ ভূমা' বলিয়া ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, অন্যদিকে আর একদল নাস্তিক আছেন যাঁহারা আত্মার নাম শুনিলেই 'অলীক কল্পনা' বলিয়া খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। এই দুই দলের করাতের ধারে উনবিংশ শতাব্দীর আত্মা সূক্ষ্ম হইতে হইতে প্রায় 'নাই' হইয়া উঠিয়াছেন। তবে নিতান্তই আত্মার আত্মা বলিয়া এখনও একেবারে অভাবে পরিণত হয়েন নাই। তাই এ সময়ে আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে হইলেই এই দুই দলের হাত ছাড়াইয়া আত্মাকে একটু স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দেখিতে হইবে। দ্বৈত দৃষ্টিতে কার্য্য এবং কারণ দুই পদার্থ হইলেও অদ্বৈত দৃষ্টিতে একই পদার্থ। যাহা কার্য্য তাহাই কারণ, যাহা কারণ তাহাই কার্য্য। কেননা, কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে থাকে না, কার্য্যে যাহা নাই তাহাও কখন কারণে থাকে না। যে শক্তি বীজে নাই তাহাও কখন বৃক্ষে স্ফুরিত হয় না, যে শক্তি বৃক্ষে স্ফুরিত হয় না তাহাও কখন বীজে থাকে না। বীজ ও বৃক্ষের সমন্বয় করিলে ইহাই শেষ দাঁড়ায় যে, শক্তির অন্তর্ভূত অবস্থাই বীজ এবং প্রকটিত অবস্থাই বৃক্ষ। তদ্রূপ প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহ মনে যে সকল শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়, ইহাও সেই বীজভূত মহাশক্তি আত্মারই প্রকটিত অবস্থা মাত্র। আত্মাতে শক্তি নিহিত আছেন, ইহা কেবল মানুষের স্থূলবুদ্ধিকে বুঝাইবার কথা মাত্র। স্বরূপতঃ শক্তিই আত্ম-স্বরূপে বা আত্মাই শক্তি-স্বরূপে অবস্থিত আছেন, ইহাই শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে, ইহা কেবল ভাষার ব্যবহার মাত্র। অগ্নিই দাহিকাশক্তি-স্বরূপে অবস্থিত অথবা দাহিকাশক্তিই অগ্নিরূপে আবির্ভূত—ইহাই তত্ত্বকথা। তুমি আমি স্থূল দৃষ্টিতে অগ্নির ভৌতিক স্থূলরূপ মাত্র দেখিতে পাই, তাই শাস্ত্র সেই সহজপ্রত্যক্ষ রূপকেই অগ্নি বলিয়া দাহিকা শক্তিকে তাঁহার শক্তি বলিয়া বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ভৌতিক রূপাংশ ত্যাগ করিলে পরমার্থতঃ একমাত্র শক্তি ভিন্ন অগ্নির স্বরূপ আর কিছুই থাকে না। যেমন সাংসারিক পুরুষের ভাষায় 'আমার আত্মা,' বস্তুতঃ 'যাহা আত্মা তাহাই আমি' হইলেও স্থূলদেহে আত্মাভিমান করিয়া তুমি আমি যেমন বলিয়া থাকি, আমার আত্মা অর্থাৎ আমার এই স্থূল দেহে অবস্থিত আত্মা, এস্থলে দেহাংশ ত্যাগ করিলে আত্মার স্বরূপ একমাত্র শক্তি বই আর কিছুই নহে। কারণ আত্মার শক্তি বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই। যাহা আত্মা তাহাই শক্তি বা যাহা শক্তি তাহাই আত্মা। শাস্ত্রে বহুস্থানে আত্মার শক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সে সমস্তই আত্মার স্বরূপকথন মাত্র। যেমন গঙ্গার জল, রাহুর মস্তক, সূর্য্যের প্রভা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ইত্যাদি। বস্তুতঃ যাহা জল তাহাই গঙ্গা; যাহা মস্তক তাহাই রাহু, যাহা প্রভা তাহাই সূর্য্য; যাহা জ্যোৎস্না তাহাই চন্দ্র; তথাপি লোক-ব্যবহারে শক্তির প্রভাব প্রদর্শন জন্য যেমন তাঁহাতে তাঁহার ভেদ কল্পনা করিয়া গঙ্গার জল

ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হয়, তদ্রূপ যাহা শক্তি তাহাই আত্মা হইলেও শাস্ত্রকারগণ শক্তিতত্ত্ব মানবের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অনেকস্থলে আত্মার শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্তবাদে সকলেই একবাক্য হইয়া সমস্বরে বলিয়াছেন "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ", শক্তি এবং শক্তিমানে কিছুমাত্র ভেদ নাই ; কিন্তু ভেদ না থাকিলেও এই অভেদ প্রতিপাদনের সময়েও ভেদজ্ঞানীকে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে "শক্তি-শক্তিমতোঃ" শক্তি এবং শক্তিমান এই উভয়ের। অন্যথা উভয় না হইলে ভেদ থাকে না, ভেদ না থাকিলেও অভেদ-প্রতিপাদন হয় না।

আরও একটু ভাবিবার কথা আছে। যে আত্মা লইয়া এত বিচার বিবাদ বিসম্বাদ সে আত্মার স্বরূপ কি, কেন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি, এ অংশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—জীবের শরীরটি অচেতন, ইন্দ্রিয়গুলি অচেতন, মনটিও প্রায় তদ্রূপ, চৈতন্যের কিছু অংশ তাঁহাতে থাকিলেও তিনি কেবল আত্ম-নির্ভরে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহেন। এই সকল পরাধীন বস্তু কাহার অধীনতায় অবস্থিত তাহা বিচার্য্য বিষয়। কেনোপনিষদে এই বিষয়টিই প্রশ্নরূপে পরিস্ফুটভাবে মীমাংসিত হইয়াছে যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি কাহার প্রেরিত হইয়া স্ব-স্ব কার্য্য-সাধনে সমর্থ হয় ? যিনি চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তাঁহার স্বরূপ কি ? যিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, এ সকল আছে, কিন্তু 'আত্মার আত্মা' এ বিশেষণটি নাই—কারণ প্রথমেই আত্মতত্ত্বের নির্ণয় হইলে শেষে আর 'কাহার প্রেরিত হইয়া ?' এরূপ প্রশ্ন হয় না, কেননা, সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ, তাহাই চরম, তাহাই গন্তব্যের শেষ সীমা। যাহা হউক এই সকল 'কেন—কেন ?' প্রশ্নের পর—জীবদেহের ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ প্রভাবে জগতের অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছেন এবং অসুর-সংগ্রামে বিজয় জন্য অহঙ্কারে নিজ নিজ স্পর্দ্ধা করিতেছেন। তৎকালে সহসা তাঁহাদিগের সম্মুখে কোন অনির্ব্বচনীয় তেজঃ প্রাদুর্ভূত হইলেন, সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজের প্রভাব অবগত হইতে না পারিয়া ইন্দ্র-প্রেরিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ একে একে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে সেই তেজোমণ্ডল হইতে ক্রমে তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমে অগ্নি বলিলেন, আমার নাম অগ্নি এবং জাতবেদা, আমি সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে পারি। অনন্তর সেই তেজোময়ী দেবতা অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন, ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অতঃপর বায়ু প্রভৃতি দেবগণও এইরূপে লজ্জিত এবং প্রত্যাবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিলে তেজোময়ী দেবতা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। তেজের অন্তর্দ্ধান দেখিয়া ইন্দ্র বুঝিলেন, ত্রিজগতের অধিপতি হইলেও আমি ইঁহার সম্ভাষণের পাত্রও নহি, ইহাই অন্তর্দ্ধানের

উদ্দেশ্য। এইরূপে ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী ত্রিভুবনসুন্দরী গৌরীমূর্ত্তি অবলম্বনে নিজ প্রভাপটলে গগনমণ্ডল আলোকিত করিয়া দেবগণের নয়ন-গোচরা হইলেন। অনন্তর দেবরাজ তাঁহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন সে অংশ উপনিষদ্ বলিয়া আমরা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও দেবী-ভাগবতে এই প্রস্তাবের যে বিস্তীর্ণ বর্ণন আছে তাহা হইতেই দেবীর প্রত্যুত্তরাংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সাধকবর্গ ইহা হইতেই তাঁহার আত্ম-পরিচয় অবগত হইবেন।

দেব্যুবাচ।

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বকারণকারণং।
মায়াধিষ্ঠানভূতন্তু সর্ব্বসাক্ষি নিরাময়ম্॥

* * *

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈকভাগঃ সম্প্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ॥
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ।
সা চ মায়া পরা শক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী॥
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।
সাম্যাবস্থাত্মিকা চৈষা মায়া মম সুরোত্তম॥
প্রলয়ে সর্ব্বজগতো মদভিন্নত্বমাগতা।
প্রাণিকর্ম্মপরীপাকবশতঃ পুনরেব হি॥
রূপং তদেবমব্যক্তং ব্যক্তীভাবমুপৈতি চ।
অন্তর্ম্মুখা তু যাঽবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে॥
বহির্ম্মুখা তু যা মায়া তমঃ-শব্দেন সোচ্যতে।
বহির্ম্মুখাত্তমোরূপা-জ্জায়তে সত্ত্বসম্ভবঃ॥
রজোগুণস্তদৈব স্যাৎ সর্গাদৌ সুরসত্তম।
গুণত্রয়াত্মকাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ মহেশ্বরাঃ॥
রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকো ভবেৎ
তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্ব্বকারণরূপধৃক্॥
স্থূলদেহো ভবেদ্ ব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ।
রুদ্রস্তু কারণো দেহ-স্তুরীয়া ত্বহমেব হি॥
সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণী।
অত ঊর্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মদ্রূপং রূপবর্জ্জিতম্॥
নির্গুণং সগুণঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্॥

সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ সংপ্রবিশ্য চ।
প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-তিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥
মদ্ভয়াদ্বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যবস্তদ্বৎ সাহং সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা ॥
মৎপ্রসাদাদ্ ভবদ্ভিস্তু জয়ো লব্ধোঽস্তি সর্ব্বথা।
যুষ্মানহং নর্ত্তয়ামি কাষ্ঠপুত্তলিকোপমান্ ॥
কদাচিদ্দেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং ক্বচিৎ।
স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছয়া সর্ব্বং কুর্ব্বে কর্ম্মানুরোধতঃ ॥
তাং মাং সর্ব্বাত্মিকাং যূয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্ব্বতঃ।
অহঙ্কারাবৃতাত্মানো মোহমাপ্তা দুরন্তকম্ ॥
অনুগ্রহং ততঃ কর্ত্তুং যুষ্মদ্দেহাদনুত্তমং।
নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি ॥
অতঃ পরং সর্ব্বভাবৈ র্হিত্বা গর্ব্বন্তু দেহজং।
মামেব শরণং যাহি সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥

আমার এই রূপই ব্রহ্মস্বরূপ, নিখিল কারণের কারণ এবং মায়ার অধিষ্ঠানভূমি ও সর্ব্বসাক্ষী এবং নিরাময় ॥ ১ ॥ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া আমি সকল জগৎ সৃষ্টি করি, তন্মধ্যে একভাগ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতি এবং অপর ভাগ মায়াপ্রকৃতি ॥ ২ ॥ সেই মায়া আমার পরমা শক্তি এবং আমি সেই শক্তিমতী ঈশ্বরী। কিন্তু জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্র হইতে অভিন্না মায়াও তদ্রূপ আমা হইতে অভিন্না ॥ ৩ ॥ দেবেন্দ্র! সর্ব্ব জগৎ প্রলয়কালে এই মায়া ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় আমাতেই অভিন্নভাবে অবস্থিতি করেন, আবার জীবের প্রারব্ধ-পরিণামে এই অব্যক্ত মায়াই ব্যক্তভাব অবলম্বন করেন ॥ ৪ ॥ শক্তির যে অবস্থা অন্তর্ম্মুখী তাহারই নাম মায়া, যে অবস্থা বহির্ম্মুখী তাহারই নাম অবিদ্যা ॥ ৫ ॥ তমোরূপী বহির্ম্মুখী অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ের প্রাদুর্ভাব হয় এবং ত্রিগুণ-বিভাগ হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবির্ভূত হয়েন ॥ ৬ ॥ তন্মধ্যে রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-প্রধান বিষ্ণু এবং তমোগুণ-প্রাধান্য হেতু তমোময় অবিদ্যাবিকাশ এই ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র নিখিলকারণ-মূর্ত্তিধর ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা আমার স্থূলদেহ-স্বরূপ, বিষ্ণু আমার লিঙ্গদেহ-স্বরূপ, রুদ্র আমার কারণদেহ-স্বরূপ এবং আমি স্বয়ংই আমার তুরীয় চৈতন্যরূপিণী ॥ ৮ ॥ যাহা আমার সাম্যাবস্থা তাহাই সর্ব্বান্তর্যামি-রূপিণী, অতঃপর আমার রূপ রূপবর্জ্জিত পরব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

নির্গুণ এবং সগুণ ভেদে আমার রূপ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যাহা মায়ার অতীত তাহাই নির্গুণ এবং যাহা মায়াযুক্ত তাহাই সগুণ ॥ ১০ ॥ সেই দ্বিবিধ-রূপিণী আমি মায়ারূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে যথানিয়মে কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ পথে প্রেরিত করি ॥ ১১ ॥ আমিই আবার ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরিত করি ॥ ১২ ॥ আমার ভয়ে পবন বহমান, সূর্য্য উদয়াস্তগামী, ইন্দ্র বর্ষণে প্রবৃত্ত, অগ্নি দাহনে নিযুক্ত এবং মৃত্যু জীবের জীবনহরণে ধাবিত। এই সকল নিয়োগের বিধাত্রী আমি, তাই আমার নাম সর্ব্বোত্তমা—সর্ব্বেশ্বরী ॥ ১৩ ॥ আমার প্রসাদেই তোমরা সর্ব্বথা জয়লাভ করিয়া থাক, আমিই তোমাদিগকে সর্ব্বদা কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করাই ॥ ১৪ ॥ ইচ্ছাময়ী আমি, স্বেচ্ছাক্রমেই সকল কার্য্য করি, তোমাদিগেরই কর্ম্মানুসারে কখনও দেবদলের কখনও অসুরদলের বিজয় বিধান করি ॥ ১৫ ॥ তোমরা নিজ গর্ব্বভরে সেই সর্ব্বান্তর্যামিনী আমাকে বিস্মৃত হইয়া দুরন্ত মোহে অভিভূত হইয়াছিলে। এজন্য তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই তোমাদিগের দেহ হইতে আমার সেই সর্ব্বোত্তম শক্তিরূপ তেজঃ নিঃসৃত হইয়াছিল, যাহাকে তোমরা যক্ষরূপে ধারণা করিয়াছিলে। অর্থাৎ যে মহাশক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তোমরা আত্মশক্তিকেও চিনিতে এবং নিজ নিজ নিয়োজিত কর্ম্মসাধনেও সমর্থ হও নাই ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ এখন হইতে তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গর্ব্ব পরিহারপূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী আমারই শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ আমাকেই সর্ব্বনিয়ন্ত্রী জানিয়া আমারই মহা-শক্তির পূর্ণপ্রভাবে কৃতাকৃত সমস্ত কর্ম্মের ফল বিন্যস্ত করিয়া আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও ॥ ১৮ ॥

আদ্যাশক্তি বলিলেন, আমি দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টি করি, তন্মধ্যে একভাগ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-প্রকৃতি অপর ভাগ মায়া-প্রকৃতি। আবার মায়া যখন তাঁহার শক্তি, তখন তিনিই সেই শক্তিমতী ঈশ্বরী, পরমার্থতঃ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় শক্তি তাঁহার অভিন্ন পদার্থ। উক্ত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ অংশকেই সর্ব্বশাস্ত্র আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ সমস্তই ইঁহার অধীনস্থ, সমস্তবৃত্তিই ইঁহার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দেহের সমস্ত পদার্থই অচেতন, এক চৈতন্যময় আত্মাই কেবল তাহাদের চেতনা-সঞ্চারের একমাত্র হেতু, সূর্য্যকিরণ যেমন দৈনিক সমস্ত আলোকের একমাত্র নিদান, আত্মাও তদ্রূপ দৈহিক সমস্ত চেতনার একমাত্র মূল। সূর্য্য যেমন তেজঃ বা কিরণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহেন আত্মাও তদ্রূপ শক্তি বা চেতনা হইতে অন্য কোন পদার্থ নহেন, তাই আত্মতত্ত্বের চরম-সিদ্ধান্ত—চিৎশক্তি। চৈতন্য বা চেতনা বলিয়া আমরা যাহা অনুভব করি তাহারই নাম শক্তি। শক্তি শব্দের শেষ অর্থ এইমাত্র বলা যায় যে, যাঁহার দ্বারা সমর্থ হওয়া

যায় অর্থাৎ অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ যাঁহার প্রেরণায় সচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় তাঁহারই নাম শক্তি। এই শক্তি বিশ্বব্যাপিনী বলিয়া ইহারই নামান্তর 'আত্মা'। অততি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা—যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই নাম আত্মা।

রথযাত্রায় যেমন দেখিতে পাই, রথ রথী সারথি অশ্ব চারিটিই গতিশীল, কিন্তু এই চারিটির মধ্যে কেবল একটিই স্বাধীন চেতন, দুইটি পরাধীন-চেতন আর অন্যটি স্বয়ং অচেতন হইলেও চৈতন্যের আকর্ষণে সচেতনবৎ-আকৃষ্ট। অশ্ব সচেতন হইলেও সারথির অধীন, সারথি সচেতন হইলেও রথীর অধীন আর রথ স্বয়ং অচেতন হইলেও পরম্পরাক্রমে রথী সারথি অশ্ব সকলেরই অধীন। সাধকগণও দেহের মধ্যে এইরূপ নিত্য রথযাত্রাই দেখিয়া থাকেন, পাঞ্চভৌতিক দেহটি এই সংসার যাত্রায় যাতায়াতের রথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দশেন্দ্রিয় ইহার দশটি অশ্ব, মন ইহার সারথি এবং সেই মহাশক্তি-স্বরূপ আত্মা ইহার রথী। রথীর আজ্ঞানুসারে সারথি যেমন অশ্বগণকে পরিচালিত করেন, আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মনও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরিত করেন, অশ্বের আকর্ষণে রথ যেমন ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে দেহও তদ্রূপ পরিচালিত হয়। আত্ম-চৈতন্যের আভাসে মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ে সচেতন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে দেহ চেতনবৎ প্রতীয়মান, দেহ ইন্দ্রিয়ের অধীন, ইন্দ্রিয় মনের অধীন, মন আত্মার অধীন, সুতরাং চারিটির মধ্যে তিনটিই পরাধীন—একমাত্র আত্মাই স্বাধীন। তাঁহারই অধীনতায় সকলে অবস্থিত কিন্তু বিশেষ এই যে সাধারণ রথীর ন্যায় দেহরথের রথী কোন নির্দিষ্ট পথের যাত্রী নহেন, সারথিকে রথ চালাইতে অনুমতি করিয়াই ইহার অবসর। অতঃপর সারথি নিজ বুদ্ধিবলে যে পথে যাত্রা করিবেন সেই পথেরই সুখ দুঃখ তাঁহাকেই ভোগ করিতে হইবে, রথীর সুখও নাই দুঃখও নাই—আত্মা নিত্য-নির্লিপ্ত। শাস্ত্রোক্ত পাপ পুণ্যের পথ যাহা নির্দিষ্ট আছে সারথি তাহাতে ভ্রান্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু দুর্ব্বল হইলেই বিপদ। উৎপথগামী দশটি অশ্ব দশদিকে আকর্ষণ করিবে তাহাতে পঞ্চ কাষ্ঠের সংযোগ-সম্বলিত অসংখ্য সন্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র রথখানি মধ্যপথেই ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তাহাতে আবার যে বীরপুরুষ সারথির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তিনি অশ্বসংযম করিবেন, সে ত দূরের কথা, আত্মসংযম করিতেই অস্থির। অশ্বগণকে বাধ্য করিতে যে দুইটি বল্‌গা নির্দ্দিষ্ট আছে—শম আর দম, সারথির তাহা মনে করিতেই যমযন্ত্রণা। স্বহস্তে ধারণ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ ত অনেকের মনেই অলীক কল্পনা বলিয়া অবধারিত হইতেছে। সারথির এই দুর্ব্বলতাবশতঃই জীবের সংসারসুখ-মৃগয়ায় যত কিছু লক্ষ্যভ্রান্তি ঘটে, এইস্থানেই ঘোর অনর্থের সূত্রপাত। সারথি দুর্ব্বল হইলেও এইস্থানে আসিয়া একবার রথীর দিকে লক্ষ্যপাত হয়, অদৃষ্টবাদ ভুলিয়া

তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, মা! তোমার এ কি লীলা? সারথির বল বুদ্ধি তোমার ত কিছু অবিদিত নহে, তবে জানিয়া শুনিয়া এমন অকর্ম্মণ্য সারথির হস্তে এ রথের ভার কেন দিলে মা! সত্য আমি ঘোর অপরাধী মহাপাপী, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি ত্যাগ করিতে পার না; এ ঘোরসঙ্কটে রথী সারথি কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ নহে। জানি আমি—নিজকৃত কর্ম্মফল আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, তথাপি এ ভগ্নরথে মা! তোমারে একবার দেখিতে চাই। রাবণের সেই শেষ রথযাত্রার ন্যায় এ অন্তিম রথযাত্রায় মা! তুমি একবার সেই উন্মাদিনী মা সাজিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আমায় কোলে করিয়া রথে দাঁড়াও, মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর্হিতা না হইয়া একবার অন্তর্নিহিতা হও, আমি নয়ন ভরিয়া মন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই ভুবনভরা রূপের ছটা একবার দেখিয়া লই। মা! তোমার ঐ কোটিচন্দ্র-সমুজ্জ্বল কালবিজয়ী কালকান্তি-কিরণে আমার মরণভয়-অন্ধকার ঘুচিয়া যাক্। মা! আমি মায়ের কোলে উঠিয়া মায়ের হইয়া সেই মরণে মরিয়া যাই, অমরগণ অমরপদ ত্যাগ করিয়াও যে মরণের জন্য লালায়িত। তাই বলিতেছি মা! আজ মায়ে-পোয়ে মিলিয়া আমরা রথযাত্রার যাত্রী হই, আমার দেহরথে নয়নরথে প্রাণরথে মা! তোমার রথযাত্রা একবার দেখিয়া লই। শুনিয়াছি, তোমার রথে আর নাকি পুনর্যাত্রা নাই, তাই এত সাধ মা!

নবম পরিচ্ছেদ

সাধক! উল্লিখিত শক্তিরূপ আত্মা যে ব্রহ্ম পদার্থ, এ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রের বা কোন সম্প্রদায়ের কোন মতান্তর নাই। কিন্তু ভেদজ্ঞানীর মতান্তর ঘটিয়াছে কেবল তিনটি শব্দ লইয়া, যথা—আত্মা, শক্তি এবং চৈতন্য। 'আত্মন্' শব্দ পুংলিঙ্গ, 'শক্তি' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'চৈতন্য' ক্লীবলিঙ্গ। নামপক্ষে এই তিনটি লিঙ্গভেদ, আবার বস্তুপক্ষেও তিনটি প্রকার ভেদ, যথা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষ, শক্তি স্ত্রী এবং চৈতন্য বা ব্রহ্ম ক্লীব। নির্গুণ চিৎশক্তিতে কোন প্রকার-ভেদ নাই বলিয়া চৈতন্য বা ব্রহ্মকে শাস্ত্র ক্লীবরূপ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তির প্রকার-ভেদে মূল জগৎ-পিতা এবং জগজ্জননী হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের সমস্ত জনক-জননী-গত স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব অনুসারে দেবকে পুরুষরূপ এবং দেবীকে স্ত্রীরূপ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা কেবল শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের কল্পনাময় নির্দ্দেশ নহে, যাহা স্বরূপতঃ সত্য তাহারই উল্লেখ মাত্র। উভয়ের সংযোগে যখনই মায়িক সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার বর্ণন, তখনই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। যখন মায়াতীত স্বরূপ-কীর্ত্তন তখনই ক্লীবত্ব বা স্ত্রীত্ব পুরুষের অতীত অবস্থা। ক্লীব বলিলে তাহাতে একেবারে স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব নাই, ইহা সিদ্ধান্ত নহে, তবে স্ত্রী-শক্তি ও পুংশক্তির অব্যক্ত অবস্থা এইমাত্র বলা যাইতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষেও ক্লীবের শরীরে দ্বিবিধ চিহ্নই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন ক্লীবের শরীরে পুরুষদেহের অধিক সৌসাদৃশ্য, কোন কোন ক্লীবের শরীরে স্ত্রীদেহের অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তাহা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই এই পর্য্যন্ত। ক্লীবের উৎপত্তি-প্রকার শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাতে স্ত্রীশক্তি বা পুংশক্তি কেহ কাহাকেও সম্যক্ পরাজিত করিতে না পারিয়া উভয়ের সাম্য-রূপ নপুংসক সৃষ্টি করিয়াছে। সারদাতিলকে—

রক্তাধিকা ভবেন্নারী ভবেদ্রেতোঽধিকঃ পুমান্।
উভয়োঃ সমতায়ান্তু নপুংসকমিতি স্থিতিঃ॥

ঋতুরক্তের ভাগ অতিরিক্ত হইলে নারী, শুক্রের ভাগ অতিরিক্ত হইলে পুরুষ এবং শুক্রশোণিত উভয়ের ভাগ সমান হইলে নপুংসক জন্মে, ইহাই নিশ্চয়। মাতৃকাভেদতন্ত্রে—

পুরুষস্য তু যৎ শুক্রং শক্তেস্তস্যাধিকং যদি।
তদা কন্যাং বিজানীয়াৎ বিপরীতে পুমান্ ভবেৎ।
উভয়োস্তুল্যশুক্রেণ ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্॥

পুরুষের শুক্র অপেক্ষা শক্তির রক্ত যদি অধিক হয়, তবে কন্যা এবং ইহার বিপরীত হইলেই পুরুষ জন্মিবে, আর যদি উভয়ের অংশই তুল্য হয় তাহা হইলে ক্লীব জন্মিবে ইহাই নিশ্চিত। এই শুক্র শোণিতের ভাগ কি পরিমাণে হইলে সমান হইবে তাহাও কথিত হইয়াছে—

দ্বাবিংশতী রজোভাগাঃ শুক্রমাত্রা-শ্চতুর্দ্দশ।
গর্ভসংজননে কালে পুংস্ত্রিয়োঃ সম্ভবন্তি হি॥
নারী রজোঽধিকাংশে স্যাৎ নরঃ শুক্রাধিকাংশকে।
উভয়োরুক্তসংখ্যায়াং স্যান্নপুংসকসম্ভবঃ।

গর্ভোৎপাদনকালে স্ত্রীর দেহে দ্বাবিংশতি-মাত্রা রজঃ এবং পুরুষের দেহে চতুর্দ্দশ-মাত্রা শুক্র উৎপন্ন হয়, ইহাই সমতা, ইহার মধ্যে রজঃ অধিক অর্থাৎ রজোমাত্রা দ্বাবিংশতি কিন্তু শুক্রমাত্রা চতুর্দ্দশের অল্প, এরূপ হইলেই স্ত্রী জন্মিবে। আবার শুক্রমাত্রা অধিক হইলে অর্থাৎ শুক্রমাত্রা চতুর্দ্দশ কিন্তু রজোমাত্রা দ্বাবিংশতির অল্প, এরূপ হইলেই পুরুষ জন্মিবে, আর শুক্র শোণিতের উক্ত সংখ্যা স্থির থাকিলেই নপুংসক জন্মিবে।

এই সমসংখ্যার মধ্যেও মাত্রার অর্দ্ধাংশ বা পাদাংশ অতিরিক্ত হইলে তাহাতেই ক্লীবদেহে স্ত্রীর অঙ্গসাদৃশ্য বা পুরুষের অঙ্গসাদৃশ্য সমধিক লক্ষিত হইবে। এই লক্ষণ অনুসারে নপুংসককেও স্ত্রী-নপুংসক এবং পুরুষ-নপুংসক-রূপে দ্বিভাগে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু ফলদর্শী শাস্ত্র এই অকর্ম্মণ্য ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণতঃ নপুংসককে এক বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভেদের ফলে কিছু বিশেষ না থাকিলেও মূলে এবং পুষ্পে কিছু বিশেষ আছে—নতুবা এ ভেদ হইত না। মূলে শুক্রশোণিতের বিশেষ, পুষ্পে ও দেহমন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিগত বিশেষ। যে ক্লীবের অঙ্গ পুরুষ-সাদৃশ্যে গঠিত তাহাতে অধিকাংশই পুরুষোচিত বৃত্তির বিকাশ, আবার যে ক্লীবদেহ স্ত্রী-সাদৃশ্যে গঠিত তাহাতে অধিকাংশই স্ত্রী-জনোচিত বৃত্তির বিকাশ; এইরূপে ক্লীবত্বের মধ্যেও যেমন স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং তাহারই স্থূল প্রকাশ স্ত্রীমূর্ত্তি ও পুরুষমূর্ত্তি তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যেও অব্যক্তরূপে শিব-শক্তি উভয় তত্ত্বই অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন—তাহারই ব্যক্তভাব উমা-মহেশ্বর লক্ষ্মী-নারায়ণ রাধা-কৃষ্ণ সীতা-রাম ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন শিবশক্তির ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত অভিন্ন আনন্দময় ব্রহ্মমূর্ত্তি, যাহা কেবল অভিন্ন চিদ্ঘনানন্দ স্বরূপেই উপাস্য, তাহাই সেই অনাদ্যা আদ্যা ব্রহ্মাদির আরাধ্যা ত্রিভুবনসাধ্যা মহাবিদ্যা। সম্ভবতঃ সাধনার চরমতত্ত্বে এই মায়াতীত অদ্বৈত নিত্য আনন্দ লীলামূর্ত্তির কিয়দংশের আভাস আমরা সাধকবর্গের সূক্ষ্ম কটাক্ষের লক্ষ্য করিতে পারিব। এক্ষণে চৈতন্য-শব্দগত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ থাকিলে চৈতন্য যে শক্তি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহেন ইহাই বুঝিবার কথা। তজ্জন্য

তন্ত্রের একটি সূত্রমাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপই এ সূত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা। নির্ব্বাণতন্ত্রে—

সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা।
চণকাকারবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥
অনাদিপুরুষোদ্‌যুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।
জ্বলদগ্নে র্যথা দেবি স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ ॥

সত্যলোকরূপ নিত্যধামে মহাকালী মহারুদ্রের সহিত পরস্পর আলিঙ্গনে একান্তভাবে অবস্থিতা, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির সমষ্টি-জোতির্ম্ময়ী সেই অনাদিপুরুষারূঢ়া অনাদ্যা শক্তি চণকাকার-বিস্তারা অর্থাৎ চণকের দ্বি-দল যেমন পরস্পর সংবদ্ধ তদ্রূপ পরস্পর-সংশ্লিষ্টা এবং চণক যেমন বহিরাবরণ বল্কল দ্বারা আবৃত তিনিও তদ্রূপ নিজ আবরণ মায়ার দ্বারা আবৃতা, চণকের কোমল উজ্জ্বল দ্বিদল অপেক্ষা বল্কল যেমন মলিন এবং কঠিন, পরমানন্দতরল জ্যোতির্ম্ময় শিবশক্তি অপেক্ষা ত্রিগুণ-বিষমা মায়াও তদ্রূপ মলিনা এবং কঠিনা, দ্বিদল এবং বল্কল এই উভয়ের সমষ্টিগত নাম যেমন চণক তদ্রূপ শিবশক্তি এবং মায়া এই উভয়ের সমষ্টিগত নাম ব্রহ্ম। স্থূলদর্শীর চক্ষুতে বল্কলের বহির্ভাগ হইতে দেখিতে চণককে এক বলিয়া বোধ হইলেও যিনি বল্কল ভেদ করিয়া দেখিতে পারেন তাঁহার চক্ষুতে যেমন এক চণকের মধ্যেই দুইটি দল পরস্পর অভিন্নভাবে মিলিত এবং মুখে মুখে সংবদ্ধ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ মায়ার অন্তরালে থাকিয়া যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় করেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম এক হইলেও মায়ার ভেদজ্ঞ সাধনসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষুতে তাঁহার শিবশক্তিরূপ পরমপ্রেমময় উভয় স্বরূপই প্রতিভাত হয়। জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ সকল স্ফুরিত হয় তদ্রূপ সেই জ্যোতির্ম্ময়ীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই অংশরূপ জীবসকল ধাবিত হইতেছে।

ঈশ্বর-মূর্ত্তিতেই হউক বা জীব-মূর্ত্তিতেই হউক স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর বিভিন্ন দেহ কেবল দ্বৈতলীলার অভিনয়-যন্ত্র বই আর কিছু নহে। যন্ত্রগত ভেদ ভিন্ন যন্ত্রিগত ভেদ কাহারও নাই—উভয় যন্ত্রেরই যন্ত্রী একমাত্র আত্মা বা শক্তি। আবার স্ত্রী-পুরুষ-দেহের ন্যায় ক্লীবদেহেও সেই আত্মা বা শক্তিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তবেই এখন স্ত্রী পুরুষ নপুংসক দেহ যাহাই কেন না বলি, সমস্তই যে সেই চিৎশক্তিরই লীলাভাণ্ড তাহাতে আর কোন বিকল্প নাই। 'ক্তি'-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয় বলিয়া 'শক্তি' বলিতে কেবল স্ত্রী-মূর্ত্তিই বুঝাইবে। পুরুষ-মূর্ত্তিতে শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। তবে ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে যে, তাহা হইলে 'শক্তি' শব্দে কেবল স্ত্রীকেই বুঝায় কেন? আমরা যথা সময়ে ইহার যথাসাধ্য উত্তর করিতে বাধ্য হইব। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিতেছি যে, স্ত্রীত্ব বুঝাইতে শক্তিশব্দ

যোগরূঢ়, কারণ মূলতঃ শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ বা নপুংসক সেই প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত শক্তির পুরুষমূর্তি-পরিগ্রহ কেবল লীলা-বিলাস মাত্র, সংসারলীলাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সে মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া মহাশক্তি স্ব-স্বরূপে অবস্থিতা হইবেন। যাঁহারা আত্যন্তিক মহাপ্রলয় (যে প্রলয়ের পর আর সৃষ্টি-সম্ভাবনা নাই) স্বীকার করেন তাঁহাদিগের মতে ইহাই সিদ্ধান্ত ; কিন্তু এ মতের যুক্তি ও প্রমাণ বড়ই দুর্ব্বল। তজ্জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পুরুষ অংশই সংসার-প্রবৃত্তিময় বন্ধনের কারণ এবং শক্তি অংশই সংসার-নিবৃত্তিময় মুক্তির কারণ। জগৎ-প্রবাহের আত্যন্তিক মহাপ্রলয় হইবার কোন কারণ নাই। এজন্য নিত্যানন্দময়ীর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারও নিত্য, বন্ধনও নিত্য, মুক্তিও নিত্য। সেই নিত্যমুক্তিময়ীর নিত্য-মূর্ত্তিতে সৃষ্টির বীজরূপ পুরুষও নিত্য, কিন্তু সেই মহানির্ব্বাণ-রূপ মুক্তিস্থলে পুরুষ-শক্তি (সৃষ্টি-প্রক্রিয়া) কেবল লীলানন্দ অনুভব জন্যই অবস্থিত, তাঁহাতে আর কোন সৃষ্টির তরঙ্গ নাই। তজ্জন্য সে শক্তিকে লীলার উপলক্ষ্য-স্বরূপ নিয়ে রাখিয়া মুক্তিদাত্রী মহাশক্তি তাঁহার উপরিভাগে আরূঢ়া হইয়া ব্রহ্মানন্দ-সোল্লাসে অঘোর উন্মাদনী সাজিয়াছেন। নিশ্চেষ্ট পুরুষ বা সৃষ্টি-শক্তিকে পদতলে স্তম্ভিত করিয়া মুক্তকেশী মুক্তির বিজয়-ঘোষণা করিতেছেন আর ঊর্দ্ধভুজ প্রসারিত করিয়া ভবভয়ভীত সন্তানগণকে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভয় প্রদান করিতেছেন। সেই সৃষ্টিশক্তি পুরুষ-রূপই স্বয়ং মহাকাল, তাঁহারই বক্ষঃস্থলে ঐ কালভয়-ভঞ্জিনী কাল-হৃদিরঞ্জিনী কালমনোমোহিনীর কৈবল্যলীলা। তাই মহাকালতন্ত্রে বলিয়াছেন—

> পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তি নিগদ্যতে।
> বামা সা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষ-প্রদায়িনী।
> অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

পুরুষের নাম দক্ষিণ (দক্ষিণাঙ্গ-স্বরূপ বলিয়া), শক্তির নাম বামা (বামাঙ্গ-স্বরূপ বলিয়া) যতদিন এই বাম ও দক্ষিণ, স্ত্রী ও পুরুষ সমবলে অবস্থিত ততদিনই সংসার বন্ধন। সাধনার প্রখর প্রভাবে বামাশক্তি জাগরিতা হইলে তিনি যখন দক্ষিণ-শক্তি পুরুষকে জয় করিয়া তদুপরি স্বয়ং দক্ষিণানন্দে নিমগ্না হয়েন অর্থাৎ কি বাম, কি দক্ষিণ উভয় অংশই যখন তাঁহার প্রভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, তখনই সেই কেবলানন্দরূপিণী জীবের মহামোক্ষ প্রদান করেন। তাই ত্রৈলোক্যমোক্ষদা মায়ের নাম—দাক্ষণা কালী।

ক্লীবের দেহ স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাগের অব্যক্ত অবস্থা হইলেও তাহা যেমন স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগ ব্যতিরেকে জন্মে নাই তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের জনক-জননী শিব-শক্তির অব্যক্তভাব ব্যতিরেকেও ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। তবে ক্লীব দেহও যেমন প্রজা জননশক্তি বৰ্জ্জিত, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপও তদ্রূপ সৃষ্টিস্থিতিসংহার

ক্রিয়াবর্জ্জিত। সগুণ অবস্থায় আবার তাঁহা হইতেই গুণবিভাগ অনুসারে তত্তদ্গুণের নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্য গণেশ সাবিত্রী লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী প্রভৃতি স্বরূপের প্রকাশ। শক্তির সেই স্বরূপ হইতেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার। তবেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রাম কৃষ্ণ সূর্য্য গণেশ, রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী দুর্গা সীতা রুক্মিণী যতই কেন না বল, স্ত্রী হউন পুরুষ হউন, সমস্তই শক্তিরূপ। সৃষ্টিশক্তির লীলারূপ ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তির লীলারূপ বিষ্ণু এবং সংহারশক্তির লীলারূপ মহেশ্বর। তেজঃ-শক্তির লীলারূপ সূর্য্য এবং সিদ্ধি-শক্তির লীলারূপ গণেশ, আর যিনি এই সকল শক্তির নিদানরূপা এবং নিধানরূপা মহাশক্তি, তাঁহারই লীলারূপ রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী দুর্গা সীতা রুক্মিণী প্রভৃতি। সাধক ইহার মধ্যে শক্তির যে রূপেরই উপাসক হউন না কেন, বৈষ্ণব হইয়া যতদিন বিষ্ণুশক্তিকে শিব দুর্গা সূর্য্য গণেশ শক্তির অভিন্নরূপে অবগত না হইতেছেন ততদিন তাঁহার বিষ্ণুশক্তি-বিষয়ক বোধ অতি অপূর্ণ, আবার শাক্ত হইয়াও যতদিন আদ্যাশক্তিকে বিষ্ণু শিব সূর্য্য গণেশ শক্তির অভিন্নরূপে অবগত না হইতেছেন ততদিন তাঁহারও শক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক বোধ অতি অপূর্ণ, যতদিন এই অপূর্ণ বোধ রহিয়াছে ততদিন মুক্তির আশা নাই। আমার উপাস্য দেবতাই জগতের উপাস্য দেবতা। শিব শক্তি সূর্য্য গণেশ বিষ্ণু যাহাই কেন না বল ইহার কেহই আমার পর বা অনুপাস্য নহেন। কারণ যিনি আমার উপাস্য, ইহারা তাঁহারই লীলা-বিভূতি। যিনি আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের আদরের ধন এ সকল মূর্ত্তি তাঁহারই সাধের লীলা। আমি কেমন করিয়া আমার সেই সাধের ধনের সাধের ধন সাধনার ধন, এ সকল মূর্ত্তিকে অনাদর করিব? এই একান্ত প্রেমের নিষ্ঠা উপস্থিত হইলে শাক্তের তখন কালী হইতে কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র মনে করিতে ভেদ জ্ঞানের নির্ঘাত বজ্রাঘাতে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, বৈষ্ণবেরও তখন কালীকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে এই নিদারুণ যন্ত্রণাতেই মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইতে হয়। নিজ নিজ দেবতার অপূর্ণ শক্তিজ্ঞান লইয়া কেহই একান্ত সুখী হইতে পারেন না। তাই তন্ত্রশাস্ত্র গভীর স্বরে সাধক সমাজকে কম্পিত করিয়া বলিয়াছেন, শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি! নির্ব্বাণং নৈব জায়তে। প্রেমময় ভক্তসাধকের হৃদয়ে ইহা যেমন মর্ম্মকথা, দেবদেষী নরাকার অসুর সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহাতে তেমনই মর্ম্মব্যথা। দেবতার কথায় অসুরের মর্ম্মব্যথা চিরকালই স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তজ্জন্য আমাদিগের বলিবার কিছু নাই। শক্তিতত্ত্বের ফলিতরূপ কালী তারা দুর্গা মূর্ত্তিকেই কেবল 'শক্তি' শব্দের প্রতিপাদ্য বুঝিয়া শাক্তগণ যেমন শক্তিতত্ত্বকে খণ্ডিত করিয়াছেন, বৈষ্ণবগণও বিষ্ণুকে শক্তি হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া বিষ্ণুতত্ত্বকেও তেমনই খণ্ডিত করিয়াছেন। আবার অধিকন্তু আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বুঝিয়াছেন, এইটুকুই বিশেষ। অনন্ত জ্ঞান-বারিধি ভক্তের আরাধ্য নিধি ভগবান কিন্তু তন্ত্রে তাঁহার আত্ম-নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—

শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ॥

শক্তি, মহেশ্বর এবং ব্রহ্ম, এ তিন শব্দই তুল্য অর্থের বাচক। স্ত্রী পুরুষ এবং নপুংসক বলিয়া যাহা কিছু ভেদ তাহা কেবল শব্দগত, পরমার্থতঃ বস্তুগত কোন ভেদ নাই। শব্দানুরূপ উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সেই সকল মূর্ত্তিতে স্ত্রী এবং পুরুষ ভাবের লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বীরও আকারে স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ভেদ আছে তাঁহারা সে আকারকে কি আকারে বুঝিয়াছেন তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কারণ শব্দানুরোধে ঈশ্বরের আকারও যদি জীবের আকারের ন্যায় অপরিহার্য্য এবং বস্তুগত হয় তাহা হইলে আর তাঁহার লীলা কি? লীলা তাহারই নাম যাহা স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও আত্ম-আনন্দের উল্লাসে সত্যের ন্যায় অভিনীত হয়। অভিনেতা পুরুষ যেমন অভিনেতা হইয়াও স্বরূপতঃ তাহাতে সম্বন্ধহীন, ভগবান বা ভগবতীও তদ্রূপ নানা আকারে লীলামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও তাহাতে সম্বন্ধহীন। কেবল অভিনয়ে এবং অভিনেতায় যে সম্বন্ধ, মূর্ত্তি-পরিগ্রহের সহিত তাঁহারও সেই সম্বন্ধ। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও জীবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার দেহও যেমন অভিনয়, সংসারও তদ্রূপ অভিনয়। কিন্তু তোমার আমার সংসার যতদিন অভিনয় বলিয়া বোধ না হইতেছে ততদিন তাঁহার মূর্ত্তির অভিনয় নহে, ইহা স্থির। দ্বিতীয়তঃ, শব্দানুরোধেই যদি তাঁহার তদনুরূপ লক্ষণাক্রান্ত আকার স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শিব-শক্তির বা লক্ষ্মী-নারায়ণের স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তির ন্যায় ব্রহ্মের নপুংসক মূর্ত্তি প্রতিপন্ন হইয়া উঠে, কেননা ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বস্তুতঃ ব্রহ্ম শব্দের বাচ্যপদার্থ শব্দানুসারে ক্লীব হইলেও যেমন স্বরূপতঃ ক্লীব নহেন তদ্রূপ শিবশক্তি পদের বাচ্যপদার্থ শব্দানুসারে স্ত্রী-পুরুষ হইলেও স্বরূপতঃ স্ত্রী মূর্ত্তি বা পুরুষ মূর্ত্তিতে বদ্ধ নহেন। তবে বিশেষ এই যে, নির্গুণ ক্লীবভাবে লীলামূর্ত্তি অসম্ভব; তাই দ্বৈত-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার এবং লীলা-মাধুর্য্য সম্বর্দ্ধনে সাধকের সাধনা পূরণ জন্য সগুণরূপে তাহার স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ। নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা অসম্ভব। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন, গন্ধর্ব্বতন্ত্রে চতুস্ত্রিংশৎ পটলে—

নপুংসকাত্মকং তত্ত্বং স্বয়মেব প্রকাশতে।
দ্বয়োরেকতরাদ্বৈত-যোগাত্মৈকভাবনা॥

শিব-শক্তি উভয়ের পরস্পর যোগ জন্য অদ্বৈততত্ত্বরূপ নপুংসক ভাব স্বতএব প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য কোন স্বতন্ত্র উপাসনার অপেক্ষা নাই। সমগ্র সাধনার পরিণামে যে নির্গুণতত্ত্বে ডুবিয়া গিয়া আত্মহারা হইতে হইবে, সেই ফলরূপ নির্গুণভাব নির্ব্বাণরূপ মহাসিদ্ধি ব্যতীত সাধনার অবস্থায় কখনও সম্ভবে না।

সগুণরূপে তিনি যে মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করুন, সমস্তই সেই একমাত্র তাঁহারই মূর্ত্তি। সকল মূর্ত্তিতেই ভুক্তি-মুক্তি-ভক্তিদাত্রী সেই একমাত্র শক্তি বই আর কেহই নহে। এক্ষণে ইচ্ছা হয়, সাধক তাঁহাকে বিষ্ণু কৃষ্ণ শিব রাম বলিয়া বুঝিয়া লউন, না হয় কালী তারা রাধা দুর্গা সীতা লক্ষ্মী বুঝিয়া লউন, পিতা মাতা সখা সুহৃৎ যাহা বলিয়া সুখী হয়েন, তাহাই বলুন। বৈষ্ণব তাঁহাকে শক্তিরূপ বিষ্ণু বলিয়া স্থির করুন, শাক্ত তাঁহাকে বিষ্ণুরূপ শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করুন তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি কৃষ্ণ-শক্তি শিব-শক্তি কালী-শক্তি যাহাই হউন, মূর্ত্তিগত স্ত্রী-ত্ব পুরুষ-ত্ব ভেদ ভুলিয়া চিৎশক্তিস্বরূপে তাঁহার সত্ত্বা-সাগরে ডুবিলে তখন সেই তরঙ্গে মিলিয়া আসিয়া সকল মূর্ত্তিই এক হইয়া যাইবেন। শিব বিষ্ণু দুর্গা গণেশ সূর্য্য যিনিই কেন মুক্তি না দেন, সর্ব্বত্রই মোক্ষদা সেই মহাশক্তি। শক্তিতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে এ অভেদ ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। যতদিন সকল মিলিয়া অভেদভাবে এক না হইতেছে ততদিন নির্ব্বাণ মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন, শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি! নির্ব্বাণং নৈব জায়তে। তন্ত্রময়-জীবন রামপ্রসাদও সেই তালে তাল দিয়া গাহিয়াছেন—

উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
তোমার, পাঁচ ভেঙ্গে যে এক করেছ তার হাতে মা! কৈ বা বাঁচ?

জগদম্বার যে সকল নাম সাধনা করিয়া নামের তত্ত্ব-মাধুর্য্যে ডুবিয়া ভক্তসাধক কৃতার্থ—জীবন্মুক্ত হইয়া যান, দুর্ভাগ্যের কথা বলিব কি, সেই সকল নামেই আমাদের ঘন জটিল সংশয়-গ্রন্থি। যে কয়েকটি নামে লোকের 'মায়াবাদের ছায়া' বলিয়া সংশয় হয় তন্মধ্যে আর একটি নাম 'বিষ্ণুমায়া'। এই নামটি হইতেই তাঁহার 'পরম বৈষ্ণবী' উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যোগিনীতন্ত্রে দশম পটলে—

ইত্যুক্ত্বা সা মহাকালী দদাবস্মাসু শাম্ভবি।
ইচ্ছাজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিঃ সর্ব্বকার্য্যার্থ-সাধনাঃ॥
ইচ্ছা তু ব্রহ্মণে দত্তা ক্রিয়াশক্তিস্তু বিষ্ণবে।
মহ্যং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী॥

প্রলয়ার্ণবে ঘোর নামক অসুরের বধের পর আদ্যাশক্তি যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কার্য্যভার প্রদান করেন, সেই সময়ের অনুস্মরণে মহাদেব বলিয়াছেন, হে শাম্ভবি! সেই মহাকালী এই (পূর্ব্বোক্ত রূপ) বলিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমাদিগকে ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রদান করিলেন। সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মাকে ইচ্ছাশক্তি, বিষ্ণুকে ক্রিয়াশক্তি এবং আমাকে সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী জ্ঞানশক্তি প্রদান করিলেন।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার গুণবিভাগের তারতম্য অনুসারে রজোগুণে ইচ্ছা-শক্তি, সত্ত্বগুণে ক্রিয়া-শক্তি এবং তমোগুণে জ্ঞান-শক্তি, সাকারলীলায় এই ত্রিবিধ স্বরূপেই তাঁহার ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী এবং মাহেশ্বরী মূর্ত্তি। এই তিন স্বরূপে তিনি যেমন বিষ্ণুমায়া, তেমনই ব্রহ্মমায়া এবং শিবমায়া। তথাপি শাস্ত্রে অধিকাংশস্থলেই তাঁহাকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির আদি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত জীব এ সংসারে স্থিতি-শক্তির অধীন। স্থিতি-শক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠিত, স্থিতি-ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈষ্ণবী-শক্তি বা বিষ্ণুমায়া। তাই দেবগণ দেবীস্তবে বলিয়াছেন—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

দেবি! তুমি অনন্তবিক্রমা বৈষ্ণবীশক্তি, তুমি এই বিশ্বের বীজ-স্বরূপা পরমা মায়া, তোমা কর্ত্তৃকই এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত, আবার তুমিই প্রসন্না হইয়া জীবের মুক্তি বিধান কর। মায়ারূপে তিনি শিবমায়া ব্রহ্মমায়া হইলেও দেবগণ বলিতেছেন, ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিঃ এবং পরমাসি মায়া। কারণ, বৈষ্ণবীমায়ার প্রভাব ব্যতীত বিশ্বস্থিতি অসম্ভব। এইজন্যই আবার বলিয়াছেন, বিশ্বস্য বীজং। কেননা 'সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ' অর্থাৎ মোহ ব্যতিরেকে বিশ্বস্থিতি সম্ভবে না। বিষ্ণু-শক্তির অধিকারেই জীব মায়ামোহে পীড়িত হয়। এইজন্যই বিষ্ণুর নামান্তর জনার্দ্দন অর্থাৎ জন-পীড়নকারী। অতীতকালে ব্রহ্মার যে মায়াপ্রভাবে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে মহেশ্বরের যে মায়ায় জগতের সংহার সাধন হইবে, এই উভয় মায়ার কোন মায়ার সহিতই স্থিতিশীল জগতের তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নহে, যত বর্ত্তমানকালময়ী বিষ্ণুমায়ার সহিত। প্রথম সৃষ্টিকালে জীব স্বাধীনভাবে জগতে আসে নাই। কারণ যাঁহার ইচ্ছাপ্রভাবে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার ইচ্ছা-প্রভাবেই জীবের জীবত্বও সৃষ্ট হইয়াছে। আবার মহাপ্রলয়কালেও জীব স্বাধীনভাবে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবে না, কারণ যিনি জগতের সংহর্ত্তা, তিনিই জীবের জীবত্ব-সম্বরণ-কর্ত্তা। সুতরাং এই সৃষ্টি ও মহাপ্রলয় উভয়কালেই জীবের স্বাধীনভাবে কিছু ভাবিবারও অবসর নাই, প্রার্থনা করিবারও অধিকার নাই। তখন মাতৃগর্ভে প্রবেশ ও নির্গমের ন্যায় জীব অনিচ্ছাক্রমেও প্রকৃতি গর্ভে প্রবিষ্ট এবং তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে স্বতএব বাধ্য। জননীগর্ভে দশমাস অবস্থিতির ন্যায় মায়াগর্ভে জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত জীবের অবস্থান। গর্ভাধান হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত জননী যেমন গর্ভবতী, সৃষ্টি হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্তও মায়া তদ্রূপ স্থিতিমতী—এই সময়েই তাঁহার নাম বিষ্ণুমায়া। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ' মাতা যেরূপ পদার্থের ভোগ বা ভোজন করেন, সেই ভুক্ত পদার্থের গুণানুসারে গর্ভস্থ সন্তান

বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ সংসারে প্রকৃতি যেরূপ ভোগ করিবেন তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান আমরাও তদ্রূপ গঠিত বা বর্দ্ধিত হইব। তাই প্রকৃতির ভোগ্য পদার্থ রাজস তামস অংশ অতিক্রম করিয়া যাহাতে সাত্ত্বিকরূপে পরিণত হয়, তাহাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। রীতি-নীতি, আচার-বিচার, বিধি-ব্যবস্থা, সাধন ভজন, মন্ত্র তন্ত্র যত কিছু সমস্তই এই জন্য। আত্ম-প্রকৃতিকে সাত্ত্বিকভোগে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সেই ভুক্তগুণে স্বয়ং পরিপুষ্ট হইয়া যিনি যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে মায়ার গর্ভকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন. তিনিই প্রসবের পর সেই মহামায়া মায়ের প্রসূতিরূপ দর্শন করিয়া সাদরে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান লাভ করেন। গর্ভস্থ সন্তান যেমন দুরন্ত গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রসবের পর জননীর স্নেহময় মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, সাধন-সিদ্ধ যোগীন্দ্র পুরুষও তেমনই মায়াকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মময়ী জননীর বিশ্ববাৎসল্যপূর্ণ বদনমণ্ডলের কৈবল্যকান্তিচ্ছটায় দ্বৈতসংসারের নিখিল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যান। যে মায়ার গর্ভকোষে থাকিয়া একদিন সাধককে মোহময় অন্ধকারের নিকট বিভীষিকা দেখিতে হইয়াছে, আজ তিনি সেই মায়ার গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আবার সেই বিশ্বপ্রসূতির অঙ্কেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু অন্ধকারের পরিবর্ত্তে সেই শতকোটি-শরদিন্দু-সমুজ্জ্বল আনন্দ-সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বাসাগরে ডুবিয়া তখন ভাবের তরঙ্গে স্নেহের হিল্লোলে মায়ের কোলে দুলিয়া দুলিয়া খেলিতেছেন আর দেখিতেছেন, মায়া আর মায়া নাই, মায়াময়ী মা হইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, গর্ভবতী জননীকে যে সাধ দিবার প্রথা আছে, সেই প্রথানুসারেই সংসারে যাহা কিছু সাধন ভজন তাহাই প্রকৃতির সাধের ভোজন। সে ভোজনের আয়োজনে এই পর্য্যন্তই প্রয়োজন বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মার শক্তি অথবা ব্রহ্মরূপিণী শক্তি হইতে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভসঞ্চার। বিষ্ণুশক্তি অথবা বিষ্ণুরূপিণী শক্তি হইতেই সে গর্ভের পুষ্টি এবং শিবশক্তি অথবা শিবরূপিণী শক্তি হইতেই সে গর্ভের প্রসব। রজোগুণ-প্রধানা শক্তির প্রভাবে জীবজগতের সৃষ্টি, সত্ত্বগুণ-প্রধানা শক্তির প্রভাবে স্থিতি এবং তমোগুণ প্রধানা শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় বা মায়াবন্ধন মোচন। ব্রহ্মশক্তি হইতে সৃষ্টি যাহা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সুতরাং জীবের পক্ষে ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মমায়ার উপাসনায় ভূতসৃষ্টির অন্যথাকরণ-বাসনা বিফল, তবে অন্য কামনায় উপাসনা সে কথা স্বতন্ত্র। জীবমাত্রেই বর্ত্তমানে বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়ার অধীনতায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে সাধনভজন দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে তবে তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে রজোগুণ এবং তমোগুণ সংহারের কথা। সেই সময়েই সংহারকারিণী সংসার-তাপহারিণী শিবশক্তির উপাসনার পূর্ণ অধিকার। মূলতঃ যে তমোগুণ লইয়া অবিদ্যারূপে তাঁহার সংসার-সৃষ্টি, আবার মহাপ্রলয়কালে নিত্যজ্ঞানানন্দময়ী শিবশক্তিরূপে তৎকর্ত্তৃকই সে তমোগুণের সংহার। কিন্তু এ অধিকার ত সত্ত্বগুণের

পূর্ণাবস্থায়। এখন অবিদ্যাগর্ভে জীব যতদিন রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভাবে অভিভূত ততদিনই তাহার প্রতি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ। তাই শাস্ত্র সাধনার অধিকারীকে মায়াতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ভূত-ভবিষ্য-বিহারিণী ব্রহ্মমায়া এবং শিবমায়া না বলিয়া অধিকাংশ স্থানেই বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ-প্রভাবা বিষ্ণুমায়াকেই মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ সংসারে মায়ার বর্ত্তমান-প্রভাবেই তাঁহার তত্ত্ব জীবের প্রত্যক্ষরূপে বুঝিবার কথা। বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তি বলিতে বিষ্ণুর অধীন মায়া বা শক্তি নহেন। যাঁহারা শক্তিবিদ্বেষী বৈষ্ণব তাঁহারা হয়ত একথা বুঝিয়াও বুঝিবেন না। কিন্তু আমরা বলি, বৈষ্ণব বুঝুন আর নাই বুঝুন, বিষ্ণুর অধীন শক্তি কি শক্তির অধীন বিষ্ণু, মধু-কৈটভ যুদ্ধে বিষ্ণু স্বয়ং তাহা বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন। ফল কথা, বৈষ্ণব! শক্তি আর শক্তিমান অথবা মায়া আর মায়াবি-রূপে তুমি যে 'দুই' বলিয়া বুঝিয়াছ, ঐ টুকুই ভ্রান্তিবিকার। স্বরূপতঃ যিনি মায়া বা শক্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহারই লীলা-বিলাস মাত্র। আবার আজকাল কোন কোন বৈষ্ণবত্বাভিমানী সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—ভগবতী না কি পরম বৈষ্ণবী। কারণ 'আত্মবৎ সেবা' ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। এজন্য সেরূপ বৈষ্ণবকে বলিবার কিছু নাই, কারণ ইহা তাঁহাদের আত্ম-পরিচয় মাত্র। কিন্তু অধিকন্তু মধুরত্ব এই যে, মা ত বৈষ্ণবী, বাবা আবার পরমার্থ ভাই, ধন্য বৈষ্ণব। বলিহারি তোমার সিদ্ধান্তে। লোকাচারে থাকিয়াও এ সম্বন্ধের মধুরতা কেবল তুমিই বুঝিয়াছিলে!

আপন দলে নজির দেখাইবার জন্য যদি মহাদেবকে পরমার্থ ভাই বলিতে এতই সাধ হইয়া থাকে তবে একবার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটানুকীটের মা পর্য্যন্ত এক করিয়া লও না। শাক্ত বৈষ্ণবে এককণ্ঠ হইয়া সমস্বরে গান কর—জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ, তখন একা মহাদেব কেন, দেব অধিদেব উপদেব-দানব মানব ব্রহ্মাণ্ডময় যত জীব দেখিবে সমস্তই সেই অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিত্রী জগদ্ধাত্রীর পুত্র বই আর কিছুই নহে। তখন পরমার্থ বই অন্য অর্থের কথাই নাই। সুতরাং ত্রিভুবনময় পরমার্থ-ভাই বই তখন আর কিছুই নাই। বৈষ্ণব বলিতে পার, বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদে বিষ্ণুর প্রসাদে এমন দিন তোমার কবে ঘটিবে যেদিন তুমি শক্তিকে বিষ্ণুমায়া না বলিয়া বিষ্ণু বলিয়াই বুঝিবে? বিষ্ণুর অধিকৃত শক্তি বলিয়া তাঁহার বৈষ্ণবী নাম নহে, বিষ্ণুর প্রসবিত্রী বলিয়াই তাঁহার নাম বৈষ্ণবী। ভগীরথের আরাধিতা এবং আনীতা বলিয়াই গঙ্গার নাম ভাগীরথী, ভগীরথের নামে তাঁহার নাম হইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্যা গঙ্গা ভগীরথের আশ্রিতা নহেন, কিন্তু ভক্ত-চূড়ামণি ভগীরথের অপার কীর্ত্তি-প্রবাহ ত্রিজগতে অব্যাহত রাখিবার নিমিত্তই শঙ্কর-শিরোবিহারিণী সংসারতাপহারিণী বিশ্বজননী 'ভগীরথের জননী হইবেন'—এই

সাধের আদরে ভাগীরথী নাম ধারণ করিয়া ভক্তবৎসলা নিজ ভক্তির মহিমা ত্রিজগতে বিঘোষিত করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-প্রসবিত্রী ব্রহ্মাণ্ডজননী হইয়াও তিনিই আবার ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী নাম ধারণ করিয়া নিজ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপে আপনি প্রসূত হইয়া আবার আপনিই প্রসূতি হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্রিত বল, তাহাতেও তিনি তাঁহারই আশ্রিত; আর আশ্রয় বল, তাহাতেও তিনি তাঁহারই আশ্রয়। সুতরাং তাঁহাকে কিছু বলিয়াই কিছু করিবার উপায় নাই। কেবল উপায় আছে তোমার আমার নরক যাত্রার। তাই বলি, সাধক! সাবধান। এ সকল পাপ-সিদ্ধান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিও।

মায়ের আর একটি নাম ব্রহ্মময়ী। ইহা হইতেও বিদ্বেষিবর্গের আপত্তির সুবিধা এই যে, যিনি ব্রহ্ম তিনি কখনও ব্রহ্মময়ী হইতে পারেন না। যদি ব্রহ্মই হইবেন তবে আর ব্রহ্মময়ী নাম কেন? ব্রহ্ম বলিলেই হইত। ইহার উত্তরে আমরা আর সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতার পরিচয় দিতে চাই না। একান্তভক্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও সময়ে সময়ে যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন, ভ্রান্ত-জীব মানব তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নহে। তবে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সাধকগণ জানিবেন, মালা যেমন স্বর্ণময়ী, প্রতিমা যেমন মৃণ্ময়ী, সূর্য্য যেমন তেজোময়, গঙ্গা যেমন জলময়ী, জগদম্বাও তেমনই ব্রহ্মময়ী। (স্বারূপ্যে ময়ট্) ব্রহ্ম শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয়, যাহা তাঁহার স্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম অথবা যাহা ব্রহ্মের স্বরূপ তাহাই তিনি। সাকাররূপেও তিনি গুণাতীত ব্রহ্মরূপিণী, তাই তাঁহার নাম ব্রহ্মময়ী। কর-চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অস্ত্র অলঙ্কার আসন বাহন আবরণ পরিবার ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ—তাই তিনি ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মময়ী শব্দের অর্থ ব্রহ্মব্যাপিনী নহে ব্রহ্মরূপিণী। বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মব্যাপী পদার্থ জগতে কি আছে তাহা ত আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন নাই।

শক্তিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, সাধকবর্গ তাহা হইতে ইহা অবশ্য অবগত হইয়াছেন যে, বিদ্বেষী শাক্ত বা বৈষ্ণবের লক্ষ্য শক্তি আর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য শক্তি এক নহেন। রাধা লক্ষ্মী সীতা রুক্মিণী সাবিত্রী সরস্বতী গঙ্গা গৌরী গণেশ সূর্য্য শিব বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষঃ মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি পূর্ণ অনন্ত চরাচর সমস্তই শক্তিরূপ। তন্মধ্যে আবার রাধা লক্ষ্মী সীতা সতী প্রভৃতি ব্রহ্মমূর্ত্তিসকল ত মহাশক্তিরই কৈবল্যলীলা। ইতিপূর্ব্বে সংশ্রবন্ধ রাবণবধ প্রসঙ্গে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধকবর্গ তাহা হইতেই সীতাতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন। এখন বৈষ্ণবগণ যে, 'শ্রীকৃষ্ণের দাসী' বলিয়া রাধিকাকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট দিয়া পূজা করেন, রাধিকার সেই দাসীত্ব শাস্ত্রে কিরূপ উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কথা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। সাধকবর্গ

শাস্ত্রের এই তরঙ্গভঙ্গী দেখিয়াই রাধাতত্ত্ব-সুধাসমুদ্রের অপার গুরুগাম্ভীর্য্য বুঝিয়া লইবেন। দেবী-ভাগবতে নবমাধ্যায়ে, নারদং প্রতি শ্রীনারায়ণ-বাক্যম্—

প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥
গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ।
গবাং গণৈঃ সুরভ্যা চ তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া হরেঃ ॥
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ র্মুনিভিঃ পরয়া মুদা।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥
পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী সুযজ্ঞেনৈব পূজিতা।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ॥

রাধিকা প্রথমতঃ গোলোকধামে কার্ত্তিকের পূর্ণিমায় রাসমণ্ডলমধ্যে পরমাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হয়েন। অনন্তর ভগবানের আজ্ঞা ক্রমে গোপীকদম্ব, গোপবৃন্দ, গোপ-বালকবালিকা মণ্ডল, গো-গণ এবং গো-কুলের অধীশ্বরী সুরভি তাঁহার পূজা করেন। এইরূপে গোলোকবাসিগণের পূজা সমাহিত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেববর্গ এবং অমরপুরনিবাসী মুনিগণ পুষ্প ধূপ গন্ধ চন্দনাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তাঁহার পূজা এবং বন্দনা করেন। তৎপশ্চাৎ পৃথিবীমণ্ডলে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভগবান মহাদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সুযজ্ঞ তাঁহার পূজা করেন। তদনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে ত্রিলোকের লোকমণ্ডলে তাঁহার আরাধনার আরম্ভ হয়। নারদ-পঞ্চরাত্রে ঃ দ্বিতীয়রাত্রে, তৃতীয়াধ্যায়ে—

যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥ ১ ॥
যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতি-স্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২ ॥
তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু রসনাসু চ।
বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতেঃ স্থিতিরেব চ ॥ ৩ ॥
আবির্ভাব-স্তিরোভাব-স্তস্যাঃ কালেন নারদ।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ ॥ ৪ ॥
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
রসনাধিষ্ঠিতা দেবী স্বয়মেব সরস্বতী ॥ ৫ ॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতী ॥ ৬ ॥

সর্ব্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা।
সংহন্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং দেববৈরি-বিমর্দ্দিনী ॥ ৭ ॥
স্থানদাত্রী চ তেষাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথা ॥ ৮ ॥
লজ্জা ভ্রান্তিশ্চ সর্ব্বেষামধিদেবী প্রকীর্ত্তিতা।
মনোধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু ॥ ৯ ॥
রাধা-বামাংশ-সম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ ॥ ১০ ॥
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ ১১ ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে।
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ ১২ ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
সরস্বতী দ্বিধাভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ১৩ ॥
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥ ১৪ ॥
রাসাধিষ্ঠাত্রীদেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥ ১৫ ॥
রাসমণ্ডলমধ্যে চ রাসক্রীড়াং চকার সা।
কৃষ্ণচর্ব্বিত-তম্বূলং চখাদ রাধিকা সতী ॥ ১৬ ॥
রাধাচর্ব্বিত-তাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
একাঙ্গো হি তনো [তয়োঃ] র্ভেদো দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা ॥ ১৭॥
ভেদকা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
তয়োর্ভেদং করিষ্যন্তি যে চ নিন্দন্তি রাধিকাম্ ॥ ১৮ ॥
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।

পুনশ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে—

আদৌ সমুচ্চরেদ্রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
বিপরীতং যদি পঠেদ্ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥
দৈবদোষেণ মহতা যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং।
বামাচারাশ্চ মূর্খাশ্চ পাপিনশ্চ হরিদ্বিষঃ ॥

কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ শতং।
ইহৈব তদ্বংশহানিঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে॥
ভবেদ্রোগী চ পতিতো বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।
হরিণোক্তং ব্রহ্মক্ষেত্রে ময়া চ ব্রহ্মণঃ শ্রুতম্॥
ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোহসেবন্ত নিত্যশঃ।
যৎপাদপদ্মে ভক্ত্যার্ঘং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ॥
যৎপাদপদ্মনখরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সুস্নিগ্ধালক্তকরসং প্রেম্না ভক্ত্যা দদৌ পুরা॥

অপিচ—পঞ্চমরাত্রে পঞ্চমাধ্যায়ে—

যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।
অস্যা নামসহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ॥
দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গ-প্রসাধিনী।

ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকৃতিতত্ত্বের অতীত নির্লিপ্ত, ব্রহ্মস্বরূপা রাধিকাও তদ্রূপ প্রকৃতির অতীতা নির্লিপ্তা ॥ ১ ॥ কর্ম্মানুরোধে তিনি যেমন সময়ানুসারে সগুণমূর্ত্তি, মহাপ্রকৃতি রাধিকাও তদ্রূপ কর্ম্মানুরোধে কালবিশেষে স্থূলপ্রকৃতিরূপে ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২ ॥ সেই সূক্ষ্মা প্রকৃতি স্থূলরূপেও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ রসনা বুদ্ধ এবং মনে যোগশক্তি প্রভাবে অবস্থিতি করেন ॥ ৩ ॥ নারদ! কালবিশেষে মায়িক জগতে তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব মাত্র হয়, বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম নাই এবং তিনি কাহারও ক্রিয়ার বিষয় নহেন। ভগবান হরির ন্যায় ভগবতী রাধিকাও নিত্যা এবং সত্য-স্বরূপিণী ॥ ৪ ॥ মুনে! যে মহাশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনিই রাধারূপিণী, যিনি রসনার অধিষ্ঠাত্রী তিনিই স্বয়ং সরস্বতী ॥ ৫ ॥ যিনি তাঁহার বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনিই সেই দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা, এক্ষণে যিনি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়া পার্ব্বতী নামে ত্রিলোকবিখ্যাতা ॥ ৬ ॥ সমস্ত দেবতার তেজঃপুঞ্জে অধিষ্ঠিতা হইয়া যে দেববৈরি-বিমর্দ্দিনী দেবী দৈত্যকুল সংহারপূর্ব্বক দেবগণকে পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, যিনি এই ত্রিজগতের ধাত্রী, যিনি ক্ষুধা পিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টি পুষ্টি ক্ষমা লজ্জা এবং ভ্রান্তি-রূপিণী, যিনি এই নিখিল জীবের অধীশ্বরী, বিশেষতঃ বিপ্রজাতিতে যিনি ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ নারদ! রাধিকারই বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১০ ॥ সেই মহালক্ষ্মীর অংশ হইতেই সিন্ধুবালা কমলা আবির্ভূতা হইয়াছেন, ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনকালে সাগরজল ভেদ করিয়া যিনি উদ্গতা হইয়াছেন তিনিই ধরাধামে মর্ত্ত্যলক্ষ্মী এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের পত্নী ॥ ১১ ॥

স্বর্গলক্ষ্মীও তাঁহারই অংশ-সম্ভবা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিতা, আর স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মলোকবিহারিণী সাবিত্রীই ব্রহ্মার পত্নী। ভগবানের আজ্ঞাক্রমে সরস্বতী পূর্ব্বেই দ্বিভাগে বিভক্তা হইয়াছিলেন। প্রথমা সরস্বতী, দ্বিতীয়া ভারতী (সাবিত্রী)। ইঁহারা উভয়েই সিদ্ধিযোগময়ী, তন্মধ্যে ভারতী ব্রহ্মপত্নী এবং সরস্বতী বিষ্ণুপত্নী ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ রাসলীলার অধীশ্বরী পরমেশ্বরী রাধিকাই রাসমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সেই নিত্যব্রহ্মসনাতনীই পূর্ণরূপে বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণা ॥ ১৫ ॥ রাসমণ্ডল মধ্যে তিনিই রাসলীলার মূল অভিনেত্রী, সেই লীলাবিহারচ্ছলেই ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করিয়া বা উভয়ের অভেদ তত্ত্ব উভয়ে উদ্ঘাটিত করিয়া ভগবতী ভগবানের এবং ভগবান ভগবতীর প্রেমোপহার উচ্ছিষ্ট তাম্বূলাদি ভোজনাভিনয় করিয়াছেন। স্বরূপতঃ তাঁহারা উভয়েই একাঙ্গ, বহির্দৃষ্টিতে লীলামাধুর্য্য প্রকটন জন্য তাঁহাদিগের দেহগত ভেদ মাত্র; বস্তুতঃ অভেদ। কেননা, এ ভেদও দুগ্ধের সহিত তাহার শ্বেতবর্ণের ভেদের ন্যায়। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ তরলতা মাধুর্য্য ইত্যাদি সামুদায়িক অংশ লইয়া যেমন দুগ্ধ পদার্থ, সৎ-চিৎ-আনন্দ ইত্যাদি স্বরূপ লইয়াও তদ্রূপ ব্রহ্মপদার্থ। শ্বেতবর্ণ তরলতা মাধুর্য্য ইত্যাদি কোন অংশ ত্যাগ করিয়া যেমন দুগ্ধত্বনির্ণয় হয় না, শক্তি শক্তিমান শক্তি-বিভূতি ইত্যাদি কোন অংশ ত্যাগ করিয়াও তদ্রূপ ব্রহ্মত্ব নির্ণয় হয় না। ভাষায় বুঝাইবার প্রণালী অনুসারে আংশিক ভেদ কল্পনা করিয়া সেই সেই অংশের নাম পৃথক পৃথক করিলেও বস্তু যেমন পৃথক হয় না তদ্রূপ রাধা বা কৃষ্ণের লীলামূর্ত্তি পৃথক হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের কোন ভেদ নাই—রাধাকৃষ্ণ উভয় তত্ত্ব লইয়াই ব্রহ্মত্ব। যিনি রাধিকা তিনিই কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাধিকা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ যাহারা এই অভিন্ন অদ্বৈত পরমতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের ভেদ জ্ঞান করে, যতদিন চন্দ্রসূর্য্য রহিয়াছেন ততদিন নরক যাতনা হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। যাহারা তাঁহাদের ভেদ কল্পনা করিবে এবং যাহারা ব্রহ্মময় লীলাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া পরমাপ্রকৃতি রাধিকার নিন্দা করিবে ব্রহ্মার বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তাহাদিগের নারকীয় দেহের পরিপাক হইবে ॥ ১৮ ॥

পুনর্ব্বার ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন—আদিতে রাধানাম উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণ বা মাধব নামের যোজনা করিবে, ইহার বিপরীতক্রমে পাঠ করিলে নিশ্চয় তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক স্পর্শ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ জগৎপিতা এবং রাধিকা জগন্মাতা, উভয়ে এক পদার্থ হইলেও লীলাবতারে লৌকিক ব্যবহারে পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে গরীয়সী এবং বন্দনীয়া ও পূজনীয়া। সেই গৌরব রক্ষার জন্যই লোক-জগতের প্রতি শাস্ত্রের নির্দেশ যে, প্রথমে রাধিকার নাম গ্রহণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম তাহাতে যুক্ত করিতে হইবে। পিতার পত্নী বলিয়া লৌকিক ব্যবহারে পিতা

অপেক্ষা মাতার গৌরব অল্প হইবারই কথা, কিন্তু এস্থলের লৌকিক ব্যবহার ধর্ম্মানুপ্রাণিত বলিয়াই শাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং শাস্ত্র-নিরপেক্ষ কেবল লৌকিক ব্যবহার নহে—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 'সহস্রন্তু পিতৃ র্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে' পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণ গৌরবে অতিরিক্তা। তাহার কারণও শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'গর্ভধারণপোষাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী'—গর্ভধারণ এবং সন্তানপোষণ এই উভয় কারণে পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক গুরু। যাহা হইতে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করা যায় জগতে তিনিই গুরু, জগতের এ শিক্ষা দীক্ষার পরীক্ষাকারিণী প্রকৃতি অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি যাহা গ্রহণ করিতে সামর্থ্য হইবেন গুরু তাহাই শিক্ষা দিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পরীক্ষার ভার প্রকৃতির হস্তে। কিন্তু এই জগৎ-পরীক্ষাকারিণী প্রকৃতি আবার শিক্ষিতা দীক্ষিতা হইবেন-মহাপ্রকৃতিরূপিণী জননীর নিকটে। মাতার শরীরে আহারে ইন্দ্রিয়ে অন্তঃকরণে যে মন্ত্র নিহিত আছে, যে তত্ত্ব নিগূঢ় রহিয়াছে, দশমাস দশদিন পর্য্যন্ত সন্তানের প্রকৃতি সেই মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সেই তত্ত্বে শিক্ষিত হইয়াই লোকরাজ্যে অভিব্যক্ত হইবে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, শুক্র-শোণিতের ভাগেও মাতার অংশ শোণিতের মাত্রাই অতিরিক্ত এবং সেই কারণে জীবের শরীরে পিতা অপেক্ষা মাতার অংশ অতিরিক্ত। তাহাতেই ত প্রথমতঃ পিতা অপেক্ষা মাতার গুরুত্ব, তাহার পর দশমাস দশদিন গর্ভধারণ, এ সময়েও জীবের অদৃষ্টলিপি মাতার দেহরূপ ভিত্তিতেই নিখাত অক্ষরে অঙ্কিত। তিনি যেমনটি ভাবিবেন বুঝিবেন করিবেন তাঁহার শরীরে যেরূপ রস-রক্তের সঞ্চার হইবে, সন্তানের শরীরটিও সেইরূপ গঠিত এবং বর্দ্ধিত হইবে। আবার ইহার পর পঞ্চমবর্ষ পর্যন্ত স্তন্যপান। সাম্প্রদায়িক অংশ ধরিতে গেলে সন্তানের শিরায় শিরায় ধমনীতে অস্থি মজ্জায় প্রাণে প্রাণে দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণে, পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অণু পরমাণুতে মাতার গুরুত্ব। আর পিতার গুরুত্বের কারণ একমাত্র গর্ভাধান, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতঃপর দশ সংস্কার শিক্ষা বা লালন পালন ইত্যাদি ব্যাপার জন্য গুরুত্ব প্রাকৃতিক নহে, কারণ পিতার অভাবেও তাহা অন্য অভিভাবকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। এজন্য বীর্য্যাধানের পর পিতার মৃত্যু হইলেও সন্তানের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু গর্ভাধানের পর মাতার মৃত্যু হইলে, পিতা কেন ত্রিজগৎ একত্র হইলেও কাহারও সাধ্য নাই যে, সে অভাব পূরণ করে। তাই এই গুরুগম্ভীর গৌরবভাবে অবনতমস্তক হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র সকলও বলিয়াছেন, 'পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণ গরীয়সী—পরমারাধ্যা।' সংসারধর্ম্মপ্রধান শাস্ত্রসকল যেস্থলে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন, সাধনধর্ম্মপ্রধান তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্ব-দৃষ্টিতে সেস্থলে যে, এই মায় আর সেই মায় কোন ভেদ নাই—ইহা বলাই পুনরুক্তি। এখন নির্লিপ্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি রাধাতত্ত্বে এই

লৌকিক মাতৃ-তত্ত্ব কিরূপে সুসঙ্গত হইয়াছে এবং তন্ত্রশাস্ত্র সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আমরা শক্তিলীলা পরিচ্ছেদে যথাসাধ্য প্রকটিত করিব, অতি-প্রসঙ্গভয়ে এস্থলে ক্ষান্ত হইতে হইল। যাহা হউক, সাধকবর্গ যে সংস্কারের গুণে তাঁহাকে মা বলিয়া জানেন আপাততঃ সেই সংস্কারের গুণেই বুঝিয়া রাখিবেন—প্রথমে রাধানাম উচ্চারণ করিয়া পরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে হইবে এবং তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই তত্ত্ব-সাধনায় সেবাপরাধী হইতে হইবে।

নিতান্ত দৈবদোষে দুর্মতিগ্রস্ত হইয়া অথবা বামাচারের অভিমানে অন্ধ হইয়া কিম্বা মূর্খতা নিবন্ধন অথবা পাপকর্ম্মে অনুরাগবশতঃ যাহারা রাধিকার নিন্দা করে তাহারা জানে না যে, রাধিকা হরিরই স্বরূপ, রাধাদ্বেষীই হরিদ্বেষী, পরলোকে শত ব্রহ্মার পরমায়ু কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকমধ্যে উত্তপ্ত তৈলকটাহে তাহাদের অবস্থান, ইহলোকেও বংশহানি এবং সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাবৎ পর্যন্ত সেই শক্তিদ্বেষী দুরাত্মার দেহপাত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত অধর্ম্মহেতু স্বধর্ম্ম হইতে পতিত এবং শক্তিদ্বেষবশতঃ উত্থান-শক্তির অভাবে ধরাতলে পতিত হইয়া তাহাকে চিররোগ এবং পদে পদে বিঘ্ন ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মক্ষেত্র পুষ্করতীর্থে ভগবান হরি কর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকটে রাধাতত্ত্ব এইরূপ কথিত হয়, পরে ব্রহ্মার নিকটে আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। স্বয়ং-পূতপাবন সাধুগণ এইরূপে সেই ত্রৈলোক্য-পাবনী রাধিকার চরণাম্বুজ-সেবায় নিত্যনিরত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি সহকারে সেই উপাস্য দেবীর চরণারবিন্দে নিয়ত অর্ঘ্য প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন লীলাবিলাসকালেও বৃন্দাবনের বনকুঞ্জে প্রেম-মধুরমূর্ত্তি ভগবান ভক্তিভরে নিজ ধীরকরাঙ্গুলি-সঞ্চালনে প্রেমময়ী ব্রহ্মময়ীর পাদপঙ্কজনখর-প্রান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল অলক্ত রসরাগে সুরঞ্জিত করিয়াছেন।

আবার রাধাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, রাধিকার সহস্রনাম মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ঋষি, মহামহিষমর্দ্দিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, মহাবিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ। সর্ব্বপ্রথমে যিনি যে যে দেবতার যে-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সিদ্ধ, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। যাঁহারা অদ্বৈততত্ত্বে অভিন্নজ্ঞানে যুগলরূপের উপাসক তাঁহাদিগকে বলিবার কিছু নাই। ভেদজ্ঞানেও সাধকগণ এক্ষণে দেখিয়া লউন, রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ দাসী। আবার নারদপঞ্চরাত্রের পঞ্চমরাত্রে পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

> যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।
> অস্যা নামসহস্রস্য ঋষি নারদ এব চ।
> দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গ-প্রসাধিনী।

যাঁহার প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামের অধীশ্বর হইয়াছেন এবং পরমপ্রভু-পদ লাভ করিয়াছেন, সেই এই মহেশ্বরী রাধিকার সহস্রনাম মহামন্ত্রের ঋষি নারদ (মন্ত্রভেদে), পরাৎপরা রাধিকা দেবতা, চতুর্ব্বর্গসাধনে বিনিয়োগ।

যে দাসীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দাসীর তন্ত্রে শিক্ষিত হইয়া দাসীর যন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া ভগবান—ভগবান হইয়াছেন, যে দাসীকে উপাসনা করিবার জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বপ্রভুও দাস সাজিয়াছেন, যাঁহার চরণ-চিন্তায় চরাচর চরিতার্থ, সেই চতুরানন চূড়ামণি চিন্তামণির চূড়া যাঁহার চারুচরণ চুম্বনাশয়ে ভূতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত, ভেদজ্ঞানিন্! তাঁহাকে যদি শ্রীকৃষ্ণের দাসী বল তবে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরী বলিবে কাহাকে? এ সকল আমার কথা নহে, তোমার কথারই প্রত্যুত্তর, তাই এত মানামানের বিচার। আমার কৃষ্ণের দাসীও কেহ নাই, ঈশ্বরীও কেহ নাই, কিন্তু তোমার কৃষ্ণের যখন দাসীর প্রয়োজন আছে তখন ঈশ্বরীর প্রয়োজন না থাকিবে কেন? দ্বৈতজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে পদক্ষেপ করিলেই ঈশ্বর হইলেও তোমার কল্যাণে তাঁহাকে প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে দাসত্বও ভোগ করিতে হইবে তাহা অনিবার্য্য। অথবা তোমার ভাষায় যদি যাঁহাকে সেবা করা যায় তাঁহার নাম দাসী আর যিনি সেবা করেন তাঁহার নাম প্রভু হয়, তাহা হইলে এ দাসত্বে প্রভুত্বে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যাহা হউক ভেদজ্ঞানিন্! এসময় কলিযুগের উনবিংশ শতাব্দী, আজকাল মা মাসীকে দাসী বলিবারই ব্যবস্থা বটে!

যাহা হউক এক্ষণে দেখিতে হইতেছে, ভগবান বা ভগবতী পরস্পরের দাস বা দাসী হউন বা না হউন তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? হইলেও উপাসকের তাহা বিচার করিবার অধিকার বা প্রয়োজন কিছু নাই। ভগবানের দাসী এই অনুরোধে যদি রাধিকার পূজা করিতে হয় এবং সে পূজায় যদি রাধিকার সন্তোষের প্রার্থনা থাকে তবে যথার্থই রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের দাসী কি না, বিচারে এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক—এখন সে বিচার করিবে কে? যদি বল, আমরাই বিচার করিব, সাক্ষ্য দিবেন স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ, তাহা হইলেও মীমাংসা সুকঠিন। কারণ ব্রজবিহার সময়ে প্রেমলীলার অভিনয়ে রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন', শ্রীকৃষ্ণ আবার রাধিকাকে তেমনই বলিয়াছেন, তোমাকে 'তুমি' বলিতেই আমি অসমর্থ, 'সর্ব্বস্ব ধন' বলিব সে ত পরের কথা। ভগবানের উক্তির এই অতিরিক্ত অংশটুকু ত্যাগ করিয়া দুইজনকে সমান সমান ধরিয়া লইলেও ত কেহ কাহারও দাস বা দাসী হইতে পারেন না। এখন এ সাক্ষীর বাক্যে নির্ভর করিয়া বিচার হইবে কিরূপে? তাই বাক্য ছাড়িয়া যদি কার্য্য দেখিয়া বিচার করিতে চাও তবে সে বিচারে আর তুমি আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিব কি? মানভঞ্জনে ভগবান নিজেই রাধিকার চরণান্তে চূড়ান্ত বিচার করিয়াছেন। আর যদি বল, প্রেমসাগরের লীলাতরঙ্গে সেই ক্ষণিক সেবার লহরী লইয়া যখন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, 'তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন' কেবল সেই সময়ের সেই কথার সেই ভাবটুকু লইয়াই আমরা রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট দিয়া

পূজা করিব। তাহা হইলে ত আবার সেই কথা, তুমি যেমন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট দিয়া রাধিকার পূজা করিতে পার, আমিও আবার তেমনই মানভঞ্জনের সময়টুকু লইয়া রাধিকার উচ্ছিষ্ট পাইবার জন্য লালায়িত শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদাইয়া তাড়াইয়া দিতে পারি। তোমারও ভাবের সেবা, আমারও ভাবের সেবা, তোমারও যেমন কথায় মাধুর্য্য কার্য্যে চাতুর্য্য আমারও অগত্যা তাহাই—এ অবস্থায় নিষ্পত্তি দূরে থাক, সম্মিলনই অসম্ভব। এই দুঃখেই কবিগণ বলিয়াছেন, দুইজন সরল হইলে তাহাদের পরস্পর-বিজড়িত প্রেম চিরকালই সরল এবং সুস্থির থাকে। একজন সরল একজন কুটিল হইলে তাহাদের প্রেম কিছুদিন অর্থাৎ যতদিন ঐ কুটিলের কুটিলতা প্রকাশ না পায় ততদিনই স্থির থাকে আর দুইজনই যে স্থানে কুটিল সে স্থানে প্রেম চিরস্থায়ী হইবে সে ত দূরের কথা, আদৌ 'কুটিলয়োর্ঘটনৈব ন জায়তে' দুই কুটিলে প্রেমের সঙ্ঘটনই হয় না। ভেদবাদিন্! তোমার আমার এই কুটিলতার জন্য প্রেমের সঞ্চার-সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, যাঁহাদের তত্ত্ব লইয়া এ প্রেমের বিচার, তাঁহারা দুইজনেই ত অতি কুটিল, ত্রিভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গিনী অথচ একাঙ্গ ও একাঙ্গিনী। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

> চন্দ্র মিটে, দিনকর মিটে, মিটে ত্রিগুণ বিস্তার।
> দৃঢ়বৎ শ্রীহরিবংশকো মিটে না নিত্য বিহার॥

চন্দ্র মিটিবে, সূর্য্য মিটিবে, ত্রিগুণ-বিস্তার এ প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড মিটিয়া গিয়া মহাপ্রলয় ঘটিবে তথাপি হরিবংশ সম্প্রদায়ের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে নিত্যবৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বিহার কখনও মিটিবে না। তাই বলি সাধক! জগৎপিতা জগজ্জননীর ঐ ত্রিভঙ্গসঙ্গ-সুন্দর কলেবরে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ত্রি-ভঙ্গ-রঙ্গ দেখিয়া সকল ভেদ ভুলিয়া যাও। একবার বাবাকে মা বলিয়া, মাকে বাবা বলিয়া বাবা-মা এক করিয়া সংসারে লইয়া চল। সেই চন্দ্র-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল প্রফুল্ল সহস্রদল কমলকোষে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্ম্ময়ীর অভিন্ন কৈবল্য-লীলাস্থলে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া বল—কি জানি, কে তোমরা? বাবা হও মা হও, যে হও সে হও—বলিয়া দাও আমি কাহার? ভাই সাধক! মায়ের উপাসক হও বা বাবার উপাসক হও, বাবা-মা যখন এক হইয়া যাইবেন তখন তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিবার, অপ্রস্তুত করিবার এমন সুযোগ আর হইবে না। বাবা ও মা যখন বাবা কিম্বা মা বলিয়া আপন পরিচয় দিতে লজ্জায় অধোবদন হইবেন, সাধক! জানিও, এ বিচারে সেইদিন তুমিই জয়ী। সন্তানের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাদের সেই লজ্জাবনত মৌন বদনমণ্ডলে অপ্রতিভ মৃদুমধুর হাস্যচ্ছটা যে একবার দেখিয়াছে—কে মা কে বাবা কে ছোট কে বড়, এ সংশয় তাহারই জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছে। তন্ত্রতত্ত্বের স্বজনবর্গ! জননীর অঞ্চলনিধি সাধকবর্গ! তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও কোনদিন

এমন দিন ঘটিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তবে এইদিনে অথবা সেইদিনে দয়া করিয়া দীন-দয়াময়ীর এই দীনহীন সন্তানের কথা অন্ততঃ অন্তরে একবার স্মরণ করিও। কি করিব ভাই। সাধনার সাধ্যতত্ত্ব কথায় বুঝাইবার উপায় নাই। যাঁহার তত্ত্ব লইয়া এ বিচার, একবার সেই তত্ত্বময়ীকে ডাকিয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া বল, মা গো! তুমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যা রাধা হও অথবা আরাধিকা রাধিকা হও—তোমার লীলা তুমি জান। লীলাময়ি মা! একবার এই নিভৃত হৃদয়-নিকুঞ্জবনে স্ব-স্বরূপে দেখা দেও মা! সঙ্গিনীকুল সঙ্গে করিয়া শ্যামাঙ্গে একাঙ্গ হইয়া একবার ত্রিভঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও! মদনমোহন-মনোমোহিনি! একবার ঐ ভুবনমোহন রূপের ছটায় হৃদয়বন আলো করিয়া দাও। আমি তোমার আলোকে তোমায় দেখিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া লই। শ্যামরঙ্গিনি! একবার শ্যামাঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও, গৌরি গো! আমাদের গৌরাঙ্গে শ্যামাঙ্গে সকল ভেদ ঘুচিয়া যাক। মা! তুমি আপন মান আপনি ভাঙ্গ, আপনি গড়, আপন পায়ে আপনি পড়, রাইরূপে মান বৃদ্ধি ক'রে শ্যামরূপে মান ভঙ্গ কর, তুমি লীলাময়ী ব্রহ্মময়ী, তাই তোমার এ মান শোভা পায়। আর মা! আমরা যে ঘোর মদান্ধ ভ্রান্ত জীব। আমরা মান গড়িতে জানি কিন্তু ভাঙ্গিতে জানি না। তাই মায়াময় জীব হইয়া ব্রহ্মময়ীর মানভঞ্জন বুঝিতে পারি না। মা গো! যে তোমার মানভঞ্জন বুঝিয়াছে, তাহার জন্মের মত মান অপমান দুইয়েরই ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। ভবভয়ভঞ্জিনি! ভক্তহৃদয়রঞ্জিনি! নিত্যনিরঞ্জনি! মা গো! তুমি শক্তিরূপিণী, শক্তি-মুক্তি বিধায়িনী, দয়া করিয়া তোমার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি তুমি দাও, আমরা ঐ ভক্তবাঞ্ছিত চরণাম্বুজে মান অপমানের অঞ্জলি দিয়া জন্মের মত অবসর লই। ভেদবাদিন্! শক্তি শক্তিমানের ভেদ কল্পনা করিয়া আর অধঃপাতের পথ প্রশস্ত করিও না। শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট রাধিকাকে দিলে তিনি তাহাতে অবমানিতা হইবেন না। কারণ রাধিকার দৃষ্টিতে কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র। কিন্তু ব্রহ্ম বস্তুতে তোমার এই অবমাননা-বুদ্ধি ঘটিলে নরকেও নিস্তার নাই; যাঁহার গৌরবে গৌরবিত হইয়া রাধিকার প্রতি তোমার এ অবমাননা-বুদ্ধি, তিনি কিন্তু সেই ভক্তবৎসলার ভক্তিভরে অধীর হইয়া বলিতেছেন, নির্ব্বাণতন্ত্রে—

আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ।
মদ্‌গতিং চৈব তেষাং হি দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ॥
গুরুণা ভাবমার্গেণ মন্ত্রমার্গেণ চৈব হি।
যে জনা মাং ভজন্ত্যেবং তে নরা মৎসমাঃ সদা॥
যা নারী মামভেদেন ভজতে পুরুষং তথা।
মৎসমানা চ সা নারী জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

ভক্ত্যা বাপ্যথবাঽভক্ত্যা যজন্তি যুগলং যদি।
তব ভক্ত্যা প্রদাস্যামি মদ্‌গতিং শৃণু রাধিকে॥

রাধানামের পরে কৃষ্ণনামের যোজনা করিয়া যাহারা জপ করে, আমি তাহাদিগকে নিজগতি প্রদান করি তাহাতে সংশয় নাই। গুরু কর্ত্তৃক ভাবমার্গে এবং মন্ত্রমার্গে উপদিষ্ট হইয়া যাহারা আমাকে এইরূপে অর্থাৎ স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণের অভিন্নভাবে অথচ উপাসনায় প্রেমময়ীর প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া প্রথমে রাধা পরে কৃষ্ণ উভয় নামের যোজনায় মহামন্ত্র জপ করে তাহারা সর্ব্বদা আমার সমপ্রভাব। যে নারী পুরুষরূপ আমাকে তোমার সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে উপাসনা করে সেও তোমার সমান প্রভাব লাভ করে—ইহা নিঃসংশয়। আর অধিক কি, ভক্তিতেই হউক আর অভক্তিতেই হউক, যাহারা তোমার সহিত আমার অভেদ বুদ্ধিতে যুগলরূপের ভজনা করে, শুন রাধিকে! তোমার ভক্তিপ্রভাবে আমি তাহাদিগকে আমার গতি প্রদান করি। অর্থাৎ পূর্ণভক্তি থাক আর নাই থাক, যুগলরূপের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব যে, ঘোর পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়েও অজস্র প্রেম নির্ঝর ঢালিয়া দিয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমরূপ পরব্রহ্ম-তত্ত্বতরু মুকুলিত কুসুমিত এবং ফলিত করিয়া দেয়।

ভেদজ্ঞানি বৈষ্ণব। এখন জিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া বিষ্ণুর দোহাই দিয়া, কোন্ সাহসে তুমি বিষ্ণুর উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিতে চাও? বিষ্ণুর দাসের দাস তস্য দাস হইয়া বিষ্ণুর আরাধ্য দেবতার অবমাননা করিতে চাও, কিসে তোমার এত অহঙ্কার? আপন ইষ্ট দেবতার উপরে আর কাহারও শ্রেষ্ঠতা তুমি স্বীকার করিতে চাহ না—ভাল, তাই বলিয়া এক বস্তুতে দুইভাগ করিয়া একটিতে প্রভুত্ব অন্যটিতে দাসত্বের আরোপ কর কেন? রাধাকে তোমার কৃষ্ণেরই স্বরূপ না বলিয়া দাসী বল কেন? আর যদি লীলাতত্ত্বে ডুবিয়াই বল, তাহা হইলেও রাধাকে যেমন কৃষ্ণের দাসী বল, কৃষ্ণকে তেমনি রাধার দাস বল না কেন? অথবা ভাবিয়াছ যে, রাধাকে দাসী না বলিলে কৃষ্ণের প্রভুত্ব থাকিবে না? এই কি তোমার বিষ্ণুতে ব্রহ্মবুদ্ধি? রাধা দাসী হউন আর না-ই হউন, প্রভু যিনি তিনি চিরকালই প্রভু। ভাই। রাধিকার দাসীত্ব লইয়া কৃষ্ণের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে যাও, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট দিয়া কৃষ্ণের ইষ্টদেবতার পূজা করিতে যাও কিন্তু একবারও বুঝিতে চাও না যে, কৃষ্ণকে ভজিয়াও তোমার এ দুর্গতি ঘটে কেন? ত্রৈলোক্যরক্ষক প্রভু থাকিতেও তোমার রক্ষা নাই কেন? যাঁহার উপাসনা কর তাঁহারই দক্ষিণাঙ্গে পূজা করিয়া বামাঙ্গে অস্ত্রাঘাত। আহা! এমন পূজায় ভগবান তোমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন, কি সুদর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন তাহা জানি না। দীনবন্ধো! দয়াময়! তুমিই ত্রৈলোক্য রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই চিরকাল বসুন্ধরার ভারহর্ত্তা। প্রভো!

এ সকল অপসিদ্ধান্ত হইতে সাধক সমাজকে রক্ষা কর। অথবা প্রভো! ইহা তোমারই স্বেচ্ছাকৃত কৃপণতা, যে-তত্ত্বে ডুবিয়া তুমি আপনি আত্মহারা, সে রাধাতত্ত্ব সাধারণে বিতরণ করিবে না বলিয়াই চক্রিচূড়ামণি! জীবের বুদ্ধিচক্র পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছ। তাই বলি ভেদজ্ঞানি বৈষ্ণব। যদি ভেদজ্ঞানেই বুঝিয়াছ তবে ইহাও বুঝিয়া লও যে, স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহার উপাসক তুমি তাঁহার উপাসনা করিবে ইহা শতকোটি জন্মান্তরেও সম্ভবে কি না সন্দেহস্থল।

পরমার্থ পথে এই সকল কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া যাঁহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের মধ্যেই কাহারও কাহারও মুখে ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়া শক্তি অবস্থিতা। সুতরাং আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া আশ্রিতের উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? শক্তি শক্তিমানের এই আশ্রিত এবং আশ্রয় ভাব কিরূপ, তাহার অনেক প্রমাণই সাধকবর্গ এ পর্য্যন্ত পাইলেন। এক্ষণে আর আমরা ইহার নূতন উত্তর কি করিব? তবে শক্তিতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া আশ্রিত এবং আশ্রয় ভাব লইয়া যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে ত দেখিতে পাই, হংসকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত, গরুড়কে আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু অবস্থিত, বৃষকে আশ্রয় করিয়া মহাদেব অবস্থিত, সিংহকে আশ্রয় করিয়া দেবী অবস্থিতা। এখন তাই বলিয়া কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে উপেক্ষা করিয়া হংস গরুড় বৃষ আর সিংহকেই আশ্রয় এবং প্রধান বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে? আরোহী আর বাহনে যে সম্বন্ধ, শক্তি আর শক্তিমানেও সেই সম্বন্ধ। ইহা কেবল উপযুক্ত প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর মাত্র। বস্তুতঃ শক্তি এবং শক্তিমান বলিয়া দুইটি পদার্থ নাই এবং থাকিবার প্রমাণ নাই প্রয়োজনও নাই। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক সমস্তই শক্তি, দেহ ইন্দ্রিয় মন আত্মা সমস্তই শক্তি বভূতি। তবে আত্মরূপিণী চিৎশক্তি সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শক্তিতত্ত্বের প্রগাঢ় ঘনরূপ, আর দেহ ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি সেই ঘনীভূত মহাশক্তির ইতস্ততঃ প্রসারিত অরুণ-কিরণের ন্যায় তরল অংশ মাত্র। স্বরূপতঃ সূর্য্য তেজঃ-পদার্থ হইলেও লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত যেমন সূর্য্য তেজস্বী এবং সূর্য্যের তেজঃ বলিয়া ব্যবহার হয়, তদ্রূপ আত্মপদার্থ স্বয়ং শক্তিরূপ হইলেও জীবের বোধ-সৌকর্য্যার্থ শাস্ত্র 'আত্মা' শক্তিমান এবং আত্মার শক্তি বলিয়া বুঝাইয়াছেন, এই মাত্র বিশেষ। পরমার্থতঃ শক্তি ভিন্ন শক্তিমান বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই। তোমার আমার ভাষায় বা বুদ্ধিতে তুমি আমি যাহাকে শক্তিমান বলিয়া বুঝি, সেই পুরুষমূর্ত্তিও প্রকৃতিরই রূপান্তর বা বিকৃতি মাত্র। অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। যিনি সকল পুরুষের অধিষ্ঠাতা বা অন্তর্যামী সেই জগদেক পুরুষোত্তম পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, নির্ব্বাণতন্ত্রে—

জায়তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো যথা পৃথ্বাং বিলীয়তে।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে ॥
জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে।
তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াঃ প্রজায়তে ॥
তথা প্রলয়কালে তু পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে।
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্প্যতে ॥
একাংশেন ভবেদ্ ব্রহ্মা একাংশেন জনার্দ্দনঃ।
একাংশেন ভবেচ্ছম্ভুঃ কালিকায়াঃ সুলোচনে ॥
অপারা সা মহাকালী নদ্যাদীনাং সমুদ্রবৎ।
গোষ্পদে চ যথা তোয়ং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা ॥
গোষ্পদং কিং বিজানীয়াৎ সমুদ্রস্য জলং শিবে।
তেন ব্রহ্মা ন জানাতি বিষ্ণুঃ কিং বেত্তি শঙ্করঃ ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা যথা কাল্যা জন্যন্তে চ সুরাদয়ঃ।
তথা প্রলয়কালে তু পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে ॥
অতো নির্ব্বাণদা কালী পুমান্ স্বর্গপ্রদায়কঃ।
দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ ॥
কালী নাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥
নির্গুণঃ পুরুষঃ কাল্যা সৃজ্যতে লুপ্যতে যতঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

শাক্তমত-চন্দ্রিকায়াং—

শক্তির্ব্রহ্মা শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্বিষ্ণুশ্চ বাসবঃ।
অন্যে চ বহবো দেবাঃ শক্তিমূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
শক্তিং বিনা যতো হ্যেষামসামর্থ্যং প্রকীর্ত্তিতং।
অতস্তেভ্যঃ প্রধানং হি শক্তিং বিদ্ধি মহামতে ! ॥

ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে—

ধ্যায়ন্তি তাং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামলসুন্দরং।
কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্ ॥
ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্ত্রং দিগম্বরং।
নানারূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ যাং ॥
সা দেবী প্রকৃতি র্ব্রহ্মতেজোমণ্ডল-বাসিনী।

কেবলং প্রকৃতিশ্চৈকা দৃশ্যতে ভক্তিযোগতঃ ॥
ভিদ্যতে সা কতিবিধা সূর্য্যো দর্পণসন্নিধৌ ।
আকাশো ভিদ্যতে যাদৃক্ ঘটস্থাদিস্তথা চ সা ।
একৈব হি মহাবিদ্যা নামমাত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।

কূর্ম্মপুরাণে কূর্ম্মোক্তৌ—

সর্ব্ববেদান্ত-বেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদং ।
অনন্তমক্ষয়ং ব্রহ্ম কেবলং নিষ্কলং পরম্ ॥
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদং ।
পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ ॥
অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যা-স্তৎ পরমং পদং ।
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দ্বৈতবর্জ্জিতম্ ॥
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্ ॥

তত্রৈব শ্রীমদ্দেবীবচনং—

যত্তু মে নিষ্কলং রূপং চিন্ময়ং কেবলং পরং ।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনন্তমমৃতং পদম্ ॥
জ্ঞানেনৈকেন তল্লভ্যমক্লেশেন পরং পদং ।
জ্ঞানমেব প্রপশ্যন্তো মামেব প্রবিশন্তি তে ॥

দেব্যাগমে—

চিতিরূপা মহামায়া পরং ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ।
সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা ॥

যোগিনীতন্ত্রে—

যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ ।
সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা ॥

যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদাহৃতা ।
সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী স চ সর্ব্বো মহেশ্বরঃ ॥
যদ্রোমকুহরে কোটিব্রহ্মাণ্ডাদি বিলীয়তে ।
সা হি নানাবিধা ভূত্বা সাধকাভীষ্টদা ভবেৎ ।

নবরত্নেশ্বরে—

স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে।
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী॥

নির্ব্বাণতন্ত্রে। বৃক্ষ যেমন পৃথিবী হইতে জাত হইয়া আবার পৃথিবীতেই বিলীন হয়, বুদ্বুদ যেমন জল হইতে উদ্ভূত হইয়া আবার জলেই বিলীন হয়, তড়িৎ যেমন জলদ হইতে উৎপন্না হইয়া আবার জলদে বিলীনা হয়, সৃষ্টিকালে তদ্রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণও সেই অনাদি সনাতনা কালিকার কলেবর হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রলয়কালে পুনর্ব্বার তাঁহাতেই বিলীন হয়েন। দেবি! এইজন্য জীব যাবৎকাল সেই মহাকাল-বিলাসিনীর পরমতত্ত্ব জ্ঞাত না হয়, তাবৎকাল তাহার মুক্তি-বাসনা কেবল উপহাসের কারণ হয়। আদ্যাশক্তি কালিকার একাংশ হইতে ব্রহ্মা, একাংশ হইতে জনার্দ্দন, একাংশ হইতে শম্ভু উৎপন্ন হইয়াছেন। সুলোচনে! নদনদী সরোবর ইত্যাদি কেহই যেমন অপার সমুদ্রের পারান্তরে যাইতে সমর্থ নহে অর্থাৎ তাহাদিগের স্রোত যতই কেন প্রবল না হউক, সমুদ্রের বিশাল গর্ভে পড়িয়া সকলেই যেমন আত্ম-অস্তিত্ব হারায়, তদ্রূপ সেই অপার অনন্ত মহাকালীতত্ত্বে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অন্তর্হিত হয়। কালীতত্ত্ব-মহাসমুদ্রের নিকটে ব্রহ্মাদি দেবতার অস্তিত্ব কেবল গোষ্পদাঙ্কিত সীমাবদ্ধ জল বই আর কিছুই নহে। সমুদ্রের অগাধ গাম্ভীর্য্য অবধারণ করা গোষ্পদের সম্বন্ধে যেমন অসম্ভব, কালীতত্ত্বের অভিজ্ঞানও ব্রহ্মাদি দেবতার পক্ষে তদ্রূপ অসম্ভব। কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই ত্রিকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু এই ত্রিকাল যাঁহার ত্রিনয়নের তিনটি নিমেষ মাত্র, সেই মহাকালও যাঁহার লীলাকটাক্ষে ক্ষণে উৎপন্ন ক্ষণে বিলীন, সেই কালীর তত্ত্ব কাহার বুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর কেহই তাঁহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহারাও সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, আবার প্রলয়কালে তাঁহাতেই লীন হয়েন। এইজন্য তাঁহার পুরুষমূর্ত্তি স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির হেতুমাত্র, নির্ব্বাণ-মুক্তিদায়িনী একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। পাপীর দণ্ডবিধানকর্ত্তা যমের অধিষ্ঠান ভূমি দক্ষিণ দিক্, সেই দক্ষিণ দিক্, যাত্রাকালে কালভয়-কম্পিত হইয়া মহাপাপীও যদি একবার কালী নাম কীর্ত্তন করে, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডবিদারী ব্রহ্ম-নামের প্রচণ্ড প্রতাপে ভীত হইয়া দণ্ডধর নিজ অধিকার দক্ষিণ দিক্ পরিহার

করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করেন। তাই ত্রিলোকের লোক দক্ষিণদিগ্‌-ভয়হারিণী দক্ষিণা কালী বলিয়া তাঁহার নাম গান করে। অথবা গুণাতীত পুরুষ মহাকালকেও সৃষ্ট এবং লুপ্ত করিতে তিনি দক্ষিণা, কুশলা। এইজন্যও তাঁহার নাম দক্ষিণা কালী। কেননা বিকৃতিরই আবির্ভাব ও তিরোভাব, প্রকৃতি নিত্য-নিশ্চলা। তাই ভগবান আবার বলিয়াছেন—

প্রকৃতি বিকৃতিমাপন্না সর্ব্বং পশ্যতি পার্ব্বতি।
বিকৃতিঃ প্রকৃতিমাপন্না ততঃ কিঞ্চিন্ন পশ্যতি ॥

প্রকৃতি যখন বিকৃতিরূপ লাভ করেন তখনই তিনি স্বরচিত সকল জগৎ দর্শন করেন। আবার সেই বিকৃতি যখন প্রকৃতিরূপ লাভ করেন তখন তিনি কৈবল্যস্বরূপে অবস্থান হেতু আর কিছুই দর্শন করেন না অর্থাৎ প্রকৃতিগর্ভে বিকৃতিরূপ দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইলে সেই অদ্বৈতরূপিণী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীই একাকিনী অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহার দৃশ্য তিনি বই তখন আর কিছু থাকে না। স্থানান্তরে পরিস্ফুটরূপেই বলিয়াছেন, প্রকৃতে বিকৃতিঃ পুমান্‌—পুরুষরূপ কেবল প্রকৃতিরই বিকৃত মাত্র।

শাক্তমত-চন্দ্রিকা। ব্রহ্মাও শক্তি, শিবও শক্তি, বিষ্ণুও শক্তি, বাসবও শক্তি এবং অন্যান্য বহু দেব যত আছেন সকলেরই মূল শক্তি। শক্তি ব্যতিরেকে আত্ম অস্তিত্ব রক্ষায় কেহই সমর্থ নহেন। অতএব হে মহামতে! শক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অবগত হও।

ব্রহ্মাণ্ড-তন্ত্রে বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ সেই মহাশক্তিকেই দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপে, কেহ কেহ বা চতুর্ভুজ প্রশান্ত লক্ষ্মীকান্তরূপে ধ্যান করেন। শৈবগণ কেহ কেহ যাঁহাকে পঞ্চবক্ত্র, দিগম্বর ত্রিশূলধররূপে, কেহ কেহ বা অন্যান্য চতুর্ব্বক্ত্র, একবক্ত্র, প্রভৃতি ধ্যানানুসারে নানারূপে দর্শন করেন, সেই মহাদেবী প্রকৃতিই ব্রহ্মতেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরবাসিনী। যোগিন্দ্রগণ একান্ত ভক্তিযোগে পরিণামে সেই একমাত্র প্রকৃতিকেই দর্শন করেন। দর্পণ সন্নিধানে একমাত্র সূর্য্যমণ্ডল যেমন সহস্র-সহস্র রূপে প্রতিভাত হয়েন তদ্রূপ নিজ মায়া সন্নিধানে একমাত্র প্রকৃতিই অনন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। ঘটাকাশ গৃহাকাশ জলাকাশ মহাকাশ ইত্যাদি রূপে বহু উপাধির ভেদ হইলেও আকাশ যেমন স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহে, তদ্রূপ রূপের অনন্ত ভেদ হইলেও অনন্তরূপিণীর স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। সেই একমাত্র মহাবিদ্যাই বিশ্বময়ী, নাম মাত্র পৃথক্‌ পৃথক্‌।

কূর্ম্মপুরাণে সমস্ত বেদ বেদান্তে ব্রহ্মবাদিগণের ইহাই নিশ্চিত তত্ত্ব যে, এক সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম কূটস্থ অচল এবং ধ্রুবরূপে যোগিগণ যাহা দর্শন করেন তাহাই মহাদেবীর পরমপদ। অনন্ত অক্ষয় কেবল নিষ্কল পরব্রহ্মরূপে যোগিগণ যাহা দর্শন

করেন তাহাই মহাদেবীর পরমপদ। যে পরাৎপর শাশ্বত শিব অচ্যুত অনন্ততত্ত্ব প্রকৃতিগর্ভে বিলীন তাহাই দেবীর পরমপদ। শুভ্র নিরঞ্জন শুদ্ধ নির্গুণ দ্বৈতবর্জ্জিত যাহা কেবল আত্মোপলব্ধিরই বিষয় তাহাই দেবীর পরমপদ।

দেবীবাক্য। যাহা আমার চিন্ময় কেবল নিষ্কল পরমরূপ যাহা সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত অনন্ত অমৃতপদ, অক্লেশে কেবল জ্ঞান দ্বারাই তাহা লভ্য। যাহারা জ্ঞানরূপে আত্মদর্শন করে তাহারা আমাতেই প্রবিষ্ট হয়।

সেই চৈতন্যরূপিণী পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়া সেবকগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই নানারূপ ধারণ করিয়াছেন।

যিনি বিশ্বেশ্বর দেবরূপে বিশ্বব্যাপী হইয়া অবস্থিত, তিনিই বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বেশ্বরী দেবী।

যে কোন পদার্থের যাহা কিছু শক্তি তাহাই দেবী বিশ্বেশ্বরী এবং সেই সমস্ত পদার্থই স্বয়ং মহেশ্বর।

যাঁহার প্রতি রোম-কুহরে কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত বিলীন হইতেছে, (কি জানি কেমন অনুগ্রহ) তিনিই আবার নানাবিধ লীলামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের অভীষ্ট দান করিতেছেন।

নবরত্নেশ্বরে সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপে পুরুষরূপে কিম্বা নিষ্কল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করিবে। স্বরূপতঃ তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন, জড়ও নহেন অর্থাৎ কোনরূপেই বদ্ধ নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীত্ববাচক নামেই ব্যবহৃত, তিনিও তদ্রূপ স্ত্রী (শক্তি) শব্দেই কীর্ত্তিতা অর্থাৎ কল্পলতার নিকটে লতার ফল, বৃক্ষের ফল যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। তাহাতে লতা বা বৃক্ষের শক্তি অতিক্রম করিয়া দৈবশক্তিই প্রকাশ পায়। তথাপি কল্পলতা যেমন লতারূপিণী তদ্রূপ নিখিল-মূর্ত্তি-স্বরূপা এবং নিখিল মূর্ত্তির অতীতা হইলেও তিনি স্ত্রীরূপধারিণী। কল্পলতা বৃক্ষের ফল প্রসব করিলেও লতা যেমন তাহার স্বরূপমূর্ত্তি তদ্রূপ দেব দানব প্রভৃতি সমস্ত পুরুষমূর্ত্তি তাঁহারই রূপ হইলেও শক্তিরূপই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি। কি দ্বৈতলীলায় কি অদ্বৈতলীলায়, কি ব্রহ্মস্বরূপে কি জীবরূপে—স্ত্রী শক্তি পুরুষ শক্তি, শক্তি উপাস্যা পুরুষ উপাসক, ইহাই সাধনার শেষ সোপান এবং প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তাঁহার স্বরূপ হইলেও এই উপাস্য উপাসক ভেদের কারণ কেবল স্বভাবতঃ স্ত্রীরূপে তাঁহার সমধিক শক্তি-প্রকাশ, এই প্রকাশের আধিক্য জন্যই স্ত্রীর 'শক্তি' নাম। এতাবতা শিব কৃষ্ণ রাম সূর্য্য বিষ্ণু গণেশ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে শক্তির অল্প প্রকাশ, ইহা কেহ মনে করিবেন না। কেননা ঐ সকল মূর্ত্তি আপাততঃ পুরুষরূপে প্রতিভাত হইলেও পুরুষরূপে বদ্ধ নহেন। কেবল চিন্ময়ীর চিদ্বিলাস-লীলা মাত্র। সাধক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসক হইয়াও তাঁহাকে কালীরূপে

দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্ত-বাসনা পূর্ণকারী ভগবান সেইরূপেই তাঁহাকে দর্শন দিতে বাধ্য। তাই আয়ানের ভয় অভিনয় করিয়া স্বয়ং রাধিকা ভগবানের সেই পূর্ণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীরূপে সেই পূর্ণশক্তির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াই মুণ্ডমালা তন্ত্রে শ্রীদুর্গাগীতায় মহেশ্বরী স্বয়ং বলিয়াছেন—

গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্‌স্বরূপিণী॥
কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে॥
গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মনাং।
যোগমধ্যে পূষাহঞ্চ পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা॥
পত্রে মালূরপত্রঞ্চ পীঠে যোনিস্বরূপিণী।
হরিহরাত্মিকা বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবার্চ্চিতা॥
বিশেষানুগ্রহেণৈব বিজ্ঞেয়া শঙ্কর প্রভো।
যত্র কুত্র স্থলে নাথ। শক্তিস্তিষ্ঠতি শঙ্কর॥
তত্রৈবাহং মহাদেব নিশ্চিতং মতমুত্তমং।
শক্তিমার্গং পরিত্যজ্য যোঽন্যমার্গং হি ধাবতি॥
করস্থং স মণিং ত্যক্ত্বা ভূতিভারং প্রধাবতি।

আমিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী এবং বাগ্বাদিনী সরস্বতী। আমিই কৈলাসে পার্ব্বতী, মিথিলায় জানকী, দ্বারকায় রুক্মিণী, হস্তিনাপুরে দ্রৌপদী। আমিই দ্বিজাতিগণের বন্দনীয়া সন্ধ্যারূপিণী এবং বেদজননী গায়ত্রী। যোগমধ্যে আমিই পূষা, পুষ্পমধ্যে আমিই কৃষ্ণবর্ণা অপরাজিতা, পত্রমধ্যে আমিই বিল্বপত্র, পীঠমধ্যে আমিই যোনিস্বরূপিণী, আমিই হরিহরাত্মিকা মহাবিদ্যা, আবার আমিই ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্চ্চিতা, প্রভো শঙ্কর। আমার বিশেষ অনুগ্রহসঞ্চার হইলেই জীব আমাকে এইরূপে জানিতে পারে। (অধিক কি বলিব নাথ।) যেস্থানে শক্তি (স্ত্রী) অধিষ্ঠিতা, সেইস্থানেই আমি অধিষ্ঠিতা। মহাদেব। নিশ্চয় জানিও, ইহাই আমার সকল মত অপেক্ষা উত্তম। এই শক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া যে আমার অন্বেষণের জন্য অন্য পথে যাত্রা করে, করস্থিত মণি ত্যাগ করিয়া সে ভস্মরাশির অভিমুখে ধাবিত হয়।

শাস্ত্রের আজ্ঞা ত এই—ইহার পর যদি কেহ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাও তাহা হইলেও যে শক্তির দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ পরিচালিত হয় সেই আত্মশক্তির পর আর কোনও শক্তি বা শক্তিমান স্বীকার করা নিরর্থক। সমস্তই যদি শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইল তবে আর শক্তিমানের অপেক্ষা

কিসের জন্য ? যদি বল, এ শক্তি আছেন কাহাকে আশ্রয় করিয়া ? তবে তুমিই বলিয়া দাও, শক্তিমান আছে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ? যিনি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় ব্রহ্মশক্তি তাঁহার আবার যদি আশ্রয়ের অপেক্ষা থাকে, তবে ত এ ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবারই কথা। আধার শক্তির আধার কে ? অগ্নি জ্বলেন কাহার তেজে ? বায়ু চলেন কাহার বেগে ? এ সকল প্রশ্ন স্বাভাবিকতার পরিচয় নহে। যাহা হউক, শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ আত্মবিভূতি বিস্তারে সমর্থ হয়েন বলিয়াই শাস্ত্র তাঁহাকে শক্তিমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডলীলাও এই তত্ত্বই অনুপ্রাণিত। তাই দ্বৈত প্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি সংহারেও শক্তির পুরুষ রূপ—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী। গায়ত্রীমন্ত্রেও মহাশক্তির সেই উভয় স্বরূপই উপাস্য। প্রথমত প্রাণায়ামে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষ, চরমে গায়ত্রী-ধ্যানে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী প্রকৃতি। গায়ত্রী সূত্র মাত্র, সন্ধ্যোপাসনা তাহারই বৃত্তি বা ভাষ্য। গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ পাঁচ প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে—যথা, বিশ্বব্যাপী, জগৎস্রষ্টা, আরাধ্য, লীলাময়, জীব-বুদ্ধির প্রেরণকারী। এই পাঁচটির মধ্যে 'বিশ্বব্যাপী' এই বিশেষণটিরই বিশেষ্য নির্গুণ স্বরূপ, সেইটিই প্রথমে ॥ ১ ॥ তাহার পরেই দ্বৈত জগতের অবতারণা, ত্রিগুণবিস্তার ব্যতিরেকে নির্গুণ অবস্থায় জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না ॥ ২ ॥ আরাধক না থাকিলে আরাধ্য হইবেন কাহার ? ॥ ৩ ॥ ইচ্ছা না থাকিলে লীলা অসম্ভব ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্বে লিপ্ত না হইলে জীবের বুদ্ধি প্রেরণ করিবার প্রয়োজন কি ? ॥ ৫ ॥

এখন গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য দেবতা নির্গুণ কি সগুণ ব্রহ্ম, বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্র দেখিয়াই তাহা বুঝিয়া লইবেন। গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণও নহেন সগুণও নহেন অর্থাৎ নির্গুণ-সগুণ উভয়ই। সাধক সগুণ সাধনায় সিদ্ধ হইলে আপনিই তাঁহার নির্গুণস্বরূপে গিয়া আত্মহারা হইবেন, তাহার জন্য তিন যুগ পূর্ব্বেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার দেখিবার প্রয়োজন নাই। সগুণ ব্রহ্ম বলিতে তুমি আমি যেমন মনে করি—ছোট ব্রহ্ম, শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম তেমন ছোট বা বড় নহেন। জলচরকে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে যেমন নদ-নদীর মধ্যে দিয়াই যাইতে হইবে, জীবকেও তদ্রূপ ব্রহ্মযাত্রা করিতে হইলে দ্বৈত জগতের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, সগুণ মূর্ত্তি অবলম্বনেই নির্গুণস্বরূপ মহানির্ব্বাণে পৌঁছিতে হইবে। নির্গুণ বলিতে ব্রহ্মে গুণ নাই—ইহা বুঝিবার কথা নহে, গুণময় হইয়াও তিনি গুণে নির্লিপ্ত ইহাই বুঝিতে হইবে। সমুদ্র জলশূন্য নহেন কিন্তু জলময় হইয়াও যেমন জলের অধিপতি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তদ্রূপ সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম গুণময় হইয়াও গুণের অধিপতি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রতিগুণে গুণময়ীর অনন্ত-গুণের অনন্তগুণ পরিচয়—সুতরাং তাঁহাকে নির্গুণ বলা আর নিজ গুণের পরিচয় দেওয়া একই কথা। দেব দানব

মানব মূর্ত্তিতে শক্তির প্রকাশ কেবল সেই ত্রিগুণধারিণীর গুণবিস্তার বই আর কিছুই নহে। রতি মতি স্থিতি শান্তি দান্তি ক্ষান্তি ভ্রান্তি ভুক্তি মুক্তি ভক্তি ইত্যাদি সমস্তই শক্তি বই আর কিছুই নহে। শ্রবণ মনন গমন দর্শন প্রভৃতি চেতন-লক্ষণ ব্যাপারসকল যাঁহার সত্ত্বায় অবস্থিত তাঁহাকে যিনি জড় বলিতে পারেন, ধন্যবাদ তাঁহার জিহ্বাকে। জিহ্বা আমার আছে কি না এ কথা যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার জিহ্বা আছে কি না তাহা তিনি না বুঝিলেও অন্যের বুঝিবার কথা। কিন্তু তাঁহারও এটুকু বোঝা উচিত যে, যদি জিহ্বা না-ই থাকে তবে জিহ্বা আমার আছে কি না—এ কথা আমি বলি কাহার সাহায্যে? তদ্রূপ জড়বাদীরও এটুকু বোঝা উচিত যে, শক্তি যদি চৈতন্যরূপিণীই না হইবেন তবে পার্থিব জীব সচেতন হয় কাহার প্রভাবে? শক্তি চেতন কি জড়, এ কথা আমি বলিই বা কাহার প্রসাদে? প্রতি শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি জীবের প্রতি পরমাণুতে যাঁহার চৈতন্যচন্দ্রিকাচ্ছটা প্রকট প্রভাবে অভিব্যক্ত, জানি না জন্ম জন্মান্তরের কি কঠোর পাপের কঠিন দণ্ডই তাহার মস্তকে বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহার আঘাতে মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখে এই প্রলাপ নির্গত হয় যে, 'শক্তি জড়'। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে। যে শক্তিতত্ত্বের অভিজ্ঞান নির্ব্বাণ-মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, জীব! তুমি কি মনে কর, বহুজন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সাধন সম্পত্তি ব্যতিরেকে কেবল বিদ্যাবাগীশ হইয়াই তাই লাভ করিবে? যাহা সেই ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধ্য ধন, সদানন্দের হৃদয় ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত গুপ্তনিধি—তাহার অধিকার তুমি পাইবে? হরি হরি হরি! তুমি আমি কেবল বুদ্ধিবলে তাঁহাকে পাইতে চাই কিন্তু ইহা বুঝি না যে, বুদ্ধিরও বুদ্ধি যিনি, তিনি বুঝিয়া শুনিয়া তোমায় আমায় যাহা বুঝিবার অধিকার দিয়াছেন তাহার অধিক আর বুঝিবার সাধ্য নাই। অন্যে পরে কা কথা। সাধক! স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই এই লীলার অভিনয় করিয়াছেন। মায়াবাদ-প্রবর্ত্তয়িতা বেদান্ত দর্শনের প্রচারকর্ত্তা দার্শনিক চূড়ামণি ভগবান শঙ্করাচার্য্য যখন দিগ্‌দিগন্ত জয় করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হয়েন, তাঁহার সেই প্রখরতর বিচার-শরে জর্জ্জরিত হইয়া অন্যান্য দার্শনিকমণ্ডলী যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, কি জানি জগদম্বার কেমন লীলা, সেই সময়েই তিনি শৈব-সম্প্রদায়ের উল্লাস-তরঙ্গ সম্বর্দ্ধিত করিয়া শাক্ত-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নিপাত বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়াছিলেন। শিব হইতে অতিরিক্ত 'শক্তির অস্তিত্বই নাই' ইহাই প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শাক্তগণ তাঁহার এই ঘোর অত্যাচারে, বহির্ব্বিচারে পরাস্ত হইলেও অন্তর্ব্বিচারে পরাস্ত হয়েন নাই। কিন্তু উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে এই নাস্তিকবাদ ঘোষণা দেখিয়া নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সাধকের সে মর্ম্মবেদনা বুঝিতে অন্তর্যামিনী ভিন্ন আর কে আছে? কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তখনও তাহা বুঝিতে পারেন

নাই। কারণ 'শিবের কাশী' এই পর্য্যন্তই তাঁহার ধারণা। কাশীর আবার অধীশ্বরী কেহ আছেন, ইহা তাঁহার তখনও অবিদিত ; তাই ভক্তের হৃদয়-বেদনা দূর করিবার জন্য, ভক্তাবতার শঙ্করাচার্য্যের ভ্রান্তিপট উত্তোলিত করিবার জন্য, শক্তিরূপিণীর সিংহাসন টলিল। একদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অশ্রান্ত বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য ক্লান্তকলেবরে মণিকর্ণিকার ঘাটে শয়ন করিয়া বিশ্রাম এবং শক্তিবাদ-খণ্ডনের বিজয়ানন্দ অনুভব করিতেছেন, এই সময় দেখিলেন একটি ক্ষুদ্র কুম্ভ কক্ষে করিয়া একটি সৌম্যমূর্ত্তি বালিকা ধীরে ধীরে সেই ঘাটের দিকেই আসিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণদিকে শীর্ষ-স্থাপন এবং উত্তরদিকে চরণ-বিন্যাস করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাহাতে গমন-পথটি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়াছে। বালিকা তাঁহার নিকটে আসিয়া অতি বিনীত বচনে বলিলেন, ভগবন্! চরণ উত্তোলন করুন আমি কলসীটি জলপূর্ণ করিয়া লইয়া যাই। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, যাও মা। আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই যাও, তাহাতে দোষ নাই। বালিকা বলিলেন, সে কি? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিব কি করিয়া? জ্ঞান-গর্ব্বিত শঙ্করাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, মা তুমি একে অজ্ঞান স্ত্রী-জাতি, তায় আবার বালিকা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী পুরুষ এ সকল ভেদ কেবল অজ্ঞান-বিজৃম্ভন, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরমার্থতঃ সমস্তই ব্রহ্মময়। তুমি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও, তাহাতে পাপ হইবে না। বালিকা তখন অতি কাতরা হইয়া বলিলেন, প্রভো! আপনিই ত বলিতেছেন, আমি অজ্ঞান স্ত্রী-জাতি, ওরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার ত আমার নাই। আমি কিছুতেই ব্রাহ্মণকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার চরণ উত্তোলন করুন, আমি চলিয়া যাই। শঙ্করাচার্য্য তখন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, মা! তোমাকে বারংবার বলিতেছি তথাপি শুনিতেছ না? আমার শরীর বড়ই পরিশ্রান্ত আবার কি জানি অকস্মাৎ কি হইল, আর যেন পা উঠাইবার শক্তি নাই। বালিকা একটু ভীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনার শক্তি নাই ইহা জানিলে আমি চরণ উত্তোলন করিতে বলিতাম না। আাপানার তত্ত্বজ্ঞান বুঝিবার অনুপযুক্ত পাত্রী আমি, তাই ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘন-ভয়ে বড়ই ভীত হইয়া বারংবার আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানের কথা না বলিয়া 'শক্তি নাই' এই কথাটি প্রথমে খুলিয়া বলিলে আমি নিজেই আপনার চরণ উত্তোলন করিয়া জলে নামিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে অনুমতি হয় ত আমিই চরণ উত্তোলন করিয়া দেই। শঙ্করাচার্য্য বালিকার বাক্যে বিশেষ লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াই বলিলেন, যাহা তোমার ইচ্ছা করিতে পার। বালিকা তখন স্বহস্তে তাঁহার পদদ্বয় উত্তোলিত এবং পথ হইতে অপসারিত করিয়া জলে অবতীর্ণা হইলেন এবং কুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল হইতে সোপান-পরম্পরায় উত্তীর্ণা হইলেন। শঙ্করাচার্য্য তখন নিতান্তই অবসন্ন দেহে কাতরকণ্ঠে বালিকাকে ডাকিয়া

বলিলেন, মা! অনেকক্ষণ হইতে পিপাসায় কাতর হইয়া আছি. আমায় একটু জল দিয়া যাও। বালিকা তখন হাসিয়া বলিলেন, কেন? আপনি ত জলের তীরেই রহিয়াছেন, তবে পিপাসায় এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন? শঙ্করাচার্য্য আবার বলিলেন, আর কতবার বলিব? আমার উঠিবার শক্তি নাই। বালিকা তখন নয়নদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া গম্ভীররবে গঙ্গাতট প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন—শঙ্কর! তুমি না শক্তি মান না? সেই মর্ম্মভেদী গম্ভীরধ্বনির প্রতিধ্বনিতে আহত হইয়া শঙ্করাচার্য্য বিদ্যুচ্চকিত সুপ্ত শিশুর ন্যায় একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার সভয়ে যেমন চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন অমনি দেখিলেন, বালিকার আরক্ত লোচনপ্রান্তে শতশত চন্দ্রসূর্য্যের দুর্দ্দর্শ জ্যোতিস্তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে. অমনি মা! বলিয়া উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া দুটি চরণ জড়াইয়া ধরিবার জন্য যেমন দ্রুত বেগে ধাবিত হইয়াছেন তৎক্ষণাৎ লীলাময়ীর লীলাভঙ্গ হইয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বালিকারূপ-মহাজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইলেন। সেই জ্যোতিঃ হারাইয়া শঙ্করাচার্য্য যে অন্ধকারে ডুবিলেন তাহা ব্যথার ব্যথিত ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ব্ব-পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মময়ী পর্ব্বতরাজনন্দিনীর একটি কটাক্ষবজ্র-ক্ষেপে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। তখন অধঃপতিত অন্ধের ন্যায় মাতৃহারা শিশুর ন্যায় 'মা আমার! কোথায় গেলে'? বলিয়া প্রমুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে অন্নপূর্ণার মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ মায়ের সন্তান মায়ের হইয়া মা বলিয়া মায়ের মন্দিরে আসিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য না হইলেও শক্তি-নাস্তিক শঙ্করাচার্য্যের এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া শাক্তগণ মায়ের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের 'জয় জগদম্বা' রবে মন্দির প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য্য সেই শাক্তভক্ত-কদম্ব-সম্বেষ্টিত হইয়া কাশীশ্বরের অধীশ্বরী ত্রৈলোক্য-রাজরাজেশ্বরীর মন্দির দ্বারে আসিয়া ঘোরাপরাধভয়-কম্পিত কলেবরে আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর সেই সুরাসুর মুকুট-তট-বিঘৃষ্ট চরণ-পীঠে মস্তক স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহর-বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥

মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন তবেই তিনি নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্যথা (শক্তি-বিরহিত হইলে) প্রভুত্ব দূরে থাক, আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে নিজ নয়ন-স্পন্দনেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে, তন্ত্রমতে শক্তি শব্দের ইকার—শিব যতক্ষণ শক্তিযুক্ত—ইকার বিশিষ্ট ততক্ষণই শিব, শক্তিবিরহিত (ইকারহীন) হইলেই শিব

আর তখন শিব নাই, নিস্পন্দ শব। অতএব তুমি জগদারাধ্য হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও আরাধ্যা আদ্যাশক্তি, মা! তোমার যে ত্রৈলোক্যদুর্লভ চরণাম্বুজে ব্রহ্মাদির মস্তক লুণ্ঠিত হয় সেই চরণে মস্তক প্রণত করিতে বা স্তব করিতে অকৃতপুণ্য আমি কিরূপে সমর্থ হইব? অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে শক্তি-তত্ত্বের আংশিক মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তোমার সেই স্ব-স্বরূপ শক্তি-তত্ত্ব তুমি স্বয়ং প্রকাশ করিয়া না দিলে কাহার সাধ্য তাহা অবগত হইতে পারে? জন্ম জন্মান্তরের সাধন-জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত না থাকিলে সে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় না—তাই অবাঙ্মনসগোচরা তারার তত্ত্ব জীবের আয়ত্ত নহে, তাই জীব তোমার ক্রোড়ে থাকিয়াও মা। তোমায় চিনিতে পারে না। মা! আমার আজ সেই দশা। কৃত অপরাধ-ভয়ে তোমার স্তব করিতে প্রণাম করিতে কিছুতেই আর সাহস হয় না। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ একশত তিন শ্লোকে জগদম্বার রূপ গুণ মহিমাত্মক স্তব করিয়া পরিশেষে বলিলেন—

প্রদীপজ্বালাভি র্দিবসকর-নীরাজনবিধিঃ,
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপল-জললবৈরর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং,
ত্বদীয়াভির্বাগ্‌ভি-স্তব জননি! বাচাং স্তুতিরিয়ম্॥

অন্তর্যামিনি, জগদম্বে! প্রদীপের তেজে সূর্য্যদেবের নীরাজন-বিধি (আরাত্রিক ক্রিয়া) চন্দ্রকান্ত মণির জলকণা দ্বারা চন্দ্রের জন্য অর্ঘ্য-রচনা, সমুদ্রের জল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ-বাসনা ইহাও যাহা, তোমার প্রসাদে উচ্চারিত বাক্যাবলী দ্বারা তোমার স্তব করাও তাহাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এইরূপে কৃতার্থ হইয়া নিজ শিষ্যানুশিষ্য সূত্র-পরম্পরাতেও যাহাতে আর কেহ কখনও শক্তিসাধন সম্পদ হইতে বঞ্চিত না হন, বৈদিকমতে সন্ন্যাসী হইলেও যাহাতে তান্ত্রিক-দীক্ষাচ্যুত না হয়েন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তাই শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় দণ্ডিমণ্ডলী মধ্যে যতস্থানে তাঁহাদের মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সর্ব্বত্রই শ্রীযন্ত্র স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ত বর্ত্তমান সময়েও নিত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তবে কোথাও বা ব্যক্ত, কোথাও বা গুপ্ত। রহস্যবিদ্ সাধকমণ্ডলী অবশ্যই তাহার তত্ত্ব অবগত আছেন। যাহা হউক, পরমার্থতত্ত্বনিধি শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত ঘটনারূপ পরমার্থ-ভ্রান্তি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। একতঃ ভগবান শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শক্তিরূপ শিবের অবতার। মূলরূপে যিনি মহাশক্তির চরণতলে বক্ষস্থল বিন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছেন, অবতাররূপে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি বড়ই বিস্ময়কর। তাই আমাদের মনে হয়, মহামায়ার মায়ামুগ্ধ মায়াবাদী বৈদান্তিক-দলের চির-অজ্ঞানময় জ্ঞানদর্প চূর্ণ করিবার জন্যই তিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতনীর অস্তিত্ব

অস্বীকার করিয়া আবার তাঁহারই প্রসাদ-বলে তন্ত্রশাস্ত্রের চিরবিজয়-বৈজয়ন্তী স্বহস্তে ধারণ করিয়া জগদম্বার মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অন্যথা, তাঁহার যে স্বকৃত স্তবের আদ্যন্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইল, এই স্তবেই তিনি শক্তিতত্ত্বের, শক্তিসাধনার এবং তন্ত্রশাস্ত্রসমূহের যেরূপ গুরুগম্ভীর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তিনি কখনও শক্তি মানিতেন না, জানিতেন না বা উপাসনা করিতেন না—ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

নবদ্বীপাবতীর্ণ গৌড়সাগর-পূর্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্রও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। শঙ্কর সম্প্রদায়ের শিষ্যানুশিষ্য স্বামী কেশব ভারতী তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু। সুতরাং গৌরচন্দ্র কোন মতে দীক্ষিত এবং উপাসক ছিলেন, সুবুদ্ধি সাধকবর্গ সহজেই তাহা বুঝিতে পারেন, তথাপি আমরা যথাস্থানে তাহার যথাসাধ্য উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

সাধক! উল্লিখিত লীলানায়ক ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উপরে আর কাহাকে দার্শনিক বলিয়া স্বীকার করিব? কোন জড়বাদী জড়ের কথায় শ্রদ্ধা করিব? 'শক্তি নাই' বলিতে গিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের অবতার শঙ্করাচার্য্যের যখন পা উঠাইবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে তখন 'শক্তি নাই' বলিয়া মাথা উঠাইবার তুমি আমি কে? যিনি মনে করেন, দর্শন শাস্ত্রের যুক্তিতর্ক বিচারের বলে শক্তি-তত্ত্ব বুঝিয়া লইব, তাঁহার ভ্রান্তি বড়ই গভীর। তিনি যদি কেবল যুক্তিতর্ক বিচারের ধন হইবেন, তবে আর সাধন ভজন কাহার জন্য? শঙ্করাচার্য্য দর্শনের বলে তাঁহাকে বুঝেন নাই, দর্শনের ফলেই বুঝিয়াছেন। তিনি আজকালকার পণ্ডিতের মত অন্ধ দার্শনিক ছিলেন না, নিত্যনিরঞ্জনীর জ্যোতিরঞ্জনে তাঁহার দিব্যনেত্র অঞ্জিত এবং রঞ্জিত হইয়াছিল। জগদম্বা তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া সেই দর্শনেই তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। আর দুর্ভাগ্য কলির জীব! বলিব কি, তুমি আমি তাঁহার দর্শনেরই দোহাই দিয়া অন্ধ হইতেছি কেবল অদৃষ্টের গুণে। যিনি আছেন বলিয়া ভগবানের 'সর্ব্বশক্তিমান' নাম, সেই শক্তি 'নাই' ইহা যিনি বলিতে পারেন, তিনি কি নাস্তিকের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ নহেন? সে শক্তির মহিমা প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শক্তির নাম প্রথমে দিয়া পরে শক্তিমানের নাম গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ, উমামহেশ্বর গৌরীশঙ্কর সীতারাম এইরূপে নাম গ্রহণ না করিলে ব্রহ্মহত্যা-জন্য পাপের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবান যাঁহার মহিমার প্রচারক, জীব! তুমি তাঁহার অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের বিচার করিতে যাও, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? যাঁহার অপার সত্তা-সাগরে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড কটাহ এক একটি জলবুদ্বুদ বলিয়াও গণ্য নহে, সেই বুদ্বুদে বাস করিয়া সেই সাগরে ডুবিয়াও যে তুমি আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না, জন্মান্ধ সন্তান জননীর কোলে বসিয়া তাঁহার

স্তন্যপানে পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহারই কোমল করপল্লবে লালিত হইয়াও যে তাঁহাকেই দেখিতে পায় না; সে কি মায়েরই দোষ—না, সন্তানেরই দুরদৃষ্ট? মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ কে না করে? কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃ-দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ত্রিনয়নার দয়ায় যাঁহার জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, সুপ্রসন্ন গুরুদেব যাঁহার সেই নয়নে প্রেমাঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন, ত্রিনয়নের নয়নময়ী রূপমাধুরী কেবল তাঁহারই নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবার কথা। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'তথা তে সৌন্দর্য্য-পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ'। তোমার যে সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের দর্শনমাত্র-গোচর, জীবের তাহা দর্শন করিতে অধিকার কি? তাই বলি, ভাই সাধক! মাকে দর্শন করিবার অধিকার পাই নাই বলিয়া মায়ের অধিকার ভুলিও না। আর শক্তি শক্তিমানের ভেদদর্শী পিতৃপক্ষপাতী মাতৃপক্ষঘাতী ভাক্ত ভক্ত-সম্প্রদায়! তোমাকেও বলি—হয় স্ত্রী না হয় পুরুষ, যে কোন রূপে তাঁহার উপাসনা করিলেই জীবের মুক্তি-দ্বার অবারিত। বাবার উপাসক যে হয়, তাহার মুক্তির জন্য মায়ের উপাসনার কোন অপেক্ষা নাই কিন্তু মাকে বিদ্বেষ করিয়া বাবার উপাসক যে হয়, নিশ্চয় জানিও, তাহাকে মুক্তি দিতে বাবার বাবারও সাধ্য নাই। শুম্ভ নিশুম্ভ জম্ভ মহিষাসুর প্রভৃতি অনেকেই এইরূপে বাবার উপাসক ছিলেন। কিন্তু কি জানি, করুণাময়ীর কেমন অপার করুণা, দ্বেষলেশও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই অমরবন্দিতা মুক্তকেশী সমরবেশেও তাহাদিগকে ভববন্ধন-মুক্ত করিলেন। কিন্তু বাবা মায়ের চরণতলে শবরূপে হৃদয় ঢালিয়া দৈত্যদলকে দেখাইয়া দিলেন যে, মুক্তিময়ী মুক্তামালা মুক্তকেশীর চরণতলেই চিরসজ্জিত এবং চিরসঞ্চিত, সে মালা পরিতে হইলেই ঐ চরণতলে হৃদয় ঢালিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইতে হইবে। এই তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই সূক্ষ্মদর্শী ভক্তভাবুক বলিয়াছেন—

> বাবা বাবা সব্ কোই কহে, মায়ী না কহে কোই।
> বাবাকো দরবার্ মে মায়ী যো কহে সো হোই॥
> 'বাবা বাবা' সবাই বলে, কেউ না বলে 'মা'।
> (কিন্তু) বাবার সভায় শেষ বিচার তাই, মায়ের আজ্ঞা যা॥

তাই বলি ভেদজ্ঞানিন্! মানবজন্ম বড়ই দুর্লভ, এখনও সময় থাকিতে প্রাণের কবাট খুলিয়া একবার কাঁদিয়া বল—কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।

পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী-উপাসনার গন্তব্য নির্গুণ ব্রহ্ম এবং উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম হইলেও ত্রৈকালীন সন্ধ্যাবন্দনেই সে উপাসনা পর্য্যাপ্ত এবং উপযুক্ত। দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে গাঢ়মগ্ন হইতে পারিয়াছেন, দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণের দ্বৈত ভান যাঁহার নাই, সন্ধ্যাবন্দন তাঁহারই একমাত্র চরম উপাসনা হইতে পারে। সন্ধ্যার আচমনে দ্বৈতজ্ঞানের অধিকার-ভুক্ত আত্ম-সমর্পণের আংশিক ছায়া

থাকিলেও তাহাতে কেবল পাপের পরিহার মাত্রই আছে। এজন্য সে অংশকে আত্ম-সমর্পণ না বলিয়া আত্মশুদ্ধি মাত্র বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, সেই অংশ-মাত্র লইয়াই ভক্তের প্রেমময় হৃদয় সুখী হইতে পারে না। আমার বলিতে আমার যাহা কিছু আছে, সে সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে বিক্রয় করিয়া প্রেমের বিনিময়ে ক্রীতদাস হইতে যাহার একান্ত সাধ, তাঁহার সাধনা সন্ধ্যাবন্দনে চরিতার্থ হইবার নহে। গায়ত্রী হইতে বুঝিলাম, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে সেই মহাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্রী। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াই ত মন প্রাণ শান্ত হয় না। কেন তাঁহার এ লীলা, কোন্ প্রক্রিয়া অবলম্বনে এই লীলা পরিচালিত এবং এ লীলার পূর্ব্বে ও পরেই বা তাঁহার স্বরূপ কি, লীলার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং লীলাময়ী হইয়াও কিরূপে তিনি এ লীলায় নির্লিপ্তা, জীব লীলাপুত্তলী হইয়াও কি উপায়ে এ লীলা অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্ব-স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে ইত্যাদি তত্ত্ব সকল জানিবার জন্য জীবের হৃদয় স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া উঠে। দ্বিতীয়ত গায়ত্রী হইতেই এ সকল তত্ত্ব না হয় যেরূপে যতটুকু পারি বুঝিলাম। বুঝিলাম তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মরূপিণী, তাহাতেই বা আমার কি হইল? আমি যে অশুদ্ধ জড় জীব। শুনিলাম সমুদ্র অনন্ত রত্নের আকর, তাহাতে আমার কি? সমুদ্রের রত্ন সমুদ্রেই আছে, আমার দারিদ্র্য আমাতেই আছে। যতক্ষণ সে রত্ন আমি আপন হাতে না পাইতেছি ততক্ষণ সমুদ্রের রত্ন শুনিয়া বা বুঝিয়া কিছুতেই আমার দুর্গতি ঘুচিবার নহে। যতক্ষণ তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ হইতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। তাই এমন কোন উপায় চাই যাহাতে তাঁহাকে পাইতে পারি। তত্ত্বজ্ঞানের তীব্র তেজে যেদিন আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে সেইদিনে আমি তাঁহাকে পাইব—এই সূক্ষ্ম পাওয়ায় আমার স্থূল বুদ্ধি মন প্রাণ সুখী নহে। আমি দশেন্দ্রিয়-সমাযুক্ত মনপ্রাণবিশিষ্ট জীব, ঐগুলিই আমার আমিত্বের ভরসা ও সম্বল। যাহাতে ঐগুলি না হারাইয়া তাঁহাকে পাই তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। আত্মার সুখ দুঃখ কোন কালেই নাই। মনের সুখ লইয়াই আমার সংসার, সেই মনকেই যদি সুখী করিতে না পারিব, মন মরিয়া গেলে যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তবে সে সাক্ষাৎ হওয়াও যা, না হওয়াও তাই। আবার মনও যদি মরিয়া যাইবে তবে সাক্ষাৎ হইবে কাহার সঙ্গে? সেও এক বিষম রহস্য। তাই আমি তাঁহাকে চাই যিনি আমার মনের মত। তিনি আমার মনের মত ইহা বড়ই আবদারের কথা। কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব? আমার মনকে ত তাঁহার মত করিতে পারিব না, অগত্যা তাঁহাকেই আমার মনের মত হইতে হইয়াছে। কেননা তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী বা সর্ব্বশক্তিমান। মনের এমন শক্তি নাই যে তাঁহার মত হইতে পারে, কারণ তিনি মনের অগোচর অর্থাৎ মন নিজশক্তি-

প্রভাবে তাঁহাকে দেখিতে বা তাঁহার মত হইতে পারে না। কিন্তু তিনি সর্ব্বান্তর্যামিনী বা সর্ব্বদর্শী; তিনি মনকে দেখিয়া মনের মত হইবেন, ইহা কিছু অসম্ভবও নহে বিচিত্রও নহে। তবে তিনি দয়া করিয়া দেখা দিলে মন তাঁহার মত হইতে পারে, কেননা ইন্দ্রিয়ের দল লইয়া সংসার করিতে পারিলেই মন আমার সুখে থাকে। সুখ লইয়াই তাহার বিষয়, সুখ না পাইলে পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতেও সে যেমন তৎপর, আবার সুখ পাইলে পরকে লইয়া সংসার করিতেও সে তেমনই তৎপর। তাই সুখ যদি পায় অর্থাৎ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি যদি নিজ নিজ বিষয় পায়, চক্ষু যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়, কর্ণ যদি তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে পায়, ত্বক্ যদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পায়—এইরূপে তিনি যদি মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে সকল বিষয়ে সুখী করিতে পারেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে মনে আনিয়া মনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে আনন্দ সাগরে ডুবাইতে পারেন তাহা হইলে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মন না হয় তাঁহাকে লইয়াই ঘর সংসার করিল। সুখ যদি পায়, তবে আর তাহার আত্মীয় পর বিচার কি? অথবা আত্মীয়তা লইয়া সুখের বিচার ইহা স্থির নহে, সুখ লইয়াই আত্মীয়তার বিচার। সুখের সংস্রব আছে বলিয়াই সাত পুরুষে যাঁহার সহিত সম্বন্ধ নাই তিনিও অর্দ্ধাঙ্গিনী, সাংসারিকের সুখের দৃষ্টান্তই এই। সাংসারিক মন যদি সংসার করিতেই ভালবাসে তবে এ সংসার না হয় তাঁহাকে লইয়াই করিল। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র সখা সুহৃৎ তিনিই হইলেন ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ প্রেম যাহা কিছু করিবার আছে তাহা না হয় তাঁহাতেই করিলাম, এ সংসারে বালকটিকে বালিকাটিকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সাজাইয়া নাচাইয়া যেমন সুখী হইবার কথা আছে, তাঁহাকেও যদি তেমনি করিয়া খাওইয়া পরাইয়া সাজাইয়া নাচাইয়া সুখী হইতে পারি, এইরূপে যদি তাঁহাকে লইয়া সংসারটি বজায় থাকে, তবে মনকে তাঁহার মত (তিনি যেমনটি ভালবাসেন) হইতে কতক্ষণ? কিন্তু এইরূপে আমার মনটিকে তাঁহার মত করিতে হইলে তাঁহাকে আগে আমার মনের মত হইতে হইবে। কেবল সূর্য্যমণ্ডলে বা অগ্নিমণ্ডলে বসিয়া থাকলে চলিবে না, আমার হৃদয়মণ্ডলে আসিয়া বসিতে হইবে। সময়ে সময়ে এক এক রূপ, ত্রিসন্ধ্যায় ত্রি-রূপ চিন্তা করিতে পারিব না। আমার এই আরম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া চিরটিকাল একরূপে হয় দাঁড়াইয়া, না হয় বসিয়া যেরূপে হউক একরূপে স্থির থাকিতে হইবে, দিবাভাগে ত্রিসন্ধ্যায় তিন বার পাইব, রাত্রিতে আর দেখা সাক্ষাৎ নাই—এরূপটি হইলে চলিবে না। রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘ-মুদন্বতি—সমুদ্রগামী গঙ্গাস্রোতের ন্যায় তাঁহাতে আমার দৃষ্টি-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। অন্য যত যাহা কেন স্পর্শ না করে, আমার দৃষ্টির অভিমুখ গতি কেবল তাঁহাতেই থাকিবে। আমি যদি ইচ্ছা না করি তবে দেশকাল পাত্র কিছুর বিচার

থাকিবে না, যখন যে অবস্থায় যেমন কেন না থাকি, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে ঐ শ্রীপদে প্রাণটি জড়াইয়া পড়িয়া থাকিব, আমার এই সকল আবদার স্বীকার করিয়া তুমি আগে আমার মনের মত হইয়া আইস, তবে তখন আমি তোমার মনের মত হইব। ভক্ত সাধকের এই সোহাগের আব্দার পূর্ণ করিবার জন্যই পূর্ণব্রহ্মসনাতনী গায়ত্রী-দীক্ষার পরেও আবার তান্ত্রিক-দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার অধিকন্তু কৃপা এই যে, যাঁহাদের গায়ত্রী-দীক্ষার অধিকার নাই তাঁহাদিগকেও তান্ত্রিক-দীক্ষার অধিকারী করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ সাধারণ ইহাতে সমান অধিকারী, অধম অন্ত্যজ চণ্ডালের জন্যও এ মুক্তি-দ্বার নিরন্তর অবারিত।

পারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি-বিচার নাই, গঙ্গার জলে স্নান করিতে যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মার বিচার নাই, কাশীধামে মৃত্যু হইলে নির্ব্বাণমুক্তির অধিকারে যেমন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ কাহারও কোন তারতম্য নাই, তদ্রূপ এই ভবসাগরের পারের নৌকায় জ্ঞান-গঙ্গার পবিত্র জলে, ব্রহ্মাণ্ডময় বারাণসী—তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে কাহারও বাধা নাই। অধিক কি, কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতে তন্ত্রের আপত্তি নাই। তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য-নিস্তারের অদ্বিতীয় অমোঘ উপায়।

গায়ত্রীতন্ত্রোক্ত তিনটি পুরুষ-মূর্ত্তি এবং তিনটি শক্তি-মূর্ত্তির মধ্যে যে কোন একটিকে এইরূপভাবে উপাসনা করি না কেন?—এরূপ কোন আপত্তির আশঙ্কাও এস্থলে হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি সূর্য্য—এই পাঁচটিই গায়ত্রী-মন্ত্রোক্ত দেবতা, তন্মধ্যে দেবর্ষি নারদের অভিশাপে ব্রহ্মার তান্ত্রিক উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ব্রহ্মার স্থানে বিষ্ণুর অবতার গণেশ উপাস্য হইয়াছেন। ফলতঃ এই পঞ্চ উপাস্য দেবতা কেহই গায়ত্রীতত্ত্বাতিরিক্ত দেবতা নহেন। সুতরাং গায়ত্রীতন্ত্রের উপাস্য দেবতাই যে তান্ত্রিক দীক্ষায় উপাস্য হইয়াছেন, ইহা বলাই পুনরুক্তি। অধিকন্তু গায়ত্রীমন্ত্রে বিশ্বব্যাপী, জগৎ-স্রষ্টা, আরাধ্য, লীলাময়, জীব-বুদ্ধি-প্রেরক, এই যে পাঁচটি বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে—এই পাঁচটিরই বিশেষ্য-শক্তি পঞ্চ উপাস্য দেবতার প্রত্যেক মূর্ত্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত। পঞ্চমূর্ত্তিই নিত্যপূর্ণ ব্রহ্মরূপ, সকল মূর্ত্তিরই ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি অনন্ত অসীম—সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্যে সকলেরই সমান সামর্থ্য, কারণ একেই তাঁহার পঞ্চত্ব, পঞ্চেই তাঁহার একত্ব। দ্বিতীয়ত গায়ত্রীতন্ত্রের উপাস্য মূর্ত্তি ছয়টি,—উপাসক আমি, আমার মন কিন্তু একটি। এক অন্তঃকরণে সমান প্রেমে ছয় মূর্ত্তির আরাধনা করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। তানপুরার সুরের মত যাহা নিরন্তর অন্তরে বাজিবে, সে প্রেম এক মূর্ত্তি হইতে অন্য মূর্ত্তিতে লইতে গেলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আবার শাস্ত্রও বলিতেছেন, 'নানা-ভাবে মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে'—নানাভাবে যাহার মন বিক্ষিপ্ত হয় তাহার পক্ষে একান্ত-

সাধনা সম্ভবে না; সুতরাং মুক্তি নাই। 'প্রাতঃপ্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাত-স্তদেব তব পূজনম্'। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত আবার সায়ংকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, জগদম্বে! তাহাই তোমার আরাধনা। 'পরস্মৈ দেবতায়ৈ চ সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ'—এইরূপে অহর্নিশ পরমদেবতার পদাম্বুজে আত্মসমর্পণ করা, কি বিপদে কি সম্পদে, কি জাগরণে কি স্বপনে, কি জীবনে কি মরণে, প্রাণে প্রাণে তাঁহার সহিত নিয়ত এইরূপে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রাখিয়া তদেকশরণাপন্ন হওয়া, 'তোমার শ্রীচরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু আর জানে না' এতটুকু সত্য সত্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া বলা, আমি মার, মা আমার—এই অপার ভাবসাগরে ডুবিয়া যাওয়া, একের সঙ্গে এই একান্তপ্রেম ছয়মূর্ত্তিতে কখনও ঘটে না। জানি, তিনি ছয় মূর্ত্তিতেই এক—কিন্তু আমার মন ত অনাদি অনন্তকাল-পরম্পরায় কখনও এক বই দুই নহে। আমি কি উপায়ে সেই একটি মন ছয় জনের চরণে অর্পণ করিব? কেমন করিয়া ছয় জনকে প্রাণের সহিত সমান ভালবাসিব? তাই প্রেমানন্দের কেন্দ্রভূমি স্বরূপে কোন একটি মূর্ত্তিকে আমার প্রাণের অবলম্বন করিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। যাঁহার মন্ত্র আমার সঞ্জীবন, যন্ত্র আমার রক্ষাকবচ, তন্ত্র আমার পূর্ণ পরমায়ু, অন্য সকলমূর্ত্তিই তাঁহার হইলেও সে মূর্ত্তি আমার যাহা তাহা আর ত্রিভুবনে নাই। সে মূর্ত্তি দলিতাঞ্জন-নীলকান্তি কিম্বা তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জগৌর অথবা রজতাচল-শুভ্রসুন্দর যাহাই কেন না হউক, সেখানে গিয়া আমার 'তোমার উপমা কেবল মা তুমি' অথবা 'মা! তুমি আমার যাহা, তুমিই কেবল তাহা আমার'। জীবের এ চর্ম্মচক্ষু লইয়া ত তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের বিচার নহে, প্রেমের চক্ষু কাহাকে সুন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লইবে তাহা সেই জগদেকসুন্দরী ভক্তপ্রেমময়ী ভিন্ন কে বলিতে পারে? এইস্থানে আসিয়াই প্রেমসাগর-যাত্রাগুরু হনুমানদেব বলিয়াছেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

পরমাত্ম-তত্ত্ব বিচার করিলে যদিও শ্রীনাথ নারায়ণরূপে এবং জানকীনাথ রামচন্দ্ররূপে কোন ভেদ নাই তথাপি কমললোচন রামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্বধন অর্থাৎ রাম নারায়ণ উভয়ই অভিন্নমূর্ত্তি হইলেও রামচন্দ্র আমার প্রেমসাগর-পূর্ণচন্দ্র, তাই নবদূর্ব্বাদল-শ্যামসুন্দর কমললোচন রামরূপ যেমন মনঃপ্রাণনয়ন-বিমোহন তেমন আর ত্রিভুবনে কিছুই নহে। সাধকের এই অতি আদরের সুকোমল প্রেমপাশে ভগবানও নিত্যবদ্ধ। তাই পুরাণাদি প্রসঙ্গে শুনিতে পাই, ভক্তাবতার পবনকুমার যখনই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন ভক্তপ্রেম ভয়বিহ্বল ভগবান তাহার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠের নিত্যমূর্ত্তি নারায়ণরূপ পরিহারপূর্ব্বক রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া মহালক্ষ্মীকে জনক-

নন্দিনী সাজাইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইয়া বসিয়াছেন। এই প্রেমময় ব্রহ্মলীলা ভক্ত আর ভগবানের নিকটেই পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। তাই ভগবান বলিয়াছেন, 'যো মে যাং যাং তনুং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তত্রাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥' শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক যে যে পুরুষ আমার যে যে মূর্ত্তিকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন সেই সেই ভক্তের সেই সেই উপাস্য মূর্ত্তিতেই আমি অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি। সকল মূর্ত্তিরই অধিষ্ঠাতা একমাত্র তিনি, সকল প্রেমেরই একমাত্র আশ্রয়ভূমি তিনি, সাধক যে মূর্ত্তিরই উপাসক হউন না কেন সকল মূর্ত্তিতেই প্রেমের পবিত্র প্রস্রবণ ঢালিয়া দিয়া জীবের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয় শীতল করিতে তিনিই একমাত্র কল্পতরু। তাঁহাকে পাইয়া আর কাহারও আশ্রয়ের অপেক্ষা থাকে না, তাই সাধক আনন্দে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন—

নান্যং বিলোকে ন চ বাঞ্ছমীহে নান্যং স্মরন্নাপরমাশ্রয়ামি।
কদাপি নাহং পরমাত্মরূপাং শ্রীসুন্দরীং চেতসি বিস্মরামি॥

অন্যকে বিলোকন করিতে চাই না, অন্যের জন্য চেষ্টা নাই। অন্যকে স্মরণ করি না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই না। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা যে, হৃদয় হইতে কখনও যেন শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরীকে বিস্মৃত না হই।

শরণং তরুণেন্দুশেখরঃ শরণং মে গিরিরাজকন্যকা।
শরণং পুনরেব তাবুভৌ শরণং নান্যদুপৈমি দৈবতম্॥

তরুণচন্দ্রশেখর ভগবান মহেশ্বর আমার শরণ, মহেশ্বরী গিরিরাজনন্দিনী আমার শরণ, আবার বলিতেছি তাঁহারাই উভয়ে আমার একমাত্র শরণ, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইব না।

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেঽনলাক্ষাৎ।
অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে॥

কণ্ঠে যাঁহার গরলপান জন্য নীলরেখার অঙ্কপাত না হইয়াছে, অঙ্গ যাঁহার ভুজঙ্গভূষণে বিভূষিত নহে, পাণিতলে যাঁহার কপালপাত্র বিন্যস্ত না হইয়াছে, ললাটতটে যাঁহার অনললোচন দেদীপ্যমান নহে, চূড়ায় যাঁহার শশাঙ্করেখা সুশোভিত নহে, বামাঙ্গে যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বিরাজিতা নহেন এমন দেবতাকে আমি মানি না—মানি না। 'মানি না' এ শব্দের অর্থ ইহা নহে যে, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না বা তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি না। উপাস্য স্বরূপে আমার আর কাহাকেও মানিবার প্রয়োজন নাই, কেননা যাঁহাকে পাইয়াছি তাঁহাতেই আমি চিরকৃতার্থ, এই ব্যভিচার-বিরহিত বিশুদ্ধ নিষ্ঠায় সতী যেমন পতিপ্রেমের একান্তভাগিনী, সাধকও তেমনই জগৎপতির একান্ত প্রেমের অধিকারী। এই অধিকারে আত্মমন সমর্পণ করিবার জন্যই একের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন—সেই দীক্ষাই তান্ত্রিক দীক্ষা।

অনেক সিদ্ধবংশে পঞ্চায়তনী দীক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই দীক্ষার নাম শুনিয়া অনেকে বিষম বিস্ময়বোধও করিয়া থাকেন। কারণ শিব শক্তি সূর্য্য বিষ্ণু গণেশ এই পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পঞ্চদেবতাকে সমান ভক্তিতে উপাসনা করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। সমান ভক্তিতে উপাসনা করিতে হইলে সত্যসত্যই বিড়ম্বনার কথা, বাস্তবিক কিন্তু সমানভাবে উপাসনা নহে, সকল উপাসকেরই উপাসনায় পঞ্চায়তন আছে। মণ্ডলের মধ্যস্থানে নিজ ইষ্টদেবতার এবং তাঁহারই চতুষ্পার্শ্বে অপর দেবতা চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠান। তবে পঞ্চায়তনী দীক্ষার বিশেষ এই যে, তাঁহারা গুরুমুখ হইতে পঞ্চদেবতার মন্ত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অন্য দীক্ষায় কেবল একের মন্ত্রই গৃহীত হইয়া থাকে। কোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সাধকের সকল মন্ত্রে অধিকার জন্মে। যদিও পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষার অভাবে সে অধিকারের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, তথাপি গুরুমুখ হইতে গ্রহণ করিলে সে অধিকার আরও শীঘ্র ফলপ্রদ হয়, এই পর্য্যন্তই বিশেষ। দ্বিতীয়তঃ সাধনসিদ্ধ অভিন্ন-বুদ্ধি কুলতিলক সাধকগণ নিজ ভবিষ্যবংশের কল্যাণ চিন্তায় ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, দেবদ্বেষ মহাপাতকে বংশ উৎসন্ন হওয়া বড়ই অপরিণামদর্শিতার ফল। তাই তাঁহারা পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, পঞ্চদেবতার মন্ত্রেই দীক্ষিত হইতে হইবে অর্থাৎ ইহা যেন কাহারও মনে না হয় যে, আমি শাক্ত, বিষ্ণু আমার উপাস্য দেবতা নহেন। সুতরাং বিষ্ণুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার প্রয়োজন নাই অথবা আমি বৈষ্ণব, শক্তি আমার উপাস্য দেবতা নহেন; সুতরাং শক্তির উপাসনা আমার পক্ষে বিফল। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই মূলে পঞ্চোপাসনার অধিকার লাভ করেন, তান্ত্রিক দীক্ষায় সেই অধিকার ফলোন্মুখ হয় এইমাত্র বিশেষ। গায়ত্রী দীক্ষায় যে তত্ত্বের বীজবপন হয় তান্ত্রিক দীক্ষা তাহারই অঙ্কুরিত অবস্থা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে বলিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে—

যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়-ব্রত-ধারণম্॥

বার্ষিক সমস্ত পর্ব্বে আমার যাত্রা, বলিবিধান (পূজানুষ্ঠান), বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষার গ্রহণ এবং আমার ব্রত ধারণ করিবে।

বৈদিক-স্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়ানামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্র (পৌরাণিক)—এই ত্রিবিধ আমার উপাসনা। সুতরাং বেদ তন্ত্র পুরাণ এই শাস্ত্রত্রয়েরই বিহিত বিধির দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান মহেশ্বর এই বিধিকেই যুগভেদে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, কুব্জিকা-তন্ত্রে—

শ্রুতিস্মৃতিবিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ।

শ্রুতিবিহিত এবং স্মৃতিবিহিত বিধি দ্বারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর, এই তিন যুগে দেবগণের পূজা করিবে, কলিযুগে কেবল তন্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা দেবতার উপাসনা করিবে। তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপাসনা করিলে কলিযুগে দেবগণ প্রসন্ন হয়েন না। তন্ত্রান্তরে ইহাই আরও বিস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—

কৃতে তু বৈদিকো ধর্ম্ম-স্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, ত্রেতাযুগে স্মৃতিবিহিত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। পুরশ্চরণ রসোল্লাসে—

তন্ত্রোক্তং ধ্যান-মন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ।
বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে।
ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ ভারতে কলৌ।

কলিযুগে ভারতবর্ষে তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রই প্রশস্ত। হে চঞ্চলাপাঙ্গি, বরাননে। বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত এবং পুরাণোক্ত ধ্যান মন্ত্রাদি কলিযুগে ভারতবর্ষে কদাচ প্রশস্ত নহে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।

প্রিয়ে। আগমোক্ত পথ ভিন্ন কলিযুগে অন্য গতি নাই। শিবে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বেই আমা কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে জ্ঞানী আগমোক্ত বিধির দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন।

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধা-স্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌত-জাতীয়া বিষহীনা ইবোরগাঃ।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়-সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমস্ত স্বতএব সিদ্ধ, শীঘ্র ফলপ্রদ এবং জপ প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মে প্রশস্ত। বেদোক্ত মন্ত্রসকল সত্যাদি যুগে সফল ছিল, কলিযুগে তাহারা বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য এবং মৃতপ্রায়, ভিত্তিচিত্রিত পুত্তলিকাসকল সর্ব্বেন্দ্রিয়—

সমন্বিত হইলেও যেমন স্ব-স্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপারে অসমর্থ তদ্রূপ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রসমস্তও কলিযুগে স্ব-স্ব কার্য্য সাধনে অসমর্থ। দত্তাত্রেয় যামলে—

অনীশ্বরস্য মর্ত্তস্য নাস্তি ত্রাতা যথা ভুবি।
তদা দীক্ষাবিহীনস্য নেহ স্বামী পরত্র চ।

অভিভাবক-হীন ব্যক্তির জগতে যেমন কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, দীক্ষাহীন পুরুষেরও তদ্রূপ কি ইহলোকে কি পরলোকে রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। গৌতমীয়ে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথা চাদীক্ষিতানাঞ্চ মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥

অনুপনীত দ্বিজ-বালকগণের যেমন নিজ কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার নাই এবং উপনয়নের পরে যেমন তাহাতে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত দ্বিজগণেরও মন্ত্রজপ এবং দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে অধিকার নাই এবং দীক্ষার পরেই তাহাতে অধিকার জন্মে। অতএব উপনয়নের পরে দ্বিজগণ আত্মাকে শিবোক্ত (তন্ত্র) শাস্ত্রানুসারে পুনঃ সংস্কৃত করিবেন। কুলার্ণবে—

নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈর্ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।

অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা নিয়ম ব্রত তীর্থক্ষেত্র গমন শরীর সংযম প্রভৃতি কোন কার্য্যই সফল হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইবে। আগমসন্দর্ভে—

গায়ত্রী প্রথমা দীক্ষা আত্মজ্ঞানপ্রদীপিকা।
অতো হি প্রথমা পূজা গায়ত্র্যাঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
দীক্ষানুসারেণ ততো হ্যন্যঞ্চ সমুপাসতে।
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে চৈতত্তত্ত্বং প্রশস্যতে॥

গায়ত্রী গ্রহণই আত্মজ্ঞান-প্রবোধিকা প্রথমা দীক্ষা। অতএব প্রথম গায়ত্রীর উপাসনা, পরে তান্ত্রিকদীক্ষা অনুসারে অন্যের (ইষ্ট দেবতার) উপাসনা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির পক্ষে ইহাই প্রশস্ত তত্ত্ব অর্থাৎ প্রথমতঃ উপনয়ন-সংস্কারে গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই পরে তন্ত্রানুসারে ইষ্টদেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের অভাব হেতু একমাত্র তান্ত্রিক দীক্ষাই বিহিত। এই গায়ত্রী-দীক্ষা বৈদিক হইলেও কলিযুগে তন্ত্রোক্তরূপেই গ্রাহ্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি ॥
অতোঽত্র কথিতং দেবি। দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়াত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ ॥
তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥

এই ব্রহ্মরূপিণী সাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী, সেইরূপই তান্ত্রিকী অর্থাৎ বৈদিক তান্ত্রিক উভয় কর্ম্মেই প্রশস্তা। দেবি! সেইজন্যই প্রবল কলিকালে দ্বিজাতিগণের বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে কেবল গায়ত্রীমন্ত্রেই নিত্যোপাসনার অধিকার আছে। তাহাতেও কলিযুগে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর আদিতে প্রণব, ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্মীবীজ এবং বৈশ্যের সরস্বতী বীজ দিতে হইবে।

এতদ্‌ভিন্ন তন্ত্রোক্ত দশ-সংস্কারাদি কার্য্যে যে সকল বৈদিক মন্ত্রের নির্দ্দেশ আছে, তান্ত্রিকবিধি-প্রসঙ্গে মহেশ্বর মহেশ্বরীর মুখে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়াই যে সমস্ত মন্ত্র বৈদিক হইলেও তান্ত্রিক হইয়া গিয়াছে। এ জন্য কলিযুগে সে সকল মন্ত্র দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বিফল হইবে না।

সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাদ্ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥
অতো বিপ্রাদিভির্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্ত-সংক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ ॥
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃপরম্ ॥
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ।
শূদ্রানাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে ॥
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ।
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ ॥
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা।
যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু ॥
পূর্বৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে।
সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু ॥
বিপ্রাদি-বর্ণভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ।
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে ॥

প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ ।
কলৌ তু পরমেশানি । তৈরেব মনুভির্নরাঃ ॥
মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ।
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ ॥
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ।
অথোচ্যতে মহামায়ে । গর্ভাধানাদিকা ক্রিয়া ॥
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ।

দেবি । সংস্কার ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি হয় না, এজন্য অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে অধিকারী নহে । অতএব ইহা পরলোকের কল্যাণকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ জাত্যুক্ত সংস্কারসকল সর্ব্বথা যত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য । গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্বন্ধে এই দশবিধ সংস্কার শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । শূদ্র এবং শূদ্রভিন্ন (অধম শূদ্র) গণের উপনয়ন নাই, তাহাদিগের নয়টি মাত্রই সংস্কার, কেবল দ্বিজাতিগণের দশ সংস্কার । বরারোহে । এই দশসংস্কার এবং এতদ্‌ভিন্ন নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য সমস্ত কর্ম্মই শাম্ভব পথ (তান্ত্রিক রীতি) অনুসারে নির্ব্বাহ করিবে । প্রিয়ে । যে যে কর্ম্মের যে যে বিধান তাহা পূর্ব্বেই বেদকর্ত্তা ব্রহ্মার স্বরূপে আমা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে । সমস্ত সংস্কার কার্য্যে এবং তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে মন্ত্রসকলও প্রদর্শিত হইয়াছে । কালিকে । সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই সেই মন্ত্রের আদিতে প্রণব প্রয়োগ করিবে । পরমেশ্বরি ! কলিযুগে শঙ্কর-শাসন (তন্ত্রশাস্ত্র) অনুসারে মানবগণ সেই সেই মন্ত্রেরই প্রথমে মায়াবীজ প্রয়োগ করিয়া সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে । নিগম-আগম তন্ত্র (গৌতম সনৎকুমার প্রভৃতি) বেদ এবং সংহিতাসমূহে সমস্ত মন্ত্র আমা কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে । কেবল যুগভেদে তাহার প্রয়োগ পৃথক পৃথক হইবে । মহামায়ে । অনন্তর গর্ভাধানাদি ক্রিয়া কথিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ঋতুসংস্কার এবং তৎপরে ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয় শ্রবণ কর ।

সাধকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন, গায়ত্রী-দীক্ষা বৈদিক হইলেও কলিযুগে তাহা তান্ত্রিক কি না । অপি চ—

সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা ।
সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্ ॥ ১ ॥
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণং ।
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ।

জাতকর্ম্ম তথা নাম চূড়াকরণমেব চ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতম্ ॥ ২ ॥
তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ।
যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদি-ধারণম্।
বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ।
গৃহারম্ভ-প্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা।
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ।
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ।
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৩ ॥
ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাঽশ্রদ্ধয়াপি বা।
বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৪
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি! প্রবলে কলৌ।
যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ ভবেৎ ॥ ৫ ॥
মন্মতাঽসম্মতা দীক্ষা সাধক-প্রাণঘাতিনী।
পূজাপি বিফলা দেবি! হুতং ভস্মার্পণং যথা।
দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৬ ॥
কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।
যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৭ ॥
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮ ॥
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ।
কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥ ৯ ॥
উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥ ১০ ॥
তদ্ধস্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্নন্তি দেবতাঃ।
পিতরোঽপি ন গৃহ্নন্তি যতস্তৎ মলপূয়বৎ ॥ ১১
তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ১২
অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ।
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন।

ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥
আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ।
তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ।
তস্মান্মর্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১৪ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকম্ ॥ ১৫ ॥
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১৬ ॥
মদ্বদনীরিতমার্গেণ নিত্যনৈমিত্ত-কর্ম্মণাং।
সাধনং যন্মহেশানি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১৭ ॥
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুতং।
ভেষজং কলিরোগানাং শ্রূয়তাং গদতো মম ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বথা সত্য আচরণে পবিত্রাত্মা হইয়া কলিযুগে মানবগণ মন্মুখনির্গত পথ (তন্ত্র) অনুসারে স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ১। দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ, ব্রত (উপনয়ন), বিবাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ এ সমস্তই তন্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করিবে। ২। তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদীয় উৎসব, যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রাদি ধারণ, বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, প্রতিপদাদি প্রত্যেক তিথিবিশেষে বিহিতকর্ম্ম, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতাস্থাপন, দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, ঋতুকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য, এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য এবং ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য সে সমস্তই মন্মুখ-কথিত বিধান অনুসারে সাধন করিবে। ৩। মোহবশতঃ অথবা দুর্ম্মতি বা অশ্রদ্ধাবশতঃ যদি এই সকল কার্য্য তান্ত্রিক বিধান অনুসারে নির্ব্বাহ না করে তবে সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া জীব পরলোকে বিষ্ঠারাশি মধ্যে কৃমিজন্ম লাভ করে। ৪। মহেশ্বরি! প্রবল কলিকালে যদি আমার মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে তাহাই তাহার বিপরীত ফলের নিমিত্ত হইবে। ৫। কলিযুগে মন্মতের অসম্মতা (শাস্ত্রান্তরে উক্তা) দীক্ষা সাধকের প্রাণঘাতিনী হইবে। তাহার অনুষ্ঠিত পূজা বিফলা এবং তৎকৃত হোমও ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে, দেবতা তাহার প্রতি কুপিতা হইবেন এবং পদে পদে তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। ৬। অম্বিকে! কলিকাল প্রবৃদ্ধ হইলে আমার নিজমুখনির্গত শাস্ত্রের আজ্ঞা জানিয়াও যদি অন্য শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে সে অনুষ্ঠাতা মহাপাতকী হইবে। ৭। বিশেষতঃ উপনয়ন

এবং বিবাহ যদি অন্য মার্গ দ্বারা নির্ব্বাহ করে তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত মানব ঘোর নরকে বাস করিবে। ৮। অন্য শাস্ত্র অনুসারে উপনয়ন হইলে সে উপনয়নে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে, উপনীত মানবক ব্রাত্য (পতিত) এবং চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইয়া নিজ কণ্ঠে সূত্রমাত্র বহন করিবে। ৯। অন্য শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হইলে সেই বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মত গর্হিতা হইবে। কুলনায়িকে! বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী হইবে। সেই স্ত্রীতে গমন করিলে তাহার বেশ্যাগমন জন্য পাপ দিনে দিনে সঞ্চিত হইবে। ১০। তাহার স্বহস্তদত্ত অন্ন, তোয়াদি দেবগণ এবং পিতৃগণ গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু তাহার অন্ন মলবৎ, জল পূয়বৎ। ১১। সেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের অংশে উৎপাদিত সন্তান কানীন (অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত) এবং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইবে, দৈবকার্য্যে, পিতৃকার্য্য এবং কুলাচারে তাহার অধিকার হইবে না। ১২। শাম্ভব (শম্ভু-কথিত) পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি দেবতার স্থাপন করে তাহা হইলে সেই দেবমূর্ত্তিতে কখনও দেবতার আবির্ভাব হইবে না। সুতরাং পরলোকের জন্য তাহাতে কেন ফল নাই, ইহলোকের ফলের মধ্যেও কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয়। ১৩। আগমোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি নর শ্রাদ্ধ করে তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিফল হইবে এবং শ্রাদ্ধকারী পুরুষ পিতৃলোকের সহিত নরক গমন করিবে, তাহার দত্ত জল শোণিত সমান এবং তাহার পিণ্ড মলময় হইবে। এ জন্য মানব প্রযত্ন সহকারে শঙ্কর-নির্দ্দিষ্ট মত আশ্রয় করিবে। ১৪। দেবি! অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শাম্ভব পথ পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, সে সমস্তই নিরর্থক হইবে। ভাবী ধর্ম্ম দূরে থাক, পূর্ব্ব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, শাম্ভবাচারহীন হইলে নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। ১৫। ১৬। মহেশ্বরি! মদুক্ত পথ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান তাহাই তোমার সাধন, তন্মধ্যে তোমার মন্ত্রযন্ত্রাদি সংযুক্ত যে আরাধন তাহাই বিশেষ সাধন। কলিকাল জন্য ভবরোগের সেই মহৌষধ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রৈলোক্যকল্যাণনিধান ভগবানের এই সকল আজ্ঞা অনুসারে সাধকবর্গ ইহাও দেখিয়া লইবেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিপুল প্রচারের অভাবে আর্য্যজাতির কি অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বনাশই ঘটিয়া গিয়াছে! এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বহুল তন্ত্রগ্রন্থের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন পূরণার্থ সাধকগণের হৃদয়ে তন্ত্রগ্রন্থের সংগ্রহ-বাঞ্ছাও অবশ্যম্ভাবিনী। কিন্তু শোচনীয় সম্বাদ এই যে, রোগের প্রারম্ভেই ঔষধালয় ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। কলিযুগের আরম্ভেই ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবল কালানলে পর্ব্বতপুঞ্জ শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকল প্রায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই দগ্ধাবশিষ্ট প্রায়োদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ গ্রন্থরাশির মধ্যে মূলতন্ত্র এবং তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থসমূহের প্রমাণ প্রয়োগ অনুসারে যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার পরে আর তাহা উল্লেখ

করিবার অবসর আমাদের ঘটিবে না। এজন্য মন্ত্রতত্ত্বের আরম্ভের পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে তাহার কতিপয় গ্রন্থের নাম আমরা সাধকবর্গের অবগতির জন্য সন্নিবেশিত করিয়া দিতেছি। তাঁহারা ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন, অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে এই গভীরতত্ত্ব-পূরিত অপার তন্ত্রবারিধির বিশাল গর্ভে তাহা কোথায় লুক্কায়িত হইবে, তাহার ইয়ত্তা থাকিবে কি না?

কালীবিলাস কঙ্কালমালিনী মুণ্ডমালা মহিষমর্দ্দিনী মায়াতন্ত্র মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় মহানির্ব্বাণ মালিনীবিজয় মহানীল মহাকালসংহিতা ফেরুতন্ত্র ভৈরবতন্ত্র ভৈরবীতন্ত্র ভূতডামর বীরভদ্র বীজচিন্তামণি একজটা নির্ব্বাণতন্ত্র ত্রিপুরাসার বিশ্বসার বরদাতন্ত্র বাসুদেবরহস্য বারাহীতন্ত্র বৃহদ্‌গৌতমীয় বর্ণোদ্ধৃতি-তন্ত্র বিষ্ণুযামল বৃহন্নীল বৃহদ্‌যোনি বিষ্ণুরহস্য বামকেশ্বর ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র ব্রহ্মযামল অদ্বৈততন্ত্র বর্ণবিলাস ফেৎকারিণী পুরশ্চরণরসোল্লাস পুরশ্চরণচন্দ্রিকা পিচ্ছিলাতন্ত্র প্রপঞ্চসার হংস পারমেশ্বরতন্ত্র নবরত্নেশ্বর নিত্যাতন্ত্র নীলতন্ত্র নারায়ণীয়ক নিরুত্তর নারদীয় নাগার্জ্জুন দক্ষিণামূর্ত্তি দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা যক্ষিণীতন্ত্র যোগিনী-তন্ত্র যোনিতন্ত্র যোগসার যোগার্ণব যোগিনীহৃদয় যোগস্বরোদয় আকাশভৈরব রাজরাজেশ্বরী রাধাতন্ত্র রেবতীতন্ত্র রুদ্রযামল রামার্চ্চনচন্দ্রিকা শাবরতন্ত্র ইন্দ্রজাল-তন্ত্র কালীতন্ত্র কামাখ্যাতন্ত্র কামধেনুতন্ত্র কালীকুলসর্ব্বস্ব কুমারীতন্ত্র কৃকলাস-দীপিকা কালোত্তর কুব্জিকাতন্ত্র কুলোড্ডীশ কুলার্ণব কুলমূলাবতার কুলসূত্র যক্ষডামর সরস্বতীতন্ত্র সারদাতন্ত্র শক্তিসঙ্গম শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব ঊর্দ্ধাম্নীয় স্বতন্ত্রতন্ত্র সম্মোহনতন্ত্র চীনাচার তোড়লতন্ত্র বুদ্ধতন্ত্র একবীরাতন্ত্র নিগম-কল্পদ্রুম নিগম-কল্পলতা নিগমসার শ্যামারহস্য তারারহস্য স্কন্দযামল অন্নদাকল্প অন্নপূর্ণাকল্প আগমকল্পদ্রুম আগমতত্ত্ববিলাস আগমদ্বৈতনির্ণয় আগমসন্দর্ভ আগমসার আদিত্যহৃদয় উত্তরকামাখ্যা উত্তরতন্ত্র উৎপত্তিতন্ত্র উমাযামল একবীরাকল্প কমলাতন্ত্র কমলাবিলাস কাত্যায়নীতন্ত্র কালিকার্চ্চনচন্দ্রিকা কালীকল্প কালীকুলসদ্‌ভাব কালীকুলামৃত কালীকুলার্ণব কালীক্রম কালীহৃদয় কুমারীকল্প কুলচূড়ামণি কুলপ্রকাশ কুলসার কুলসুন্দর কুলাচার কুলার্ণব কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা কৌলার্চ্চনদীপিকা কৌলাবলী ক্রমচন্দ্রিকা ক্রমদীপিকা ক্রিয়াযোগসার ক্রিয়াসার গণেশবিমর্ষিণী গন্ধর্ব্বতন্ত্র গায়ত্রীতন্ত্র গুপ্তদীক্ষা গুপ্তসাধন গুপ্তার্ণব গুরুতন্ত্র গূঢ়ার্থদীপিকা গৌতমীয়তন্ত্র গৌরীযামল ঘেরণ্ডসংহিতা চক্রবিচার চীনতন্ত্রযামল জ্ঞানতন্ত্র জ্ঞানার্ণব ডামর তন্ত্রকৌমুদী তন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রদীপিকা তন্ত্রপ্রমোদ তন্ত্ররত্ন তন্ত্ররাজ তন্ত্রসাগরসংহিতা তন্ত্রসার তন্ত্রাদর্শ তান্ত্রিকদর্পণ তারাখণ্ড তারানিগম তারাতন্ত্র তারাপ্রদীপ তারাভক্তিসুধার্ণব তারার্ণব তারাসার ত্রিপুরাকল্প ত্রিপুরার্ণব ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় ত্রৈলোক্যসম্মোহন দক্ষিণামূর্ত্তিকল্প দত্তাত্রেয়যামল দুর্গাকল্প দেবীযামল দেব্যাগম নন্দিকেশ্বরসংহিতা নারদ-পঞ্চরাত্র নারায়ণীতন্ত্র

নিগমকল্পলতা নিগমকল্পসার নিগমতত্ত্বসার নিবন্ধতন্ত্র নৃসিংহকল্প পরমহংসপটল পরদেবীরহস্য পুরশ্চরণবোধিনী পূজাসার প্রপঞ্চসার প্রয়োগসার বালাবিলাস ব্রহ্মযামল ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্তিবিলাস ভাবচূড়ামণি ভীমপরাক্রম ভুবনেশ্বরীতন্ত্র ভুবনেশ্বরীপারিজাত ভূতশুদ্ধিতন্ত্র ভৈরবকোষ ভৈরবযামল ভৈরবসংহিতা মৎস্যসূক্ত মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ মন্ত্রদর্পণ মন্ত্রমহোদধি মন্ত্রমুক্তাবলী মন্ত্ররত্ন মন্ত্ররত্নাবলী মহাকপিল পঞ্চরাত্র মহাকালমোহিনীতন্ত্র মহানীলতন্ত্র মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্র মানসোল্লাস মালিনীতন্ত্র মৃড়াণীতন্ত্র মেরুতন্ত্র যোগচিন্তামণি রেবাতন্ত্র লক্ষসাগর লক্ষ্মীকুলার্ণব লিঙ্গার্চ্চন বর্ণভৈরব বামদেবতন্ত্র বায়বীয়সংহিতা বারাহীতন্ত্র বিদ্যানন্দনিবন্ধ বিদ্যোৎপত্তিতন্ত্র বিমলাতন্ত্র বীরতন্ত্র বৃহত্তন্ত্রসার বৃহত্তোতলাতন্ত্র বৃহৎশ্রীক্রমসংগ্রহঃ বৃহদ্রুদ্রযামল বৃহন্নির্ব্বাণ বৃহন্নায়াতন্ত্র বেহায়সীমন্ত্রকোষঃ ব্যোমকেশসংহিতা ব্যোমরত্নতন্ত্র শক্তিযামল শক্তিতন্ত্র শম্ভুসংহিতা শাক্তক্রম শাক্তানন্দতরঙ্গিণী শাম্ভবীতন্ত্র শারদাতন্ত্র শারদাতিলক শাশ্বততন্ত্র শিখরিণীতন্ত্র শিবতাণ্ডব শিবধর্ম্ম শিবরহস্য শিবসংগ্রহ শৈবরত্ন শৈবাগম শ্যামাকল্পলতা শ্যামাপ্রদীপ শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা শ্যামাসপর্য্যাক্রম শ্যামাসপর্য্যাবিধি শ্রীকুলার্ণব শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি শ্রীরামসংগ্রহ সনৎকুমারতন্ত্র সময়াতন্ত্র সময়াচারতন্ত্র সম্মোহনতন্ত্র সরস্বতীতন্ত্র সারচিন্তামণি সারসংগ্রহ সারসমুচ্চয় সারস্বততন্ত্র সিংহবাহিনীতন্ত্র সিদ্ধলহরীতন্ত্র সিদ্ধবিদ্যাদীপিকা সিদ্ধান্তসার সিদ্ধেশ্বরীতন্ত্র সোমশম্ভু স্বচ্ছন্দমাহেশ্বর হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র হরগৌরীসংবাদ উড্ডামরেশ্বর কালিকোল্লাস কুলকল্পলতা কামাখ্যাদর্পণ কৌমারীবিলাস চণ্ডিকার্চ্চনচন্দ্রিকা চামুণ্ডাতন্ত্র অঘোরভৈরব অঘোরভৈরবী ভৈরবানন্দসার নিগমতত্ত্বরত্ন শিবসূত্র নিত্যাপ্রয়োগসার নির্ব্বাণসংহিতা কামরূপদীপিকা কামেশ্বরতন্ত্র কামাখ্যাপ্রয়োগ হনুমৎকল্প বিজয়াতন্ত্র পীঠরত্নাকর কাত্যায়নীকল্প গৌরীতন্ত্র মাতঙ্গীতন্ত্র ষোড়শীসংহিতা পার্ব্বতীতন্ত্র ডামরসূত্র ষট্‌কর্ম্মদীপিকা ষট্‌কর্ম্মদীধিতি চক্রেশ্বর চক্রমুকুর কৌলকৃত্যতত্ত্ব কৃত্যাতত্ত্ব কৃত্যাপ্রয়োগ আগমার্ণব অভিচারকবচ শ্যামাসপর্য্যা সিদ্ধিতন্ত্র।

এ পর্য্যন্ত সাধারণ অনুসন্ধান দৃষ্টিতে প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, দিগ্‌দর্শনের জন্য তাহারাই অংশবিশেষ এস্থলে উল্লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন তান্ত্রিক আচার্য্যগণের মুখে শুনিতে পাই—তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা একলক্ষ। কেহ কেহ বলেন তদপেক্ষাও অনেক অধিক, তদ্‌ভিন্ন বিশেষ বিশ্বস্ত সম্প্রদায়ের মত এই যে অদ্যাপি তন্ত্রসৃষ্টির বিরাম হয় নাই এবং আবহমানকাল-পরম্পরায় হইবেও না। অদ্যাপি কৈলাসশিখরে ভগবান গণপতিদেব জনকজননীর মুখে যে কোন তন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাহাই হিমাচলনিবাসী ঋষিবর্গের সন্নিধানে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ত্রিলোকহিতৈষী মহর্ষিবর্গ ও সিদ্ধ সাধকবর্গ শিষ্য-পরম্পরায় জগতে তাহার প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপেই

পৃথিবীমণ্ডলে তন্ত্রের অবতরণা।. সুতরাং জগতে নিত্য-নবতন্ত্রের আবির্ভাব কিছুই বিচিত্র নহে। তাই অদ্যাপি কৈলাস-মণিমন্দিরে ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দ-সমিতি সিংহাসনে সমাসীন ত্রিভুবন-জনকজননী পরব্রহ্মদম্পতির কথোপকথনচ্ছলে শব্দব্রহ্ম তন্ত্রশাস্ত্র নিত্যনবরূপে আবির্ভূত এবং লুপ্ততন্ত্রসকল ঘোর কলিকলুষার্ণবমগ্ন পাতকিকুলের উদ্ধারার্থ পুনরুদ্ধৃত হইতেছে—ইহাই সাধককুলে দিব্যদৃষ্টি-পরীক্ষার অমোঘ উদ্‌ঘোষণা।

ইতি দশম পরিচ্ছেদ।

প্রথমভাগ সম্পূর্ণ।

তন্ত্রতত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ

"আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়ানাম্।
নারাধয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি যে ত্বাং
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥"

৺সর্ব্বমঙ্গলা সভার সম্পাদক
সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারক পণ্ডিতবর—

৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য

মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

(নূতন সংস্করণ)

শকাব্দ ১৮৩৬

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীশ্বরী মা সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছায় নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তন্ত্রতত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। সর্ব্বমঙ্গলা সভার যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে তন্ত্রতত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া যাইত কিন্তু বিচারালয়ের প্রথিতনামা বিচারপতি মহানুভব উড্‌রফ্‌ সাহেব বাহাদুরের উদারতায় ও তাঁহারই অর্থে ইহা আজ জনসমাজে প্রকাশিত হইল। যাঁহার অর্থে ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে ভারতের এই পরম গুহ্যতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ জনসাধারণে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইল, আর্য্যসন্তান মাত্রই মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। মা সর্ব্বমঙ্গলা সেই ধর্ম্মপ্রাণ মহামহিমান্বিত উড্‌রফ্‌ সাহেব বাহাদুরের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।

তন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশিত হইল বটে—কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে মহাপুরুষ তন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন—কি জানি মায়ের কি ইচ্ছা—আজ তাঁহার এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের আনন্দ তিনি ভোগ না করিয়া আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সমগ্র সাধকসমাজকে ব্যথিত করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

একাদশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রতত্ত্ব

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সবিতা ভগবান সূর্য্যদেব সম্বৎসরের দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই আট মাসে পৃথিবীর নিকট হইতে যাহা জলরূপ কর গ্রহণ করেন, আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন এই চারি মাসে বৃষ্টি বর্ষায় আবার তিনি তাহা পৃথিবীকেই প্রত্যর্পণ করেন। এই করগ্রহণও তাঁহার করপ্রসারণেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহারই নাম কর, এইজন্যই শাস্ত্রে তাঁহার নাম সহস্রাংশু সহস্রকিরণ সহস্রকর ইত্যাদি। পৃথিবীর জল সূর্য্যতেজে আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যলোকে উত্থিত হয়। সূর্য্যের সেই তেজের নামই রৌদ্র। কিন্তু ইহা ভাবিবার বিষয় যে, সূর্য্যের তেজের নাম রৌদ্র কেন হইল? সৌর হওয়াই উচিত ছিল। 'রুদ্রস্য ইদমিতি রৌদ্রম্' রুদ্রের যাহা তাহারই নাম রৌদ্র। তবে সূর্য তেজের নাম রৌদ্র কেন? ইহা বুঝিতে হইলেই গায়ত্রীতত্ত্বের অনুধ্যান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের অধিষ্ঠাত্রী ও নিয়ন্ত্রী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্রী ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রি-শক্তিই ত্রি-সন্ধ্যায় সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যেয় মূর্ত্তি। দৈনন্দিন সৃষ্টি স্থিতি সংহারে—প্রাতঃসন্ধ্যা সৃষ্টিকাল, মধ্যাহ্ন স্থিতিকাল এবং সায়ংসন্ধ্যা সংহারকাল। প্রলয়ের তামসীশক্তি নিদ্রার অধীনতা ও অন্ধকারের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া প্রভাতে জীবজগৎ জাগিয়া উঠে। রাত্রিতেও বিশ্বজগৎ সমানভাবে থাকিলেও তামসিক আবরণে তাহা আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং থাকিয়াও, তখন তাহা প্রসুপ্ত অবস্থায় অনুভবের বিষয় হয় না। এজন্য তখন উহা নাই বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে, কেননা তাহা না ধরিলে প্রলয় পদার্থ অলীক হইয়া উঠে। কারণ প্রলয়েও সূক্ষ্মাকারে বীজরূপে জীবজগৎ প্রকৃতিগর্ভে অধিষ্ঠিত থাকে। তাহার পর সৃষ্টির সেই প্রথম বিকাশ ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দৈনন্দিন সৃষ্টিতেও সেই ব্রহ্মশক্তিই সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিশ্বজগতে পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। তাই তরুণারুণ কিরণালোকে লোক-জগতের সে সৃষ্টিময়দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া থাকে। এইজন্যই প্রাতঃকালে প্রাতঃসন্ধ্যায় সৃষ্টিকর্ত্রী ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণীমূর্ত্তিতে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যেয়া। মধ্যাহ্নে প্রৌঢ় জগৎ যখন পূর্ণতার পরমসীমায় আরূঢ়, স্থিতির মূল ক্ষুধাশক্তি ও তৃষ্ণাশক্তির অধিকারে জীবজগৎ যখন সম্পূর্ণ অধিকৃত, বৃক্ষ গুল্ম লতা বনস্পতি পর্য্যন্তও যখন অশ্রান্ত সূর্য্যকিরণ-পানে ক্লান্তদেহ এবং তথাপি স্থিতি-শক্তির প্রভাবে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সে আহারের জন্য লালায়িত। একদিকে উদয়াচল অন্যদিকে

অস্তাচল, সূর্য্যদেব যখন ইহারই মধ্যবর্ত্তী হইয়া মধ্যগগনে অধিষ্ঠিত তখনই মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় সংসারের স্থিতি-কর্ত্রী বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী-মূর্ত্তিতে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যেয়া। আবার সায়ংকালে জীবজগৎ যখন দৈনন্দিন লীলাখেলার শেষ করিয়া শ্রান্তদেহে প্রলয়ের প্রসুপ্তি-শান্তিসুখ-ভোগের জন্য উন্মুখ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সংযত ও সংস্পৃহ তখনই সেই শান্তি বিধানের জন্য ভ্রান্তির রঙ্গভূমি এই মায়াময় সংসারকে তামসী-শক্তির আবরণে নিদ্রার যবনিকাপাতে আচ্ছন্ন করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়াবলীর সংস্কাররাশি জীবের মনোবৃত্তি হইতে সুদূরে অপসারিত করিয়া সুষুপ্তির শান্তিভোগে কেবলানন্দরূপিণী বিশ্বসংহারকারিণী শিবশক্তি মাহেশ্বরী মূর্ত্তিতে সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিতা এবং সায়ংসন্ধ্যায় তিনিই আরাধ্যা। এইজন্যই শাস্ত্রের আজ্ঞা কালাতীতে বৃথা সন্ধ্যা, স্ব-স্বকাল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাবন্দনের অনুষ্ঠান করিলেও তাহা বৃথা হয়। কেননা প্রাতঃসন্ধ্যার কাল-সৃষ্টিশক্তির অধিকার অতীত করিয়া স্থিতিশক্তির অধিকারে আসিয়া সৃষ্টিশক্তির উপাসনা করা এক রাজার রাজ্যে বাস করিয়া অন্য রাজার নিকটে তাঁহার কর প্রদান করা হয়, তাহাতে পূর্ব্বকালীন রাজশক্তির পূর্ণ প্রভাব তখন কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। আবার স্থিতিশক্তির অধিকার অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে বা রাত্রিকালে মধ্যাহ্নসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলে বা সংহারশক্তির অধিকার সায়ংকাল অতিক্রম করিয়া পরদিন সায়ংসন্ধ্যায় অনুষ্ঠান করিলেও সেই একই কথা। ইহাই হইল স্থূলভাব। ইহার পর সূক্ষ্মভাবে আবার বুঝিবার কথা এই যে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ত্রিশক্তির সমষ্টি-স্বরূপিণী মহাপ্রকৃতি সত্ত্বরজস্তম-ত্রিগুণাত্মিকা। তাঁহার এক গুণের লীলার সময়ে অন্যগুণ নিস্তব্ধ থাকে ইহা নহে, সৃষ্টি স্থিতি সংহারের নিত্যলীলাই তাঁহাতে সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজিত। স্থূলদৃষ্টিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। মনে কর আমরা দেখিতেছি, একটি ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটি হরিণকে হত্যা করিল। আমরা বুঝিলাম, ইহা জগদম্বার সংহারলীলা। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই ইহা বিস্পষ্ট অনুভূত হইবে যে এ সংহারলীলার মধ্যেও ত্রিগুণময়ীর ত্রিগুণলীলাই পরম্পরাক্রমে সমানভাবে বিরাজিত। স্থূলদৃষ্টিতে আমরা হরিণের সংহারই দেখিলাম কিন্তু হরিণের পক্ষে উহা সংহার হইলেও ব্যাঘ্রের পক্ষে উহা স্থিতি বই আর কিছুই নহে। কারণ ঐ হরিণের রক্তমাংসই ব্যাঘ্রের দেহের রক্ষা হইল। আবার এই ব্যাঘ্রের দেহ রক্ষিত হইয়াই ব্যাঘ্রশিশুর উৎপত্তির কারণ হইল। সুতরাং হরিণের পক্ষে উহা সংহারলীলা হইলেও ব্যাঘ্রশিশুর পক্ষে সৃষ্টিশক্তির লীলাখেলা বই আর কিছুই নহে। যেমন তুমি আর আমি আহার করিলে উহাতে বৃক্ষের বীজশক্তির হইল সংহার, তোমার আমার হইল স্থিতি আর সন্তান সন্ততির হইল সৃষ্টি। তবেই এখন বুঝিবার কথা এই হইল যে, তাঁহাতে ত্রিগুণের তিন লীলাই সমভাবে নিত্য বিরাজিত। কিন্তু জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মফলে কাহারও পক্ষে সৃষ্টি, কাহারও

পক্ষে স্থিতি এবং কাহারও পক্ষে সংহার। মায়ের লীলা সনানভাবেই চলিতেছে, কেবল জীবের বিচিত্র কর্ম্মফলে সে লীলার বিষয়সকল পৃথক পৃথক হইতেছে এই মাত্র প্রভেদ। তিনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী নিত্য-ত্রিগুণলীলাময়ী। তাঁহার সে ত্রি-লীলার বিরাম বিরতি এক নিমিষের জন্যও হইবার নহে। ভ্রান্তজীবের অন্ধ দৃষ্টিতেই কেবল উহার ক্রমপরম্পরা লক্ষিত হয়। যে জলপান করিয়া লোকে জীবন ধারণ করিতেছে সেই জলেই লোক ডুবিয়া মরিতেছে। ইহাতে জলের জীবনীশক্তিই বুঝিব, না সংহারিণী শক্তিই বুঝিব? আবার সেই জলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জলে বাস করিয়া মৎস কূর্ম্ম কুম্ভীর শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি জলজীবগণ জীবন ধারণ করিতেছে, জল হইতে উঠিলেই তাহারা জীবন হারাইতেছে, ইহাতে জলের সৃষ্টি-স্থিতি-শক্তিই বুঝিব? সুদূর প্রান্তরে নিদাঘার্ত্ত পথিক যে রৌদ্রে প্রাণ হারাইতেছে, হিমাচলের তুষারপাতে জড়ীভূত-দেহ শীতার্ত্ত পথিক সেই রৌদ্রেই জীবন লাভ করিতেছে। বল, এখন ইহা রৌদ্রের সংহারশক্তির পরিচয়, না স্থিতিশক্তির পরিচয়? এই রৌদ্র না পাইলেই বৃক্ষ গুল্ম লতা শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে আবার এই রৌদ্রই পৃথিবীর জল আকর্ষণ করিয়া সুদূর সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত করিতেছে। জগতের যিনি স্থিতিকর্ত্তা নারায়ণ, তিনিই রামরূপে কৃষ্ণরূপে রাবণ কুম্ভকর্ণ কংস প্রভৃতির সংহারকর্ত্তা। যখন যে অধিকারে যে লীলার প্রভাব তখন সেই অধিকারেই তাঁহার সেই নাম। পৃথিবীর জল যখন সংহরণ করিতেছেন তখনই জলের পক্ষে সে তেজ রৌদ্র, জলসংহরণের জন্য পূর্ব্বের সে তেজঃ তখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—তাই সৌরতেজঃ হইলেও তাহা তখন রৌদ্রতেজঃ, এইজন্যই রৌদ্রের নাম রৌদ্র। গুণলীলার অনুসারেই তাঁহার রূপলীলা ও নামলীলা। ভাই সাধক। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এই রৌদ্র পদার্থে এবং সূর্য্য পদার্থে কি-কতদূর প্রভেদ। মণ্ডলাকৃতি ঘনীভূত তেজঃপুঞ্জের নামই সূর্য্য, আর তাহারই ইতস্ততঃ প্রসারিত তরল কিরণমালার নামই রৌদ্র। ফলতঃ তরঙ্গে ও সমুদ্রে যে ভেদ, রৌদ্রে ও সূর্য্যেও সেই ভেদ। সমুদ্রে যেমন সমষ্টিরূপে জল অধিষ্ঠিত, সূর্য্যমণ্ডলেও তদ্রূপ সমষ্টিরূপে তেজঃ অধিষ্ঠিত। ব্যষ্টিরূপে নিত্যতরঙ্গ তাহাতে যেমন নিত্য উদ্বেলিত, সূর্য্যমণ্ডলেও তেজস্তরঙ্গও তদ্রূপ নিত্য উদ্বেলিত। তবেই বুঝিতে হইল জলও যাহা তরঙ্গও তাহাই, সূর্য্যও যাহা রৌদ্রও তাহাই। কোথায় লক্ষ যোজন অন্তরালে ঊর্দ্ধে সূর্যমণ্ডল আর কোথায় লক্ষযোজন নিম্নে এই পার্থিব জলরাশি। সূর্য্য যদি নিজে নিজের তেজঃ প্রসারণে এ জল পৃথিবী হইতে আকর্ষণ না করিতেন তবে জলের কি কখনও সাধ্য ছিল সূর্য্যমণ্ডলে উঠিতে, না এ বিশ্বজগতে কাহারও সাধ্য ছিল জলকে সূর্য্যমণ্ডলে উঠাইতে? কোথায় সেই বেদবেদান্তের দুরধিগম্যা যোগী যোগীন্দ্রের দুরারাধ্যা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও অবাঙ্মনসগোচরা ত্রিগুণাতীতা ব্রহ্মময়ী আর কোথায় এই গুণপ্রপঞ্চ সংসারের মায়াময়

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জড়জীব? জীবের এই জীবশক্তি আপন বলে গিয়া শিবশক্তিতে প্রবেশ করিবে, ইহা কি কখনও জীবের সাধ্যায়ত্ত? মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, শিশু যদি তাঁহারা কোলে উঠিতে চাহে তবে তাহার কি সাধ্য যে ঝাঁপিয়ে মায়ের কোলে উঠিবে যদি দয়াময়ী জননী সস্নেহ কর প্রসারণে আপনি তাহাকে কোলে তুলিয়া না লয়েন? এই নিরুদ্দেশ বিশ্বপ্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য যাত্রা করিতে চাহিলে কাহার এমন সাধ্য যে সাহস করিয়া বলিতে পারেন, যাও সাধক। নির্ব্বিঘ্নে বিঘ্নহর-জননীর কোলে গিয়া উঠ, তাহার জন্য আমি প্রতিভূ রহিলাম; সে প্রতিভূ থাকিবার সাধ্য সামর্থ্য কেবল একমাত্র মন্ত্রশক্তিতেই নিত্য অধিষ্ঠিত। তাই ভগবান ও ভগবতী উভয়ের আজ্ঞা, শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শ্বাশ্বতী তনুঃ—পরব্রহ্ম যেমন আমার নিত্যদেহ, শব্দব্রহ্ম মন্ত্রশক্তিও তেমনই আমার নিত্যদেহ। সূর্য্যতেজ রৌদ্রের ন্যায় মন্ত্রশক্তিই কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবকুলকে ব্রহ্মময়ীর কোলে উঠাইয়া দিবার অধিকারিণী, কেননা মন্ত্রশক্তি তাঁহাবই স্বরূপ। এই চৈতন্যময়ী শক্তির প্রসারণেই অচৈতন্য জীবজগৎকে সচৈতন্য কবিয়া মন্ত্রশক্তিই কেবল তাহাকে পরমাত্মস্বরূপ প্রদর্শনের একমাত্র কর্ত্রী। এইজন্যই আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত যত কিছু সিদ্ধি-সাধনা-পদ্ধতি, কেবল মন্ত্রশক্তিই তাহার সকল যন্ত্রেব পরিচালযিত্রী। জীবহীন দেহ যেমন সর্ব্বকর্ম্মে অসমর্থ, মন্ত্রশক্তি বির্বর্জ্জিত বিধি-পদ্ধতিও তদ্রূপ সাধনরাজ্যের সর্ব্বকার্য্যে অসমর্থ।

তন্ত্রতত্ত্বের প্রথমখণ্ডে মন্ত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে স্বল্পাক্ষরে যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতেই ইহাও প্রদর্শিত হইয়ছে যে, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ দ্বিবিধ—প্রথমে বাচকশক্তি, দ্বিতীয় বাচ্যশক্তি। সাধকের উপাসনাক্রমে বাচকশক্তি জাগরিতা হইলে তবে বাচ্যশক্তির স্বরূপ প্রকাশ হইবে। যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেরূপ মূর্ত্তিমতী হউন না কেন, সকলেই সেই মূলাধার বিবববিলাসিনী কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গবিভূতি বই আব কিছুই নহেন। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণমালাই মাতৃকা-সরস্বতীর অক্ষমালা। এই পঞ্চাশদ্বর্ণ হইতেই নবকোটি মহামন্ত্রের আবির্ভাব এবং এই সকল মন্ত্রই সিদ্ধিসাধনার একমাত্র নিদান। এই মন্ত্রই বীজ অঙ্কুর স্তম্ব কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব পত্র পুষ্প ফল ভেদে নানাবিধ। বীজবপন ব্যতিরেকে পত্র পুষ্প ফল পল্লবের আশা যেমন অসম্ভব, দেবতাব স্বরূপ-মন্ত্র ব্যতিরেকেও তদ্রূপ অন্যান্য মন্ত্রে অধিকার অসম্ভব। এইজন্যই দীক্ষাকালে দেবতার স্বরূপ-মন্ত্র যাহা লাভ করা যায় তাহার নাম বীজমন্ত্র। সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত পরিষ্কৃত এবং কৃপাসলিল-সেচনে সুসিক্ত করিয়া গুরুরূপী পরব্রহ্ম তাহাতে যে মহাবীজ বপন করেন, সেই বীজেরই অঙ্কুরোদ্‌গম দেবতার নামঘটিত মন্ত্র, তৎপর তান্ত্রিক-সন্ধ্যা গায়ত্রী ন্যাস পূজা ও উপচারমন্ত্র তাহারই স্তম্ব কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব, স্তবন বন্দন তাহারই পত্র

পুষ্প এবং মন্ত্রাত্মক কবচ তাহার ফলস্বরূপ। ফলমধ্যে যেমন সকল বীজ নিহিত এবং বীজের অভ্যন্তরে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অঙ্কুর কাণ্ড পত্র পুষ্পাদি নিহিত তদ্রূপ মন্ত্রফল কবচের মধ্যেও বীজমন্ত্র সকল নিহিত এবং সেই বীজেরই অভ্যন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সিদ্ধি সাধনশক্তি প্রভৃতি অবস্থিত। এক্ষণে বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেকের সন্দেহ এই যে, পরমেশ্বরের উদ্দেশে আত্মবক্তব্যের ভাষার নাম মন্ত্র। সুতরাং আমার যে ভাষাতে ইচ্ছা আমি সেই ভাষাতেই তাঁহাকে আত্মবিষয় জানাইতে পারি, তাহার জন্য চিরপুরাতন শাস্ত্রবাক্য (বাঁধিগদ) অভ্যাস করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, তাঁহারা মন্ত্রের লক্ষণ যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই আদৌ অশাস্ত্রীয়, সুতরাং ভ্রান্ত। মন্ত্রলক্ষণে শাস্ত্র বলিয়াছেন,

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা-মামন্ত্রান্মন্ত্র উচ্যতে ॥

যাহার মনন হইতে বিশ্ব বি-জ্ঞান, বিশ্বময় বিশেষ জ্ঞান ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ড-সত্তা পৃথক নহে, এই একান্ত অনুভব প্রত্যক্ষ হয়—এই অংশে 'মন্', সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ ঘটে—এই অংশে 'ত্র', সমষ্টিতে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের আমন্ত্রণ যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মন্ত্র।

অবিশ্বাসীর কথা স্বতন্ত্র। এখন শাস্ত্রের আজ্ঞায় যাঁহার বিশ্বাস আছে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার বন্ধন-পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের আমন্ত্রণ এই তিনটি অলৌকিক দায়িত্ব যাহাতে নিত্য বিদ্যমান তাহাই মন্ত্র। সাধন ভজন করিতে সকলেরই সাধ হয়, কিন্তু সে কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতে হাতে পাইব কিনা, এ কথার উত্তর কে দিবে? এই সঙ্কটময় সমস্যার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একমাত্র মন্ত্র ভিন্ন কাহার সাধ্য এ জগতে সদম্ভে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে, 'জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ'। কাহার সাধ্য বলিতে পারে, যদি সিদ্ধি না হয় তবে তাহার জন্য আমি দায়ী রহিলাম, ত্রিভুবনে কাহার এমন আধিপত্য যে একদিকে সেই অবাঙ্মনসগোচরা দুরারাধ্যা সাধ্য দেবতা অন্যদিকে মহামোহ-সমাচ্ছন্ন জীবসাধক, এই উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, সাধক! ভয় নাই, আমি তোমার প্রতিভূ রহিলাম—সেই সিদ্ধিদাতা দায়-পরিশোধকর্ত্তা প্রতিভূ একমাত্র মন্ত্র। কি জানি মন্ত্রের কেমন দুরন্ত আকর্ষিণী শক্তি। যাহার আকর্ষণে নিত্যসিদ্ধ অপার স্থির গম্ভীর পরম দেবতাকেও অতি চঞ্চল করিয়া তুলে, প্রকৃতির চিরপ্রবাহমান প্রক্রিয়ারাশিকেও স্তম্ভিত করিয়া নিজ প্রচণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে, সাধকের প্রকৃতিসিদ্ধ জীবত্ব বিদূরিত করিয়া শিবত্ব সঞ্চারিত করে, অযত্নসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তাঁহার নয়নগোচরে নৃত্য করিতে থাকে। মন্ত্রসিদ্ধিবলে যখন

সাধকের ত্রিলোকদৃষ্টি বিস্ফারিত হয় তখন আর অলৌকিক বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, মহামায়ার অনুগ্রহে যখন তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ায় তত্ত্বকবাট উদ্ঘাটিত হয় তখন আর কার্য্য-কারণ প্রক্রিয়া-মধ্যে সাধকের পক্ষে কিছুই দুর্ঘট নহে। এইজন্য মন্ত্র বলিতে ভাষা বলিয়া অনুমান করা অজ্ঞতার পরিণাম মাত্র। বিশেষতঃ বীজমন্ত্রাদি ভাষা হওয়াও অসম্ভব, কারণ লৌকিক ব্যবহার অনুসারে সে সকল মন্ত্রাদির কোন অর্থই আদৌ হয় না—যে অর্থ তাহাতে আছে, সে কেবল সেই পরমার্থস্বরূপিণী দেবতার স্বরূপ বই আর কিছুই নহে। ভাষাও নহে বাক্যও নহে, বর্ণও নহে অক্ষরও নহে, তুমি আমি যাহা কিছু লিখি বা পড়ি তাহার কিছুই নহে অথচ যাহা বলি এবং যাহা শুনি তাহারই অন্তশ্চারিণী নিখিল-বর্ণ-নিনাদিনী ধ্বনিরূপিণী নিত্যসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-দেবতা। সেই সাক্ষাদ্দেবতাকে অক্ষর বলিয়া মনে করাও মহাপাপ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

গুরৌ মানুষবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাং।
প্রতিমায়াং শিলাবোধং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥

গুরুদেবে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে যাহার অক্ষরভাবনা এবং দেবপ্রতিমায় যাহার শিলাবুদ্ধি তাহার নরক অব্যাহত। এস্থলে অক্ষর তত্ত্বটি একটু বিশদরূপে বুঝিবার প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ লিপি বিন্যাসকে এবং উচ্চারিত বর্ণকে অক্ষর বলিয়া মনে করি। সহজ কথায় বর্ণের নাম অক্ষর, কিন্তু 'উচ্চারিত-প্রধ্বংসিনো হি বর্ণা ন তৃতীয়ক্ষণমপেক্ষন্তে'—বর্ণসকল উচ্চারণমাত্রেই ধ্বংসশীল, তাহারা কখনও তৃতীয় ক্ষণের অপেক্ষা করে না। এই দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে পদ বাক্য বা ভাষা বলিতে বর্ণসমষ্টির একত্র অবস্থানও অসম্ভব। যেমন কলস শব্দটি উচ্চারণ করিতে হইলে ক উচ্চারণের পরে ল উচ্চারণ করিতে গেলেই ক তখন আর নাই, আবার ল উচ্চারণের পর স উচ্চারণ করিতে গেলেই ল তখন আর নাই। সুতরাং ক ল এবং স বর্ণের উচ্চারণ হইলেও কলস এই শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব। বস্তুতঃও বর্ণেরই উচ্চারণ হয়, শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব—তবে ঈশ্বরেচ্ছাগ্রন্থিতে যে সকল বর্ণ শব্দরূপে পরস্পর-গ্রথিত, তাহাদেরই যথাক্রমে অব্যবহিত পরে পরে শাস্ত্রানুসারে উচ্চারণ করিতে হইবে—এই পর্য্যন্তই শব্দের শব্দত্ব এবং শাস্ত্রের আজ্ঞা। তাই কথিত হইয়াছে, 'যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থপ্রতিপাদনে বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যা-স্তে তথৈবার্থ-বোধকাঃ'। বর্ণ যতগুলি, যেমন গুলি এবং যে গুলি, যে অর্থ প্রতিপাদনে ঈশ্বরেচ্ছা-নিয়োজিত এবং সামর্থ্যশালী, তাহারা সেইরূপেই পরতঃ পর উচ্চারিত হইয়া সেই সেই অর্থের বোধক হইবে। আদি ভাষার বিবরণে সত্যতত্ত্ব এই যে, মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাবের পর জীব জগতের শব্দসমষ্টিময়ী ভাষার সৃষ্টি সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই যে, অমুক বর্ণসকল একত্র সমবেত হইলে শব্দরূপ অমুক অর্থের বোধক

হইবে—ইহা অনাদি সিদ্ধি, যুক্তিতর্ক বিচার-বলে কাহারও সাধ্য নাই যে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্বময় ভাষা-বিপ্লব ঘটাইতে পারে। এই সনাতনী-সিদ্ধি চিরকাল সমানভাবে আছে বলিয়াই জগৎ রক্ষিত হইতেছে। এইজন্যই শব্দশাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইদমন্ধতমং কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং।

যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥

এই সমস্ত ত্রিভুবন রাজ্য অন্ধতম হইয়া যাইত যদি শব্দ-নামক জ্যোতিঃ সমগ্র সংসার ব্যাপিয়া দেদীপ্যমান না থাকিত। এ শব্দ শাস্ত্রানুগত বৈদিক-ভাষার, অন্যান্য ভাষার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ সে সমস্তই মহাপ্রকৃতি বৈদিক-ভাষার বিকৃতি বা আধুনিক রূপান্তর মাত্র। যাহা হউক আদি ভাষা লইয়াই আমাদের কথা, তাহাতেও দুইটি বর্ণ একদা উচ্চারিত হইবার নহে। এখন প্রথম ক্ষণে যাহার উৎপত্তি দ্বিতীয় ক্ষণে নাশ, উচ্চারণের পরে আর যাহাকে পাইবার উপায় নাই তাহাকে অক্ষর বলিয়া স্বীকার করি কিরূপে? কিন্তু তথাপি অক্ষরের নাম অ-ক্ষর অর্থাৎ কোনকালে যাহার ক্ষরণ (বিনাশ) নাই, অনাদি অনন্ত নিত্যসিদ্ধ সনাতন পদার্থ—তবেই বুঝিতে হইতেছে যে, চিরকালই অক্ষর লিখিয়া পড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু অক্ষর কাহাকে বলে তাহা আজও জানি না, ইহাই দুঃখ। ভগবান বলিয়াছেন, 'শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ'—শব্দ যাঁহার নিত্যদেহ সেই স্বপ্রকাশ ভগবান ভিন্ন কাহার সাধ্য শব্দতত্ত্ব প্রকাশ করিবে? যোগিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, কল্পান্ত-প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিপ্রারম্ভে পরব্রহ্ম দম্পতির কৌতুকময় লীলাবিস্তার প্রসঙ্গে শিবাংশসম্ভূত ঘোর নামক দৈত্যের নিধনসাধন জন্য অনাদিনিধনা মহাকাল-মনোমোহিনী যখন রণোন্মাদিনী সাজিয়া মহাকাল-বক্ষস্থলে দাঁড়াইলেন, জগদম্বার সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির রশ্মিবৃন্দ-সমুদ্ভূত অনন্তকোটি যোগিনীমণ্ডল যখন তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া ভৈরবানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডময় রণপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মময়ী রণরঙ্গিনীর রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল আর সেই তালে তালে তাল দিয়া কালবিজয়-বৈজয়ন্তী মা আমার যখন অশ্রান্ত নৃত্যভরে দ্বিতীয় প্রলয়কালের অবতারণা করিলেন, সেই সময়ে স্বয়ং মহাকাল বলিতেছেন—

তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং ভয়বিহ্বলমানসঃ।
অহং জগাম সহসা তত্র কান্তারমুত্তমম্॥
সুষুম্না বর্ত্মনা দেবি। তত্র গত্বা ময়া কিল।
সমুদ্দিষ্টং শ্রুতং যদ্‌যৎ কথিতুং নৈব শক্যতে॥
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ক্বচিৎ॥ ১॥
অতীব বৃহদাকারা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটি কোটিশঃ।
চরন্তি সর্ব্বদা দেবি কঃ সংখ্যাতুং ক্ষমো ভবেৎ॥ ২॥

কোটি-কোটি-মুখা দেবি কোটি-কোটি-ভুজাস্তথা ।
এবঞ্চ বিবিধাকারা ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥
মহদৈশ্বর্য্য-সম্পন্নাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবাসিনঃ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি ! দৃষ্ট্বাঽহকুশলমানসঃ ॥
সর্ব্বং মে বিস্মৃতং জাতং কোঽহং চিন্তাপরায়ণঃ ।
অহং কঃ কুত আয়াতঃ কো ন পৃচ্ছতি কুত্রচিৎ ॥ ৩ ॥
এবং নানাবিধং দেবি ! ভুবনে বিস্মৃতং সদা ।
নানাস্থান-সম্ভ্রমঞ্চ স্মর্য্যঞ্চ নাস্তি মে কদা ॥
ততশ্চ কোটিবর্ষান্তে প্রাপ্তং তে হৃদয়াম্বুজং ।
তত্র গত্বা ময়া সর্ব্বং দৃষ্টমাশ্চর্য্যসুন্দরম্ ॥
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি ! কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৫ ॥
যদ্ ধর্ম্মার্থোদয়ং শাস্ত্রং কারণং সুখমোক্ষয়োঃ ।
পরমাত্মাগমো বেদা জীবো দর্শনমিন্দ্রিয়ঃ ॥
দেহঃ পুরাণমঙ্গানি স্মৃতয়ো যানি যানি চ ।
তত্রৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি লোমাদীনি বরাননে ॥
জীবাত্মনো যথা ভেদ-স্তথা বেদাগমেষ্বপি ॥ ৬ ॥
পত্রাগ্রে পত্রমধ্যে চ পত্রান্তে হৃদয়াম্বুজে ।
দৃষ্টা বর্ণাবলী যা তু তীব্রতেজোময়ী শুভা ॥
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তশ্ছন্দ এব বা ।
অন্যানি সর্ব্বশাস্ত্রাণি ক্ষুদ্রাণি যানি কানি চ ॥ ৭ ॥

ততো ময়া গতং দেবি কর্ণিকান্তর্মহোজ্জ্বলং ।
কোটি-কোটি-দিবানাথ-নিশানাথ-সমুজ্জ্বলম্ ॥
কোটি-কোটি-মহাবহ্নি-তেজো-মণ্ডলমণ্ডিতং ।
তন্মধ্যে তু ময়া দৃষ্টং বর্ণপুঞ্জং মহোজ্জ্বলম্ ॥
সূর্য্যকোটি-সমাভাসং চন্দ্রকোটি-সুশীতলং ।
বহ্নিকোটি-মহোজ্জ্বালং পরং ব্রহ্মময়ং ধ্রুবম্ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি ! সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সদা ।
সর্ব্বযজ্ঞময়ং দেবি সর্ব্বতীর্থময়ং সদা ॥ ৯ ॥
সর্ব্বপুণ্যময়ং দেবি ! সর্ব্বধর্ম্মময়ং তথা ।
সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি ব্রহ্মানন্দময়ং তথা ॥ ১০ ॥

প্রমাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বেদাদীনাং মহেশ্বরি।
প্রমাণং সর্ব্বসত্ত্বানাং ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতম্ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বমায়াবহির্ভূতং সর্ব্বমায়ানিকৃন্তনং।
সর্ব্বানন্দময়ং দেবি! ব্রহ্মানন্দময়ং সদা ॥
পূর্ণানন্দময়ং দেবি! ব্রহ্ম নির্ব্বাণমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বমায়াময়ং দেবি সর্ব্ববিদ্যাময়ং পুনঃ ॥
সর্ব্বতপোময়ং দেবি সর্ব্বসিদ্ধিময়ং তথা ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমুক্তিময়ং দেবি সর্ব্ববেদময়ং তথা।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ং দেবি সর্ব্বভোগময়ং তথা ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বলোকময়ং দেবি সর্ব্বযোগময়ং তথা।
দৃষ্টাগমমহং তত্র মগ্নোঽহজ্ঞানান্ধসাগরে।
গতশর্ব্বর্য্যথোঽদ্রাক্ষং যথা সূর্য্যোদয়োজ্জ্বলং।
অভ্যস্তং হি ময়া সর্ব্বং মহাকালী-প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥

জগদম্বার সেই অতিবিচিত্র তাণ্ডবনৃত্য ব্যাপার সন্দর্শনে ভয়বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়নের অন্য কোন পথ না পাইয়া আমি তখন সেই বিরাটরূপিণীর দেহমধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সুষুম্নাপথে ধাবিত হইলাম এবং ব্রহ্মময়ীর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ ব্রহ্মদেহে যাহা দর্শন এবং শ্রবণ করিলাম, সে সমস্তই অতি আশ্চর্য্যময়, দেবি। সেরূপ আর কখন কিছু দর্শনও করি নাই, শ্রবণও করি নাই। ১। অতীব বৃহদাকার কত কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা তাঁহার দেহমধ্যে বিচরণ করিতেছে, দেবি। কাহার সাধ্য তাহার সংখ্যা করিতে সক্ষম হইবে। ২। চতুরানন পঞ্চানন সহস্রানন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কথা দূরে থাক, কত কোটি কোটি মুখবিশিষ্ট কত কোটি কোটি ভুজবিশিষ্ট বিবিধ-মূর্ত্তিধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তথাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা এবং সকলেই মহদৈশ্বর্য সম্পন্ন। ৩। দেবি! এই সকল আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দর্শনে আমার হৃদয় অভিভূত এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইল, অধিক কি আমি তৎকালে আত্মবিস্মৃত হইয়া 'আমি কে' এই চিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। দেবাধিদেবগণ সকলেই তথাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কিন্তু আমি যেন কাহারও দৃক্পাতের লক্ষ্য হইলাম না। কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, কোথায় কেহ আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ৩। দেবি! দেবীর সেই দেহভুবনে আমি এইরূপে নানাপ্রকারে বিস্মৃতি লাভ করিতে লাগিলাম, নানাস্থানে সম্ভ্রম উপস্থিত হইতে লাগিল—তন্মধ্যে কখনও কোন বিষয় স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তৎপর এইরূপে কোটি বর্ষকাল ভ্রমণ করিয়া নাভিমণ্ডল হইতে আমি তোমার

হৃদয়াম্বুজ প্রাপ্ত হইলাম, সেস্থানে গিয়া যে সকল আশ্চর্য্য এবং সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিলাম, পরমেশ্বরি! সে সকল বিষয় বলিতে এক্ষণে আমি অসমর্থ। ৫। জীবের ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের কারণস্বরূপ শাস্ত্রতত্ত্ব আমি তথাতে দর্শন করিলাম। মন্ত্রময় তন্ত্র সেই শাস্ত্রমূর্ত্তির পরমাত্মা, বেদসকল তাঁহার জীবাত্মা, দর্শনশাস্ত্র সকল তাঁহার ইন্দ্রিয়, পুরাণ সমস্ত দেহ, স্মৃতি সমস্ত তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বরাননে! তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রোমরাজিবৎ বিরাজিত। ফলতঃ জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় যে ভেদ, বেদে এবং তন্ত্রেও সেই ভেদ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে যেমন মনের (ন্যায় মতে জীবাত্মার) অস্তিত্ব, তন্ত্রের অস্তিত্বেও তদ্রূপ বেদের অস্তিত্ব, জীবদেহে পরমাত্মা যেমন বিশুদ্ধ চিৎশক্তি শাস্ত্রদেহেও তন্ত্র তদ্রূপ মন্ত্রময়ী চিৎশক্তি। জীবাত্মায় যেমন সগুণ মনঃশক্তির প্রক্রিয়াসকল নিত্য প্রবাহিত বেদেও তদ্রূপ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণভেদে অধিকারানুরূপ জ্ঞানময় বিচারশক্তি-সকল নিত্য অধিষ্ঠিত। মনের সর্ব্বশেষ পরিণাম যেমন পরমাত্মায় বিলয় এবং গুণময় প্রক্রিয়াশক্তিসমূহের নিঃশেষ বিলোপ তদ্রূপ বেদেরও শেষ পরিণাম বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞানে তন্ত্রে বিলয় এবং গুণভেদে বিভিন্ন অধিকার-সমূহের সমূল বিনাশ। ৬। দেবি! তৎপরে তোমার সেই হৃদয়াম্বুজের পত্রাগ্রে পত্রমধ্যে এবং পত্রপ্রান্তে ত্রৈলোক্যকল্যাণবিধায়িনী তীব্রতেজোময়ী যে বর্ণাবলী দর্শন করিলাম তাহা শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ এবং যে কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র। ৭। দেবি! অনন্তর তোমার সেই হৃদয়কমল-কর্ণিকার অভ্যন্তরে আমি কোটি কোটি দিবানাথ এবং নিশানাথের ন্যায় উজ্জ্বলাদপি উজ্জ্বলতম কোটি কোটি মহাবহ্নির তেজোমণ্ডল-মণ্ডিত শতশত বর্ণপুঞ্জ দর্শন করিলাম, সেই তেজঃপুঞ্জ বর্ণাবলী কোটি সূর্য্যের সদৃশ দীপ্তিসম্পন্ন অথচ কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল এবং কোটি বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় মহোজ্জ্বল পরব্রহ্মস্বরূপ সত্যসনাতন। ৮। দেবি! সেই তেজোময় বর্ণপুঞ্জ সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বৈশ্চর্য্যময় সর্ব্বযজ্ঞময়, সর্ব্বতীর্থময় অর্থাৎ যে মন্ত্রাত্মক বর্ণের সাধনায় ব্রহ্মাণ্ডগত নিখিল বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মন্ত্রশক্তির মহাপ্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে লোকজগতের বিস্ময়কর আশ্চর্য্য ঘটনাসকল নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহের অসাধ্য ফল পরমদেবতার স্বরূপ-দর্শন যাহার সাধনায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে, যে মহামন্ত্রের সাধনায় সমস্ত তীর্থদর্শন-স্পর্শনের ফল একদা লাভ হয়, অধিক কি মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন-স্পর্শন লাভ করিয়াই তীর্থসকল স্বয়ং পবিত্র হইতে ইচ্ছা করেন, কেননা সাধকের দেহ ত প্রাকৃত ভৌতিক-বিগ্রহ নহে, তাহা সেই সর্ব্বতীর্থের অধীশ্বরী পতিতোদ্ধারিণী ত্রৈলোক্যনিস্তারিণীর নিত্যনিকেতন। ৯। দেবি! সেই বর্ণসকল সর্ব্বপুণ্যময়, সর্ব্বধর্ম্মময়, সর্ব্বজ্ঞানময় এবং ব্রহ্মানন্দময় অর্থাৎ যাঁহার আরাধনায় সকল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান একদা সম্পন্ন হয়, সকল কর্ম্মের ফলরূপ সকলধর্ম্ম এক

উপায়ে সুসিদ্ধ হয়, সর্ব্বধর্ম্মের ফল সকল-ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া যায়। ১০। মহেশ্বরি! সেই মন্ত্রসকল বেদ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ, সমস্ত জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ, পরম ব্রহ্মতেজঃ-স্বরূপ এবং পরমকল্যাণ-স্বরূপ অর্থাৎ পরোক্ষফল পারলৌকিক শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলিতে অনেকেই সমর্থ, কিন্তু যাহার ফল ইহ জগতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে অপ্রমাণ বলিতে নাস্তিকেরও বদন অবনত হয়। এই স্বপ্রমাণ শাস্ত্র যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন পরম্পরারূপে তাহাও অবশ্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে, পরোক্ষশাস্ত্র বলিয়া বেদের প্রতি আস্তিকেরও কদাচ সন্দেহ জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষশাস্ত্র তন্ত্র যদি বেদ বা বেদাঙ্গ অন্যান্য শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে নাস্তিকেরও তাহাতে শিরশ্চালন করিবার সাধ্য নাই, কেননা তন্ত্র স্বপ্রমাণ। মন্ত্রময় বর্ণ সকল জীবের অস্তিত্বে প্রমাণস্বরূপ ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। বর্ণের বিভাগ নির্দ্দেশকালে কণ্ঠ্য তালব্য মূর্দ্ধণ্য প্রভৃতি বিশেষণ ভেদে তাহার যে ব্যবহার হয় তাহাও কেবল উচ্চারণ স্থান লইয়া— কিন্তু উৎপত্তিস্থান লইয়া নহে, যেমন কণ্ঠ হইতে যাহার উচ্চারণ হয় তাহার নাম কণ্ঠ্য, তালু হইতে যাহার উচ্চারণ হয় তাহার নাম তালব্য ইত্যাদি। উচ্চারণের অর্থও এই যে 'উৎ—চারণ', অধোবিচরণশীল বর্ণসকলকে ঊর্দ্ধে বিচরণ করান। সেই ঊর্দ্ধে বিচরণ যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষরূপে বহিঃপ্রকাশ তখন অধোবিচরণে যে অতীন্দ্রিয়রূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অন্তঃপ্রকাশ আছে ইহাও নিঃসন্দিগ্ধ। সেই নিগূঢ় সত্য তত্ত্বই শাস্ত্রে পরিস্ফুটরূপে কথিত হইয়াছে। প্রপঞ্চসারে—

অবৈশদ্যান্মুখস্রোতো-মার্গস্যাবিশদাক্ষরং।
অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা কুণ্ডলী তদা।
মূলাধারে বিধ্বনতি সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহুঃ॥

মুখস্থিত বাক্‌প্রবাহপথের অপরিষ্কারহেতু শিশু যে সময়ে অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট ধ্বনি করে, মূলাধার-কুহর-বিলাসিনী কুলকুণ্ডলিনী তখন অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া বারম্বার সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন—তাঁহার সেই অব্যক্ত ধ্বনির প্রতিধ্বনিই শিশুর কণ্ঠকুহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। প্রয়োগসারে—

সোঽন্তরাত্মা তদা দেবি। নাদাত্মা নদতে স্বয়ং।
যথাসংস্থানভেদেন সম্ভূয় বর্ণতাং গতঃ।

দেবি। তৎকালে নাদময় অন্তরাত্মা (কুলকুণ্ডলিনী) স্বয়ং নাদ করিতে থাকেন, তাঁহার সেই নাদসমূহই সম্মিলিত হইয়া পরে বর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। শারদাতিলকে—

চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতং।
তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং।
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্য-পদ্যাদি-ভেদতঃ॥

শব্দব্রহ্ম, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে অবস্থিত ইহাই আমার মত, সেই চৈতন্যময় শব্দ-ব্রহ্মই কুণ্ডলিনীরূপ অবলম্বনে প্রাণিগণের দেহ মধ্যগত হইয়া পুনর্ব্বার কণ্ঠ তালু দন্ত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষস্থানে বায়ুভরে সঞ্চারিত হইয়া গদ্য পদ্যাদিভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েন। বিশ্বসারতন্ত্রে—

শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্বয়ং সদাশিব তাঁহাকেই শব্দব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, অনাহত চক্রে সেই শব্দ অধিষ্ঠিত। অপি চ তত্রৈব দ্বিতীয় পটলে—

পরানন্দময়ং ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম-বিভূষিতং।
আত্মনো দেহমধ্যে তু সর্ব্বমন্ত্রাত্মকং প্রিয়ে॥

জীবের আত্মদেহমধ্যেই আনন্দময় পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মবিভূষিত এবং সর্ব্বমন্ত্রাত্মক স্বরূপে অধিষ্ঠিত।

মন্ত্রসকল শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী। চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীরই স্বরূপবিভূতি। সুতরাং কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে তাহার উচ্চারণ (বহিঃপ্রকাশ) হয় বলিয়াই শব্দ বা মন্ত্র কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা নহে। ব্রহ্মরূপ শব্দের বস্তুতঃ উৎপত্তি না থাকিলেও মূলাধারই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। যাহা হউক আমরা যাঁহাকে শব্দ বা বর্ণ বলিয়া বুঝি, তিনিই স্বয়ং জীবের সঞ্জীবনী শক্তি। সুতরাং সেই শক্তিময় মন্ত্রসকল যে জীবের অস্তিত্বে নিত্য প্রমাণস্বরূপ ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। ইহার পরেই বলিয়াছেন—ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং, মন্ত্রসকল পরব্রহ্মতেজঃ-স্বরূপ। দার্শনিক মতে সমস্ত স্থানেই শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য অনেকের সংস্কার যে, শব্দ আকাশ হইতে উৎপন্ন, ইহা কেবল ফলদর্শন, কিন্তু মূলদর্শী তন্ত্রমতে উহা অতি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বভেদী প্রত্যক্ষপক্ষপাতী তন্ত্রের মতে শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের জনক ভিন্ন কাহারও জন্য নহে। আকাশ হইতে শব্দের যে উদ্‌গম হয় তাহা বহিঃপ্রকাশ মাত্র, বস্তুতঃ শব্দ নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ। কামধেনুতন্ত্রে—

অকারাদি ক্ষকারান্তা মাতৃকা বীজরূপিণী।
বিসর্গশ্চৈব বিন্দুশ্চ দ্বিসন্ধি ব্রহ্মবিগ্রহা।
বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।
রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি। জগৎসংহারকারকঃ॥

অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মাতৃকাশক্তিই এই নিখিল চরাচরের বীজ-রূপিণী, তন্মধ্যে আবার বিসর্গ শক্তি, বিন্দু পুরুষ এবং উভয়ের সংযোগে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক অজপা-মন্ত্রে অভিন্ন পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী। দেবি। মন্ত্রময় বর্ণ হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং জগৎসংহারক রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। অপি চ—

অকারাদি-ক্ষকারান্তা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
সর্ব্বং চরাচরং বিশ্বং বর্ণাত্মা সূয়তে ধ্রুবম্ ॥

অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী পরমা কুলকুণ্ডলিনী স্বয়ং এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন, ইহাই ধ্রুব সত্য। মাতৃকোদয়ে—

বেদানামীশ্বরঃ কর্ত্তা পুরাণানাং মহর্ষয়ঃ।
যন্নাস্যাঃ শ্রূয়তে কর্ত্তা স্বয়ম্ভূর্মাতৃকা ততঃ ॥

বেদের কর্ত্তা ঈশ্বর, পুরাণের কর্ত্তা মহর্ষিগণ, কিন্তু ইহাঁর কেহ কর্ত্তা আছেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে অশ্রুত বার্ত্তা। অতএব বর্ণরূপিণী মাতৃকা দেবী কাহারও সৃষ্ট নহেন, স্বয়ম্ভূ। এইজন্য বর্ণময়ী মন্ত্রদেবতা কুলকুণ্ডলিনীর নামান্তর মাতৃকা অর্থাৎ তিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জনয়িত্রী, তাঁহার জনকজননী অসম্ভব; তাই তাঁহার নাম কেবল মাতৃকা। তিনি সকলেরই মা ভিন্ন কাহারও সন্তান নহেন। বায়ব ঘাত প্রতিঘাতে আকাশমণ্ডলে যেমন শব্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, জীবের দেহমধ্যস্থ আকাশেও তদ্রূপ প্রাণবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রবেশে ও নির্গমে শব্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। আকাশে শব্দের কোনরূপ উৎপত্তি প্রক্রিয়ার প্রকাশ নাই, কেবল অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। যদি মূলতঃ নিত্য এবং স্বতন্ত্ররূপে আকাশে শব্দ সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে এ স্থূলরূপের অভিব্যক্তি অসম্ভব, ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই ধারণা করিতে পারেন। তবে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ভাষা-পরিচ্ছেদ মাত্র পড়িয়াই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ফুৎকারে উড়াইতে চাহেন তাঁহারা আকাশে শব্দ আসিল কোথা হইতে এত দূরাদপি দূরতর চিন্তা অপেক্ষা এস্থানে নাস্তিকতাই পরম উপাদেয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। আকাশে শব্দ উৎপন্ন হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বভাবের উপর আর কোন আপত্তি নাই, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত। স্বভাবের উপরে এইরূপ অচলা ভক্তি রাখিয়া যাঁহারা আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতে পারেন তাঁদের কথায় কিন্তু আমাদের ভক্তি হয় না। কারণ স্বরূপে স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থকে বস্তুতঃ আমরা অভাব বলিয়া মনে করি, যাহার যাহা আছে তাহার তাহা থাকার নাম স্বভাব। তবে আর স্বভাবে উৎপত্তি হয় বলিলে কেন হইল এ কথার উত্তর কি হয়? স্বভাবে হয় অর্থাৎ হয় বলিয়াই হয়, ইহার নাম তত্ত্বের অনুসন্ধান নহে, পলায়নের পথ চেষ্টা মাত্র। ফলতঃ তত্ত্বলালসায় চিত্ত যাঁহাদিগের চঞ্চল হইয়াছে, শাস্ত্র তাঁহাদিগেরই জন্য। আকাশে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, ইহাকে

যাঁহারা মূল না বুঝিয়া ফল বলিয়া বুঝিয়াছেন, আকাশের গুণ শব্দ ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগের শান্তি সন্তোষের সম্ভাবনা বিরল। তাঁহারা তাহাই জানিতে চাহেন যাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও সার সত্য। কিন্তু সে নিগূঢ় তত্ত্বদ্বার উদ্ঘাটিত করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে অথচ সে তত্ত্বের অভিজ্ঞানের অভাব জন্য যাতনাও অসহ্য। তাই করুণা কল্পতরু সর্ব্বভূতভাবন ভগবান করুণাময়ীর সচ্চিদানন্দ-তরঙ্গময় নিত্যদেহে যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই তন্ত্রে ত্রৈলোক্যকল্যাণবিধান জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, দেবীর নিত্যদেহে বর্ণরূপে মন্ত্রসকলও নিত্য, ব্রহ্মরূপ, তেজঃপুঞ্জ এবং তাঁহারই স্বরূপ। ফলরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপ মন্ত্রসকল তাঁহারই দেহক্ষেত্রে নিত্যবিরাজিত, তাহার তাই নাম জগতে বীজমন্ত্র। এ মন্ত্র মন্ত্রের বীজ, যন্ত্রের বীজ, তন্ত্রের বীজ, দেবতার বীজ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বীজ, জীবের জীবন ধারণের বীজ, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সিদ্ধি ও সাধনার বীজ, আকাশে যে শব্দের অঙ্কুরোদ্গম হয় তাহারও পূর্ব্বাতিপূর্ব্বকালীন চিরন্তন নিত্য বীজ। সংসারসাগরের পারান্তরে, ব্রহ্মাণ্ড কটাহের বহিঃপ্রদেশে, সুরাসুরকিন্নরনর জীব-জগতের মনোবুদ্ধির অগোচরে, চরাচরগুরুর ত্রিলোচনগোচরে সেই অবাঙ্মনসগোচরা ব্রহ্মময়ীর কলেবরে যদি এই শব্দব্রহ্ম মণিমাণিক্য মন্ত্ররূপে নিত্য দেদীপ্যমান না থাকিত তাহা হইলে কি আজ অবকাশমাত্রসম্বল আকাশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া শব্দের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় উৎস দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় বিকীর্ণ হইয়া পড়িত ? তুমি আমি আজ বৃত্তি ভাষ্য টীকা যাহা পড়িয়াই কেন পণ্ডিত না হই, ফলতঃ শব্দের যাহা সূক্ষ্মসূত্র, তাহা সেই অতলস্পর্শ অপার অনন্ত তত্ত্বসাগরের গভীর গর্ভেই নিত্যনিগূঢ়, কাহারও সাধ্য নাই যে তিনি ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। তবে যাঁহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত সাধন সম্পত্তি ফলোন্মুখ হয় তিনিই সে ফলের অমৃতরস আস্বাদনে চরিতার্থ হইয়া মন্ত্রের সেই জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম অস্তিত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি ও বর্ণভেদে শব্দ দ্বিবিধ। অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষরমালায় যাহা অভিব্যক্ত তাহারই নাম বর্ণ, আর যাহাতে অক্ষরমাত্রা অভিব্যক্ত হয় না তাহারই নাম ধ্বনি। শব্দের এই দ্বিবিধ অবস্থার কারণ কেবল স্বরভেদ। শাব্দিক পণ্ডিতগণ স্বরের এই মাত্রাভেদেই শব্দকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ ধ্বনি বা বর্ণভেদে স্বরূপতঃ শব্দের কোন ভেদ হয় না। মূলতঃ ধ্বনিই পদার্থ, শব্দ তাহার পরিণাম মাত্র। এই ধ্বনিই জীবের চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনী শক্তির অসাধারণ সূক্ষ্ম স্বরূপ, ধ্বনি-রূপেই জীবদেহে তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব। এইস্থানে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে একটু পরিস্ফুট অবতারণার আবশ্যক। আর্যমতে বেদ অপৌরুষেয়, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই। স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই বেদের স্মরণকর্ত্তা, কেহ কর্ত্তা নহেন। শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারে স্বয়ং ভগবান মর্ত্ত্যলোকে তাহার প্রকাশকর্ত্তা মাত্র। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ। প্রকাশকা ভবন্ত্যেবং কৃষ্ণাদ্যা-স্ত্রিদিবৌকসঃ॥ আবার ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বেদানামীশ্বরঃ কর্ত্তা—বেদের কর্ত্তা ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ—শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এ উভয়ই আমার নিত্যদেহ। এখন এই পরস্পর বিরোধী শাস্ত্রবাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য কি, তাহা একবার দেখিতে হইবে।

বৈদিক হউক বা তান্ত্রিক হউক, মন্ত্র মাত্রেই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মরূপ, মন্ত্রময় বেদ বা তন্ত্র ব্রহ্মেরই স্বরূপ বিভূতি। সুতরাং পরব্রহ্ম মন্ত্ররূপে আবির্ভূত, ইহা বই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক মন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা বলিবার উপায় নাই; কারণ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলেও তিনি তাঁহার আত্মসৃষ্টির কর্ত্তা নহেন। তাঁহার সৃষ্টি অসম্ভব, কেননা তিনি অনাদিসনাতনী। এইজন্যই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছানুসারে লোকলোচনগোচরে তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব, প্রকাশ এবং অন্তর্দ্ধান, ইহাই শাস্ত্রীয়-সিদ্ধি। লোকরাজ্যে অধর্ম্মনিরাকরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপনে ভূভারহরণ জন্য ভগবান যেমন রাম কৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণ, ধর্ম্মরাজ্যেও তিনি তদ্রূপ যোগবিঘ্ন-নিরাকরণপূর্ব্বক সমাধি অবলম্বনে বা তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যা-বন্ধনচ্ছেদন জন্য শব্দব্রহ্ম শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ। রাম কৃষ্ণাদির মূল স্বরূপ যেমন বৈকুণ্ঠ বা গোলোকধামস্থিত চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরাদি মূর্ত্তি, শব্দব্রহ্ম শাস্ত্রেরও

তদ্রূপ মূল স্বরূপ চিন্ময়ীর চিদ্ঘনশ্যামসুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতি লাবণ্যলহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্র মূর্ত্তি। ফলরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিপ্রারম্ভে সেই মন্ত্রময়ী জ্যোতিঃকলিকা বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দশ দলে চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহারই সচ্চিদানন্দ মকরন্দের সৌরভভরে ত্রিভুবন আমোদিত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ের পর কারণার্ণবশায়ী ভগবান নারায়ণের নাভিকুহরনির্গত মৃণালনালে সহস্রদল কমলগর্ভে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যখন আবির্ভূত হয়েন তৎকালে যুগানুবৃত্তি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির প্রক্রিয়াচিন্তায় তিনি ব্রহ্মময়ীর ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইলে শব্দব্রহ্ম বেদ তাঁহার হৃদয়াকাশে স্বতএব আবির্ভূত এবং নিশ্বাসদ্বারে নির্গত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বভেদে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিচতুষ্টয় পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রহ্মা সেই মূর্ত্তিমতী শ্রুতির মুখে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের তত্ত্ব অবগত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইলেন। অনেকেই এই ধ্রুব সত্য সৃষ্টিতত্ত্বকে পৌরাণিক রহস্য রূপক আধ্যাত্মিক ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিভূষিত করিয়া ইঙ্গিতে উড়াইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বুঝিতে চাহেন না যে, এ তত্ত্ব যেদিন উড়িবে সেদিন এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমি কোথায় উড়িয়া যাইব তাহার সন্ধানও থাকিবে না। ব্রহ্মা স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও আপনিই নারায়ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহে জননী সাজিয়া তাঁহারই নাভিকুহর-কমলকোশে স্বয়ং লীলাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি আদি জীব সাজিয়াছেন। নিজ আবির্ভাব সময়ে তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, সুরাসুর কিন্নর নর প্রমুখ জীব-জগতের সৃষ্টি বিধানেও তাঁহার সেই প্রক্রিয়াই চির প্রবাহিত। নারায়ণ তাহার জননীস্থানীয়, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার গর্ভভূত, মায়া সেই গর্ভের উল্বন (জরায়ু কোষ) কারণ-সমুদ্র সেই জরায়ুর মধ্যবর্ত্তী জলরাশি, ভগবন্নাভি-নির্গত মৃণাল—মাতার নাড়ীস্থানীয়, সহস্রদল রক্তকমল সেই মৃণালের অগ্রবর্ত্তি কুসুম-স্থানীয় এবং জগৎ পিতামহ ব্রহ্মা ফলরূপে সন্তান-স্বরূপে স্বয়ং সেই কমলে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী নারায়ণরূপা স্থিতিশক্তি পরে জগদ্ধাত্রী সাজিলেও প্রথমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ নিজ কুক্ষিতে রক্ষা করিয়াই ব্রহ্মার জননী হইয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু যেমন চেতনা লাভ করিয়া জন্মান্তরীণ ঘটনাসমূহের অনুস্মরণ করিতে থাকে, ব্রহ্মাও তদ্রূপ ব্রহ্মময়ীর গর্ভ এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চৈতন্যময়ী শক্তির আপ্লাবনে অন্যান্য কল্পকল্পান্তের সৃষ্টি স্থিতি সংহারময় ঘটনারাশির অনুস্মরণ করিতে লাগিলেন—শিশুর অন্তঃকরণে সে সময়ে যেমন জন্মান্তরীণ স্মৃতি স্বতএব উদ্ভূত হয়, ব্রহ্মার অন্তঃকরণে শ্রুতি তদ্রূপ স্বতএব আবির্ভূত হইলেন। জীবের অন্তঃকরণে স্মৃতি যেমন আত্মশক্তি, ব্রহ্মার অন্তঃকরণে শ্রুতি তদ্রূপ চিৎশক্তি, এই চিৎশক্তিরই নিগূঢ় অবস্থা ধ্বনিরূপা, তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ শব্দরূপ, শব্দের সেই অঙ্কুরোদ্গমধ্বনিই জীবের সঞ্জীবনী। প্রপঞ্চসারে—

ব্রহ্মাণ্ডং গ্রন্থমেতেন ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং।
নাদঃ প্রাণশ্চ জীবশ্চ ঘোষশ্চেত্যাদি কথ্যতে ॥

এই ধ্বনিময়ী শক্তি কর্তৃক স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত এবং ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই শক্তিরই নামসকল নাদ প্রাণ জীব ঘোষ ইত্যাদিরূপে জগতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার বলিয়াছেন—

তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সন্তো হৃদয়নাং বিদুঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিম্ ॥

এই মহাশক্তিকেই যোগীন্দ্র পুরুষগণ হৃদয়চারিণী কুলকুণ্ডলিনী বলিয়া জানেন। তিনিই জীবের মূলাধার-বিবরে নিরন্তর ভৃঙ্গীর সঙ্গীতবৎ অস্ফুট মধুর গুঞ্জনধ্বনি করিয়া থাকেন। এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়াই ষট্‌চক্রতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং,
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনা ভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাস-বিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে,
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্ত্যাবলী ॥ ১ ॥
তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা,
নিত্যানন্দপরম্পরাতি-চপলা-মালালসদ্দীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে,
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া ॥ ২ ॥

সুকোমল কাব্যবন্ধ রচনার ভেদ এবং অতিভেদক্রমে প্রস্ফুট বচনরাজিকেও মধুমত্ত ভ্রমরমালার অস্ফুটগুঞ্জনবৎ যিনি ধ্বনিরূপে নিরন্তর মধুর কূজন করিতেছেন এবং সেই ধ্বনির উচ্ছ্বাসে শ্বাসপ্রশ্বাসের আবর্ত্তনে অনন্ত জগতের জীবাত্মা যৎকর্তৃক বিধৃত হইতেছে, সেই প্রোদ্দাম-শতসৌদামিনী-প্রভাময়ী অন্তর্যামিনী কুলকুণ্ডলিনী জীবের মূলাধারকমলকোষে বিলাসে নিত্য নিমগ্না রহিয়াছেন।

কুলকুণ্ডলিনীর এই স্থূলরূপের উল্লেখ করিয়া আবার সূক্ষ্মরূপের নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই স্থূলরূপের অভ্যন্তরে চির আনন্দ রসপ্রবাহিনী তড়িৎপুঞ্জ গঞ্জনকর সৌন্দর্য্যশোভাময়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরাৎপরা চিন্ময়ীকলারূপে যিনি অধিষ্ঠিতা এবং পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকটাহ যাঁহার প্রভায় প্রভাসিত, সেই এই নিত্যজ্ঞান-স্বরূপিণী শ্রীমৎ পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী সর্ব্বেশ্বরীরূপে বিরাজিতা।

সাধকবর্গ এক্ষণে অনুভব করিবেন কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ এই দ্বিবিধ—স্থূলমূর্ত্তি, সগুণা ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কারবৎ অস্ফুট পঞ্চাশদ্বর্ণ নিনাদিনী; সূক্ষ্মমূর্ত্তি নির্গুণা শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপিণী। এই স্থূল মূর্ত্তিই দেবতাভেদে রূপভেদে নিখিল মন্ত্রবর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সূক্ষ্মমূর্ত্তিই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য উপাস্য দেবতা। তাই স্বয়ম্ভূশয়নে

নিদ্রিতভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা না হইলে জগদম্বার মন্দির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না, মন্ত্রচৈতন্য না হইলে মন্ত্রসিদ্ধিও ঘটে না। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের এই পর্য্যন্তই লক্ষ্য যে, ধ্বনির পরিণাম শব্দ কেবল চিৎশক্তিরই স্বরূপবিভূতি এবং জগদম্বার জ্যোতির্ম্ময়ী নিত্যমূর্ত্তিতে তাহা নিত্য জ্যোতির্ম্ময়রূপেই অধিষ্ঠিত। সৃষ্টি-কালে আকাশের গুণরূপে তাহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া আকাশের সৃষ্টিতেই তাহার সৃষ্টি বা আকাশের প্রলয়েই তাহার প্রলয় ইহা সিদ্ধান্ত নহে। আর যাঁহাদের মতে আকাশ নিত্য পদার্থ, তাঁহাদের ত এ সম্বন্ধে কোন বিপ্রতিপত্তির কারণই নাই যতই কেন মতান্তর না থাকুক্। মন্ত্রময় বেদ সেই ধ্বনিবর্ণেরই সমষ্টি রূপ। তাই ব্রহ্মার সমাধিযোগে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মময়ী শব্দব্রহ্ম বেদরূপে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত-স্বরূপ তাঁহার নাসিকা বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা বেদের কর্ত্তা অর্থাৎ জীব যেমন নিশ্বাসের পরিত্যাগ এবং প্রশ্বাসের আকর্ষণ কর্ত্তা, ব্রহ্মাও তদ্রূপ বেদের আবির্ভাব কর্ত্তা। স্বরূপতঃ বেদ নিত্যসিদ্ধ শব্দব্রহ্ম, ব্রহ্মার সৃষ্টি পদার্থ নহে, তাই বেদ অপৌরুষেয়।

ঈশ্বরদেহে এই কুণ্ডলিনীধ্বনির পরিণাম বেদ এবং জীবদেহে কুণ্ডলিনীধ্বনির পরিণাম শব্দরূপ। এই শব্দের অভ্যন্তরেই নিখিল মন্ত্রতন্ত্র নিহিত—সেই মন্ত্রই জীবের সঞ্জীবন যন্ত্রস্বরূপ। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবের অজ্ঞাতসারেও প্রাণবায়ুর আবর্ত্তনে শ্বাস প্রশ্বাসের নির্গম ও প্রবেশে ধ্বনিচক্রের বিঘূর্ণনে স্বতএব কোন মহা-মন্ত্রের জপ হয়, তাহারই নাম অজপা মন্ত্র অর্থাৎ জীব ইচ্ছাপূর্ব্বক জপ না করিলেও যাঁহার জপ স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহারই নাম অজপা মন্ত্র অথবা যাঁহার জপ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জপ নাই, তাঁহারই নাম অজপা মন্ত্র। এই অজপাই জীবের পূর্ণ পরমায়ুঃ, তাই শুনিতে পাই—

অজপায় অজপা হয়ে জপা তপা কিছু হল না।
অজপা ফুরাল তবু অ-জপা ত ফুরাল না॥

ব্রহ্মা যেমন ভগবানের নাভিকমলে পূর্ব্বতন কল্পান্তরের চিন্তা করিয়াছিলেন, জীবও তদ্রূপ মাতার গর্ভমধ্যে জন্মান্তরের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া থাকে। সেই সময়ে জীবের মনোবৃত্তিতে কে আমি কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, আমি কাহার কে আমার ইত্যাদি গভীর চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। সেই মনোবৃত্তির তরঙ্গ আসিয়া প্রাণশক্তিতে সম্মিলিত হয়। সেই প্রাণশক্তি আবার ঈড়া পিঙ্গলা উভয় নাড়ীর অন্তরালে থাকিয়া জঠরানলের নিম্নভাগে কুণ্ডলিনীচক্রে ঘাত প্রতিঘাত প্রদান করে। সেই নিজ আঘাতে আহত হইয়া নিদ্রিত ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলিনী তখন গর্জ্জন করিতে থাকেন—তাঁহার সেই গর্জ্জনধ্বনির প্রস্ফুট অবস্থায়ই অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ মাতৃকা। এই বর্ণাবলীর অবলম্বনেই গর্ভস্থ জীবের জন্মান্তরীণ

চন্তা তখন বাক্-তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয় এবং মনই তখন জীবরূপে মনোনয়নে তাহা দর্শন করিয়া মনঃশ্রবণে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। প্রসব সময়ে জরায়ু-কোষ বিদীর্ণ হইয়া যখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার উন্মুক্ত হয় তখনই কণ্ঠকুহরে সেই আন্তরিক ধ্বনি নির্গত হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। গর্ভকারাগারের অন্ধতামস কক্ষে বসিয়া জীব যখন আত্মার সেই গভীর অতীত তত্ত্ব চিন্তা করিতে থাকেন, দ্বিতীয় স্বপ্নের ন্যায় মনই তখন সে রাজ্যে রাজা হইয়া সমস্ত বিচার করিতে থাকেন। তখন সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত যাহা হয় তাহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, মহাভাগবতে শ্রীমদ্ভগবতী-গীতায়াং হিমালয়ং প্রতি দেবীবাক্যম্—

স্মৃত্বা প্রাক্তনদেহোত্থ-কর্ম্মাণি বহুদুঃখিতঃ।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি ॥ ১ ॥
এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্মালভং ক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতং।
নারাধিতো ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিহারিণীম্ ॥ ২ ॥
যদ্যস্মান্নিষ্কৃতির্ম্মে স্যাদ্ গর্ভ-দুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীং।
নিত্যং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ ॥ ৩ ॥
বৃথা পুত্রকলত্রাদি-বাসনা-বশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্ট-সংসারমনাঃ কৃতবানাত্মনোঽহিতম্ ॥
তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং দুরাসদং।
তন্ন ভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসারসেবনম্ ॥ ৪ ॥
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ।
অস্থিযন্ত্র-বিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ম্মণা।
সূতিবাত-বশাদ্ ঘোরনরকাদিব পাতকী।
মেদোঽসৃক্-প্লুতসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ ॥
ততো মন্মায়য়া মুগ্ধ-স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ড ইব স্থিতঃ ॥ ৫ ॥
সুষুম্নাপিহিতা নাড়ী শ্লেষ্মণা যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালৈর্ন শক্যতে ॥ ৬ ॥

মহাভাগবতে—ভগবতীগীতায় হিমালয়ের প্রতি দেবীবাক্য—জন্মান্তরীণ দেহদ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মসমূহের অনুস্মরণে অতি দুঃখিত হইয়া জীব তখন স্বয়ংই বিচারপূর্ব্বক মনে মনে এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে ॥ ১ ॥ এইরূপে জন্মান্তরে বহু দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আমি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলাম,

কারণ সংসারে কেবল অন্যায়পূর্ব্বক বিত্ত উপার্জ্জন এবং কুটুম্বভরণ মাত্রই করিয়াছি, কখনও দুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গার আরাধনা করি নাই ॥ ২ ॥ কিন্তু যদি এইবার এই গর্ভদুঃখ হইতে আমার নিষ্কৃতি হয় তাহা হইলে মহেশ্বরী দুর্গার উপাসনা ভিন্ন আর পুনর্ব্বার বিষয়ের সেবা করিব না, সংযতহৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ত কেবল তাঁহারই পূজা করিব ॥ ৩ ॥ বৃথা পুত্রকলত্রাদির বাসনাবশতঃ বারংবার সংসারে নিবিষ্টমনা হইয়া কেবল আপনারই অকল্যাণ সাধন করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই ফলস্বরূপ দুরাসদ গর্ভদুঃখ ভোগ করিতেছি, তাই প্রতিজ্ঞা আমার, বৃথা সংসারের সেবা আর করিব না ॥ ৪ ॥ এইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে বহু প্রকারের দুঃখ অনুভব করিয়া প্রসববায়ুর বেগবশতঃ প্রসবদ্বারের অস্থিযন্ত্রে বিনিষ্পিষ্ট হইয়া জরায়ু পরিবেষ্টিত জীব ঘোরনরকোত্তীর্ণ পাতকীর ন্যায় মেদঃ এবং রক্তে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করিয়া নিজ কুক্ষিপথ প্রসারণ করিয়া ভূতলে পতিত হয়, অনন্তর আমার মায়া-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া জীব সেই গর্ভাবস্থানকালের অনুস্মৃত এবং অনুভূত সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মাংসপিণ্ডের ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর অবস্থায় অবস্থিত হয় ॥ ৫ ॥ তৎপর শিশুর সুষুম্নানাড়ীর বহিঃপার্শ্ব যতদিন শ্লেষ্মা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ততদিন সে সুস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে একটি আধুনিক অতিরিক্ত কথার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি, ভরসা করি সাধকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আজকালকার কবি ও কাব্যতত্ত্ব-বেত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রসব প্রক্রিয়ায় প্রসূতির অসহ্য যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন কেবল ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচার ভিন্ন এই যাতনার আর কোন কারণ নাই—কেননা যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি কি ইচ্ছা করিলে সন্তান ও প্রসূতির কষ্ট সৃষ্টি না করিয়া প্রসবের অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না? একটি জীবের জন্ম হইবে বলিয়া তাহার জন্য আর একটি জীব অকারণে এ দুরন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবে কেন? আমরা বলি, কেন এ প্রশ্ন তাঁহার নিকটে অসম্ভব, কারণ সর্ব্বভূতভাবন ভগবানের ব্যবস্থাসমুদ্রের নিকট আমরা এক একটি জলবুদ্বুদ বলিয়াও গণ্য নই। দ্বিতীয়তঃ এক লাঠিতে সাত সাপ মারা তাঁহার কার্য্য, তুমি আমি যাহাকে তোমার আমার বিপদ বা সম্পদ বলিয়া মনে করি, এ অনন্ত চরাচরে কত শত জীবের বিপদ বা সম্পদের সূত্র তাহার সহিত বিজড়িত আছে তাহা কে বলিবে? মন্থরা কি কখনও মনে করিয়াছিল যে, কৈকেয়ীর প্রসাদ লাভ ভিন্ন তাহার বাক্যের আর কোন আশা, উদ্দেশ্য, বা ফল আছে? ফলাফল যাহা আছে না আছে তাহা বুঝিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মাণ্ডের ফলাফল বিধাতা ভগবান, যাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের জন্য দেবদলের এ কূট চক্রান্ত ও দুষ্টা সরস্বতীর আরাধনা। মন্থরা তাহার যে বাক্যের ফলে স্বার্থসিদ্ধি বই আর কিছু আশা করে

নাই সেই বাক্যের ফলে সানুজ সশক্তি ভগবান রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, মহারাজ দশরথের অকালমৃত্যু, কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ীর বৈধব্য, ভরতের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, মারীচবধ সীতাহরণ জটায়ুর মৃত্যু বালিবধ সমুদ্রবন্ধন লঙ্কাদাহ লক্ষ্মণের শক্তিশেল সবংশ রাবণের নিধন সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেবকুলের স্বর্গলাভ ইত্যাদি রামলীলারূপ অপার সমুদ্রে এ কয়েকটি ঘটনা কয়েকটি প্রধান তরঙ্গ বই আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে সূত্রানুসূত্রপরম্পরায় আর কত কোটি কোটি জীবের কোটি কোটি অদৃষ্টের ফলাফল গ্রথিত আছে কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? রামলীলা সেই সকল অদৃষ্টের ফল প্রসবের দ্বার মাত্র, জীবের লীলা খেলাতেও এইরূপ পরস্পর অদৃষ্টের সংশ্রব নিত্যনিহিত, তবে ভগবানের লীলায় যেস্থানে কোটি কোটি তোমার আমার না হয় সেইস্থানে শতশত এইমাত্র বিশেষ। অদৃষ্টের যে ফলপ্রক্রিয়ায় প্রসবকালে সন্তানের দুরন্ত যন্ত্রণাভোগ করিবার ব্যবস্থা, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে প্রসূতির অদৃষ্ট প্রক্রিয়া বিজড়িত না আছে, ইহা কে বলিল? দ্বিতীয়তঃ উহা না করিয়া ইহা করিলেন কেন? এ প্রশ্নও তাঁহার নিকটে সম্ভব হয় না, মানুষের মুখে চক্ষু সৃষ্টি না করিয়া পৃষ্ঠে করিলেন না কেন? ইহা আপত্তি করিতে পারি না, কারণ পৃষ্ঠে চক্ষু সৃষ্টি করিলেও এই আমিই যে তখন আবার মুখে চক্ষুসৃষ্টি না করিয়া পৃষ্ঠে করিলেন কেন এ প্রশ্ন না করিতাম, তাহার প্রমাণ কি? কেন, এ প্রশ্ন আমি সকল বিষয়েই করিতে পারি। প্রশ্নকর্ত্তার নিকটে কিছুতেই ঈশ্বরের অব্যাহতি নাই। কারণ প্রশ্ন করা অজ্ঞতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত বিরহিত জীব সর্ব্বজ্ঞের নিকটে চিরদিনই অজ্ঞ। সুতরাং জীবরূপ জলবিন্দু যতদিন সেই শিবসমুদ্রে সম্মিলিত না হইতেছে ততদিন তাহার প্রশ্নেরও অবধি নাই। তবে তাঁহার নিজমুখ নির্গত শাস্ত্রে তিনি নিজের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যতদূর জানিতে পারা যায় ততদূরই জীবের চরিতার্থতা। প্রসববেদনার মূলে তাঁহার কি ইচ্ছা আছে তাহা চিকিৎসাশাস্ত্রের অজ্ঞাত হইলেও সাধনাশাস্ত্রের অজ্ঞাত নহে। তন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন—

এতস্মিন্নন্তরে দেবি। বিশেষাৎ গর্ভসঙ্কটে।
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ॥
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ।
পাতিতোঽপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতোঽপি ততশ্চ্যুতিম্॥
সূতিবাতস্য বেগেন যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ।
বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি॥

দেবি। এই গর্ভসঙ্কট সময়ে নবম বা দশম মাস উপস্থিত হইলে প্রবল প্রসব বায়ুর আঘাতে আহত হইয়া জীব ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় প্রসবদ্বার হইতে নিঃসৃত হয়,

এইরূপে পতিত এবং মূর্চ্ছিত হইয়াও আত্মাকে গর্ভচ্যুত বলিয়া জানিতে পারে না। প্রসবকালে প্রসববায়ুর বেগে এবং যোনিরন্ধ্রের নিপীড়নে জীবের সেই সমস্ত জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যায়, গর্ভবাসকালে সে যাহা কিছু হৃদয়ে চিন্তা করিয়াছিল। প্রপঞ্চসারে—

অথ পাপকৃতাং শরীরভাজা-মুদরান্নিষ্ক্রমিতুং মহান্ প্রয়াসঃ।
নলিনোদ্ভবধী-বিচিত্রবৃত্তা নিতরাং কর্ম্মগতিস্তু মানুষাণাম্ ॥

গর্ভস্থ জীবের মধ্যে যে যত পাপী, মাতার উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে তাহার তত অধিক যাতনা হয়। পদ্মযোনি বিধাতার ইচ্ছানুসারে মানবের কর্ম্মগতির বৃত্তান্ত নিতান্ত বিচিত্র।

এরূপ রোগমুক্ত ব্যক্তিকেও দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় যিনি পূর্ব্বে অর্দ্ধাঙ্গ বা তৎসদৃশ কিম্বা ততোধিক কোন গুরুতর রোগগ্রস্ত বা কোনরূপ ঘোরতর বিকারে বিকৃত বা প্রায়োম্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছেন, কিন্তু সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁহার যাহা ছিল এক্ষণে আর তাহার কাহাকেও তিনি চিনিতে পারেন না, সংসারে সকল থাকিতেও তাঁহার জ্ঞানে এক্ষণে আর তাঁহার নিজের বলিয়া কোন পদার্থ নাই—ইহা একরূপ একদেহে জন্মান্তর। বর্দ্ধিত অতিপ্রৌঢ় বা অতিবৃদ্ধ অবস্থাতেও যখন এইরূপ 'চিরসংস্কারসিদ্ধ প্রগাঢ় জ্ঞানের বিস্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় তখন প্রসববেদনার কঠোর তাড়নায় নিষ্পিষ্ট শিশুর সুকোমল হৃদয়ের তরল জ্ঞান অন্তর্হিত হইবে, সেই বিকট মোহমূর্চ্ছার বিষম বিভীষিকায় তাহার সুদূর স্মৃতি অপসারিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যে কোন কারণে নিখিল জ্ঞানের ভাণ্ডার হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিঘট্টিত হইলেই সকল বিস্মৃতি সুসম্ভব। অন্তঃকরণের স্তরে স্তরে যে সকল সংস্কারময় পট সুসজ্জিত রহিয়াছে, কোন একটি গুরুতর ঘাত প্রতিঘাতে তাহার বিন্যাস পরম্পরার কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটিলেই সকল সংস্কারের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যখন সমস্ত বন্ধনের সূত্র কে কোথায় ছুটিয়া পড়িবে তাহার সন্ধানও থাকিবে না, জীবের অন্তঃকরণ হইতে সেই জন্মান্তর-বৃত্তান্ত বন্ধন বিশ্লিষ্ট করিবার জন্যই প্রসব বেদনার সৃষ্টি। এইজন্যই পাপের ফল ভোগের নিমিত্ত দেহধারণ। দেহধারণ করিবার নিমিত্ত এ দণ্ড ভোগ করিতে হইল, এরূপ নহে। এই দণ্ডভোগ করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সুতরাং তজ্জন্য আপেক্ষা করিয়া কোন ফল নাই। যে সময় যে রূপে যে উপায়ে যে পাপের ফলভোগ করিতে জীবের মঙ্গলপথ পরিষ্কৃত হয় সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময়ী আজ্ঞাক্রমেই তাহার ব্যবস্থা হইয়া আছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, অদৃষ্টের অতি অল্প অংশ মাত্র যাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট রহিয়াছে, মুক্তিক্ষেত্র তীর্থাদিতে যাহারা প্রসব যাতনাতেই দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। তবে প্রসূতি কেন কষ্টভোগ করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রসূতির অদৃষ্টই সে পক্ষে

একমাত্র কারণ, পুত্রকে সুপ্রসূত করিবার জন্য তিনি এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহা নহে। তিনি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিবার জন্যই প্রসব ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অদৃষ্টের বাজারে কাহারও সহিত কাহারও কোন আত্মীয়তা নাই বা থাকিতে পারে না। পিতা হউন মাতা হউন, পুত্র হউন, কন্যা হউন, পতি হউন, পত্নী হউন, এ নির্দ্দয় পাষাণ রাজ্যে কেহ কাহারও নহেন অথচ এই পাষাণে পাষাণে পরস্পর এমন ঘনসন্নিকৃষ্ট নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেন লৌহ চুম্বকের পরস্পর আকর্ষণ—দুইই কঠিনের এক শেষ অথচ দুইয়েরই মিলনেরও এক শেষ, কিন্তু অদৃষ্ট যদি দুই জনকে দূরে দূরে রাখিয়া দিল, তবেই এক নিমেষের মধ্যে সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া তখন পাষাণের কঠিন প্রাণ আপন তাপে আপনি ফাটিতে লাগিল—অদৃষ্ট মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া যখন অপ্রসূত বা অর্দ্ধ প্রসূত সন্তানকে দূর দূরান্তর তাড়িত করিয়া দিল তখন আপন কর্ম্মফলে পাষাণময়ী জননী আপনার শোকের তাপে আপনি ফাটিয়া পড়িলেন, শিশু হইলেও পাষাণ প্রাণ সন্তান আপন অদৃষ্টের তাড়নায় একবারের জন্যও জননীর এ যন্ত্রণা চিন্তা করিবার অবসর সে পাইল না। তাই বলিতেছিলাম, এ পাষাণ রাজ্যে পাষাণকুমারীর আজ্ঞাক্রমে সমস্তই পাষাণ, এখানে মায়ের জন্যও সন্তান ভোগ করে না, সন্তানের জন্যও মা ভোগ করেন না। সকলেই আপন আপন পথে চলিয়াছেন, কেবল পথসন্ধিতে দুই এক নিমিষের জন্য দুই এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে এইমাত্র—পথ-প্রদর্শিকা মায়া কেবল মধ্যে মধ্যে তাহাদের সঙ্গে প্রাণের প্রিয়তম সম্বন্ধ ঘটাইয়া সেই প্রাণ-ভুলান সম্বন্ধের সোহাগে পথিককে পথশ্রান্তি বিস্মৃত করাইয়া কৌশলে দূরাদপি দূরতর দেশ দেশান্তরে কখনও স্বর্গে কখনও নরকে লইয়া যাইতেছেন। এই বিস্মৃতিকে বিস্মৃত করিয়া মধ্যে মধ্যে পথের কথা মনে করিয়া দিবার জন্যই শাস্ত্রের আবির্ভাব—তাই শাস্ত্র পথের যন্ত্রণা স্মরণ করাইয়া, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইলে জীবের ক্লান্ত হৃদয়ে প্রাণের অন্তঃস্তর ভেদ করিয়া যে সকল মর্ম্মব্যথা উদ্গীর্ণ হয় তাহাই মনে করিয়া দিবার জন্য গর্ভবাসের কঠোর প্রতিজ্ঞা সকল সংসারেও উল্লেখ করিয়াছেন—নিতান্ত তপোমার্জ্জিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইলেই শাস্ত্রের সেই কৃপাকাহিনী শুনিয়া সাধকের অন্তঃকরণে সেই গভীর প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞান জন্মে। এই অভিজ্ঞানের আঘাতে জর্জ্জরিত হৃদয় হইয়াই সাধক সঙ্গীতচ্ছলে বলিয়াছেন—

আমি আছি মা তারিণি! ঋণী তব পায়।
মা! আমার অনুপায়, ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
(জননি গো!) বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।

জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে বল্লেম,
এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে,
ত্রিপত্র দিব মায়ের শ্রীপদে,
এখন, ধরায় পতিত হয়ে, আছি মা! পতিত হয়ে
পতিত-পাবনি! ভুলে মা! তোমায়।
হল না সাধনা আর হয় না, হে দুর্গে! আমার দুঃখ ত আর সয় না,
অপার দাশরথি শঙ্করি! হয় না মানসবশ কি করি?
এখন, মা যদি মা! মন করী, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর মুক্তকেশি! (এ ভব) বন্ধন দায়॥

অকূল দুঃখসাগরের তরঙ্গ তাড়নায় অধীর হইয়া সাধক এইস্থানে আসিয়া একেবারে প্রাণের কপাট খুলিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন, হল না সাধনা আর হয় না, হে দুর্গে মা! আমার দুঃখ ত আর সয় না। সংসারের জ্বলন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া সাধনাভ্রষ্ট হইলে সাধকের যে অসহ্য মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হয়, এই কয়েকটি কথায় তাহা একেবারে ঢালিয়া দিয়া সাধক যেন জলমুক্ত মেঘের ন্যায় অলক্ষ্য আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন। কবিত্ব অনেকেরই আছে, কিন্তু ভুক্তভোগী জীবনের এমন জীবন্ত মূর্ত্তি চিত্র করা জগদম্বার সাধনালব্ধশক্তি জীবন্ত সাধক ভিন্ন অচেতন লতাপাতার ছবি-কবির কর্ম্ম নহে। বঙ্গভূমির কণ্ঠরত্ন ধন্য সচেতন দাশরথি! ধন্য তোমার সঙ্গীত সাধনা অথবা কুলকুণ্ডলিনীর ধ্বনিমূর্চ্ছণা, তুমি বলিয়াছ মায়ের নিকটে তুমি ঋণী, কিন্তু তোমার এই ঋণের কথায় সমগ্র সাধককুল তোমার নিকটে চিরঋণী।

সাধনাভ্রষ্ট হইতে অনেকেই সুপটু, কিন্তু এমন প্রাণগত অনুতাপের অধিকার অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক এই ভাগ্য ঘটাইবার জন্যই জন্মান্তরের কথা, গর্ভবাসের কথা, জীব ভুলিয়া গেলেও জগজ্জননী শাস্ত্রদর্পণে বারবার তাহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন, বৎস! যাহা যাহা বলিয়াছিলে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার কর্ম্মানুসারে এই ভ্রান্তি ঘটাইবার জন্যই প্রসববেদনার সৃষ্টি। যাহা হউক, গর্ভমধ্যে নিত্যসিদ্ধ ধ্বনিশক্তির অভ্যুদয়ই যে, জীবের চৈতন্যসঞ্চার—অজপা মন্ত্ররূপে ধ্বনি-ই যে জীবের সঞ্জীবনী শক্তি, এই পর্য্যন্ত দেখাইবার জন্যই আমাদের এতদূর অবতারণা। জন্মান্তরীণ সংস্কার অনুসারে গর্ভমধ্যে জীব মনে মনেও বাক্য রচনা করে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি'। এই মননরূপ বচন প্রসবের পর রোদনাদি প্রক্রিয়ায় পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং সেই রোদনের সূত্রপাত গর্ভমধ্যেই হইয়া থাকে।

জায়তেঽধিকসম্বিগ্নো জৃম্ভতেঽঙ্গৈঃ প্রকম্পিতৈঃ।
যাত্যুন্মনং নিঃশ্বসিতি ভীত্যা রোদিতুমিচ্ছতি ॥

প্রসবকালে গর্ভস্থ জীব সমধিক উদ্বিগ্ন হয়, জরায়ু মধ্যে তাহার অঙ্গসমস্ত বারম্বার বিকম্পিত হয়, সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদে শিশুর জৃম্ভা (হাই তোলা) উপস্থিত হয়, মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে এবং ঘোরান্ধকার জরায়ু মধ্যে এই বিকট বিপদের আক্রমণ দেখিয়া ভয়বিহ্বল হৃদয়ে তখন রোদন করিতে ইচ্ছা করে, রোদনের জন্য যাহা কিছু অন্তঃপ্রক্রিয়া, তাহা এই সময়েই সম্পন্ন হইয়া থাকে—প্রসবের পর বহিঃপ্রক্রিয়ার আরম্ভ হয় মাত্র, সে প্রক্রিয়া এই—

মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্ত ভাবঃ পরাখ্যঃ,
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যম্ ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষো-রস্য জন্তোঃ সুষুম্না,
বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবন-প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥

প্রথমতঃ মূলাধার হইতে বাক্যের যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থার উদ্গম হয়, তাহার নাম পরভাব। পশ্চাৎ তদপেক্ষা স্থূলরূপে সেই অবস্থা হৃদয়গত হইলে তাহার নাম পশ্যন্তী ভাব। অনন্তর তদপেক্ষা স্থূলরূপে সেই অবস্থা যখন বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হয় তখন তাহার নাম মধ্যম ভাব। তৎপর সম্পূর্ণ স্থূলরূপে সেই অবস্থা যখন রোদনেচ্ছু জীবের মুখ-বিবর দ্বারে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম বৈখরী ভাব এবং সেই অবস্থাতেই শিশুর রোদন পরিস্ফুটরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে। অতএব জীবের সুষুম্নাযন্ত্রবদ্ধ বর্ণমালা কেবল প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বহিঃ প্রতিভাত হয়। সুষুম্নাকুহরে সেই নিত্যধ্বনি মধ্যে সমস্ত বর্ণের সূক্ষ্ম অবস্থান থাকিলেও চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বহিঃ প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ—

স্রোতোমার্গস্যাবিভক্তত্বহেতো-স্তত্রত্যানাং জায়তে ন প্রকাশঃ।
তাবদ্ যাবৎ কণ্ঠমূর্দ্ধাদিভেদো বর্ণব্যক্তি-স্থানসংস্থা যতোঽতঃ ॥

মূলাধার হইতে মুখ-বিবর পর্য্যন্ত শব্দস্রোত প্রবাহিত হইবার যে সকল পথ আছে, সেই সকল পথের বিভাগ না হওয়ায় তাবৎকাল পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণসমূহের প্রকাশ হইতে পারে না, যাবৎ কণ্ঠ, মস্তক, প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ গঠন না হয়, যেহেতু ঐ সমস্ত অঙ্গই বর্ণের অভিব্যক্তিস্থান।

সমস্ত মন্ত্রই এই নিখিল বর্ণ ধ্বনিময়ী পরমাত্ম-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপবিভূতি; সুতরাং সমস্ত মন্ত্রই বাঙ্ময় হইলেও চিন্ময়-স্বরূপ। সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে চৈতন্যের সত্তা থাকিলেও শুক্র শোণিত সংযোগ প্রভৃতির প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে যেমন তাহার অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ সমস্ত মন্ত্র চৈতন্যময় হইলেও সাধকের সাধন শক্তির

সহিত মন্ত্রশক্তির সংযোগ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে সে চৈতন্য প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্যই সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে—

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তি নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী শর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূত-সর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥

যদিও সেই মন্ত্রময়ী কুলকুণ্ডলিনী সমস্ত জীবের মূলাধারে বিদ্যুৎপ্রভায় দেদীপ্যমানা, তথাপি যোগিগণের হৃদয়-কমলেই তিনি স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন, (অন্যত্র সূক্ষ্মরূপে তাঁহার সত্তা থাকিলেও স্ব-স্বরূপের প্রকাশ নাই)। কুণ্ডলীভূত ভুজঙ্গীর অঙ্গশ্রী অঙ্গীকার করিয়া সেই দেবী শঙ্খাবর্ত্ত-ক্রমে (সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে) স্বয়ম্ভূ শঙ্করকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতা, তিনি সর্ব্ব-বেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী সর্ব্বতত্ত্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরী। তিনিই তেজস্ত্রয়ের (চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির) জননী, শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

সাধক! এখন একবার স্মরণ করুন সেই যোগিনীতন্ত্রোক্ত 'প্রমাণং সর্ব্বসত্ত্বানাং ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং' মন্ত্রের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ সত্য কি না? সেই তেজোময় মন্ত্রসকল সর্ব্বমায়াবহির্ভূত অর্থাৎ সমস্ত মায়ার অতীত, কারণ মন্ত্রতত্ত্ব মায়ার অতীত না হইলে মন্ত্রশক্তি প্রভাবে কখনও মায়িক জগতের কার্য্যকারণ প্রক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটিত না। কেননা যে যাহার আশ্রিত সে কখনও নিজ শক্তিপ্রভাবে তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না। এইজন্যই আবার বলিতেছেন 'সর্ব্বমায়া-নিকৃন্তনং', মন্ত্র সমস্ত মায়ার নিকৃন্তন। যে নিজে মায়াজড়িত, সে কখনও মায়াপাশ ছেদনে সমর্থ হইতে পারে না। মন্ত্রসকল সর্ব্বানন্দময় অর্থাৎ যে মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইলে জগতে কোন বস্তুর লাভ জন্য আনন্দের অভাব থাকে না, এইজন্যই দ্বিতীয় বিশেষণ মন্ত্রসকল ব্রহ্মানন্দময় অর্থাৎ এমন বস্তু জগতে নাই যাহাতে ব্রহ্মের সত্তা নাই, এমন আনন্দও জগতে নাই ব্রহ্মানন্দ লাভের পরেও যাহা অলব্ধ থাকে। এইজন্য আবার বলিয়াছেন, মন্ত্রসকল পূর্ণানন্দময় অর্থাৎ যিনি মন্ত্রের স্বরূপ অথবা মন্ত্র যাঁহার স্বরূপ তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল আনন্দের একমাত্র কেন্দ্রভূমি সচ্চিদানন্দ-রূপিণী। সুতরাং মন্ত্রসিদ্ধি বলে তাঁহার সেই স্বরূপ যে লাভ করে তাহার কোন আনন্দই অপূর্ণ থাকে না। এই পূর্ণানন্দ অবস্থাই পরম জীবন্মুক্তি। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় বিশেষণ 'ব্রহ্মনির্ব্বাণমুত্তমং', মন্ত্রই উত্তম-ব্রহ্মনির্ব্বাণ, সাক্ষাৎ কৈবল্যমুক্তি।

মন্ত্রসকল সর্ব্বমায়াময় সর্ব্ববিদ্যাময় সর্ব্বতপোময় এবং সর্ব্বসিদ্ধিময়। ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ হইয়াও সমস্ত গুণের অধীশ্বর এবং গুণময়, মন্ত্রও তদ্রূপ সমস্ত মায়ার অতীত হইলেও মায়ার প্রকাশভূমি এবং সর্ব্বমায়াময়। মায়াবলে সাধক যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন মন্ত্রের সাধনাই তাহার অসাধারণ কারণ। মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যাময় অর্থাৎ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা উপবিদ্যা বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাতত্ত্বভেদে আদ্যাশক্তির সে সকল স্বরূপ বিভক্ত হইয়াছে, মন্ত্রই সেই সমস্ত বিভাগের কারণ। মন্ত্রের সাধনাশক্তি প্রভাবেই তাঁহার স্বতন্ত্র আবির্ভাব সাধকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে অথবা মন্ত্র সর্ব্ববিদ্যাময় অর্থাৎ চতুঃষষ্টিকলা সহকৃত চতুর্দ্দশ লৌকিক বিদ্যা এবং অবিদ্যাপাশনাশিনী ব্রহ্মবিদ্যা যাঁহার সাধনায় অযত্নসিদ্ধরূপে সাধিত হয়। মন্ত্র সর্ব্বতপোময় অর্থাৎ কায়ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম, কায়ক্লেশ ব্যতিরেকেও যাঁহার প্রসাদে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিময় অর্থাৎ এমন কোন সিদ্ধি জগতে নাই যাহা মন্ত্রের সাধনায় লব্ধ না হয়। মন্ত্র সর্ব্বমুক্তিময় অর্থাৎ যাঁহার সাধনায় উপাস্য দেবতার সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য সার্ষ্টি এবং নির্ব্বাণ, সাধক ইহার যে কোন মুক্তিকেই প্রার্থনা করুন না কেন, কিছুই অসম্ভব নহে। কেননা মন্ত্র স্বয়ংই মুক্তিময়, অতলস্পর্শ সমুদ্রের যে পর্য্যন্ত অগাধতা পরীক্ষা করিবার জন্য যাঁহার ইচ্ছা হইবে তাঁহাকে যেমন সেই পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে তদ্রূপ সাধক যাদৃশ মুক্তির প্রার্থনা করিবেন তাঁহাকে তাদৃশ সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। সমুদ্র যেমন এক গণ্ডূষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লাবী জল দিতেও কাতর নহেন, কেননা সমুদ্র স্বয়ংই জলময়, মন্ত্রও তদ্রূপ সাধকের অধমা সিদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া মহানির্ব্বাণ পর্য্যন্ত কোন মুক্তি দিতেই কাতর নহেন। কেননা মন্ত্র স্বয়ংই মুক্তিময়, যাহা মন্ত্রের স্বরূপের তাহা নিত্যমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, কেবল সাধকের সাধনার অনুসারে ফলের তারতম্য। সাধক এইস্থানে বুঝিয়া লইবেন, নির্ব্বাণ মুক্তির অবস্থাতেও যাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় না, সেই মন্ত্রকে লৌকিক শব্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কি সাক্ষাৎ তুরীয়-চৈতন্য ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে? মন্ত্র সর্ব্ববেদময় অর্থাৎ একটি মন্ত্রও যদি সম্যক্ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই সাধকের সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদবিদ্যার ফল তত্ত্বজ্ঞান অনায়াসে লব্ধ হয় অথবা নিখিল বেদমন্ত্রের অধিকারসাধ্য কর্ম্ম তিনি নিজ-মন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন করিতে পারেন। মন্ত্র সর্ব্বলোকময় অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন লোক নাই সাধকের প্রয়োজন হইলে মন্ত্রশক্তি যেখানে গিয়া নিজ প্রভাবে কার্য্য করিতে না পারেন অথবা মুক্তি সময়ে সেই চতুর্দ্দশ ভুবনদ্বার ভেদ করিয়া সাধককে স্ব-স্বরূপে বিলীন করিতে না পারেন। মন্ত্র সর্ব্বভোগময় অর্থাৎ সাধকের যাহা কিছু ভোগ্য পদার্থ, এক মন্ত্রশক্তি হইতেই তাঁহার সে সমস্ত সম্পন্ন হয় অথবা স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়সুখ জন্য যাহা কিছু ভোগ, সাধক এক মন্ত্রশক্তির মধ্যেই সে সমস্ত

অনুভব করেন কিম্বা যাহার ব্রহ্মাণ্ডজীর্ণকর তীব্র প্রভাবে সমস্ত ভোগই সিদ্ধির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারে না। মন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রময় অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি সিদ্ধ হইলে কোন শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানেরই তখন অভাব থাকে না। মন্ত্র সর্ব্বযোগময় অর্থাৎ এমন কোন যোগ নাই যাহা মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ না হয়। দেবি! তোমার সেই হৃৎকমল দলে দলে এইরূপে মন্ত্রপুঞ্জ এবং শাস্ত্রপুঞ্জ দর্শন করিয়া সেই দুর্দ্দর্শ তেজঃ-প্রভায় আমার দর্শনশক্তি স্তম্ভিত হওয়ায় আমি মোহময় অজ্ঞানসাগরে মগ্ন হইলাম এবং সেই মূর্চ্ছার অবসানে শর্ব্বরীর গাঢ়ান্ধকারমগ্ন পুরুষ যেমন প্রভাতে উজ্জ্বল সূর্য্যোদয় দর্শন করে তদ্রূপ পুনর্ব্বার সেই সূর্য্যোজ্জ্বলতেজঃপুঞ্জ মন্ত্ররাশি দর্শন করিলাম। সর্ব্বমন্ত্রের অধীশ্বরী সেই মহাকালীর প্রসাদে সে সমস্ত মন্ত্রই আমার সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমস্ত শাস্ত্রই আমার অভ্যস্ত হইয়াছে। 'পঞ্চাশন্মাতৃকা নিত্যা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী', মাতৃকারূপিণী অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্ বর্ণমালা নিত্য, অনাদি অনন্ত এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী—এ মহাবাক্য সমস্ত তন্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত। পুরুষের ভ্রান্তিময় সংস্কারে যদি কখন কোন বর্ণের উচ্চারণের লোপ বা ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় বিধাতা স্বয়ং অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া তাহা পত্রাঙ্কিত করিয়াছেন—

বৃহস্পতিঃ। ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা॥

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, ষণ্মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই জীবের হৃদয়ে ভ্রান্তির উদয় হয়, এজন্য বিধাতা কর্ত্তৃক অক্ষর সমস্ত সৃষ্ট এবং লিপি-বিন্যাসক্রমে পত্রে আরোপিত হইয়াছে।

সাধকগণ বুঝিবেন, বিধাতা কর্ত্তৃক বেদও যেমন সৃষ্ট অক্ষরও তদ্রূপ সৃষ্ট, মহেশ্বর মহেশ্বরীর হৃদয়াম্বুজে বর্ণপুঞ্জের যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, বিধাতা তদনুরূপেই লিপিবিন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কামধেনু প্রভৃতি তন্ত্রে অকারাদি বর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধক তাহাতেই এ তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে লক্ষ্য করিবেন—অক্ষরমালার বিন্দু মাত্রা রেখা প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শক্তি সূর্য্য গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ ঐ সমস্ত রেখাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ফলতঃ লোক-ব্যবহারে আমরা যে লিপি-বিন্যাস প্রক্রিয়াকে (লেখাকে) অক্ষর বলিয়া জানি তাহা কেবল ঐ অ-ক্ষর ব্রহ্মের যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। সাধনাক্ষেত্রে মৃণ্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিকে যেমন দেবতাস্বরূপে ব্যবহার করা হয়, লেখার অধিকারে রেখাময় যন্ত্র সকলকেও তদ্রূপ অক্ষর বলিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধকের সাধনা প্রভাবে মন্ত্রশক্তি জাগরিতা হইলে প্রতিমার ন্যায় তেজোময় রেখা মূর্ত্তির অভ্যন্তরে প্রত্যেক রেখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন রেখা মূর্ত্তি ভেদ করিয়া নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দর্শন দেন। তৎপর মন্ত্র সিদ্ধ হইলে সমষ্টি মন্ত্রের অধীশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী উপাস্য দেবতা

স্বয়ং স্ব-রূপ প্রকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের অভ্যুদয়ে যামিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া অরুণের প্রখর রশ্মি যেমন দিক্ দিগন্তে প্রসারিত হইয়া আকাশ এবং পৃথিবীমণ্ডল আলোকিত করে এবং তাহারই অব্যবহিত পরে ধীরে ধীরে উদয়াচল শিখর সীমা সুরঞ্জিত করিয়া প্রতপ্তকাঞ্চনচ্ছবি রবিমণ্ডল যেমন লোকলোচনগোচরে আবির্ভূত হয়েন এবং সন্ধ্যাবন্দন সমাহিত-হৃদয় যোগীন্দ্র পুরুষগণ যেমন সেই তেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রফুল্ল রক্তকমলসমাসীন রক্তাঙ্গরাগ শুদ্ধ সিন্দূর সুন্দর সূর্য্যদেবকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মময়ীর কৃপারূপ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের অভ্যুদয়েও তদ্রূপ অবিদ্যা কালরাত্রির মোহান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া মন্ত্রের তীব্রতেজ সাধকের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমদেবতার প্রেম পুলকিত করিয়া তুলে, এই অবস্থার পরে পরেই সাধকের সহস্রারকমলদলে মন্ত্রমণ্ডলে দেবদেবীগণ দলে দলে অপ্রার্থিত-রূপে দর্শন প্রদান করেন। এইরূপে বিভূতিবর্গের পূর্ণ প্রকাশের পর পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী তখন সেই দেবমণ্ডলী-মণ্ডিত তেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরে সাধকের ধ্যেয় মূর্ত্তি অবলম্বনে স্ব-স্বরূপের প্রকাশ করেন। সাধক কৈবল্যময়ীর সেই কৈবল্যময় ভাবসাগরে মনঃপ্রাণ নিমজ্জিত করিয়া অগাধ শান্তির অন্তস্থলে চৈতন্যশয্যায় শয়ন করিয়া ব্রহ্মানন্দ নিদ্রার উপভোগ করেন—ইহাই অক্ষরের অক্ষর স্বরূপ। ফলতঃ প্রতিমাস্থ বা যন্ত্রস্থ দেবতা আর অক্ষস্থ অক্ষর বা মন্ত্র একই বস্তু, সাধকের সাধনার প্রভাবে তাহাতে দেবতার আবির্ভাব এবং অভাবে তিরোভাব হয় এই মাত্র। মন্ত্রবর্ণ নাদ বিন্দু স্বর ব্যঞ্জনের যে সকল সম্বন্ধ তাহাও মূর্ত্তিভেদে দেবতার স্বরূপের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে, মন্ত্রজ্ঞ সাধকবর্গ অবশ্যই তাহা অবগত আছেন। নিতান্ত গুরুগম্য বলিয়া আমরা সাধারণতঃ সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। কোন কোন বর্ণে দেবতার কোন কোন স্বরূপ বা বিভূতি অধিষ্ঠিত, সাম্প্রদায়িক মন্ত্র ব্যতিরেকে কোন খণ্ডিত বর্ণে সেই পূর্ণ শক্তির প্রকাশ নাই—এজন্য যে কোন শব্দ বা বর্ণ মন্ত্র হইতে পারে না। লীলাময়ী দেবতা যে মন্ত্রে নিজের যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন সেই মন্ত্রই সেই স্বরূপের প্রকাশক। তাই সেই মন্ত্র তাঁহার সেই স্বরূপের নিজ মন্ত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। এইজন্যই সর্ব্বমন্ত্র-সিদ্ধিগুরু ভগবান ভূতভাবন ভগবতীকে বলিয়াছেন—

যদ্দেবো জায়তে বীজ-স্তস্য মূর্ত্তির্ভবেদ্ ধ্রুবং।
দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে॥

যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা সেই বীজ হইতে সেই দেবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইবেন ইহা নিশ্চিত, যে হেতু দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতেই উৎপন্ন হয়। কামধেনুতন্ত্রে—

যস্য দেবস্য যদ্বীজং প্রফুল্লা কলিকা তথা।
ধ্যাত্বা দেবীং যথাশক্ত্যা তস্মাদাবির্ভবেৎ স্বয়ম্ ॥
শক্তি র্বা বিষ্ণুদেবো বা শিবো বা সূর্য্য এব বা।
বীজাদুৎপদ্যতে দেবি পরং ব্রহ্ম নিরঞ্জনম্ ॥
বীজধ্যানং বিনা দেবি। কথমুৎপদ্যতে হরিঃ।
সদাশিবো মহাদেবঃ কথমুৎপদ্যতে স্বয়ং ॥
সদাশিবস্য জননী বীজরূপা সনাতনী ॥

যে দেবতার যে বীজ এবং প্রফুল্লা ও কলিকা (মন্ত্রশক্তি বিশেষ) দেবীকে তদনুসারে যথাশক্তি ধ্যান করিলে সেই বীজমন্ত্র হইতেই শক্তি বিষ্ণু শিব সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। বীজ হইতেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মের প্রকাশ, বীজধ্যান ব্যতিরেকে কিরূপে হরি বা সদাশিব সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হইবেন, যেহেতু বীজরূপিণী সনাতনী সদাশিবেরও জননী। সাধকের সাধনা-লতার যাহা কিছু সিদ্ধিফল সমস্তই এই বীজরূপিণী মহামন্ত্রশক্তির প্রতি নির্ভর করে। তাই দেশ কাল পাত্র ভেদে সেই বীজ বপনের বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাশি নক্ষত্র গ্রহ যোগ ইত্যাদি যে সকল দেবতা সাধকের শরীরক্ষেত্রে অন্তশ্চারিণী-শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন সেই সকল শক্তির গুণানুসারে কোন ক্ষেত্রে কোন্ প্রক্রিয়ায় কোন্ বীজ বপন করিলে শীঘ্র সুফল ফলিবে তাহারই নির্দ্দেশস্বরূপ মন্ত্র-বিচার, মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে। বিশ্বসারতন্ত্রে—

সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্ জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ ॥
সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপু র্মূলং নিকৃন্ততি।

বিচক্ষণগণ চক্রবিচার-ক্রমে মন্ত্রকে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং অরি এই চতুর্ব্বিধ ভেদে অবগত হইবেন। তন্মধ্যে সিদ্ধ মন্ত্র যথাবিধি সাধিত হইলে যথাকালে (যে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য যতকালের অপেক্ষা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে) সিদ্ধ হইবে। সাধ্য মন্ত্র জপ এবং হোম উভয়ের দ্বারা দীর্ঘকালে সিদ্ধ হইবে, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই সিদ্ধ হইবে (কিন্তু সাধকের সাধনা অনুসারে ফলের অভিব্যক্তি হইবে) এবং রিপুমন্ত্র সিদ্ধির মূলোচ্ছেদন করিবে।

সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যার্ণাঃ সেবকাঃ স্মৃতাঃ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥
জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিকসেবয়া।
পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥

সিদ্ধমন্ত্রসকলকে বান্ধব, সাধ্যমন্ত্রসকলকে সেবক, সু-সিদ্ধ মন্ত্রসকলকে পোষক এবং শত্রুমন্ত্রসকলকে ঘাতক বলিয়া জানিবে। বন্ধুমন্ত্র যথাশাস্ত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্র অধিক সেবায় সিদ্ধ হয়, পোষকমন্ত্র অধিক সেবা ব্যতিরেকেও অভীষ্ট প্রদান করে এবং ঘাতকমন্ত্র নিশ্চয় সাধকের বিনাশ সাধন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মন্ত্রবিচার নাই এবং তাহার তত্ত্বসকল গুরুগম্য। এস্থলে সাধকবর্গের বিশেষ অনুধাবনের বিষয় এই যে, পূজা পাঠ স্তব হোম ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা আর নিজ দীক্ষা-মন্ত্রের অবলম্বনে সিদ্ধি ও সাধনার উদ্দেশ্য এক হইলেও প্রক্রিয়া এক নহে। পূজা পাঠ স্তব ইত্যাদি দ্বারা সাধক দশ বৎসরে যে ফল লাভ করিবেন, উৎকট সাধনার প্রক্রিয়া-প্রভাবে এক বৎসরে এক মাসে এক সপ্তাহে এমন কি একদিনেও মন্ত্রবলে সে ফল সিদ্ধ হইবে। কারণ পূজা স্তব ধ্যান ধারণা ইত্যাদি স্থলে কেবল সাধকের সাধনাশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে, আর মন্ত্রসাধনা স্থলে সাধনাশক্তি মন্ত্রশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন। দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধকের সাধনাশক্তি অনেকস্থলে অঙ্গহীন এবং কুণ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে, কিন্তু মন্ত্রশক্তির অব্যাহত প্রভাব কোথায়ও কুণ্ঠিত হইবার নহে। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মন্ত্রের সর্ব্বত্র সমান অধিকার। সাধকের কামনা সাধু হউক বা অসাধু হউক মন্ত্রশক্তি তাহা বিচার করিবেন না। দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নি যেমন তাহা সাদরে আত্মসাৎ করিবেন আবার অপরের সর্ব্বনাশ-কামনায় তাহার গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দিলেও তিনি যেমন সাদরে তাহাও ভস্মসাৎ করিবেন তদ্রূপ নিজের হউক বা অন্যের হউক, মঙ্গল বা অমঙ্গল যে কোন কামনায় হউক, সাধিত হইলেই মন্ত্রশক্তি সে কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। তাহার জন্য স্বর্গ নরক যাহা ভোগ করিতে হয় সাধক করিবেন, অগ্নির ন্যায় নিজ সর্ব্বদাহিকা এবং সর্ব্বপ্রকাশিকা শক্তির বিস্তার করিয়াই মন্ত্রশক্তি ক্ষান্ত হইবেন। সাধকের আত্মশক্তি বায়ুস্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয়। এ জন্য সাধকের আত্মশক্তি ক্ষীণ হইলেও মন্ত্রের দৈবশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহাকে বিপুল করিয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয় তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নভোমণ্ডলে যেমন বায়ুতরঙ্গ ঘনবেগে প্রবাহিত হয় আবার সেই বেগশালী বায়ুতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া অগ্নিমণ্ডল যেমন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয় তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির ঘাত প্রতিঘাতেও সাধকের আত্মশক্তি তীব্রবেগে সম্বর্দ্ধিত হয়। তখন সেই বেগময়ী আত্মশক্তির মন্ত্রশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে দ্বিগুণ সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। অগ্নি যেমন কণিকামাত্র বায়ুকে ধার করিয়াই সূক্ষ্মরূপে প্রজ্বলিত হইয়া জড়ীভূত বায়ুস্তরকে বিক্ষুব্ধ এবং সহচর করিয়া নিজ প্রভায় ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিয়া নভোমণ্ডল ভেদ করিতে থাকেন, মন্ত্রশক্তিও তদ্রূপ সাধকের

কণিকামাত্র আত্মশক্তিকে দ্বার করিয়া সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হইয়া সাধকের সেই জড়প্রায় আত্মশক্তিকে সন্ধুক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহারই বেগে আত্মবিস্তার করিয়া এবং পরিশেষে সেই সাধকশক্তিকেই সঙ্গে করিয়া জীবহৃদয় আলোকিত করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া দেন। মন্ত্রের এই অদ্ভুত প্রভাব আছে বলিয়াই অসাধ্য সাধন জীবের পক্ষে অসম্ভব নহে—নতুবা কি, জীব হইয়া শিবারাধ্য সাধ্যধনে কেহ কখনও আশা করিতে পারিত? জীবের এমন আত্মশক্তি কি আছে যাহার বলে মন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে সে জৈবী শক্তিকে পরাভূত করিয়া দৈবী শক্তিতে পরিণত হইতে পারে? সংসারের বিশাল প্রান্তরে সিদ্ধির বিলম্ব-অন্ধকারে একমাত্র মন্ত্রই ক্ষয়োদয়-রহিত চিরশারদ পূর্ণচন্দ্র। জগদম্বার অপার করুণাই এ চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ বিমলোজ্জ্বল কিরণমালা, সাধু সাধক ভক্ত সাধিকাই তাহার একমাত্র চিরপিপাসু চকর চকোরী। তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম উভয় পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সংসার-ভূভাগ অতিক্রম করিয়া সাধনার বিস্তীর্ণ গগনমণ্ডলে সর্ব্বোচ্চ কক্ষে উঠিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে সে সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাই সদানন্দ আনন্দময়ীকে বলিয়াছেন—

চকোরা এব জানন্তি নান্যে চন্দ্ররুচাং রুচিম্।

চন্দ্রকিরণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য (যেমন) চকোর ভিন্ন অন্যে জানে না (তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির তত্ত্বসুধাও সাধিকা ভিন্ন অন্যে জানে না। একচক্ষু অবিশ্বাসী কাকের দল তাহা দেখিয়া চিরকালই সংসারের শুষ্ক নীড়ে বসিয়া সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক লুক্কায়িত করে)।

সাধকের চতুর্ব্বর্গ-কল্পলতা মন্ত্রশক্তির সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কোন তত্ত্বই সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। তাই আমরা কেবল মূলতত্ত্ব-লক্ষ্যে তর্জ্জনী নির্দ্দেশমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম, কারণ ইহার পর শাখা পল্লব পত্র পুষ্পগুলি ধরিয়া দেখাইয়া দিলেই বৃক্ষসকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তন্ত্রশাস্ত্র বিলাসীর প্রমোদকানন নহে, ইহা চরাচরগুরু যোগীন্দ্রচূড়ামণির যোগসিদ্ধ তপোবন। কাহার সাধ্য তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে এই তেজঃপুঞ্জ বনকুঞ্জের একটি পত্রপুষ্পও স্পর্শ করিতে পারে? নিজভুজ-বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত যিনি এ বনে প্রবেশ করিবেন, অগ্নিমণ্ডলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায়, মরণোন্মুখ কন্দর্পের ন্যায়, তাঁহাকেই সংহারনাথের মহারুদ্রতেজে ভস্মীভূত হইতে হইবে। তাই আমরা এই পর্য্যন্ত আসিয়াই সভয়ে পশ্চাৎপদ।

অতঃপর যাহা বুঝাইবার আছে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ঐ ভক্তবাঞ্ছিত চরণাম্বুজে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহারই বাক্যানুসারে নিখিল গুরুবর্গহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যবর্গকে তাঁহার মন্ত্রময় স্ব-স্বরূপ বুঝাইয়া দিউন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গুরুতত্ত্ব

মন্ত্রতত্ত্বে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সিদ্ধি-সাধনার বার্ত্তা কথিত হইল, ইহার সমস্তই গুরুতত্ত্বের অপেক্ষিত—যেহেতু গুরুমূলক দীক্ষা, দীক্ষামূলক মন্ত্র, মন্ত্রমূলক দেবতা এবং দেবতামূলক সিদ্ধি। এইজন্যই মুণ্ডমালাতন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন—

গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।
অতএব বরারোহে। দেবতায়াঃ পিতামহঃ॥
পিতুশ্চ ভাবনাদ্দেবি। যথা চৈব পিতুঃ পিতুঃ।
তদ্‌স্তব-স্তোষমেতি বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

গুরু হইতে মন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং মন্ত্র হইতে দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। বরারোহে; এজন্য গুরুদেব ইষ্টদেবতার পিতামহস্থানীয়, পিতা পিতামহের সেবা করিলে যেমন তাঁহাদিগের পুত্র এবং পৌত্র সন্তোষ লাভ করেন তদ্রূপ গুরুর সেবা করিলে মন্ত্র, মন্ত্রের সেবা করিলে দেবতা এবং গুরু মন্ত্র উভয়ের সেবা করিলেও দেবতা প্রসন্ন হয়েন। ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলেই বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ পিতা পিতামহকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের পুত্র পৌত্রকে সেবা করিলেও যেমন পুত্র পৌত্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত অসন্তুষ্ট হয়েন তদ্রূপ গুরুকে অবজ্ঞা করিয়া মন্ত্রের কিংবা মন্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া দেবতার অথবা গুরু ও মন্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া ইষ্টদেবতার উপাসনা করিলেও তাহাতে তাঁহারা প্রসন্ন না হইয়া বরং কুপিত হয়েন। এস্থানে ইহাও বুঝিবার বিষয় যে পিতা পিতামহকে অবজ্ঞা করিয়া পুত্র পৌত্রকে সেবা করিলেও তাহাতে যেমন পুত্র পৌত্রের অসন্তোষ বই সন্তোষের সম্ভাবনা নাই তদ্রূপ পুত্র পৌত্রকে অনাদর করিয়া পিতা পিতামহকে সেবা করিলেও তাহাতে পিতা পিতামহের সন্তোষ সম্ভাবনা নাই। দেবতাকে অবজ্ঞা করিয়া গুরু ও মন্ত্রের সেবা কিম্বা দেবতা ও মন্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া গুরুকে সেবা করিলেও তাহাতে গুরুর সন্তোষ সম্ভাবনা নাই। একথাটি এখানে বলিয়া দিবার প্রয়োজন এই যে, আজকাল এমন শিষ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা মন্ত্রজপ এবং দেবতার উপাসনার ভয়েই গুরুর একান্ত শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এই অতিভক্তিই চোরের লক্ষণ। ফলতঃ গুরু মন্ত্র এবং দেবতা এই ত্রি-তত্ত্বে যাঁহার অভেদজ্ঞান, সিদ্ধি তাঁহারই অদূরবর্ত্তিনী। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মন্ত্রে বা গুরুদেবে বা ন ভেদং যস্তু কল্পতে।
তস্য তুষ্টা জগদ্ধাত্রী কিন্ন দদ্যাদ্দিনে দিনে ॥

মন্ত্রে গুরুদেবে এবং ইষ্টদেবতায় যিনি ভেদ কল্পনা না করেন, জগদ্ধাত্রী তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে দিনে দিনে কিনা দান করেন? শাস্ত্রের উক্তি এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আজকাল গুরুবাদ লইয়া বড়ই বিসম্বাদ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানুষকে ব্রহ্মরূপ দেবতা বলিয়া উপাসনা করা, অনেকের পক্ষেই অরুচিকর। তাঁহারা মন্ত্রকে যেমন অক্ষর বলিয়া বুঝিয়াছেন, গুরুকেও তদ্রূপ মানুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ গুরুতত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই এ সিদ্ধান্তের একমাত্র মূল। শাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এ সন্দেহ স্থান পাইবার অবকাশ নাই। সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী বিশ্বজননী স্বয়ংই সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। যোগিনীতন্ত্রে—

শ্রীদেব্যুবাচ।

গুরুঃ কো বা মহেশান। বদ মে করুণাময়।
ত্বত্তোঽপ্যধিক এবায়ং গুরুস্ত্বয়া প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

আদিনাথো মহাদেবি। মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ।
গুরুঃ স এব দেবেশি। সর্ব্বমন্ত্রেষু নাপরঃ ॥
শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবে চ গাণপত্যে তথৈন্দবে।
মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥
মন্ত্রবক্তা স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি।
মন্ত্রপ্রদানকালে হি মানুষে নগনন্দিনি।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি।
অতস্তু গুরুতা দেবি। মানুষে নাত্র সংশয়ঃ ॥
মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যদ্ ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ।
তদ্ ধ্যানং কুরুতে দেবি। শিষ্যোঽপি শীর্ষপঙ্কজে ॥
অতএব মহেশানি। এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মানুষেষু মহেশ্বরি।
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তস্য সর্ব্বশাস্ত্রেষু শঙ্করি ॥

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহেশ্বর! গুরুই বা কে। করুণাময়! যাঁহাকে তুমি তোমা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ। ঈশ্বর বলিলেন, মহাদেবি! যিনি আদিনাথ মহাকাল, দেবেশি! সর্ব্বমন্ত্রে তিনিই দীক্ষাগুরু, অন্য কেহ নহেন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য ঐন্দব মহাশৈব এবং সৌর, এই সকল মন্ত্রেই তিনিই দীক্ষাগুরু তাহাতে সংশয় নাই, পরমেশ্বরি। তিনিই সমস্ত মন্ত্রের বক্তা, অপর কেহ

নহেন। নগনন্দিনি! শিষ্যের মন্ত্র-প্রদানকালে মানবের দেহে সেই মহাকালের অধিষ্ঠান হয়, শঙ্করি! তজ্জন্যই মানবের গুরুত্ব ইহা নিঃসংশয়। দেবি! মন্ত্রদাতা নিজ শিরঃপদ্মে গুরুর যাদৃশ মূর্ত্তি ধ্যান করেন, শিষ্যও নিজ শীর্ষপঙ্কজে গুরুর সেই স্বরূপই ধ্যান করেন। অতএব মহেশ্বরি! গুরু ও শিষ্য উভয়ের নিকটেই গুরু পদার্থ এক। শঙ্করি! মনুষ্যগুরুর দেহে সেই পরমগুরুর অধিষ্ঠান হয়। এইজন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে সেই মানবগুরুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তোমার আমার বাটীর মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমা গঠিত হইলেও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে যেমন সে প্রতিমা কৈলাসবাসিনীরই মূর্ত্তি তদ্রূপ পৃথিবীর এদেশে ওদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও গুরুদেহই ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি। দুর্গোৎসবাদি পূজায় যেমন প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, শিষ্যের মন্ত্রদীক্ষাকালেও গুরুকে তদ্রূপ নিজদেহে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তুমি আমি যাহাকে গুরু বলিয়া বুঝি, গুরু যদি তাহাই হইবেন তবে আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কাহার? আবার সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠাকালেও গুরু অমুক উপাধিধারী, অমুকবর্ণবিশিষ্ট, অমুক আকার আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা বলিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন না। তখন সেই জীবের শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলমধ্য-সমাসীন কর্পূরকুন্দ-শরদিন্দু-শুভ্রসুন্দর বরাভয়করদ্বয় উদ্যদরুণবর্ণ-শক্তি-সমালিঙ্গিত-বামাঙ্গ পরমগুরুর প্রাণশক্তিই নিজ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার সত্তাসাগরে আত্মসত্তা নিমজ্জিত করেন এবং সেই সত্তা লক্ষ্য করিয়াই শিষ্যের ন্যায় তিনিও আপনি আপনাকে প্রণাম করেন। প্রতিমা যেমন দেবত্বের আধারযন্ত্র, গুরুদেহও তাহাই। যদি গুরুর পার্থিব দেহকেই শাস্ত্র গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন তাহা হইলে সেই সেই আকৃতি অনুসারে প্রত্যেক গুরুর ধ্যানও স্বতন্ত্র হইত। এইজন্য শাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন 'মুক্তি র্ন জায়তে দেবি মানুষে গুরুভাবনাৎ' অর্থাৎ আমার গুরু অমুক এবং এই আকারের এই মনুষ্যরূপে গুরুভাবনা করিলে তাহাতে কখনও মুক্তি হইবে না। এ বৎসরে পূজার প্রতিমাখানি যেমন হইয়াছে তাহাই জগদম্বার স্ব-স্বরূপ, ইহা চিন্তা করিলে যেমন আগামীবর্ষের বা পূর্ব্ববর্ষের প্রতিমাখানি তাঁহার অ-স্বরূপ, হইয়া যায়, কেননা দুইখানি প্রতিমা কখনও একরূপ হয় না। সুতরাং অন্যের বাটীর প্রতিমাতেও প্রকারান্তরে যেমন দেবত্ব নাই বলিয়াই বুঝিতে হয় তদ্রূপ অমুক আকারের অমুক উপাধিধারী যিনি—তিনিই আমার গুরু এরূপ চিন্তা করিলেও 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ' যিনি আমার নাথ তিনিই জগতের নাথ, যিনি আমার গুরু তিনিই জগতের গুরু এ তত্ত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। তাই বুঝিতে হইবে, মূর্ত্তি যেরূপই কেন গঠিত না হউক, সমস্ত মূর্ত্তিতেই একমাত্র জগন্ময়ীর আবির্ভাব। তাই মূর্ত্তি সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অভিন্নরূপিণী মায়ের সত্তায় সমস্তই এক। তদ্রূপ গুরুর পার্থিব দেহসকল পরস্পর পৃথক্ হইলেও অভিন্ন

গুরুতত্ত্বের স্বরূপে সমস্তই এক। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ'। তাই সমস্ত তন্ত্রে গুরুর ধ্যান ও মন্ত্র একরূপ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রদীপশিখা হইতে প্রদীপান্তরের বর্ত্তিকা যেমন প্রজ্বালিত করিয়া লওয়া হয়, গুরুদেহ হইতেও তদ্রূপ মন্ত্রময়ী দৈবশক্তিকে শিষ্যদেহে সংক্রামিত করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী প্রদীপের দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তি অথবা এই শক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত অবস্থা অগ্নি স্বরূপের কিছুমাত্র তারতম্য বা পার্থক্য হয় না। সকল প্রদীপেই অগ্নিপদার্থ এক, তদ্রূপ গুরুদেহেই হউক অথবা শিষ্যদেহেই হউক গুরুর স্বরূপ সর্ব্বত্রই এক। তবে গুরুদেহ হইতে যতদিন সে শক্তি শিষ্যদেহে সম্পূর্ণরূপে সংক্রামিত না হয় ততদিন পর্য্যন্তই গুরুশিষ্য ব্যবহার, যতদিন সাধক ততদিনই শিষ্য। অতঃপর সিদ্ধাবস্থা, গুরু ও শিষ্য এই দ্বৈতভাবের অতীত, তখন এক অদ্বৈতরূপিণীর সত্তা ব্যতীত অন্য সত্তাই নাই। সুতরাং গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ সুদূরপরাহত। মুক্তির স্বরূপ যেমন নির্গুণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান, সিদ্ধির স্বরূপও তদ্রূপ অদ্বৈতরূপে অবস্থান। কিন্তু সগুণ দেবতার উপাসনা ব্যতীত যেমন গুণাতীত মুক্তির অবস্থা অসম্ভব, তদ্রূপ গুরুর আরাধনা ব্যতীত অদ্বৈত জ্ঞানও অসম্ভব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকার অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চরাচর যৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত সেই ব্রহ্মপদ যৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম। জ্ঞানময়ী অঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ জীবের চক্ষু যৎকর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম। যাঁহার প্রসাদে বিশ্বময় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হয়, তিনি মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইলেও স্বরূপতঃ মানব নহেন।

চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দুর্লভ মানবজন্ম লাভের পর যখন জীবের শুভাদৃষ্ট-দ্বার উদঘাটিত হয় তখন স্বয়ং ভগবান মহেশ্বরই গুরুরূপে তাঁহার দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হয়েন। বুঝিতে হইবে, অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া তখন জীবকে সেই ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিয়াছে যে ক্ষেত্রে করুণাময় সদাশিব জীবগুরুরূপে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাই অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—শতবৎসরের চেষ্টাতে যে গুরু চিরদুর্লভ ছিলেন, ভাগ্যক্রমে অযত্নসুলভ অপ্রার্থিতরূপে তিনিই স্বয়ং-প্রার্থী হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সৌভাগ্যশালী শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া যান। পার্থিব প্রজার সৌভাগ্যক্রমে তখন সেই বায়ু বহিতে থাকে, ঘোর অনাবৃষ্টির পরে যে বায়ু চক্রের আকর্ষণে আলোড়নে চঞ্চল হইয়া সলিলভরমন্থর নবমধুর জলদবৃন্দ নবাঙ্কুরসমাচ্ছন্ন

নিদাঘতাপতাপিত ক্ষেত্রের বক্ষঃ অজস্র বর্ষণে সন্তর্পিত করেন, সাধকের বিশাল হৃদয় সুশোভিত করিয়া সাধনার শস্যকাণ্ড সকল প্রস্ফুট কুসুমসৌরভও পরিণত ফলসৌন্দর্য্যভরে জগতের প্রাণ উন্মাদিত করে। জন্মান্তরের নিতান্ত সাধনার অঙ্কুর না থাকিলে এ শুভদিন প্রায়শঃই সমাগত হয় না। তাই অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ শিবমূর্ত্তি মহাপুরুষ সম্মুখে উপস্থিত হইলেও দুরদৃষ্টশালী জীবের মস্তক তাঁহার চরণারবিন্দে প্রণত হয় না। জগদম্বার মোহিনী মায়ায় জীবের হৃদয় তখন এমনই অজ্ঞানভরে অভিভূত হইয়া পড়ে, যাহাতে তাঁহার সে মূর্ত্তিতে দোষ ভিন্ন গুণ-দৃষ্টি কিছুতেই বিস্ফারিত হয় না। আবার জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত থাকিলে গুরুতত্ত্বে অনুরাগ এবং গুরুচরণে একান্ত ভক্তি স্বতএব উপস্থিত হইয়া থাকে। তাই ভগবান মহেশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, কুলার্ণবে—

যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোম্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোঽনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে ॥ ১ ॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ২ ॥
শিবোঽহমাকৃতি র্দেবি! নরদৃগ্-গোচরা নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ ৩ ॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥
সম্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাকৃতিঃ।

* * *

শিবঃ কৃপানিধি র্লোকে সংসারীব হি চেষ্টিতঃ ॥ ৫ ॥
অত্রিনেত্রঃ শিবঃ সাক্ষাদচতুর্ব্বাহুরচ্যুতঃ।
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা শ্রীগুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥
নরবদ্দৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্ম্মণা।
শিববদ্দৃশ্যতে লোকে ভবানি! পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ৭ ॥
শ্রীগুরুং পরমং তত্ত্বং তিষ্ঠন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
মন্দভাগ্যা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ৮ ॥
গুরুঃ সদাশিবঃ সাক্ষাৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
শিবরূপী গুরু র্নো চেদ্ ভুক্তিং মুক্তিং দদাতি কঃ ॥ ৯ ॥
সদাশিবস্য দেবস্য শ্রীগুরোরপি পার্ব্বতি।
উভয়োরন্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী ॥ ১০ ॥

দেশিকাকৃতিমাস্থায় পশুপাশানশেষতঃ।
ছিত্ত্বা পরপদং দেবি! নয়ত্যেব যতো গুরুঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।
আচার্য্যরূপমাস্থায় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশূন্ ॥ ১২ ॥
যথা ঘটশ্চ কলসঃ কুম্ভশ্চৈকার্থবাচকঃ।
তথা দেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে ॥ ১৩ ॥
যথা দেবস্তথা মন্ত্রো যথা মন্ত্রস্তথা গুরুঃ।
দেবমন্ত্রগুরূণাঞ্চ পূজায়াঃ সদৃশং ফলম্ ॥ ১৪ ॥
শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্লাতি পার্ব্বতি।
গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশনিকৃন্তয়ে ॥ ১৫ ॥

শিবের যাহা সূক্ষ্মস্বরূপ তাহা সর্ব্বগামী (সর্ব্বব্যাপী) নিষ্কল উন্মনা অব্যয় ব্যোমাকার (নির্লিপ্ত) অনাদি অনন্ত। প্রিয়ে! সেই নিগুর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে দ্বৈতজ্ঞানময় পূজার বিষয় হইবে? ॥ ১ ॥ এইজন্যই সেই পরমগুরু মানব-গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক সম্যক্ পূজা করিলেই তিনি ভোগ মোক্ষ উভয় প্রদান করেন ॥ ২ ॥ দেবি! যদিও আমি স্থূলরূপ-পরিগ্রহে এই শিবমূর্ত্তিতে অবস্থিত কিন্তু তথাপি এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়নগোচর হইবার যোগ্য নহে। তজ্জন্যই নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি ॥ ৩ ॥ মনুষ্যচর্ম্মে আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরমশিব স্ব-শিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত গূঢ়রূপে ধরিত্রীমণ্ডলে পর্য্যটন করেন ॥ ৪ ॥ কৃপানিধি সদাশিব সাধুভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত নিহঙ্কার (করুণাময়) মূর্ত্তি অবলম্বনে লোকরাজ্যে সংসারের অতীত হইয়াও সংসারী পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করেন ॥ ৫ ॥ প্রিয়ে! শ্রীগুরু অত্রিনেত্র (ত্রিনেত্র না হইয়াও) শিব, অচতুর্ব্বাহু (চতুর্ভুজ না হইয়াও) বিষ্ণু, অচতুর্ব্বদন (চতুর্ম্মুখ না হইয়াও) ব্রহ্মা ॥ ৬ ॥ ভবানি! পাপের ফল প্রবল হইলেই সংসারে গুরুদেবকে নরবৎ বলিয়া বোধ হয় এবং পুণ্যফল প্রবল হইলেই তাঁহাকে শিববৎ বোধ হয় ॥ ৭ ॥ সাক্ষাদ্-ব্রহ্মতত্ত্বরূপ শ্রীগুরু চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও অন্ধ যেমন সূর্য্যদর্শনে চিরবঞ্চিত তদ্রূপ হতভাগ্য জীবগণও তাঁহার স্বরূপদর্শনে অসমর্থ হয় ॥ ৮ ॥ গুরু যে সাক্ষাৎ সদাশিব দেব—ইহা নিঃসংশয় সত্য। কারণ গুরু শিবরূপী না হইলে সাধকের ভোগ মোক্ষ প্রদান করে কে? ॥ ৯ ॥ পার্ব্বতি! দেব সদাশিব ও শ্রীগুরু, এই উভয়ের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। যে ইহাতে ভেদজ্ঞান করিবে, সে পাতকগ্রস্ত হইবে ॥ ১০ ॥ দেবি! যেহেতু গুরুদেব উপদেষ্টার মূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্ব্বক অশেষ প্রকারে জীবের পশুপাশরাশি ছেদন করিয়া পরব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত করেন ॥ ১১ ॥ সর্ব্বানুগ্রহকারী করুণানিধি ঈশ্বর আচার্য্যরূপ

পরিগ্রহপূর্ব্বক মায়াপাশবদ্ধ পশুবর্গকে দীক্ষা দ্বারা মুক্ত করেন ॥ ১২ ॥ ঘট কলস এবং কুম্ভ শব্দ যেরূপ এক পদার্থেরই বাচক, দেবতা মন্ত্র এবং গুরুশব্দও তদ্রূপ এক পদার্থেরই বাচক ॥ ১৩ ॥ যাহা দেবতার স্বরূপ তাহাই মন্ত্রের স্বরূপ, যাহা মন্ত্রের স্বরূপ তাহাই গুরুর স্বরূপ। এইরূপে দেবতা মন্ত্র ও গুরু, এই তিনেরই উপাসনার ফল এক ॥ ১৪ ॥ শিবরূপে অবস্থিত হইয়া আমি পূজা গ্রহণ করি এবং গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবের ভবপাশ ছেদন করি ॥ ১৫ ॥ গুরুতন্ত্রে—

গুরোঃ সেবা গুরোর্ধ্যানং গুরোঃ স্তোত্রং গুরোর্জপঃ।
গুরোঃ পূজা গুরোস্তৃপ্তি-গু‍র্বোর্ভক্তির্নৃণাং যদি ॥
জন্মভাগ্যবশাদ্দেবি। যেষাং সংজায়তে কচিৎ।
তেষাং মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধো জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥
গুরোর্গেহে স্থিতঃ শিষ্যো যৎ পুণ্যং সমুপাচরেৎ।
তৎ পুণ্যমক্ষয়ং প্রোক্তং পুণ্যতীর্থে শতাধিকম্ ॥

গুরুর সেবা, গুরুর ধ্যান, গুরুর স্তোত্র, গুরুমন্ত্র জপ, গুরুর পূজা, গুরুর তৃপ্তি সাধন এবং গুরুচরণে ভক্তি কদাচিৎ জন্মান্তর-সঞ্চিত ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদিগের সম্পন্ন হয়, দেবি! তাঁহাদিগেরই মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া শিষ্য যে পুণ্য উপার্জ্জন করেন তাহা অক্ষয়, আবার সেই গুরুগৃহ যদি পুণ্যতীর্থে হয় তবে সে পুণ্য আরও শতাধিক পরিবর্দ্ধিত হয়। রুদ্রযামলে—

গুরুভক্ত্যা চ শক্রত্বং মদ্ভক্ত্যা শূকরো ভবেৎ।
গুরুভক্তেঃ পরং নাস্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বতঃ ॥

গুরুভক্তির দ্বারা জীব ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে কিন্তু আমার ভক্তি-দ্বারা শূকর হইবে অর্থাৎ গুরুতে অভক্তি করিয়া যদি জীব ইষ্টদেবতার ভক্ত হয় তবে তাহার শূকরত্ব লাভ হইবে। স্বরূপতঃ কোন শাস্ত্রেই গুরুভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ আর নাই। অপিচ—

ধিগ্ ধনং ধিগ্ বলং তেষাং ধিক্ কুলং ধিগ্ বিচেষ্টিতং।
যেষাং নোৎপদ্যতে ভক্তি গু‍র্রুদেবে মহেশ্বরি। ॥

মহেশ্বরি! ধিক্ তাহাদিগের ধনে, ধিক্ তাহাদিগের বলে, ধিক্ তাহাদিগের কুলে, ধিক্ তাহাদিগের কর্ম্মকাণ্ডে, গুরুদেবের প্রতি যাহাদিগের ভক্তির উদয় না হয়। যোগিনীতন্ত্রে—

গুরোঃ স্থানং হি কৈলাসং গৃহং চিন্তামণের্গৃহং।
বৃক্ষালী কল্পবৃক্ষালী লতা কল্পলতা স্মৃতা ॥
সর্ব্ব খাতজলং গঙ্গা সর্ব্বং পুণ্যময়ং শিবে!।
গুরুগেহে স্থিতা দাস্যো ভৈরব্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

ভৃত্যা ভৈরবরূপাশ্চ ভাবয়েন্মতিমান্ সদা।
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন গুরোঃ স্থানং মহেশ্বরি।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।

গুরুর নিবাসস্থান কৈলাসধাম, গুরুর গৃহ চিন্তামণি গৃহ, গুরুভবন-স্থিত বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, লতাসমস্ত কল্পলতা, সমস্ত খাতজল গঙ্গা, শিবে! অধিক আর কি বলিব, সেই পুণ্যময় ধামে সমস্তই পুণ্যময়। গুরুর গৃহে অবস্থিত দাসীসমস্ত ভৈরবী-স্বরূপা, ভৃত্যবর্গ ভৈরবরূপ, মতিবান্ সাধক সর্ব্বদা এইরূপে গুরুর স্বরূপ চিন্তা করিবেন। মহেশ্বরি! গুরুস্থানকে যিনি একবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, তিনি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। বিশ্বসারতন্ত্রে—

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকং।
গুরুর্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম তদ্বচঃ॥

গুরুর নিবাসস্থান কাশীক্ষেত্র, তাঁহার চরণোদক স্বয়ং জাহ্নবী, গুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্রই স্বয়ং তারক ব্রহ্ম।

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃ কৃপা॥

গুরুর মূর্ত্তি ধ্যানের মূল, গুরুর পাদপদ্মই পূজার মূল, গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল এবং গুরুর কৃপাই সিদ্ধির মূল।

মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুঃ রক্ষতি পার্ব্বতি।॥

মুনিগণ, পন্নগগণ অথবা সুরগণ কর্ত্তৃকও যদি সাধক অভিশপ্ত হয়েন অথবা অপরিহার্য্য কালমৃত্যুভয়ও যদি উপস্থিত হয়, পার্ব্বতি! সে ঘোর-সঙ্কট সময়েও একমাত্র গুরুই সাধককে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। গুপ্তসাধনতন্ত্রে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুস্তীর্থং গুরুর্যজ্ঞো গুরুর্দানং গুরুস্তপঃ॥
গুরুরগ্নি গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই স্বয়ং দেব মহেশ্বর। গুরুই তীর্থ, গুরুই যজ্ঞ, গুরুই দান (দানজন্য পুণ্যরূপ), গুরুই তপস্যা, গুরুই অগ্নি, গুরুই সূর্য্য, নিখিল জগৎ সমস্তই গুরুময়।

কিং দানেন কিং তপসা কিমন্যতীর্থসেবয়া।
শ্রীগুরোরর্চ্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চ্চিতং জগৎ॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তি হি সন্ততম্॥

দানের দ্বারাই বা কি, তপস্যার দ্বারাই বা কি, তীর্থসেবার দ্বারাই বা অন্য পুণ্য কি উপার্জ্জিত হইবে? শ্রীগুরুর শ্রীচরণদ্বয় যিনি পূজা করিয়াছেন, ত্রিজগৎ তাঁহারই পূজিত হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যে যত তীর্থ অধিষ্ঠিত আছেন, শ্রীগুরুর চরণাম্বুজতলে সে সমস্ত তীর্থই নিরন্তর নিবাস করিতেছেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃদেবতাঃ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সার্ব্বভৌমিকাঃ॥
এতে চান্যে চ তিষ্ঠন্তি নিত্যং গুরুকলেবরে।
শ্রীগুরোস্তৃপ্তিমাত্রেণ তৃপ্তিরেষাঞ্চ জায়তে॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং পরমেশ্বরী পার্ব্বতী ইন্দ্রাদি দেবগণ যক্ষাদি দেবযোনিগণ, পিতৃদেবতাগণ, গঙ্গাদি সমস্ত পুণ্যনদী, সমস্ত গন্ধর্ব্ব এবং সর্পজাতি, এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম এবং সর্ব্বভূভাগে অধিষ্ঠিত সমস্ত পর্ব্বত, এই সমস্ত এবং এতভিন্ন আর যাহা কিছু ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অবস্থিত, গুরু-কলেবরে সে সমস্তই নিত্য অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুর তৃপ্তিমাত্রেই ইহাদিগের তৃপ্তি সাধিত হয়।

ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ।
ন গুরোরধিকো মন্ত্রো ন গুরোরধিকং ফলম্॥
ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ।
ন গুরোরধিকা মূর্ত্তির্ন গুরোরধিকো জপঃ॥

শাস্ত্রও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, তপস্যাও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, মন্ত্রও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, কর্ম্মজন্যফলও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, স্বয়ং দেবীও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, শিবও গুরু অপেক্ষা অধিক নহেন, গুরুমূর্ত্তি অপেক্ষা কোন মূর্ত্তিও অধিক নহেন, গুরু অপেক্ষা কোন জপও অধিক নহে অর্থাৎ একমাত্র গুরুসাধনেই এই সমস্ত সাধন সিদ্ধ হয়। এইজন্যই যামলে কথিত হইয়াছে—

গুরুরেকঃ শিবঃ প্রোক্তঃ সোঽহং দেবি! ন সংশয়ঃ।
গুরুস্ত্বমপি দেবেশি! মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে॥
অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে নহি ভেদঃ প্রজায়তে।
কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মে ধ্যেয়ো গুরুঃ সদা॥
কদাচিদ্ধৃদয়াম্ভোজে কদাচিদ্দৃষ্টিগোচরে।

একমাত্র শিবই গুরুস্বরূপ এবং আমি সেই শিবস্বরূপ, দেবেশি! তুমিও গুরুস্বরূপ, মন্ত্রও গুরুস্বরূপ। এইজন্য মন্ত্রে গুরুদেবে এবং ইষ্ট দেবতায় কখনও ভেদ হয় না। কদাচিৎ সেই গুরুদেবকে নিজ শিরঃস্থিত সহস্রারপদ্মে ধ্যান করিবে, কদাচিৎ

হৃদয়াম্ভোজে ইষ্ট দেবতারূপে ধ্যান করিবে এবং কদাচিৎ দৃষ্টিগোচরে অর্থাৎ গুরুর পার্থিব দেহে তাঁহাকে ধ্যান করিবে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে—

গুরুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দীক্ষাশিক্ষা-প্রভেদতঃ।
আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ শেষে শিক্ষাগুরুর্মতঃ॥
যন্মুখাত্তু মহামন্ত্রঃ শ্রূয়তেঽভ্যস্যতেঽপি বা।
স গুরুঃ পরমো জ্ঞেয়-স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী॥

শিক্ষা এবং দীক্ষা ভেদে গুরু দ্বিবিধ কথিত হইয়াছেন। প্রথমে দীক্ষাগুরু, এবং শেষে শিক্ষাগুরু অর্থাৎ যাঁহার নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করা যায় তিনিই দীক্ষাগুরু এবং দীক্ষার অনন্তর যাঁহার নিকটে সমাধি ধ্যান ধারণা জপ স্তব কবচ পুরশ্চরণ মহাপুরশ্চরণ এবং বিশেষ বিশ্লেষ সাধনা ও যোগাদি শিক্ষা করা যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু। এই উভয়ের মধ্যে যাঁহার নিকটে ইষ্টদেবতার মহামন্ত্র শ্রুত এবং অভ্যস্ত হইয়াছে, তিনিই পরমগুরু এবং তাঁহার আজ্ঞাই সিদ্ধির মূল। প্রকারভেদে এই গুরুতত্ত্বই কুলাগমে ষড়্বিধ কথিত হইয়াছে। যথা—

প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকো দর্শকস্তথা।
শিক্ষকো বোধকশ্চৈব ষড়েতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥
পঞ্চৈতে কার্য্যভূতাঃ স্যুঃ কারণং বোধকো ভবেৎ।

যিনি সাধনার এবং দীক্ষা-গ্রহণের বিশেষ আবশ্যক বুঝাইয়া দিয়া প্রেরণ করেন তিনি প্রেরক, যিনি সাধনা এবং সাধ্য বিষয়ের উদ্বোধের সূচনা করেন তিনি সূচক, যিনি সাধনা এবং সাধ্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া দেন তিনি বাচক, যিনি সাধনা এবং সাধ্যতত্ত্বকেই ইদন্তারূপে অঙ্গুলীনির্দ্দেশে প্রদর্শন করেন তিনি দর্শক, যিনি সেই সাধ্য এবং সাধনাতত্ত্বের শিক্ষাপ্রদান করেন তিনি শিক্ষক, যিনি হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া সাধনা এবং সাধ্যতত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করেন তিনি বোধক। এই ষড়্বিধ-স্বরূপে গুরুকে অবগত হইবে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চপ্রকার গুরুই কার্য্য-স্বরূপ এবং শেষোক্ত বোধক গুরুই কারণ স্বরূপ অর্থাৎ বোধক গুরুর প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রেরণা, সূচনা, বাচনা, প্রদর্শন ও শিক্ষা সমস্তই বিফল, প্রত্যুত ইহ পরলোকে বিষম বিপদের নিদান। এইজন্যই ভগবান্ ভূতভাবন বলিয়াছেন ঃ পিচ্ছিলাতন্ত্রে—

গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং নান্যঃ শিবতমঃ প্রভুঃ।
অতএব মহেশানি! যত্নতো গুরুমাশ্রয়েৎ॥

এই সাধনাশাস্ত্র কেবল গুরুমূলক, ইহাতে গুরু ভিন্ন অন্য কেহ কল্যাণকর প্রভু নহেন (অর্থাৎ অকল্যাণকর প্রভু অনেকেই হইতে পারেন)। মহেশ্বরি! অতএব সাধক যত্নপূর্ব্বক গুরুকে আশ্রয় করিবেন। রুদ্রযামলে—

গুরুং বিনা যস্তু মূঢ়ঃ পুস্তকাদিবিলোকনাৎ।
জপবন্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি ॥
ন মাতা ন পিতা ভ্রাতা তস্য কো বা গতিঃ প্রিয়ে।
গুরুরেকো বরারোহে। পাপং নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥
গুরুং বিনা যতন্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন।
অতএব প্রযত্নেন গুরুঃ কর্ত্তব্য উত্তমঃ ॥

গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে যে মূঢ় পুস্তকাদির অবলোকনে জপ নিয়মাদির আরম্ভ করে, পরমেশ্বরি। কেবল পাপলাভই তাহার ফল। কি মাতা কি পিতা কি ভ্রাতা কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। বরারোহে। একমাত্র গুরুই কেবল ক্ষণমধ্যে তাহার পাপরাশি বিনাশনে সমর্থ, যে হেতু গুরু ব্যতিরেকে তন্ত্রশাস্ত্রে কোন প্রকারেই অধিকার নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে উত্তম পুরুষকে গুরু করিবে। গুরুতন্ত্রে—

গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা রুষ্টে রুষ্টা চ সুন্দরী ॥
অতো গুরুর্মহেশানি। সংসারার্ণবলঙ্ঘনে।
কর্ত্তা পাতা চ হর্ত্তা চ গুরু র্মোক্ষপ্রদায়কঃ ॥

গুরু সন্তুষ্ট হইলে স্বয়ং শিব সন্তুষ্ট হয়েন, গুরু রুষ্ট হইলে ত্রিলোচন রুষ্ট হয়েন, গুরু তুষ্ট হইলে সর্ব্বমঙ্গলা তুষ্ট হয়েন এবং গুরু রুষ্ট হইলে ত্রিপুরসুন্দরী রুষ্টা হয়েন, অতএব মহেশ্বরি। গুরুই সংসারসাগর নিস্তারে একমাত্র কর্ত্তা রক্ষয়িতা সংহর্ত্তা এবং গুরুই মোক্ষপ্রদায়ক।

সাধক এক্ষণে বুঝিয়া লইবেন, উক্ত বচনপরম্পরায় গুরুতত্ত্ব শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা মানবতত্ত্ব কি দেবতত্ত্ব? জীবতত্ব কি ব্রহ্মতত্ত্ব? মানবদেহে সেই ব্রহ্মরূপ গুরুশক্তির আবির্ভাব হয় এই জন্য যদি গুরুদেব মানব হইয়া যান, তাহা হইলে ত মৃণ্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত দেবতারও মৃত্তিকা বা পাষাণ হইয়া যাইবার কথা। বস্তুতঃ যাহা গুরুর গুরুত্ব, তাহা অখণ্ড পূর্ণব্রহ্মত্ব। মৃত্তিকায় হউক পাষাণে হউক ব্রহ্মতত্ত্ব বিশ্বব্যাপী, তাহা কোথাও পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে। জড় মৃত্তিকা বা পাষাণেও যা পরিচ্ছিন্ন হয় না, সচেতন মানবে তাহা পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, ইহা বড়ই অসম্ভব কথা। ফলতঃ সাধক হইলে তখন তিনি নিজ সাধনা প্রভাবে জড় মৃণ্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিতে চিৎশক্তিকে জাগরূক করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি সাধকশ্রেণীতে পরিগণিতও নহেন, সাধনার অধিকার-প্রার্থী মাত্র তখন তাঁহার পক্ষে সে মৃণ্ময় মূর্ত্তি কখনও মৃণ্ময় ভিন্ন চিন্ময় নহে। তাই সে শক্তি লাভ করিবার জন্য তখন সচেতন অচেতন বিচার করিবার প্রয়োজন, সচেতন মধ্যেও সেই সচেতনের

প্রয়োজন যে সচেতন নিজ চেতনার উৎকট প্রভাবে অন্য অচেতনকেও সচেতন করিয়া দিতে পারেন। তাই গুরুকরণে শাস্ত্রে পাত্রাপাত্রের বিচার বিহিত হইয়াছে। অন্যথা মানবশক্তিই যদি গুরুশক্তি হইতেন তাহা হইলে মানবমাত্রকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইত, তাহার জন্য আর এত অন্তঃশক্তি বহিঃশক্তি পরীক্ষা করিবার আবশ্যক ছিল না। কুলাগমে—

তত্ত্বজ্ঞৈরুপদিষ্টা যে তত্ত্বজ্ঞা-স্তে ন সংশয়ঃ।
পশুভিশ্চোপদিষ্টা যে দেবি। তে পশবঃ স্মৃতাঃ॥
অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ।
শিলাং সন্তারয়েন্নৌ হিঁ ন শিলা তারয়েচ্ছিলাম্॥

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক যাঁহারা উপদিষ্ট তাঁহারাও তত্ত্বজ্ঞ হয়েন; ইহা নিঃসংশয়। পশুগণ কর্ত্তৃক যাঁহারা উপদিষ্ট, দেবি। তাঁহারাও পশু বলিয়াই জ্ঞেয়, কারণ অভিজ্ঞ (বিদ্বান্) ব্যক্তি মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু মূর্খ কখনও মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারে না, যেমন নৌকা শিলাকে নদীর পরপারে উত্তীর্ণ করিতে পারে কিন্তু শিলা কখনও শিলাকে পার করিতে পারে না। যিনি নিজে কখনও যে পথে পদার্পণ করেন নাই, তিনি কখনও অন্যকে সে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি কোন এক পথে গমন করিয়া সে পথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া সকল পথের শেষ গন্তব্য স্থান চিনিয়া লইয়াছেন, তিনি সেই সকল পথের মূল কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক পথের যাত্রীকেই আহ্বান করিয়া নিজস্থানে পৌঁছাইতে পারেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥
গাণপে গাণপঃ খ্যাতঃ কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥

শক্তিমন্ত্র বিষয়ে শাক্ত গুরু প্রশস্ত, শিবমন্ত্রে শৈব গুরু প্রশস্ত, বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণব গুরু প্রশস্ত, সূর্য্যমন্ত্রে সৌর গুরু প্রশস্ত, গণপতিমন্ত্রে গাণপত্য গুরু প্রশস্ত এবং কৌল গুরু এই সমস্ত মন্ত্র বিষয়েই সুপ্রশস্ত। অতএব জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বান্তঃকরণে কৌলের নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যেহেতু—

পশোর্ব্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাচ্চ ব্রহ্মবিদ্ ভবেৎ॥

পশু (পশ্বাচার) গুরুর মুখ হইতে যিনি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও পশু ইহা নিঃসংশয়। বীর (বীরাচার) গুরু হইতে যিনি লব্ধমন্ত্র, তিনিও বীর এবং কৌল (কুলাচার) গুরু হইতে যিনি লব্ধমন্ত্র, তিনি ব্রহ্মবেত্তা হইবেন। বৃহন্নীলতন্ত্রে—

শৈবোঽপি পরবিদ্যানামুপদেষ্টা ন সংশয়ঃ।
বৈষ্ণবঃ স্বমতস্থানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ ॥
গাণপত্যস্তু দেবেশি গণদীক্ষা-প্রবর্ত্তকঃ।
শৈবে শাক্তে চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ।
কৌলস্তস্মাৎ প্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥

শৈবও নিঃসংশয়রূপে অন্যমন্ত্রের উপদেষ্টা হইবেন। বৈষ্ণব নিজ-মতাবলম্বী (বৈষ্ণব) গণের উপদেষ্টা হইবেন; সৌর সৌরগণের উপদেষ্টা হইবেন, গাণপত্য গণপতিবিষয়ক দীক্ষার প্রবর্ত্তক হইবেন এবং শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি সকল বিষয়েই কৌলগুরু দীক্ষাস্বামী হইবেন। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক কুলতন্ত্রোপদেষ্টা গুরুকে আশ্রয় করিবে। সারদাতিলকে—

মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধভাবো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥
পরোপকারনিরতো জপপূজাদিতৎপরঃ।
অমোঘবচনঃ শান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
যোগমার্গার্থসন্ধায়ী দেবতাহৃদয়ঙ্গমঃ।
ইত্যাদিগুণসম্পন্নো গুরুরাগমসম্মতঃ ॥

পিতৃকুল এবং মাতৃকুল হইতে যিনি শুদ্ধদেহ, শুদ্ধভাব, জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত তন্ত্রের সারজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা, পরোপকারে নিরত, জপ-পূজাদি অনুষ্ঠানে তৎপর, সত্যবাদী অথবা নিজতপঃপ্রভাবে অব্যর্থবাক্য, শান্ত, বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী যোগমার্গের তত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং নিজহৃদয়ে দেবতার আবির্ভাব-বিশিষ্ট ইত্যাদি গুণসমূহে যিনি সম্পন্ন তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত গুরু। বিশ্বাসতন্ত্রে—

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্ম-পরায়ণঃ ॥
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে।

সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধায়ী, কার্য্যদক্ষ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ, সুবাক্য সুন্দর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কুলীন (কুলাচার) শুভদর্শন, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণ, প্রশান্তহৃদয় পিতা মাতার হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত, নিজকর্ত্তব্য সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী, আশ্রমী এবং দেশস্থায়ী এতাদৃশ গুরুই শাস্ত্রবিহিত। ব্রাহ্মণ-বিশেষণের বিশেষ নির্দ্দেশহেতু এস্থানে বুঝিতে হইবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন না। ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেম্বনুগ্রহং।
তদভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাৎ তেন কার্য্যশ্চ শূদ্রে নিত্যমনুগ্রহঃ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকালের অভিজ্ঞাতা ব্রাহ্মণ সমস্তবর্ণেরই মন্ত্রদীক্ষা-প্রদানরূপ অনুগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহার অভাবে শান্তাত্মা ভগবদ্ভাবময় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতিকে অনুগ্রহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় গুরুরও যদি অভাব হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত-গুণসম্পন্ন হইতে বৈশ্যও শূদ্রের প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ করিতে পারেন। শূদ্র অন্যজাতির দূরে থাক্, স্বজাতিরও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না। যথা শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং—

শূদ্রঃ শূদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।
গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥

শূদ্র যদি শূদ্রমুখ হইতে বিদ্যা শ্রবণ বা মহামন্ত্র গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি পরলোকে নরকে গমন করেন এবং ইহলোকে নিয়ত দুঃখভোগ করেন। বাসুদেব-রহস্যে—

শূদ্রঃ শূদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্।
কোটিবংশান্ সমাদায় রৌরবং প্রতিগচ্ছতি ॥
অপি দাতৃগ্রহীত্রোর্বা দ্বয়োরপি সমং ফলং।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি অক্ষরং চাক্ষরং প্রতি ॥

শূদ্র যদি শূদ্রমুখ হইতে বিদ্যা বা মন্ত্র শ্রবণ করেন তাহা হইলে তিনি নিজবংশীয় কোটিপুরুষকে সঙ্গে করিয়া রৌরব নরকের অভিমুখে যাত্রা করেন। এতাদৃশ মন্ত্রদাতা এবং মন্ত্রগ্রহীতা উভয়েই সমান ফলভাগী হইবেন। দানে এবং আদানে উভয়কেই অক্ষরে অক্ষরে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে। জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিণ্যাম্—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ ন চ শূদ্রঃ কদাচন।
উভয়ো নরকং দেবি। ত্রিকোটীকুল-সংযুতম্ ॥

শূদ্র কখনও শূদ্রকে মন্ত্র প্রদান করিবেন না, যদি করেন তবে মন্ত্রদাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই নিজ নিজ ত্রিকোটিকুলের সহিত নরক বাস করিবেন। কামধেনুতন্ত্রে—

যদ্দেশে বিদ্যতে শূদ্রঃ পাতকী মন্ত্রবিক্রয়ী।
তদ্দেশং পতিতং মন্যে তস্য রাজা চ পাতকী ॥
স কথং চঞ্চলাপাঙ্গি। জিহ্বায়াং প্রজপেন্নরঃ।
তস্য জিহ্বা বরারোহে। মূত্রশোণিতরিড়্‌যুতা ॥

তন্মুখং মূত্রবিড়্-রূপ-মন্নং বিষ্ঠাময়ং সদা।
তজ্জলং শোণিতং সাক্ষাৎ চণ্ডালসমজাতিষু ॥
আলোক্য তন্মুখং তীর্থ-স্তৎস্থানং ত্যজ্য গচ্ছতি।
তীর্থাঃ কোটিঃ পলায়ন্তে দৃষ্ট্বা তন্মুখমণ্ডলম্ ॥
গঙ্গা জলং পরিত্যজ্য দ্রুতং স্বস্থানমাপ্নুয়াৎ।
মহাপাতকিনো যে যে ব্রহ্মহত্যাদি-সংযতাঃ ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা তান্ পুনাতি ন সংশয়ঃ।
মন্ত্রবিক্রয়িণং শূদ্রং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥

মন্ত্রবিক্রয়কারী পাতকী শূদ্র যে দেশে বাস করে সেই দেশ পতিত হয় এবং তাহার রাজাও পাতকগ্রস্ত হয়েন। চঞ্চলাপাঙ্গি! সেই মহাপাপী কিরূপে জিহ্বায় মন্ত্র উচ্চারণ করিবে? বরারোহে! তাহার জিহ্বা মলমূত্রশোণিতপূর্ণ। তাহার মুখ বিণ্মূত্রস্বরূপ, তাহার অন্ন বিষ্ঠাময়, তাহার জল সাক্ষাৎ শোণিত এবং সে ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডালসদৃশ। তাহার মুখ দর্শন করিলে গঙ্গা নিজ-জল এবং অন্যান্য কোটি তীর্থ স্ব-স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। যে সকল মহাপাতকী ব্রহ্মহত্যাদি পাপে সংলিপ্ত, ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা নিঃসংশয় তাহাদিগকেও পবিত্র করেন, কিন্তু মন্ত্রবিক্রয়ী শূদ্রকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গুরুলক্ষণে যে আশ্রমী বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে গৃহস্থাশ্রম-বিশিষ্ট বুঝিতে হইবে। কুলার্ণব তন্ত্রে গুরুলক্ষণে কথিত হইয়াছে, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে। গুরু সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা এবং গৃহস্থ হইবেন। দেশস্থায়ী বিশেষণেরও উদ্দেশ্য এই যে গুরু অন্য দেশস্থ হইলে তাঁহার নিকটে নিয়ত উপদেশাদি গ্রহণ এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা শিষ্যের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে।

॥ গুরু বিচার ॥

পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ যোগিনীতন্ত্রে।

পিতার নিকটে, মাতামহের নিকটে, সহোদরের নিকটে, বয়ঃকনিষ্ঠের নিকটে এবং শত্রুপক্ষাশ্রিত গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। গণেশবিমর্ষিণ্যাং—

যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িনী ॥

যতির নিকটে, পিতার নিকটে, বনবাসীর নিকটে এবং সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সে দীক্ষা সাধকের কল্যাণদায়িনী নহে। রুদ্রযামলে—

ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতি-স্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে! ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥
মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ॥

ভর্ত্তা পত্নীকে দীক্ষিতা করিবে না। পিতা, কন্যা এবং পুত্রকে দীক্ষিত করিবেন না এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবেন না। কিন্তু পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হয়েন, তবে তিনি পত্নীকে নিজ শক্তিস্বরূপে দীক্ষিত করিতে পারেন, তাহাতে গুরুর মন্ত্রদানজন্য পিতৃত্ব এবং শিষ্যার মন্ত্রগ্রহণ জন্য কন্যাত্ব হইবে না। নিজ শক্তিস্বরূপে দীক্ষাপ্রদানের বিধানহেতু পতি কর্ত্তৃক পত্নীর দীক্ষা কেবল বীরাচারে এবং কৌলাচারেই বুঝিতে হইবে, পশ্বাচারাদিতে এরূপ দীক্ষা বিহিত নহে। কারণ পশ্বাচারাদিতে শক্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মন্ত্রস্থ বর্ণসকল দেবতা স্বরূপ এবং দেবতা স্বয়ং গুরুরূপিণী। অতএব সাধক সাধিকা যদি নিজ কল্যাণ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এই মন্ত্র দেবতা ও গুরুদেবে ভেদজ্ঞান করিবেন না। সিদ্ধিযামলে—

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণম্॥

প্রিয়ে! ভাগ্যবশতঃ সাধক নিজে যদি সিদ্ধমন্ত্র লাভ করেন তাহা হইলে সে স্থলে গুরু-বিচার ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মশক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন। যামলে—

ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতি-স্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ॥
শক্তিত্বেন বরারোহে! ন চ সা কন্যকা ভবেৎ।
পিতা তথাবিধঃ পুত্রং তদা দীক্ষাং সমাচরেৎ॥
ভ্রাতা সিদ্ধমনুর্ভূয়াদ্ গুরোর্ভ্রাতুস্তু শক্তিতঃ।
সিদ্ধমন্ত্রে নরঃ সর্ব্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ॥

ভর্ত্তা পত্নীকে দীক্ষিতা করিবেন না, পিতা কন্যাকে দীক্ষিতা করিবেন না। কিন্তু পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হয়েন তাহা হইলে তিনি নিজশক্তি-স্বরূপে পত্নীকে দীক্ষিতা করিতে পারেন, তাহাতে দীক্ষিতা কন্যা-স্থানীয়া হইবেন না। পিতা তদ্রূপ সিদ্ধমন্ত্র হইলে পুত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন ; ভ্রাতাও তথাবিধ ভ্রাতার নিকটে দীক্ষিত এবং তাঁহার

প্রভাবে সিদ্ধমন্ত্র হইতে পারেন, যেহেতু সিদ্ধমন্ত্রের দীক্ষা প্রদানে এবং গ্রহণে সমস্ত অযোগ্যতাই যোগ্যতায় উপনীত হয়। সিদ্ধমন্ত্র বলিতে যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে এইরূপ অর্থ নহে, এ স্থলে সিদ্ধমন্ত্র পারিভাষিক। যথা, ক্রমচন্দ্রিকায়াং—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
দীক্ষিতাস্তাসু যে নিত্যং সিদ্ধমন্ত্রাংস্তু তান্ বিদুঃ।

কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলাত্মিকা এই মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা, ইহাঁদিগের মন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারাই সিদ্ধমন্ত্র। কালীকল্পে—

সিদ্ধবিদ্যা মহাদেবি! যদি ত্রৈপুরুষং ভবেৎ।
সা এব পরমা বিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

মহাদেবি! যদি ত্রৈপুরুষ (প্রপিতামহ পিতামহ পিতা এই ত্রিপুরুষ-পরম্পরায় উপাসিত) মন্ত্র হয় তাহা হইলে সে মহামন্ত্র সিদ্ধ মন্ত্র হইবে। মৎস্যসূক্তে—

নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি।

পিতৃদত্ত মন্ত্র অন্য বিষয়ে নির্ব্বীর্য্য হইলে শৈব ও শাক্ত বিষয়ে দূষিত হইবে না।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিশেষ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপাত্র হইলে তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদান করিতে পিতার অধিকার আছে। যথা—

মৎস্যসূক্তে—নিজকুলতিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাৎ।
শ্রীক্রমে—মনুং বিমৃষ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে। ইত্যাদি।

॥ স্ত্রী-গুরু ॥

সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না জাপিকা পদ্মলোচনা।
রত্নালঙ্কারসংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা॥
শান্তা কুলীনা কুলজা চন্দ্রাস্যা সর্ব্ববুদ্ধিগা।
অনন্তগুণসম্পন্না রুদ্রত্বদায়িনী প্রিয়া॥
গুরুরূপা শক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরূপিণী।
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা॥

স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা।
পুত্রিণী বিধবা গ্রাহ্যা কেবলানন্দকারিণী॥
সিদ্ধমন্ত্রং যদি তদা গৃহ্ণীয়াদ্বিধবামুখে।
কেবলং সুফলং তত্র মাতুরষ্টগুণং স্মৃতম্॥
সধবা স্বপ্রবৃত্ত্যা চ দদাতি যদি তন্মনুং।
তত্রাষ্টগুণমাপ্নোতি যদি সা পুত্রিণী সতী॥
যদি মাতা স্বীয়মন্ত্রং দদাতি তনুজায় চ।
তদাষ্টসিদ্ধিমাপ্নোতি ভক্তিমার্গে ন সংশয়ঃ॥
তদেব দুর্ল্লভং দেবি। যদি মাত্রা প্রদীয়তে।
আদৌ ভুক্তিং ততো মুক্তিং সংপ্রাপ্য কামরূপধৃক্।
সহস্রকোটিবিদ্যার্থং জানাতি নাত্র সংশয়ঃ॥
স্বপ্নে বা যদি বা মাতা দদাতি চ স্বমন্ত্রকং।
পুনর্দ্দীক্ষাং সোঽপি কৃত্বা দানবত্বমবাপ্নুয়াৎ॥
যদি ভাগ্যবশেনৈব জননীচ্ছানুবর্ত্তিনী।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নাত্র মন্ত্রং বিচারয়েৎ॥ রুদ্রযামলে।

সাধ্বী সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া সমস্ত মন্ত্রের অর্থ এবং তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞা, সুশীলা ইষ্টদেবতার পূজনরতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নিয়ত জপপরায়ণা পদ্মলোচনা রত্নালঙ্কারসংযুক্তা স্বর্ণাভরণভূষিতা শান্তা কুলীনা (কুলাচাররতা) কুলজা (কৌল-বংশজাতা অথবা সৎকুলজাতা) চন্দ্রাস্যা নিখিলবুদ্ধিবৃত্তির অভিজ্ঞা অধিকগুণসম্পন্না এতাদৃশী স্ত্রী গুরুপদের যোগ্যা হইবেন। তাঁহার উপাসনাতেই সাধনশক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইবে। কিন্তু বিধবা হইলে তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইবে না। স্ত্রী গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত, বিশেষতঃ মাতার নিকটে দীক্ষিত হইলে তাহাতে অষ্টগুণ অধিক ফল হইবে। বিধবা যদি পুত্রবতী হয়েন তবে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। সিদ্ধ মন্ত্র হইলে সাধারণতঃই বিধবার নিকটে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কেবল দীক্ষার ফল মাত্র লাভ হইবে, কিন্তু মাতার নিকটে বিশেষ এই যে তাহাতে অষ্টগুণ ফল হইবে। দীক্ষার প্রার্থনা ব্যতিরেকে কেবল নিজ প্রবৃত্তি বশতঃ পুত্রবতী সতী সধবা যদি সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করেন তাহা হইলেও তাহাতে সাধারণ দীক্ষা অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ফল হইবে। মাতা যদি পুত্রকে নিজ উপাস্য মন্ত্র প্রদান করেন এবং পুত্র যদি তাহাতে ভক্তিমান্ হয়েন তাহা হইলে নিঃসংশয় অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে। দেবি। মাতার নিজ মন্ত্রে দীক্ষাই দুর্লভ, কিন্তু যদি মাতা নিজ মন্ত্র প্রদান করেন তাহা হইলে সাধক স্বেচ্ছাশরীরধারী হইয়া প্রথমে ভোগ এবং পরে মুক্তি লাভ করেন, সহস্রকোটি মন্ত্রের অর্থে তাঁহার নিঃসংশয় অভিজ্ঞতা জন্মে। স্বপ্নে

মাতা যদি নিজ মন্ত্র প্রদান করেন, অতঃপর পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করিলে সাধক দানবজন্ম লাভ করিবেন। ভাগ্যবশতঃ জননী যদি পুত্রের প্রার্থনায় অনুবর্ত্তিনী হইয়া দীক্ষা প্রদান করেন তাহা হইলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করিবেন। সে স্থলে আর মন্ত্রবিচারের প্রয়োজন নাই। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রেও গুরু বা মন্ত্রের বিচার নাই। রুদ্রযামলে—

স্বপ্নে তু নিয়মো নাস্তি দীক্ষায়াং গুরু-শিষ্যয়োঃ।
স্বপ্নেলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে সংস্কারেণৈব শুধ্যতি ॥

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে গুরু ও শিষ্যের বিচার নাই। স্বপ্নে যদি মন্ত্র লাভ করা যায় এবং সেই মন্ত্র যদি স্ত্রী-দত্ত হয় তাহা হইলে সংস্কার দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইবে। গুরুকরণ ব্যতিরেকে কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না। এজন্য স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে ও ঘটে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কুঙ্কুম দ্বারা বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া গ্রহণ কবিবে। যোগিনীতন্ত্রে—

স্বপ্নলব্ধে তু কলসে গুরোঃ প্রাণান্নিবেদয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্ ॥
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা বিফলং ভবেৎ। ইত্যাদি।

স্ত্রীগুরুর ধ্যান মন্ত্র স্তব কবচাদিও স্বতন্ত্র। সাধকবর্গ মাতৃকাভেদ ও গুপ্ত সাধন প্রভৃতি তন্ত্র হইতে তাহা অবগত হইবেন।

গুরু-বিচারে গুরুর বাহ্যলক্ষণ শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহারই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথামাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। এতদ্ভিন্ন কুলার্ণব কামাখ্যা রুদ্রযামল প্রভৃতিতে গুরুর যে সমস্ত অন্তর্লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আমরা তাহা স্পর্শও করিলাম না। কারণ সে সকল গুরুগভীর তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে আর একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ তাহার সকল কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবারও নহে। তৃতীয়তঃ আজকালকার শিষ্য সম্প্রদায় সে সকল কথার অর্থ বুঝিয়া গুরুবিচার করিবেন, এ আশা দূরে থাক, গুরুবর্গও তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন কি না সন্দেহস্থল; সুতরাং অনর্থক অবৈধ পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন।

গুরুকুল ও কুলগুরু।

পশুমন্ত্র-প্রদানে তু মর্য্যাদা দশ পৌরুষী।
বীরমন্ত্র-প্রদানে তু পঞ্চবিংশতি পৌরুষী ॥
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পঞ্চাশৎ পৌরুষী মতা।
ব্রহ্মযোগ-প্রদানে তু মর্য্যাদা শতপৌরুষী ॥ যোগিনীতন্ত্রে।

পশ্বাচারে মন্ত্র প্রদান করিলে গুরুকুলে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত মর্য্যাদা, বীরাচারে মন্ত্র প্রদান করিলে পঞ্চবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত, তন্মধ্যে আবার মহাবিদ্যাবিষয়ক মন্ত্র হইলে সমস্ত মহাবিদ্যাতেই পঞ্চাশৎ পুরুষ পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মযোগ প্রদানে শত পুরুষ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা।

পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ পাপমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥ পিচ্ছিলাতন্ত্রে।

পাপমোহিত হইয়া শিষ্য যদি পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করেন তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত তিনি ঘোর নরকে বাস করেন।

তস্মাদ্‌গুরোর্ব্বংশজাতং বয়োঽল্পমপি পণ্ডিতং।
গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরোঃ কুলম্ ॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে।

সেই হেতু গুরুবংশজাত বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষও যদি পণ্ডিত হয়েন, তবে গুরুকুলে বিচার না করিয়া তাঁহাকেই দীক্ষাকার্য্যে গুরুত্বে বরণ করিবে। অনেক তন্ত্রেই গুরুকুলের এইরূপ অপরিহার্য্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কালপ্রভাবে সেই নির্দ্দেশই আর্য্যসমাজের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ নির্দ্দেশ সর্ব্বনাশের হেতু হয় নাই, সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে কেবল গুরুকুলের আত্মম্ভরিতা এবং শিষ্যকুলের মূর্খতা। কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্রোভয়ত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

মন্ত্রত্যাগ করিলে মৃত্যু হইবে, গুরুত্যাগ করিলে দরিদ্রতা হইবে এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে সাধক রৌরব নরকে গমন করিবেন। আজকাল অনেকে এই বচনটিকেই গুরুকুল ত্যাগের নিষেধক বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন কিন্তু তান্ত্রিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে, সাধক নিজ গুরু এবং মন্ত্র ত্যাগ করিলেই পূর্ব্বোক্ত পাপভাগী হইবেন, কারণ যাহার গ্রহণ নাই তাহার ত্যাগ অসম্ভব। পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করিবে না ইহার অর্থ এই যে, গুরুকুলে গুরুকরণের উপযুক্ত পাত্র বিদ্যমান থাকিলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু আশ্রয় করিবে না। অন্যথা তখন গুরুকুলে শিষ্যের এমন কোন স্বত্বই হয় নাই যে, তিনি তাহা ত্যাগ করিবেন না; তবে ত্যাগ করিবেন না এ কথার অর্থ কি? যোগিনীতন্ত্রোক্ত বচনেও কেহ কেহ বলেন মর্য্যাদা শব্দের অর্থ সম্মান। তাঁহাদিগের পুরুষ-পরম্পরাকে গুরুত্বে বরণ না করিলেও পূর্ব্ব-পুরুষের গুরু বলিয়া সম্মান করিবে, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পৈতৃক গুরুবংশে গুরুকরণের যোগ্য পাত্র না থাকিলেও তাঁহাদিগকে গুরু করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তাহাই বিস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যে,

গুরুকুলে যদি কেহ বয়ঃকনিষ্ঠও হয়েন এবং তিনি পণ্ডিত হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকেই গুরু করিবে অর্থাৎ এতাদৃশ স্থলেই গুরুকুল অবিচার্য্য, তদ্ভিন্ন গুরুকুলের অনুরোধে অযোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ কতদূর ধর্ম্মসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত গুরুতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই বুঝিয়া লইবেন। বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও পণ্ডিত জ্ঞানক্রমে জ্যেষ্ঠ। জ্ঞানজ্যেষ্ঠতা লইয়াই জ্ঞানরাজ্যে সাধনাশাস্ত্রের বিচার। তাই পণ্ডিত কনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠ এবং সেই জ্যেষ্ঠতা-নিবন্ধনই তিনি দীক্ষাদানের অধিকারী। অতএব শিষ্যবর্গ এ স্থানে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, যে পাণ্ডিত্যের অনুরোধে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে সে পাণ্ডিত্য কোন উপাধিমূলক নহে, বরং জীবগত সমস্ত উপাধির সমূলনাশক। আজকাল যাঁহারা সংসার সমাজে পণ্ডিতমূর্ত্তির আদর্শ, সাধকসমাজে তাঁহাদের অধিকাংশই কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ঘোর অনভিজ্ঞ। তাই গুরুকুলে পণ্ডিত বলিলে বুঝিতে হইবে, যে বিদ্যা লইয়া গুরুর গুরুত্ব সেই বিদ্যায় পণ্ডিত হওয়া চাই। স্মৃতির ব্যবস্থা বা ন্যায়ের কূটবিচার লইয়া এ বিদ্যার পরিচয় নহে। তাই শিষ্যকে দেখিতে হইবে, লোকসমাজে তিনি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেও সাধন-বিদ্যায় পণ্ডিত কি না? ভারত সমাজের দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুবংশীয় সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষগণ প্রায়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাধনসিদ্ধ দৈবতেজঃও সেই সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন প্রায়শঃই সেই সকল বংশে কেবল নির্ব্বাপিত প্রদীপের দুর্গন্ধময় বর্ত্তিকার ন্যায় দুই একটি গুরু ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছেন। ইহাঁদের অত্যাচারে উৎপীড়নে সমাজ উৎসাদিতপ্রায়। ইহাঁরা মনে করেন যে, গুরুগিরিও দ্বিতীয় কৌলীন্য, কেননা শাস্ত্র বলিয়াছেন, কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ। তাহাদের দিন দিন যেরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত প্রশ্রয় বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং নিজ নিজ কর্ম্মতরুর যে সকল বিষময় ফল এতদিনে সুপক্ক হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বোধ হয় এ সকল গুরুর দক্ষিণান্তের আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। এরূপ দক্ষিণান্ত প্রাকৃতিক নিয়মে অবশ্যম্ভাবী হইলেও এস্থলে আমরা দুই একটি শাস্ত্রীয় কথা উত্থাপন করিব। কারণ এইরূপ গুরুদল মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আমরা শিষ্যকুলের মৌরসী পাট্টা পাইয়াছি। এখন আর কাহার সাধ্য আমাদের সে স্বত্ব লোপ করে? আমরা স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী যাহাই কেন না হই—শিষ্যের তাহা বিচার করিবার অধিকার নাই। কেননা, অবিচার্য্যং গুরোঃ কুলং। আমরা বলি, এ পাট্টা লিখিয়া দিল কে? যাঁহার রাজ্য তিনি পাট্টা দিবেন, তাহা দূরে থাক— পাছে এইরূপ জাল পাট্টা উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় অতি পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল ব্যবস্থার সাধারণ্যে প্রচার না থাকাতেই এই সকল সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠিয়াছে। গুরু বা শিষ্য যাঁহার ঐরূপ সংস্কার থাকে, তিনিই শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া নিজ কল্যাণ বিধানে সাবধান হইবেন। রুদ্রযামলে—

বর্জ্জয়েচ্চ পরানন্দরহিতং রূপবর্জ্জিতং।
নিন্দিতং রোগিণং ক্রূরং মহাপাতকিনং গুরুম্॥
অষ্টপ্রকারকুষ্ঠে চ গলৎকুষ্ঠিনমেব চ।
শ্বিত্রিণং জনহিংসার্থং সদার্থগ্রাহিণং তথা॥
স্বর্ণবিক্রয়িণং চৌরং বুদ্ধিহীনং সুখর্ব্বরং।
শ্যাবদন্তং কুলাচাররহিতং শান্তিবর্জ্জিতম্॥
সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগং।
অসংস্কারপ্রবক্তারং স্ত্রীজিতং চাধিকাঙ্গকম্॥
কপটাত্মানমেবঞ্চ বিনষ্টং বহুজল্পকং।
বহ্বাশিনং হি কৃপণং মিথ্যাবাদিনমেব চ॥
অশান্তং ভাবহীনঞ্চ পঞ্চাচারবিবর্জ্জিতং।
দোষজালৈঃ পূরিতাঙ্গং পূজয়েন্ন গুরুং বিনা॥

ব্রহ্মানন্দরহিত রূপবর্জ্জিত নিন্দিত রোগী ক্রূর ও মহাপাতকী এতাদৃশ গুরুকে বর্জ্জন করিবে। অষ্টপ্রকার কুষ্ঠমধ্যে গলৎকুষ্ঠবিশিষ্ট এবং শ্বিত্রী, অভিচারিক উপায়ে সর্ব্বদা লোকহিংসার জন্য অর্থগ্রাহী, স্বর্ণবিক্রয়ী, চৌর, নির্ব্বুদ্ধি, নিতান্ত খর্ব্ব, শ্যাবদন্ত (সম্মুখস্থ দন্তদ্বয়ের মধ্যে যাঁহার ক্ষুদ্র দন্ত আছে), কুলাচাররহিত, শান্তিবর্জ্জিত, কলঙ্কবিশিষ্ট, নেত্ররোগপীড়িত, পরদারগামী, অশুদ্ধভাষী, স্ত্রৈণ, অধিকাঙ্গ (অতিরিক্ত-নখাদিবিশিষ্ট), কপটাত্মা, বিনষ্ট (ধর্ম্মভ্রষ্ট), বহুজল্পক, বহ্বাশী, কৃপণ, মিথ্যাবাদী, অশান্ত, ভাবহীন (ভক্তিহীন), পঞ্চাচারবিরহিত এবং বহুদোষযুক্ত, গুরুব্যতিরিক্ত এতাদৃশ ব্যক্তিকে পূজা করিবে না অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের পর গুরু যদি এই সকল দোষযুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া পূজা করিবে। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনও গুরুপদে বরণ করিবে না। কল্পচিন্তামণৌ—

ক্ষয়রোগী চ দুশ্চর্ম্মা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
কর্ণান্ধঃ কুসুমাক্ষশ্চ খল্বাটঃ খঞ্জরীটকঃ॥
অঙ্গহীনোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পূতিনাসিকঃ।
বৃদ্ধাণ্ডো বামনঃ কুব্জঃ শ্বিত্রী চৈব নপুংসকঃ॥
ইত্যাদ্যৈ র্দেহজৈ র্দোষৈঃ সংযুক্তো নিন্দিতো গুরুঃ।
সংস্কাররহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াশূন্যঃ শুষ্কভাষঃ সুকুৎসিতঃ।
পুরযাজনজীবী চ নরো বৈদ্যশ্চ কামুকঃ॥

ক্রূরো দম্ভী মৎসরী চ ব্যসনী কৃপণঃ খলঃ।
কুসঙ্গী নাস্তিকো ভীতো মহাপাতকচিহ্নিতঃ॥
দেবাগ্নিগুরুবিদ্যাদি-পূজাবিধিপরাঙ্মুখঃ।
সন্ধ্যাতর্পণ-পূজাদি-মন্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ॥
আলস্যোপহতো ভোগী ধর্ম্মহীন উপশ্রুতঃ।
ইত্যাদ্যৈ র্ব্বহুভি র্দোষৈ-রাগমোক্তৈশ্চ যত্নতঃ।
বর্জ্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈ দীক্ষাসু স্থাপনাদিষু॥

ক্ষয়রোগী (ক্ষয়কাস রোগগ্রস্ত) দুশ্চর্ম্মা (চর্ম্মরোগবিশিষ্ট) কুনখী শ্যাবদন্ত কর্ণান্ধ (বধির) কুসুমাক্ষ (চক্ষুতে যাঁহার ফুলি পড়িয়াছে) খল্বাট (কেশহীন) খঞ্জরীটক (খঞ্জ) অঙ্গহীন অতিরিক্তাঙ্গ পিঙ্গাক্ষ পূতিনাসিক (যাঁহার নাসিকা নিয়ত দুর্গন্ধময়) বৃদ্ধাণ্ড (যাঁহার কোষবৃদ্ধি আছে) বামন কুব্জ শ্বিত্রী নপুংসক (ব্যর্থ-বীর্য্যাদি) ইত্যাদি দেহজ দোষরাশিসংযুক্ত হইলে গুরু নিন্দিত হইবেন। দেহজ দোষের উল্লেখ করিয়া আবার কর্ম্মজ দোষের নির্দ্দেশ করিতেছেন—বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াহীন শুষ্কভাষী লোকনিন্দিত গ্রামযাজনজীবী বৈদ্য-ব্যবসায়ী কামুক ক্রূর দাম্ভিক মৎসরী ব্যসনাসক্ত কৃপণ খল কুসঙ্গী নাস্তিক ভীত মহাপাতকচিহ্নিত, দেবতা অগ্নি গুরু এবং মহাবিদ্যা প্রভৃতির উপাসনা-পরাঙ্মুখ, সন্ধ্যা তর্পণ এবং পূজাদির মন্ত্রজ্ঞান-বিবর্জ্জিত, আলস্যোপহত ভোগাসক্ত ধর্ম্মহীন এবং উপশ্রুত (দৈবজ্ঞাদি-ব্যবসায়জীবী) ইত্যাদি বহুদোষ এবং এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত দোষ আগমে উক্ত হইয়াছে সেই সকল দোষযুক্ত হইলে প্রাজ্ঞগণ দীক্ষা গ্রহণ এবং দেবতাস্থাপনাদি কার্য্যে তাদৃশ গুরুকে যত্ন পূর্ব্বক ত্যাগ করিবেন। কামাখ্যাতন্ত্রে—

জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্‌ জ্ঞানং পরাৎপরং।
অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষম-স্তং ত্যজেদ্ গুরুম্॥
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সন্ত্যজতি প্রিয়ে॥ ১॥
জ্ঞানত্রয়ং যদা ভাতি স গুরুঃ শিব এব হি।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ॥ ২॥
জ্ঞানাদ্ধর্ম্মো ভবেন্নিত্যং জ্ঞানাদর্থো হি পার্ব্বতি।
জ্ঞানাৎ কামমবাপ্নোতি জ্ঞানান্মোক্ষো হি নির্ম্মলঃ॥ ৩॥
জ্ঞানং হি পরমং বস্তু জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।
জ্ঞানায় ভজতে দেবং জ্ঞানং হি তপসঃ ফলম্॥ ৪॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥ ৫॥

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্‌গুরুর্দ্দেবি শিষ্যহৃত্তাপহারকঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ইতি মত্বা সাধকেন্দ্রো গুরুতাং কল্পয়েৎ সদা।
জ্ঞানিন্যেব শিষ্যভক্ত্যা কেবলং নিশ্চিতং শিবে ॥ ৭ ॥
শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥
সিদ্ধোঽসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে। ॥ ৯ ॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং বক্তি সাধু মনোহরং।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং বক্তি য এব সদ্‌গুরুশ্চ সঃ ॥ ১০ ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ ॥ ১১ ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতং।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তি র্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥
ইত্যাদিগুণসম্পত্তিং দৃষ্ট্বা দেবি! গুরুং ব্রজেৎ।
ত্যক্ত্বাঽক্ষমং গুরুং শিষ্যো নাত্র কালবিচারণা ॥ ১৩ ॥
কেবলং শিষ্যসম্পত্তি-গ্রাহকো বহুমারকঃ।
ব্যঙ্গিতশ্চ সমক্ষে যো লোকৈর্নিন্দ্যো গুরুর্মতঃ ॥ ১৪ ॥
কায়েন মনসা বাচা শিষ্যং ভক্তিযুতং যদি।
দৃষ্ট্বানুমোদনং নাস্তি তস্য তত্ত্বস্তুকামতঃ ॥
কর্ম্মণা গর্হিতেনৈব হন্তি শিষ্যধনাদিকং।
শিষ্যাহিতৈষিণং লোভাদ্ বর্জ্জয়েৎ তং নরাধমম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞান হইতেই জীব মোক্ষ লাভ করে, জ্ঞানই পরাৎপর। অতএব সেই জ্ঞানদানে যিনি সক্ষম নহেন তাদৃশ গুরুকে ত্যাগ করিবে, অন্নাকাঙ্ক্ষী ক্ষুধার্ত্ত যেমন নিরন্ন গৃহস্থকে ত্যাগ করে ॥ ১ ॥ যাঁহাতে জ্ঞানত্রয়—বীর দিব্য কৌল, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, গুরু মন্ত্র দেবতা, মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা-জ্ঞান দেদীপ্যমান, সেই গুরু সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ জ্ঞানী গুরুর শরণাপন্ন হইবে ॥ ২ ॥ জ্ঞান হইতে নিয়ত ধর্ম্ম, জ্ঞান হইতে অর্থ, জ্ঞান হইতে কাম এবং জ্ঞান হইতে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥ জ্ঞানই পরম বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা সারতর আর কিছু নাই, জ্ঞানের নিমিত্তই জীব দেবতার উপাসনা করে, জ্ঞানই তপস্যার চরম ফল ॥ ৪ ॥ মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ

যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও তদ্রূপ গুরু হইতে গুর্ব্বান্তরের শরণাগত হইবেন ॥ ৫ ॥ শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু অনেক আছেন, কিন্তু দেবি! শিষ্যের হৃত্তাপ-হারক সদ্‌গুরুই দুর্লভ ॥ ৬ ॥ জ্ঞানময় অঞ্জনশলাকার দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জীবের চক্ষু যৎকর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম—ইহাই মনে করিয়া অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত গুরুর দায়িত্ব অবগত হইয়া সাধকেন্দ্র, জ্ঞানী-পুরুষেই গুরুত্ব কল্পনা করিবেন, শিবে! অতঃপর কেবল শিষ্যের ভক্তিপ্রভাবেই নিশ্চয় সিদ্ধি হইবে ॥ ৭ ॥ যিনি শান্ত দান্ত কুলীন সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ এবং পঞ্চতত্ত্বের উপাসক তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ৮ ॥ ইনি সিদ্ধ পুরুষ এইরূপে যিনি বিখ্যাত, বহু উপায় দ্বারা শিষ্যবর্গের পরিপালক এবং দৈবশক্তি প্রভাবে চমৎকারকারী, তিনিই সদ্‌গুরু বলিয়া কথিত ॥ ৯ ॥ যিনি বিশুদ্ধ এবং মনোহররূপে অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অভিমত বাক্য প্রয়োগ করেন, তন্ত্র এবং মন্ত্র উভয়কে যিনি তুল্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ১০ ॥ যিনি সর্ব্বদা শিষ্যের জ্ঞানপ্রদান দ্বারা হিতসাধনে ব্যাকুল এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ১১ ॥ পরমার্থে যাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি, পরমার্থতত্ত্বকীর্ত্তনে যিনি নিয়ত তৎপর এবং গুরুচরণাম্বুজে যাঁহার একান্তভক্তি, তিনিই সদ্‌গুরু ॥ ১২ ॥ দেবি! ইত্যাদি গুণ-সম্পত্তি বিশিষ্ট গুরুকে লাভ করিলে শিষ্য অক্ষম গুরুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরণাগত হইবে, তাহাতে কালবিচারেরও অপেক্ষা নাই ॥ ১৩ ॥ কেবল শিষ্যের সম্পত্তিগ্রাহী বহুমারক (দীক্ষাচ্ছলে বহুশিষ্যের ধনাদি অপহারক) এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লোকে যাহাকে ব্যঙ্গ করে তাদৃশ গুরু নিন্দনীয় ॥ ১৪ ॥ কায়-মনোবাক্যে ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে দেখিয়াও তাহার কোন বস্তুতে কামনাবশতঃ যদি তাহাকে অনুমোদন না করে এবং গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি শিষ্যের ধনাদি নষ্ট করে তাহা হইলে লোভবশতঃ শিষ্যের অহিতাকাঙ্ক্ষী তাদৃশ নরাধমকে ত্যাগ করিবে ॥ ১৫ ॥

সাধকবর্গ এক্ষণে দেখিয়া লইবেন, গুরুকুল যদি অবিচার্য্য হয় তবে এ সকল বিচার কাহার জন্য? সকল বচনেই বলিতেছেন এতাদৃশ গুরুকে বর্জ্জন করিবে, কিছু না কিছু গুরুত্ব যাঁহার না আছে তাঁহাকে বর্জ্জন বা ত্যাগ অসম্ভব। সে গুরুত্ব আর কিছুই নহে, পূর্ব্বপুরুষের গুরুকুলে জন্মিয়াছেন, এ জন্য কুল-গুরুত্ব, যথাশাস্ত্র গুণসম্পন্ন হইলে অন্য গুরুকে আশ্রয় না করিয়া তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিবে অন্যথা পরিত্যাগ করিবে, এই পর্য্যন্তই শাস্ত্রার্থ। বিচারক নিজে রাজা না হইলেও নিজগুণে রাজার প্রতিনিধি এবং সেই রাজশক্তিপ্রভাবেই তাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় এবং তিনি সাধারণের পূজ্য—ইহাই রাজনীতির অনুশাসন। এই অনুশাসন বলেই তিনি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা এবং রাজ্য তাঁহার শাসনার্হ। তিনি রাজার নিয়োগ পালন করেন বলিয়াই সকলে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে এবং রাজভাণ্ডারে প্রদেয় নিজ নিজ

রাজকর বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার করে সমর্পণ করে। কিন্তু তিনি যদি আত্মম্ভরি বা স্বার্থপর হইয়া সেই রাজস্ব আত্মসাৎ করেন বা রাজনীতিকে পদদলিত করিয়া নিরপরাধ প্রজার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে সে রাজ্য যেমন তাঁহার উৎপীড়নে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার কথা, গুরুর অত্যাচারেও শিষ্য-সম্প্রদায়ের তদ্রূপ উৎসন্ন হইবার কথা। রাজনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বিচারক রাজনীতিরই বিচারক, কিন্তু ধর্ম্মনীতির উপরে তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলেই সমগ্র সাম্রাজ্যমণ্ডল যেমন এক হুহুঙ্কারে প্রতিধ্বনি দিয়া বিদ্রোহের জ্বলন্ত অনলে অনন্ত আহুতি দিতে অগ্রসর হয় তদ্রূপ গুরু কেবল ধর্ম্ম-নীতির বিচারক। তিনি সংসার নীতির কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেই শিষ্যবর্গের বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবার কথা, হইয়াছেও তাহাই। কিন্তু শুভ-সংবাদ এই যে—ত্রৈলোক্য-রাজরাজেশ্বরী এ বিচারক নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছেন প্রজাপুঞ্জের হস্তে। এখন প্রজা যদি দস্যুকে বিচারক নির্ব্বাচন করেন, তাহাতে সম্রাজ্ঞীর কোন দোষ নাই। একে ত দস্যুর অত্যাচারে ইহ-পরলোকের সারসর্ব্বস্ব-সম্পত্তি পরমার্থ হারাইতে হইবে, তাহার পর রাজকরও রাজার ভাণ্ডারে পৌঁছিবে না। পরমেশ্বরীর উদ্দেশে পরমগুরু বলিয়া যাঁহার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে, তিনি তাহা আত্মসাৎ করিবেন কিন্তু রাজনীতির প্রচণ্ড প্রতাপে তোমার আমার নরকদণ্ড খণ্ডিত হইবার নহে। বিচারকের যেমন দুইটি মূর্ত্তি আছে, একটিতে তিনিও তোমার আমার মত রাজার প্রজা, অন্যটিতে তোমার আমার বিচারকর্ত্তা রাজার প্রতিনিধি; তদ্রূপ গুরুরও দুইটি মূর্ত্তি আছে, একটিতে তিনিও তোমার আমার মত মায়ামোহবিশিষ্ট দশেন্দ্রিয়-সমাযুক্ত জীব-স্বরূপ, অন্যটিতে মায়াতীত ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্ম শিব-স্বরূপ। রাজশক্তি লক্ষ্য করিয়া যেমন বিচারকের হস্তে রাজকর-সমর্পণ, ব্রহ্মশক্তি লক্ষ্য করিয়াও তদ্রূপ গুরুদেবের স্বরূপে পরম দেবতার উপাসনা। কিন্তু রাজশক্তির বিরোধি-গুণাবলম্বী বিচারকের হস্তে রাজকর সমর্পণ করিলে তাহা যেমন রাজশক্তিতে সমর্পিত না হইয়া প্রজাশক্তিতেই সমর্পিত হয় তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তির বিপরীত গুণাবলম্বী গুরুর হস্তে রাজরাজেশ্বরীর উপাসনা সমর্পিত হইলেও তাহা ব্রহ্মশক্তিতে সমর্পিত না হইয়া দস্যু-শক্তিতেই সমর্পিত হইবার কথা। তাই ব্রহ্মাণ্ড রাজনীতির প্রচার-কর্ত্তা রাজরাজেশ্বর স্বয়ং গুরু নির্ব্বাচন-বিধানে সমগ্র প্রজামণ্ডলে ঘোষণা করিয়াছেন, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে—

> অসম্মতস্তু লোকৈ র্য স্তত্র রুষ্টঃ সদাশিবঃ।
> রাজস্বং দীয়তে রাজ্ঞে প্রজাভির্মণ্ডলাদিভিঃ॥
> যথা তথৈব তস্মৈ তু শিষ্যদানসমর্পণং।
> অত্রৈব গ্রাহকা হিংস্রা মণ্ডলাদ্যাঃ স্মৃতা যদি॥
> অন্যদ্বারেণ দাতব্যং তাংস্ত্যান্ সন্ত্যজ্য সর্ব্বদা।

যিনি সর্ব্বসাধারণের অসম্মত পাত্র তাঁহার প্রতি সদাশিব স্বয়ং রুষ্ট। প্রজাবর্গ যেমন মণ্ডল বিচারক বা রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষক প্রভৃতির নিকটে রাজস্ব সমর্পণ করেন, শিষ্যগণও তদ্রূপ গুরুদেবের নিকটে ইষ্টদেবতার উপাসনা সমর্পণ করেন। কিন্তু সেই সকল মণ্ডল প্রভৃতি রাজপুরুষগণ যদি স্বয়ং গ্রাহক বা হিংস্রক হয়েন তাহা হইলে যেমন ঐ সকল হিংস্রক প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ বিশ্বস্ত সৎপাত্রে রাজকর অর্পণ করিতে হয় তদ্রূপ শিষ্যগণও হিংস্রক বা আত্মম্ভরি অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ-দৈবশক্তিহীন ষড়্‌বর্গবিজিত নরমাত্র গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার চরণে নিজ সাধন সমর্পণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, গুরুকুল। তুমি কুলগুরু কাহার প্রসাদে? চরাচর গুরুর আদেশবাহী বলিয়াই ত তুমি গুরু, যাঁহার রাজনীতির বলে তুমি সমগ্র রাজ্যের দণ্ডধর সেই রাজরাজেশ্বর আজ স্বয়ং তোমার প্রতি দণ্ডধর। তোমার নিকটে দণ্ডিত হইয়া আমি অন্য বিচারকের অধানস্থ প্রদেশে গিয়া বাস করিতে পারি, কিন্তু তুমি যাঁহার নিকটে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছ, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া তুমি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? অন্তর্মহীং বা যদি বোর্দ্ধমুৎপতেঃ সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি—স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেখানে কেন ধাবিত না হও সেইখানেই দেখিবে বিরূপাক্ষের বিশাল শূল তোমার বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া অমোঘ উদ্যত রহিয়াছে। মূর্খ শিষ্য তোমার ভয়ে ভীত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার ভয়ে চন্দ্র সূর্য্য দেদীপ্যমান, বায়ু বহমান, যম নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-ভৈরবের জ্বলন্ত কোপাগ্নিমণ্ডলে তুমি কোন্ নগণ্য পরমাণুপরিমিত কীটানুকীট? শিষ্য সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার অব্যাহতি আছে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত দস্যুগুরু! তোমার নিস্তার নাই। বিচারক! মূর্খ প্রজা আমি, আমার নিকটে তুমি বিচারক না হইয়াও বিচারক কিন্তু রাজার নিকটে একজন ঘোরাপরাধী প্রজা বই আর কিছুই নও, আর যদি বিচারক বলিয়াই অভিমান থাকে তবে একজন সাধারণ প্রজা চোর হইলে তাহার যে দণ্ড হইবে, মনে কর বিচারক স্বয়ং চোর হইলে সে স্থলে কি হওয়া উচিত? তাই বলি, কলির দূত গুরুকুল! শিষ্যের কুলগুরু বলিয়া আর মৌরসী পাট্টা দেখাইতে যাইও না। রাজকর আত্মসাৎ করা যদি রাজপুরুষের লক্ষণ হয়, বলিতে পার তবে দস্যুবৃত্তি কাহার নাম? পূজ্যপাদ গুরুকুল! জানিও, বড় দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াই বলিতেছি—আজ তোমার যে দুর্ম্মতির এবং যে দুর্গতির দিন আসিয়াছে তাহাতে কুলগুরু দূরে থাকুক তোমাকে গুরুকুল বলিতেও লজ্জা হয়। আজ গুরুর কুলের সন্তান কি না যাত্রার দলে সং দেন, নাটকে নায়িকা সাজেন, যণ্ডামার্কের শিষ্য সাজিয়া চণ্ডালগুরুর পদস্পর্শ করেন, আবার তিনিই আসিয়া শরুকদে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্রে পদস্থাপন করিয়া মহাশক্তির মহামন্ত্রপূত সচ্চন্দন

পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন। হা জগদম্বে! এ সময় মা তুমি কোথায়? অথবা মা সর্ব্বত্র, আমরাই কোথায়? মা যদি সর্ব্বত্র না থাকিতেন, মায়ের দৃষ্টি যদি সর্ব্বত্র বিস্ফারিত না হইত, মায়ের আজ্ঞা যদি সর্ব্বত্র প্রচণ্ড প্রভাবে নিজশক্তি বিস্তার না করিত তাহা হইলে কি আজ ভারতের মুকুটমণি আর্য্যাবর্ত্তের শিরোরত্ন সিদ্ধসাধক গুরুবংশ এইরূপে নির্ব্বংশ হইত? সর্ব্বার্থসাধিকার সাধককুল সাধনার অভাবে অর্থের জন্য এইরূপে নির্ম্মূল হইত? উগ্রতপা ব্রাহ্মণের সন্তানগণ এইরূপে কর্ম্মচণ্ডাল সাজিত? অন্ধকার গৃহকক্ষে অন্ধের কোন দুঃখ নাই, কিন্তু চক্ষুষ্মানের গৃহে প্রদীপ নিভিলেই বিষম বিভীষিকা। অনাচারে অনার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাধকের বংশে সাধনার অভাব হইলেই উৎসন্ন যাইবার কথা। তাই গুরুকুল! আজ তোমার ভিটায় দিনে দুই প্রহরে ঘুঘু চরিতেছে আর ধর্ম্ম তাহা বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু কি মোহমদিরা-পানেই তুমি মজিয়াছ যে, তোমার মুদ্রিত নেত্র কিছুতেই আর উন্মীলিত হইবার নহে! আবার তুমিই কি না শিষ্যকে তোমার প্রণামের মন্ত্র শিখাইয়া দাও, 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥' মহাশ্মশানবাসিনি মা! ভৈরবদলে আজ্ঞা দাও—তাঁহারা এই পাপ ভস্মরাশি উড়াইয়া দিয়া সচ্চিদানন্দ-চিতাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ভারতের গভীর গাঢ় অজ্ঞান অন্ধকার বিদীর্ণ করুন। মাতৃহারা সন্তানের দল এ ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেও আপন আপন পরিচিত পথ দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া, মা! তোমার ঐ কোটি-শারদচন্দ্র-সুন্দর চারুচরণ-সরোরুহে চিরশান্তি লাভ করুক।

॥ গুরুগিরি ॥

ভারতের রাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-বিপ্লবের সৃষ্টি। গুরুগিরি শব্দের অর্থ গুরুত্ব ব্যবসায় বা গুরুত্ব-উপজীবিকা। অর্থ উপার্জ্জনের যে সকল পথ আছে তাহার মধ্যে গুরুগিরি ব্যবসায় আজকাল একটি প্রধান এবং প্রশস্ত পথ। এই পথে আসিয়া পরমার্থের সহিত অর্থের যোগ এবং উভয়ের যোগে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু পরমার্থের সহিত অর্থের যোগই আদৌ হয় নাই। তাই এ অনর্থের সৃষ্টি, পরমার্থের সহিত অর্থ যুক্ত হইলে তাহাতে বরং সকল অনর্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবারই কথা। যাহা হউক, এই ব্যবসায়ী গুরুসম্প্রদায় সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, একটি প্রভু অন্যটি বিভু। তাহার পর আর এক সম্প্রদায় আজকাল আসরে নামিয়াছেন—ইঁহারা আবার স্বয়ম্ভু। প্রথম দুই দলের মধ্যে কোন্ দল কি এবং কে, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভুদিগের কৃপাতেই

প্রভু নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন কাহারও একটা কিছু হইলেই লোকে তাহাকে অমনি বলে ইনি একটি প্রভু। বিভুর দল ত বিভু দেখাইয়া দেখাইয়া এখন নিজেরাই বিভু দেখিতে বলিয়াছেন।

ভাল মন্দ যাহাই হউক, এ দুই দলেরই প্রথম সৃষ্টি শাস্ত্রমূলক। ইহার পর তৃতীয় দল আবার কোন শাস্ত্রেরই ধার ধারেন না, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। ইঁহারা যোগ দেন। পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদির মধ্যে অনেক চেষ্টায় কদাচিৎ কোন স্থানে এক আধটি যোগীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও কত শত বৎসর তপস্যা করিয়া মুনি ঋষি উপাধি পাওয়ার শত সহস্র বৎসর পরে তবে কোন দেবতার বা দেবসদৃশ কোন যোগীন্দ্র পুরুষের নিকটে যোগদীক্ষা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল ঘাটে মাঠে যোগীর হাট বসিয়াছে, প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় অমুকবাবু, অমুকবাবুর নিকটে যোগ লইয়াছেন। যে যোগীর যোগভঙ্গভয়ে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা, ভুবনমোহন রূপের ছটা অন্তর্হিত করিয়া কেহ পশু কেহ পক্ষিণী রূপ ধারণ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে পালাইতেন, আজ কি না পিশাচ-সহচরী বারবিলাসিনীর উচ্ছিষ্টচণ্ডাল বিলাসবিহ্বল দেবধর্ম্মপরাঙ্মুখ উপ-নাস্তিকের দল সেই যোগীর পদে অভিষিক্ত। কলিরাজ! ধন্য তোমার অমোঘ প্রভাব! এ যোগে কোন দেবতার নাম নাই, রূপ নাই, মন্ত্র নাই, এক কথায় বলিতে গেলে উপাসনার সঙ্গে বড় একটা সংস্রব কিছু নাই। তাহার পর জাতিভেদ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ সকলের ত সম্বন্ধই নাই। ইহার সাধনা—শ্বাস প্রশ্বাস আর সিদ্ধি—ক্ষয়কাস যক্ষ্মাকাস। আজকাল বড় বড় স্থানে এরূপ সিদ্ধপুরুষ প্রায়ই দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকের ত অভাবই নাই। আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণজ্ঞানবিবর্জ্জিত বিকৃতমস্তিষ্ক সমাজ-পরিত্যক্ত বিলাসী সম্প্রদায়ই প্রায়শঃ এ পথের পথিক। সর্ব্বনাশের কথা এই যে, ইঁহারা এবং ইঁহাদিগের গুরু ও গুর্ব্বী সম্প্রদায় আবার আর্য্যধর্ম্মের ধ্বজাধারী। ততোধিক সর্ব্বনাশের সূত্রপাত এই যে, পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানে স্ফীতবক্ষা অন্তঃসারশূন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অথচ ঘোর আলস্যপরতন্ত্র যুবকদল এই যোগ শিক্ষার জন্য বিশেষ লালায়িত; কেননা এরূপ নির্ব্ব্যয় নিষ্পরিশ্রম ধর্ম্মের এই অভিনব আবিষ্কার। এই সুযোগের যোগে যোগ দিবার জন্য যুবকদল প্রায়ই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যাগত হইলে প্রায়ই তাঁহাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় অমুক পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে তাহার শিখরে গিয়া দেখিলাম, একটি গিরিগুহার মধ্যে একজন জ্যোতির্ম্ময় যোগীন্দ্র পুরুষ সমাধিস্থ রহিয়াছেন; দেখিয়া আমার প্রাণ যেন গলিয়া গেল। আমি নিঃশব্দে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম, কিয়ৎকাল পরে যোগী ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন। আমি আবার প্রণাম করিলাম, মহাপুরুষ অমনি আমার

দিকে চাহিয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, বৎস! আসিয়াছ? তোমার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। তোমার সমস্ত অবস্থা আমি যোগবলে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। হিমালয়ে আমার গুরু আছেন—ঐ শুন! তিনি বলিতেছেন বৎস! তোমার নিকটে একজন ভবিষ্য যোগী উপস্থিত হইয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধক! ভূতযোগীর মুখে যে ভবিষ্যযোগীর কথা শুনিলেন, ইনিই আমাদের বর্ত্তমান যোগী। আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, বনের মধ্যে বসিয়া যোগী বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন, আর হরিণ ব্যাঘ্র, হস্তী, সিংহ, ইহারা গলাগলি ধরিয়া তাহা শুনিতে শুনিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যোগী সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু সোহাগের বীণাটি ছাড়িতে পারেন নাই। বলা অধিক যে, বক্তা যোগীরও একটি বীণা আছে। এই সকল ঔপন্যাসিক যোগীর দল দিন দিন মূর্খ সম্প্রদায়ে প্রভুত্ব পাইয়া কুহকজাল বিস্তারে ক্রমে বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি পর্য্যন্তও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। লঙ্কার মায়াবী মহীরাবণ আর কোন উপায় না পাইয়া শেষে যেমন বিভীষণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হনুমানকে বঞ্চনা পূর্ব্বক কটকমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবান রঘুনাথ ও লক্ষ্মণদেবকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, এই মায়াবী নাস্তিকের দলও তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া বুদ্ধিমানের বিশ্বস্ত হৃদয় পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ ও বঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃত সিদ্ধিসাধনাময় আর্য্যধর্ম্মকে রসাতলে লইয়া যাইবার ফাঁদ পাতিয়াছে। আর্য্যসমাজ! এখনও বলিতেছি, মহীরাবণের মুখে ভক্তচূড়ামণি বিভীষণের কথা আর শুনিবার প্রয়োজন নাই। দেবদ্বেষী বেদদ্বেষী ধর্ম্মদ্বেষী অনার্য্যের নিকটে যোগ শিক্ষার কথা শুনিয়া আর ভুলিও না। তুমি হনুমানের মত দ্বারে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবে, কিন্তু মহীরাবণ এ দিকে অন্তঃকক্ষ হইতে তোমার হৃদয়মন্দিরের সারসর্ব্বস্বধন রামচন্দ্রের ন্যায় সনাতন ধর্ম্মকে রসাতলে পাঠাইবে। জানি আমরা তাহাতেও ভয় নাই, কারণ সে পাতালেও রক্ষাকর্ত্রী স্বয়ং মা ভদ্রকালী। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, জানি না আবার কতদিনে আমরা রামচন্দ্রের দর্শন পাইব? কিন্তু আবার ইহাও জানি যে, যদি মহীরাবণ বধ করাই মায়ের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়ার রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে; তথাপি বলি, সমাজ! তুমি আত্ম-সাবধানতায় ভ্রান্ত হইও না, ধর্ম্মরাক্ষসকে কখনও নিজ নিকেতনে স্থান দিয়া আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিও না, দ্বন্দ্বযুদ্ধে দণ্ডায়মান ধর্ম্মকে আর এ সময়ে স্থান ভ্রষ্ট করিও না।

প্রয়োজনের দায়িত্বে গুরুতত্ত্ব-প্রসঙ্গে আমরা দুই এক কথা অতিরিক্তও বলিলাম। শেষে আমাদের শাস্ত্রমূলক গুরুব্যবসায়ী প্রভুবর্গ ও বিভুবর্গের নিকটেও বলিয়া রাখিতেছি যে, তাঁহারাও ধীরে ধীরে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বরভূদলেই অগ্রসর হইতেছেন।

আমরা শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্রের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী উন্মার্গগামী পুরুষ সিদ্ধ হইলেও তিনি আমাদের নিকটে চক্ষুর শূল, কারণ ভগবদ্বাক্য অপেক্ষা কোন বাক্যই আমাদের নিকটে প্রমাণ নহে। ভগবান নিজে বলিয়াছেন, যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নরকঞ্চাধিগচ্ছতি॥ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাহার সিদ্ধিলাভ দূরে থাক্, অধিকন্তু নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায়ি গুরুদল! তোমাদের ব্যবসায়ের মূল শাস্ত্র হইলেও তাহার ফল পল্লব পত্র পুষ্প সমস্তই শাস্ত্রবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশ কাল পাত্র কিছুরই বিচার নাই, তোমরা যে শিষ্য দেখিলেই শিকার বলিয়া মনে কর এবং প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং বলিয়া তাহার স্কন্ধে গিয়া পড়, ইহা কোন্ শাস্ত্রের ব্যবস্থা? কালানলবিষধর সর্পও যদি কাহাকেও দংশন করে তবে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সে সর্প জ্বরে অভিভূত হইয়া থাকে। গতিশক্তির অভাবে সর্পগণ অধিকাংশই এই সময়ে হত হয়। তদ্রূপ উগ্রতপঃসম্পন্ন সাধকও যদি কাহাকেও দীক্ষিত করেন তবে সেই দীক্ষা সময়ে তাঁহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাধনার যে তেজঃ শিষ্য-শরীরে সঞ্চারিত হয়, সেই ক্ষতির পূরণ করিতেই গুরুকে দীক্ষাদত্ত মন্ত্রের জপাত্মক পুরশ্চরণ এবং বিষয়বিশেষে বহুকালব্যাপী তপস্যাও করিতে হয়, তবে তিনি পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন। আর বিকৃতির প্রতিমূর্ত্তি তোমরা যে মহানবমীর বলির ন্যায় এক এক দিনে এক এক বারে দশটি বিশটি করিয়া উদ্ধার কর! অগতির গতি প্রভুকুল! বলিতে পার, তোমাদের গতি কি হইবে? তুমি একাধারে দংশনে বিষধর, ভোজনে অজগর, মোহজ্বরে জর্জ্জর, তাহার উপর আবার এই আকণ্ঠপূর্ণ গ্রাস, কালদণ্ড হস্তে লইয়া শিয়রে যম দণ্ডায়মান। প্রভো! একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দেখ, কালিয়দমন প্রভু আজ কালরূপে তোমার প্রভুত্ব পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এখনও সময় থাকিতে শ্রীনাথের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বল, অনাথনাথ! দীনবন্ধো! তোমার আজ্ঞা অবহেলনের ফল ফলিয়াছে, চরণাশ্রিত শরণাগত পাপীর পাপ খণ্ডিত করিয়া অনুগ্রহ-দণ্ডে দণ্ডিত কর, শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই। আর তোমার পক্ষ হইতে আমরাও বলি, ভগবন্! ভূভারহরণই তোমার লীলায় প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের গুরুভার আজ বড়ই বিষম গুরুভার। কৃপাময়! তুমি ভিন্ন এ ভার হরণ করিবার আর কে আছে? এই কালসর্প গুরু-কুলের বিষম-বিষমিশ্রিত দীক্ষারূপ যমুনাজলে আর্য্যকুল জর্জ্জরিতপ্রায়। প্রভো! এ সর্পের ফণামণি তোমার ঐ রক্তকমলরাগরঞ্জিত বিমল চরণাম্বুজরাগে একবার রঞ্জিত কর, চরণাঘাতে স্বার্থাভিসন্ধি বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া জম্বুদ্বীপ হইতে তোমার নিত্য-রাসরমণ রমণকদ্বীপে পাঠাও। নরনারী বালক বালিকা বিশ্বস্ত হৃদয়ে দীক্ষাজলে অবগাহন করিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করুক্। হিমবান নিষধ বিন্ধ্য সুমেরু

মাল্যবান প্রভৃতি অনেক গিরিই জম্বুদ্বীপে অধিষ্ঠিত, কিন্তু প্রভো! এ গুরুগিরির ন্যায় দুর্ব্বহ আর কোন গিরিই নহে। শুনিয়াছি, তুমি নাকি গোবর্দ্ধন-গিরি-ধর, তাই আশা হয়, হয় চরণে না হয় করে, তুমি একদিন এ গিরি ধরিবেই ধরিবে। কেননা ভারতের ভাগ্যক্রমে এ গিরিও আজ গো-বর্দ্ধন, ইহার দ্বারা কেবল গো-জাতি মূর্খমণ্ডলীই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। দেবরাজের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য তুমি একবার গোবর্দ্ধন ধরিয়াছিলে, আবার নাথ! কলিরাজের দর্প চূর্ণ করিতে আর একবার ধরিতে হইবে। গিরি-গোবর্দ্ধনরূপে তুমিই গোপের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলে! গুরু-গোবর্দ্ধন রূপেও তোমাকেই আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতে হইবে। কালিয়দমন গোবর্দ্ধনধারণ উভয়ই তোমার লীলা, উভয় লীলার ক্ষেত্রই সুপ্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। লীলাময়! এখন কেবল তোমারই অবতারের অপেক্ষা মাত্র। আর বলি, গিরীন্দ্ররাজনন্দিনি মা! তুমিই বলিয়াছ, মন্ত্রদাতা গুরু তোমার পিতারও গুরু—পিতামহস্থানীয়, তোমার পিতৃকুল সেই গিরিকুলের গুরুগৌরব-ভয়ে তুমি যদি এ গুরুগিরির প্রশ্রয় দাও, তবে অগত্যা তখন আমরা বাবা ভৈরবনাথের সম্মুখে দাঁড়াইব, শ্বশুরকুলে তাঁহার যত ক্ষমা আছে, দক্ষযজ্ঞই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! তখন সেই প্রতীকার হইবেই হইবে। কিন্তু মা! তোমার পিতৃকুলে এ কলঙ্কগ্লানি গঞ্জনা চিরকাল রহিয়া যাইবে। তাই বলি, বাপের সুপুত্রী হইয়া এই বেলা ইহার উপায় দেখ। ঘরের কথা তোমরাই ঘরে ঘরে মিটাইয়া দাও।

গুরুকুল! শিষ্যরক্ষা করিবার জন্য গুরু হইতে চেষ্টা করিও না, আত্মরক্ষা করিবার জন্য শিষ্য হইতে অগ্রসর হও, তখন গুরুর প্রসাদে জগৎ তোমার শিষ্য হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া গুরুর উপাসনা করিতে হয়, নিজে যদি তাহা শিক্ষা করিতে তাহা হইলে আজ আর শিষ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তোমাকে এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। পিতৃহন্তা পিতার আদর্শে শিক্ষিত হইলে সে পুত্রের হস্তে পিতার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই গুরুপরাঙ্মুখ গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া তোমার শিষ্য আজ তোমার সর্ব্বনাশে উদ্যত। নিজ কর্ম্মফল নিজে ভোগ করিতে বসিয়াছ, ইহার জন্য দুঃখ করিয়া কি করিবে? তুমি নিজে যদি সিদ্ধ, অন্ততঃ সাধকও হইতে তাহা হইলেও তোমার শিষ্যের একদিন না একদিন সাধক হইবার কথা ছিল। তুমি যদি বৃন্দাবন বা কাশীজ্ঞানে গুরুগৃহের দাস হইতে, দেখিতে আজ তাহা হইলে কাশী বৃন্দাবন শূন্য করিয়া অগণ্য নরনারী তোমার দ্বারে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত। আর আজ সেইস্থলে তুমি কি না নামে গুরু, কার্য্যে দাস হইয়া বার্ষিকবৃত্তি রক্ষার জন্য জঘন্যবৃত্তি শিষ্যের দ্বারে পড়িয়া কুক্কুরের ন্যায় তাড়িত হও অথবা তাহারই পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে, এই আশায় সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কদর্য্য বৃত্তির অনুমোদন কর! এখনও যে তোমার শিরে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয় না, জানিও সে কেবল কলিযুগের অমোঘ প্রভাব।

দুঃখের কথা বলিব কত? সুরা ও বেশ্যার বিলাসের ভোজে গুরু আজ পাচকের কার্য্যে ব্রতী, শিষ্যের ধারণায় গুরু সেখানে বিনা মূল্যের পৈতৃক ক্রীতদাস। ধর্ম্মরাজ! কৃতান্তদেব! নরক কি এত পূর্ণ হইয়াছে যে, এ সকল অধিকারীরও তথায় স্থান সঙ্কুলন হয় না? ভগবন্! রক্ষা কর, এ মহাপাতকের স্রোতে অকালে মহাপ্রলয় ঘটিবে, সমাজ সংসার উৎসন্ন হইবে। গুরুগণ! ক্ষমা কর, আর এ নরকের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাই না। জগদম্বে! মা তুমি জগতের মা, সুপুত্র হউক কুপুত্র হউক, এ সকল মা তোমারই লীলা খেলা। জানি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, তাই কাঁদিয়া বলি মাগো! কোলের ছেলে ধূলায় ফেলিয়া এ কি রঙ্গ দেখ মা? সজলজলদশ্যামসুন্দরি! করুণাময়ি মাগো! একবার ঐ ত্রিভুবন-ত্রিতাপহরণ-ত্রিনয়ন-নির্ঝরের অজস্র করুণাবর্ষণে ভারতের গুরুকুল-কলঙ্ক-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া দাও, বরাভয়করাম্বুজ-প্রসারণে অশান্ত সন্তানকুল কোলে উঠাইয়া তাহার কুদৃষ্টিকলুষিত মলিননয়নে তোমার প্রেমাঞ্জনের রেখা দিয়া স্ব-স্বরূপে দেখা দাও। সর্ব্বার্থ-সাধিকে! পরমার্থ-স্বরূপিণি মা! তুমি শিবহৃদয়ের সর্ব্বস্ব-সার-সম্পত্তি, আজ জীব যদি সেই শিব-সাধন-সাধ্যধন শ্রীচরণের স্বত্বাধিকার লাভ করে, বিশ্বরাজরাজেশ্বরি! তবে তোমার সন্তান হইয়া সে কিসের নিঃস্ব? কোন নিঃস্বতার নিপীড়নে তাহাকে শিষ্যের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাড়িত হইতে হইবে? মা তুমি কোলের ছেলে কোলে করিয়া মা সাজিয়া দাঁড়াও, বিশ্বসংসার অগ্রে তোমার পদে নির্ভর করিয়া পরে তোমার সন্তানের পদস্পর্শ করুক। শিষ্যজগৎ বুঝিয়া লউক্ যে, তোমাকে পাইলে তবে গুরুতত্ত্ব বুঝিবার কথা। তোমার তত্ত্ব অপেক্ষাও তোমার স্নেহময় রূপান্তর গুরুর তত্ত্ব গুরুতর। আর তোমার সেই মায়ে-পোয়ে নিগূঢ় কথা, সেই সাধের—সোহাগের আমন্ত্রণ—মন্ত্রতত্ত্ব, যে তত্ত্ব শুনিতে পাইলে, বুঝিতে পারিলে শিষ্যের শিষ্যত্ব, গুরুর গুরুত্ব, মন্ত্রের মন্ত্রত্ব, তোমার সাধ্যত্ব ঘুচিয়া গিয়া একত্বে পরিণত হয়—যেখানে গিয়া কেবল 'যৎ কিঞ্চিদব-শিষ্যতে তৎ-ত্বমেব স্বরূপে' সকল গিয়াও যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, স্বরূপতঃ তুমিই তাহা। এই মহাতত্ত্বের উদয়, তোমার সেই গূঢ়াদপি গূঢ়তম নিগূঢ় সোহাগের কথা একবার শুনাইয়া দাও, আমরা গুরুতত্ত্বে মন্ত্রতত্ত্বে তোমার তত্ত্বে একত্বে ডুবিয়া যাই। আর যদি সে সাধের ত্রিতত্ত্ব ঘুচাইতে নিতান্তই কাতর হও, তবে দয়া করিয়া সেই তত্ত্বই বুঝাইয়া দাও, কামাখ্যাতন্ত্রে কামান্তকারী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন—

> আদাবনুগ্রহো দেব্যাঃ শ্রীগুরো-স্তদনন্তরম্।
> তদাননাত্ততো দীর্ঘা ভক্তিস্তস্যাং প্রজায়তে॥
> ততো হি সাধনং শুদ্ধং তস্মাজ্ জ্ঞানং সুনির্ম্মলম্।
> জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেৎ সত্যমিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥

প্রথমতঃ দেবীর অনুগ্রহ হইলে তবে শ্রীগুরুর অনুগ্রহ লাভ হয়, অনন্তর সেই গুরু-মুখ-নিঃসৃত মহামন্ত্রের প্রভাবে পরমদেবতার পদাম্বুজে একান্ত ভক্তির সঞ্চার হয়। সেই ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবেই সাধন শুদ্ধ হয়; সেই বিশুদ্ধ সাধনবলেই বিমল-জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়; সেই তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবেই জীবের মহামোক্ষ লাভ হয়; ইহাই সত্য—ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়।

। শিষ্যলক্ষণ ।

আজকাল সংবাদপত্রের সম্পাদকের সমালোচনা করিবার যেমন কেহ নাই, অথচ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমালোচক তদ্রূপ শিষ্য-লক্ষণেরও সমালোচনা করিবার কেহ নাই, অথচ শিষ্যগণ সকল গুরুর সমালোচক। সম্পাদকের শাণিত শতমুখী লেখনীর ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও যেমন কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, বাচালবীর শিষ্যদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তদ্রূপ গুরুকুলের কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই, কেননা গুরু একমুখ, শিষ্য শতমুখ। গুরু হয় ত ঊর্দ্ধসংখ্যা সংস্কৃতভাষার দুই একটি কথায় শিষ্যকে দুই একটি বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, শিষ্য হয় ত ইংরাজী-ভাষায় উপহাস করিয়াই তাঁহাকে উড়াইয়া দিবেন। শিষ্য গুরুকে শাস্ত্রের কষ্টি পাথরে কষিয়া লইবেন কিন্তু গুরুকে শিষ্যের গিল্টী দেখিয়াই হা করিয়া থাকিতে হইবে, কারণ গুরুর সম্বল শুধু জ্ঞান, শিষ্যের বাহুবল বি-জ্ঞান।

আজকাল সমাজে কেমন একটা হৈ হৈ রব উঠিয়াছে যে, যথাশাস্ত্র গুরু আর পাওয়া যায় না। এতাবতা বোধ হয় যে, যথাশাস্ত্র শিষ্যের আর অভাব নাই; আমরা কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারি না, গুরু দুর্ল্লভ কি শিষ্য দুর্ল্লভ? শতাবধি গুরুর মধ্যে দশটি সদ্-গুরু আজও দুর্ল্লভ নহেন, কিন্তু সহস্র শিষ্যের মধ্যে একটিও কি যথাশাস্ত্র শিষ্য পাওয়া যায়? এ ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা যেটির যেমন প্রয়োজন, বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিশ্বজননী তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কি আহার করিবে, এই চিন্তায় যিনি মাতার স্তন এবং স্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মপ্রাণ শিষ্যের জন্য গুরুর সৃষ্টি করেন নাই, ইহা অসম্ভব কথা। ফলতঃ, যথাশাস্ত্র গুরু হইলে যেমন যথাশাস্ত্র শিষ্যের অভাব নাই, যথাশাস্ত্র শিষ্য হইলেও তদ্রূপ যথাশাস্ত্র গুরুর অভাব নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,

> দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
> যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী॥

দেবতা তীর্থ দ্বিজ মন্ত্র দৈবজ্ঞ ভেষজ এবং গুরু এই কয়েকটি বিষয়ে যাঁহার যেমন ভাবনা, সিদ্ধিও তাদৃশী হইবে অর্থাৎ এই কয়েকটি বিষয়ে যাঁহার যে পরিমাণে বিশ্বাস হইয়াছে তাঁহার ফলও সেই পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইবে।

আজকাল অনুপযুক্ত গুরু বলিয়া অনেকেই গুরুকুলে ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে সুপটু। কিন্তু আমি শিষ্য হইবার কতদূর উপযুক্ত পাত্র, ইহা বিবেচনা করিবার লোক কয় জন আছেন তাহা জানি না। তুমি আমি যে পরিমাণে উপযুক্ত তাহাতে-গুরুকুলমাত্রকেই অনুপযুক্ত মনে করা নিতান্তই আস্পর্দ্ধার কথা। সনাতন ধর্ম্মের পুনরান্দোলন-তরঙ্গ-তাড়িত অধীরহৃদয় যুবক ও কিশোরবৃন্দ ইতিহাস উপন্যাস নবন্যাস অভিনয় ইত্যাদিতে বিজ্ঞ হইয়া গুরু-নির্ব্বাচনে ব্যতিব্যস্ত। গুরু বলিতেই ইহাদের একদলের অন্তঃকরণে সংস্কার এইরূপ যে, তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি-শিখরে বিজন গিরিগহ্বরে বা লোকালয়ের অতীত কোন প্রশান্তশ্বাপদাকার্ণ মহারণ্যের পর্ণকুটীরে বদ্ধপদ্মাসন মুদ্রিতলোচন যোগিরাজ বসিয়া আছেন। স্বীকার করিলাম, তিনি সদ্‌গুরু কিন্তু তাহাতে তোমার আমার ফল কি? অগাধগম্ভীর সমুদ্রগর্ভে অনন্ত রত্ন সুসজ্জিত রহিয়াছে সত্য, তাহাতে তোমার আমার লাভ কি? দ্বৈততরঙ্গ বিস্মৃত হইয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে ডুবিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তোমার আমার আশা কোথায়? সত্য আমি পিপাসার্ত্ত এবং নদীতীরে উপস্থিত, কিন্তু তীরকচ্ছ হইতে জল ত অনেক নিম্নে, আমি ইচ্ছা করিলে সেই উত্তুঙ্গ পর্ব্বত প্রায় বিকট তট অতিক্রম করিয়া জলে অবতীর্ণ হইতে পারি না, অথচ জল না পাইলেও জীবন রক্ষা হয় না। এখন উপায় কি? আমি জল চাহিতেছি তাঁহার নিকটে, যিনি মধ্য-নদীর প্রবাহে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-প্রবাহ সেই প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছে, যিনি আমার চক্ষে 'যিনি' থাকিলেও তাঁহাতে আর তিনি নাই—আমার মত লক্ষ কোটি জীব নদীর তীরে বসিয়া মাথা কুটিলেও তিনি আর ফিরিয়া চাহিবেন না। হয় জগৎ রক্ষা হউক, না হয় অকালে মহাপ্রলয় ঘটুক, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। সমগ্র জগৎ যাঁহার নিকটে তৃণ বলিয়াও গণ্য নহে, তুমি আমি কি তাঁহার নিকটে পরমাণু বলিয়াও গণ্য হইবার আশা করিতে পারি? আমি জল পাইতে পারি তাঁহার নিকটে, যিনি স্থল অতিক্রম করিয়া জলে অবতীর্ণ অথচ অতলস্পর্শ প্রবাহে অনুপস্থিত। তাই শাস্ত্র তোমার আমার এবং সাধারণের জন্য বলিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে, এবং দৈবে পৈত্রে বিমিশ্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ। অন্যথা, দ্বৈতভান যাঁহার নাই, তাঁহার নিকটে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ আকাশকুসুম বই আর কিছুই নহে। অনেকের সাধ যে, গৃহস্থ গুরুর মধ্যেও যদি যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠের ন্যায় গুরু পাই, তবেই দীক্ষিত হইব নতুবা নহে। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই যে, তাহা হইলে তাঁহাকেও রাজর্ষি জনক এবং ভগবান রামচন্দ্রের ন্যায় হইতে হয়। উচ্চ অভিলাষ সকলেরই হয় কিন্তু অসম্ভব আশা করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলে। উপন্যাসের তত্ত্ব না বুঝিয়া উপন্যাস পড়িতে গেলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সভায় দুর্য্যোধন সাজিতে হয়। নভেলী ছাঁচে হৃদয় ঢালিয়া সেই আবদার পূর্ণ করা

আর গুরুচরণে শরণাপন্ন হইয়া সিদ্ধি সাধনার অধিকারী হওয়া এক কথা নহে। সেই জলাবগাহী পুরুষ দ্বারা আমার উপকার হইতে পারে, যিনি জল হইতে স্থলে আসিয়া আমাকে জল দিতে পারেন অথবা স্থল হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া জলে অবগাহন করিতে পারেন। লক্ষকোটি সিদ্ধপুরুষ জলমগ্ন থাকিলেও তাহাতে আমার কোন উপকার-সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অর্দ্ধমগ্ন বা প্রায়োমগ্ন, অন্ততঃ জলাবতীর্ণ একজন দয়াবান পুরুষকে পাইলেই আমি কৃতার্থ হইতে পারি। তাই সর্ব্বাশ্রমীর পক্ষে গৃহস্থ গুরুই সুপ্রশস্ত। কেহ কেহ আবার এরূপ মনে করেন যে, গুরুর বিদ্যা-বুদ্ধি কি পর্য্যন্ত কতদূর আছে তাহা না বুঝিয়া দীক্ষিত হওয়া উচিত নহে। এই কথাটিতে কিন্তু হাস্য-সম্বরণ করা কঠিন। গুরু মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধি কি আছে না আছে, পাঠশালায় যাইবার পূর্ব্বেই যদি বালক তাহা বুঝিয়া উঠিল, তবে আর পাঠশালায় যাইবারই বা প্রয়োজন কি? যাঁহাকেই গুরু স্বীকার করিতে হইবে তাঁহার নিকটেই নিজের অজ্ঞান অঞ্জলি দিতে হইবে, ইহাই গুরু-শিষ্য-জগতের নৈসর্গিক নিয়ম। নিজের অজ্ঞান না থাকিলে গুরু করণের প্রয়োজন নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥' গুরুর বিদ্যা-বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আর পিতামাতার বাল্যলীলা দর্শন করিবার ইচ্ছা, একই কথা। পিতামাতা কোনদিন বালক বালিকা থাকিলেও আমার পিতামাতা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা যেমন যুবক যুবতী তদ্রূপ গুরু কোনদিন অজ্ঞান থাকিলেও তোমার আমার দীক্ষার পূর্ব্বেই তিনি অগাধ-জ্ঞানসাগর, অন্যথা শিষ্যের জ্ঞানদাতা গুরু নিজে অজ্ঞান হইলে তাঁহার নিকটে দীক্ষা অসম্ভব। আমি নিজবুদ্ধিবলে সেই বিষয়ের পরীক্ষা করিতে পারি, যে বিষয়ে আমি স্বয়ং বিদ্বান্; কিন্তু যাহার বিন্দু বিসর্গও আমার অবিদিত সেই বিষয়ের পরীক্ষা করা আর নিজের পরীক্ষা দেওয়া একই কথা। হইতে পারে, আমি অনেক অনেক বিষয়ে উপাধিধারী পরীক্ষোত্তীর্ণ পুরুষ, কিন্তু তাহাতে গুরুকে পরীক্ষা করিবার অধিকার আমার কি হইয়াছে? গুরু হয় ত আমার ন্যায় উপাধিধারী পরীক্ষোত্তীর্ণ নহেন, তাহাতেই বা কি? আমি সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলেও সাধনাক্ষেত্রে ঘোরমূর্খ—গুরু সর্ব্ব বিষয়ে অশিক্ষিত হইলেও সিদ্ধি-সাধনায় মহামহোপাধ্যায়। তাঁহার নিকটে আমি যাহা শিক্ষা লাভ করিব তাহা আমার স্বপ্নেও অপরিচিত। তাই লৌকিক বিদ্যার অভিমানে অন্ধ হইয়া, গুরুর সেই মহাবিদ্যা—তত্ত্ববিদ্যার পরীক্ষা করিতে যাওয়া বড়ই ধৃষ্টতা, বড়ই আস্পর্দ্ধা—বড়ই বিড়ম্বনার কথা। গুরুর নিকটে পরীক্ষা করিবার কিছু নাই, কিন্তু আজীবন পরীক্ষা দিবার বিষয় যথেষ্ট আছে।

ইহার পর আর একদল আছেন, যাঁহারা প্রেমোন্মাদী অভিনয় বক্তৃতা বা লেখার ছটায় মুগ্ধ হইয়া দণ্ডে দশ বার ধ্রুব প্রহ্লাদ হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ইহারা আবার

যোগ যাগ তপস্যা ইত্যাদি দুই চক্ষের বিষ দেখেন। মনে মনে ধারণা যে অভিনয়ের কান্না কাঁদিয়াই হরিকে গলাইব, ভক্তির গন্ধও মনে প্রাণে থাক্ বা না থাক, ভক্ত বলিয়া জগতে আদর্শপুরুষ হইব। কেননা শুনিয়াছি, ভক্তের আর জপ তপ পূজা অর্চ্চা কিছুরই আবশ্যক নাই। জ্ঞানের কথা ইহাঁদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদ-বিশেষ, কারণ জ্ঞানের ফল মুক্তি। ইহাঁরা ভক্ত, মুক্তি চাহেন না, কেননা বৈষ্ণবের গ্রন্থে লিখিত আছে, জ্ঞান হ'তে ভক্তি বড় মুক্তি তার দাসী। মুক্তি যেন ইহাঁদের জন্য কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, আর ইহাঁরা যেন বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন—দূর হ, তোকে চাই না। আজকাল হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজাধারী সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-পল্লীতে এইরূপ লোকই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যত কেন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করুক, সপ্তাহান্তে একদিন সন্ধ্যাকালে খোল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিলেই বে-কসুর খালাস। সেই গোলে হরিবোল ভিন্ন অন্য মন্ত্র বা উপাসনা ইহাদের মতে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর অধিকারভুক্ত। যাহা হউক, ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনবধানতা ও অপরিণামদর্শিতায় এবং নিস্পন্দ আর্য্যসমাজের কঠোর সহিষ্ণুতায় এই সম্প্রদায় দিন দিন যেরূপ প্রশ্রয় পাইতেছে তাহাতে আর্য্যসমাজের নামে অনার্য্যসমাজের সৃষ্টি যে অবশ্যম্ভাবিনী, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। এই উপ-প্রহ্লাদের দল গুরু বলিতেই মণ্ডামার্ক বলিয়া মনে করে এবং গুরুকরণের যে প্রয়োজন নাই, প্রহ্লাদকেই তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করে। কিন্তু ইহা একবারও ভাবিবার অবসর পায় না যে, এইরূপ ভক্ত হইলেই যদি প্রহ্লাদ হওয়া যায় তবে এতকালের মধ্যে একটি বই আর প্রহ্লাদ জন্মিল না কেন? অনন্ত চরাচরে ত ভগবানের অনন্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কৈ প্রহ্লাদের মত ত আর একটিও হইলেন না? নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আর কাহারও সম্মুখে ভগবান দাঁড়াইলেন না? ভগবানের ভক্তি কি এতই একপক্ষপাতিনী যে, প্রহ্লাদ ভিন্ন আর অন্য কাহারও নিকটে নিজ বিভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না? এইরূপ ভক্তি লইয়া যদি প্রহ্লাদের আদর হয়, তবে ত সংসারে প্রহ্লাদের সংখ্যা করা কঠিন! এইস্থানে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের একটু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ব্রহ্মাদি দেবগণ হিরণ্যকশিপুর উৎপীড়নে অধীর হইয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে বলিলেন, আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর, যতদিন ইহার নিজের আত্মায় বিদ্বেষ না হইতেছে ততদিন ইহার পাপের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতেছে না—আমিও বধ করিতে পারিতেছি না। দেবগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জীবের ত কখনও আত্মার প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয় না, তবে ইহা কিরূপে সম্ভবে? ভগবান বলিলেন, ভয় নাই—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—আমিই স্বয়ং উহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ চক্রিচূড়ামণির কৌশল বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন, ভগবানও দেবকার্য্য-সাধনার্থ দৈত্যরাজের ঔরসে কয়াধুর গর্ভে

প্রহ্লাদরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এখন মনে কর, ভগবানের সেই সাক্ষাদ্ ভক্তাবতার প্রহ্লাদের যাহা ঘটিয়াছিল, তোমার আমার বা অন্যের তাহাই ঘটিবে, ইহা মনে করাও কি স্বপ্নাতীত নহে? হিরণ্যকশিপুর বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য তিনি আপনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি আপনার অমোঘ ভক্তির অলৌকিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বলিয়া কি তুমি আমি তাহাই দেখাইব? হরি হরি হরি তাহাই যদি ঘটিবে, তবে আর স্বয়ং তিনি কেন প্রহ্লাদরূপে অবতীর্ণ হইবেন? আর প্রহ্লাদরূপে অবতীর্ণ হইয়াই কি তিনি গুরুকরণ ব্যতিরেকে নিজ ভক্তির প্রকাশ করিয়াছেন? শাস্ত্রের অনভিজ্ঞগণ অনায়াসে প্রহ্লাদের গুরু নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধুগণ জানেন যে, হিরণ্যকশিপু যুদ্ধযাত্রা করিলে কয়াধূ এবং তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশার্থ দেবরাজ রক্ষকহীন দৈত্যপুর হইতে কয়াধূকে হরণ করিয়া যখন পলায়ন করেন সেই সময়ে পথমধ্যে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজ! গর্ভবতী রমণীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছেন! এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? ইন্দ্র বিশুস্ক হৃদয়ে বলিলেন, তপোধন! একে ত হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে দেবরাজ্য বিধ্বস্তপ্রায়, আবার ইহাঁর পরে পিতা-পুত্র একত্র হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিলে ত্রৈলোক্য উৎসাদিত হইবে। সেই আশঙ্কায় গর্ভসহ দৈত্যমহিষীকে হত্যা করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি, নতুবা উপায়ান্তর নাই। দেবর্ষি হাসিয়া বলিলেন, দেবরাজ! ক্ষান্ত হউন্, দৈত্যদৌরাত্ম্য নির্ম্মূল করিবার জন্যই এ গর্ভের আবির্ভাব, গর্ভধ্বংস করিবার প্রয়োজন নাই। এই গর্ভ হইতেই সুরকুল-সৌভাগ্যলক্ষ্মী পুনরামন্ত্রিত হইবেন। ঋষিবাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক দৈত্যমহিষীকে পরিত্যাগ করিয়া দেবরাজ স্বস্থানে গমন করিলেন। কয়াধূ তখন কাঁদিয়া ঋষির চরণে ধরিয়া বলিলেন, প্রভো! দেবরাজ আমাকে নিঃসহায়া দেখিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহে এ বিপদে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু এখন আমি দৈত্যপুরে যাই কি উপায়ে? সতী হইলেও কুলবতী রমণী এইরূপে শত্রুহস্তগতা হইলে কেহ তাহার ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ এ বার্ত্তা অবগত হইলে দৈত্যরাজ নিশ্চয় আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। প্রভো! এইরূপে লোকলাঞ্ছিত পতিপরিত্যক্ত গর্ভভারপীড়িত দুর্ব্বহ জীবনে আমার ফল কি? আবার গর্ভস্থ সন্তান সহ এ দেহ পরিত্যাগই বা করি কিরূপে? পিতঃ! এ ঘোরতর উভয় সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করুন। দৈত্যরাজমহিষীর এই বিপদ দেখিয়া দেবর্ষি বলিলেন, মা! নিজ-চরিত্রের কলঙ্কচিন্তা পরিহার কর, আমি সে বিষয়ে সাক্ষী রহিলাম। এক্ষণে হিরণ্যকশিপুর প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত তুমি আমার আশ্রমেই অবস্থান কর, পরে পতিসঙ্গে একত্র দৈত্যপুরে গমন করিও। দেবর্ষির আশ্বাসবাক্য অনুমোদন করিয়া

কয়াধূ নারদের আশ্রমে অবস্থিতা হইলেন। এই সময়ে দেবর্ষি কয়াধূর প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকটে ভগবদ্ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করেন। ভক্তাবতার ভগবান প্রহ্লাদরূপে মাতার গর্ভে থাকিয়াই দেবগুরু নারদকে গুরুপদে বরণ করিয়া তৎকালে নিজভক্তি-যোগ নিজে অভ্যাস করেন। সেই ভক্তিরই পরিণাম ভগবানের নরসিংহ-মূর্তি ধারণ। এখন মনে কর, ভক্তের আরাধ্য ধন ভগবানও নিজভক্তি নিজে শিক্ষা করিবার সময়ে নিজভক্তকেও যে ক্ষেত্রে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে আজ প্রহ্লাদের কেহ গুরু ছিলেন না, এ কথা বলিতে যাওয়া বড়ই অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্। যিনি স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া অদ্ভুত তেজোময় নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিলেন, তিনি যে গুরুদত্ত উপদেশ ব্যতিরেকে নিজভক্তি-যোগ নিজে প্রচার করিতে পারিলেন না, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু তথাপি শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ত্রৈলোক্যগুরু নিজে শিষ্য হইয়া নিজ শিষ্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া গর্ভ হইতেই সিদ্ধরূপে আবির্ভূত হইলেন। এখন সাধকবর্গ বুঝিয়া লউন, যাঁহার ভক্তির ভান করিয়া আমরা অভিমান করি, গুরুগৌরব রক্ষার জন্য দেবরাজকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেও কত কি কূটচক্রান্তের অনুসরণ করিতে হইয়াছে, আর আজ কিনা সেই প্রহ্লাদকে সাধারণ দৈত্যপুত্ররূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার যে গুরুকরণ ছিল না, ইহাই আমরা নজীর দেখাইতে যাই। ধন্য আমাদের আস্পর্দ্ধা! ধন্য আমাদের বুদ্ধি বিদ্যা! আর ধন্য আমাদের অবশ্যম্ভাবী অধঃপাত! তাই বলি, শিষ্যদল! দেবলীলায় দৈত্যলীলার, ব্রহ্মলীলায় জীবলীলার কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের সাথে হৃদয় ঢালিয়া নূতন প্রহ্লাদ সাজিও না। বামন হইয়া চন্দ্র ধারণে হস্তক্ষেপ করিও না, পতঙ্গ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আপনি আপনাকে ভস্মসাৎ করিও না।

ইহার পর আর এক শ্রেণী আছেন, তাঁহাদের মতে মানুষ কখনও মানুষের গুরু হইতে পারে না। মানুষের গুরু ঈশ্বর, তিনি যখন যে উপদেশ দেন অর্থাৎ বুদ্ধিরূপে হৃদয়ে উদিত হইয়া তিনি যে বৃত্তির উন্মেষ-বিধান করেন, তাহার অনুসরণ করাই তাঁহার আজ্ঞাপালন। ইহাঁরা প্রকৃতিকেই পরমগুরু বলিয়া মনে করেন। পর্ব্বত বন উপবন মেঘ বিদ্যুৎ নদ নদী সাগর সরোবর ইত্যাদি ইহারা সকলেই গুরু। কিন্তু আমরা বলি, এই সকল অচেতন চিত্র লইয়া সচেতন মানবসমাজ গঠিত হইবার নহে। কেবল প্রকৃতি, বৃক্ষ লতা পশু পক্ষীর গুরু হইতে পারেন, কিন্তু মানুষের নহে। গাভীর প্রসবের পর বৎস প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনি, উঠিয়া মাতার স্তন্য অন্বেষণ করিয়া লয়, কিন্তু মানবসন্তান প্রসূত হইলে পুত্রবৎসলা জননী প্রসববেদনা ভুলিয়া শিশু' সহস্তে স্তন ধরিয়া পুত্রের মুখে না দিলে শিশুর স্তন্যপানবৃত্তি চরিতার্থ হয় না। একমাস যাহার বয়ঃক্রম হইয়াছে, এরূপ গোবৎসকেও জলমধ্যে ফেলিয়া দিলে প্রকৃতির শিক্ষানুসারে সে আপনি সাঁতার দিয়া অনায়াসে জল পার হইয়া চলিয়া

যাইবে। কিন্তু মানুষের দশবৎসর বিশ বৎসরের ছেলে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দাও (মানুষের দেখাদেখি যদি সাঁতার না শিখিয়া থাকে) হাবুডুবু খাইয়া তৎক্ষণাৎ সে ডুবিয়া মরিবে। এখন সাধক বুঝিয়া দেখুন, প্রকৃতি-গুরুর ভরসায় থাকিয়া মানব-গুরুর অভাবে পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া যাহাদের এই দুর্গতি, তাহারাই কিনা প্রকৃতি-গুরুর দোহাই দিয়া দণ্ডে দশ বার ভবসমুদ্র পার হইতে যায়—আপনিও যায়, অন্যকেও ডাকে। পশু পক্ষীর দেখাদেখি সাধ করিলে যদি তাহা পূর্ণ হইবার হইত, তাহা হইলে প্রকৃতিশিষ্য! তোমার দেহগঠনও তদ্রূপ হইত। ফলতঃ যে প্রকৃতির শিষ্য বলিয়া তুমি অভিমান কর সেই প্রকৃতিতত্ত্বেই তুমি জন্মান্ধ। এই দুঃখই অসহনীয়। এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন জীব কে আছে, যে প্রকৃতির শিষ্য নহে? জীবের প্রাথমিক জীবত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার পরব্রহ্মে বিলয় পর্যান্ত যাহা কিছু কায়িক বাচনিক মানসিক বৃত্তি ও ব্যাপার, ইহার সমস্তই প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে পরিচালিত। আহার নিদ্রা ভয় সংসর্গ এই চারিটী বৃত্তিই কেবল প্রকৃতির নিয়ম, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা বুদ্ধিমানের কথাও নহে শাস্ত্রের অনুমোদিতও নহে। স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন, 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'। জীব সকল নিজ নিজ প্রকৃতির অনুগমন করে, নিগ্রহ তাহার কি করিবে? অদৃষ্টচক্রের বিচারক্রমে জন্মান্তরোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে যিনি যে জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃতি যাঁহাকে যে আচারে, যে মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই আচারে, সেই মন্ত্রেই সিদ্ধ হইতে হইবে। প্রকৃতি যাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের আচারে থাকিয়াই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের কথা। স্থূলদৃষ্টিতে পশুকে মানুষ করা যেমন অসম্ভব, আবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করাও তেমনই অসম্ভব। জীবের জন্মের পর প্রকৃতি যদি তাহার স্বত্বত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন তাহা হইলেও একদিন এ বর্ণসঙ্কর-কল্পনার সম্ভাবনা ছিল। তাহা যখন নহে, প্রকৃতির সঙ্গে যখন নির্ব্বাণ মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্বন্ধ তখন কিছুতেই প্রকৃতিশাসনের হাত এড়াইবার উপায় নাই। প্রকৃতির যাহা নির্দ্দেশ তাহাতে সচেতন মানুষের গুরু সচেতন মানব ভিন্ন অচেতন পাহাড় পর্ব্বত কখনও হইতে পারে না। কিন্তু সেই মানবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সচেতন মানবকে গুরু বলিতে লজ্জা হয়, অথচ অচেতন পাহাড় পর্ব্বতকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। প্রকৃতির ইহাও এক বিচিত্র লীলা!

কেহ কেহ আবার সিদ্ধান্ত করেন, মন্ত্রশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে গুরুকরণের প্রয়োজন কি? শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রকে স্বয়ং গ্রহণ করিলে তাহাতে সিদ্ধি না হইবে কেন? আমরা গুরুতত্ত্বে যাহা বলিয়াছি, যদিও তাহাতেই প্রকারান্তরে এ কথার উত্তর করা হইয়াছে তথাপি জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রশক্তির দ্বারা

কার্য্য হইবে ইহা যাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন, গুরুকরণ ব্যতিরেকে মন্ত্রশক্তি ফলপ্রদ হয় না—ইহা তাঁহারা স্বীকার না করিবেন কেন? কারণ মন্ত্রশক্তিও শাস্ত্রের আজ্ঞালব্ধ, গুরুকরণও শাস্ত্রের আজ্ঞালব্ধ। শাস্ত্রের একাংশ স্বীকার করিব, অপরাংশ স্বীকার করিব না—ইহা কোন্ আস্তিকতার পরিচয়? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরন্তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।

* * * *

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে! তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবি! দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ॥
কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতি র্নৈব জায়তে॥

অপি চ—

উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ।
ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি! দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা॥

জপ সমস্ত দীক্ষামূলক, তপস্যা সমস্ত দীক্ষামূলক। দীক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি যে কোন আশ্রমে বাস করিবে। অদীক্ষিত অবস্থায় যাহারা জপ-পূজাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, প্রিয়ে! পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় তাহাদের সেই সকল ক্রিয়া সফল হয় না। দেবি! দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সদ্গতিও নাই, সিদ্ধিও নাই। সেই হেতু সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইবে। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সে ব্যক্তি রৌরব নরকে গমন করিবে। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক তান্ত্রিক গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইবে। গ্রন্থে মন্ত্র দেখিয়া যে নরাধম গুরুকৃত দীক্ষা ব্যতিরেকে সেই মন্ত্র গ্রহণ করে, সহস্র মন্বন্তর অতীত হইলেও তাহার নরক যাতনার নিস্তার নাই। দেবেশি! দীক্ষা যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ উপপাতক এবং কোটি কোটি মহাপাতককে ভস্মসাৎ করে।

দীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে মানব আপনিই পদার্থ দেখিয়া লইতে পারে। তাই বলিয়া দীপ জ্বালিবার আবশ্যক নাই, ইহা বুদ্ধিমানের কথা নহে। শাস্ত্রীয় অধিকারভুক্ত হইলে সাধক মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে অচেতন মূর্ত্তিকেও চৈতন্যময়ী করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু সেই মন্ত্রশক্তিকে সচেতন করিবার জন্য প্রদীপের ন্যায় গুরুর প্রয়োজন অবশ্য

আছে। মন্ত্রশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে সত্য, কিন্তু গুরু ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য সেই মন্ত্রশক্তিকে জাগরূক করিয়া দিতে পারে? বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হইলে সে তখন দাহ্যপদার্থের পরিমাণ অনুসারে নিজ দাহিকা এবং প্রকাশিকা শক্তি সম্বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু অপ্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রজ্জ্বলনের জন্য সেই দাহিকা এবং প্রকাশিকা শক্তির সমষ্টিরূপ অগ্নিশিখার যেমন প্রয়োজন, অদীক্ষিত অবস্থায়ও তদ্রূপ দীক্ষার জন্য সেই দৈবী এবং সাধিকা বা সিদ্ধিশক্তির সমষ্টিরূপ গুরুর প্রয়োজন; সে শক্তি সচেতন ভিন্ন অচেতনে থাকিতে পারে না। সচেতনের মধ্যেও আবার সর্ব্বাঙ্গীন সচেতন দেবতা বা দেবোপম মহাপুরুষেই তাহা সম্ভবে—তাই শাস্ত্রমতে লতা পাতা পাহাড় পর্ব্বতে না হইয়া সিদ্ধ বা সাধক পুরুষেই গুরুকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে-কোন রূপেই হউক, দীক্ষা বা সাধনা শাস্ত্রোক্ত হইলেই তাহা গুরু ব্যতিরেকে কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। দেশের ইতিহাসে পথের বিবরণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা সত্য; কিন্তু পথমধ্যে হঠাৎ কোন বিপদ্ ঘটিলে তখন তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি? তাহার তত্ত্ব যেমন সেই পথের পূর্ব্ব-পরিচিত পুরুষ ভিন্ন অন্যের নিকটে জানিবার উপায় নাই তদ্রূপ সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সাধনায় কোন দৈব-বিড়ম্বনা ঘটিলে তখন সে ঘোর বিপদে রক্ষাকর্ত্তা গুরু ভিন্ন অন্য কেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ রক্ষণে সক্ষমো গুরুঃ। ন সমর্থা গুরৌ রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্বদেবতাঃ॥ ইষ্টদেব রুষ্ট হইলেও গুরু তখন সাধককে রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হয়েন তাহা হইলে এক ইষ্ট দেবতা কেন, সমস্ত দেবতা একত্র হইলেও তাহার রক্ষা নাই। সাধনহীন সমাজে এ সকল কথার অর্থ সাধারণে না বুঝিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে অনেকস্থানে এমন অনেক ঘটনা নিয়ত ঘটিতেছে যাহাতে ভগবান শ্রীকণ্ঠের স্বকণ্ঠ-নির্গত এই সকল অমোঘ আজ্ঞা পদে পদে প্রত্যক্ষ হইতেছে। অনেক উচ্চকক্ষসমারূঢ় সাধক, সাধনার সমস্ত উপায় সুসম্পন্ন থাকিতেও কেবল গুরুকোপে ভ্রষ্ট হইয়াই আকাশ-কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় অধঃপতিত এবং নিষ্প্রভ হইতেছেন। আবার ইহাও অনেক দেখা যাইতেছে যে, সাধনাঙ্গের কোন উপপত্তি নাই, দেহশুদ্ধি বাক্‌শুদ্ধি মনঃশুদ্ধি কিছু নাই, বিশেষ কোন সাধন নাই, ভজন নাই, আছে কেবল বিপদে সম্পদে জয় গুরো! শ্রীগুরো! ধ্বনি। কি জানি করুণাময়ীর কেমন করুণা, ইষ্টদেবতা-স্বরূপে আজীবন তাঁহার উপাসনা করিয়াও যাহা ঘটে নাই, দেখিতে পাই গুরুরূপে অতি অল্পকাল মাত্র তাঁহার আরাধনা করিয়াই সাধক অনায়াসে সে ফল লাভ করিতেছেন। কঠোর সাধনাসমূহে সিদ্ধ হইবার জন্য যাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিজয়দুন্দুভি বাজিতেছে, বিভীষিকার বিকট অন্ধকারময় সমরাঙ্গনে উত্তাল ভৈরব-নৃত্য করিবার জন্য যাঁহার বীরগর্ব্বিত পদদ্বয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে, সংসারের ভীষণ ষড়্‌বর্গ-সৈন্যব্যূহ ভেদ

করিবার জন্য যাঁহার উদ্যত সিদ্ধিশক্তি বজ্রনির্ঘোষ হুহুঙ্কারে আস্ফালন করিতেছে, তিনি জানিয়াছেন—বিজয়ভৈরবীর বিজয়ভৈরব-কুমার কেবল একমাত্র গুরুভক্তি-ব্রহ্মাস্ত্র বলেই ত্রিলোকের অজেয়। সেই জ্বলন্ত-অগ্নিময়ী পরীক্ষা দিতে যিনি অগ্রসর হইয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন, গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা কথ্যতে যদি।
তৎ সম্মতং ভবেদ্বেদৈ র্মহারুদ্রবচো যথা॥

গুরু যদি তন্ত্রবিরুদ্ধ আজ্ঞাও করেন, তবে তাহাকেই মহারুদ্রবাক্যের ন্যায় বেদসম্মত বলিয়া জানিবে।

শাস্ত্র যেখানে কুণ্ঠিত, শাস্ত্র যেখানে লুণ্ঠিত, লৌকিক সমস্ত উপায় যেখানে নিরস্ত, অধিক কি, বরদানোদ্যত দেবতা পর্য্যন্ত যেখানে নিজ অমোঘ ইচ্ছা সঙ্কুচিত করিয়া পশ্চাৎপদ, বিভীষিকার সেই তাণ্ডবনৃত্য প্রাঙ্গণে ভীষণাদপি ভীষণতম নির্ম্মম মহাশ্মশানে, যেখানে সর্ব্বমঙ্গলা মা থাকিতেও এ অনন্ত চরাচরে আমার বলিয়া রক্ষা করিতে তখন আর কেহ নাই, বিঘ্নভৈরব বেতাল সিদ্ধ ভূত বটুক ডাকিনী যোগিনীগণমণ্ডিত সেই অমাবস্যার গভীর ঘোর নিশীথ অন্ধকারে সাধকের তীব্র তপস্তেজঃও যখন নিষ্প্রভ হইয়া আইসে, বীরেন্দ্রের অটল বীর-হৃদয়ও যখন সভয়ে টলিতে থাকে, মন্ত্রচৈতন্য-শবপৃষ্ঠে সাধকের বদ্ধপদ্মাসনের নিবিড় বন্ধনও যখন শিথিল হইতে থাকে, অবসন্ন অন্তঃকরণে বীর যখন নিজ আসনে বিষম ভূমিকম্প অনুভব করিতে থাকেন, এই পতন ঘটিল, আর রক্ষা নাই, এই বার নিশ্চয় চূর্ণ হইলাম, মৃত্যুমূর্চ্ছায় গ্রাস করিল—এমন সময়েও সাধক যদি একবার নিমেষের জন্যও হৃদয় সরল করিয়া ঊর্দ্ধহস্তে প্রাণের কবাট খুলিয়া দোহাই গুরুদেব, রক্ষা কর বলিয়া হাত বাড়াইয়া দেন, তৎক্ষণাৎ সাধকের শাস্ত্রীয় সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গিয়া নিজ কটাক্ষে নিখিল বিঘ্নরাশি বিদূরিত করিয়া গুরুরূপিণী জগজ্জননী দ্বিভুজের পরিবর্ত্তে তখন দশভুজ প্রসারণ করিয়া আয় বাছা! আর ভয় নাই বলিয়া সাধককে সেই অভয়-ক্রোড়ে স্থান দিয়া ধন্য করেন, সাধকও সেইদিনে শেষ পরীক্ষা করেন—গুরু বড় কি, মা বড়! তাই বলি, ভাই সাধক! কবে তোমার সে দিন আসিবে যে দিন মায়ের স্বরূপে গুরু মিশিবেন, গুরুর স্বরূপে মা মিশিয়া যাইবেন আর তুমি সেই উভয় স্বরূপে এক করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আপনি আত্মহারা হইবে! করুণাময়ি মা! একবার করুণাকটাক্ষে ফিরিয়া চাও। তোমার সাধের ভারতের সাধককুলের হৃদয়তেজঃ একবার উজ্জ্বল করিয়া দাও, পিতৃরূপে গুরু হইয়া মাতৃরূপে দেখা দিয়া পুত্ররূপের সিদ্ধি সাধনা পূর্ণ কর, আর আমরা সেই প্রসাদের দাস হইয়া আনন্দে নাচিয়া গাই—

কেউ তোমায় সাধে না শ্যামা। তুমি, আপ্‌নি সাধ আপন সাধ,
তুমি, আপন্ সুখে আপনি মে'তে যেমন হাস, তেম্‌নি কাঁদ।

সকল শাস্ত্রের মতামত কি, তাহা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া শুঝিয়া বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে বৃদ্ধকালে সিদ্ধি সাধনায় বদ্ধপরিকর হইব—এই সাহসে বুক বাঁধিয়া একদল অনুসন্ধিৎসু সম্প্রদায় বসিয়া আছেন। ইহাঁদের উদ্যম দেখিয়া বোধ হয়, মার্কণ্ডেয় দধীচি বলিরাজ ভীষ্মদেব প্রভৃতি চিরজীবিগণ ইহাঁদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ না কেহ হইবেন। মৃত্যুর কথা যেন ইহাঁদের জন্মকোষ্ঠীর বহির্ভূত। এই দল লক্ষ্য করিয়াই কবিগণ বলিয়াছেন, সমুদ্রে শ্রান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ—সমুদ্রের ঘোর তরঙ্গ নিবৃত্তি হইলে তবে স্নান করিব, এ বুদ্ধি বর্ব্বরদিগেরই ঘটিয়া থাকে। এইজন্যই কুলার্ণবতন্ত্রে দেবদেবী সংবাদে ভগবান বলিয়াছেন—

আত্মৈব যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ।
কোঽন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মানং তারয়িষ্যতি ॥ ১ ॥
ইহৈব নরকব্যাধে-শ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২ ॥
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবত্তত্ত্বং সমভ্যসেৎ।
সন্দীপ্তে ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩ ॥
ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ু র্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ।
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগা-স্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥
যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয়-বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥
কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখদুঃখৈর্জনো হন্তি ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
জাতানাপদ্‌গতানার্ত্তান্ দৃষ্ট্বাতিদুঃখিতান্ মৃতান্।
লোকো মোহসুরাং পীত্বা ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িচ্চঞ্চলমায়ুশ্চ কস্য কস্মাদতো ধৃতিঃ ॥ ৮ ॥
শতং জীবিতমিত্যল্পং নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী।
বাল্যরোগ-জরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥ ৯ ॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যে ভয়স্থানং হা নরঃ কেন হন্যতে ॥ ১০ ॥
তোয়ফেণসমে দেহে জীবে শকুনিবৎস্থিতে।
অনিত্যে প্রিয়সংসারে কথং তিষ্ঠন্তি নির্ভয়াঃ ॥ ১১ ॥

অহিতে হিতবুদ্ধিঃ স্যাদধ্রুবে ধ্রুবচিন্তকঃ।
অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী স্বমৃত্যুং ন হি বেত্তি কিম্ ॥ ১২ ॥
পশ্যন্নপি ন পশ্যেৎ স শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥
সন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
মৃত্যুরোগমহাগ্রাহে ন কিঞ্চিদপি বুধ্যতি ॥ ১৪ ॥

আত্মাই যদি আত্মাকে অকল্যাণ হইতে নিবারণ না করে তবে জগতে কে এমন হিতকর আছে যে, আত্মাকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারে? ॥ ১ ॥ ইহলোকেই যে ব্যক্তি নরকরূপ ব্যাধির চিকিৎসা না করে, সে আর পীড়িত হইয়া পরলোকে সেই ঔষধহীন দেশে গিয়া কি করিবে? ॥ ২ ॥ যতক্ষণ এ দেহ অবস্থিত আছে তাহার মধ্যেই পরমতত্ত্বের অভ্যাস করিবে। ইহার পর, এমন দুর্ম্মতি কে আছে যে গৃহ জ্বলিয়া উঠিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য তখন কূপ খনন করিতে আরম্ভ করে ॥ ৩ ॥ জীবকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যাঘ্রীর ন্যায় বদনব্যাদন করিয়া জরা অপেক্ষা করিতেছে, ভগ্নঘটে অবস্থিত জলের ন্যায় নিয়ত পরমায়ুঃ ফুরাইতেছে, গৃহাক্রমণকারী শত্রুর ন্যায় রোগসমস্ত নিরন্তর আঘাত করিতেছে। সেইহেতু যতশীঘ্র সম্ভবে নিজ শ্রেয়ঃসাধনে নিযুক্ত হইবে ॥ ৪ ॥ যতক্ষণ দুঃখ আসিয়া আশ্রয় না করে, যতক্ষণ আপদ্‌সকল উপস্থিত না হয়, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ বিকল না নয়, তাহারই মধ্যে শ্রেয়ঃসাধন করিবে ॥ ৫ ॥ নানা কার্য্যে কাল অতিবাহিত হইলেও তাহা জানা যায় না। সংসারসম্ভব সুখ দুঃখেই জীব হত হয় কিন্তু কি যে আত্মার হিতপথ তাহা তখনও অবগত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥ কত জীব, জাত আপদ্‌গত আর্ত্ত দুঃখিত এবং মৃত হইতেছে, এ সমস্ত দেখিয়াও মোহমদিরা পানে উন্মত্ত জীব কিছুতেই আপন হিত জানিতে পারে না ॥ ৭ ॥ সম্পৎ সকল স্বপ্নসদৃশ, যৌবন কুসুমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, পরমায়ুঃও বিদ্যুতের ন্যায় গতিশীল, কাহার ইহা দেখিয়া কিসের জন্য ধৈর্য্য থাকিতে পারে? ॥ ৮ ॥ মানবের পূর্ণ পরমায়ুঃ শতবৎসর, নিদ্রাই তাহার অর্দ্ধহারিণী, তাহার পর অবশিষ্ট অর্দ্ধ যাহা থাকে, বাল্য রোগ জরা দুঃখ ইত্যাদির দ্বারা সেই অর্দ্ধও নিষ্ফল হয় ॥ ৯ ॥ অবশ্য যাহার আরম্ভ করিতে হইবে, সে বিষয়ে নিরুদ্‌যোগ; যে সময়ে জাগিয়া থাকিতে হইবে, সেই সময়ে প্রসুপ্ত; যাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে তাহাতেই ভয়ের আশঙ্কা; হায়! কি দুর্ভাগ্যবশতঃই মানব এরূপে হত হয় ॥ ১০ ॥ তোয়ফেণের সমান এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে, বৃক্ষশাখায় অবস্থিত পক্ষীর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জীবনে, এই চির অনিত্য সংসারকে প্রিয় ভাবিয়া জীব কেমন করিয়াই নির্ভয় হইয়া অবস্থিত করে? ॥ ১১ ॥ অহিত বিষয়ে হিতবুদ্ধি হয়, অধ্রুব পদার্থে ধ্রুব চিন্তা করে, অনর্থে পরমার্থ জ্ঞান করে, তথাপি কি নিজমৃত্যু নিজে বঝিতে

পারে না? ॥ ১২ ॥ দেবি! তোমার মহামায়ায় মোহিত হইয়া জীব দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, পড়িয়াও জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ মৃত্যুরোগ মহাকুম্ভীর-সঙ্কুল গম্ভীর কাল-সাগরে এই সমগ্র জগৎ নিয়ত নিমগ্ন হইতেছে, কিন্তু তথাপি কাহারও কিছু বুঝিবার সাধ্য নাই ॥ ১৪ ॥

এইরূপে যাহা বুঝিয়াও বুঝিবার নহে, তাহাই বুঝিয়া শুঝিয়া পণ্ডিত হইয়া তবে দীক্ষিত হইব, এই আশা যাঁহারা করেন, ধন্য তাঁহাদিগের বিধাতাকে হাসাইবার ক্ষমতা। ইহার পর—দর্শন-তর্ক বেদ বেদান্ত পড়িয়া তবে দীক্ষিত হইব—এ আশা আরও ভয়ঙ্কর। কুলার্ণবে ভগবান বলিয়াছেন—

ষড়্‌দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ১ ॥
বেদার্থমপরিজ্ঞায় দহ্যমানা ইতস্ততঃ।
কালোর্ম্মিণা গ্রহগ্রস্তা-স্তিষ্ঠন্তি হি কুতার্কিকাঃ ॥ ২ ॥
বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি চ।
বিড়ম্বকস্য তস্যাপি তৎ সর্ব্বং কাকভাষিতম্ ॥ ৩ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়-মিতি চিন্তাসমাকুলাঃ।
পঠন্ত্যহর্নিশং দেবি! পরতত্ত্বপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪ ॥
কাব্যচ্ছন্দোনিবন্ধেন বাক্যালঙ্কার-শোভিতাঃ।
চিন্তয়া দুঃখিতা মূঢ়া-স্তিষ্ঠন্তি ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥
অন্যথা পরমং তত্ত্বং জনাঃ ক্লিশ্যন্তি চান্যথা।
অন্যথা শাস্ত্রসদ্ভাবো ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি চান্যথা ॥ ৬ ॥
কথয়ন্ত্যুন্মনীভাবং স্বয়ং নানুভবন্তি হি।
অহঙ্কারহতাঃ কেচিদুপদেশবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৭ ॥
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি দুর্লভা ভাববেদকাঃ।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং দর্ব্বীপাকরসং যথা ॥ ৮ ॥
শিরো বহন্তি পুষ্পাণি গন্ধং জানাতি নাসিকা।
পঠন্তি বেদশাস্ত্রাণি বিবদন্তি পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥
তত্ত্বমাত্মস্থমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতি।
গোপঃ কক্ষগতং ছাগং কূপে পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১০ ॥
সংসারমাত্রনাশায় শাব্দবোধো ন হি ক্ষমঃ।
ন নিবর্ত্তেত তিমিরং কদাচিদ্দীপরেখয়া ॥ ১১ ॥
প্রজ্ঞাহীনস্য পঠতো হ্যন্ধস্য দর্শনং যথা।
দেবি! প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১২ ॥

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্শ্বয়োরপি কেচন।
তত্ত্বমীদৃক্ তাদৃগিতি বিবদন্তি পরস্পরম্ ॥ ১৩ ॥
সদ্বিদ্যাদানশূরাদ্যৈ গু'ণৈ র্বিখ্যাতমানবাঃ।
ঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরস্থঃ কথ্যতে জনৈঃ ॥ ১৪ ॥
প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্ত্তায়া গ্রহণং প্রিয়ে!
এবং যে শাস্ত্রসংমূঢ়া-স্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্ব্বতঃ শ্রোতুমিচ্ছতি।
দেবি! বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নৈব গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥
বেদাদ্যনেকশাস্ত্রাণি স্বল্পায়ু র্বিঘ্নকোটয়ঃ।
তস্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ ক্ষীরং হংস ইবাম্ভসি ॥ ১৭ ॥
অভ্যস্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা হি বুদ্ধিমান্।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রং পরিত্যজেৎ।
যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্ ॥ ১৮ ॥
ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তি র্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে ॥ ১৯ ॥
ন বেদাঃ কারণং মুক্তে র্দর্শনানি ন কারণম্।
তথৈব সর্ব্বশাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥ ২০ ॥
মুক্তিদা গুরুবাগেকা বিদ্যাঃ সর্ব্বা বিড়ম্বকাঃ।
কাষ্ঠভারশ্রমাদস্মাদেকং সঞ্জীবনং পরম্ ॥ ২১ ॥
অদ্বৈতন্তু শিবেনোক্তং ক্রিয়ায়াসবিবর্জ্জিতম্।
গুরুবক্ত্রেণ লভ্যেত নাধীতাগমকোটিভিঃ ॥ ২২ ॥

প্রিয়ে! পশুপাশনিয়ন্ত্রিত মূঢ়গণ ষড়্‌দর্শন-মহাকূপে পতিত হইয়া পরমার্থ কি, তাহা জানিতে পারে না ॥ ১ ॥ বেদার্থের অপরিজ্ঞানহেতু কুতার্কিকগণ সংশয়ানলে দহ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে কালতরঙ্গপ্রেরিত হইয়া মৃত্যুরূপ কুম্ভীরের করাল কবলমধ্যে তাহারা বাস করিতেছে ॥ ২ ॥ বেদাগম-পুরাণের অভিজ্ঞ অথচ পরমার্থের অনভিজ্ঞ, এতাদৃশ পরবিড়ম্বক পণ্ডিতের যাহা কিছু উক্তি, সে সমস্তই কাকবাক্য বলিয়া (কাকের ধ্বনি অনুসারে লোকের শুভাশুভ নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু কাক তাহার কিছুরই অভিজ্ঞ নহে) জানিবে ॥ ৩ ॥ এইটি জ্ঞান, এই জ্ঞেয়, এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তাহারা অহর্নিশ শাস্ত্র পাঠ করে; কিন্তু দেবি! পরমতত্ত্বে চিরকালই পরাঙ্মুখ থাকিয়া যায় ॥ ৪ ॥ কাব্যশাস্ত্রের ছন্দোবন্ধে এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রে অনেকে বাহিরে সুশোভিত হয়, কিন্তু সেই সকল ব্যাকুলেন্দ্রিয় মূঢ়গণ অন্তরে চিন্তিত এবং দুঃখিত হইয়াই কালযাপন করে ॥ ৫ ॥ পরমার্থ-তত্ত্ব

একরূপ, জীবগণ তাহা জানিবার জন্য কষ্ট কল্পনায় চেষ্টা করে অন্যরূপ ; শাস্ত্রের ভাব একরূপ, তাহারা ব্যাখ্যা করে অন্যরূপ। উন্মনীভাবের ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং তাহা অনুভব করে না। অহঙ্কার-হত সুতরাং গুরূপদেশ-বিবর্জ্জিত হইয়া কেহ কেহ বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করে, কিন্তু তাহার যথার্থ ভাববেত্তা বড়ই দুর্ল্লভ। দর্ব্বী (হাতা) যেমন পাকের রস জানে না অথচ তাহার দ্বারাই পাক হয়, মস্তক যেমন পুষ্পবহন করে, কিন্তু তাহার গন্ধজ্ঞান হয় নাসিকায়, তদ্রূপ ইহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব যাহা তাহা সাধু সাধকগণই অনুভব করেন। ইহাদের কার্য্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, কিন্তু তাহার ফল কেবল পরস্পর-বিবাদ ॥ ৬-৭ ॥ ॥ ৮-৯ ॥ মূঢ় জীব নিজ আত্মগত না জানিয়া কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নেই মুগ্ধ হয়, দুর্ম্মতি গোপ যেমন নিজ কক্ষে অবস্থিত ছাগকে কূপস্থ জলের ছায়ায় দর্শন করে ॥ ১০ ॥ শাস্ত্রীয় শব্দজ্ঞান কখনও সংসারের মাত্রাস্পর্শ সুখদুঃখ নাশে সমর্থ হইতে পারে না, যেমন চিত্রিত প্রদীপের তেজোরেখায় গৃহস্থিত অন্ধকার কখনও দূর হয় না ॥ ১১ ॥ প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ, যেমন অন্ধের দর্শন (নয়নোন্মীলনমাত্র), দেবি ! প্রজ্ঞাবান পুরুষের পক্ষেই শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানের কারণ ॥ ১২ ॥ তত্ত্ব যে স্থানে অবস্থিত, কেহ তাহার অগ্রে থাকিয়া, কেহ পৃষ্ঠে থাকিয়া, কেহ তাহার বামপার্শ্বে, কেহ বা দক্ষিণপার্শ্বে, দাঁড়াইয়া তত্ত্ব এই রূপ, ঐ রূপ, সেই রূপ বলিয়া পরস্পর বিবাদ করে। সদ্বিদ্যা দান শৌর্য্য ইত্যাদি গুণরাশির দ্বারা বিখ্যাত মানবও যদি দূরস্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেও লোকে যেমন কেহ ঈদৃশ, কেহ তাদৃশ ইত্যাদি নানারূপ ব্যাখ্যা করে (ফলতঃ তত্ত্ব ঈদৃশ কি তাদৃশ এইরূপ বিবাদ যাহাদিগের রহিয়াছে, তত্ত্ব হইতে তাহারা যে দূরে অবস্থিত, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ) ॥ ১৩-১৪ ॥ প্রত্যক্ষগ্রহণ কাহারও নাই, অথচ পরমুখ হইতে শ্রুত বার্ত্তার গ্রহণ আছে অর্থাৎ সাধনাবলে স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, তাহার সাধনা না করিয়া শাস্ত্রীয় নানাপথের নানাকথা লইয়া বিতণ্ডা-বাদে পাণ্ডিত্য আছে। প্রিয়ে ! এইরূপ যাহারা শাস্ত্রসংমূঢ়, তাহারা যে মূলতত্ত্ব হইতে দূরস্থ, ইহা নিঃসংশয় ॥ ১৫ ॥ একটি জ্ঞান, একটি জ্ঞেয়, সমস্ত শাস্ত্রের নিকট হইতে ইহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু দেবি ! জীব ইহা জানে না যে, শতবর্ষ দূরে থাক্‌, সহস্রবর্ষ-পরমায়ুঃ গত হইলেও শাস্ত্রের অন্ত পাইবার নহে ॥ ১৬ ॥ বেদাদি শাস্ত্র অনেক, পরমায়ুঃ অতি অল্পকাল, তাহার মধ্যে আবার কোটি কোটি বিঘ্ন অবস্থিত, সেইজন্য সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে যাহা সারাংশ তাহাই গ্রহণ করিবে, হংস যেমন জলমধ্য হইতে দুগ্ধের অংশ গ্রহণ করে ॥ ১৭ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে তত্ত্ব-পদার্থ অবগত হইয়া, ধান্যার্থী পুরুষ যেমন ধান্য সংগ্রহ করিয়া পলালকে পরিত্যাগ করে তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবে। অমৃতপানে পরিতৃপ্ত পুরুষের যেমন আর আহারে প্রয়োজন নাই তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরও আর

শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥ বীরবন্দিতে! কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, অন্যথা কি বেদাধ্যয়ন, কি শাস্ত্রপাঠ, কিছুতেই মুক্তি-সম্ভাবনা নাই ॥ ১৯ ॥ বেদসমস্তও মুক্তির কারণ নহে, দর্শনসমস্তও মুক্তির কারণ নহে, তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রই মুক্তির কারণ নহে, একমাত্র জ্ঞানই কেবল মুক্তির কারণ ॥ ২০ ॥ একমাত্র গুরুবাণীই মুক্তিদায়িনী, অন্য সমস্ত বিদ্যাই বিড়ম্বনা, এই সকল লৌকিক বিদ্যারূপ অচেতন কাষ্ঠভারের বহন-পরিশ্রম অপেক্ষা গুরুদত্ত একটি সঞ্জীবন মহামন্ত্র-ধারণও শ্রেষ্ঠ ॥ ২১ ॥ ক্রিয়ায়াস-বিবর্জ্জিত অদ্বৈততত্ত্ব স্বয়ং শিব কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, কেবল গুরুমুখ হইতেই জীব তাহা লাভ করিতে সমর্থ, অন্যথা কোটিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তাহা লব্ধ হইবার নহে ॥ ২২ ॥

শাস্ত্র কেবল গুরু-পরীক্ষার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, শিষ্যকেও বিলক্ষণ পরীক্ষিত হইতে বলিয়াছে। দীক্ষার পূর্ব্বে বর্ণভেদে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, চারি বৎসর গুরুর নিকট নিয়ত বাস করিতে হইবে। গুরু তাঁহাকে নিয়ত কঠোর আজ্ঞাপ্রদানে গুরুভক্তি এবং দেবভক্তির পরীক্ষা করিবেন। শিষ্যের কায়মনোবাক্য ঘটিত কোন বিষয় গুরুর অবিদিত থাকিবে না। এই কয়েক বৎসরের পরীক্ষার মধ্যেই গুরু তাঁহার চিরজীবনের সকল তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। শিষ্য যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া ভবিষ্যতে যথাশাস্ত্র সাধনায় অগ্রসর হইবেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন। জানি না, আজ কয়জন শিষ্য এইরূপ পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং কয়জন এইরূপ পরীক্ষার কথা শুনিয়া থাকেন, আর কয়জন গুরুই বা এরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? বর্ত্তমানকালের প্রচলিত রীতি দেখিয়া বোধ হয়, গুরু ও শিষ্য যেন নিজ নিজ পরীক্ষার দায় পরস্পরে ঘরে ঘরে মিটাইয়া লইয়াছেন। সেই পরস্পর-সমন্বয়ের ফলেই দিন দিন গুরুকুল নির্ম্মূল এবং শাসনের যোগ্য শিষ্যকুল শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিতেছেন। ভগবান ভূতভাবন শিষ্যপরীক্ষার নিয়মও তন্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার পরিণাম যাহা হইবে তাহাও বলিয়াছেন—

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ। (নবরত্নেশ্বরে)

গুরু ও শিষ্য এক বৎসরকাল একত্র বাস করিলে তাঁহাদিগের দীক্ষাদানের ও দীক্ষাগ্রহণের উপযোগিতা হইবে। সারসংগ্রহে—

সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।

সদ্গুরু নিজের আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন। এই পরীক্ষা কেবল ব্রাহ্মণ-শিষ্যের সম্বন্ধে। ক্ষত্রিয়াদি শিষ্য হইলে তাঁহাদিগের পরীক্ষা উত্তরোত্তর অধিককাল-ব্যাপিনী হইবে। রুদ্রযামলে—

বর্ষৈকেণ ভবেদ্ যোগ্যো বিপ্রো হি গুরুভাবতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতো শিষ্যযোগ্যতা॥

ব্রাহ্মণ এক বৎসরে, ক্ষত্রিয় দুই বৎসরে, বৈশ্য তিন বৎসরে এবং শূদ্র চারি বৎসরে গুরুভক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হইলে তবে দীক্ষা-যোগ্য হইবেন। কুলার্ণবাদিতন্ত্রে—

ধনেচ্ছাভয়লোভাদ্যৈরযোগ্যং যদি দীক্ষয়েৎ।
দেবতাশাপমাপ্নোতি কৃতঞ্চ বিকৃতং ভবেৎ॥
পরশিষ্যে দুষ্টবংশে ধূর্ত্তে পণ্ডিতমানিনি।
স্ত্রীদ্বিষ্টে সময়ভ্রষ্টে ব্যঙ্গে দীক্ষা তু নিষ্ফলা॥
অন্যায়েন চ যো দদ্যাদ্ গৃহ্ণাত্যন্যায়তশ্চ যঃ।
দদতো গৃহ্ণতো দেবি! দেবীশাপঃ প্রজায়তে॥
অকৃত্বা বিধিবদ্দীক্ষামযষ্ট্বা গুরুপাদুকাং।
ইহ দারিদ্র্যমাপ্নোতি দেব্যাঃ শাপঃ প্রজায়তে॥
ভুক্তিমুক্তি-প্রসিদ্ধ্যর্থং পরীক্ষ্য বিধিবদ্ গুরুঃ।
পশ্চাদুপদিশেন্মন্ত্রমন্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ॥
গুরুশিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরম্।
উপদেশং দদদ্ গৃহ্নন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্॥
অশাস্ত্রীয়োপদেশন্তু যো গৃহ্ণাতি দদাতি চ।
ভুঞ্জীয়াতামুভৌ ঘোরান্ নরকানেকবিংশতিম্॥
অসংস্কৃতোপদেশঞ্চ যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
বিনশ্যন্তি চ তন্মন্ত্রাঃ সৈকতে শালিবীজবৎ॥
মন্ত্রিপাপঞ্চ রাজানং পতিং জায়াকৃতং যথা।
তথা শিষ্যকৃতং পাপং প্রায়ো গুরুমপি স্পৃশেৎ॥

ধনলাভের ইচ্ছা, ভয়, লোভ ইত্যাদি কারণবশতঃ গুরু যদি অযোগ্য পাত্রকে দীক্ষিত করেন তাহা হইলে তিনি দেবতার শাপ লাভ করিবেন এবং তৎকৃত দীক্ষাও অসিদ্ধ হইবে।

পরশিষ্য, দুষ্টবংশজাত, ধূর্ত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী, স্ত্রীদ্বিষ্ট (স্ত্রী যাহাকে দ্বেষ করে), সময়ভ্রষ্ট (দীক্ষার কাল যাহার অতীত হইয়াছে), ব্যঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ) শিষ্য এতাদৃশ হইলে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করা নিষ্ফল।

অন্যায়পূর্ব্বক যিনি দীক্ষা দান করেন এবং যিনি গ্রহণ করেন, এই দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই দেবীর শাপগ্রস্ত হয়েন। বিধিবৎ দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া এবং গুরুচরণাম্বুজে পূজা না করিয়া শিষ্য ইহলোকে দারিদ্র্য এবং দেবীশাপ লাভ করিবেন।

শিষ্যের ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধির নিমিত্ত গুরু যথাশাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্রোপদেশ করিবেন। অন্যথা, দীক্ষা নিষ্ফলা হইবে। গুরু শিষ্য উভয়েই মোহবশতঃ পরস্পর পরীক্ষা না করিয়া যদি মন্ত্রোপদেশ দান ও গ্রহণ করেন তাহা হইলে উভয়েই পিশাচত্ব লাভ করিবেন। অশাস্ত্রীয় উপদেশ যিনি দান করেন এবং গ্রহণ করেন, ইঁহারা উভয়েই একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত ঘোর নরক ভোগ করেন।

মূঢ়বুদ্ধি গুরু অসংস্কৃত পুরুষে উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার সেই সকল মন্ত্র বিনষ্ট অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়, যেমন বালুকাক্ষেত্রে শালিবীজ বপন করিলে তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। মন্ত্রিকৃত পাপ যেমন রাজাকে স্পর্শ করে, পত্নীকৃত পাপ যেমন পতিকে স্পর্শ করে তদ্রূপ শিষ্যকৃত পাপও প্রায়ই গুরুকে স্পর্শ করে। রুদ্রযামলে—

কামুকং কুটিলং লোকনিন্দিতং সত্যবর্জ্জিতং।
অবিনীতমসামর্থ্যং প্রজ্ঞাহীনং রিপুপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
সদাপাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকং।
কলিদোষসমূহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩ ॥
আশ্রমাচারহীনঞ্চাশুদ্ধান্তঃকরণোদ্যতম্।
সদা শ্রদ্ধাবিরহিতমধৈর্য্যং ক্রোধিনং তথা ॥
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং সদা।
অসদ্বুদ্ধি-সমূহোত্থ মভক্তং দৈন্যচেতসম্ ॥
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জ্জয়েদ্ গুরুঃ।
যদি ন ত্যজ্যতে বীর ধনাদিদানহেতুনা ॥
নারকী শিষ্যবৎ পাপী তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
ক্ষণাদসিদ্ধঃ স ভবেৎ শিষ্যাসাদিত-পাতকৈঃ ॥
অকস্মান্নরকং প্রাপ্য কার্য্যনাশায় কেবলং।
বিচার্য্য যত্নাদ্ বিধিবৎ শিষ্যসংগ্রহমাচরেৎ।
অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থো ভবেদ্ গুরুঃ ॥

কামুক, কুটিল, লোকনিন্দিত, সত্যবর্জ্জিত, অবিনীত, কামাদিপ্রিয়, সর্ব্বদা পাপক্রিয়াসক্ত, সামর্থ্যহীন, প্রজ্ঞাহীন, বিদ্যাশূন্য, জড়বুদ্ধি, কলিদোষসমূহে আবৃতাঙ্গ, বেদক্রিয়াবিবর্জ্জিত, আশ্রমাচারহীন, অশুদ্ধান্তঃকরণে সাধনোদ্যত, সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবিরহিত, অধৈর্য্য, ক্রোধী, অসচ্চরিত্র, গুণহীন, পরদারাতুর, অসদ্ বুদ্ধিসমূহের আকর, অভক্ত, দীনচেতা, নানানিন্দায় আবৃতাঙ্গ এতাদৃশ শিষ্যকে গুরু বর্জ্জন করিবেন। বীর! ধনাদিদান হেতু যদি ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে সেই শিষ্যবৎ পাপীগুরু নারকী এবং শিষ্যাপেক্ষায়ও বিশেষ পাপভাগী হইবেন। সেই

শিষ্যোপার্জ্জিত পাতকভারে গুরু ক্ষণকাল মধ্যে অসিদ্ধ হইয়া কেবল নিজ কার্য্য নাশের নিমিত্ত অকস্মাৎ নরকে পতিত হইবেন। অতএব যত্নপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া গুরু শিষ্য-সংগ্রহ করিবেন, অন্যথা শিষ্যদোষে গুরুকে নরকস্থ হইতে হইবে।

॥ দীক্ষাকাল ॥

ক্ষত্রিয়াদির কথা সুদূরপরাহত, আজকাল এমন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সন্তান সন্ততিগণ কোনরূপ নাস্তিকতাগ্রস্ত নহেন, নিজ ধর্ম্মে বিশেষ বিশ্বাস ও আস্থাও আছে, তাঁহাদিগেরও ধারণা এই যে, বয়ঃক্রম যতই কেন না হউক, জীবনে কোন একদিন দীক্ষিত হইলেই শাস্ত্রের আজ্ঞা রক্ষিত হইল। ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের গুরুকুলেরও সংস্কার ঐরূপ। এ সংস্কারের মূল কেবল আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত গুরুকুলের গুরুগিরি। যাহা হউক, দীক্ষার কার্য্য—সাধনা, ফল— সিদ্ধি, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। সাধনা—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ উপায়ের পরস্পর-সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। শারীরিক বৃত্তি-সকল পূর্ণাবয়বে পল্লবিত হইলেই বুঝিতে হইবে, দীক্ষার বসন্তবায়ুর সঞ্চার হইয়াছে। এইকালে যাঁহাদিগের দীক্ষা সম্পন্ন না হয়, পূর্ব্বোক্ত বচনে নিষিদ্ধশিষ্য-লক্ষণে শাস্ত্র তাঁহাদিগকেই সময়ভ্রষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীক্ষার কাল ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম, রাধাতন্ত্রে—শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবীবাক্যম—

সম্প্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥
যদি নো কুরুতে পুত্রঃ সম্প্রাপ্তে বর্ষষোড়শে।
হরিনাম বৃথা তস্য গতে তু বর্ষষোড়শে ॥
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যা দীক্ষা হি বর্ষষোড়শে।
অন্যথা পশুবৎ সর্ব্বং তস্য কর্ম্ম ভবেৎ সুত ॥

ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম প্রাপ্ত হইলেই সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। পুত্র যদি ষোড়শবর্ষে দীক্ষা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে হরিনাম গ্রহণরূপ সংস্কারও বৃথা (সাধনার কাল অতীত হইলে সাধনার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অসম্ভব, অসাধিত মন্ত্রও সম্যক্ ফলপ্রদ হয় না)। অতএব, যত্নপূর্ব্বক ষোড়শবর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অন্যথা তাহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই পশুকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। এইজন্যই ভগবান মহেশ্বর বলিয়াছেন,

আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং,
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাং।

নারাধয়ন্তি জগতাং জননিত্রি ! যে ত্বাং,
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি ॥

চতুরশীতিলক্ষযোনি-ভ্রমণোপযোগী সুদীর্ঘকালের পর দুর্লভ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাহাতে আবার নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের পটুত্ব লাভ করিয়া, ত্রিজগজ্জননি ! যাহারা তোমাকে আরাধনা না করে, নিঃশ্রেণিকার (সোপানপরম্পরার) অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া তাহারা পুনঃ পতিত হয়। সোপানের নিম্নাংশ বা মধ্যাংশ হইতে পতিত ব্যক্তির আহত হইবার সম্ভাবনা, উচ্চাংশ হইতে পতিত ব্যক্তির হত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইলে তাহার যেমন চূর্ণিত চূর্ণায়মান না হইয়া আর অব্যাহতি নাই, তদ্রূপ মানবজীবন এবং ততোধিক দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পতিত হইলে তাঁহারও আর সহজে নিস্তার নাই। কুলার্ণবে—

পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে।
শুষ্যতে সাগরজলং শরীরে দেবি ! কা কথা ॥ ১ ॥
অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে।
লপন্তমিতি মর্ত্ত্যং হি হন্তি কালবৃকোদরঃ ॥ ২ ॥
ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্।
এবমীহাসমাযুক্তং মৃত্যুরত্তি জনং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাপ্যথবাঽকৃতম্ ॥ ৪ ॥
জরাদর্শিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকং।
মৃত্যুশত্রুসমাদিষ্ট-মায়ান্তং কিং ন পশ্যতি ॥ ৫ ॥
তৃষ্ণাসূচীবিনির্ভিন্নং মিশ্রং বিষয়সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্ ॥ ৬ ॥
বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি।
সর্ব্বানাদিশতে মৃত্যুরেবম্বিধমিদং জগৎ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণুমহেশাদি-দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ৮ ॥

যাহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হয়, সুমেরু বিশীর্ণ হয়, সাগরের জল শুষ্ক হয়, দেবি তাহার প্রভাবে যে পার্থিব দেহের ধ্বংস হইবে, ইহাতে আর কথা কি ? ॥ ১ ॥ আমার অপত্য, আমার কলত্র, আমার ধন, আমার বান্ধব, এই প্রলাপ শেষ হইতে না হইতেই মৃত্যুব্যাঘ্র আসিয়া মর্ত্ত্যদেহ আক্রমণ করে ॥ ২ ॥ ইহা করিলাম, ইহা করিতে হইবে, এই আর একটী করা হইল, আর একটী করা হয় নাই, মানব এইরূপ চেষ্টায়

ব্যতিব্যস্ত থাকিতেই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আগামী দিনের কর্ত্তব্য কার্য্য অদ্য সম্পন্ন করিবেন, অপরাহ্নের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করিবেন। কারণ, মৃত্যু কাহারও কোন কর্ম্ম কৃত বা অকৃত রহিয়াছে, এ প্রতীক্ষা করে না ॥ ৪ ॥ জরা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ, মৃত্যুরূপ শত্রু কর্ত্তৃক আদিষ্ট, তাহার সেই ব্যাধিরূপ প্রচণ্ড সৈন্যগণ আগতপ্রায়, ইহা দেখিয়াও কি জীব দেখিতে পায় না ? তৃষ্ণারূপ সূচী (লৌহ শলাকা) দ্বারা বিনির্ভিন্ন, বিষয়রূপ ঘৃতের দ্বারা সংমিশ্রিত এবং আসক্তি ও বিদ্বেষরূপ অনলে পক্ক করিয়া মৃত্যু মানবকে ভোজন করিতেছে ॥ ৫-৬ ॥ কি বালক, কি যৌবনস্থ, কি বৃদ্ধ, কি গর্ভস্থ, মৃত্যু ইহার সকলকেই নিজ শাসনের বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ। দৃশ্যমান জগৎ এইরূপেই মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেববর্গ এবং সমস্ত ভূতজাতি নিজ নিজ নাশের (অন্তর্দ্ধানের) অনুধাবন করেন। অতএব, সর্ব্বান্তঃকরণে যাহা নিজের ইহ পরলোকের কল্যাণ-সাধন, জীব সত্বর হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮ ॥

এই সকল প্রত্যক্ষ শাস্ত্রবাক্যে যিনি বিশ্বাসশীল, নৈসর্গিক নিয়মে পরিদৃশ্যমান জীবলোকের জলবিম্ববৎ পার্থিব দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে যিনি চক্ষুষ্মান্ মানব-জীবনের এক পলার্দ্ধ পরমায়ুর বিনিময়ে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যও তাঁহার নিকটে তৃণবৎ নগণ্য। জানি না একবার এ দেহপাত হইলে নিজকৃত কর্ম্মানুসারে আবার কোন্ অন্ধতমস প্রদেশে যাত্রা করিতে হইবে ? স্বয়ং দেবগণও যে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দেব-ভোগ পরিহারপূর্ব্বক দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করেন— সেই এই অযত্নলব্ধ মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষ—সেই আর্য্যাবর্ত্ত, সেই মানবত্ব, এবার যদি ইহা হারাইলাম, কে এমন সৌভাগ্যশালী, সাহস করিয়া বলিতে পারে যে—নিশ্চয় আবার এই দেবদুর্লভ ভারতে—এই আর্য্যাবর্ত্তে আসিতেছি, এই মানবত্ব, এই ব্রাহ্মণত্ব আবার লাভ করিতেছি। কোন্ অদৃষ্ট-বায়ুভরে এ বাষ্পপ্রায় খণ্ড-মেঘ কোথায় কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে উড়িয়া যাইবে, কাহার সাধ্য তাহা বলিতে পারে ? তাই এই বেলা বেলা থাকিতে খেলা ভাঙ্গিয়া মায়ের নিকটে যাইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে, এ ঘোর অন্ধকারে পথ পাইবার জন্য গুরুচরণে একান্তশরণাপন্ন হইতে হইবে, গুরুর কৃপাপাত্র হইবার জন্য শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার দাসানুদাস হইতেই হইবে।

শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্র যেরূপ লক্ষণে লক্ষিত হইলে গুরুকরুণা-কল্পলতা তাহাতে কৈবল্য-ফল প্রসব করিবে, অপার-করুণানিধি শাস্ত্রই তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যথা, গৌতমীয়তন্ত্রে—

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদঃ কুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ ॥

ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভি-র্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
অনিত্যকর্ম্মণস্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহো বিমৎসরঃ ॥
গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো গুরুদুঃখদঃ ॥

সৎকুলসম্ভব, শুদ্ধাত্মা, পুরুষার্থপরায়ণ (ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধনে তৎপর), অধীতবেদ, কুশল, পিতৃহিতরত, ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তা, গুরুশুশ্রূষারত, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, দৃঢ়দেহ, দৃঢ়াশয়, নিয়ত জীবহিতৈষী, পারলৌকিক কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী, বাক্য, মন, দেহ ও ধন দ্বারা গুরুসেবায় রত, যাহার ফল অতি অল্পকাল স্থায়ী তাদৃশ কর্ম্মের ত্যাগী এবং যাহার ফল চিরকাল-স্থায়ী তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, জিতালস্য, জিতমোহ, বিমৎসর, গুরুর ন্যায় গুরুর পুত্র কলত্রাদিতেও ভক্তিমান্, শিষ্য এবম্বিধ-গুণ-সম্পন্ন হইবেন। ইহার বিপরীত হইলেই সে শিষ্য কেবল গুরুর দুঃখের হেতুভূত হয়। কুলার্ণবে—

নষ্টান্বয়ায়জং ক্ষেত্রগুণহীনং নিরূপিতং।
পরশিষ্যঞ্চ পাষণ্ডং ষণ্ডং পণ্ডিতমানিনম্ ॥
হীনাধিকবিকারাঙ্গং বিকলাবয়বান্বিতং।
পঙ্গুমন্ধঞ্চ বধিরং মলিনং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥
উৎসৃষ্টং দুর্ম্মুখং বাপি স্বেচ্ছাবেশধরং পরং।
দুর্ব্বিকারাঙ্গচেষ্টাদি-গতিভাষণভীষণম্ ॥
নিদ্রাতন্দ্রাজড়ালস্য-দ্যূতাদিব্যসনান্বিতং।
অন্তর্ভক্তিকরং ক্ষুদ্রং রাজভক্তিবিবর্জিতম্ ॥
ব্যলীকবাদিনং শুষ্কং প্রেষিতং প্রেরকং শঠং।
ধনস্ত্রীশুদ্ধিরহিতং নিষেধবিধিবর্জ্জিতম্ ॥
রহস্যভেদকং বাপি দেবি! কার্য্যবিনাশকং।
মার্জ্জরবকবৃত্তিঞ্চ রন্ধ্রান্বেষণতৎপরম্ ॥
মায়াবিনং কৃতঘ্নঞ্চ প্রচ্ছন্নান্তরদারকং।
বিশ্বাসঘাতিনং দ্রোহকারিণং পাপকর্ম্মিণম্।
আততায়িনমেকাক্ষং কুৎসিতং কূটসাক্ষিণম্ ॥
সর্ব্বপ্রতারকং দেবি! সর্ব্বোৎকৃষ্টাভিমানিনং।

অসত্যং নিষ্ঠুরাসক্তং গ্রাম্যাদিবহুভাষিণম্ ॥
কুবিচারকুতর্কাদি-কারকং কলহপ্রিয়ং।
বৃথাক্ষেপকরং মূর্খং চার্ব্বাকং বাগ্বিড়ম্বকম্ ॥
পরোক্ষে দূষণকরং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বাগ্‌ব্রহ্মবাদিনং বিদ্যা-চৌরমাত্মপ্রশংসকম্ ॥
গুণাসহিষ্ণুমহিতং আত্মক্রোধনমন্বিকে।।
ইত্যাদিদোষসংযুক্তং গুরুঃ শিষ্যং ন কারয়েৎ ॥

নষ্টান্বয়জ (ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত বা উৎসন্নপ্রায় বংশে জাত), ক্ষেত্রগুণহীন (মাতৃকুলেরও কোন গুণ যাহাতে বিদ্যমান নাই), পরশিষ্য (যিনি একবার কোন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত), পাষণ্ড, ষণ্ড (নপুংসক অথবা সাধনায় অক্ষম), পণ্ডিতমানী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, বিকৃতাঙ্গ, পঙ্গু, অন্ধ, বধির, মলিন, ব্যাধিপীড়িত, উৎসৃষ্ট (সমাজত্যক্ত), দুর্ম্মুখ, স্বেচ্ছাবেশধর, যাহার অঙ্গ ভঙ্গী ইত্যাদি দূষিত এবং বিকৃত, যাহার গমন এবং বচন ভয়ঙ্কর, নিদ্রা এবং তন্দ্রায় নিয়ত জড়প্রায়, আলস্য ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে আসক্ত, অন্তর্ভক্তি (যাহার বাহ্যলক্ষণে কোন ভক্তি চিহ্ন প্রকাশ পায় না), ক্ষুদ্রাশয়, রাজভক্তিবিবর্জ্জিত, ব্যলীকবাদ, (অসম্ভব, অসঙ্গত এবং অশ্লীলভাষী), শুষ্কহৃদয়, প্রেষিত (নিজের কোন বিশেষ ইচ্ছা নাই অথচ অন্যের প্ররোচনায় দীক্ষাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত), প্রেরক (নিজে কোন অনুষ্ঠান করে না, কেবল অন্যের প্রেরণায় পটু), শঠ, ধন-স্ত্রী-শুদ্ধিরহিত (যাহার ধন শাস্ত্রবিহিত উপায়ে উপার্জ্জিত নহে এবং যাহার স্ত্রী যথাশাস্ত্র বিবাহিতা ও সচ্চরিত্রা নহে), নিষেধ-বিধিবর্জ্জিত (শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠানকারী এবং শাস্ত্রবিহিত বিষয়ের অনুষ্ঠানবিরত), রহস্যভেদক (গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশক), কার্য্যনাশক, মার্জ্জারবৃত্তি (বিড়াল যেমন কোন ভোগ্য বস্তু পাইলে সাধারণের সমক্ষ হইতে অন্তরালে গিয়া তাহা ভোজন করে তদ্রূপ যে আত্মম্ভরি), বকবৃত্তি (বক যেমন বাহ্য লক্ষণে অতি স্থির ধীরভাবে বসিয়া একাগ্র হৃদয়ে পরপ্রাণ-হিংসার অনুধ্যান করে, তাহার ন্যায় বাহ্যলক্ষণে প্রশান্ত হইয়া অন্তরে যে ব্যক্তি পরম দারুণ), পরচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ী, মায়াবী, কৃতঘ্ন, প্রচ্ছন্নান্তরদারক (প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যে ব্যক্তি পরের অন্তস্তত্ত্ব ভেদ করে), বিশ্বাসঘাতী, বিদ্রোহী, পাপকর্ম্ম, আততায়ী (অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥) অগ্নিদ (গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী), গরদ (বিষদানকারী), শস্ত্রপাণি (আঘাতের নিমিত্ত উদ্যত অস্ত্রধারী), ধনাপহারী, ক্ষেত্রদারাপহারী (ভূমি এবং স্ত্রীর অপহরণকারী) এই ছয় ব্যক্তি আততায়ী। একচক্ষু, নিন্দিত, কূটসাক্ষী, সর্ব্বপ্রতারক, সর্ব্বোৎকৃষ্টাভিমানী, অসত্যবাদী, নিষ্ঠুর কর্ম্মে আসক্ত, অশ্লীলভাষী এবং বহুভাষী, কুবিচার ও কুতর্কাদিকারী, কলহপ্রিয়,

বৃথাভর্ৎসনকারী, মূর্খ, চার্ব্বাক (নাস্তিক), বাগ্‌বিড়ম্বক, পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, বাগ্‌ব্রহ্মবাদী (কথায় ব্রহ্মজ্ঞানী), বিদ্যাচোর (অন্যের বিদ্যাকে যে নিজের বিদ্যা বলিয়া পরিচয় দেয়), আত্ম-প্রশংসাকারী, পরগুণের অসহিষ্ণু, অহিতকারী, আত্মক্রোধন (ক্রোধাবেগের আধিক্যহেতু নিজের প্রতি নিজে অসন্তোষবশতঃ ক্ষুব্ধ), অম্বিকে ! ইত্যাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিকে গুরু শিষ্য করিবেন না। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

যথাযোগ্যগুণৈঃ পূর্ব্বৈর্ম্মুক্তশ্চাতিপ্রিয়ম্বদঃ।
বিশুদ্ধদেহবদনঃ শুদ্ধাম্বরধরঃ শুচিঃ ॥
বিমুখঃ পরনিন্দাসু দেবতাধর্ষণেষু চ।
পরান্নবনিতা-ভূমি-পীড়াসু বিগতস্পৃহঃ ॥
দয়ান্বিতঃ সর্ব্বজনে প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো গুরুভক্তশ্চ বুদ্ধিমান্ সুস্থিরাশয়ঃ ॥
অলুব্ধঃ স্থিরমৈত্রশ্চ গুরুবাক্যপ্রমাণকঃ।
সর্ব্বদা দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে সদৈবতে ॥
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্য-স্ত্বিতরো দুঃখকৃদ্ গুরোঃ।

*　　*　　*　　*

প্রণম্যোপবিশেৎ পার্শ্বে তথা গচ্ছেদনুজ্ঞয়া।
মুখাবলোকী সেবেত কুর্য্যাদাদিষ্টমাদরাৎ ॥
অসত্যং ন বদেদগ্রে ন বহু প্রলপেদপি।
কামং ক্রোধং তথা লোভং মানং প্রহসনং স্তুতিম্ ॥
চাপলানি চ জিহ্মানি কার্য্যাণি পরিদেবনং।
ঋণদানং তথাদানং বস্তুনাং ক্রয়বিক্রয়ম্ ॥
ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যোঽপি চ কদাচন।
যতো গুরুঃ শিবঃ সাক্ষাত্তং স্তবন্ প্রণমংস্ত্যজেৎ ॥
যথা দেবে তথা মন্ত্রে তথা মন্ত্রে যথা গুরৌ।
যথা গুরৌ তথা চাত্মন্যেবং ভক্তিক্রমঃ প্রিয়ে ॥
অবমত্য গুরোর্ব্বাক্যং স্ববুদ্ধ্যা কুরুতে তু যঃ।
ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধি র্মন্ত্রৈর্দেবপ্রপূজনৈঃ ॥
মন্ত্রেণ তস্য নিয়তং পূজাং কুর্য্যাদ্ যথোদিতাং।
আসনং শয়নং বস্ত্রং ভূষণং পাদুকাং তথা ॥
ছায়াং কলত্রমপ্যচ্চ যদ্‌গুরো-স্তৎ প্রপূজয়েৎ।
গুরুশয্যাসনং পীঠমুপানচ্ছত্রপাদুকাম্ ॥

স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।
গুরুং দৃষ্ট্বা ভবেৎ হৃষ্টঃ পরমানন্দনির্ভরঃ।
ভীতভীতঃ পদাম্ভোজং পশ্যেচ্চকিতলোচনঃ।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—পূর্ব্বোক্ত যথাযোগ্য গুণসমূহে যুক্ত, অতিপ্রিয়ংবদ, বিশুদ্ধদেহবদন, শুক্লাম্বরধর শুচি পরনিন্দা এবং দেবতার অবমাননায় বিমুখ, পরান্ন পরবনিতা পরভূমি এবং পরপীড়ায় বিগতস্পৃহ, সর্ব্বজনে দয়ান্বিত, প্রেক্ষাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, গুরুভক্ত বুদ্ধিমান্ সুস্থিরাশয় অলুব্ধ স্থিরমৈত্র গুরুবাক্য-প্রমাণকারী, গুরু, মন্ত্র এবং দেবতায় সর্ব্বদা দৃঢ়ভক্তি—শিষ্য এতাদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন, ইহার অন্যথা হইলেই তিনি গুরুর দুঃখকৃৎ।

* * * *

শিষ্য প্রণামপূর্ব্বক গুরুর পার্শ্বে উপবেশন করিবেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে গমন করিবেন। গুরুর মুখাবলোকী হইয়া সেবা করিবেন এবং আদরপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালন করিবেন। গুরুর অগ্রে অসত্য বাক্য এবং প্রলাপ প্রয়োগ করিবেন না; কাম ক্রোধ, লোভ, মান, প্রহসন, স্তুতি, চাপল্য, কুটিলকার্য্য, পরিদেবন, ঋণদান, ঋণগ্রহণ, বস্তুর ক্রয় বিক্রয় শিষ্য কদাচও গুরুর সহিত এ সকল আচরণ করিবেন না, যেহেতু গুরুদেব সাক্ষাৎ শিব, স্তব স্তুতি প্রণাম ইত্যাদি উপাসনার সম্বন্ধ ভিন্ন তাঁহার সহিত অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই তাঁহাতে মনুষ্য ভাবনা উপস্থিত হইবার কথা। যেমন ইষ্ট দেবতায় সেইরূপ মন্ত্রে, যেরূপ মন্ত্রে সেইরূপ গুরুদেবে, যেরূপ গুরুদেবে সেইরূপ আত্মাতে অভিন্নবুদ্ধি—ইহাই ভক্তিক্রম। গুরুবাক্যে অবমাননাপূর্ব্বক নিজবুদ্ধি অনুসারে যে ব্যক্তি উপাসনার অনুষ্ঠান করে, কি মন্ত্রজপ, কি দেবপূজা কিছুতেই কদাচ তাহার সিদ্ধি হইবে না। প্রত্যহ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গুরুর যথাশাস্ত্র পূজা করিবে। গুরুর আসন শয্যা বস্ত্র ভূষণ পাদুকা ছায়া পত্নী এবং এতদ্ভিন্ন গুরুসম্বন্ধীয় অন্য যাহা কিছু সে সমস্তই গুরুর বিভূতি বোধে পূজা করিবে। গুরুর শয্যা আসনপীঠ উপানহ ছত্র পাদুকা স্নানোদক এবং ছায়া কদাচও লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবকে দর্শন করিয়াই হৃষ্ট এবং পরমানন্দ-নির্ভর হইবে কিন্তু ভীত অপেক্ষাও ভীতভাবে চকিতলোচনে তাঁহার শ্রীপদাম্বুজ সন্দর্শন করিবে।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য শাস্ত্রে যাহা নির্দিষ্ট দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশ উদ্ধৃত করিলেও তন্ত্রতত্ত্বে স্থান সঙ্কুলন হয় না, সুতরাং সে অংশে হস্তক্ষেপ করা কেবল বিড়ম্বনা। ইষ্টদেবতাকেও পরোক্ষরূপে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র যাঁহাকে প্রত্যক্ষ শিবরূপিণং বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, বুদ্ধিমান সাধকবর্গ ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন সেই পরমারাধ্য পরমদেবতার প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য কতদূর?

। সাধারণ উপাসনাতত্ত্ব (পূজা) ।

আজকাল জ্ঞানাভিমানী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, দুর্ব্বল বা নিভান্ত নিম্নাধিকারীদিগের জন্যই প্রতিমা-পূজা আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা রহিয়াছে। আর্য্য-গৃহে অনার্য্যের দুর্গোৎসব-দর্শনের ন্যায় চণ্ডীমণ্ডপের বহিঃ-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া যাঁহারা এ সকল তত্ত্ববিচার করেন, তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর আমাদিগের অতি অল্প। আমরা শাস্ত্রের দাস, শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিবার জন্য দায়ী, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত পূজাতত্ত্ব কি, এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিব।

দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বের প্রকাশক, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকের ধারণা এই যে, সাকার-উপাসনা বা মূর্ত্তি-পূজা কেবল মনঃস্থির-তার উপায় মাত্র। যাঁহার মনঃস্থিরতা হইয়াছে, তাঁহার আর সাকার উপাসনা বা মূর্ত্তিপূজা করিবার প্রয়োজন নাই। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সাকার বা মূর্ত্তিস্থিত দেবতার সহিত উপাসকের এইরূপ বন্দোবস্ত যে যতদিন আমার মনঃস্থিরতা না হয় ততদিনই তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ, তাহার পর তুমি আর নাই—ইহাই স্থির। যে সাকার উপাসনার আরম্ভ এবং উপসংহারে সাধকের আমার এবং আমি বলিতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া আত্মহারা হইয়া আত্মসমর্পণ পূর্ণ করিবার কথা, যে সাকার উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া কুলার্ণবতন্ত্রে স্বয়ং ভগবান্ ভূতভাবন বলিয়াছেন—বিশ্বাসায় নমস্তস্মৈ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে। যেন মৃদ্দারুদৃষদঃ ফলন্ত্যবিফলং ফলং ॥ সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ী বিশ্বাসকে নমস্কার, যাহার প্রভাবে মৃত্তিকা দারু পাষাণও অবিফল ফলসকল প্রসব করে অর্থাৎ যে ঐকান্তিক বিশ্বাসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মৃণ্ময় দারুময় পাষাণময় জড় প্রতিমা বা যন্ত্রাদিতেও চৈতন্যময়ী দেবতা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া সাধকের অবিফল (সাক্ষাৎ সত্য) সিদ্ধি ফলসকল প্রদান করেন। সাধকের সেই দৃঢ়বিশ্বাস-ভিত্তিশিখরে সংস্থাপিত সাকার উপাসনার মূলে যদি সাকার দেবতা মিথ্যা, উহা কেবল চিত্ত স্থির করিবার উপায় এই সংস্কার দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে সে সাকার উপাসনার আকার যে কিরূপ, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। দ্বিতীয়ত এরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত দ্বারা প্রকারান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে যে, তাহা হইলে পূজা পাঠ জপ হোম শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি যাহা কিছু ব্যাপার, এ সমস্তই পণ্ডশ্রম বই আর কিছুই নহে; কেননা, চিত্তস্থির হওয়া পর্য্যন্তই সাকার উপাসনার একমাত্র ফল; এইরূপে যাহার এক একটি করিয়া আবরণ ভেদ করিলে অন্তর্গর্ভ প্রগাঢ় নাস্তিকতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে, সে সিদ্ধান্ত ভেদ করাও যে নিতান্ত পণ্ডশ্রম, বোধ হয় সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার অপেক্ষা নাই; তথাপি সাকার উপাসনা করিতে

করিতে কিরূপে নিরাকার দর্শন হয়, এই রহস্যের রহস্য ভেদ করিবার জন্যই এতদূর অবতারণা। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ—সাধক ক্রমশঃ ইষ্টদেবতার সর্ব্বাঙ্গে মনোবৃত্তি ধারণাপূর্ব্বক ধ্যান করিবেন অর্থাৎ প্রথমতঃ চরণতল হইতে মুখমণ্ডল অথবা মুখমণ্ডল হইতে চরণতল পর্য্যন্ত এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিতে করিতে নিশ্চল ধ্যানে যাহাতে অন্তঃকরণে একদা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের অভিব্যক্তি হয়, সাধক তদুপযোগী ধারণায় অগ্রসর হইবেন। এ অবস্থায় উত্তরোত্তর সাকার ধ্যানই প্রগাঢ় এবং নিশ্চল হইবার কথা, তাহাতে সাকার ধ্যান করিতে করিতে নিরাকার দর্শন আপনিই হইবে অর্থাৎ নিরাকার আসিয়া সাকারকে তাড়াইয়া দিবেন, এ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করেন, বলিহারি তাঁহাদিগের ধ্যানধারণার প্রগাঢ়তায়। শাস্ত্র অবশ্য বলিয়াছেন, স্থূলে তু নিশ্চলং চিত্তং ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি সঙ্গতং—স্থূলমূর্ত্তি ধ্যানে চিত্ত নিশ্চল হইলে তাহা সূক্ষ্মধ্যানেও সঙ্গত হইতে পারিবে, চিত্তবৃত্তিতে ঐকান্তিক ধারণা উপস্থিত হইলে তাঁহার স্থূলতত্ত্বের যে অভিব্যক্তি হয়, সূক্ষ্ম তত্ত্বেরও তদ্রূপই অভিব্যক্তি হইবে অর্থাৎ তাঁহার লীলাময় মূর্ত্তিধ্যানে লীলাতত্ত্বে অনুপ্রাণিত স্থূলভাব ভক্তবাৎসল্য করুণাময়ত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা ইত্যাদির যেমন অনুভব হইবে তদ্রূপ সূক্ষ্মরূপে চিৎশক্তি-স্বরূপে বিশ্বব্যাপকত্ব মায়াবিত্ব এবং মায়াতীতত্ব ইত্যাদি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকলেরও অনুভব হইবে। সাধকের সিদ্ধাবস্থায় হইয়াও থাকে তাহাই; তাহাতে সাকার উড়িয়া গিয়া নিরাকার দর্শন হইবে এ সিদ্ধান্ত আসিল কোথা হইতে, তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না; তবে সাকার ধ্যানের প্রথমেই সাকার মিথ্যা এই সংস্কার যাঁহাদিগের মূলভিত্তি, তাঁহাদিগের ভক্তির চোটে সাকার উড়িয়া যাইবেন, ইহাও বিচিত্র নহে; আর সাকার উড়িয়া গেলে তখন অভাবের স্ব-স্বরূপ নিরাকার দর্শন আপনিই ঘটিবে ইহাও অসম্ভব নহে। দুঃখের কথা এই যে, তাঁহাদিগের অদৃষ্টক্রমে অবশ্যম্ভাবী নিজের এই নিরাকার-দর্শনকে তাঁহারা শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ভগবান ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে স্বয়ং বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্। ১।
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্। ২।
বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরত-শ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে। ৩।
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্। ৪।

স্বর্ণ যেমন একমাত্র অগ্নিসংযোগেই নিজ মলকে পরিহার করে এবং অগ্নিতাপিত হইয়াই আবার যেমন নিজ রূপ (উজ্জ্বল কান্তি) লাভ করে, জীবের আত্মাও তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগেই কর্ম্মবাসনারূপ মলত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগেই আমার ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়। ১। আমার পবিত্র গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা আত্মা যেরূপ যেরূপ শোধিত হইবে, অঞ্জন-রঞ্জিত চক্ষু যেমন সূক্ষ্মবস্তুসকল লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় তদ্রূপ সেই মদ্ভক্তিশোধিতহৃদয় ভক্তও সেই সেই পরিমাণে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্ব-সকল সন্দর্শন করিতে থাকেন। ২। নিরন্তর স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সমূহের ধ্যানকারী পুরুষের চিত্ত যেমন বিষয়রাশিতেই আসক্ত হইয়া যায় তদ্রূপ যিনি নিরন্তর আমাকে ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তও আমার স্বরূপেই বিলীন হইয়া যায়। ৩। অতএব, হে উদ্ধব। স্বপ্নলব্ধ মনোরথের ন্যায় মায়াময় মিথ্যা সাংসারিক বিষয়ের অভিধ্যান পরিহারপূর্ব্বক মদ্ভাবভাবিত মনকে আমাতেই সমাহিত কর। ৪।

ধ্যানপ্রসঙ্গে আবার বলিয়াছেন—

বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলং।
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্‌। ১।
সমানকর্ণ-বিন্যস্ত-স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্‌। ২।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতং।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্‌। ৩।
দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণং।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধৎ। ৪।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ। ৫।
তৎসর্ব্বব্যাপকং চিত্ত-মাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্‌। ৬।
তত্র লব্ধপদং চিত্ত-মাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। ৭।
এবং সমাহিতমতি র্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্‌ জ্যোতি র্জ্যোতিষি সংযুতম্‌। ৮।
ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াভ্রমঃ। ৯।

যোগী হৃৎপদ্মে বহ্নিমণ্ডলমধ্যে আমার এই ধ্যানমঙ্গল রূপ স্মরণ করিবে—সম (অনুরূপ-সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন) প্রশান্ত সুমুখ দীর্ঘচারুচতুর্ভুজ সুচারুসুন্দরগ্রীব সুকপোল সুচিস্মিত সমানকর্ণদ্বয়ে বিন্যস্ত সুদীপ্ত মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত, পীতাম্বর ঘনশ্যাম শ্রীবৎসচিহ্নশোভায় সমুজ্জ্বল, ভুজচতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং বক্ষঃস্থল বনমালার দ্বারা উদ্ভাসিত, রত্নময় নূপুরপ্রভায় বিলসিত-চরণাম্বুজ, কৌস্তুভমণিপ্রভায় অলঙ্কৃত, দীপ্তিময় কিরীট কটক কটিসূত্র এবং অঙ্গদভূষণে বিভূষিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রম্যমূর্ত্তি, সুপ্রসন্ন-মুখমণ্ডল এবং সুস্নিগ্ধনয়নদ্বয়, সুকুমার আমার এই হৃদয়ললিত ব্রহ্মমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে মনঃসমাধানপূর্ব্বক অভিধ্যান করিবেন। ১-৪। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে ধীর সাধক সেই মনোবৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে আমাতে প্রীতিরসে অভিষিক্ত করিবেন। ৫। অতঃপর আমার সর্ব্বাঙ্গে অভিব্যাপ্ত সেই চিত্তবৃত্তিকে আকর্ষণপূর্ব্বক একত্র ধারণা করিবেন, তৎকালে আর অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, সাধক কেবল আমার মৃদুমধুরহাস্যময় মুখমণ্ডল ভাবনা করিবেন। ৬। চিত্তবৃত্তি সেই মুখমণ্ডলের একান্ত ধারণায় সমর্থ হইলে তখন সেই ঐকান্তিক চিত্তকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্যোমমণ্ডলে ধারণা করিবেন। অনন্তর অনন্ত আকাশের কক্ষে কক্ষে অথবা সমস্ত আকাশচক্রে আমার (পূর্ব্বোক্ত) সূক্ষ্মবিভূতি সকলের অনুভব করিয়া সেই নিখিলনভোমণ্ডল-বিস্তৃত মনোবৃত্তিকে সংহরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরমাত্মস্বরূপে আমাতে চিত্তসমাধান করিবে—তখন আর কোন চিন্তাই করিবার প্রয়োজন নাই। ৭। এইরূপে সমাহিতচিত্ত হইয়া যোগী নিজ আত্মাতে সর্ব্বজীবের পরমাত্মস্বরূপ আমাকেই জ্যোতিঃসংমিলিত জ্যোতির ন্যায় অভিন্নভাবে সন্দর্শন করেন। ৮। এইরূপে সুতীব্রধ্যান দ্বারা মনঃসমাধানকারী যোগীর দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া এই ত্রিবিধ ভ্রম শীঘ্র প্রশমিত হইয়া যায়। ৯

সাধক এইস্থলে বুঝিয়া লইবেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান আছে ততক্ষণই উপাসনা; তাহার পর সমাধি বা নির্ব্বাণ অবস্থা, মনোবৃত্তি তখন প্রকৃতিগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, যোগী তখন মন হারাইয়া পরমাত্মসত্তার অতিরিক্ত জীবাত্মার সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়াছেন, আমি আছি এ জ্ঞান পর্য্যন্তও যখন নাই তখন সেই একমাত্র নির্ব্বিকল্প চিৎসত্তায় যে নিরাকার ভাবের উপলব্ধি হয়, ইন্দ্রিয় নাই মন নাই, অধিক কি—আমি পর্য্যন্তও যখন নাই তখন সে নিরাকার দর্শন করে কে? এ রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন। ইহার নাম নিরাকার দর্শন নহে, সাক্ষাৎ বিদেহকৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি। সেই অবস্থায় নিরাকার হইব, এই আশ্বাসে যাঁহারা শতজন্ম-পূর্ব্বে নিরাকারের অধিবাস করিয়া নিরাকার স্বপ্ন দেখিতে থাকেন তাঁহাদিগের উদ্যোগিতার প্রশংসা করিতে পারি কিন্তু উদ্যোগিসম্প্রদায়কে ইহাও বলিয়া রাখি যে, নিরাকার

হইবার জন্য কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয় না। এই নিখিল সাকার ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি একদিন নিরাকার করিবেন, সময় হইলে তোমাকে আমাকে নিরাকার করিতে তাঁহার বড় অধিকক্ষণ লাগিবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সাকার আসিয়া সম্মুখে না দাঁড়াইলে, এ আকার ভাঙ্গিয়া নিরাকার করিতে নিরাকারেরও সাধ্য নাই।

এ ত গেল ধ্যান ধারণা সমাধির কথা, ইহার পর পূজার প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। সাকার ভিন্ন উপাসনা হয় না, এ কথা অনেকবার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন মূর্ত্তিপূজা বা প্রতিমাপূজা কথাটা কি এবং প্রতিমাপূজক উপাসকমণ্ডলী অন্ধবিশ্বাসগ্রস্ত নির্ব্বোধ নিম্নাধিকারী কিনা, তাহাই একবার দেখিতে হইবে। যাঁহারা বাহির হইতে প্রতিমাপূজা দেখিয়া তাহার সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগের সে সমালোচনাকে তাঁহাদিগের দেখার সমালোচনা না বলিয়া প্রতিমাপূজার সমালোচনা বলিতে পারি না। কারণ পূজা অর্চ্চা ইত্যাদি শাস্ত্রেরই কথা, পূজার পদ্ধতি শাস্ত্র এবং পূজার অধিকারী সাধক ; ইহাঁরা যাহা বলেন সমালোচকের সমালোচনা তাহার বিপরীত। শাস্ত্র ও সাধক বলেন—সাধনা ও সিদ্ধি। সমালোচক বলেন—খেলা ও আমোদ। এখন এই উভয়ের মধ্যে ভুক্তভোগীর কথা ছাড়িয়া আমরা নিঃসম্পর্কীয় বাজে লোকের কথায় বিশ্বাস করিব কোন্ প্রাণে ? মূর্ত্তি উপাসনার তত্ত্ব ত বাহির হইতে দেখিবার বস্তু নহে ; যিনি সে তত্ত্বের উপাসক, তিনিই তাহার দর্শক ; তবেই ত সমালোচক কেবল তাঁহার নিজ বুদ্ধি বিদ্যার সমালোচক বই আর কিছুই নহেন। অন্তরে পূজার সাধক এবং বাহিরে পূজার দর্শক এই উভয়ে ত এক পদার্থ নহেন। পণ্যবীথিকার দর্শক নিজ বুদ্ধিবিদ্যাবলে অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, মিষ্টান্নের আকার কিরূপ, বর্ণ কেমন, পরিমাণ কত, স্পর্শ উষ্ণ কি শীতল ; দর্শক এ সমস্ত বলিয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু বলিয়া দিতে পারেন কি, তাহার আস্বাদ মধুর কি তিক্ত ? কটু কি অম্ল ? যিনি নিজ জিহ্বায় কখনও তাহার রসাস্বাদ গ্রহণ করেন নাই, তিনি সহস্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত বিচক্ষণ হইলেও বলিয়া দিতে পারিবেন না যে মিষ্টান্নের আস্বাদ এইরূপ। আবার ভুক্তভোগী হইয়াও মিষ্টান্নের আস্বাদগ্রাহী সহস্র বাগ্‌বিন্যাস কৌশলেও তাঁহাকে মিষ্টান্নের আস্বাদতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না, যিনি কখনও নিজমুখে মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণ না করিয়াছেন ; তদ্রূপ শক্তিসম্পন্ন সাধক মহামন্ত্র শক্তিবলে প্রতিমায় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যে লোকাতীত তত্ত্বের অনুভব করেন, নাস্তিক তাহা দেখিবেন কি করিয়া ? শাস্ত্র ত এ কথা বলেন নাই যে, হাটে ঘাটে খাটে বসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে দেবতার আবির্ভাব দেখিতে হইবে।। তিনি বলিয়াছেন, এই এই করিলে এই এই হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমি তাহার কি কি করিয়াছি ? শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল গুরুসেবার পর গুরু কর্ত্তৃক

পরীক্ষিত হইয়া গুরুর নিকটে যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া সাধনার অলৌকিক নিগূঢ় তত্ত্বসকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাশাস্ত্র পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান দ্বারা মন্ত্রশক্তি চৈতন্য হইলে, তবে সাধক সেই মন্ত্রবলে অচেতন মৃন্ময় পাষাণময় যন্ত্র মূর্ত্তি ইত্যাদিতে চৈতন্যময়ী দেবতার আবির্ভাব সঞ্চার করিতে পারিবেন। এখন দোহাই ধর্ম্মের! ভাই সমালোচক একবার প্রাণের কবাট খুলিয়া সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি ইহার কি করিয়াছ? আদৌ তুমি ঘোর সন্দিগ্ধ মহা অবিশ্বাসী—সাধন ভজন ত পরের কথা, গুরুসেবা বা দীক্ষাগ্রহণেই তুমি চির-অনধিকারী, আর তুমি কি না শক্তিসম্পন্ন সাধকের সাধ্য অলৌকিক তত্ত্বময় প্রতিমায় দেবপূজার সমালোচনা করিতে যাও! বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা তোমার আস্পর্দ্ধার বিষয় আর কি হইতে পারে? দুর্ভাগ্যক্রমে পাগলের দেশে পাগলকে পাগল বলিবার কেহ নাই। ভাই সমালোচক! তাই সৌভাগ্যক্রমে তোমার সমালোচনা করিবার কেহ নাই কিন্তু তাই বলিয়া আজ মনে করিও না যে, পৃথিবী কেবল উন্মত্তেরই রাজধানী।

সমালোচকের সূক্ষ্ম সমালোচনায় এবং দয়ানন্দী দলের দয়ায় আজকাল দুই একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে—যথা, প্রতিমাপূজা মূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা ইত্যাদি। নাস্তিক সম্প্রদায় দ্বারা এই সকল ভাষার বহুল-প্রচারফলে আজকাল অনেক নিরক্ষর এবং সাক্ষর অচৈতন্য হিন্দুও আপনাকে প্রতিমাপূজক ও মূর্ত্তিপূজক বা পৌত্তলিক বলিয়া গৌরব-সহকারে লোক সমাজে অভিহিত করেন। তাঁহারা হয় ত মনে করেন এ সকল শব্দ আমাদেরই শাস্ত্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, আর্য্যশাস্ত্র বা আর্য্যপুরুষের কথা দূরে থাক, নিতান্ত অনার্য্যবংশে এবং অনার্য্য অংশে জন্ম না হইলে জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেক সত্ত্বে মনুর সন্তান মানবের মুখে কখন এ সকল শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে না। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ভেদ করিলে প্রগাঢ় নাস্তিকতার ভাণ্ডার খুলিয়া যায়। অনেক লেখক লিখিয়া থাকেন, প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রতিমাপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কথাগুলি শুনিলেই বোধ হয় যেন ইহার সহিত মন্ত্র দেবতা বা সাধনার কোন সম্পর্কই নাই, কেবল প্রতিমারই পূজা। অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষ আবার তাহার সারতত্ত্ব নিষ্কাশন করেন যে, আজকাল যেমন শোকস্মারক মৃত-মূর্ত্তি-স্তম্ভসকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, প্রতিমাপূজাও তাহাই—যেন দেবতা সকল মরিয়া গিয়াছেন; আর আমরা (পরলোক না মানা, অথচ সমাজভঙ্গা নির্লজ্জের দল) তাঁহাদের মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। হা ভগবন্! কতদিনে এই শিক্ষিতমূর্খ জন্মান্ধদলের চক্ষু ফুটিবে? কতদিনে এ সকল ব্যাখ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব! ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে এ ঘটোৎকচের উৎপত্তি আর কতকাল হইবে? মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ, সঙ্করজাতি সকল মাতৃ-বর্ণেই অনুশাসিত হয়; তাই ভারতের

ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল নাস্তিকতাই উদ্গীরণ করে। ইহাতেও সন্তুষ্টি হয় নাই—আবার সাকার উপাসক আর্য্যগণ না কি পৌত্তলিক। পুত্তলিকার উপাসনাই ইঁহাদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ সাকার উপাসকগণ পুতুলের পূজা করেন, দেবমূর্ত্তির নাম পুতুল। অজ্ঞান বালকবালিকা যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, সাকার উপাসনাও তেম্‌নি একটা ধূলা খেলাবিশেষ এবং উপাসকেরাও তদ্রূপ অজ্ঞান-বিশেষ। সমালোচক। তুমি ত আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান কর, বলিতে পার কি—যাহাদিগের বেদ তন্ত্র পুরাণ দর্শন জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদের পত্রোচ্ছিষ্টভোজীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইয়া তোমার এ জ্ঞানবিজ্ঞানগর্ব্ব, সেই সাকার উপাসক প্রতিমায় দেবপূজক জ্ঞানিকুলচূড়ামণি সাধকগণ অজ্ঞান ছিলেন? দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহারা যে উপাসনাতত্ত্বকে দুর্দ্ধর্ষ তেজঃপুঞ্জ বলিয়া মনে করিতেন, তোমার আমার মত পতঙ্গ যদি আজ সেই গগনস্পর্শী দুর্লঙ্ঘ্য তেজোমণ্ডল উল্লম্ফনে উল্লঙ্ঘন করিতে যায়, তাহা কি সাক্ষাৎ মৃত্যুর নিমন্ত্রণ নহে? হরি! হরি! সাধকের সাধনাসাধ্য পরমারাধ্য দেবমূর্ত্তির নাম কিনা পুতুল। চৈতন্যময়ী দেবতার অধিষ্ঠান-যন্ত্রের নাম কি না অচেতন জড় অথচ সেই চৈতন্যময়ীর অস্ফুট আভাসের ছায়া পাইয়া তুমি কি না নিজ দেহকে সচেতন বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর। তুমি নিদ্রিত থাকিতে তোমার অবোধ শিশু সন্তান অনায়াসে তোমাকে অচেতন মনে করিতে পারে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান (যে তোমাকে ডাকিয়া জাগাইতে পারে) সেও কি তাহাই মনে করিবে? জগৎপিতা বা জগদম্বার মূর্ত্তির নিকটে তুমি আমিও তদ্রূপ অবোধ সন্তান, তাই তাঁহার মূর্ত্তি তোমার আমার নিকটে জড় বই আর কিছুই নহে। কিন্তু যে তাঁহাকে ডাকিয়া জাগাইতে পারে অর্থাৎ সেই নিত্যজাগ্রৎস্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মা নিজে জাগিয়া যাহাকে জাগাইয়া, ডাকিয়া আবার তাঁহাকে জাগাইবার ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহার নিকট তাঁহার মূর্ত্তির স্বরূপপ্রকাশ চৈতন্য ভিন্ন কখনও জড় হইতে পারে না, কেননা তিনি চৈতন্যময়ীর প্রসাদে নিজে চৈতন্যস্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। তুমি আমি নিজে জড়, তাই তোমার আমার নিকটে তাঁহার মূর্ত্তিও জড়; ইহা তাঁহারও দোষ নহে, তাঁহার মূর্ত্তিরও দোষ নহে, তোমার আমার জন্ম জন্মান্তরীণ নিজকৃত কর্ম্মের দোষ।

উপাসনা-কাণ্ডের ফল-বিভাগ লইয়া বিচার বা আলোচনা অসম্ভব; কারণ অনাস্বাদিতরস পুরুষকে ফলের তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। এজন্য অন্ততঃ উপাসনার প্রক্রিয়াতত্ত্ব লইয়াও আমরা দেখিব—সাকার উপাসক, মূর্ত্তিময়ী দেবতার সেবক, আর্য্যসাধক-সম্প্রদায় অজ্ঞান বা নিম্নাধিকারী কি না?

দেবমূর্ত্তির নাম শুনিলেই ক্রোধে অচৈতন্য হইয়া পড়া, শাস্ত্রমতে ইহা অসুরের ধর্ম্ম; বংশে বংশে অসুরত্ব প্রবেশ না করিলে কখনও দেবতার প্রতি বিদ্বেষ হয় না,

আবার দেবতার প্রতি বিদ্বেষ না হইলেও অসুরত্ব মোচন হন না। জ্বর বিরামের সময় হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শরীরে যেমন ঘর্ম্মোদ্গম হয়, অসুরত্ব মোচনের সময় হইলেও তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই দেবতার প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, কেননা অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে—পাপ বা পুণ্য ইহার কিছুই অতি উৎকট না হইলে ইহলোকে তাহার ফল ফলে না। তুমি হয় ত মনে কর, মূর্ত্তি ত দেবতা নহে, তবে তাহা দেখিয়া এ মূর্খমণ্ডলী হাসেই বা কেন, কাঁদেই বা কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত পাষণ্ড-রাজ! দেবমূর্ত্তির নাম শুনিলে তোমার রাগ হয় কেন? দেবতার নাম শুনিলে অসুরের রাগ হয় ইহা সত্য, কিন্তু তোমার মতে মূর্ত্তি ত দেবতা নহে, তবে তাহা দেখিয়া তুমি রাগ কর কেন? হাসি কান্নাও বিকার, রাগও বিকার, দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার না হয় দানবত্ব-সুলভ রাজস বিকার ক্রোধ হয়, আমার না হয় মানবত্ব-সুলভ সাত্ত্বিক বিকার উল্লাস হাস্য বা আনন্দাশ্রুর উদ্গম হয়, তাহা বলিয়া কি করিবে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি গুণের অধীশ্বরী; গুণের তারতম্য অনুসারে তিনি তাহার লক্ষণ সকল পরিস্ফুট করেন। তোমার যদি দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া কোন বিকারই না হইত, তাহা হইলেও তুমি একদিন বলিতে পারিতে—ইহারা হাসে কেন, কাঁদে কেন? তুমি যখন মূর্ত্তি দেখিয়া রাগিতে শিখিয়াছ তখনই তোমার ইহা মনে করা উচিত ছিল যে, যে রাগাইতে পারে সে হাসাইতেও পারে, কাঁদাইতেও পারে। অচেতন মূর্ত্তির মধ্যে এমন কোন তীব্র চেতনা আছে যাহার বলে তোমার সর্ব্বত্র বিস্ফারিত প্রেমের চক্ষু, দয়ার চক্ষু, ভ্রাতৃভাবের চক্ষুও শত্রুভাবের প্রভাবে আরক্ত হইয়া উঠে। মূর্ত্তিতে দেবতার স্বরূপসম্পর্ক ত তুমি মান না, কেবল নামের সম্পর্কেই যদি তোমার এই পর্য্যন্ত মানবপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনে কর দেখি, যাঁহারা সেই মূর্ত্তিতে দেবতার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃ অবলোকন করেন তাঁহাদিগের আনন্দ উল্লাসের বিকার কতদূর হওয়া উচিত। তোমার দৃষ্টিতে তুমি দেখ প্রতিমার পূজা, কিন্তু যিনি স্বয়ং পূজা করেন অলৌকিক দৃষ্টিবলে তিনি ত দেখেন—অচেতন প্রতিমাযন্ত্রে চৈতন্যময়ীর পূর্ণ আবির্ভাব। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিসর্জ্জনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধকের সিদ্ধাঞ্জন স্নিগ্ধ-নয়নে মৃণ্ময়ী প্রতিমা তখন চিন্ময়ীর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্যনবলাবণ্যময়ী ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননীর ব্রহ্মময় কান্তিচ্ছটাই উদ্গীরণ করেন।

এ ত গেল সাধকের কথা। আর সাধনাশূন্য নাস্তিকতাপূর্ণ দৃষ্টিতে যদি প্রতিমাকে অচেতন বলিয়াই জান, অচেতন বলিয়াই যদি অন্তরের সহিত বিশ্বাস কর, তাহা হইলেও মনে কর, প্রতিমার উপর রাগ করা তোমার কতদূর নীচহৃদয়তার পরিচয়! কতদূর জঘন্যবৃত্তির উদ্গীরণ? কতদূর কাপুরুষতা? যাহাকে অচেতন বলিয়াই জান, যাহার কোন ক্ষমতাই নাই তাহার উপর রাগ কর কেন? কংসাসুরের মত

আছাড় দিয়া তুমি প্রতিমা ভাঙ্গিতে যাও কেন ? যোগীন্দ্রপুরুষ হৃদয়মন্দিরে যাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারেন না, তুমি তাঁহাকে মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিয়া আছাড় দিতে চাও ! কংস যাঁহাকে আঁটিতে পারেন নাই, তুমি তাঁহাকে ধ্বংস করিতে যাও। ইহা অপেক্ষা আস্পর্দ্ধার কথা আর কি আছে ? তোমার ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণ মশক মক্ষিকার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া আবার সেই ত্রিলোকবিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ বধের জন্য নন্দনন্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী হইবেন ; কিন্তু তোমার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য রাখিয়া যাইবেন সেই বিভূতি যাহা নরলোকলীলার জন্য গোকুলে নন্দালয়ে অবতীর্ণ। কংস যদি দেবকীর অষ্টম-আত্মজ হইতে নিজ পাপের সমুচিত দণ্ড হইবে ইহা বিশ্বাস না করিত তাহা হইলে কি সে কখনও দেবকীর পুত্র কন্যা বধ করিতে অগ্রসর হইত ? ইহা দেখিয়াই ত বোধ হয় যে, তুমি প্রতিমার দেবত্ব বিশ্বাস না কর তাহা নহে, তবে নিজকৃত পাপের অনুতাপে নিদারুণ নরকযাতনার ভয়ে ভীত হইয়াই দণ্ডকর্ত্তার মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে যাও, এইমাত্র বিশেষ। মনে মনে ভয়ে ভয়ে বিশ্বাসটি বিলক্ষণই কর, কিন্তু দুঃখ এই যে, প্রমত্ত-পুরুষের স্মৃতির ন্যায় বিদ্বেষে অন্ধ হইলে পরক্ষণে আর তাহা থাকে না। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ভাঙ্গিতে যাও, কিন্তু ভাঙ্গিতেছ কাহাকে তাহাই কেবল বুঝিতে পার না। সমালোচক ! তাঁহাকে কেহ ভাঙ্গিতেও পারে না, গড়িতেও পারে না। বাহিরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া আর তুমি ভয় দেখাও কাহাকে ? পূজার পরে আমরাও ত সে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া থাকি ; তুমি হয় ত ঘরেই বিসর্জ্জন দেও, আমরা না হয় জলে লইয়া বিসর্জ্জন দেই ; কিন্তু বাহিরের মূর্ত্তি বাহিরে বিসর্জ্জন দিয়া অন্তরের মূর্ত্তি অন্তরে ভরিয়া লই। অন্তর হইতে চিন্ময়ীর যে জ্যোতিঃ আনিয়া মৃণ্ময়ীতে সংযোজিত করিয়াছিলাম, মৃণ্ময়ীতে পূজা শেষ করিয়া আবার সেই চিন্ময়ীর জ্যোতিঃ চিন্ময়ীতেই সংযোজিত করিয়া লই—কৈ কিছুই ত ভাঙ্গিয়া যায় না, তোমার মত একেবারে কিছুই ত ধুইয়া মুছিয়া যায় না। বাহিরের মণ্ডপে যেমন ভুবনভরা রূপের ছটা, অন্তরের মণ্ডপেও তেমনি অনুপম সৌন্দর্য্যঘটা। মা আমাদিগের যেমন ভিতরে তেমনি বাহিরে, যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে ; কিছুদিন এইরূপ ভিতরে বাহিরে আনা লওয়া করিতে করিতে প্রাণের কবাট যে দিন একেবারে খুলিয়া যাইবে সেই দিন আমার আবাহন বিসর্জ্জন জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে। বাহিরে চাহিলে যে দিন ভিতরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব, ভিতরে চাহিলে যে দিন বাহিরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব—ভিতরে বাহিরে, বাহিরে ভিতরে যে দিন এক হইয়া যাইবে, সেই দিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন, অশান্ত নৃত্যকালী সেই দিন আমার শান্ত হইবেন, কিম্বা কি জানি, অন্তরে বাহিরে খোলা পথ পাইয়া হয়ত আনন্দে আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন ; কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও সেদিন আমি আর তাঁহাকে আনিবও না, লইবও না। তিনি আপন-

আনন্দে আপনি আসিবেন, আপনি যাইবেন—আপনি নাচিবেন, আপনি গাইবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া দিয়া জয় মা বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব। ভাই! মায়ের সন্তান সমালোচক! মা করুন্ তোমাকে যেন এ আনন্দে বঞ্চিত হইতে না হয়, তুমি যাঁহাকে অন্তরের মা বলিয়া জান তিনিই দয়া করিয়া নিজ শক্তিবলে অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, সে শক্তির পরিচয় পরে। এখন এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আর্য্যসাধকের বাহিরে মূর্ত্তি না থাকিলেই অন্তরে মূর্ত্তি থাকে না, তাহা নহে, অন্তরে মূর্ত্তি আছে বলিয়াই বাহিরে সে মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছে—অন্তরের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই তবে বাহিরের মূর্ত্তিতে পূজার আরম্ভ হয়, বাহিরের মূর্ত্তির অভাবেও সাধক অন্তরের মূর্ত্তি লইয়াই তাঁহার পূজায় সমর্থ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে ভগবানের উক্তি, শ্রীমদ্ভাগবতে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥

শৈলী (শিলাময়ী) দারুময়ী লৌহী (ধাতুময়ী) লেপ্যা (চন্দনাদি লেপন দ্বারা নির্ম্মিতা) লেখ্যা (চিত্রিতা) সৈকতা (মৃত্তিকা বালুকাদিনির্ম্মিতা) মনোময়ী মণিময়ী এই অষ্টবিধ প্রতিমা। শিলাময়ী প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রতিমার সদ্‌ভাবে মনোময়ীকে মানস উপাচারে পূজা করিয়া পরে বাহ্যমূর্ত্তিতে বাহ্য উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে; কিন্তু উক্ত সপ্তবিধ প্রতিমার অভাবে বাহ্যপূজাতেও মনোময়ী প্রতিমাকেই বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে হইবে। এইস্থানেই সাধকেন্দ্র রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ, তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হ'য়ে মনোময়ী হ'য়ে নাচ। তন্ত্রে দেবাধিদেবের আজ্ঞা, কুলার্ণবে—

কুণ্ডস্থণ্ডিলয়োর্মধ্যে শূর্পকুড্যপটেষু চ।
মণ্ডলে ফলকে মূর্দ্ধ্নি হৃদয়ে চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১।
এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাং।
অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ ॥ ২।
গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
তথা সর্ব্বত্রগো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে ॥ ৩।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বস্য পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ।
সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ সান্নিধ্যা দেবতা ভবেৎ ॥ ৪।
গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণং।
স্বকর্ম্মরচিতং তত্তু হৃহতামেব পোষণম্ ॥ ৫।

স্বকর্ম্মাবচিতং তত্তু পুনস্তানেব পোষয়েৎ।
এবং সর্ব্বশরীরস্থ-মাত্মনঃ পরমেশ্বরি।
বিনা চ সময়ং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ॥ ৬।
সকলীকৃত্য তৎপ্রাণাং-স্তদীয়ানীন্দ্রিয়াণি চ।
প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ্চয়েদ্দেবি চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৭।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনমপি মুক্তিফলপ্রদং।
ক্ষময়া সাধয়েৎ সর্ব্বং হীনমঙ্গপদং বদেৎ ॥ ৮।
নিয়মাদতিরেকেন যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ন কিঞ্চিদপ্যস্য ফলং সিধ্যতি ক্রমদোষতঃ ॥ ৯।
ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন।
যথা করফলাদীনি সৎকর্ম্মাণি ফলন্তি হি ॥ ১০।
তদ্ বিধানাৎ কৃতং কর্ম্ম জপহোমার্চ্চনাদিষু।
দেবতা প্রীতিদা ভূয়াদ্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ ১১।
দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তি-মজানতাং।
কৃতার্চ্চনাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি ॥ ১২।
যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং দেবতা মন্ত্ররূপিণী
মন্ত্রবৎ পূজিতা দেবী সহসৈব প্রসীদতি ॥ ১৩।
কামক্রোধাদিদোষস্য সর্ব্বদুঃখ-নিয়ন্ত্রণাৎ।
যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ ॥ ১৪।
শরীরমিব জীবস্য দীপস্য স্নেহবৎ প্রিয়ে।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তথা যন্ত্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫।
তস্মাদ্ যন্ত্রং লিখিত্বা বা পূজয়েৎ পরমাং শিবাং।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সর্ব্বং পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে ॥ ১৬।

কুণ্ড এবং স্থণ্ডিলের মধ্যে, শূর্প (কুলো—মঙ্গলচণ্ডী কুলচণ্ডী ইত্যাদি পূজাব্রতে এখনও অনেকস্থানে আর্য্যকুল-মহিলাগণ সিন্দূর চন্দন দূর্ব্বাক্ষত ইত্যাদি দ্বারা শূর্পমধ্যে দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া থাকেন) কুড্য (গৃহভিত্তি—পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অধিকাংশ আর্য্যস্থানেই পূজা ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গৃহভিত্তিতে দেবতার মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া থাকে) পট (বস্ত্রের উপরে বর্ণলেপাদি দ্বারা চিত্রিত) মণ্ডল (শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডল) ফলক (ধাতু কাষ্ঠ পাষাণাদি নির্ম্মিত ফলক) মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) ও হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিতা। ১। দেবেশি। কর্ম্মকাণ্ডনিরত সাধকগণ সেই রূপাতীত পরমশিবস্বরূপিণীকেও ভক্তি ও মন্ত্র উভয়ের যোগবলে রূপবতী করিয়া

এই সকল স্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন। ২। গাভীর সর্ব্বাঙ্গ-সঞ্চারী রক্ত হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি হইলেও তাহা যেমন কেবল তাহার স্তনরন্ধ্রদ্বার হইতেই নির্গত হইয়া থাকে তদ্রূপ বিশ্বব্যাপিনী দেবতা সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিতা থাকিলেও প্রতিমাদিতেই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রতিমা যদি যথাশাস্ত্র দেবতার অনুরূপ হয়েন, পূজার উপচারাদির যদি বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, আর সাধকের যদি একান্ত বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলেই প্রতিমাদিতে দেবতা সন্নিহিতা হয়েন। ৩-৪। গাভীর শরীরে ঘৃত থাকিলেও তাহা কাহারও দেহের পুষ্টিসাধন করে না, কিন্তু যাঁহারা তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া উত্তাপে আবর্ত্তন ইত্যাদি স্বকৃত কর্ম্মপরম্পরার দ্বারা তাহা হইতে ঘৃত সঞ্চয় করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই সে ঘৃত দেহপুষ্টির কারণ হয়। এইরূপে ঘৃত যেমন দেহপুষ্টির কারণ হয়, পরমেশ্বরি! সকলেরই আত্ম-শরীরস্থ দেবতাও তদ্রূপ উপাসনা অনুসারেই সাধকের মুক্তির কারণ হইয়া থাকেন, উপাসনা ব্যতিরেকে সাধককে ফল প্রদান করেন না। ৫-৬। অতএব উপাসনার বিধি অনুসারে দেবতার প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রাণ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয় করিয়া তত্তন্মন্ত্রে তাহার প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে, অন্যথা প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভাবে পূজাদি করিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। ৭। প্রাণপ্রতিষ্ঠা যথাশাস্ত্র সিদ্ধ হইলে উপাসনা অন্যান্য মন্ত্রহীন এবং ক্রিয়াহীন হইলেও মুক্তিরূপ মহাফল প্রদান করিবে; যাহা কিছু অঙ্গহীন হইবে, সাধক দেবতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক সে সকলের পরিহার করিবেন। ৮। শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অতিক্রমপূর্ব্বক যিনি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ক্রমভঙ্গ-দোষহেতু তাঁহার সে কর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্রও ফলপ্রদ হইবে না। ৯। শাস্ত্রীয় বিধি হইতে ন্যূন বা অতিরিক্তরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল কদাচও সফল হইবে না। শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফলসকল করস্থিত ফলাদির ন্যায় নিত্য প্রত্যক্ষ হইবে। ১০। অতএব জপ হোম পূজা ইত্যাদি ব্যাপারে বিধান অনুসারে কর্ম্মের আচরণ হইলে সেই ক্রিয়া দেবতার প্রীতিদায়িনী এবং সাধকের ভোগ মোক্ষ উভয় ফলের বিধায়িনী হইবে। ১১। শাম্ভবি! দেবতার স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব এবং মন্ত্রের শক্তি যাহারা না জানে, তাহাঁদিগের কৃত অর্চ্চনাদি সমস্তই ব্যর্থ হইবে। ১২। যন্ত্রসমস্ত মন্ত্রময় এবং দেবতা মন্ত্রশক্তি-স্বরূপিণী; অতএব যথাশাস্ত্র মন্ত্র সহকারে পূজিতা হইলেই দেবতা সহসা প্রসন্না হয়েন। ১৩। জীবের কামক্রোধাদি দোষ এবং তজ্জনিত নিখিল দুঃখের নিয়ন্ত্রণ হেতু যন্ত্রের নাম যন্ত্র। এই যন্ত্রে দেবতা পূজিতা হইলেই তাঁহার প্রীতির কারণ হয়। ১৪। জীবের সম্বন্ধে যেমন দেহ, দীপের সম্বন্ধে যেমন স্নেহ (তৈলাদি) সমস্ত দেবতারই যন্ত্র তদ্রূপ নিত্যলীলা স্থল। ১৫। অতএব, প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অথবা যন্ত্রবিলেখনপূর্ব্বক পরমেশ্বরীর পূজা করাই মুখ্য কল্প। কিন্তু প্রিয়ে! গুরু মুখে ইহার সমস্তত্ত্ব অবগত হইয়া যথাবিধানে পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ১৬।

শাস্ত্র যেস্থলে প্রতিমার উল্লেখ করিয়াছে, সেইস্থলেই এইরূপে আদ্যন্তে মনোময়ী দেবতার কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে জিতপ্রাণোঽথ সাধকঃ।
ঐক্যং সঞ্চিন্তয়েদ্দেব্যা বাহ্যান্তর্ম্মূর্ত্তিযুগ্মযোঃ॥

এইরূপে জিতপ্রাণ সাধক ইষ্টদেবতাকে ধ্যানবলে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে অন্তরস্থ দেবীমূর্ত্তি এবং বহিঃস্থিত দেবীমূর্ত্তি এই উভয়ের একত্ব চিন্তা করিবেন। যথাস্থানে ইহার প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইবে। এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিবার কথা যে, অন্তরের মূর্ত্তিকেই বাহিরের মূর্ত্তিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এখন একবার সমালোচক মহাশয় বুঝিয়া দেখিবেন যে, মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সাকার উপাসনা উঠাইবার চেষ্টা করা ভ্রান্তি-বিড়ম্বনা কি না? মনোময়ী মৃণ্ময়ী, যে মূর্ত্তিই কেন না হউন, প্রতিদিন পূজার পরে আমরা তাঁহাকে ভাঙ্গিতেছি; এত ভাঙ্গাতেও যাঁহাকে এক নিমেষের জন্য ভাঙ্গিতে পারিলাম না—ভিতরে বাহিরে যখন যেখানে চাই তখনই সেইখানে দেখিতে পাই; হয় ভগবান্ নয় ভগবতী, ইচ্ছাময়ীর যখন যেরূপ ইচ্ছা তখন সেইরূপেই এলোমেলো পাগ্‌লী মেয়ে মা আমার অসিটি ছাড়িয়া বাঁশীটি ধরিয়া, বাঁশীটি ছাড়িয়া অসিটি ধরিয়া, কখনও কখনও আবার অসিটি বাঁশীটি একটি করিয়া, হাসিটি তাহাতে মিশাইয়া, চুলটি ছড়াইয়া, চূড়াটি বাঁধিয়া, হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাকে; ঘুমাইয়া থাকিলে আপনি আসিয়া বাঁশীটি জাগাইয়া দেয়; আবার অপরাধ হইলে অসিটি তুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া ভয় দেখায়; কোন্ পাষণ্ড এ মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে পারে? যে মূর্ত্তির সঙ্গে প্রাণের এত গভীর ভালবাসা, কাহার সাধ্য ত্রিজগতে সে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে? বাহিরের মূর্ত্তি তোমার, প্রতিবিম্ব বই ত নয়। অন্তরের বিম্বিমূর্ত্তি যতক্ষণ না ভাঙ্গিতেছে, ততক্ষণ বিম্বমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তুমি কি করিবে? নির্ম্মল নদীবক্ষে ধীরসান্ধ্যসমীরহিল্লোলে অনন্তবীচিমালায় নিজকনককান্তি-চন্দ্রিকাচ্ছটা সংক্রান্ত করিয়া স্বচ্ছসুন্দর চন্দ্রমণ্ডল তাহাতে প্রতিবিম্বিত; অবোধ বালকের ন্যায় তুমি আমি যদি তাহাতে দণ্ডাঘাত করিতে যাই, মনে কর তাহাতে কি প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডল চূর্ণ হইয়া যাইবে? ভ্রান্ত তুমি আমি, জলের চাঞ্চল্য দেখিয়া মনে করিতে পারি চন্দ্রকে বুঝি শতধা সহস্রধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিলাম; কিন্তু ভাই! মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, জল স্থির হইলে দেখিবে—আবার যে পূর্ণচন্দ্র সেই পূর্ণচন্দ্র, তখন বুঝিবে এই জলতরঙ্গচঞ্চল চন্দ্রমণ্ডলই কেবল চন্দ্রের মূর্ত্তি নহে, ইহা প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিবিম্বমাত্র; আকাশের বিম্বিচন্দ্র নিজ চন্দ্রিকার অবলম্বনে জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন, তাই আজ জলে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে; তোমার আমার মত বামনের এই ক্ষুদ্র করদণ্ড যতক্ষণ সেই সুধাকরের কররাজ্য গগনসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ না করিতেছে—ভাই উদ্যমশীল

পিত! ততক্ষণ ঐ পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল চূর্ণ হইবার নহে। তাই বলি ভাই! বিম্বিকে আঘাত করিতে না পারিলে বিম্বকে আহত করিয়া ফল কি? বাহিরে ভক্তের নয়ন-সম্মুখে তুমি যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, উহা ত কেবল বাহিরের বস্তু নহে, ভববক্ষো-বিহারিণী ভক্তহৃদয়চারিণীর যে মূর্ত্তি ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছে, ভক্তের প্রেমময় নয়ননদীর নির্ম্মল তরঙ্গলীলায় ভাবের হিল্লোলে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া ব্রহ্মময়ীর যে মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তিনি একেশ্বরী হইলেও অনন্ত ভক্তের নয়নে অনন্ততরঙ্গে তাঁহার যে অনন্ত মূর্ত্তি সমুদিত হইয়াছে, তাহাও কেবল বাহিরের বস্তু নহে। যদি সেই অন্তরের মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে কাহারও অধিকার থাকিত, তবেই এ কথা একদিন শোভা পাইত যে, মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সাকার উপাসনা উঠাইব। তুমি আমি যদি আজ নিজ নিজ প্রচণ্ড নাস্তিকতাদণ্ডে বাহিরের একটি মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে যাই, মনে করিয়াছ কি তাহাতে মূর্ত্তি ভাঙ্গিবে? কখনই নহে, কেবল ভক্তের নয়নে আঘাত করিলে ভক্তির মধুময় অশ্রুজল উচ্ছলিত হইয়া সমস্ত সমাজবক্ষ আলোড়িত করিবে, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তমধ্যে সে গভীর জল স্থির ধীর প্রশান্তরূপ ধারণ করিবে। জল চঞ্চল হইলে চন্দ্রবিম্ব তথা হইতে অন্তর্হিত হয় না, অধিকন্তু লহরীতে লহরীতে বিশদ কৌমুদীমালা নাচিয়া নাচিয়া খেলিতে থাকে—তদ্রূপ তোমার আঘাতেও ভক্তনয়ন হইতে দেবতার সে প্রতিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবে না, অধিকন্তু হৃদয়ময়ী দেবতার মহাশক্তি ভক্তের নয়ননীরে লহরীতে লহরীতে খেলিতে থাকিবে—দেখিতে দেখিতে শান্তির সান্ত্বনা আসিয়া সে নয়নমণির প্রশান্ত করিয়া দিবে, তৎক্ষণাৎ দেখিবে —ভক্তের অন্তর্যামিনী ব্রহ্মময়ী আবার বাহিরে মূর্ত্তিময়ী হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভক্তের সম্মুখে তাঁহার সেই মৃদু মধুর হাস্যচ্ছটার প্রকট বিকট ভঙ্গী, আর তোমার আমার এই মূর্ত্তিভঙ্গের পরাক্রমমহিমা দেখিয়া তখন মনে হইবে, যেমন রণবিজয়িনী মহিষমর্দ্দিনী আজ বামচরণের অঙ্গুষ্ঠভরে দানবদর্প চূর্ণ করিয়া দেববর্গে স্বর্গের অধিকার বিন্যস্ত করিয়া অট্টহাসি হাসিতেছেন। জগদম্বে! সে দিন আনিয়া দাও মা! দয়া করিয়া আমায় তেমনি নাস্তিকতা শিখাইয়া দাও, যাহার বলে যোগীন্দ্রের ধ্যানদুর্লভা মা তুমি স্বয়ং সমরাঙ্গনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রণরঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও যে নাস্তিকতার মহাপ্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া মহেশ্বরের হৃদয়নিধি চারুচরণসরোরুহ দুরন্ত দানবের কঠোর কণ্ঠে স্কন্ধে সংস্থাপিত কর, অপারকরুণাময়ি মা! ত্রিসংসার খুঁজিয়া তোমার এ করুণার তুলনা নাই—এই গুণেই মা তুমি জগতের মা, পুত্র ভিন্ন সংসারে তোমার শত্রু কেহ নাই, ইহাই তাহার চরম উদাহরণ। ধন্য মা করুণাময়ি! তুমি ধন্য, তোমার দয়া ধন্য, শত্রুরূপী পুত্র তোমার ততোধিক ধন্য, ধন্য। তাই ভাই সমালোচক! এ সময়ে তুমিই বন্ধু, তাই আজ তোমাকেই কাঁদিয়া বলি, এ সংসারে মায়ের রাজ্যে সবাই ধন্য, কেবল দুর্ভাগ্য তুমি আমিই অধন্যের শিরোমণি!

না গেলাম নাস্তিকতায়, না আসিলাম আস্তিকতায়, না পারিলাম শত্রু হইতে, না পারিলাম পুত্র হইতে। তাই আজ বড় দুঃখে কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বল মা! আমি দাঁড়াই কোথা?

কোথায় দাঁড়াইব তাহা তিনি জানেন, তবে পথের কথা যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতে বসিয়াছি, তাই আজ তোমাকে আর দুই একটি কথা বলিব। শুনিতে পাই, তুমি না কি কথায় কথায় বলিয়া থাক—মূর্ত্তিপূজকেরা জড়ের উপাসক; ইহাতে প্রকারান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন যে, তুমি সাক্ষাৎ চৈতন্যের উপাসক। মূর্ত্তিপূজকেরা জড়ের উপাসনা করে, এ কথা বলা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; বরং বলাই স্বাভাবিক। কেননা, অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধিগৃণন্—যাহার যতদূর বুদ্ধির পরিণাম সে তাহা বলিবে, তাহাতে নিন্দার কোন কথা নাই। তুমি মূর্ত্তিপূজককে জড়ের উপাসক বল, তজ্জন্য তোমাকে বলিবার কিছু নাই; কিন্তু তুমি স্বয়ং চৈতন্যময় ব্রহ্মের উপাসক, তাই তোমাকে আজ দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। বৃংহ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, ইহা তুমি জান। যিনি বিশ্বব্যাপী তাঁহার নাম ব্রহ্ম, ব্রহ্ম চৈতন্যময় ইহাও তুমি মুখে বলিয়া থাক। সেই ব্রহ্মের উপাসক হইয়া তুমি তাঁহার মূর্ত্তিকে জড় বল ভাই! কোন্ প্রাণে? যিনি বিশ্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র যাঁহার সত্ত্বা, স্বর্গ হইতে নরক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যাঁহার সমান আবির্ভাব, প্রতিমায় তাঁহার অস্তিত্ব নাই—ইহা কি তোমার আস্তিকের কথা? দ্বৈতবাদী একদিন জড় ও চৈতন্য পদার্থ দুই বলিলেও তাঁহার মুখে কতক শোভা পায়, তুমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক হইয়া চৈতন্যের অতিরিক্ত জড় বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার কর কোন্ মুখে? জড় হউক, চৈতন্য হউক—কোন উপাসনার ধার ধারি না, ইহা যদি বলিতে পার তবে একদিকে তোমার অব্যাহতি আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও অন্যদিকে জড় বলিয়া কোন পদার্থই নাই—ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তুমি জড় বল তাহাকে যাহাতে কোন চৈতন্যের লক্ষণ দেখিতে পাও না—যথা, মৃত্তিকা জল কাষ্ঠ পাষাণ ইত্যাদি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এ গুলিকে যে তুমি জড় দেখ, তাহা কি ইহাতেই চৈতন্য নাই বলিয়া—না, তোমারই সে চক্ষু নাই বলিয়া? অনেকে আবার বৃক্ষ গুল্ম লতা বনস্পতি ইত্যাদিকেও জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা হয়ত বুঝিয়াছেন যে, আহার নিদ্রা ভয় সংসর্গ এই চারিটিই জীবের স্বরূপ-লক্ষণ। ইহা যাহাতে না আছে তাহাই জড়; কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন, বৃক্ষ লতা ইত্যাদি কিছুই জড় নহে, উহারাও স্থাবর জীব। মনু বলিয়াছেন, শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈ-রন্ত্যজাতিতাম্। শরীরজ কর্ম্মদোষে অর্থাৎ দেহ দ্বারা পাপের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্য সেই পাপের ফলে স্থাবরত্ব (বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদি জন্ম) লাভ করে অর্থাৎ জন্মান্তরে স্বেচ্ছানুসারে শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা আর কোন

অনুষ্ঠান না করিতে পারে, ইহাই সেই পাপের দণ্ড। বাচনিক পাপের ফলে পক্ষিজন্ম পশুজন্ম লাভ করে অর্থাৎ জন্মান্তরে আর বাক্য প্রয়োগ করিতে না পারে, ইহাই সেই পাপের দণ্ড। মানসিক পাপের অনুষ্ঠান করিলে জন্মান্তরে অন্ত্যজ জাতি লাভ করে; তাহার উদ্দেশ্যে এই যে, পরজন্মে আর প্রশস্ত মনোবৃত্তি লাভ করিতে না পারে। কেবল দিগ্‌দর্শনের জন্য আমরা এ স্থলে মনুর বচনটি উদ্ধৃত করিলাম, বস্তুতঃ ইহা যথেষ্ট নহে। এ সম্বন্ধে শত সহস্র যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ হইতে পারে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাহার অবতারণা করিতে ভীত। এ বচনে ইহাই আমাদিগের দেখাইবার বিষয় যে, বৃক্ষ লতা ইত্যাদিও অচেতন বা জড় নহে। ইহারাও প্রাণী, ইহাদিগেরও জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি ইত্যাদি বিলক্ষণ আছে, তবে অন্যান্য প্রাণীর সুখ দুঃখ-জন্য বিকার তুমি আমি যেমন পরিস্ফুটরূপে লক্ষ্য করিতে পারি, বৃক্ষ গুল্ম লতা ইত্যাদির তদ্রূপ অনুভব করিতে পারি না, এইমাত্র বিশেষ। তাহার দুইটি কারণ, একটি—বৃক্ষাদিতে জীবরূপে যে চিৎশক্তি অধিষ্ঠিত তাহা মায়াশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত। দ্বিতীয় কারণ—বৃক্ষাদিতে সুখ-দুঃখ-জন্য যে সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহা এত সূক্ষ্ম যে, তোমার আমার এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের এমন প্রখর সূক্ষ্ম শক্তি নাই যাহাতে সে সকল বিকার আমরা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারি। সর্ব্বভূতদর্শী তপঃসিদ্ধ ঋষিগণ দেবগণ এবং দেবযোনিগণই তাহা অনুভব করিবার অধিকারী। তাই পুরাণাদি প্রসঙ্গে অনেকস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবানুভাব মহাপুরুষগণ যখনই শাপভ্রষ্ট হইয়া বৃক্ষাদি জন্মলাভ করিয়াছেন তখনই ঋষিগণ দেবগণ শাপাপগমের কাল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই সকল স্থাবরাদি জন্ম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ইহার প্রমাণ। অতঃপর, ধাতুও পাষাণ—তন্মধ্যে ধাতু সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ধাতু পর্ব্বতেরই অন্তর্গর্ভ-খনিস্থিতং চেতনাচেতন লক্ষণ সম্বন্ধে ধাতু ও পাষাণে কিছু প্রভেদ নাই। পর্ব্বত একটি মহাপ্রাণী এবং উদ্ভিদ্ পদার্থের শিরোমণি, পৃথিবীর ধারণাশক্তি পর্ব্বতেই সমধিক অধিষ্ঠিত, তাই পর্ব্বতের নাম ধরাধর। পর্ব্বতের উৎপত্তি আছে বৃদ্ধি আছে ক্ষয় আছে। পৃথিবী ভেদ করিয়া পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতের বৃদ্ধি হয়, আবার ক্ষয়কালে পর্ব্বত ক্রমশঃ ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। তিল তিল পৃথিবী ভেদ করিয়া একটি পর্ব্বত যেমন সহস্র বৎসরে, লক্ষ বৎসরে উৎপন্ন হয়, আবার তেমনই তিল তিল করিয়া সহস্র বৎসরে, লক্ষ বৎসরে তাহা ভূগর্ভে বিলীন হইয়া থাকে। পর্ব্বতেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। মৃত পর্ব্বতে জীবনীশক্তি থাকে না; মৃত বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় মৃত পর্ব্বতের প্রস্তরও কর্কশ ও নীরস হয়; মৃত বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, মৃত পর্ব্বতের নীরস প্রস্তরও তদ্রূপ অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পার্ব্বত্যতত্ত্বের অভিজ্ঞ

প্রস্তরব্যবসায়িগণ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন্ পর্ব্বত মৃত, কোন্ পর্ব্বত জীবিত তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা দেখাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু তুমি হয় ত ইহা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছ যে, পর্ব্বতের আবার জীবন আছে? আজ তোমার এ হাসি দেখিয়া পর্ব্বত যে হাসিতেছে না, বলিতে পার। ইহাই বা তোমায় কে বলিল? এমন কোন বস্তু জগতে দেখাইতে পার কি যাহার জীবন নাই অথচ বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে? লক্ষ কোটী বৎসর, সহস্র সহস্র যুগযুগান্ত, শত শত মন্বন্তর, এক এক পর্ব্বতের পরমায়ু। তুমি আমি বিশাল কালসমুদ্রের এক একটি নগণ্য বুদ্বুদ মধ্যেও গণ্য নই, কেমন করিয়া এক জীবনে আমরা সে পর্ব্বতের জন্মমৃত্যু দেখিয়া চেতনত্ব জড়ত্ব পরীক্ষা করিব? পর্ব্বতের এক জীবনের মধ্যে তোমার আমার কত চতুরশীতি লক্ষবার ঘুরিয়া আসিবার কথা আছে, তাহা কে বলিবে? তাই পর্ব্বতের জন্মমৃত্যু দেখিয়া তাহার চেতনত্ব জড়ত্ব নিশ্চয় করিবার কথা তোমার আমার মুখে শোভা পায় না। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ক্ষয়বৃদ্ধি তোমার আমারও নিত্যপ্রত্যক্ষ, তাহা দেখিয়াই পর্ব্বত চেতন কি অচেতন তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার। অতঃপর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার চেতনাতত্ত্ব আরও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। ভৌতিক অনুভব শক্তির দ্বারা তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন, তাহাই কেবল একমাত্র সাধনসাধ্য দৈবশক্তির প্রভাবেই পরিজ্ঞেয়। সুতরাং সাধারণভাবে সে সম্বন্ধে লিখিয়া বুঝাইবার কিছু নাই। তদ্ভিন্ন জড়রূপেই যদি পৃথিবীকে ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও দেখিতে হইবে, বস্তুতঃই পৃথিবী জড় কি না? পার্থিব পরমাণু কেবল জড়শক্তিরই লীলাস্থল। অথবা চিৎশক্তি সূক্ষ্মরূপে তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহিরে জড়শক্তিকে কিঙ্করী করিয়া নিজকার্য্যসাধন করিয়া লইতেছেন। স্বীকার করিলাম, মৃত্তিকা কেবল জড়শক্তির লীলাস্থলী, কিন্তু কাল যেখানে দেখিয়া আসিলাম কেবল নীরস বালুকাস্তূপ ধূ ধূ করিতেছে, আজ সেখানে গিয়া দেখিতে পাই নবলাবণ্যময় অঙ্কুরের উদ্গম হইয়াছে। অচেতন মৃত্তিকার জড় পরমাণুমধ্যে এ সচেতন প্রাণীর জবনীশক্তি সঞ্চারিত হইল কোথা হইতে? এই প্রথম অবস্থা, আবার ইহার পরিণাম-অবস্থা আরও বিচিত্র। দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর স্তম্ভ কাণ্ড পত্র পুষ্প সহকারে ক্রমে ফল প্রসব করিল, শস্য পক্ক হইয়া মনুষ্য পশুপক্ষীর উদরস্থ এবং উদরে জঠর অগ্নিতে তাহার পুনঃ পরিপাক হইল, দেহমধ্যে সেই পক্ক শস্যের সারাংশ হইতে রস রক্ত মেদ শুক্র শোণিতের সৃষ্টি হইল, গর্ভাশয়ে সে শুক্র শোণিত পুনঃ পরিপক্ক হইয়া সজীব সচেন সাঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্তানরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল— এখন নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও একমাত্র গর্ভিণী ভিন্ন তোমার আমার তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিবার শক্তি নাই। ক্রমে দশমাস, দশদিন অতিবাহিত করিয়া সন্তান যে দিন ভূমিষ্ঠ হইল, সেইদিন তুমি আমি বুঝিলাম যে, অচেতন শস্য আহার

করিয়া তাহার এই সচেতন ফল ফলিয়াছে। শুক্র শোণিতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে চিৎশক্তি না থাকিলে এ চেতনা আসিল কোথা হইতে? আবার ভুক্ত শস্যে চেতনা না থাকিলে শুক্র শোণিতে চেতনা আসিল কোথা হইতে? বৃক্ষে চেতনা না থাকিলেই বা ফলে (শস্যে) চৈতন্য আসিল কোথা হইতে? আবার মৃত্তিকার চেতনা না থাকিলেই বা বৃক্ষে চেতনা আসিল কোথা হইতে। জড়বাদি-সমালোচক! এখন একবার বল দেখি—মৃত্তিকাই অচেতন, কি তুমি আমিই অচেতন? এই সূক্ষ্মরূপে চিন্ময়ী পৃথিবীকে স্থূলরূপে কেবল মৃণ্ময়ী বলিয়া বুঝিয়া উঠা কি তোমার আমার নিজ নিজ জড়তার পরিচয় নহে? যে পৃথিবীর প্রতি পরমাণুগত চিৎশক্তির প্রভাবে মনুষ্য পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ গুল্ম পর্ব্বত ইত্যাদি চরাচর জগৎ সচেতন, সেই পৃথিবীকে, মৃত্তিকাকে, অচেতন জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করি; আর যাহা ভাবিয়া দার্শনিকের মাথা ঘুরিয়া যায়, অনায়াসে তুমি আমি তাহা উপহাসে উড়াইয়া দেই. ইহা অপেক্ষা ব্যলীকতা আর কি আছে। দার্শনিক বলিতেছেন—

> এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজাল-মপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতং,
> রেতশ্চেতত্তি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূত-নানাঙ্কুরং।
> পর্য্যায়েণ শিশুত্ব-যৌবন-জরা-রোগৈ-রনেকৈর্ব্বৃতং,
> পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥

গর্ভবাসে অবস্থিত অচেতন রেতঃপদার্থ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়, ক্রমে তাহার হস্ত মস্তক প্রভৃতি নানা অঙ্কুরের উদ্গম হয়, আবার সেই জীবরূপে অঙ্কুরিত রেতঃপদার্থই পর্যায়ক্রমে শৈশব যৌবন জরা রোগ প্রভৃতি অনেক উপাধিতে উপস্থিত হইয়া দর্শন ভোজন শ্রবণ ঘ্রাণ এবং গমন ও আগমন করে, ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রজাল আর কি আছে?

এখন আপত্তির উত্থাপন এই হইতে পারে যে, মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠ ধাতু ইত্যাদিতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্য অংশ লইয়াই যদি উপাসনা হয়, তবে তদপেক্ষায় পরিস্ফুট-চৈতন্য মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদির দেহ লইয়া উপাসনা হয় না কেন? আমরা বলিব, হয় না, এ কথা কে বলিল? তাহাও হয়—গুরুরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা গুরুর মনুষ্যদেহেই হইয়া থাকে, কুমারীপূজাও মানব-বালিকার দেহেই হইয়া থাকে, শিবার পশুদেহেই শিবসীমন্তিনীর উপাসনা হয়, ক্ষেমঙ্করীর পক্ষিরূপেই দক্ষনন্দিনী সাধকের সাধনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এ ত গেল অন্যের দেহে—প্রথমে সাধকের নিজ দেহেই ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতে হইবে, তবে অন্য দেহে উপাসনার অধিকার জন্মিবে; কিন্তু কেবল ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ লইয়া ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধিই হয়, ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধি হয় না। উপাসনা করিতে হইলেই দেবতার প্রসাদমাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তির প্রয়োজন; সে মূর্ত্তিও নিজে মনঃকল্পিত কিছু করিয়া লইলে

চলিবে না। তিনি স্বয়ং যে সকল মূর্ত্তিতে স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতে হইবে। সে উপাসনাও আবার শাস্ত্রের অনুমোদিতরূপে করিতে হইবে; শাস্ত্রানুমোদিত সাধনা হইলেই সিদ্ধি তাহাতে অবশ্যম্ভাবিনী। যেখানে সিদ্ধির সংস্রব আছে সেইখানেই মন্ত্রশক্তির একাধিপত্য, মন্ত্রময়ী সাধনায় দেবতার স্বরূপ-রূপ মন্ত্রশক্তি বলেই সমুদিত হইবে। সুতরাং আমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত সেই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য স্বরূপই আমার একমাত্র ধ্যেয়। নিজ আত্মাতে আমি সেই স্বরূপের ক্ষণিক ধ্যান করিতে পারি, কিন্তু যতদিন সে ধ্যান একান্ত সমাধিতে পরিণত না হইতেছে ততদিন সে স্বরূপ রূপ নিয়ত হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই—এই অভাব পূরণ করিবার জন্যই বাহিরে মূর্ত্তিস্থাপন। দ্বিতীয়তঃ পূজাদির সময়ে নিশ্চল ধ্যান হইতেও পারে না—আমি পূজক তিনি পূজ্য, পূজা আমার কার্য্য, এই ত্রিবিধ জ্ঞান না থাকিলে পূজা হয় না—ইহার মধ্যে আবার প্রত্যেক দ্রব্যাদি দানকালে সেই সেই দ্রব্যবিষয়ক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জ্ঞানের উদয় হইবে। এত বিভিন্ন জ্ঞানের যুগপৎ সম্মিলনে কখনও একান্ত ধ্যান সম্ভবে না—এইজন্যই বাহিরে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে বাহ্য পূজা সিদ্ধ হয় না। তবে আমি ইচ্ছা করিলেই বাহিরের মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির আবির্ভাব কেন হইবে?—এ কথার উত্তর স্বতন্ত্র। একতঃ, মন্ত্রশক্তি তাঁহার যে স্বরূপের যে পরিচয় শাস্ত্রে দিয়াছেন, মৃণ্ময় পাষাণময় মূর্ত্তি ইত্যাদি সেই সেই স্বরূপে গঠিত; সুতরাং তাহাতে সেই স্বরূপশক্তির আবির্ভাবের কোন বাধা নাই, বরং অনুকূল উপায়ই যথেষ্ট আছে। তারপর মন্ত্রশক্তি নিজপ্রভাবে জাগরিত হইয়া সাধকের হৃদয়স্থ ব্রহ্মতেজ দেবতার বাহ্যরূপে অবস্থিত তেজের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিবেন, তখন উভয় তেজ একত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া যজ্ঞাগ্নির ন্যায় সাধকের প্রদত্ত উপহারসকল আত্মসাৎ করিবেন; তাহাতে তোমার আমার আপত্তি করিবার, চিন্তা করিবার কথা কি আছে? মধ্যস্থ মন্ত্রই তজ্জন্য দায়ী, মন্ত্র আপন বলে প্রতিমায় দেবত্ব সঞ্চার করিবেন, তোমাকে আমাকে তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না—এইজন্য সকল সাধনার মূল মন্ত্রশক্তি। মন্ত্র একেশ্বর হইয়া নিজ অলৌকিক প্রভাববলে যে ত্রিজগতের অতীত ঘটনা সঙ্ঘটিত করিতে পারেন, ত্রিজগদ্ ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়াও মন্ত্র ব্যতিরেকে তাহা সিদ্ধ করিতে অসমর্থ। মন্ত্রের এই অদ্ভুত মহিমা আছে বলিয়াই তুমি আমি মানব হইয়াও দেবতাকে পূজা করিতে সমর্থ। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
> আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি।

অর্চ্চকের যদি তপস্যার বল অর্থাৎ মন্ত্রে চৈতন্য থাকে, অর্চ্চন দ্রব্যাদির যদি অতিশয়তা থাকে অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্যের উদ্দীপনায় যদি সাধকের হৃদয় দেবতার

প্রতি একান্ত তদ্গত হইয়া যায়, আর প্রতিমা যদি দেবতার স্বরূপের অভিরূপ হয় অর্থাৎ মূর্ত্তিদর্শনমাত্র সাধকের নয়ন মন যদি তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-সাগরে ডুবিয়া পড়ে, তবেই সে মূর্ত্তিতে দেবতা সহসা সন্নিহিত হয়েন। ব্রহ্মময়ীর এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপে তিনি নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষ গুল্ম লতা বনস্পতি দেব দানব মানব ইত্যাদি যে যন্ত্রে তাঁহার যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, সে শক্তি সিদ্ধ করিতে হইলেই তাঁহার সেই যন্ত্রে উপাসনা করিতে হইবে। শিবা ক্ষেমঙ্করী শ্মশান শব শক্তি বিল্ব অশ্বত্থ অপরাজিতা গাভী বৃষ ব্রাহ্মণ তীর্থ অগ্নি ইত্যাদিতে তাঁহার উপাসনারও ইহাই মূল। সুযোগ ঘটিলে আমরা যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের তত্ত্বোদ্ঘাটনে হস্তক্ষেপ করিব। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বুঝিবার কথা যে, যে যন্ত্রে যে মূর্ত্তিতেই তাঁহার উপাসনা করা হউক না কেন, এ সমস্তই তাঁহার স্বরূপ-বিভূতির আরাধনা। এইজন্য জ্ঞানৈকশরণ বৈদান্তিক দণ্ডিগণও বলিয়াছেন—

বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে।
ধাত্রাদি স্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ ॥ ১ ॥
ঈশসূত্র-বিরাড়্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরাল-মারিকা-যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ২ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥ ৩ ॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ ৪ ॥
যথাযথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥ ৫ ॥
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্ব-স্বপ্নো হীয়তে যথা ॥ ৬ ॥
অদ্বিতীয়-ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥ ৬ ॥ (পঞ্চদশী)

পুরুষ সূক্তে বিশ্বরূপাধ্যায়ে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের বিরাট রূপের অবয়ব ॥ ১ ॥ ঈশ্বর সূত্রাত্মা বিরাট ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র অগ্নি বিঘ্ন ভৈরব মৈরাল মারিক যক্ষ রাক্ষস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র গো অশ্ব মৃগ পক্ষী অশ্বত্থ বট আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ, যব ব্রীহি তৃণ প্রভৃতি শস্য, জল পাষাণ মৃত্তিকা কাষ্ঠ বাস্য (বাইস) কুদ্দাল প্রভৃতি এ সমস্তই ঈশ্বর; ঈশ্বর-স্বরূপে পূজা করিলেই ইঁহারা স্ব স্ব যন্ত্রে অধিষ্ঠিত শক্তি অনুসারে ফল বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২-৪ ॥ পূজক, তাঁহাতে যে যে যন্ত্রে যেরূপ যেরূপ পূজা করিবেন,

পূজার ফলও সেইরূপ সেইরূপ লাভ করিবেন ; ফলের যাহা কিছু উৎকর্ষ অপকর্ষ লক্ষিত হয়, সে কেবল পূজনীয় যন্ত্রের স্বরূপ এবং সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক গুণভেদে পূজার তারতম্য অনুসারে ; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি কখনও হইবে না, যেমন নিজের প্রবোধ ব্যতিরেকে কিছুতেই নিজের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে উপস্থিত হইলে তখন ঈশ্বর জীব ইত্যাদি রূপে চেতনাচেতনাত্মক এই নিখিল জগৎ স্বপ্ন বই আর কিছুই নহে ॥ ৬-৭ ॥

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতি ত্রিবিধ কারণ—১। বেদান্তদর্শনসিদ্ধ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। ২। যোগানুষ্ঠান। ৩। ভক্তিকে অবলম্বন রাখিয়া কর্ম্ম যোগ জ্ঞান এই ত্রিতয়ের সংমিশ্রণরূপ সাধনা। এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে শেষোক্ত উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম মধুর শীঘ্র ফলপ্রদ এবং বিষয়ী বিরক্ত মুমুক্ষু এই ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষেই উপযোগী। ভক্তকুলের সেই উপাসনাকাণ্ডের অবলম্বন জন্য পরমদেবতা পরমেশ্বরী সর্ব্বশক্তির কেন্দ্ররূপে স্বয়ং যে সকল স্বরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সেই সকল স্বরূপই ভক্তিরাজ্যের একমাত্র পরমারাধ্য পরমতত্ত্ব। ব্রহ্মা হইতে তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যে বিরাট-বিভূতি কীর্ত্তিত হইল, সেই সকল খণ্ড খণ্ড বিভূতির সিদ্ধি লাভ করিয়া যাঁহারা চরিতার্থ নহেন, ঐকান্তিক ভক্তি বা মুক্তির জন্য যাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল, তন্ত্রোক্ত চরমা সিদ্ধি কেবল তাঁহাদিগেরই করতলে নৃত্য করেন। পর-ব্রহ্মরূপিণীর তন্ত্রোক্ত পরব্রহ্ম স্বরূপের উপাসনায় কেবল তাঁহারাই অধিকারী। তাঁহাদিগের জন্যই কেবল তুরীয় চৈতন্যরূপিণী ত্রিজগজ্জননী চিদ্‌ঘনানন্দ লীলাময় ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন—

কুলধর্ম্মমহামার্গে গত্বা মুক্তিপুরীং ব্রজেৎ।
অচিরামাত্র সন্দেহ-স্তস্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গুণলীলা

তিনি শিবরূপে গুণাতীত নিষ্কলতত্ত্বস্বরূপ হইয়াও অনন্তগুণময়-মধুর-মূর্ত্তিধর, তমোগুণময় হইয়াও তমোগুণের নিয়ন্তা একমাত্র অধীশ্বর, তমোগুণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও স্বপ্রকাশ রজতাচল—শুভ্রসুন্দর, তমোময় হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান—পরমগুরু, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও মহাশ্মশানগোচর, মহাপ্রলয়-মহারুদ্র হইয়াও অপার-স্থিরগম্ভীর মহাশান্তিসাগর, নিজানন্দে অধীর হইয়াও নিজ সাধনানন্দ-নির্ভর, বিরূপাক্ষ হইয়াও করুণাময়-প্রেমদর্শন, নিজে ত্রিজগতের উপাস্য হইয়াও নিজ উপাসনার পথপ্রদর্শক, নিত্য নির্দ্বন্দ্ব হইয়াও নগেন্দ্রনন্দিনীর অর্দ্ধাঙ্গহর, নিঃসঙ্গ হইয়াও নিত্যসঙ্গিনীর সঙ্গসাধক, নিত্যকান্তকান্তা-যুগলমূর্ত্তিধর হইয়াও কামান্তকর; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা হইয়াও কাশীক্ষেত্রে অযাচক জীবমাত্রের চিরকৈলব্য ফলবিধাতা, উগ্র হইয়াও আশুতোষ, শুভ্র হইয়াও নীলকণ্ঠ, ত্রিলোক-সংহারকর্ত্তা হইয়াও কালকূট-পানচ্ছলে ত্রৈলোক্যরক্ষাকর, ভস্মধূসরিতদেহে চিরবৈরাগ্যপ্রদর্শক হইয়াও ভুজঙ্গ-ভূষণে বিলাসলীলাধর; জটাজূটবিমণ্ডিত হইয়াও চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখর, বরাভয়ধর হইয়াও ত্রিশূল-পরশুপাণি, ভক্তমুক্তিবিধায়ী হইয়াও মুক্তকেশরীর চরণতলশায়ী, পূর্ণানন্দ হইয়াও কারণানন্দপায়ী মহাভৈরব, ভৈরব হইয়াও মাভৈ-রব, সহস্রশীর্ষা হইয়াও পঞ্চানন, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ হইয়াও ত্রিলোচন, অম্বরমূর্ত্তি হইয়াও দিগম্বর, অষ্টমূর্ত্তি হইয়াও অনন্তমূর্ত্তি, জ্ঞানরূপ হইয়াও জ্ঞানগুরু, মুক্তিপ্রাপ্য হইয়াও মুক্তিপ্রাপক, জগৎপতি হইয়াও কৈলাস-কাশীপতি, ভূতনাথ হইয়াও ভূতপতি, পশুপাশ-বিনাশকারী হইয়াও পশুপতি, ললাটলোচনে বহ্নিধর হইয়াও জটাজূটে গঙ্গাধর; সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বর হইয়াও দক্ষযজ্ঞ-বিধ্বংসন, মায়ামোহের পারান্তর হইয়াও দেবীবিয়োগ-লীলাকাতর, সর্ব্বসম্বন্ধ গন্ধহীন হইয়াও গিরীন্দ্রজামাতা, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভবনিদান লিঙ্গরূপী পরব্রহ্ম হইয়াও কুমারহেরম্ব-পিতা, কর্ম্মজ্ঞান-যোগগম্য হইয়াও যোগনিদ্রার নিত্যনায়ক, ত্রৈলোক্য-সংহারকর্ত্তা হইয়াও ভক্তভুবনের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞানীর লভ্য হইয়াও ভক্তের নিত্যসহচর, ত্রৈলোক্যনাথ হইয়াও অনাথনাথ, বিশ্ববিভু হইয়াও দীনবন্ধু, বিশ্ববৎসল হইয়াও শরণাগতবৎসল, নিখিল মন্ত্র যন্ত্রের আরাধ্য হইয়াও তন্ত্র মন্ত্রের একমাত্র অধীশ্বর, অনন্তভুবনে একেশ্বর হইয়াও প্রত্যেক ভক্তহৃদয়-সিংহাসনে চির-রাজরাজেশ্বর।

আবার কৃষ্ণরূপে দ্বৈততরঙ্গ-বিকাররহিত হইয়াও কপট শঠ নটবর, ভাববিকার-বহির্ভূত হইয়াও ত্রিভঙ্গমধুর-মূর্ত্তিধর, শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হইয়াও সজলজলদ-শ্যামসুন্দর, সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও ভূভারহরণচ্ছলে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ, পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও গুঞ্জাফল-মালাধর, বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর আরাধ্য হইয়াও বৃন্দাবন-ধূলিধূসরিত, ত্রিলোকপালক হইয়াও গোপাল গোপবালক, বিশ্বম্ভর হইয়াও বিপ্রপত্নীর অন্নভিক্ষুক, অনন্ত শোভার আধার হইয়াও শিখিপুচ্ছ-শোভাধর, মায়াবরণের অতীত হইয়াও পীতাম্বর-বদ্ধকটি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহায় হইয়াও বলরাম-সহায়বান্, যোগীন্দ্রগণের হৃদয়চারী হইয়াও গোপগোষ্ঠ-বিহারকারী, অনন্ত জগতের আধার হইয়াও গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, প্রশান্ত মদনমোহন হইয়াও কংস-কালিয়-দর্পদমন, বালগোপালমূর্ত্তি হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর দামোদর, হরিহরব্রহ্মরূপে অভিন্ন হইয়াও ব্রহ্মসম্মোহনকর, স্বয়ং ভয়ের ভয়স্বরূপ অভয়তত্ত্ব হইয়াও প্রেমগুণে যশোদাভয়বিহ্বল, অনন্ত ভুবনের প্রতি পরমাণুতে অনুস্যূত হইয়াও নিত্যবৃন্দাবনচর, লজ্জাধর্ম্ম-ভয়কাতরা দ্রৌপদীর অসংখ্য-বসনবিধানকারী হইয়াও কাত্যায়নীব্রতসিদ্ধা কিশোরী-কুলের বসনহারী, নাদবিন্দুধ্বনি মূর্চ্ছনার নিদান হইয়াও বংশীধ্বনি-বিনোদন, মহারস-স্বরূপ হইয়াও নিত্যরাস-রসোৎসুক, নিত্যানন্দপরিপূর্ণ হইয়াও রাধিকা-মান-কাতর, মহাপ্রেম-সাধিকার সাধ্য হইয়াও রাধিকার নিত্যসাধক, নিত্যমুক্ত নির্লিপ্ত নির্গুণ হইয়াও ব্রজপুর-সুন্দরীকুলের প্রেমগুণে নিত্যবদ্ধ, কামদোষ-লেশবর্জ্জিত হইয়াও কামিনীকুলের কামকেলি-সুপণ্ডিত, কামতরঙ্গমধ্যমগ্ন হইয়াও কামসমরবিজয়ী কুমার, এক অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র হইয়াও অসংখ্য গোপীমণ্ডলীর অসংখ্যযূথে প্রত্যেকের নিকটে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্বিতীয়, নরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াও ব্রহ্মলীলায় অধীর উন্মত্ত, সাধনহীন দুর্ভাগ্য জীবের মোহবিধানচ্ছলে নিজদারামণ্ডলেও পরদারত্ব-প্রতিপন্নকারী, সংসারধর্ম্মসেতুর রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও সাধনধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি-নির্দ্দেশকর্ত্তা, উভয়ধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়াও সংসারধর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া সাধনধর্ম্মের বিজয়ধ্বজার উদ্ধর্ত্তা, আবার লোকরক্ষার প্রবর্ত্তনচ্ছলে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের বিধানকর্ত্তা হইয়াও ধর্ম্মের পক্ষপাতী, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়াও পাণ্ডবকুলের নিত্যসখা, কর্ম্মী যোগী জ্ঞানীর আরাধ্য হইলেও ভক্তের জীবনসর্ব্বস্ব, অশরণশরণ হইয়াও স্বয়ং ভক্ত-শরণাগত।

আবার শক্তিরূপে নিখিলশক্তির সমষ্টিস্বরূপিণী গুণাতীতা হইয়াও অনন্তগুণধারিণী, অদ্বৈতরূপিণী হইয়াও দ্বৈতজগতের পরস্পর বিরোধী গুণরাশির একত্র সামঞ্জস্য-কারিণী, রণরঙ্গিনী হইয়াও ভক্তভয়ভঞ্জিনী ; ত্রিদেবজননী হইয়াও শিবহৃদয়রঞ্জিনী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপিণী হইয়াও নগেন্দ্র-প্রাণনন্দিনী, ত্রিলোকপিতামহের প্রসবিত্রী হইয়াও নিত্যনবযৌবনা, ত্রিলোকব্যাপিনী হইয়াও অবাঙ্মনসগোচরা, আবার অবাঙ্মনসগোচরা হইয়াও অনন্তমূর্ত্তিধরা, নির্দ্বন্দ্বা হইয়াও ধর্ম্মের পক্ষপাতিনী,

ব্রহ্মাণ্ড-জননী হইয়াও দৈত্যকুলবিধ্বংসিনী, আবার দানবকুলঘাতিনী হইয়াও দানবকুলনিস্তারিণী, সপ্তসমুদ্রচারিণী হইয়াও ক্ষীরসমুদ্রবিহারিণী, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বরী হইয়াও মণিদ্বীপনিবাসিনী, উপাধির অতীতা হইয়াও চিন্তামণিগৃহস্থিতা, ভবন-বন-সমানদর্শিনী হইয়াও পারিজাত-বনাশ্রিতা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গফলের চিরকল্পলতা হইয়াও স্বয়ং কল্পতরুতলস্থিতা, ভস্মরত্নে সমদর্শিনী হইয়াও রত্নসিংহাসনগতা, অনন্তজগতের আধারশক্তি হইয়াও সদাশিবমহাপ্রেত-পদ্মাসনশায়িনী, অনন্তকোটী চন্দ্র সূর্য্য বহ্নিমণ্ডলের জ্যোতির্বিধায়িনী হইয়াও স্বয়ং নিবিড়কাল-কাদম্বিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বপ্রকাশলীলা হইয়াও দলিতাঞ্জনপুঞ্জনীলা, গভীর তিমির কান্তিধারিণী হইয়াও সচ্চিদানন্দ-লাবণ্যভরে অনন্ত ভক্তভুবনের অন্তরন্ধকারহারিণী, স্বয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণবীণাধ্বনিবিনোদিনী হইয়াও পঞ্চাশন্মুণ্ডমালিনী, প্রপঞ্চের অতীতা হইয়াও ত্রিপঞ্চারবিহারিণী, বেশবিন্যাসবিমুখী হইয়াও চন্দ্রখণ্ডবিমণ্ডিতা, কালখণ্ডনতৎপরা হইয়াও কালকৌতুকসুপণ্ডিতা, নিখিলব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হইয়াও মহাশ্মশানবাসিনী, কেবলা নিষ্কলা নিত্যশুদ্ধা হইয়াও অনন্তকোটী যোগিনীবৃন্দসহচারিণী, ভববন্ধনবিধায়িনী হইয়াও ভক্তবন্ধন-মোচনচ্ছলে নিত্যমুক্তকেশী, বামাস্বরূপধারিণী হইয়াও দক্ষিণচরণ-প্রসারণচ্ছলে দক্ষিণাংশ বিজয়িনী, মায়ামোহের অতীতা হইয়াও মদভর-ঢলঢলঘোরঘূর্ণিতরক্তনয়না, করাল মুখমণ্ডলেও মধুর-মন্দ-সুহাসিনী, খড়্গমুণ্ডধরা হইয়াও বরাভয়বিধায়িনী, লজ্জাবৃত্তিপ্রবর্ত্তিনী হইয়াও নির্লজ্জার শিরোমণি, অনন্ত অম্বরব্যাপিনী হইয়াও দিগম্বরী, সর্ব্বানন্দ-স্বরূপিণী হইয়াও যোগানন্দ-উন্মাদিনী, অনন্ত চরাচরের প্রসূতী হইয়াও মহাকালবিলাসিনী।

সাধক! এই পরস্পরবিরোধী অনন্তগুণরাশির একাধারে এমন অতুল সজ্জা আর কোথায় দেখিতে পাইবে? যেন অনন্তগুণময়ীর অনন্তগুণ কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া অনন্তভুবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাঁহার গুণ তাঁহাকে পাইয়া মাতৃহারা সন্তানদলের ন্যায় নির্ব্বিরোধে মায়ের কোলে ঘুমাইয়াছে। সাধক! সগুণমূর্ত্তিপ্রধান উপাসনাকাণ্ডে গুণময়ীর এই গুণেই ত সাধকের মনঃপ্রাণ সংসার হইতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণকল্পতরুর শীতল ছায়ায় অতুলশান্তি সম্ভোগ করে। অনন্তগুণের আধার বলিয়াই ত সে মূর্ত্তি এত মধুর, এত মনোহর! কোন একটি গুণ যে স্থানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, সেইস্থানেই অন্য গুণের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়; করুণা যে স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে, কঠোরতা সে স্থান হইতে অনাদৃত হইয়া পলায়ন করে—গুণ সকল স্বভাবতঃই এইরূপ পরস্পর বিরোধী; কিন্তু যে স্থানে কোন গুণেরই আধিপত্য নাই, কোন গুণই যেখানে অধীন ভিন্ন অধিপতি নহে, সেখানে কাহার সহিত কাহার বিরোধ হইবে? খাদ্য বস্তু লইয়া সন্তানের দলে ততক্ষণই ঘোরতর বিবাদ যতক্ষণ মা আসিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থান ও খাদ্যপদার্থ বিভক্ত

করিয়া না দেন, তদ্রূপ গুণও ততক্ষণ পর্য্যন্তই পরস্পরবিরোধী হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিগুণাতীতা নিজ নিঃসঙ্গ অঙ্গে তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত না করেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে সকল গুণই তখন গুণ থাকিয়াও নির্গুণ-স্বরূপে পরিণত হয়। তাই তাঁহার গুণসকল পরস্পর বিরোধী হয় না, তাই মায়ের শ্রীঅঙ্গে বামে খড়্গমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয় শোভা পায়, তাই মায়ের অট্ট অট্ট হাসির ছলে করুণার বিগলিত ধারা বহিয়া যায়—তাই রণরঙ্গিণীর প্রেমতরঙ্গে ত্রিভুবন ভাসিয়া যায়, তাই আনন্দময়ীর গুণের গুণে, প্রেমের গুণে নির্গুণ সদানন্দ পুরুষ তাঁহার চরণতলে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছেন। ধন্য গুণময়ীর গুণাতীত গুণলীলা, ধন্য নির্গুণার গুণের খেলা, ধন্য সগুণ সংসারে তাঁহার গুণের মেলা!

সগুণ সংসারে এ অনন্তনির্গুণ গুণের একত্র সমাধান অসম্ভব বলিয়াই গুণাতীতার গুণলীলাময় মূর্ত্তিপরিগ্রহ। পার্থিব জগতে তিনি প্রত্যেক জীবহৃদয়ের অন্তশ্চারিণী হইলেও এত গুণ একত্র সম্ভবে না, তাই তাঁহার নিত্য সিদ্ধ পরিস্ফুট চৈতন্যাংশ জীবকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রথমে অপরিস্ফুট-চৈতন্য অনন্ত গুণের প্রতিবিম্ব প্রতিমাতেই তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা। শেষে প্রাণপ্রতিষ্ঠাকালে মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মূর্ত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য সঞ্চারিত হইলেই তখন মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে যে চিন্ময় আবির্ভাব উপস্থিত হইবে, জীবদেহে শতসহস্র উপাসনা করিয়াও সে শক্তি সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি সর্ব্বভূতব্যাপিনী হইলেও প্রতিমাতেই তাঁহার ব্রহ্মরূপের উপাসনা সুসম্ভব। এইজন্যই ভগবান ভূতভাবন বলিয়াছেন—

গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
এবং সর্ব্বত্রগো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥

গাভীর দুগ্ধ তাহার সার্ব্বাঙ্গজ হইলেও স্তনদ্বার হইতেই যেমন তাহা পরিস্রুত হয় তদ্রূপ দেবতা বিশ্বব্যাপিনী হইলেও প্রতিমাতেই তাঁহার স্বরূপসত্ত্বা নিত্যবিরাজিত। সর্ব্বাঙ্গেই দুগ্ধ জন্মে বলিয়া গাভীর নাসিকা পুচ্ছ লাঙ্গুল প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দোহন করিলে তাহা হইতে যেমন শ্লেষ্মা মূত্র গোময়াদি লাভেরই ধ্রুবসম্ভাবনা, সর্ব্বভূতে তিনি অধিষ্ঠিত বলিয়া তোমার আমার এই দেহে জীবরূপে তাঁহার উপাসনা করিলেও তাহা হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের পরিবর্ত্তে তদ্রূপ জীবতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেরই অবশ্যম্ভাবিতা। আর যদি জীবরূপ ব্রহ্মাংশ লইয়া ব্রহ্মরূপের উপাসনা করা হয় তাহা হইলেও জীবদেহে সে সর্ব্বশক্তির স্বরূপ অনুভব অসম্ভব। আবার এইজন্য যদি জীবত্ব উপাধিভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ চিৎসত্ত্বা মাত্র লক্ষ্য করা হয় তাহা হইলে আর জীব-দেহেই বা প্রয়োজন কি? উপাধি ত্যাগ করিলে ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার সত্ত্বাময়। আবার—সেই নির্গুণ স্বরূপই আসিয়া পড়িল; সে তত্ত্বের যখন অনুভব হইবে তখন ত আর উপাসনারই প্রয়োজন নাই। তাই সগুণ অবস্থায়

থাকিয়া অনন্ত গুণাতীত অথচ অনন্ত-গুণময় ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করিতে তাঁহার আজ্ঞাবলে মন্ত্রবলে কল্পনায় বা উপমা উদাহরণ দৃষ্টান্তে না হইয়া সত্য সত্য নিত্য প্রত্যক্ষরূপে তাঁহার সে স্বরূপ শক্তি অনুভব করিতে একমাত্র তাঁহার স্বেচ্ছা-পরিগৃহীত লীলাময় মূর্ত্তি ভিন্ন উপাসনাকাণ্ডে আর উপায়ান্তর নাই। এইজন্যই প্রতিমার এত অতুল মহিমা, এইজন্যই প্রতিমা তাঁহার উপাসনার অবলম্বন স্তম্ভ, এইজন্যই প্রতিমার উপাসক সাক্ষাৎ ব্রহ্মকৈবল্যের অধিকারী। প্রতিমা যেরূপ তাঁহার ব্রহ্মলীলার নিত্যাধিষ্ঠান ক্ষেত্র, যন্ত্রও তদ্রূপ নিত্যাধিষ্ঠান ক্ষেত্র; কিন্তু যন্ত্রতত্ত্ব নিতান্তই গুরুগম্য —সে গুরুগম্ভীর নিগূঢ়-তত্ত্ব সাধারণতঃ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তবে ঊর্দ্ধ সংখ্যা এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যন্ত্র কেবল তাঁহার মন্ত্রমূর্ত্তির স্বরূপপ্রকাশ, অতি উচ্চ অঙ্গের সাধক ব্যতীত যন্ত্রতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার নাই—গুরুদেব নিজ শিষ্যের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সে তত্ত্ব বিবৃত করিবেন। তজ্জন্যই কুলার্ণবে দেবদেব আজ্ঞা করিয়াছেন—

তস্মাদ্ যন্ত্রং লিখিত্বা বা পূজয়েৎ পরমাং শিবাং।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সর্ব্বং পূজয়েদ্বিধিনা প্রিয়ে॥ (তন্ত্রতত্ত্ব ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

এখন ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিয়াছেন, ভূগোলসূত্র পড়িয়াছেন, এই সূত্রে যাঁহারা আপনাকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত বিজ্ঞ বহুদর্শী বলিয়া মনে করেন, যোগবাশিষ্ঠ, পাতঞ্জলসূত্র ও পঞ্চদশীর অনুবাদ পড়িয়াছেন বলিয়া আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধসাধক বলিয়া মনে মনে বিলক্ষণ অভিমান রাখেন, বাঁধিগদে অচঙ্গা-ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা হয় ত এখনও বলিবেন যে, সর্ব্বব্যাপী পদার্থের আবার একটা আবাহন বিসর্জ্জন কি? তাঁহাদিগের কথায় কথায় উত্তর করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই— তবে এইমাত্র বলি যে, সর্ব্বত্র তিনি আছেন। ইহা যদি মুখের কথা না হইয়া যথার্থই হৃদয়ের কথা হইত তা হইলে আর আজ তুমি—তুমি আমি, তিনি ইনি, যে সে সম্বন্ধ ঘটাইয়া আমার কথার উত্তর করিতে আসিতে না। বলিতে কি, 'তিনি সর্ব্বত্র আছেন' এ কথা ভাই! তোমার খাতায় আছে, কিন্তু মাথায় নাই। জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগ এ সকল বিভাগের হেতু কি, ভেদ কি, তাহা তুমি বুঝিতেও পার না, বুঝিবার শক্তিও নাই। তাই তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জনের নাম শুনিলেই স্বপ্ন দেখিয়া দণ্ডে দশবার চীৎকার করিয়া উঠ। হৃদয়স্থ দেবতাকে মন্ত্রবলে হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া বাহিরের পূজা শেষ করিয়া আবার হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে স্থাপন করার নাম আবাহন আর বিসর্জ্জন, এ কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকিত, অলৌকিক দৈবশক্তির আবির্ভাবের নাম সাধনার সিদ্ধি, ইহা যদি তোমার জন্মান্তরীণ সংস্কারেরও অন্তর্নিহিত হইত, তাহা হইলেও তুমি এ কথা কখন মুখে আনিতে

পারিতে না যে, তাঁহার আবার আবাহন আর বিসর্জ্জন কি? আজ ফলে ফুলে কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে, সে ত অনেক দূরের কথা, এ অকাণ্ড কাণ্ড সৃষ্টির মূলবীজেই তাহা ছিল কি না সন্দেহ। ইহা আমাদিগের অতিরঞ্জিত কথা নহে, ফুলে যাহা ফুটিয়াছে, ফলে যাহা ঘটিয়াছে—তাহা দেখিয়াই বীজের শক্তি সপ্রমাণ করিয়া লও। রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন—

মন! এ কি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার?
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি বা কে আন কাকে, এ কি চমৎকার॥
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে, এ কি অবিচার॥
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥

ইহার উত্তর আর আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে না। সাধনাপ্রাণ মহাত্মা দিগম্বর ভট্টাচার্য্য যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তিনি বলিতেছেন—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার?
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবনসঞ্চার॥
জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এস ব্রহ্মময়ি! কর গো নিস্তার॥
জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল সকলি ত তাঁর॥

ভ্রান্তি ত ছাড়িবার নহে, ছাড়িলেও তাহা কথায় বা গানে ছাড়িবার নহে, তবে আর ভ্রান্তি ভ্রান্তি করিয়া কাঁদিয়া এ অশান্তি ভোগ করা কেন? নিদ্রা ত ভাঙ্গিবার নহে, তবে আর দিন রাত্রি দুঃখ দুর্গতির চিন্তা করিয়া দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখিয়া এ চীৎকারে ফল কি? বরং দুঃখের পরিবর্ত্তে অভিলষিত সুখের চিন্তা করিয়া নিদ্রার সময়টা সে সুখের স্বপ্ন উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাই সংসারতপ্ত জীবনে ভ্রূভঙ্গী করিয়া সাধনতৃপ্ত-জীবন দিগম্বর বলিতেছেন—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।

তোমারও ক্ষতি নাই, আমারও ক্ষতি নাই, যাঁহাকে ডাকি তাঁহারও কোন ক্ষতি নাই—তবে জিজ্ঞাসা করি, এ ক্ষতি কার? তোমার ক্ষতি নাই, কারণ আমি ডাকিতেছি; আমার ক্ষতি নাই, কেননা আমি ডাকিয়া শান্তি পাইতেছি—আর যাঁহাকে ডাকিতেছি, তাঁহারও কোন ক্ষতি নাই—কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে ত আমি আর তাঁহাকে ডাকিতেছি না। তিনিই আজ আমি হইয়া তাঁহাকে ডাকির্তেছেন—কেবল তুমি আমি দেখিতেছি যে, তুমি আমি ডাকিতেছি—বস্তুতঃ সে ডাকা ত মিথ্যা। তবে বলিতে পার, তিনি এ মিথ্যা ডাক ডাকেন কেন? আমরা বলি, এ কথার উত্তর জীবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়—তিনি ব্রহ্ম থাকিয়াও জীব হইলেন কেন? সচ্চিদানন্দ থাকিয়াও দ্বন্দ্বদুঃখ বিজড়িত হইলেন কেন? এ কথার উত্তর করিবে কে? লীলানন্দময়ী তিনি, লীলাই তাঁহার আনন্দনাটক, এ সংসারলীলা-নাটকে তিনি যদি জীবরূপে আপনি আপনাকে ডাকিয়া আপন আনন্দে আপনি উন্মত্তা হয়েন, আপন ভ্রান্তিতে স্বপ্ন দেখিয়া তিনি যদি আপন শান্তি আপনি উপভোগ করেন, তাহাতে তাঁহারই বা ক্ষতি কি? আর সংসারদৃষ্টিতে আমি জীব হইয়া যদি তাঁহাকে ডাকি, তবে তাহাও ত তাঁহারই আজ্ঞানুমোদিত, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতির কি কথা আছে? তাই এ সংসার ভ্রান্তিময়—ইহা জানিয়াও, ভ্রান্তিনিদ্রার বিষম স্বপ্নে জাগিয়াও, ভ্রান্তির মূলতত্ত্ব বুঝিয়াই উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রান্তসাধক অভ্রান্ত তান্ত্রিক দিগম্বর শান্তিসাগরে ডুবিয়া বলিতেছেন,

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি বা কে? আন কাকে, একি চমৎকার।

যিনি সর্ব্বত্র আছেন, তাঁর ত আর 'এখানে ওখানে' নাই, তবে আর তাঁহাকে ইহাগচ্ছ (এখানে এস) বল কি করিয়া? এইস্থানে রায় মহাশয় একটু ডুবিয়া বুঝিলে বোধ হয় আর এরূপ বলিতেন না। কারণ বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের এখানে ওখানে নাই—ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, তবে ইহাগচ্ছের এ 'ইহ' কাহার? ইহা সাধক বলিতেছেন—তাঁহার নিজের ইহ, ব্রহ্মের এখানে ওখানে না থাকিলেও সাধকের ত তাহা আছে। তিনি বলিতেছেন—আমার এখানে এস। 'যদি তোমার এখানে' বলিতাম তাহা হইলে একদিন দোষের কথা ছিল, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত এই সাধকের 'ইহ' বোদ্ধার বুদ্ধিদোষে ব্রহ্মের 'ইহ' হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ধের স্কন্ধে অন্ধ উঠিয়াছেন, তাই তুমি আমিও বুঝিয়াছি যে, এ ইহ ব্রহ্মেরই ইহ। ইহার পর যদি আপত্তি করা যায় যে, ব্রহ্মের যখন এখানে ওখানে আদৌই নাই তখন এখানে আসিতে বলিলেই বা তিনি আসিবেন কি করিয়া? আমরা বলি, তবে আর একটু

অগ্রসর হইলেই ভাল হয়। যাঁহার 'এখানে ওখানে' নাই, তাঁহার ত আসা যাওয়াও নাই; তবে আর একেবারে মূল হইতে তাঁহার আসা লইয়া আপত্তি না তুলিয়া এখানে আসা লইয়া আপত্তি কেন? যাঁহার আসাও নাই যাওয়াও নাই, তাঁহার খওয়াও নাই পরাও নাই, নেওয়াও নাই, দেওয়াও নাই—নাই বলিতে কিছুই নাই, ঐ সঙ্গে তোমার আমার উপাসনাও নাই। নাই। নাই! এইবার সব পরিষ্কার, ইহারই নাম অস্তিবুদ্ধি। এইস্থানেই রায়মহাশয়ের বুঝা উচিত ছিল যে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা ভিন্ন অধিকারের কথা—উহা কেবল জ্ঞানকাণ্ডেই শোভা পায়, ভক্তিসহকৃত জ্ঞানকর্ম্ম উপাসনাকাণ্ডে উহার অধিকার নাই। এক অধিকারের কথা লইয়া অন্য অধিকারে ব্যঙ্গ করা ভাল হয় নাই—ইহারই নাম কাণ্ডজ্ঞান না থাকা।

আবার বলিতেছেন, তুমি বা কে? আন কাকে? একি চমৎকার? চমৎকারের কারণ এই যে, তুমি বা কে? আন কাকে? এই তুমি বা কে? আন কাকে-র গতি তিন দিকে হইতে পারে। এক তুমি বা কে? আন কাকে? অর্থাৎ তুমিই ত তিনি, কেননা জীব ব্রহ্মেরই অংশ। ইহা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা—ঐ কাণ্ডেরই পুনরাবর্ত্তন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই, কারণ ও কাণ্ডের উত্তর আমরা ঐ কাণ্ডেই করিয়াছি। তারপর দ্বিতীয় গতি—তুমি বা কে, আন কাকে অর্থাৎ তিনি তোমারই হৃদয়স্থ, তবে আবার আন কাকে? আমরা বলি, হৃদয়স্থ, দেবতা হইতে অন্য একজন দেবতাকে আমরা বাহিরে আনিয়া পূজা করিয়া থাকি, ইহা যদি রায় মহাশয় বুঝিয়া থাকেন তবে বলিহারি তাঁহার বাহ্য পূজার অভিজ্ঞতায়। যে তত্ত্ব তিনি জানেন নাই বা বুঝেন নাই তাহা লইয়া উপহাস বা আন্দোলন করাও তাঁহার ভাল হয় নাই—

আত্মস্থং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবমুপাসতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

হৃদয়স্থ দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বাহিরের দেবতার উপাসনা করে, করস্থিত কৌস্তুভ মণিকে ত্যাগ করিয়া সে কাঁচের লালসায় ভ্রমণ করে (কারণ বাহ্যমূর্ত্তিতে হৃদয়স্থ দেবতার তেজঃ সংক্রামিত না হইলে তাহা দেবতার পূজা না হইয়া কেবল প্রতিমারই পূজা হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, করস্থ মণি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশির অভিমুখে ধাবিত হয়)। এই শাস্ত্রবাক্য যে উপাসনার মূলভিত্তি তাহাতে হৃদয়স্থ দেবতা ত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ দেবতার পূজা করা হয়, ইহা যদি রায় মহাশয় বুঝিয়া থাকেন তবে তাহাও তাঁহার ভ্রান্তি বিজৃম্ভন মাত্র। আর, তুমি বা কে? আন কাকে? অর্থাৎ তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, তিনি মহান্ অপেক্ষাও মহান্ অসীম অনন্ত—তাঁহাকে তুমি আনিবে কি করিয়া? আমরা বলি, ইহার জন্য আমাদিগের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই—কারণ আমরা কোন মনঃকল্পিত

বিধানে তাঁহার উপাসনা করিতে যাই না। শাস্ত্র তাহারই আজ্ঞা, তিনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন আমরা তদনুসারে চলিব। আনিতে কেন পারিব তাহা তিনি ভাবিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই তিনি মন্ত্রশক্তিরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই তিনি তদনুসারে স্বয়ং তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অসীম অনন্তরূপে উপাসনা হয় না বলিয়াই তিনি জীবের প্রতি করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া কখন ছোট, কখন বড়, অসীম হইলেও সসীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং সে অর্থেও তুমি বা কে? আন কাকে, একি চমৎকার? এ চমৎকারও আমাদের চমৎকার বলিয়াই বোধ হয়।

এখন দ্বিতীয় কথা এই হইতে পারে যে, ব্রহ্মের 'এখানে ওখানে' না থাকিলেও সাধকের তাহা আছে, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু যাঁহাকে যেখানে ডাকিব তিনি যখন না ডাকিতেও সেখানে আছেন ইহা স্থির, তখন নিরর্থক এ ডাকা কেন? এই আপত্তি লক্ষ্য করিয়াই দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনা দ্বারা তত্ত্বদর্শী সাধক, সত্য সত্য তাঁহার আবাহন এবং আবির্ভাব প্রতিপন্ন করিতেছেন—'সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়, বলি বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার'। স্থূল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে বায়ু পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের যাতনায় প্রাণ যখন যাই যাই করে তখন সেই কাতর প্রাণে হৃদয়ের সহিত কে না বলে, বায়ু! আয় আয়! কেন? বায়ু আসিবেন কোথা হইতে? বায়ু ত আছেনই সর্ব্বত্র, বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে, কোথাও কি জীবের অস্তিত্ব থাকিত? অন্তরে বাহিরে বায়ু আছেন বলিয়াই জীবের প্রাণ রহিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে; তবে আর বায়ু আয়-আয় এ আবাহন কেন? আছে—আবাহনের কারণ বায়ুতে কিছু না থাকিলেও আমাতে বিলক্ষণ আছে। নিদারুণ গ্রীষ্মের যাতনায় আমার দেহ মন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাই বায়ুকে আবাহন করিতে আমার মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে সর্ব্বত্র বায়ু থাকিলেও আমার পক্ষে তাঁহার থাকা না থাকা দুইই সমান হইয়া উঠিয়াছে। আমি যে বায়ুকে ডাকিতেছি, তিনি ত নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাইবার জন্য নহেন, তাঁহাকে ডাকিতেছি আমার অন্তরের বাহিরের অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য। সে কার্য্য ত নির্ব্বিশেষে সূক্ষ্ম বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে, তাহার জন্য সেই মলয়াচলবক্ষঃস্থলচারী চন্দনবন-সৌগন্ধহারী বিশ্বসন্তাপ-শান্তিকারী গ্রীষ্মদমন পবনরাজের প্রয়োজন। তাই সর্ব্বত্র সূক্ষ্মবায়ু প্রবাহিত থাকিলেও আমি তখন তাহা উপেক্ষা করিয়া স্থূলবায়ুকে ডাকিতে গিয়া বলি, বায়ু! আয় আয় জীবন সঞ্চার। আর ইহা কেবল আমার মুখের বলা নহে, বস্তুতঃও যতক্ষণ সেই স্বন্ স্বন্ বেগে প্রবাহিত পীযূষস্পর্শময় শীতল-স্নিগ্ধতরঙ্গ সমীরণ সঙ্গে এ অঙ্গ না সন্তর্পিত হইবে ততক্ষণ এ নিখিল বিশালব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল খুঁজিয়া কোথায়ও আমার সে

শান্তির সম্ভাবনা নাই; তদ্রূপ তাঁহাকে আবাহন করিবার কারণ তাঁহাতে না থাকিলেও আমাতে বিলক্ষণ আছে। আমি ত্রিতাপতপ্ত দগ্ধজীব, ঘোর সংসারযাতনায় আমার মন প্রাণ নিরন্তর জর্জ্জরিত, বিষময় বিষয়ের বিষম জ্বালায় আমি দিনরাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি। এ সময়ে সর্ব্বত্র তিনি থাকিলেও ত আমার জ্বালা ঘুচিতেছে না। তাই নির্ব্বিশেষ-সত্ত্বারূপে তিনি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও আমার পক্ষে তাঁহার এ থাকা না থাকা দুইই যেন সমান হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহার সত্ত্বামাত্র চিৎস্বরূপ অবগত হইয়াও তাঁহাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইতে পারিতেছি না। আমি চাই তাঁহাকে, যাঁহাকে পাইলে আমার সকল জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে; সংসারের ঘোর দাবানলে একেবারে বেষ্টিত হইয়াছি, আর পালাইবার পথ নাই—এখন এই অগ্নিমণ্ডলের প্রচণ্ড জ্বালামালায় চতুর্দ্দিক হইতে দগ্ধ হইয়া হতাশ হৃদয়ে ঊর্দ্ধবাহু প্রসারণ করিয়া মর্ম্মভেদি-গভীরকাতরকণ্ঠে যেমন ডাকিয়া বলিব, জগদম্বে! কোথায় আছিস মা! আমি মলেম মলেম, করুণাময়ি! রক্ষা কর, আয় মা! আয় মা! আয় মা! মা আমার এই মুখের কথা মুখে থাকিতে সন্তানের ব্যথায় ব্যথিতহৃদয়ে ত্রস্তব্যস্ত-বিগলিতবেশে কৈলাসের স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দশদিগন্তে দশ অভয়ভুজ প্রসারণ করিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভৈরবমনোমোহিনী মা যদি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, তবেই আমার এ পাপ তাপ রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা জন্মের মত মিটিয়া যাইবে, নতুবা সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত তাঁহার শত সহস্র সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইলেও এ করুণাময় স্থূলতত্ত্ব ব্যতীত আমার দুর্গতি ঘুচিবার নহে। তাই দিগম্বর বলিতেছেন, জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই, বলি এস ব্রহ্মময়ি! কর গো নিস্তার। জগন্মাতা যে জগন্ময়ী, তাহা তুমিও যেমন জান আমিও তেমনই জানি, কিন্তু অনুভব না হইলে কেবল জানাতে ত যাতনা ঘুচিবে না। তাই আমরা যখন কাতর হই, বলি এস ব্রহ্মময়ি! এস বলিয়া আবাহন করি বটে, কিন্তু সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত যে বিভূতি তাহা আবাহন না করিয়া, সর্ব্বভূতের অধীশ্বরী যিনি তাঁহাকেই আবাহন করি।

রায় মহাশয় বলিতেছেন, 'একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার'। যাহা নাই, তিনি তাহা পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন, কিন্তু এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্য, তাঁহাকে তুমি বিবিধ নৈবেদ্য দিয়া স্তব কর, ইহা বড়ই অসম্ভব। তাঁহার বিশ্বের নৈবেদ্য ত তোমার নহে, তবে তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দান করিবার তুমি কে? দান করিতে হইলেই সে বস্তুতে তোমার নিজের স্বত্ব স্থাপন করিতে হইবে—তাঁহার বস্তুতে তুমি নিজের স্বত্ব স্থাপন করিতে গেলেই প্রকারান্তরে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয়। এখন দান করিতে গিয়া লাভের মধ্যে তাহার ফল হইল, চৌরদণ্ড ভোগ করা। ইহারই উত্তরে দিগম্বর বলিতেছেন, 'জড় জীব জড়

করি, যাঁহার সাধন করি, ধ্যান জ্ঞান জল ফল সকলি ত তাঁর'। তাঁহার বস্তুতে আত্মস্বত্ব স্বীকার করিলে যদি চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তবে সে দণ্ড ত তোমার আমার পক্ষে অখণ্ডনীয়; কেবল পূজার নৈবেদ্যের সময় তাহা মনে না করিয়া আমার স্ত্রী, আমার পুত্র; আমার সম্পত্তি, আমার সংসার—এ সকল কথা বলিবার সময়েও একবার তাহা মনে করা উচিত ছিল; স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার, ইহার মধ্যে আমার বলিতে তোমার কি আছে? তুমি যদি নিজের ভোগের সময়ে তাঁহার এই সমস্ত বস্তু লইয়া নিজের বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতে পার, তবে আমি না হয় তাঁহার ভোগের জন্য তাঁহার বস্তুকে একবার আমার বলিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলাম, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? চৌর্য্যাপরাধের দণ্ড তোমারও যাহা হইবে আমারও তাহাই হইবে, অধিকন্তু নিজে ভোগ করিয়াছ বলিয়া তোমার যাহা হইবে, তাঁহাকে ভোগ দিয়া আমি প্রসাদ পাইয়াছি বলিয়া আমার দণ্ড তদপেক্ষা অল্পরূপ হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। তাই দিগম্বর বলিতেছেন—জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা করি—জড় এবং জীব এই উভয়কে একত্র করিয়া যাঁহার সাধনা করি, ধ্যানই বল, জ্ঞানই বল, জলই বল, ফলই বল, এ সমস্তই তাঁহার—তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ, ধ্যান, জ্ঞান, গান, এ সমস্তই ত তাঁহার; তাঁহার নৈবেদ্য দিয়া যদি তাঁহাকে পূজা করা না হয়, তবে তাঁহার মন দিয়া তাঁহার ধ্যান করিয়া, তাঁহার স্বর দিয়া তাঁহার গান গাহিয়াই বা তাঁহার উপাসনা হয় কি করিয়া? তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দিতে গেলে তুমি আমাকে চোর বল, কিন্তু যাঁহার বস্তু তিনি বলিয়াছেন, 'তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ'। সেই দেবগণকর্ত্তৃক দত্ত হিরণ্য পশু শস্য প্রভৃতি বস্তুসকল দেবতাকে নিবেদন না করিয়া যদি স্বয়ং ভোগ করে তবে সে চোরই। এখন বল দেখি ভাই! আমিই দিয়া চোর, কি তুমি না দিয়া চোর? এ বিশ্ব তাঁহার—তাহা সত্য, কিন্তু আমি তাহা বুঝিয়াছি কৈ? যদি তাঁহার-ই বুঝিতাম, তবে কি আর এ আমারই থাকিত? মুখে তাঁহার বুঝিতে অনেকেই সুপটু, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করাই সুকঠিন। যেদিন তাঁহার বলিয়া সত্য সত্যই বুঝিব সেদিন 'আমার'ও ঘুচিয়া যাইবে, পূজাও সাঙ্গ হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না বুঝিতেছি ততদিন আমার বলিয়া তাঁহার এ পূজায় তুমি ব্যঙ্গ কর কোন মুখে? তাই বলি, ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া এ শান্তিময় ভ্রান্তিকে 'ভ্রান্তি' বলাই ভ্রান্তি। তাই অভ্রান্ত দিগম্বর বলিয়াছেন—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার—আবাহন বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার?

সঙ্গীতসাধক মহাত্মা দাশরথি রায়ও তাঁহার আগমনীতে এই তত্ত্বেরই অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন—

শুভ যাত্রায় শুভ ফল প্রাপ্ত হন গিরি।
শুভ দিনে শুভক্ষণে এলেন শঙ্করী ॥
ত্বরায় গিরি করে শুভ মঙ্গল-আচরণ।
শুভ সপ্তমীতে শুভ পূজার আয়োজন ॥
তন্ত্রধারক মন্ত্র পাঠ করেন পুস্তক ধরি।
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মময়ীর পূজা করেন গিরি ॥
যত্ন করি আসনে বসেন মনশুদ্ধে।
স্থানে স্থানে চণ্ডীপাঠ চণ্ডীর সান্নিধ্যে ॥
তনয়া চণ্ডীর ধ্যান করি তদন্তরে।
শিরে পুষ্প দিয়া পূজেন মানসোপচারে ॥
মানসে হেরিয়া গিরির মানস চঞ্চল।
দেখেন, অনন্তব্রহ্মাণ্ড আমার উমারি সকল ॥
মেয়ের, উদরস্থ সমস্ত, মেয়ে ত মেয়ে নয়।
তনয়ার তনয়া তনয় জগন্ময় ॥
কোটি ব্রহ্মা কোটি বিষ্ণু কোটি শূলপাণি।
চরণে আশ্রিত, সর্ব্বেশ্বরী শিবরাণী ॥
ধ্যান ত্যজে গিরি বলে, চক্ষে শতধার।
আমি, কি দিয়ে পূজিব চণ্ডি! চরণ তোমার।
আমি ত এ আধিপত্যের অধিপতি নই।
কার্ দ্রব্য কারে তবে দিব? ব্রহ্মময়ি! ॥
ভ্রান্ত হয়ে 'আমার আমার' লোকে করে।
ভ্রান্ত না হইয়া কেবা গৃহাশ্রম করে?
মহামায়া! কি মায়া দিয়াছ আমায় তুমি।
মম দ্রব্য গ্রহণ কর, তোমায় বল্‌ছি আমি ॥

সঙ্গীত।

উমা! কি ধন আছে আমার তোমায় দিতে পারি?
দেখ্‌লাম নয়নমুদে, ব্রহ্মাণ্ডময় সকলি তোমারি ॥
কি দিব তোয় রত্নবাস, রত্নাকর তব দাস,
স্বর্ণকাশী মাঝে বাস অন্নপূর্ণেশ্বরী।
কুবের ভাণ্ডারী যরে, কে বলে ভিখারী হরে,
তোমার, ত্রিলোচন ভিখারীর দ্বারে, ত্রিজগৎ ভিখারী ॥

প্রসন্না প্রসন্নময়ী কন পিতা প্রতি।
সঙ্কল্পিত পূজা সাঙ্গ করহ সম্প্রতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে সকলি আমার।
দিয়াছি তোমারে যে ধন তব অধিকার॥
চণ্ডীর কৃপায় চণ্ডীর পায় পূজে গিরি।
সপ্তমীর দিবা সাঙ্গ, হইল শর্ব্বরী॥

আ মরি মরি! ইহারই নাম ভক্তহৃদয়ে দেবীর দৈববাণী। 'সঙ্কল্পিত পূজা সাঙ্গ করহ সম্প্রতি'। ব্রহ্মাণ্ডময় সকলি আমার, ইহা যখন বুঝিয়াছ তখনই ত মানসপূজা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন আমার এই সঙ্কল্পে যে বাহ্যপূজা সঙ্কল্পিত করিয়াছ তাহা সাঙ্গ কর। যদি বল, বাহ্যপূজায় যাহা অর্পণ করিব তাহাও ত তোমারই। সর্ব্বান্তর্যামিনী মা তাহারই উত্তর করিতেছেন—'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে সকলি আমার। দিয়াছি তোমারে যে ধন, তব অধিকার'। মায়ের মুখে না হইলে আর প্রাণভরা সরল কথায় এমন সরল উত্তর কোথায় পাইব? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলি আমার হইলেও তোমায় যে ধন দিয়াছি অর্থাৎ যে ধনে তোমার এই আমার বুদ্ধি দিয়াছি, তাহা ত তোমারই; কেননা তোমার এই আমার বুদ্ধিও আমিই দিয়াছি—বস্তুস্বত্ব আমার থাকিলেও ভোগের স্বত্ব তোমার, তুমি আজ সেই স্বত্ব আমায় অর্পণ কর, তাহা হইলেই তোমার পূজা সাঙ্গ হইল। আমার ভার আমায় দিয়া পিতঃ! তুমি নিশ্চিন্ত হও—তোমায় আজ সকল ভারে মুক্ত করিয়া আমি আমার করিয়া লই। গিরিরাজ! সকলি তাঁহার, ইহা যাহারা মুখে না দেখিয়া চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের পূজা এইরূপে সাঙ্গ হয়। ধন্য পূজক তুমি এ সংসারে! মায়ের পূজা যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে তুমিই তাহার অগ্রগণ্য। তুমি বলিয়াছ—ভ্রান্ত হয়ে আমার আমার লোকে করে, ভ্রান্ত না হইয়া কেবা গৃহাশ্রম করে। কিন্তু তোমার মত অভ্রান্ত গৃহাশ্রমী এ জগতে কে আছে তাহা জানি না, তুমি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ভ্রান্ত বাহ্য পূজায় যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ—কোটি কোটি যোগীন্দ্র পুরুষ অভ্রান্ত অন্তর্যাগেও তাহা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ! বাহ্য পূজা ত এ জগতে সকলেই করে, কিন্তু অন্তরের ধন বাহিরে আসিয়া তোমার মত কাহাকে কবে এমন করিয়া সান্ত্বনা করেন? জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মময়ী আনন্দময়ী মা আমার, অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াও তোমার বাহ্য পূজা লইবার জন্য এক বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিধাম কৈলাসের মণিমন্দিরে উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়া সাধকের সাধনা সাধিতে সাধে সাধে সাদরে এমন করিয়া কবে কাহার মন্দিরে আসিয়া থাকেন? এ ব্রহ্মাণ্ডে কে এমন সৌভাগ্যশালী যে পূজার প্রারম্ভেই অন্তরের জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মময়ীকে মূর্ত্তিময়ী করিয়া সম্মুখে রাখিতে পারে? কাহার

এমন সৌভাগ্য যে সাধনার সাধ্য ধন সাধ করিয়া বাহিরের পূজা গ্রহণ করেন? গৌরবের 'গৌরীগুরু, নাম ধরিয়াও গৌরীপূজায় তুমিই এ জগতের দীক্ষাগুরু, তোমার প্রদত্ত গৌরীপূজার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই আজ এ চরাচর সংসার দুর্গোৎসবের অধিকারী, তাই তোমার দুর্গ-সাধনার লব্ধনিধি দুর্গাধন জগতের মা হইয়াও তোমার মেয়ে! কাহার সাধ্য মাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিতে পারে! কিন্তু ভক্তরাজ গিরিরাজ! সিদ্ধেশ্বরীর সাধের পিতা সিদ্ধরাজ! আজ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, আর তোমাকে মাতামহ পাইয়া জগদ্বাসী আমরাও ধন্য; তাই বলি প্রভো! তোমার এ ধন্যবাদ না বুঝিয়া জগতে যাহারা অধন্য, তাহাদিগের সেই মরুময় হৃদয়ে একবার তোমার ঐ ধূর্জ্জটি-মোহিনী নন্দিনীর ভক্তির নির্ঝর ঢালিয়া দাও, মধুর মা-রবের উত্তাল তরঙ্গমালা তাহাদিগের উত্তপ্তপাষাণপ্রাণ শীতল করিয়া ধরাধরের কল্যাণে আজ ধরাতলে আনন্দের অনন্তস্রোত প্রবাহিত করুক।

পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিবাদ বা মায়াবাদকে লক্ষ্য করিয়াই রায় মহাশয় গীতান্তরে বলিয়াছেন—

তুমি কার? কে তোমার? কারে বল রে আপন!
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে, যায় নানা স্থান।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব
সময়ে পালাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন মণিময় আভরণ
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণপ্রিয়জন—
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

বিষয়-সংসারে মায়ানিদ্রার বিকট স্বপ্নের ভ্রান্তিবিভীষিকা দেখিয়া বা দেখাইয়া রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য সত্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। কিন্তু সাধন-সংসারে আবার সেই মা-ময় মায়ানিদ্রার মধুর শান্তিস্বপ্ন দেখিয়া মহাত্মা দিগম্বর যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে যেন সেই ভ্রান্তিময় সংসারই অনন্ত শান্তির আধার বলিয়া বোধ হয়। দিগম্বর উত্তর দিয়াছেন—

মা আমার, আমি মার, তাঁরে বলি রে আপন,
মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা, বল কি তখন?
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে দিকে,
আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন—
যাতায়াতে সমাচার, নিত্য সত্য এ সংসার,
চিন্ময়ীচরণ-চিন্তা সংসারবন্ধন।

মহাশক্তিকে বক্ষে ধরিয়া ভক্তের অটল হৃদয়ে কি অতুল বলই ছুটিয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের অমোঘ অস্ত্রবলে যেমন জিজ্ঞাসা হইয়াছে—

তুমি কার? কে তোমার?

অমনি যেন মুখের কথা থাকিতে সদর্পে বক্ষঃস্ফীত করিয়া ভুবনবিজয়ী ভক্ত বলিতেছেন—

—আমি মার, মা আমার।
—কারে বল রে আপন?
—তাঁরে বলি রে আপন।
—মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
মহামায়া মায়ে আমি দেখিরে স্বপন।

যাঁহার মায়ার স্বপ্ন দেখিয়া তুমি ভয়ে বিহ্বল হও, আমি সেই মায়ার অধীশ্বরী সাক্ষাৎ মহামায়া মাকেই স্বপ্নে দেখি; মহামায়া মা যাহাকে দেখা দেন, মায়া দেখিয়া তাহার কিসের ভয়?

প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন—ইহা তোমারও যেমন আমারও তেমনই, তবে তুমি এই বলিতেছ যে, বিষয়-সংসারেই হউক আর সাধন-সংসারেই হউক, মায়াময় সংসারে যাহা দেখা যায় তাহাই স্বপ্ন (রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন)। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তুমি অদ্বৈতবাদী, দ্বৈত বলিতে কিছুই মান না। সুতরাং উপাস্য উপাসক লইয়া যখন সাধনকাণ্ড তখন তাহাও যে মান না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; সাধনা যখন মান না, জান না, কর না তখন এ মায়া, এ নিদ্রা, এ স্বপ্ন বুঝাইলেও তুমি বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং সে সম্বন্ধে তোমার সহিত বাক্-নিষ্পত্তি নিষ্প্রয়োজন অথবা তুমি যাহা বলিয়াছ, সাধন-সংসার তাহার লক্ষ্য নহে, বিষয়-সংসারই লক্ষ্য; সুতরাং সে সম্বন্ধেও বলিবার কিছু নাই। এখন (রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন; প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা)—ইহাও সত্য, কিন্তু

এ মিথ্যা কখন হয়, কাহার হয় এবং কাহার মুখে শোভা পায়, কাহার কর্ণে স্থান পায় তাহাই একবার বুঝিবার কথা। তাই দিগম্বর বলিতেছিন, স্বীকার করিলাম রজ্জুতে অহি দর্শন ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত; সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন, অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন? স্বপ্নে যখন ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় হয় তখন সেই স্বপ্নাবস্থায় কি ব্যাঘ্রকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়? যদি তাহাই হইত তবে কি আর স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখিয়া কেহ ভয় পাইত? স্বপ্নের ব্যাঘ্র মিথ্যা হয় সত্য, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গের পর; তদ্রূপ ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্প দর্শন হয়; সুতরাং সে সর্প মিথ্যা ইহা সত্য, কিন্তু সে মিথ্যাজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ভ্রান্তি ভঙ্গের পর--তবেই মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইয়া সংসার-স্বপ্ন দেখিতেছ, এই অবস্থায় তুমি সংসারকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিবে কিরূপে? এই অনুভব হয় না বলিয়াই সাংসারিক জীবের কর্ণে মায়াবাদের উপদেশ স্থান পায় না। দ্বিতীয় কথা, মায়া থাকিলেই কাহার মায়া? মায়ার মধ্যে থাকিয়াও যদি আমি যাঁহার মায়া তাঁহাকে পাই, তবে ত মায়া মিথ্যাময় হইলেও আমার পক্ষে তাহার ফল সত্যময় হইয়া উঠিল। যেমন স্বপ্নের মধ্যেও লোকে সত্য ঔষধ পায়, স্বপ্নের মিথ্যা আমোদে বিহ্বল হইয়াও সত্য হাসি হাসিয়া উঠে, স্বপ্নের মিথ্যা বিপদের বিভীষিকা দেখিয়াও সত্য সত্যই রোদন করে, স্বপ্নের মিথ্যা বিতর্কস্থলে উপস্থিত হইয়াও সত্য সত্যই বিচার করে; তদ্রূপ মায়ানিদ্রার সংসার-স্বপ্নে সাধনার রাজ্যে গিয়া আমি যদি সত্য সত্যই সত্যময়ী মাকে পাই, তবে এ মায়া হইতে আমার সুখের স্বপ্ন শান্তি আর কি আছে? লোকের যেমন স্বপ্নের মধ্যে ঔষধ পাইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আমারও যদি তেমনি মায়ার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভবরোগের মহৌষধ পাইয়া এ সংসার-ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তবেই ত আমি কৃতার্থ হইব, সংসারের দ্বৈতজ্ঞানে তিনি মা আমি পুত্র, তিনি প্রভু আমি দাস, এই তত্ত্বে তাঁহার সাধনা করিতে করিতে যদি আমি তাঁহার প্রসাদ পাইয়া যাই, তাহা হইলেই ত তখন আমি অজর অমর অবিনশ্বর চিৎস্বরূপে দ্বৈততরঙ্গে সাঁতার-দিয়া অদ্বৈতসাগরের বক্ষে আনন্দে ভাসিতে পারিব, মুক্তির অগাধ জলে না ডুবিয়া ভক্তির স্রোতে ছুটিতে পারিব, মুক্তির সাগরে সাঁতার দিয়া মুক্তকেশীর চরণকূলে স্থান পাইব; তখন জাগিয়া দেখিব, স্বপ্নেই সাঁতার দিয়া সত্য সত্যই কুলকুণ্ডলিনীর কূলে আসিয়া উঠিয়াছি, ভবরোগের মহৌষধ পাইয়া সত্য সত্যই ভবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাই দিগম্বর বলিতেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে, সেই ভাল আর জাগিও না, জাগিয়া জাগিলে সে জাগায় সুখও ছিল শান্তিও ছিল—আর না জাগিয়া এ জাগিবার নাটক, এও একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে। জাগিয়া জাগিলে তাহার হয় শান্তি সুখ আর না জাগিয়া জাগিলে তাহার সুখশান্তি দূরে থাক্, অধিকন্তু এই হা হতোস্মি অশান্তি আর্ত্তনাদ।

পাখীসকল একেবারে চলিয়া গেলে ত বৃক্ষ একদিনেই শূন্য হইত, জীবসকল একেবারে চলিয়া গেলেও সংসার এক যুগেই অনিত্য হইত, কিন্তু পাখী যেমন প্রভাতে গিয়া সন্ধ্যার সময় আবার ঘুরিয়া আসে জীবও তেমনি মৃত্যুকালে চলিয়া গিয়া জন্মের সময় আবার ফিরিয়া আসে। তাই যাহাকে তুমি সংসারের অনিত্যতা বল, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সংসারের নিত্যতার নিত্য স্রোত, অধিকন্তু ইহলোকে পরলোকে নিরন্তর যাতায়াতে সংসার যে নিত্য সত্য, এই সমাচারই নিত্য আসে—তাই অনিত্য হইয়াও সংসার নিত্য 'নিত্য'। তাই আমার সে নিত্য সংসারের নিত্য বন্ধন-শৃঙ্খল কেবল চিন্ময়ীর চরণচিন্তা। পাছে অদ্বৈতবাদে গিয়া মায়ে পোয়ে এক হইয়া যাই—এই ভয়েই নিত্য সংসারকে নিত্য নিত্য প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, মুক্তির কুহকে পড়িয়া পাছে মা মুক্তকেশীর চরণছাড়া হই এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কাতেই এ সংসার ছাড়িতে পারি না, মায়ের মুখে মধুর হাসি না দেখিয়া দণ্ডে দশবার মা গো মা, ও গো মা, মা আমার, উমা শ্যামা, মা ওমা—না বলিয়া কেমন ক'রে মুক্তির পরে মাকে না পাইয়া থাকিব? এইজন্যই মায়ের প্রেমনিগড়ে এ বন্ধন অপেক্ষা মুক্তিও আমার সুখের নহে। তাই দিগম্বর সাধে সাদরে বলিয়াছেন—চিন্ময়ীচরণ-চিন্তা সংসার বন্ধন। রায় মহাশয়ের গানের শেষ অন্তরাতে যাহা আছে—কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন—ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান। দিগম্বরের দিগম্বর-সংসারে ইহা ছিলও না, তিনি তাহার উত্তরও করেন নাই। আবার রায় মহাশয় বলিয়াছেন—

মন! তোরে কে ভুলালে হায়!
কল্পনাকে সত্য করি জান এ কি দায়?
প্রাণদান দেহ তাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে কর অভিপ্রায়।
কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার,
ক্ষণেক স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যাঁরে, সম্মুখে নাচাও তাঁরে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায়?

দিগম্বর উত্তর দিয়াছেন—

ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী।
কল্পনারে সত্য করি দেখা দিলা জননী॥
কল্পনায় অধিষ্ঠান, কল্পনায় দেই প্রাণ,
সত্য করি আত্মদান, এইমাত্র জানি।

কখন ভূষণ দেই কখন অশন,
কখন স্থাপন করি, কভু বিসর্জ্জন,
মাতৃরূপা দেখি চক্ষে, নাচিছে বাপের বক্ষে,
ভয়ে বলি সর্ব্বরক্ষে কর সর্ব্বরূপিণি।

সাধক দেখিবেন, কি বিষম পার্থক্য। রায় মহাশয় বলিতেছেন, মন তোরে কে ভুলালে হায়। দিগম্বর বলিতেছেন—একা মনকে কেন? ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী। ত্রিভুবন যাঁহার মায়ায় ভুলিয়াছে, তুমি কি মনে করিয়াছ, তুমি তাঁহার মায়ায় ভুলিবে না? অথবা প্রতিমাপূজায় তুমি যাহা ভুল মনে করিয়াছ, তোমার সংসার-পূজাতে সেই ভুল। সংসারপূজা ভুল হইলেও তাহাকে যখন সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ তখন প্রতিমাপূজাকে সত্য বলিয়া বুঝিবে না কেন? মিথ্যা হইলেও যখন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির সঙ্গলাভে লালায়িত হও তখন তাঁহার সঙ্গলাভকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে না করিবে কেন? তাহার পর আমার কল্পনাকে যদি আমি সত্য বলিয়া জানিতাম তাহা হইলেও তুমি একদিন আমার ভুল বলিতে পারিতে—কিন্তু এ ত তাহাও নহে, যাঁহার এই জগৎকল্পনা, এ যে তাঁহারই কল্পনা! তিনি স্ত্রী পুত্র কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যখন ভুলিতে পারিলাম না তখন তাঁহার স্বরূপের কল্পনা ভুলিব কি করিয়া?

তাই তুমি বল—কল্পনাকে সত্য করি জান একি দায়।
আমরা বলি—সত্যকে কল্পনা করি ভাব এ কি হায়!

এ কল্পনার কথা সংসারে না বলিয়া কেবল সাধনার অধিকারে বলা বড়ই আত্মবিস্মৃতির পরিচয়। তবে বলিতে পার, সংসার কল্পনা হইলেও পিতা মাতাকে যে পরিমাণে সত্য দেখি, প্রতিমাকে ত তাহাও দেখি না। আমি বলি, তুমি দেখ না তাহাতে কাহার কি? পেচক দেখে না বলিয়া সূর্য্যের তাহাতে কি আসে যায়? আর যদি নিজে ইচ্ছা করিলেই দেখা যাইত তাহা হইলেও তোমার এ 'দেখি না' কোন দিন সম্ভব হইত। এ যে—যাহাকে দেখিব সে দেখা দিলে তবে দেখিবার কথা। তাই আমি সত্য করিয়া কিছু দেখিতে চাই না; কিন্তু সে যে আপন কল্পনাকে সত্য করিয়া আপনি আসিয়া দেখা দেয় তাহার তুমি কি করিবে? এত বড় মিথ্যা ব্রহ্মাণ্ডটার কল্পনা যে সত্য করিতে পারে, সে আপনি সত্যস্বরূপিণী হইয়া আপন সত্য, সত্য করিবে—ইহা যদি তোমার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় তবে কি আর বলিব, বলিহারি তোমার সত্যজ্ঞানে! তাঁহার মূর্ত্তিও যেমন কল্পনা অধিষ্ঠানও তেমনি কল্পনা, প্রাণদানও যেমন কল্পনা প্রাণও তেমনি কল্পনা, সংসারও যেমন কল্পনা তুমি আমিও তেমনি কল্পনা—শেষ কথা, তাঁহার কল্পনাও কল্পনা, তোমার আমার কেবল বৃথা কল্পনামাত্রই সার। তোমার আমার এই মূর্ত্তির কল্পনা তাঁহার যতদিন সত্য রহিয়াছে

ততদিন তাঁহার মূর্ত্তি তাঁহার কল্পিত হইলেও তাহা সত্য-সত্য-সত্য। যেদিন তোমার তুমিত্ব আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে সেদিন তাঁহার তিনিত্ব অন্তর্হিত হইবে। আজ তাঁহাকে কল্পনা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে তুমি কল্পনা বলিয়া বুঝিলেই ভাল হয়। তাই—

প্রভু বলি মানি যাঁরে,
সম্মুখে নাচাই তাঁরে'
(এ নাচ্‌না আমি নাচাই না)।
মাতৃরূপা দেখি চক্ষে,
(সে যে আপনি) নাচিছে বাপের বক্ষে,
(তাই) ভয়ে বলি সর্ব্বরক্ষে কর সর্ব্বরূপিণি।

সর্ব্বরূপিণীর কোন রূপই যখন ভুলিলাম না তখন এমন পাপ কি করিয়াছি যে, এ স্বরূপ রূপ ভুলিব? তাঁহাকে হারাইয়া যাহারা তাঁহার রূপ দেখিতে যায় তাহাদিগের নিকটে তাঁহার রূপ চিরকালই কল্পনা, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যাঁহারা তাঁহার রূপ দেখিতে যান তাঁহারা চিরকালই বলিয়া থাকেন—

কল্পনারে সত্য করি দেখা দিলা জননী ॥

অন্য গানে রায় মহাশয় বলিয়াছেন—

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা।
নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা ॥

দিগম্বরের বরপুত্র দিগম্বর অমনি তাহার উত্তর দিয়াছেন—

কেন ক্ষেপা! কর তবে তাঁহার সাধনা?
নির্গুণ যদি তিনি রহিত কল্পনা।

মধ্যের এক অন্তরাতে দিগম্বর যাহা উত্তর দিয়াছেন, সে অংশ পাওয়া যায় নাই। প্রথমে যে 'সদা কর তাঁহার সাধনা' এ সাধনাও শাস্ত্রোক্ত নহে, ইহা রায় মহাশয়ের নিজের সাধনা; কারণ মধ্যের অন্তরাতে তিনি বলিয়াছেন—

সিদ্ধি ইত্যাদি যাহা কিছু, 'সে সব বুদ্ধির ভ্রম দুঃসাধ্য সূচনা' (অথচ সদা কর তাঁহার সাধনা) ইহার পরেই বলিয়াছেন—

বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান,
আছে মাত্র এই জ্ঞান, অতীত ভাবনা।

দিগম্বর তাহার উত্তর দিয়াছেন—

আছে মাত্র এই জ্ঞান, তবে কেন গাও গান,
চক্ষু মুদি কর ধ্যান, কিসের ভাবনা?

এইস্থানে দিগম্বর দেখাইয়াছেন যে, রায় মহাশয় কাজে কথায় এক নহেন।

অন্ত গানে রায় মহাশয়ের উক্তি—

একি ভুল মন (তোমার)
দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের ন্যায় তারে মানা এ কেমন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত,
তাঁরে দেখাইতে কত করহ যতন।
পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে করাতে ভোজন।

যিনি যে কার্য্যের ফলের অভাব দেখেন, তিনিই তাহাকে ভুল বলিয়া মনে করেন। তাই রায় মহাশয় বলিতেছেন, একি ভুল মন। কিন্তু যিনি ফল পাইয়াছেন, তিনি অম্‌নি বিস্পষ্ট নয়নে দেখিতে দেখিতে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

ভুল নয়, ভুল নয়, ঐ দেখ ঐ।
আঁধারে করিছে আলো, ঐ যে আমার ব্রহ্মময়ী।
পদতলে পড়ি মহেশ বিকলে, লক্ষ লক্ষ কর কটির শিকলে,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়নে নিকলে, বদনে মাভৈঃ মাভৈঃ।
অট্ট অট্ট হাস, বিকট বিকাশ,
ত্রাসিত আকাশ, সমরে জয়ী।
করাল বদনে সরল হাসিছে, মরালগমনে মেদিনী কাঁদিছে,
তালে তালে তালে সুঠামে নাচিছে, তাথৈ তাথৈ।

এইস্থানে আসিয়া দিগম্বর অন্যের কথায় উত্তর করিতে গিয়া নিজের কার্য্যের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। সাধনা এইস্থানে বিচারকে পদদলিত করিয়া সাধককে সিদ্ধেশ্বরীর প্রত্যক্ষ মন্দিরে লইয়া গিয়াছেন, তথাতে গিয়া তিনি যাহা দেখাইতেছেন তাহাতে সাধকের নিজের কথাতেই অবসর নাই, আর পরের কথার উত্তর করিবেন কি? নিদ্রার পূর্ব্বে কোন বিষয় চিন্তা করিলে স্বপ্নের সময় অন্য দৃশ্য দেখিলেও যেমন তাহার মধ্যে সেই সকল পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়ে অস্ফুট ছায়া আসিয়া উপস্থিত হয়, আজ দিগম্বরেরও তদ্রূপ গান-রচনার পূর্ব্বে ভুল কি না—ইহা ভাবিতে গিয়া যে কয়টি বিষয়ের চিন্তা হইয়াছিল, ধ্যানময় রচনাকালেও সেই আকাশ আর চন্দ্র সূর্য্যই জগদম্বার বিরাটরূপের মধ্যে অস্ফুট আভাসে দেখা দিয়াছেন—ইহা কেবল পূর্ব্ব চিন্তার সংস্কার মাত্র। দিগম্বর কিন্তু তখন 'ঐ দেখ ঐ' বলিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছেন অথবা যাহা দেখিয়া—ঐ দেখ ঐ বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি আত্মহারা। সাধক এইস্থানেই একবার দেখিয়া লইবেন, সাধনায় আর জ্ঞান-বিচারে কি স্বর্গ মর্ত্ত পার্থক্য!

ভুবনমোহিনীর মোহনমাধুরীর তরঙ্গলীলায় যিনি এইরূপে ডুবিয়াছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচার বুদ্‌বুদ আর কি তাঁহার চক্ষুর লক্ষ্য হয়? আ মরি মরি, কি সিদ্ধ সাধনা! প্রাণময়ী যেন প্রাণের কবাট খুলিয়া দিয়া ভক্তের নয়নে নয়নে খেলিতেছেন। সাধক প্রাণ ভরিয়া করতালী দিয়া আপনি দেখিয়া জগৎকে তাহা দেখাইতেছেন—ঐ দেখ ঐ, মা আমার 'করাল বদনে সরল হাসিছে, যেন মরালগমনে মেদিনী কাঁদিছে, আবার তালে তালে তালে সুঠামে নাচিছে—তাথৈ তাথৈ'। ধন্য সাধক! তুমিই ধন্য, তোমার কল্যাণে ধরা ধন্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ আধ্যাত্মিকবাদ ॥

আমাদের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত নিরাকাররোগগ্রস্ত সম্প্রদায়কে আমরা শতগুণে শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করি। কারণ, ইঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার উপায় আছে; কিন্তু ইহার পর সংক্রামক রোগগ্রস্ত আর একদল ব্যাখ্যাতা আছেন যাঁহাদিগকে সহজে চিনিবার উপায় নাই অথচ তাঁহারা স্পর্শ করিলেও রক্ষা নাই। ইঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুই রাজ্য অতিক্রম করিয়া এখন আধ্যাত্মিকে প্রবেশ করিয়াছেন। তাই কার্য্যে যাহাই কেন না হউক, নামে ইঁহারা আধ্যাত্মিকবাদী। ইঁহাদিগের প্রত্যক্ষ দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক সংসার পর্য্যন্তও প্রায় আধ্যাত্মিক, দেবতা ধর্ম্ম পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ রাজ্যের কথা ত দূরে আস্তাং, বেদ তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস যাহাই কেন না হউক ইঁহাদিগের মতে ইহার সমস্তই রূপক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপক, প্রকৃতি পুরুষ রূপক, দশাবতার রূপক, দশ মহাবিদ্যা রূপক, দেবদেবী সমস্ত রূপক, নারদাদি ঋষিগণ রূপক, মধু কৈটভ হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর রাবণ কুম্ভকর্ণ কংস শিশুপাল জরাসন্ধ প্রভৃতি রূপক, ধ্রুব প্রহ্লাদ শুকদেব সনাতন প্রভৃতি রূপক, পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি রূপক, বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সর চারণ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব সমস্ত রূপক, কাশী কাঞ্চী অবন্তী অযোধ্যা মথুরা মায়া বিরজা দ্বারকা হস্তিনা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সমস্তই রূপক। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে পিতা পিতামহের উপর হইতে ঊর্দ্ধতন এবং পৌত্র প্রপৌত্রের নিম্ন হইতে অধস্তন পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্তই রূপক; যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই সত্য, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু এ সংসারে অপ্রত্যক্ষ সে সমস্তই রূপক। মূর্খলোকে শাস্ত্রের গুরুগম্ভীর গুহ্যতত্ত্বসকল বুঝিতে না পারিয়া চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করে, বস্তুত পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পদার্থ সকলের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক বা

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে—যথা বংশ শব্দে বুঝিতে হইবে, বাঁশের ঝাড়। পিতা পিতামহ প্রভৃতি সেই বংশস্তম্বের এক একটি পোর বা পুর (তাহাতেই ভাষায় তাহাদিগের নাম হইয়াছে পূর্ব্বপুরুষ)। আর্য্যাশাস্ত্র বলিয়াছেন, প্রতি বৎসর তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—শ্রদ্ধয়া দীয়তে যত্তু পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধমুচ্যতে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে যে দান করা যায়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। প্রতি বৎসর তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে অর্থাৎ প্রতি বৎসর বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এক এক ঝাড় নুতন বাঁশ বাটীতে লাগাইতে হইবে, যাঁহাদিগের বাটীতে বাঁশের ঝাড় আছে তাহারা এ নিয়ম বিশেষরূপে অবগত আছেন —ইহাই শাস্ত্রের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এইজন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যিনি প্রতি বৎসর পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার কখনও বংশ লোপ হয় না অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে কখনও বাঁশের অভাব হয় না ইত্যাদি। এইরূপে বুঝিতে হইবে আর্য্যশাস্ত্রে উপাসনা ইত্যাদির যাহা কিছু বিধি ব্যবস্থা আছে, সে সমস্তই এইরূপ রূপক, কেবল গুহ্যতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার অভাবেই লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অন্যরূপ ভাবিয়া থাকে। সাধক! শ্রাদ্ধের ব্যাখ্যা যেমন শুনিলেন, দেব দেবীর উপাসনাদিরও এইরূপ সকল বিবিধ ব্যাখ্যা আছে। আজকাল জনসাধারণে সে সকল ব্যাখ্যা বিশেষ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আর আমরা সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না। ফল কথা, জানকীময়-জীবন ভগবান রামচন্দ্র মারীচের অনুসরণ করিলে পঞ্চবটী বনে যেমন বিকট রাক্ষস রাবণ, জটিল তাপস ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষাচ্ছলে সূর্য্যকুল-মহালক্ষ্মীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আর্য্যসমাজকেও তদ্রূপ অনাথ অসহায় বিজনবনসদৃশ লক্ষ্য করিয়া এই সকল ধর্ম্মরাক্ষসগণ ধীরে ধীরে ভিক্ষুকবেশে আসিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বারে দাঁড়াইতেছেন। কালমাহাত্ম্যে ভগবান আমাদিগের অনেক দূরে, এক্ষণে কেবল ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধায়ী ভক্তগণের প্রদত্ত রেখার উল্লঙ্ঘন না করাই একমাত্র নিস্তারের পথ। তাই সামাজিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আজ তারস্বরে সাবধান করিয়া দিতে হইবে যে, জানকী যেন এ সময়ে লক্ষ্মণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে পদার্পণ না করেন। উপস্থিত ব্যাখ্যাকর্ত্তার দল বাহিরে তাপস হইলেও অন্তরে রাক্ষস, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। যতক্ষণ ইহারা সাধারণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে নিজের হস্তায়ত্ত করিতে না পারিবে ততক্ষণই এই সকল মিষ্ট মিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া বলিবে—গোপী শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণ শব্দের অর্থ আত্মা বস্ত্র শব্দের অর্থ লজ্জা, কদম্ববৃক্ষের অর্থ ষট্‌চক্র; আকাশ তাঁহার সুনীল কান্তি, অরুণরাগ তাঁহার পীতাম্বর, ইন্দ্রধনু তাঁহার মোহনচূড়া ইত্যাদি। তাহার পর যেমন দেখিবে এই সকল আপাত-মধুর কথায় ভুলিয়া সাধারণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহাতে ভুঁ দিয়া নিজ নিজ অধিকার-গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি

তখন কপট-তাপস বেশ অন্তরিত করিয়া বিকট রাক্ষসমূর্ত্তি প্রকট করিয়া বলিয়া বসিবে, কৃষ্ণ বলিয়া বা তাঁহার লীলা বলিয়া স্বরূপতঃ কোন পদার্থই নাই, মূর্খগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ রূপকচ্ছলে সেই নিরাকার ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তখন রাক্ষসের পৈশাচবলনিষ্পিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আমাদের কাঁদিতে কাঁদিতে সাগর পারে যাত্রা করিবেন, পথে দুই একজন জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেও তখন তাঁহারা আর এ রাক্ষসের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। জানি ইহা যে, ভগবৎপ্রেয়সী ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া সাধ করিয়া এ বিপদ্ ডাকিয়া আনা কেন? ইহাদিগের প্রদর্শিত মীমাংসা সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কিছুরই আর বিচার বিতর্ক করিবার সময় বা অপেক্ষা নাই। এখন দেখা হইলেই গৃহদ্বার হইতে দূর হও বলিয়া বিদায় দিবার ব্যবস্থা। তবে বিনা উপহারে অতিথিকে বিদায় দিতে নাই—এই বলিয়াই যিনি যাহা উপহার দেন!

সকলেরই সকল কার্য্যে একটা না একটা যাহা কিছু উদ্দেশ্য থাকেই থাকে। ইঁহাদেরও তাহা বিলক্ষণই আছে। তবে আমোদ এই যে, একটু অন্তস্তত্ত্ব ভেদ করিলেই যাহা সহস্র চক্ষুর সম্মুখে শত খণ্ডে ফাটিয়া পড়ে, ইহারা কোন্ সাহসে সেই সাধের শিমূলের ফল এই প্রবল ঝড়ের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে বসিয়া থাকেন। শাস্ত্র, দেবতাকে, দেবতার লীলাকে এবং লীলাধামকে রূপক বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু আমাকে বলিয়াছেন—ষষ্টি সহস্র যোজন পথ পর্য্যটন করিয়া সেই রূপক তীর্থকে সত্য সত্যই দর্শন করিতে হইবে। রূপক দেবতার জন্য আমার এই সত্য দেহকে সত্য সত্যই অস্থিকঙ্কাল শেষ করিয়া জীর্ণ করিতে হইবে, রূপক দেবতার জন্য সত্য সত্যই বলিতে হইবে—মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ং। আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যাতা মহাশয় ত এ সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু আমি যে এখন কি বলিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করি তাহাই ভাবিয়া অস্থির। ঘটনা যদি কিছুই নহে, তবে এ মিথ্যা রূপক বর্ণনা দ্বারা লোকের সহজ হৃদয়ে ভ্রান্তি বিস্তার করা কি শাস্ত্রপ্রচারক ভগবানের এবং ঋষিগণের ন্যায্য কার্য্য? লোকের সত্যজ্ঞান উদ্ভাসিত করিবার নিমিত্ত যে শাস্ত্রের অবতারণা, সেই শাস্ত্রের কার্য্য কি না মিথ্যা পদার্থের বর্ণন দ্বারা অন্ধতমস মোহসাগরে জগৎকে নিক্ষিপ্ত করা। জীবের গর্ভাধান হইতে শ্মশানকার্য্য পর্য্যন্ত, মাতৃগর্ভ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত, নরক হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণে প্রতিকার্য্যে অণু পরমাণুরূপে মঙ্গলামঙ্গলের নির্দ্দেশ করিয়া যে শাস্ত্র জীবের ইহপরলোকের চিরবন্ধু সেই শাস্ত্র কি না মিথ্যা কল্পনা জল্পনা দ্বারা নিখিল জগৎকে রসাতলে নিমজ্জিত করিতে উদ্যত? এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া অভিবাদন করা উচিত কি না তাহা তাঁহারাই বলিয়া

দিবেন। শাস্ত্রের সহিত বা ভগবানের সহিত জগতের কি এমন মর্ম্মান্তিক শত্রুতা ছিল যে, তিনি সেই বাদ সাধিবার জন্য উপরে সহজ অর্থের মধুর ধারা ঢালিয়া দিয়া তাহার অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক-বিষের কুম্ভ সাজাইয়া রাখিয়াছেন ? শাস্ত্র ত তোমার আমার মত স্বার্থপরের স্বার্থজাল বিস্তার নহে। শাস্ত্রের প্রকাশক তিনি এবং তাঁহারা—যিনি বৈকুণ্ঠ পরিহার করিয়া ত্রিলোকরক্ষার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ এবং যাঁহারা তপোবলে অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইয়াও বিজনবন-বিহারী জটাবল্কলধারী বিবেক-বৈরাগ্যের সীমান্তচারী, অকারণ-করুণাকারী। তাঁহারা যাহাকে সত্যের পর সত্য ত্রিসত্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—'সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ', সেই ধ্রুবসত্যকে যাহারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করে, তাহাদিগকে যদি সত্যবাদী বলিব, তবে জগতে মিথ্যাবাদী কে ? বড়ই হাসির কথা যে, আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ জ্যোতিষ এবং মন্ত্রময় তন্ত্রবিভাগ, ইহার কিছুই রূপক হইল না, রূপক হইল কেবল সকল বেদেরই উপাসনাকাণ্ড। তুমি রূপক বলিয়া বুঝিয়াছ তাহাতে আপত্তি করি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রোগ হইলে ঔষধকে কেন রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা কর না ? চন্দ্র সূর্য্যকে রূপক বলিয়া দিবা দ্বি-প্রহরে প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রিতে কেন স্নান কর না ? রূপক অলঙ্কার বুঝিয়া রস অনুভব করিবার কথা ; কার্য্যে রূপক অলঙ্কারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা তুমি কোন কাব্যে পড়িয়াছ ? দার্শনিকের সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধির দুর্ভেদ্য সাধনতত্ত্ব ভেদ করিয়া যাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই সাধনে সিদ্ধ হইয়া আলৌকিক দৈবতত্ত্ব সকলকেও যাঁহারা লোকসমাজে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী মহর্ষিগণ রূপাতীত স্বরূপ বুঝিয়াও তোমার আবিষ্কৃত এই রূপক বুঝিতে পারেন নাই, ইহা বলিতেও কি তোমার জিহ্বা সহস্রধা বিদীর্ণ হয় না ?

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই আবহমান কাল-পরম্পরায় ত্রিজগতের সিদ্ধ সাধু সাধক পণ্ডিতমণ্ডলী এতদিন যত কিছু যাগ যজ্ঞ ধ্যান জ্ঞান জপ তপ পূজা পাঠ করিয়া আসিতেছেন, ইহার সমস্তই পণ্ডশ্রম ? কেহই এই রূপকপ্রাণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ? কলিরাজের কল্যাণে আজ বলিহারি তোমার গবেষণায়। আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ, 'আত্মানমধিকৃত্য যৎ'—আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা হয় তাহারই নাম আধ্যাত্মিক। আত্মা নিরাকার, সুতরাং আত্মাতে যাহা কিছু হইবে সে সমস্তও নিরাকার হইবারই কথা ; তবেই প্রকারান্তরে সাকারবাদ মিথ্যা হইতে চলিল—কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ (সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে ; সাকারবাদও উঠিয়া যায়, কিন্তু সমাজও না চটে)। এইজন্যই আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের প্রতি এত অচলা ভক্তি, এইজন্যই আর্য্যশাস্ত্রের ধ্বজা ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসকল আজকাল আবার সমাজ ছাড়িয়া

সভায় সভায় বিক্রীত বিতরিত বিলোড়িত হইতেছে। এইজন্যই কপট পাষণ্ডগণ ধর্ম্মপ্রচারের ভান করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অধর্ম্ম প্রচারে দেশে দেশে ঘুরিতেছে। এইজন্যই সরল সাধু সভ্যগণ সহজ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শাস্ত্র বলিয়া ঐ সকল শাণিত শস্ত্র সঞ্চয় করিয়া এখন তাহার খরতর ঘাতে ঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছেন। উপরে ঐ শাস্ত্র নামের বাহ্য চাকচিক্য আছে বলিয়াই ধর্ম্মদস্যুদল এখনও ধার্ম্মিকের আশ্রমে স্থান পাইতেছে। কিন্তু শুভসংবাদ এই যে, দীনদয়াময়ীর দয়ায় দিন পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, দেখিয়া ঠেকিয়া সকলেই এখন প্রায় শিখিয়া উঠিয়াছেন। তথাপি আমরা যাহা বলিলাম তাহা কেবল 'বিদিতে চাপি বক্তব্যং সুহৃদ্ভিরনুরাগতঃ'—বিদিত থাকিলেও সুহৃদ্‌গণ অনুরাগবশতঃ তাহা পুনর্ব্বিদিত করিয়া দিবেন বলিয়াই। তাই আবার বলিয়া দিতেছি—সমাজ! সাবধান, সাবধান, সাবধান! ওলাউঠা বসন্ত ম্যালেরিয়াকে ভয় কর বা না কর—আধ্যাত্মিক গুরুকে দেখিয়া সভয়ে প্রচণ্ড দণ্ডবৎ করিতে ভুলিও না, ভুলিও না—ভুলিও না!

কিসে, কি ভাবে, কেন, কোথা হইতে, কিরূপে এ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, পরবর্ত্তী বিষয় সকলের অবতারণায় হয় ত আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে, এজন্য এক্ষণে আর সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাহ্য-পূজা

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাঽধমাধমঃ ॥ ১ ।
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্ ॥ ২ ॥ (মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে)।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্তার অনুভব, ইহাই উত্তম ভাব; ধ্যান মধ্যম ভাব; স্তব এবং জপ অধম ভাব; বাহ্য পূজা তদপেক্ষাও অধম ভাব। ১। জীব এবং পরমাত্মায় একত্ব জ্ঞান বা একত্ব সাধনের নাম যোগ; তিনি ঈশ্বর এবং আমি সেবক, এই উভয়-কোটি জ্ঞানের অবলম্বনেই পূজা; কিন্তু সমস্তই ব্রহ্ম—ইহা যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার আর যোগও নাই, পূজাও নাই। ২।

উত্তমা মানসী পূজা বাহ্য-পূজা কনীয়সী।
পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ ॥
হোমেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ।
বীরাণাং মানসী পূজা দিব্যানাঞ্চ কুলেশ্বরি ॥ (নিরুত্তর-তন্ত্রে)

মানসী পূজা উত্তমা, বাহ্য-পূজা তদপেক্ষা কনীয়সী। দেবতার পূজা করিয়া জনসমাজে সাধক স্বয়ং পূজা লাভ করেন; জপ হইতে মন্ত্রসিদ্ধি নিঃসংশয়; হোমের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লব্ধ হয়; সেই হেতু সাধক পূজা জপ হোম এই ত্রিতয়েরই অনুষ্ঠান করিবেন। কুলেশ্বরি! বীরাচার এবং দিব্যাচার সাধকগণ মানসী পূজার অধিকারী অর্থাৎ বাহ্য-পূজা ব্যতিরেকে কেবল মানস-পূজায় ইহাদিগের অধিকার।

এইরূপ অন্যান্য তন্ত্রও বাহ্য-পূজাকে নিম্নাধিকার বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল বচন প্রমাণই আজকাল সাধারণ-সমাজে অকালপ্রলয়-মহাধূমকেতুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। এইজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দাম্ভিক বিজ্ঞদল প্রায়শঃই বাহ্যপূজা-পরাঙ্মুখ; অধিকন্তু বাহ্য-পূজার বিরোধী। তাঁহাদিগের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাহ্য-পূজা অধমাধম, সুতরাং উহা করিলেই অধম হইতে হয়—অথবা যাহারা অধমাধম নরাধম তাহারাই উহা করিবে, আমরা উহা করিব কেন? আমরাও স্বীকার করি যে, বাহ্য-পূজা অধম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ অধম কাহার হইতে? তত্ত্বজ্ঞান হইতে অধম, ধ্যান হইতে অধম, স্তব জপ হইতে অধম? না, এ সকল ছাড়িয়া তাঁহারা যাহা করিয়া থাকেন তাহা হইতেও অধম? বাহ্য-পূজা অধম অধিকার

সত্য, কিন্তু তুমি এমন কি নরোত্তম হইয়াছ যে, বাহ্য-পূজার নাম শুনিলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর? গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ক খ লেখা, বিদ্যাশিক্ষার নিতান্তই নিম্নাধিকার; কিন্তু তাই বলিয়াই মনে করিয়াছ কি, বর্ণজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী মহর্ষি হইবে? যদি কখন কাহারও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মিয়া থাকে, তবে জানিবে তাহা কেবল ঐ গুরুমহাশয়ের নিকটে ক খ-লেখার কল্যাণেই জন্মিয়াছে; তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানে যদি কেহ কখন অধিকারী হইয়া থাকেন, তাহাও জানিবে—এই বাহ্য পূজার প্রসাদেই। ছাত্র শেষে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছাড়িয়া টোলে কলেজে আসিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ক খ ছাড়িয়া আসে না ইহাও ধ্রুব সত্য। ক খ জ্ঞান যখন চিরজীবনের অপরিহার্য্য দৃঢ় সংস্কারে অভ্যস্ত হইয়া আসে তখন সেই ক খ-তরণী আশ্রয় করিয়াই বালকগণ অপার শাস্ত্র-সাগরে প্রবেশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ প্রথমে পরম-গুরুর পাঠশালায় বাহ্যপূজায় পরমদেবতার পদাম্বুজ-সাধনায় ধ্যান ধারণা সংস্কার দৃঢ় হইলেই সাধক সেই অভয় চরণতরণী সহায় করিয়াই অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া ভবপারে উত্তীর্ণ হয়েন। বিদ্যার সাধনায় গুরু মহাশয়ের ক খ লেখার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, মহাবিদ্যার সাধনাতেও গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রময়ী দেবতার উপাসনার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। যে শাস্ত্রে যে সাধনায় যাত্রা করিবে, মন্ত্রময় 'ক খ'-ই তোমার যে সঙ্কটে উদ্ধার করিবেন। শাস্ত্র যত কেন দূর পারাবার না হয়, একমাত্র 'ক খ' যেমন অগ্রসর হইয়া তোমাকে তাহার পারান্তরে লইয়া যাইবে তদ্রূপ জ্ঞান যোগ সমাধিতত্ত্ব যত কেন দূরান্তর না হয়, মন্ত্রময়ী মহাদেবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার কর ধরিয়া তাহার অপরপারে লইয়া যাইবেন। জ্ঞান যোগ সমাধি যাহারই কেন অনুষ্ঠান না করি, দেখিব তাহার সকলের মধ্যেই সর্ব্বেশ্বরী আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন। তাঁহারই অশ্রান্ত নৃত্যভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। ভাই! ভ্রান্ত তুমি, কাহার কাছে শুনিয়াছ যে, আমার মা-ছাড়া আবার সাধন ভজন ধ্যান জ্ঞান ভক্তি মুক্তি এ সংসারে আর কিছু আছে? আমার সাধনায় মা, সাধ্যে মা, সিদ্ধিতে মা, সিদ্ধে মা; আদিতে মা, মধ্যে মা, অন্তে মা, উপান্তে মা—সব গিয়া শেষে কেবল যাহা টিকিবে তাহাও জানিবে কেবল মা; মাকে 'মা' বলিতে কেহ না থাকিলেও তখনও জানিবে—কেবল মা; কেননা, মা আমার, আমারও মা, ছেলেরও মা, বাবারও মা, মেয়েরও মা—মা মায়েরও মা, তাই সব হারাইয়াও মা—মা। মা! সেদিন কবে আসিবে যেদিন সব হারাইয়া শব সাজিয়া আমরাও দেখিব কেবল মা!

বাহ্য-পূজার এই অনুষ্ঠান উড়াইবার জন্য কত নজীর, কত প্রমাণ সংগ্রহ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ রামপ্রসাদের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া বলিতেছেন,

তিনি কি মাটির কালী পূজা করিতেন ?—কখনই না। তিনি বলিয়াছেন, হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী ; যেন রামপ্রসাদের কালী আর কখন বাহিরে আসিতেন না অথবা যাহারা মাটির কালী পূজা করে তাহাদের কালী আর কখন হৃৎকমলে দাঁড়ান্ না ; কথা শুনিলেই হাসি পায়—মাটির কালী। ভাই সমালোচক ! কালী মাটি হইলেও তিনি খাঁটি ; কিন্তু তুমি যে অস্থিমাংসের মানুষ হইয়াও মাটি হইলে, এই দুঃখই চিরস্মরণীয়। জানি না, তোমার অদৃষ্টে কবে সে দিন আসিবে যে দিন ঐ মাটির মধ্যে মাটি ভেদ করিয়া মা-টি তোমার দেখা দিবেন ? যে দিন তুমি বুঝিবে—মাটি মাটি হইলেও মা-টির তাহাতে অভাব নাই। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা। রামপ্রসাদের সহস্র গানের মধ্যে কেবল এইটিকেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; এইটিকেও নহে, এইটুকুমাত্র—যে টুকুতে নিরাকারা আছে। যেন রামপ্রসাদ দিব্য করিয়া বলিতেছেন, আমি আর যত যাহা কিছু বলিয়াছি; সে সমস্তই মিথ্যা কথা—কেবল তারা আমার নিরাকারা এইটুকুই খাঁটি সত্য। আর—

মা ! কত নাচ গো রণে—
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,
বিবসনা হরহৃদে—কত নাচ গো রণে ॥

শ্যামা বামা কে ?
তনুদলিতাঞ্জন—শরদসুধাকরমণ্ডলবদনী—
কুন্তল বিগলিত, শোণিতশোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে ॥

ও কে রে মনোমোহিনী—ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল তড়িতপুঞ্জ মণিমরকতকান্তিচ্ছটা—
ও কে রে মনোমোহিনী ॥

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে—
গলিত চিকুর আসব-আবেশে
রণে দ্রুতগতি চলে, ধরে মম দলবলে,
করতলে গজগরাসে।

আরো ঐ এল কে রে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা, লাজবিরহিতা
ভুবনমোহিতা, একি অনুচিতা কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ, লোলিতরসনা গলিত কেশ,
সুরনরে শঙ্কা করে, হেরি বেশ ; হুঙ্কাররবে দনুজদলনী ॥

এ সকল যেন স্বপ্ন প্রলাপ অথবা বাজে কথা ; কাজের কথা যেটুকু তাহা কেবল ঐ নিরাকারা। সমালোচক ! ধন্য তোমার নিরপেক্ষ সমালোচনা !

রামপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার মুখে বড় একটা নিরাকারের কথা কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই—তারপর যখন তিনি মাটির কালী পূজা করিতেন না অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যার মহানিশাতে মৃণ্ময়ীমূর্ত্তিতে চিন্ময়ীর পূজা সমাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে জগদম্বার মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন দিবার জন্য যাত্রা করেন সেই সময় গঙ্গাতীরে মায়ের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে অবতীর্ণ হইয়া মায়ের সম্মুখে মায়ের ছেলে আজ 'কেবল মায়ের' হইয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে মায়ের মূর্ত্তিতে দৃষ্টি স্থির করিয়া সংহারমুদ্রায় সমাধিস্থ হইয়া বাহির হইতে মাকে একবার অন্তরে ডাকিলেন, অন্তরের ধন অন্তর্যামিনী কৃতান্তদলনী মা অমনি সন্তানের লীলান্তকাল বুঝিয়া অন্তরে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেন, আনন্দময়ীর অভয়-দৃষ্টিতে ভবভয় ঘুচিয়া গেল, নৃত্যকালীর প্রেমের নৃত্যে প্রাণের কবাট খুলিয়া গেল, প্রেমানন্দে ঢল ঢল অলস দেহ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, আনন্দ-স্তিমিত চক্ষু ছল ছল উছলিল। সাধক জন্মের মত সাধ মিটাইয়া সাধের সাধনা শেষ করিয়া প্রাণের তন্ত্রী বাজাইয়া আজ গান ধরিলেন—

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মাভৈঃ শব্দের ঘন ঘন, গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে, প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে ॥
স্থির দৃষ্টি অবিশ্রান্তে নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণচাতকের তৃষাভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে ॥

প্রাপ্তির পরেও উৎকট আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। আর জন্ম হবে না জঠরে—ইহা যথার্থতঃ জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সে আকাঙ্ক্ষা আরও শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন জগদম্বার ভাবি অদর্শনে বিচ্ছেদযন্ত্রণা নিতান্তই অসহ্য

বোধ করিয়া মাতৃপ্রাণ সাধক আবার মায়ের চরণতলে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন—

এমন দিন কি হবে তারা।
যে দিন তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে প'ড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুঠে, মনের আঁধার যাবে ছুটে;
অমনি, ধরাতলে প'ড়ব লুঠে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ;
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে;
আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা॥

তারা! এমন দিন কবে হইবে যে দিন তুমি নিরাকারা হইবে। যে দিন হৃৎপদ্ম ফুটিয়া উঠিবে, মনের আঁধার ছুটিয়া যাইবে, অমনি ধরাতলে লুঠিয়া পড়িয়া তারা বলিয়া সারা হইব, যে দিন ভেদ অভেদ সব ত্যাগ করিব, মনের খেদ ঘুচিয়া যাইবে, সেইদিন—শত শত সত্য বেদ, তারা আমরা নিরাকারা। তারা নিরাকারা—এ বেদ বাক্য সেইদিন আমার পক্ষে সত্য হইবে। আমার এ আকার যেদিন ঘুচিয়া যাইবে সেদিন তারাও আমার নিরাকারা হইবেন। তারা নিরাকারা হইবেন না, আমার পক্ষে নিরাকারা হইবেন—ইহাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন; কেননা আমি সাকার আছি বলিয়াই তাঁহার উপাসনা। আমার এ আকার ঘুচিয়া আমি যে দিন তাঁহার চিৎস্বরূপ মহাকৈবল্যে বিলীন হইব সে দিন আমিও যেমন নিরাকার, আমার তারাও তেমনিই নিরাকারা। বেদবাক্যে তারার নিরাকারত্ব উপলব্ধি করিবার যথার্থ উপযুক্ত সময় আমার সেই দিন আসিবে—সে দিন আমার আমিত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমার যেমন থাকিবে না, তাঁহার তারাত্ব বা তাঁহার সাকারত্ব অথবা তাঁহার স্তিনিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমার তেমনই থাকিবে না; তাই আমার চক্ষে তারার যদি কোনদিন নিরাকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা সেইদিন সম্পন্ন হইবে। তদ্ভিন্ন যতদিন আমার আমিত্ব আছে—আমি আছি, ততদিন তারাও আমার তারা আছেন, সাকার আছেন, মা আছেন, ইহা নিঃসংশয়। এখন বল দেখি, রামপ্রসাদ তারাকে সাকার বলিয়াছেন কি নিরাকার বলিয়াছেন? রামপ্রসাদ বলিয়াছেন বলিয়া নজির দেখাইতে যাও কিন্তু রামপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে যে তোমার এখনও অনেক দিন বাকি—এটুকু বুঝিতে পার না, এই বড় দুঃখ। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, রামপ্রসাদ বলিয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহাকে গুরু বলিয়াই তাঁহার কথা

মানিয়া চলিতে চাও অথবা তিনি তোমার মনের মত কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কথাকে নজির দেখাইতে চাও কিম্বা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা না বুঝিয়া একে আর ঘটাইয়া অথবা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার উপক্রম উপসংহার আদ্যন্তভাগ চুরি করিয়া মাঝের একটি ছিন্নজঙ্ঘা ছিন্নমস্তা কথা উঠাইয়া লোককে ভয় দেখাইয়া আপন দলে আনিতে চাও? যদি রামপ্রসাদকে গুরু বলিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারেই চল, তাহা হইলে আর সহস্র গানের মধ্য হইতে শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা—এটুকু উদ্ধৃত করিলে কেন? ইহা দেখিয়াই ত বোধ হয়, নিরাকারের সঙ্গে তোমার নিরাকার প্রেমের নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা আছেই আছে! এইখানে আসিয়াই ত পক্ষ-পাত করিয়াছ, আর উড়িতে চাও কোন্ সাহসে? মধ্যস্থ হইয়া কোন মতের মীমাংসা করিতে হইলেই সেখানে একটু সাবধান এবং বিলক্ষণ নিঃস্বার্থ থাকিতে হয়, আপন স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া তুমি যেখানে কার্য করিবে সেখানে সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হইবে কিরূপে? নিরাকার-প্রতিবাদক কথাটি তুলিয়াছ, ভাল—তাহাতে ত কেহ আপত্তি করিতেছে না। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, তুমি সহস্র গানের মধ্য হইতে একটি নিরাকার শব্দ বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া আনিতে পারিলে আর সহস্র গানের মধ্যে শত সহস্র লক্ষ সাকার কথার মধ্যে একটি সাকারও তুমি উঠাইতে পারিলে না, ইহার অর্থ কি? অবশ্য নিরাকার অপেক্ষা সাকার অনেক ভার, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাহা দশের ভার; চিরকাল ত্রিজগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের লোক যাহার ভার বহন করিয়া আসিতেছে, তুমি একা তাহার ভার বহন করিবে কিরূপে? তোমার যেমন দেহ সূক্ষ্ম, মন সূক্ষ্ম, উপাসনা সূক্ষ্ম, ভাগ্যক্রমে উপাস্যদেবতাটিও জুটিয়াছেন তেমনই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম, একেবারে নিরাকার! ইঁহার ভার তোমার পক্ষেই উপযুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ন্যায় জীবের পক্ষে সাকার দুর্ব্বহ হইলেও সে দুর্ব্বহ ভারের কথাটি একেবারে চাপিয়া রাখা কর্ম্মটা ভাল হয় নাই—নিজে উঠাইতে না পারিলেও অন্ততঃ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, রামপ্রসাদ সহস্র সহস্রবার সাকারের কথা বলিতে বলিতে একবার নিরাকারের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা তোমার আমার পক্ষেও নহে, রামপ্রসাদের পক্ষেও নহে, রামপ্রসাদের রামপ্রসাদত্ব ঘুচিয়া গিয়া উপাস্য—উপাসক সম্বন্ধ অতীত হওয়ার পক্ষে।

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে, আঁখি অন্ধ। দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা। মা আমার সর্ব্বভূতে বিরাজিতা, কিন্তু অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ চক্ষু। জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে তুমি যে তাঁহাকে দেখ না, ইহাই দুঃখ! ততোধিক

দুঃখ এই যে—মা তিমিরহরা, তথাপি তুমি তাহাকে তিমিরে দেখিতে পাও না। চন্দ্র সূর্য্য জগতের অন্ধকার হরণ করেন ইহা সত্য, কিন্তু অন্ধের অন্ধকার ত তাহাতে ঘুচিবার নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে দৃষ্টি বিষয়ে অন্ধ, চক্ষুষ্মানের রাজ্য হইতে দূরে অপসৃত—জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মদোষে অন্ধ স্বয়ং দৃষ্টিহীন। বাহিরের অন্ধকার হইলে তাহা সূর্য্যকিরণে ঘুচিবার কথা ছিল, এ যে অন্ধের নয়নগত অন্ধকার। অন্ধকার আর কিছুই নহে, দৃষ্টিশক্তির বিকাশের অভাব, সে অভাব বাহিরের কোন কারণে ঘটে নাই—ঘটিয়াছে আমার আন্তরিক কোন কারণে, যে কারণের নাম দুরদৃষ্ট। আজ শুভাদৃষ্টের অনুষ্ঠানের বলে যদি আমি সে দুরদৃষ্ট খণ্ডন করিতে পারি, যদি দেবতার অনুগ্রহে পুনর্দৃষ্টি পাই, তবেই আমি তখন; তিমিরের মধ্যেও মা তিমিরহরা—ইহা প্রথমে দেখিয়া পরে তিমির হারাইয়া মাকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পারি। কেননা, সূর্য্যের তিমিরহারিণী শক্তির দর্শন না পাইলে সূর্য্যকেও দর্শন করা ঘটে না। প্রদীপের প্রভা ব্যতীত প্রদীপ দর্শন হয় না, বিদ্যুতের দীপ্তি ভিন্ন বিদ্যুদ্দর্শন হয় না; তদ্রূপ মা সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী হইলেও মায়ের শক্তি-স্ফুরণ ব্যতীত মায়ের দর্শনলাভ ঘটে না। তিনি নিত্যজ্ঞানানন্দময়ী। তাঁহার জ্ঞানকলার আলোক ব্যতীত কাহার সাধ্য তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী সত্তার অনুভব করে! মা তিমিরহরা ইহা সত্য, কিন্তু আমি যে কর্ম্মদোষে অন্ধ, তাহার কি? আমার এ অন্ধকার ত বাহিরের নহে, এ যে অন্তরের অন্ধকার। সাধক বলিতেছেন, তাহাতেও ভয় নাই, এ অন্ধকারও যেমন অন্তরের, ইহার চন্দ্র সূর্য্যও তেমনই অন্তরের। তিনি যে অন্তরের অন্তঃস্তরে সমুদিত, অন্ধকার অন্তরের হইলেও সেখানে তাহা বাহিরের বলিয়াই পরিগণিত; কেননা, যেখানে তাঁহার অভয় জ্যোতির্ম্ময় করশক্তি প্রসারিত হইয়াছে, অন্ধকার সেইস্থান হইতে সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। তাই অনন্তকোটি চন্দ্রসূর্য্যকটাক্ষধারিণী জগদম্বার শরণাপন্ন হইতে হইলেই অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইতে হয় অথবা অন্ধতমস পাতালপুরে বাস করিলেও তাঁহার করুণাকিরণে পাতালও তখন চন্দ্রলোকে-সমুজ্জল হইয়া উঠে। তাই তুমি অন্তরে অন্ধ হইলেও তিনি যেখানে আছেন, তাহা অপেক্ষা এ অন্তরকেও বাহির বলিয়া জানিবে। এইজন্যই রামপ্রসাদ নিজ চক্ষুকে অন্ধ জানিয়াও বলিতেছেন—আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে। কেননা তুমি তিমিরে অন্ধ থাকিলেও তিনি যে তিমিরহরা; সে তিমির যখন ঘুচিবে তখনই দেখিবে—মা বিরাজে সর্ব্বঘটে। বস্তুতঃ রামপ্রসাদ অন্ধ জীব হইলেও যে সময়ে এ কথা বলিতেছেন তখন তিনি অন্ধ নহেন: গত জীবনের অন্ধত্ব লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—আঁখি অন্ধ! এখন যাহা দেখিতেছেন, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া

তাহারই মৌখিক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন, দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা—আর তিমিরের ভয় নাই, তিমিরহরা আসিয়াছেন; তাই এই বেলা দেখিয়া লও—মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।

এমন দিন কি হবে তারা! রামপ্রসাদের এই কাতরকণ্ঠে প্রাণের প্রার্থনা তারা আজ স্বয়ং সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন, সুতরাং সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবার নহে। লোকে দেখিতেছে, রামপ্রসাদ আজ মাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য গঙ্গাতীরে মাকে লইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু মা দেখিতেছেন, রামপ্রসাদ আজ আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য গঙ্গাতীরে মাকে লইয়া আসিয়াছেন। লৌকিক রামপ্রসাদের লোকলীলা সম্বরণ করিবার জন্য বড় সাধের কোলের ছেলে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, ভক্ত পুত্রের ভবযজ্ঞের দক্ষিণান্ত করিবার জন্য, স্বয়ং দক্ষিণা আজ প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলেন, মন্ত্রবিসর্জ্জিত মূর্ত্তিতেও মায়ের অন্তরাবির্ভাব ফুটিয়া উঠিল, জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিস্তরঙ্গে গঙ্গার তরঙ্গ মিশিয়া গেল, সেই সঙ্গে রামপ্রসাদের প্রেমতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রামপ্রসাদের বারাণসী প্রত্যক্ষ হইল—

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
আমার তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী॥

—কেন হব তীর্থবাসী, শ্যামার চরণতলে দেখব কত গয়া গঙ্গা বারাণসী।

আর কাজ কি আমার কাশী, কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।—অনেক দিনের এ সকল কথা আজ সার্থক হইল।

যেদিন, তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।
অমনি ধরাতলে প'ড়ব লুঠে তারা ব'লে হব সারা।

দীনতারিণী মায়ের কৃপায় সত্য সত্যই সেদিন তখন আসিয়া উপস্থিত হইল, কালকাদম্বিনী কালমোহিনীর কালোরূপের আলোর ছটায় দিনরাত্রি সমান হইয়া উঠিল—সে রূপের তরঙ্গরঙ্গে ত্রিভুবন ডুবিয়া গেল, কালো মেয়ের কালো ছেলে কালসাগরে সাঁতার দিয়া এতদিনে মায়ের কোলে কূলে গিয়া উঠিলেন—হৃদয়মন্দির উদ্ঘাটিত করিয়া বাহিরের মা অন্তরে আসিয়া কালবিজয়ী কালীনামের গভীর হুঙ্কারে গঙ্গাতট কাঁপাইয়া দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজার প্রাণপূর্ণ আহুতি দিয়া কালীর কুমার এতদিনে কালীর কোলে ঘুমাইলেন—রামপ্রসাদের ভবলীলার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপূজার সাঙ্গ হইল, কিন্তু বিসর্জ্জন আর ঘটিল না। আমরা বলি, ধন্য মায়ের প্রিয়পুত্র; মায়ের পূজা করিয়া সংহারমুদ্রায় মায়ের বিসর্জ্জন কেমন করিয়া দিতে হয় তাহা তুমিই যথার্থ শিখিয়াছিলে! ধন্য জননি বঙ্গভূমি! তুমিই সন্তানকে যথার্থ সুশিক্ষিত করিয়াছিলে, মহাবিদ্যার মহামন্ত্রে রামপ্রসাদকে ধন্য বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলে, যাহার প্রসাদে তাঁহার বিসর্জ্জনের উপার্জ্জনও কি ইহলোকে কি পরলোকে

অনন্ত অক্ষয় অমোঘ অব্যয় হইয়া রহিল। আজ রামপ্রসাদের সেই বিসর্জ্জনে উপার্জ্জিত ধনে ভারতের লক্ষ লক্ষ পথের কাঙ্গাল লক্ষপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া তাহা ভোগ করিতেছেন,—জয় মা। তোমার প্রসাদের জয়।

সাধক এখন একবার দেখিয়া লইবেন, রামপ্রসাদের তারা কেমন নিরাকারা। রামপ্রসাদ একদিন এক সময়ে তারাকে নিরাকারা বলিয়াছেন, যেদিন যে সময়ে তিনি আর নিজে রামপ্রসাদ ছিলেন না। আজ তাঁহার সেই পরব্রহ্ম-সমাধির সময়ের সুর ধরিয়া অসুর-সম্প্রদায়ের তারাকে নিরাকারা বলা বড়ই সুবিধার কথা। কেননা, সাকার তারার নাম শুনিলেই অসুরের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তারা নিরাকারা না হইলে আর ও-সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত হইবার নহেন; কিন্তু তাহা হইলেও রামপ্রসাদের সে বিদেহকৈবল্যের অনুভব যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ ত এ নাজির না-মঞ্জুর। রামপ্রসাদ যেমন তারাকে নিরাকার বলিয়াছেন, অমনি নিজে নিরাকার হইয়াছেন; আর ইহাঁদিগের ত দেখিতেছি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত দিন রাত্রি যতই নিরাকার নিরাকার করিতেছেন ততই সাকারে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইতেছেন, বলিতে পারি না এ কোন্ দেশী নিরাকার। রামপ্রসাদের তারা নিরাকারা ছিলেন, তিনি সাকার মানিতেন না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আবার বলা হইতেছে, তিনি যেন মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিয়াই কালীপূজা করিয়াছিলেন এবং পরদিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় অর্দ্ধনাভি-গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জীবনের শেষ সঙ্গীত গাইতে গাইতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই, ভাবে মৃত্যু। বলিহারি কালদূতের সিদ্ধান্ত! সাকার মানিতেন না, কিন্তু মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া সাকার প্রতিমায় কালীপূজা করিয়াছিলেন এবং পরদিন সেই পূজিত প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়! সাকার মানিতেন না, তবে কি সাকার কালীপূজা করিলেন, মৃত্যুভয়ে? তাহা হইলেও ত সমালোচক ভায়ার বুঝিয়া রাখা উচিত ছিল যে, বাঁচিয়া থাকিতে সাকার মানি বা না মানি, মরিবার সময় একদিন মানিবার কথা আছে, এ হেন রামপ্রসাদকেও মানিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদ নিরাকার-সত্তার অনুভবের সম্পূর্ণ অধিকার-সিদ্ধ হইয়াই নিজের পক্ষ হইতে তখন একবার মাত্র বলিয়াছেন—তারা আমার নিরাকারা। আ মরি মরি! প্রাণগত সাধনাগ্রেনের কি অতুল্য অমোঘ বল—নিরাকারা যে তখনও 'তারা আমার'। নিরাকারা হইলেও তারা আমার তখনও 'তারা', তারার নিরাকার-সত্তায় তাঁহার সাকারত্ব ডুবিয়া যাইবে—ইহা সাধকের প্রাণের কথা নহে, আমার সাকার তারাই তখন আমাকে তাঁহার নিরাকার-সত্তাসাগরে ডুবাইবেন, আমি আমার আমিত্ব হারাইয়া কেবল তাঁহার তিনিত্বে বিলীন হইব। মায়ের অঙ্কে অঞ্চলের আবরণ-মধ্যে শিশু যেমন নিদ্রিত হয়, আমার অনন্তব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী সাকার মায়ের

নিরাকার কৈবল্য-গর্ভেও আমি তেমনই বিলীন হইব, ইহাই ভক্তিরাজ্যের সিদ্ধাবস্থা। এতদ্ভিন্ন সাধনাবস্থায় কখনও তাঁহার হৃদয়ে নিরাকার-সত্তা স্থান পায় নাই, বরং নিজের বা সাধারণের কথা দূরে থাক যোগীর পক্ষেও তাহা অসম্ভব বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দেবতার মন্ত্রময় স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,

> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
> সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
> এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণি।
> তথাচ তোমাকে বলে কালের কামিনী॥
> ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব।
> কালীমূর্ত্তিধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
> পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগমসার।
> কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
> আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
> গুণভেদে গুণময়ি! হ'য়েছ সাকার॥
> বেদবাক্য নিরাকার-ভজনে কৈবল্য।
> সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
> প্রসাদ বলে কালোরূপে সদা মন ধায়।
> যেমন রুচি তেমন কর, নির্ব্বাণ কে চায়?

সমালোচক মহাশয় এইস্থানে আসিয়াই বিদ্যাবুদ্ধির সিন্ধুক খুলিয়া বসিয়াছেন—বেদবাক্য নিরাকার-ভজনে কৈবল্য শুনিয়াই অজ্ঞান, অধীর আহ্লাদে ঢল ঢল। বেদবাক্য নিরাকার-ভজনে কৈবল্য—ইহা রামপ্রসাদের কথা নহে, সাধনাহীন দাম্ভিকদলের অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। রামপ্রসাদ তাহার প্রতিবাদ করিয়াই বলিতেছেন, সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য—এইটুকুই রামপ্রসাদের নিজের কথা। যাহারা বলে নিরাকারে লয় ব্যতীত নির্ব্বাণমুক্তি হয় না, রামপ্রসাদ তাহাদের প্রতি—তাহাদের প্রতি কেন, যিনি মুক্তিদাত্রী তাঁহার প্রতিই ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন, প্রসাদ বলে কালোরূপে সদা মন ধায়, যেমন রুচি তেমনি কর, নির্ব্বাণ কে চায়। তোমার নিরাকার-সত্তার উপলব্ধি ব্যতীত যদি নির্ব্বাণমুক্তি না হয়, না হউক, তাহাতে কিসের ক্ষতি? তোমাকে পাইলে তোমার নির্ব্বাণমুক্তি চায় কে? যেমন রুচি তেমনি কর, হয় মুক্তি দাও, না হয় না দাও, তথাপি কালোরূপ ছাড়িয়া অন্যদিকে মন ধাইবার নহে। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহারা নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত

হয় তাহারা তাঁহার অপার অনন্ত অগাধ গভীর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অধিকারী নহে ; গীতান্তরে রামপ্রসাদ এই কথাই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

আর কাজ কি আমার কাশী,
কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।
কালীর ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি ॥
কালীনামে পাপ কোথা মাথা নাই তার মাথার ব্যথা,
অনলে দাহন যথা করে তূলারাশি—
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী—
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্‌লে এলোকেশী ॥

———

কাশী যেতে কৈ মন সরে,
যার জন্যে যাব কাশী সেই সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফেরে।

নির্ব্বাণমুক্তি চাওয়া ত দূরে থাক্, পাওয়া পর্য্যন্তও তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ। তিনি বলিতেছেন, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি। চিনি হইয়া যদি তাহার রস আস্বাদনই করিতে না পারিলাম, তবে চিনি হইলাম কিসের জন্য? যদি বল, সংসার-দুঃখ নিবৃত্তির জন্য রামপ্রসাদ অমনি বলিতেছেন—আমি যে রাজ্যে বাস করি, তাহাতে সংসারও নাই, দুঃখও নাই—যাহার দুঃখ আছে, সে তাহার নিবৃত্তি করুক্ গিয়া। তোমার এক মুক্তি কেন? আমার, চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাব্‌লে এলোকেশী। যাঁহাকে ধ্যান করিলে চতুর্ব্বর্গ আপনি আসিয়া অযাচিতরূপে উপস্থিত হয় তাঁহাকে ধ্যানে পাইলে যে কি হয় তাহা কি আর ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য আছে?

সমালোচক দ্বিতীয় কথা ধরিয়াছেন, কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবারূপ নিরাকার, কেননা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন--নিরাকার ভাবনা করা কঠিন। সমালোচক তাহারই বাহবা দিয়া বলিতেছেন—উপাসনা যত উচ্চ অঙ্গের হইবে ততই কঠিন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্থাৎ রামপ্রসাদ অধম উপাসক ছিলেন, তাই তাঁহার এ দশা;

আর অর্থাৎ কেন ? সমালোচকের দল স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, এক্ষণে কেবল এই আক্ষেপ হয় যে রামপ্রসাদের যদি প্রথম হইতেই প্রকৃত পথে (নিরাকার পথে) সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইত তাহা হইলে না জানি রামপ্রসাদ আরও কত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতেন (সমালোচক যেমন করিয়াছেন)। আ মরি মরি! যেমন নিরাকার মন্দিরের সৌন্দর্য্য তেমনি নিরাকার সোপানের শোভা! রামপ্রসাদের সে সৌভাগ্য ঘটিবে কোথা হইতে? তিনি যে সময়ে সংসারে আসিয়াছেন, তখনও যে এ মণির খনি কেহ অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসে নাই। সমালোচক! মুহূর্ত্তের জন্য জঘন্য নারকীয় বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একটু স্থির হইয়া বসিতে পার কি? তোমাকে দুই একটা কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিব। রামপ্রসাদ যে বলিয়াছেন—কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার, ইহা কোন্ অধিকারের কথা? আর ইহার অর্থ কি? তাহা বুঝিবার শক্তি সামর্থ্য বা অধিকার তোমাদের আছে কি? তোমরা রামপ্রসাদের গানগুলিতে যে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ তাহা বলিবার নহে। আমরা একে একে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইব যে ধর্ম্মজগতে এরূপ অনধিকারে মতপ্রচার, প্রচ্ছন্ন দস্যুবৃত্তি, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তিধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগমসার।
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ি! হয়েছ সাকার॥

এ কথাগুলি তুমি বুঝিয়াছ কি? যদি বুঝিতে তাহা হইলে আর সর্ব্বনাশ ঘটাইতে না। 'ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব, কালীমূর্ত্তিধ্যানে মহাযোগী সদাশিব'—এ কথা বুঝিতে হইলে গুরুর নিকটে যথাশাস্ত্র দীক্ষিত এবং উপদিষ্ট হইবার প্রয়োজন। 'পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার, কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার'—এই দুই পয়ারের মধ্যে যে 'কিন্তু'-টি আছে, এ 'কিন্তু'-টি বুঝিতে কিন্তু তোমার এখনও অনেক যুগ যুগান্তের প্রয়োজন। এ নিরাকার, ঊনবিংশ শতাব্দীর কিম্ভূতকিমাকার নিরাকার নহে। ইহা রূপ-নিরাকার অর্থাৎ নিরাকার হইলেও তাহাতে রূপ আছে, এইটুকু সূত্র। তাহারই বৃত্তিতে বলিতেছেন—আকার তোমার নাই অক্ষর আকার—তাহারই ভাষ্য কেবল, গুণভেদে গুণময়ি! হয়েছ সাকার। বিশেষ সাধনালব্ধ শক্তি ব্যতীত এ গভীর অলৌকিক তত্ত্ব বুঝিবার নহে। বড়ই হাসির কথা যে, তুমি অদীক্ষিত হইয়া মন্ত্রশক্তির লীলা খেলা বিচার করিতে যাও; ইহারই নাম গর্ভস্থ শিশুর সংগ্রাম-সাধনা!

সমালোচক! তুমি যদি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত না হইয়া যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইতে তাহা হইলেই আমাদের এ দুঃখ ঘুচাইবার উপায় ছিল, নতুবা মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। স্বয়ং বিশ্বনাথের শ্রীমুখের আজ্ঞা—অনধিকারীর নিকটে এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার নহে। তাই রামপ্রসাদের গান সূত্ররূপ হইলেও আমরা তাহার বৃত্তিভাষ্য টীকা হাটে ঘাটে মাঠে ছড়াইতে পারিতেছি না। তবে তোমাকে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, যে সকল সাধনাসাধ্য তত্ত্বের সাধনা ব্যতীত সহস্র মস্তিষ্ক-বিলোড়নেও উপলব্ধি হইবার নহে, সাধনার অনধিকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধকজগতে হাস্যাস্পদ হইয়া মূর্খমণ্ডলীর এ সর্ব্বনাশ কর কেন? রামপ্রসাদ পরমার্থসাধক, আর সমালোচক স্বার্থসাধক। এই অমৃত আর বিষ, স্বর্গ, আর নরক, তুমি একত্র মিশাইতে চাও কোন্ সাহসে? তুমি আবরণ দিয়া আপেক্ষ করিয়াছ যে, রামপ্রসাদের যদি প্রথম হইতেই প্রকৃতপথে সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইত। কি আসুরিক দাম্ভিকতা! তুমি কি দর্পণ দেখিয়া মনে করিয়াছ যে, রামপ্রসাদ দিশাহারা উন্মার্গগামী শাস্ত্রাধিকার-বিবর্জ্জিত অদীক্ষিত জন্মান্ধ জীব? রামপ্রসাদের নামবিক্রয়ী উচ্ছিষ্ট দাস হইয়া তুমি রামপ্রসাদকে সাধনার প্রকৃত পথ দেখাইতে চাও, এত আস্পর্দ্ধা কিসে তোমার? তুমি সংসারে বসিয়া আপন জীবিকার পথ দেখিতেছ, তাহাই দেখ, শাস্ত্রের নিগূঢ়গর্ভনিহিত সাধনাতত্ত্ব ধরিয়া এ টানাটানি রোগ, এ অনধিকার প্রবেশ তোমার কেন? তোমাকে নিরাকাররোগে ধরিয়াছে, তুমি আকাশে লম্ফ দাও, রামপ্রসাদের তাহা ধরে নাই বলিয়া এ আস্ফালন কেন? তোমাদের সাধন ভজনের সারসিদ্ধান্ত যেমন সাকারবিদ্বেষ, রামপ্রসাদের সাধন ভজনের শেষ সিদ্ধান্ত তদ্রূপ নিরাকারবিদ্বেষ ছিল না। রামপ্রসাদ কেন? আর্য্যশাস্ত্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী কোন সাধকেরই তাহা থাকিতে পারে না। তাঁহারা নিরাকারতত্ত্ব বুঝিয়াই বলিয়া থাকেন, নিরাকারের সাধন ভজন অসম্ভব। আর যাহারা নিরাকারের নাম শুনিয়াই দিল্লীকা লাড্ডু করিয়া বুঝিয়া বসিয়া আছে, তাহারাই আকাশকুসুম দিয়া নিরাকারপূজার জন্য চিৎকার করিয়া বেড়ায়। এইজন্যই শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহারা বলে আমরা ব্রহ্মকে জানি তাহাদিগের পক্ষে তিনি অজ্ঞাত এবং যাহারা বলে ব্রহ্মকে জানিতে পারিলাম না, তাহাদিগের পক্ষেই তিনি বিজ্ঞাত। নির্দ্দিষ্টগণ্ডীতে তাঁহার স্বরূপ নির্ব্বাচন হয় না বলিয়াই তিনিই অনির্ব্বনীয়। বস্তুতঃ সাকারের নাম শুনিলে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্বজাধারী সম্প্রদায় যেমন ভয় পান, ব্রহ্ম কিন্তু তেমন ভয় পান না বলিয়াই সাকার-উপাসকগণের অন্তঃকরণে নিরাকারবিদ্বেষ স্থান পায় না। যাহা হউক, রামপ্রসাদ নিরাকার-উপাসক ছিলেন, কি সাকার-উপাসক ছিলেন তাহা লইয়া আর আমরা আদার ব্যাপারীর মুখে জাহাজের কথা শুনিতে চাই না। রামপ্রসাদ আমেরিকা আফেরিকা ইয়ুরোপের লোক নহেন,

বঙ্গভূমিতেই তাঁহার জন্ম-মৃত্যু লীলার পর্য্যবসান, আমরাই তাঁহার প্রতিবেশী, শুনিতে হয় দেশের লোকে বিদেশের লোকে আমাদের নিকটেই তাঁহার কথা শুনিতে আসিবে। আমরা কাহারও নিকটে তাঁহার কথা শুনিতে যাইব না। সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ের মত দল বাঁধিয়া সুর বাজাইয়া গান করাই রামপ্রসাদের মুখ্য সাধনা ছিল না। গভীর সাধনা-সাগরে তিনি ডুবিয়াছিলেন, আসনবদ্ধ সাধনা হইতে যখন ক্ষণিক বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন তখনই তাঁহার ভাবের হিল্লোলে দুই একটি করিয়া গানের তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, সেই তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইয়াই আজ সমালোচকদলের এ দুর্গতি। রামপ্রসাদের শবসাধন, চিতাসাধন, শক্তিসাধন, মহাশঙ্খের মালা, বিল্বমূল, পঞ্চমুণ্ড প্রভৃতি আসনের জ্বলন্ত প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান। রামপ্রসাদ যে অধিকারে অধিকারী—যে তত্ত্বে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিক, সাধক-সম্প্রদায়ে এখনও তাহা গভীর ভেরীরবে বিঘোষিত হইতেছে। বাহিরের দুই একটা ভাসা গান শুনিয়াই যদি বাজে লোকে তাহা বুঝিতে পারিত তাহা হইলে ত হাজার হাজার সমালোচক একদিনেই রামপ্রসাদ হইয়া যাইতেন। গুরু তাঁহার পথপ্রদর্শক, শাস্ত্র তাঁহার স্বয়ং প্রদীপ, গন্তব্য তাঁহার সাধনাপথ, প্রাপ্তব্য তাঁহার জগদম্বার চিন্তামণিধাম। প্রতি কার্য্যে তাঁহার যেমন শিবাজ্ঞার অনুসরণ করা ছিল, শিবের দোহাই দেওয়া ছিল—গানেও তাঁহার তাহাই হইয়াছে। শিবের আজ্ঞা অনুসারে কার্য্যসাধন। যে না করে, সেও কি কখন বুকের পাটায় বল করিয়া শিবের দোহাই দিতে পারে? শিব মানি না, শাস্ত্র মানি না, গুরু মানি না, সাধনা মানি না, সাধ্য দেবতা মানি না অথচ রামপ্রসাদকে আর তাঁর সুর-ভাঁজান গানগুলিকে মানি। দেবতাকে মানি না অথচ ভূত ভাবিয়া ভয়ে মরি, গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা—এ বিদ্যা রামপ্রসাদের ছিল না। তিনি অবনতমস্তকে শাস্ত্রের দাস হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই শাস্ত্রানুসারে অলৌকিক সিদ্ধিশক্তি তাঁহার নিত্যসহচরী হইয়াছেন।

রামপ্রসাদের আর একটি গানে আছে—

মন্! তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লে না।
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন! তাও জান না?
তুমি, মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁরে ক'রতে চাও রে উপাসনা॥
ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
তুমি, সেই মাকে সাজাতে চাও রে, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা।
তুমি, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয় আলোচাল আর বুট ভিজানা॥

ইত্যাদি।

'অতদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং ভ্রমঃ'—যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞান হইলেই তাহার নাম হয় ভ্রম। স্বরূপজ্ঞানের অভাবের নামই অজ্ঞান বা ভ্রম; যে যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝাই ভ্রম, স্বরূপজ্ঞানের অভাবেরই নামান্তর ভ্রম। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে বিকৃত জ্ঞান স্বতঃই বিদূরিত হয়। লোকরাজ্যে এই কথাই সুপ্রসিদ্ধ যে, যতক্ষণ বুঝিতে না পারে ততক্ষণই ভ্রম থাকে, বুঝিলেই ভ্রম ঘুচিয়া যায়। কিন্তু মন! তোমার এই ভ্রম গেল না—এ কথা যিনি বলিতেছেন তিনি ত বুঝিতেছেন যে, ইহা তাঁহার মনের ভ্রম, তবে ভ্রম গেল না বলিয়া তিনি এ আক্ষেপ করেন কেন? বুঝিলেই ভ্রম ঘুচিয়া যাইবার কথা, কিন্তু বুঝিয়া শুঝিয়া মনে মুখে এক করিয়া বলিতেছেন, তথাপি তাঁহার ভ্রম ঘুচিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ। এখন সমালোচক বুঝিয়া লউন—এ ভ্রম কোন্ ভ্রম। তুমি আমি যেমন সাকার উপাসক বলিয়া পরকে টিট্‌কারী দিয়া বেড়াই, রামপ্রসাদ তাহা দেন নাই। তিনি পর সাবধান করিবার পূর্ব্বে ঘর সাবধান করিয়া নিজেই নিজের মনকে ডাকিয়া বলিতেছেন—মন্! তোমার এই ভ্রম গেল না। আর আমরা হইলে হয় ত বড় অনুগ্রহ করিলেও বলিয়া ফেলিতাম—ভাই! তোমার এই ভ্রম গেল না অর্থাৎ আমার গিয়াছে, তোমা অপেক্ষা আমি অনেক বড় লোক। করুণাময়ীর পরম করুণাভাজন মহাত্মা দিগম্বর যে ভ্রান্তির মূল স্পর্শ করিয়া ধীর-গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, ভ্রান্তিতে শান্তি আমার। অমূলস্পর্শী রামপ্রসাদ সাধনার প্রথমাধিকারে সে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অশান্তহৃদয়ে অধীর হইয়া বলিতেছেন, মন! তোমার এই ভ্রম গেল না। যে ভ্রমকে অতি সন্তর্পণে অন্তঃকরণের অন্তঃস্তরে পোষণ করিয়া দিগম্বর জগদম্বার লীলানন্দ অনুভব করিতেছেন, রামপ্রসাদ অন্তঃকরণ হইতে সেই ভ্রমকে তাড়াইবার জন্য ব্যাকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—ইহা কেবল অপক্ক সাধনার চাঞ্চল্য মাত্র। এই চাঞ্চল্য একদিন হইয়াছিল বলিয়াই রামপ্রসাদ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেন, ইহা কেহ মনে করিবেন না; কেন না উত্থান যেখানে সম্ভবে পতনও সেইখানে; পতন যেখানে সম্ভবে উত্থানও সেইখানে। তবে কেহ কেহ রামপ্রসাদের নাম শুনিলেই তাঁহাকে জন্মযোগী বা জন্মান্তর-সিদ্ধ মনে করিয়া ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন; মনে করেন, রামপ্রসাদই সাধকরাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা। আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। কারণ, আমরা প্রথমে রামপ্রসাদের মুখে (গানেই) তাঁহার নিজের কথা শুনি, তারপর সাধকসম্প্রদায়ে প্রচারিত তাঁহার সাধনাবৃত্তান্তে তাহার প্রমাণ অবগত হই, তারপর শাস্ত্রের কষ্টিতে তাঁহার কথা কষিয়া মাজিয়া বুঝিয়া লই। মহা মহা রামপ্রসাদের কথাও যদি শাস্ত্রবিগর্হিত হয়, তবে তাহা উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ দূরে পরিহার করি। কারণ, যাঁহার প্রসাদে রামপ্রসাদ সপ্রমাণ, তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলে কোটি কোটি রামপ্রসাদ তখন কীটাণুকীট

বলিয়াও গণ্য নহেন। উল্লিখিত গানটি যে রামপ্রসাদের অতি অপক্কাবস্থার আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি। এখন প্রথমত এইটুকু বুঝিবার কথা যে, যে সময়ে রামপ্রসাদের এই গান সে সময়ে তিনি জ্ঞানরাজ্যের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যস্তরে অবতীর্ণ, শেষ স্তরে অপ্রবিষ্ট এবং সাধনারাজ্যে নবপ্রবিষ্ট মাত্র; তাই ভক্তিতত্ত্ব-নিরপেক্ষ কেবল জ্ঞানের সহিত সাধনাকে সম্মিলিত করিতে গিয়াই উপক্রম উপসংহার স্থির রাখিতে পারেন নাই। ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন। তাও জান না —এটুকু সম্পূর্ণ জ্ঞানরাজ্যের কথা। কিন্তু 'তুমি মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁরে করতে চাও রে উপাসনা'—এইটুকু সাধনতত্ত্বে ব্যাকুল অবস্থা। ত্রিভুবনের সমস্তই যদি মায়ের মূর্ত্তি হইল তবে মাটির মূর্ত্তি গড়িলে যে তাহা মায়ের মূর্ত্তি হইবে না, ইহা কে বলিল? জ্ঞানদৃষ্টিতে ত্রিভুবনকে মায়ের মূর্ত্তি বলিলেই, মাটীর মূর্ত্তিও যে তাঁহার মূর্ত্তি, ইহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। ফলত, এ কথায় রামপ্রসাদ শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধাচারী হইয়া মাটীর মূর্ত্তি গড়িতে নিষেধ করিতেছেন, তাহা নহে। মা ত্রিভুবনময়ী হইলেও তাঁহাকে সেই বিশ্বব্যাপিনীরূপে দেখিতে পারিতেছি না বলিয়াই আজ মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া পৃথকভাবে পূজা করিতে হইতেছে—এই দুঃখই গাহিয়াছেন। সাধনার চরমাবস্থা—সিদ্ধির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কে-ই বা এ দুঃখ না গাহিয়া থাকেন? এই দুঃখের অবসান করিবার জন্যই ত তাঁহার উপাসনা। সে দুঃখ যদি আগেই ঘুচিয়া গেল, আগেই যদি মাকে জগন্ময়ী দেখিলাম, তবে আর উপাসনা কিসের জন্য? যাঁহারা সেই জগন্ময় মা না দেখিয়া জগন্ময় মাটীই দেখেন অথচ রামপ্রসাদের ধুয়া ধরিয়া বলিয়া বেড়ান—মন! তোমার এই ভ্রম গেল না, তাঁহারা যে কোন্ অধিকারের অধিকারী তাহা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। 'জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা। তুমি, সেই মাকে সাজাইতে চাও রে দিয়ে ছার ডাকের গহনা' ॥—এ কথাটি আবার ভক্তিরাজ্যের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার আভাসমাত্র। কত কত স্বর্ণরত্ন দিয়া যে মা জগৎকে সাজাইতেছেন সেই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের রাজ রাজেশ্বরীকে তুমি তুচ্ছ ডাকের গহনা দিয়া সাজাইতে চাও, ইহা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। এভাবতা মাকে সাজান যায় না বা মা সাজেন না, ইহা ত প্রতিপন্ন হইতেছে না, বরং সাজাইতে পারিলে মা বিলক্ষণ সাজিতে পারেন, ইহাই সপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে। তিনি ত্রিভুবন-সৌন্দর্য্যসজ্জার নিদানভূমি, তৃণবৎ তুচ্ছ ডাকের গহনা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের নিকটে উপস্থিত করাই বিষম ধৃষ্টতার কথা। অনন্তকোটি কুবেরের অক্ষয় রত্নভাণ্ডার যাঁহার চরণতলে ঢালিয়া দিলেও সূর্য্যমণ্ডলসম্মুখে প্রদীপ-বর্ত্তিকার ন্যায় তাহার আত্ম-অস্তিত্ব হারাইয়া যায়, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ডাকের গহনা, এ কথা মনে করিতেও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। এই অপূরণীয় অভাবের যাতনায় অধীর হইয়াই রামপ্রাসাদ বলিয়াছেন, তুমি সেই মাকে সাজাইতে চাও রে, দিয়ে ছার ডাকের

গহনা। তথাপি শাস্ত্র তাঁহাকে সাজাইবার ব্যবস্থা কেন দিয়াছেন, সে কথার উত্তর আমরা পরে করিব। তবে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি, যে, সাধনা করিতে হইলেই মাকে সাজাইয়া সাধ মিটাইতে হইবে, ইহা সাধক সাধিকার দায়িত্ব বিশেষ। সাধনারসে হৃদয় নিমগ্ন হইলে সে রসতত্ত্ব তখন জগদম্বার ব্রহ্মতত্ত্বকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম; সাধকের সে অপরাজিত পরাক্রমকে পরাজিত করিতে স্বয়ং অপরাজিতাও অনেক সময়ে কাতরতার অভিনয় করিয়া থাকেন। ভবজননীর সেই ভক্তবৎসল লীলামাধুর্য্যে ডুবিয়াই ভাব-চাতুর্য্যচূড়ামণি দাশরথি আগমনী প্রবন্ধে জগজ্জননীর জননীর প্রেমে দেখাইয়াছেন—ভক্তরাজ গিরিরাজের দুর্গোৎসব-সাধনার অনুরোধে নগেন্দ্রনন্দিনী যখন মহিষমর্দ্দিনী সাজিয়া শুভষষ্ঠীর সায়ংকালে শৈলরাজের মণ্ডপপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, উমাময়-জীবন শৈলরাজমহিষী মেনকা, উমার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া রণরঙ্গিনী-মূর্ত্তিদর্শনে ভীত চকিত হইয়া কন্যা-তন্ত্রের মহাসাধিকা অন্য তন্ত্রে যখন দিশাহারা হইয়াছেন, তখনই—

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব্বরূপ পূর্ব্বের তনয়া॥
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী॥
দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতোষদারা।
উদয় হলেন চণ্ডী, যেন চন্দ্রে ঘেরা॥
উমাচন্দ্র কোটীচন্দ্র-জিনি রূপ ধরে।
দশ চাঁদ পড়িয়ে মায়ের চরণনখরে॥
হেরিয়ে গগনচাঁদ মলিন লজ্জায়।
চাঁদে কি তুলনা তাঁর, চাঁদ পড়ে যাঁর পায়॥
শরদে, শারদচাঁদের হাট হৈল হিমালয়ে।
রাণী পাইল হাতে চাঁদ, উমাচাঁদকে পেয়ে॥
চাঁদের পরিবার উমার, গগনচাঁদকে ঢাকে।
চন্দ্রমুখী চাঁদমুখে জননী ব'লে ডাকে॥
রাণী বলে এলি আমার দুর্গা দুঃখহরা।
রোদনে রোদনে তারা। নাই মা নয়নতারা॥
বিদায় দিয়ে কি দায় উমা। ঘটে গৃহবাসে।
আমার, দেহ থাকে মা। হিমালয়ে, প্রাণ থাকে কৈলাসে॥

অদর্শনে ধরাসনে মৃতসমা রই।
আজ, প্রাণ এনে দেহেতে দিলি তাই ত কথা কই ॥
'মা আছে' মা! ব'লে মনে হয় না কিসের লাগি?
তোর শোকে মা ম'লে হবি মাতৃবধের ভাগী ॥
আমি, পুত্রহীনা কন্যাবিনা অন্য গতি কৈ?
তোর ভরসা তোরই আশা করি ব্রহ্মময়ি।
কোন্ দিনে ত্যজিব প্রাণ, দিনে দিনে জরা।
অসমর্থকালে তত্ত্ব কর্‌বি না কি তারা?
তোর, ভাব দেখে ভবতারিণি! শঙ্কা মনে আছে।
হাঁ মা! অন্তকালে আন্‌তে গেলে আস্‌বি না কি পাছে?'[1]
রাণীবাক্যে মনোদুঃখে কন শিবরাণী।
তুমি গো আমার তত্ত্ব কর কৈ? জননি।
জনক যাহার রাজা, মা যার রাজমহিষী।
ভাগ্যগুণে পতি না হয়, হয়েছেন সন্ন্যাসী ॥
নারীগণের গঞ্জনাতে লজ্জায় ম'রে যাই।
বলে, রাজার মেয়ে শুন্‌তে পাই, তোর্ কি গো মা নাই?
জনক পাষাণ, তেম্‌নি মা তুমি পাষাণী!
আমি, পাশরিতে নারি মায়া তাই আসি আপনি ॥
রাণী বলে ঈশানি! পাষাণী বটি আমি।
পাষাণ হওয়া ভাল মা! তার, যার কন্যা তুমি ॥[2]

* * * *

এত বলি গিরিভার্য্যা ভাসে নয়নজলে।
করুণা করিয়ে পুনঃ কন্যাপ্রতি বলে ॥
অচলপতি গতিহীন কিরূপে তত্ত্ব করি?
পূরাও গো সাধ, সে অপরাধ, ক্ষম ক্ষেমঙ্করি ॥
কত লোকে, উমা! আমাকে, তোমায় দুঃখী বলে।
শুনে শুনে, মনাগুণে, সদা প্রাণ জ্বলে ॥
বলে, স্বর্ণলতা, বিবর্ণতা, রাণি! তোর কুমারী।
করি ভিক্ষা, প্রাণরক্ষা, করেন ত্রিপুরারি ॥

১। ধন্য ধন্য ভক্তকবি দাশরথি। যথার্থ সময় বুঝিবা আনিবার অধিবাস তুমিই করিয়াছ। ইহাকেই বলে—যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

২। পাষাণ না হইলে তোমার অদর্শন-যাতনা সহিবে কিরূপে?

সবে ধন, উমাধন, আরাধনে ধন ।
রাখিতে চাই, ঘরজামাই, মানেন না ত্রিলোচন ॥
তখন, মেনকারে, দর্প ক'রে, দুর্গা কন ছলে ।
তোর জামাতার দুঃখের কথা, কেবা তোরে বলে ?
মোর ভর্ত্তা, হর্ত্তা কর্ত্তা, ত্রিভুবনস্বামী ।
বরং, মা তুমি দরিদ্রজায়া, রাজমহিষী আমি ॥
কান্ত আমার, কাশীকান্ত[১] অন্ত কে তার জানে ।
জগতে ধনী, ওগো জননী ! আমার পতির ধনে ।
ভক্তি করি, মোর পতিকে যে জন করে ভিক্ষে ।
মোক্ষধন, ত্রিলোচন, তারে দেন কটাক্ষে ॥
নাই, কিছুরই অভাব, দেখিতে স্বভাব, দীনদুঃখীর প্রায় ।
যে বুঝে ভাব, তার উঠে ভাব, ভবের ভাবনা যায় ॥
তোর ধনে কি, তোর জামাই ঝি, সম্পত্তি পাবে ?
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী এনে, তারে ধন দিবে ?
তার কখন দৈন্য থাকে ? যার ঘরে তোর মেয়ে ।
জগতে অন্ন যোগাই আমি অন্নপূর্ণা হ'য়ে ॥
রত্নাকর কুবেরাদি শিবের ধন রাখে ।
কত পুণ্যে, মা তুই কন্যে, সঁপেছিলি তাঁকে ॥
আমি, ইন্দ্রাণী তোয়্ ক'র্‌তে পারি এমনি পতির জোর ।
দশপুত্রসমা কন্যা, আমি কন্যা তোর ॥
যত, প্রতিবেশী হিংস্রক, সুখ তোরে বলে না ।
দুঃখের কথা, ব'লে মাতা ! দেয় তোরে বেদনা ॥
রাণী বলে মর্ম্মকথা বল ব্রহ্মময়ি !
এত যে ঐশ্বর্য্য তার বাহ্যলক্ষণ কৈ ?
সাজাইতে শঙ্করি ! তোরে, সাধ কি শিবের নাই ?
রত্ন-আভরণ কেন দিলেন না জামাই ?
উমা-বিধুর, অঙ্গ শুধু, কি করে ছার ধনে ।
এলে, দৈন্য-সাজে, পদব্রজে, সন্দেহ হয় মনে ॥

১। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও জ্যোতির্ম্ময়ী কাশীর গৌরব সমধিক, তাই অন্ত ভুবনেশ্বর পরমেশ্বর প্রভৃতি বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়াও কাশীকান্ত বিশেষণে কালীকান্তের পরিচয় সূত্র; ইহারই বৃত্তি—কাশীতে রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।

মেনকারে হাস্যমুখে, উমা কন রঙ্গে।
ওমা! আভরণ, ত্রিলোচন, দেখিতে নারেন অঙ্গে॥
বলেন, এ অঙ্গ সাজাতে কি ভূষণ, আছে এ ভুবন মাঝে।
তারিণী আমার শিরোমণি, মণি কি তোমায় সাজে?
চাঁদে কি বাঁধিলে মণি, অধিক উজ্জ্বল করে?
আমার, শূন্য বেশে আশুতোষের সদা মন হরে॥
পঞ্চাননের বাঞ্ছা মনে যা হয়, তাই করি।
নইলে, অসংখ্য অমূল্য মণি যায় গড়াগড়ি॥
রাণী বলে কেন ভূষণ সাজিবে না গায়?
হ'লে, হস্তিদন্ত স্বর্ণে বাঁধা অধিক শোভা পায়॥
আমি প্রত্যক্ষে দেখিব আজি নানা রত্ন আনি।
সাজে কি না সাজে অঙ্গ তোমার ঈশানি!

* * * *

তখন, প্রেমানন্দে গিরিরাণী, রত্ন আভরণ আনি,
উমা-রত্নে যত্নে সাজাইল।
কদাচ না শোভা পায়, আভরণ উমার গায়,
চাঁদকে যেন রাহুতে গ্রাসিল॥
খেদে রাণী ম্রিয়মাণা, দাসীগণে করে মানা,
বলে, আর এনো না তুচ্ছ আভরণ।
যা দিয়ে সাজালাম দেহ, শীঘ্র মুক্ত করি দেহ,
মায়ের, শূন্য দেহ করি দরশন।
সাজিল না শঙ্করি মা! তোরে আভরণে সাজিল না।
কোন্ বিধি গড়িল মা তোয়্ হর-অঙ্গনা;
কি রূপ ধ'রেছ তারা, শরচ্চন্দ্রমুখি তারা!
মা আমি, চাঁদের নাম রেখেছি তারা, নয়নতারা ছিল না॥
রূপে হরের মন হরে, মনের অন্ধকার হরে,
মা উমা! তাইতে বুঝি ত্রিনয়ন তোরে, নয়ন ছাড়া করে না॥

এইরূপে তাঁহাকে সাজাইবার সাধ যতক্ষণ না মিটিয়া যাইতেছে ততক্ষণ সাধনা চরিতার্থ হইবার নহে, তাই শাস্ত্র তাঁহাকে সাজাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাকে সাজাইতে গিয়া আমাকে বারংবার এইরূপে শ্রান্ত ক্লান্ত লজ্জিত বিড়ম্বনাগ্রস্ত দেখিয়া সন্তানের সন্তাপ দূর করিবার জন্য করুণাময়ী ত্রিপুরসুন্দরী যেদিন আপন সৌন্দর্য্যে

আপনি সাজিয়া আপনি আসিয়া এ হৃদয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন, আমার অলঙ্কারে মাকে সাজাইতে গিয়া যেদিন মায়ের অলঙ্কারে আমি সাজিয়া দাঁড়াইব, সেইদিন আমার সাজাইবার সাধ জন্মের মত মিটিয়া যাইবে। সেইদিন আমি আনন্দে উর্দ্ধ্ববাহু হইয়া জগৎকে ডাকিয়া দেখাইব—মাকে যে সাজাইতে যায় সে তাঁহাকে সাজাইতে না পারিলেও সাজাইতে গিয়াছিল—এই পুণ্যফলেই আপনি সাজিয়া দাঁড়ায়। সে সাজসজ্জার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুভব করিতে হইলে কোন্ চক্ষুর প্রয়োজন তাহাও রামপ্রসাদ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে তাহা দেখাইতে সচেষ্ট হইব। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিবার কথা যে, মায়ের উপযুক্ত হউক বা না হউক, আমার অবস্থার উপযুক্ত হইলেই মাকে আমি সাজাইব। কেননা, মা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও মা, আমারও মা। উমার উপযুক্ত হউক বা না হউক, মেনকার উপযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই মায়ের মা মাকে সাজাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অলঙ্কারকে তিনি মায়ের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহার অলঙ্কারে (অহঙ্কারে) মা সাজিলেন না, কিন্তু মায়ের অলঙ্কারে তিনি সাজিয়া দাঁড়াইলেন—ব্রহ্মময়ী উমার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যসাগরে মেনকার দৈব-সৌন্দর্য্য ডুবিয়া গেল, আত্ম-অস্তিত্বের অহঙ্কার অন্ধকারময় অলঙ্কারকে বিদূরিত করিয়া একমাত্র জগদম্বার সত্বাসৌন্দর্য্য-সূর্য্যকিরণে মেনকা স্বয়ং প্রতিভাশালিনী হইলেন, তখনই চিন্ময়ীর স্বপ্রকাশ-স্বরূপ দর্শন করিয়া বলিলেন, ওরে, আর এনো না তুচ্ছ আভরণ—এখন যা দিয়ে সাজালাম দেহ, শীঘ্র মুক্ত করি দেহ, মায়ের শূন্য দেহ করি দরশন। মায়ের সাধ এবং সাধনা মিটাইবার জন্য মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল হইতে শ্রীচরণাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যখন নিষ্কল সচ্চিদানন্দ মাধুরীধারা বিগলিত হইয়া পড়িতেছে তখন সে লাবণ্যে অন্য শোভা স্থান পাইবার নহে। তাই মেনকা সাধ মিটাইয়া সাধ করিয়া বলিতেছেন, মায়ের শূন্যদেহ করি দরশন। কেননা, কন্যা তখন লীলারূপে কন্যা হইলেও কৈবল্যরূপে পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।

রামপ্রসাদের হৃদয়ের যেরূপ ঊর্দ্ধগতি তাহাতে সেই সাধ মিটাইবার উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ব্যথিত হইয়াই তিনি বলিয়াছেন, তুমি সেই মাকে সাজাইতে চাওরে দিয়ে ছার ডাকের গহনা। এতাবতা, মাকে সাজাইতে হইবে না ইহা তাৎপর্য্য নহে, মাকে সাজাইবার উপযুক্ত অলঙ্কার পাইলাম না, ইহাই তাঁহার দুঃখ-গীতি—অন্যথা মাকে মা বলিয়া ডাকিতে সাধ আছে অথচ তাঁহাকে সাজাইতে সাধ নাই, এমন দুর্ভাগ্য সন্তান জগতে কে আছে ?

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা,
তুমি কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাও তাঁয় আলোচাল্ আর বুট ভিজানা।

যিনি সাজাইতে পারেন তিনি সাজিতেও পারেন, যিনি খাওয়াইতে পারেন

তিনি খাইতেও পারেন। সাজাইবার সাধ যাঁহার আছে, সাজিবার সাধ থাকা তাঁহার অসম্ভব নহে, খাওয়াইবার সাধ যাঁহার আছে, খাইবার সাধ থাকাও তাঁহার অসম্ভব নহে। হয় একেবারে বল, তিনি সাজানও না সাজেনও না; খাওয়ানও না খানও না, আর না হয় একেবারে বল, তিনি সাজানও সাজেনও; খাওয়ানও খানও। সাকারমূর্ত্তিতে তিনি না-ই বা সাজিলেন, কিন্তু তোমার নিরাকারমূর্ত্তিতেও ত সাজাইলেন—ইহা সত্য, তবে আর তুমি অব্যাহতি পাইলে কিসে? নিরাকারস্বরূপ, নিত্যনির্গুণ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ, সর্ব্ববাদিসিদ্ধ; সেই নির্গুণস্বরূপে জগৎকে সাজাইবার ইচ্ছারূপগুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। তবে উনবিংশ শতাব্দীর কল্যাণে আজকাল অনেকস্থানে সগুণ নিরাকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা কিন্তু সে গুণকে নিরাকারের গুণ না বুঝিয়া নিরাকার উপাসকগণের গুণ বলিয়াই বুঝিয়াছি; অন্যথা নির্গুণ ব্রহ্মে গুণস্বীকার আর আকাশের প্রমোদবনে কুসুমচয়ন একই কথা। যাঁহারা ব্রহ্মকে গুণলেশ-বিবর্জ্জিত বলিয়া উল্লেখ করেন তাঁহারা আবার গুণময় ব্রহ্মাণ্ডের জন্য ত্রিগুণময়ী মায়ার স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন; ইহাঁরা কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণময় জগৎকেও অস্বীকার করিতে পারেন না। মায়ার স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে সে গুরুগম্ভীর চিন্তার ভাবকেও সহিতে পারেন না, আবার জগতের সহিত নিরাকার ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বলিলে তাঁহাকে দয়াল পিতা বলিয়াও ডাকা ঘটে না। আবার সম্পূর্ণ সগুণ বলিলেও সাকার-উপাসকগণের নিকট লজ্জায় মুখ দেখান কঠিন হইয়া উঠে, কারণ সগুণ হইলেই সাকার হইবার কথা, তবেই ত বিষম বিপদ। তাই ইহাঁরা সম্পূর্ণ সগুণ (যে টুকুতে সাকার হইবার কথা) বাধ দিয়া আধা সগুণ, আধা নির্গুণ; নিরাকার অথচ সগুণ, সগুণ অথচ নিরাকার, এই এক কিম্ভূত কিমাকার ব্রহ্মের অবতারণা করিয়া থাকেন। ইনি শাস্ত্র হইতে সচ্চিদানন্দ, বাইবেল হইতে দয়াল পিতা, কোরাণ হইতে কর্ত্তা ঈশ্বর, অনার্যগণের আর্য্যবিদ্বেষ হইতে নিরাকার আর স্বার্থসিদ্ধি হইতে সাময়িক প্রেমময়। আর্য্যগণের উপাস্য-দেবতার সহিত ইহাঁকে এক হইতে দেওয়া হইবে না, এজন্য তিনি নাম রূপের অতীত হইলেও তাঁহার রূপ নাই, কিন্তু নাম আছে; কেননা কেবল 'হে' বলিয়া ডাকি কি করিয়া? যাহা হউক, এই নব আবিষ্কৃত সগুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁহাদিগের কাজ চালাইবার উপযুক্ত হইলেও আমাদিগের এমন কোন অভাব উপস্থিত হয় নাই যাহাতে এ অভিনব-অবতারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে; নিরাকার হইলে নির্গুণ ব্রহ্মেরই আমরা বড় ধার ধারি, তায় ইনি ত সগুণ।

সাজাইবার মত যিনি খাওয়াইতে পারেন, তিনি খাইতে পারিবেন না বা খাইবেন না, ইহাই বা কে বলিল? ইচ্ছাময়ীর নিত্য ইচ্ছা যদি আছেই আছে, তবে সে ইচ্ছা খাওয়াইতেও যেরূপ খাইতেও সেইরূপই। আর যদি বল তাঁহার

খাওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে আমরা বলিব—তাঁহার খাওয়ানও অসম্ভব। তুমি যখন খাওয়ান স্বীকার করিতেছ তখন খাওয়া স্বীকার না করিবে কেন? তবে বলিতে পার, তিনি যেন জগৎকে খাওয়াইতেছেন কিন্তু তাঁহাকে খাওয়াইবে কে? কেননা, যিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের আহারদাত্রী তাঁহাকে আহার দেওয়া অসম্ভব কথা—শব্দজ্ঞানহতচেতন অতত্ত্বদর্শী সম্প্রদায় এই কথাগুলিকে বড়ই মধুর এবং নিঃশেষ-নিঃসারিত সারতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। কারণ, এই সকল কথার বাহিরে যে মাদকতা আছে, তাহার মোহ অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে ইহাঁদিগের বুদ্ধিবৃত্তি স্বতএব কুণ্ঠিত। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা। তুমি কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাও তাঁর আলো চাল আর বুঁট ভিজানা'॥ এরপর কি আরও কথা আছে। যাহা হইবার তাহা একেবারে এই শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে (যেহেতু আমার মনের মত)—বুঝিয়াছেন খান বা খাইবেন—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু খাওয়াইবেন, কেবল ইহাই সার সত্য।

মা জগৎকে খাওয়াইতেছেন, এইজন্যই যদি তাঁহাকে খাওয়ান না হয় তাহা হইলে তাহার কারণ এই দাঁড়ায় যে, মা জগৎকে খাওয়াইতেছেন, আমার নিকট হইতেই যেন তাহার ষোল আনা শোধ উঠাইয়া লইবেন; কেননা জগৎকে যিনি এত খাওয়াইতে পারেন, তাঁহার নিজের আহার কত তাহাও একবার বুঝিবার কথা। আমি বলি, জগৎকে তিনি যত ইচ্ছা তত খাওয়ান, আমার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? আমাকে যাহা খাওয়াইতেছেন, আমি তাহাই তাঁহাকে দিতে বাধ্য; ভোগ করিবার জন্য তিনি আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমার সেই ভোগ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি অবসর লইতে পারিলেই চরিতার্থ; তাঁহার ষোল আনা শোধ দিতে আমি আসি নাই, আমার ষোল আনা শোধ দেওয়া পর্য্যন্তই আমার দায়িত্ব। আমি যতদিন জীব আছি তিনি ততদিনই ব্রহ্ম; আমিই যতদিন সন্তান আছি তিনি ততদিনই মা; আমি যতদিন মানব আছি তিনি ততদিনই দেবতা; আমি যতদিন আমি আছি ততদিনই তাঁহার উপাসনা; আমার আমিত্ব যেদিন ঘুচিয়া যাইবে তাঁহার উপাসনাও আমার সেইদিন শেষ হইবে অথবা তাঁহার উপাসনা যেদিন শেষ হইবে আমার আমিত্বও সেইদিনই ঘুচিয়া যাইবে। আমাকে যতদিন আলোচাল আর বুঁট ভিজানা খাইতে হইবে ততদিন আমি তাঁহাকে তাহা না দিয়া খাই কি বলিয়া? ব্রহ্মাণ্ডের মা হইলেও তিনি যে আমার মা, ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান হইলেও তিনি যে আমার প্রভু। আমার যদন্নাঃ পুরুষা রাজংস্তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ—যে অন্ন আমাকে ভোগ করিতে হইবে পিতৃলোক দেবলোক উদ্দেশেও আমাকে সেই অন্নই দিতে হইবে, যাহা আমাকে আহার করিতে হইবে আমার ইষ্ট দেবতা তাহাই প্রসাদ করিয়া দিবেন; তাহাতে যদি 'আলো চাল আর বুঁট ভিজানা'

বলিয়া তোমার আমার মত তাঁহার অভিমান হইত, তবে কি আর তিনি করুণাময়ী দীনদয়াময়ী প্রপন্নপালিনী ভক্তিসুলভা ভক্তবৎসলা ত্রিভুবনজননী বলিয়া ত্রিজগতের আরাধ্য-দেবতা হইতেন? মহাপ্রেমময়ী মহালক্ষ্মী রুক্মিণীর স্বহস্তসজ্জিত অন্নব্যঞ্জন দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মশাপভয়ভীতা শরণাগতা সাধ্বী সখী দ্রৌপদীর ভোজনাবশিষ্ট স্থালীলগ্ন শাককণা ভোজনের জন্য যদি তিনি দ্বারকা হইতে দ্বৈতবনে ধাবিত না হইতেন, তবে কি তাঁহার গৌরবের পাণ্ডব-সখা নাম ত্রিজগতে বিঘোষিত হইত? অনন্তভুবনস্বামী বৈকুণ্ঠনাথ হইয়াও যদি প্রহ্লাদের উদ্বেলিত-প্রেমচঞ্চল বালগোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বহস্তে বিষান্নদান-বিষণ্ণ প্রহ্লাদের হস্ত হইতে অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া নিজকরকমলের অঙ্গুলিদল-প্রসারণে স্বয়ং ব্রহ্মাদিদত্ত-পীযূষপূর্ণ শ্রীমুখমণ্ডলে তাহা অর্পণ না করিতেন, তবে কি জগতের হরি হইয়াও প্রহ্লাদের হরি, এই সাধের উপাধি তাঁহার প্রচারিত হইত? দ্বারকার অষ্টৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও যদি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার প্রেমসাধিকা-পত্নী-প্রদত্ত তণ্ডুলকণায় সাদরে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া প্রেমের গুণ গাহিতে গাহিতে তাহার অমৃতাধিক মাধুর্য্য আস্বাদন না করিতেন, তবে কি জগতে কেহ তাঁহাকে দীনবন্ধু দয়াময় বলিয়া ডাকিত? গোপবালকের অর্দ্ধভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট ফলখণ্ড যদি জীবের চতুর্ব্বর্গফল বিধাতার নিকটে উপাদেয় বোধ না হইত, তবে কি সচ্চিদানন্দ নাম হইতে নন্দনন্দন নামের গৌরব এত মাধুর্য্যময় হইত? মহাজ্যোতির্ম্ময় ধাম কৈলাসের রত্নসিংহাসন পরিহার করিয়া ব্রহ্মাদিজননী মা যদি ব্যাধপুত্র কালকেতুর পর্ণকুটিরে রূপের প্রভায় ভবন বন আলোকিত করিয়া অধিষ্ঠিতা না হইতেন—গুহগজাননের নিত্যসেবিত শ্রী-অঙ্কে যদি চণ্ডাল-কুমারকে স্থান দিয়া চণ্ডী নাম সার্থক না করিতেন, ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ-পয়োধর দানে কালকেতুকে কৃতার্থ করিয়া কালমনোমোহিনী অন্নপূর্ণা যদি চণ্ডালান্ন গ্রহণ না করিতেন, কালকেতুর কালভয়ভঞ্জিনী যদি ব্যাধের জননী হইতে ঘৃণাবোধ করিতেন, তবে কি আজ ব্যথিতহৃদয়ে জগতের জীব মা বলিতে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইত? সুরথ-সমাধির সাধ্যদেবতা মা যদি নদীতটে বনবিভাগে ফলমূলময় পূজা গ্রহণে সাধকদ্বয়ের হৃদয়বিদীর্ণ রক্তধারায় সন্তর্পিতা হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ না করিতেন, তবে কি মায়ের সাধনায় সাধক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বদ্ধপরিকরে উদ্যত হইতেন? শাস্ত্রও বলেন, লোকেও বলে—মহারাজ সুরথ এবং মহাসমাধিজীবন বৈশ্যরাজ সমাধি মৃণ্ময়মূর্ত্তিতে মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎকট তপস্যায় শীঘ্র তাঁহার দর্শনলাভ করিবার জন্য তিন বৎসরকাল নিরত খড়্গাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রত্যহ সেই রক্তে মহাপূজায় বলিদান কার্য্য সমাধান করিয়াছিলেন—এ কথা শুনিয়া আমার যেন মনে হয় অন্তরূপ।, মায়ের

পূজার জন্য সন্তানের বক্ষঃস্থল-বিদারণ, এ ত মায়ের অনুগ্রহের কথা নহে—মা হইয়া মায়ের এ নিদারুণ নিগ্রহ কেন? আমার কিন্তু বোধ হয়, বলিদানে সন্তুষ্ট করিয়া মাকে সম্মুখে আনিবার জন্য সুরথ সমাধি হৃদয়ে খড়্গাঘাত করেন নাই। গুরুদেব মহর্ষি মেধসের মুখে শুনিয়াছিলেন, মা নাকি ভক্তহৃদয়বিহারিণী অন্তর্যামিনী; তাই সন্তুষ্ট করিয়া হউক বা না হউক, অন্ততঃ বিরক্ত করিয়াও তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহিরের মূর্ত্তিতে আনিয়া দর্শন করিব—এই কঠোর প্রতিজ্ঞার প্রতি নির্ভর করিয়াই প্রতিনিয়ত হৃদয়ে খড়্গাঘাত করিয়াছেন, নতুবা উৎকট তপস্যা কেন? সে হৃদয় হইতে যে রক্তধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছে লোকে তাহাকে হৃদয়রক্ত বলে বলুক, আমি বলি—কেবল হৃদয়রক্ত নহে, হৃদয় অনুরক্ত। তাই আজ মায়ের ভক্তহৃদয়ে এ রক্তধারা প্রবাহিত; সে হৃদয় যে মাতৃপ্রেমে আকণ্ঠপরিপূর্ণ! তাহাতে যেমন আঘাত হইয়াছে অমনি দরদরিত প্রেমের ধারা অজস্রনিস্যন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সে প্রেম ত স্বচ্ছ সুন্দর বিশুদ্ধ নির্ম্মল ঘন-নিবিড় দুগ্ধধবল, তাহা কেন রক্তবর্ণ হইল তাহা বলিব কি করিয়া? ভক্তগণ! তোমরাই কেবল বলিয়া দিতে পার, এ রক্ত আসিল কোথা হইতে? আমার যেন বোধ হয়, ক্ষীরসমুদ্র-মণিদ্বীপ-সিংহাসন-বিলাসিনী মা ভক্তহৃদয়-ক্ষীরসমুদ্র-সুখশয়নে শায়িতা ছিলেন, সেই ভক্তহৃদয়ে যত আঘাত হইয়াছে তাহা কেবল ভক্তবৎসলার চরণপীঠেই আহত প্রতিহত হইয়াছে। সেই তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সাদরে সদানন্দের স্বহস্তরচিত জগদম্বার-চরণাম্বুজরঞ্জন উজ্জ্বল অলক্তরসরাগ বিগলিত হইয়া আজ ভক্তহৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগে মিশিয়া গিয়াই লোকনয়নে রক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। নতুবা দেহ ইন্দ্রিয় হৃদয় আত্মা সর্ব্বস্ব যাঁহার চরণে একেবারে সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য একবার দান-করা হৃদয় আবার বারে বারে দান করা কেন? সমুদ্র অগাধ হইলেও তরঙ্গময়, প্রেম নিত্যনিবিড় হইলেও নিয়ত চঞ্চল—ইহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি তাহার চরণে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তথাপি দণ্ডে দশবার নিমিষে নিমেষে ইচ্ছা হয়—আবার দেই! আবার দেই! ইহা ভালবাসার গুণ কি ভালবাসার পাত্রের গুণ তাহা বলিতে পারি না; ভক্তির গুণ কি মায়ের শ্রীচরণের গুণ তাহা জানি না; ফলতঃ এই গুণের চঞ্চলতায় অধীর হইয়াই সুরথ সমাধি যতবার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন—আমি জাগিয়া আছি কি না, ইহা জানাইবার জন্য জগদম্বা ততবারই যেন চঞ্চলচরণ আন্দোলিত করিয়া রক্তের লহরীতে লহরীতে তাহার বিস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—শেষে, সাধে সাদরে সুরঞ্জিত সব অলক্ত ধুইয়া গেলে পাছে মহেশ্বরের অভিমান হয় (ভক্তের নিয়ত দত্ত অনুরাগ উপেক্ষা করিয়া বাহিরে দিলে সাধকের মর্ম্মব্যথায় শিববাক্য মিথ্যা হয়) এই ভয়েই নগেন্দ্রকুমারী সে সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সাধকের নয়নানন্দ-মাধুরী

মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে চিন্ময়স্বরূপে জাগিয়া দর্শন দিলেন। যেন এতদিন কিছুই জানেন না,—সুপ্তোত্থিত চকিতবৎ অলস-অবশ ঢলঢল লোচনে অপত্যস্নেহমন্থর মধুরবিলোল প্রশান্তদৃষ্টি-পীযূষবর্ষণে ভক্তহৃদয় সন্তর্পিত করিয়া মৃদুস্মিত-বিম্বাধরে হাসিয়া মা সুরথকে বলিলেন, মহারাজ! যাহা ইচ্ছা কর তাহা লও! বৈশ্যকেও বলিলেন, কুলনন্দন! যাহা ইচ্ছা তাহা লও! আ মরি মরি! মায়ের মুখে কুলনন্দন—এ ত সম্বোধন নয় অপারস্নেহের কবাট-উদ্‌ঘাটন! কেবল মায়ের হইয়া যাহারা মাকেই চায়, মা তাহাদিগকে এমনি করিয়াই মধুরকোমল সম্বোধনে মাতাইয়া থাকেন। মহারাজ সুরথ সকামসাধক, অবশ্য পুত্র পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক তাড়িত হৃতসর্ব্বস্ব নির্ব্বাসিত হইয়াও তাঁহার অন্তরের সে বিষয়রস-লালসাকষায় বিদূরিত হয় নাই; হৃতরাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার মায়ের উপাসনা—তাই আজ অন্তর্যামিনী মা রাজপুত্রকে মহারাজ! বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। আর বৈশ্যকুমারের তীব্রবৈরাগ্য সংসারবাসনাকে সমূলে ভস্মসাৎ করিয়া এ মায়ার কেন্দ্রভূমি মহামায়া মাকে না পাইয়া আর শান্ত হইতেছে না। তাই আজ মাতৃপ্রাণ মা-হারা সন্তানকে মা বড় আদরে—বড় সোহাগে 'কুলনন্দন' বলিয়া ডাকিতেছেন। সংসারের মা যেমন সন্তানকে কৃতী দেখিলে বড় সোহাগে বলিয়া থাকেন, বাছা আমার কুলধুরন্ধর কুলতিলক—মা তেমনি সংসারের অতীতা হইয়াও যেন মায়ের ধর্ম্ম রাখিতে গিয়া মাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়াই বৈশ্যকে বলিয়াছেন কুলনন্দন।—মা! তোমার কোন কুলে কেহ নাই, তোমার আবার কুলনন্দন কি? তবু মা হইয়াছ বলিয়া আজ কুলের মমতা বড়ই বাড়িয়াছে অথবা তোমার পূর্ব্বকূলই নাই, পরকুল না থাকিবে কেন? পরকুল যদি না থাকিবে তবে আমরা কেন আছি মা? তোমার কুল থাক্ বা না থাক, সকল কুলের মূল মা তুমি স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী, তোমার পথে যে দাঁড়ায় মা, কুলপথ ত তাহারই জন্য; কুলের সাধ মিটিয়াছে মা! একবার কুল ছাড়াইয়া কোলে কর, কুলের মূলে বসিয়া একবার কুলরহস্য ভেদ করি—ভবনদীর কুলকুলধ্বনি জন্মের মত মিটিয়া যাক্, মা! তোমার সমাধিমগ্ন সমাধিকুমার সে দুকুল ভেদ করিয়া এ কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন বলিয়াই তুমি তাঁহাকে তোমার সাধের কুলনন্দন উপাধির অধিকার করিয়াছ! ধন্য ভক্ত সুরথ-সমাধি! তোমাদের এ বলিদানের গভীর রহস্য কলির জীব আমরা কি বুঝিব? এ বলি কেবল তোমরাই দিয়াছিলে—আর মা-ই বুঝিয়াছিলেন। সাকারসাধক! তুমি সকাম হও বা নিষ্কাম হও, বাহ্যমূর্ত্তিতে মায়ের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তাহার জন্য কি করিতে হয়, তাহা এই বেলা সুরথ সমাধির নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যে উপাসনার বাহ্যমূর্ত্তিতে জগদম্বার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করিবার জন্য এ হেন সুরথ সমাধির স্বহস্তে বক্ষঃস্থল-বিদারণ,—কলিযুগে আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানপণ্ড পাষণ্ডসমাজে সেই উপাসনার

নাম কি না পৌত্তলিকতা। সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বদর্শী মহর্ষি মেধস যাঁহাদিগের মায়াতত্ত্বের উদ্ভেদক, পরতত্ত্ব-পথ প্রদর্শয়িতা সেই সসাগরা বসুন্ধরার একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট মহারাজাধিরাজেন্দ্র সুরথ আর তীব্রবৈরাগ্য-সন্ধুক্ষিত-তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি-সন্দীপিতহৃদয় মহাত্মা সমাধি—ইহাঁরাই কি না পুতুল খেলা করিতে গিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন? সাবর্ণিক মনুর প্রতি মানবের এ সমালোচনা কলিযুগের পূর্ণ পরিচয় ব্যতীত আর কি হইবে? সে যাহা হউক, নিজমুখনির্গত শাস্ত্রবাক্য রক্ষার জন্য যিনি সুরথ সমাধির হৃদয়রক্ত বলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, আলো চাল আর বুঁট ভিজানা তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইবার নহে। অগ্রাহ্য হইবার নহে বলিয়াই সবলে হৃদয় বাঁধিয়া সাধক বলিয়াছেন—

যজন্তে মাতস্ত্বাং দিবি দিবিষদো নিত্যমমৃতৈ-
রপূর্ব্বাহারৌঘৈ র্জগতি জগদীশ্বর্য্যবনিপাঃ।
অতো দত্তং তোয়ং ফলকুসুমপত্রং ত্যজ ন মে
সমাধত্তে বহ্নিঃ সঘৃতসমিধং প্রাপ্য ন তৃণম্॥

মাতঃ! দেবলোকে দেবগণ অমৃত দ্বারা নিত্য তোমার অর্চ্চনা করেন, জগদীশ্বরি! জগন্মণ্ডলে অবনীপালগণ অপূর্ব্ব আহার দ্বারা তোমার পূজা করেন, তাই বলিয়া মা! তুমি আমার প্রদত্ত পত্রপুষ্প ফল জল পরিত্যাগ করিতে পার না। মা! যজ্ঞকুণ্ডে সঘৃত সমিধে পূজিত হয়েন বলিয়া বহ্নি কি তৃণ পাইলে তাহা পরিত্যাগ করেন? নিজ দাহিকাশক্তিবলে বহ্নি সমস্ত বস্তু আত্মসাৎ করিতে সমর্থ, তাই তাঁহার নাম সর্ব্বভুক্। যে যাহাই কেন প্রদান না করুক, বহ্নির নিকটে তাহাই নির্ব্বিশেষে গ্রাহ্য এবং দাহ্য হয়, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বমঙ্গলার উদ্দেশে যাহাই কেন অর্পিত না হউক, সর্ব্বার্থসাধিকা করুণাময়ী সাধককে কৃতার্থ করিতে তাহাই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এ অঙ্গীকার তাঁহার নিজ অভাব পূরণ করিবার জন্য নহে, ভক্তবৎসলার ভক্তরক্ষা—ব্রতরক্ষার জন্য, নতুবা যিনি মহাভাবস্বরূপিণী, সেই ভাবস্বভাব-প্রভাবময়ীর রাজ্যে স্বরূপতঃ অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যদি কোন অভাব থাকে, তবে সে কেবল অভাবের অভাব মাত্র। আলো চাল আর বুঁট ভিজানা-র অভাবও তাঁহার যেমন নাই মিষ্টান্ন পরমান্ন অমৃতের অভাবও তাঁহার তেমনই নাই; তবে আর 'আলো চাল আর বুঁট ভিজানা' বলিয়া তাঁহার নিকটে দুঃখই বা কি, লজ্জাই বা কি? সপ্তসমুদ্রমথিত অমৃতভাণ্ডারও তাঁহার নিকটে যে পরমাণু, আলো চা'ল আর বুঁট ভিজানাও সেই পরমাণু। অমৃতগ্রহণেও তিনি যে নিত্যনির্লিপ্ত, আলো চাল বুঁট ভিজানাতেও সেই নিত্যনির্লিপ্ত। স্বরূপতঃ পদ্মপত্র-সলিলবৎ নির্লিপ্ত থাকিয়াও মায়াময়সংসারলীলার অভিনয়ে ভক্তকে আত্মসাৎ করিবার জন্য এ সকল উপচারাদিগ্রহণে তাঁহার আনন্দের ভান মাত্র, নতুবা

নিত্যপূর্ণানন্দময়ীর কোন্ আনন্দের অভাব আছে যে, নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া তিনি সেই আনন্দ ভোগ করিবেন? নৈবেদ্যের প্রতিপরমাণুর মধ্যে যে আনন্দময়ী চিৎসত্তায় অধিষ্ঠিতা, নৈবেদ্য তাহাকে আনন্দ প্রদান করিবে, ইহা বড়ই হাসির কথা। তথাপি উপাসনার অধিকারে শাস্ত্র তাহার যে আনন্দ উল্লাসের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার আনন্দ—তাঁহার উল্লাস নহে, সাধকের সাধনানন্দ সাধনোল্লাস বিলাস মাত্র। যথাসময়ে আমরা এ বিষয় প্রপঞ্চিত করিতে সচেষ্ট হইব। এক্ষণে এই মাত্রই বলিবার কথা যে, রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—তাঁহার মনের দুঃখে প্রাণের কথা যে দুঃখ সাধনার প্রথমাধিকারে পরতত্ত্বের উদ্ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকমাত্রকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। এ দুঃখগাথা জ্ঞানরাজ্যের সিদ্ধান্ত নহে, ভক্তিরাজ্যের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অস্ফুট আভাস মাত্র। অতত্ত্বপরিচিত অভুক্তভোগী অভক্তসম্প্রদায় কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে এবং অনধিকার প্রবেশের প্রভাবে সেই ভক্তিরাজ্যের কথাগুলিকে জ্ঞানকাণ্ডের রং দিয়া সং সাজাইয়া পাষণ্ডসমাজে বাহাদুরী দেখাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই যে, মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। একবার যদি বৃষ্টি হয়; তাহা হইলেই এ কাঁচা রং ধুইয়া তখন কোথায় গিয়া পড়িবে তাহার সন্ধানও থাকিবে না। বড়ই আমোদের কথা এই যে, লোকে রামপ্রসাদের দোহাই দিয়া, রামপ্রসাদের দলের লোক বলিয়া লোকসমাজে নিজের পরিচয় দিয়া, আবার লোকের অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে সেই রামপ্রসাদকেই আপন দলে আনিতে চায়। এত বুদ্ধি যাঁহাদের উদরে, তাঁহাদের উদরে রামপ্রসাদের প্রসাদ-অন্ন জীর্ণ হইবার স্থান কোথায়, কেবল তাহা ত ভাবিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। লোকের জীবনেই সাধনের পরিচয়, কিন্তু রামপ্রসাদের জীবনে মরণে সমান পরিচয়। তিনি সাকার ব্রহ্ম মানিতেন কি না, সাকার উপাসনা করিতেন কি না, মৃত্যুর পূর্ব্ব-রাত্রিতেও পূজা করিয়া মৃত্যুকালেও মায়ের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধসাধক মহাত্মা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে ত গানে গানে প্রাণে প্রাণে মূর্ত্তিমতী মায়ের নৃত্য! ইহার পরেও, রামপ্রসাদের সাকার উপাসনা ছিল না।—ইহা যিনি বলিতে পারেন, রামপ্রসাদের আত্মা ছিল না, একথাও তাঁহার মুখেই শোভা পায়।

রামপ্রসাদের আত্মসমর্পণের আর একটি গানও আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে তাঁহার মনঃপ্রাণ আত্মতত্ত্ব দূরে থাক্, দেহ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্তও কি ভাবে মায়ের আরাধনায় অধিকৃত, তাহা দেখিবার কথা—

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই। (যদি) দক্ষিণার প্রেমে না গলে।
ওরে, এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালী নাম নাহি বলে॥

কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে, সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ,
ওরে, সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে ?
ওরে, না পূরে অঞ্জলি, চন্দন-জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে, কালীমূর্ত্তি যথা তথা, ইচ্ছাসুখে নাহি চলে ॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার ?
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আমও কি কখন ফলে ॥

সাধক একবার এই সময়ে সমালোচককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, এ গান কোন্ রামপ্রসাদের ? সমালোচকগণের এই সকল নাস্তিক্যরাগরঞ্জিত সমালোচনা দেখিয়া শুনিয়া অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে, এ সকল অভিনব সূক্ষ্মসমালোচনা কেবল উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী চিন্তাচর্চ্চারই উজ্জ্বলপ্রতিভাচ্ছটা ; কিন্তু আমরা বলি, এ প্রতিমাবিরোধিনী প্রতিভা আজকার নহে, যতদিন আলোক ও অন্ধকারের সৃষ্টি ; যতদিন হইতে দেবকুলে দৈত্যকুলে চিরবিরোধ ; যতদিন সাগরগর্ভে একাধারে অমৃত ও হলাহলের অবস্থান ; যতদিন চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রিকা ও কলঙ্করেখা ; যতদিন স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও বিঘ্ন, দেব ও দানব, মানব ও পিশাচ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আস্তিক ও নাস্তিক, সাধু ও স্বেচ্ছাচারী, ভক্ত ও পাষণ্ড, ততদিন হইতেই উপাসনারাজ্যে এ রাষ্ট্রবিপ্লব চিরপ্রবাহিত। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গগামী পুরুষও নরকযাত্রা করেন, পাপের প্রভাব প্রবল হইলে জ্ঞানীরও দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়, বিকারগ্রস্ত রোগী হইলে সাধুরও তখন অভক্ষ্য ভক্ষণে অপেয় পানে লালসা হয় ; তদ্রূপ জন্মান্তরের ঘনসঞ্চিত সুকৃতি ফলে আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও অনার্য্য-বৃত্তি সকল দুরদৃষ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বতএব জীবের হৃদয় অধিকার করে ; সেই অধিকারেরই ফলাফল এই সমুদায় সমালোচনা ! মূলতত্ত্বের চির অজ্ঞ কেবল ফলমাত্রদর্শী আমরা, তাই মনে করি ফল বুঝি কেবল শাখাতেই ফলে ; বস্তুতঃ তাহা নহে, সকল ফলের মূলে তিনি, তাঁহারই আজ্ঞায় বীজ অনুসারে বৃক্ষের রস কটু তিক্ত কষায় মধুর হয় এবং সেই রসেই তাহার ফল ফলে। তাই অনেকস্থলে দেখিতে পাই, ভগবদ্ভক্ত হইলে চণ্ডালের অন্তঃকরণেও ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়, আবার ভগবদ্-বিমুখ হইলে ব্রাহ্মণও তখন চণ্ডাল অপেক্ষা চণ্ডালত্বে পরিণত হয়ে। স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি, পূর্ণব্রহ্মসনাতন ভগবান ভবানীপতির শ্বশুর হইয়াও যখন অসুর-বুদ্ধির অবলম্বনে ভগবতী-ভগবচ্চরণে ভক্তিশূন্য হইলেন

তখন ত্রিজগতের পশুপাশবিনাশকারী স্বয়ং পশুপতি সেই ছিন্নমুণ্ড শ্বশুরের স্কন্ধে পশুর অধম ছাগের মুণ্ড সংযোজিত করিতে অনুমতি করিলেন। আবার শিবরাত্রি-ব্রততত্ত্বে দেখিতে পাই, সেই পশুপতিই করুণা-বলে পশুঘাতী নিষাদরাজাকে ভীষণ শমনসঙ্কট হইতে উন্মুক্ত করিয়া যোগীন্দ্রগণবাঞ্ছিত কৈলাসমন্দিরে উপস্থিত করিয়া নিজচরণ-শীতলচ্ছায়ায় চণ্ডালের ত্রিতাপতপ্ত জীবনে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিলেন। তাই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে—

আমরি! চতুর্ব্বর্গ-ফলবিধাতা শ্রীফলমূলে।
তাই ব্যাধের মৃগয়া-ফলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে॥
গাছে ফল ধরে নানা, লোকে ভাবে সেই ভাবনা;
গাছে ত ভাই ফল ধরে না, ফল ধরে ঐ মূলের বলে॥
ব্যাধ্ রে তোর আশ্রয় তরু, তরু নয় ও কল্পতরু;
তোর, তরুর মূলে জগদ্‌গুরু, জন্মান্তর-সাধনার ফলে॥
ধন্য তোর মৃগয়াদীক্ষা, ধন্য রে তোর শরশিক্ষা;
যার বলে স্মরহর ভিক্ষা গ্রহণ করেন বিল্বদলে॥
ধন্য তিথি শিবরাত্রি, যার ফলে মা জগদ্ধাত্রী;
ব্যাধপুত্রে করেন কোলে, ফেলেন না চণ্ডাল ব'লে।
আজ, জন্মিয়ে ব্রাহ্মণের কুলে, সেই ব্রত যে আছে ভুলে;
ওরে, সে যদি ব্রাহ্মণ তবে, চণ্ডাল আর কারে বলে।
ঊর্দ্ধে, ব্যাধ চণ্ডাল তুমি, (তোমার) নিম্নে ত্রিভুবন স্বামী;
এ তত্ত্ব কি বুঝব্ আমি, জন্মিয়ে ব্রাহ্মণের কুলে॥
ভক্তাধীন ভগবান, রাখিতে ভক্তের মান;
নিম্নে রেখে আপনার স্থান, ভক্তকে দেন ঊর্দ্ধে তুলে॥
যদি ভক্তের পতন ঘটে, তখন ভক্তরক্ষা বিষম ঘটে;
তাই ভক্তবৎসল তরুতলে, ভক্তে কোলে ক'র্‌বেন ব'লে॥
ব্যাধ! তোমারে প্রণাম কর্‌তে, আজ, লজ্জিতে হয় বিশ্বনাথে;
তাই, দূর হতে প্রণাম করি, চণ্ডাল! তব পদতলে॥
দাও আশীর্ব্বাদ নিষাদরাজ! আমার ব্রাহ্মণত্ব ঘুচে যাক্ আজ;
চণ্ডালদাদার ভাই ক'রে ভাই, স্থান দাও চণ্ডী মায়ের কোলে।
কুলের গাছে তুলেছ ভাই, এবার প'লে আর রক্ষা নাই;
দোহাই শিবের শিবের দোহাই, হাত বাড়া'লাম ধর তুলে॥

মানবজীবনে এই সকল পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ত্রিকাললোচন ভগবান ত্রিলোচন তাহার মূল লক্ষ্য করিয়া সাধক-জগৎকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়ভাগে অষ্টম পটলে স্বয়ং বলিয়াছেন—

তীর্থে প্রাসাদকরণে ধর্ম্মারম্ভে বিশেষতঃ।
ব্রতযজ্ঞসমারম্ভে বিঘ্নানি নিবসন্তি বৈ ॥ ১ ॥
তেষাং সম্পূজয়েদাদৌ বলিভি র্মোদকাদিভিঃ।
অন্যথা জায়তে বিঘ্ন-মিতি জানীহি মে প্রিয়ে ॥ ২ ॥
অথাপরাণি বিঘ্নানি শরীরে নিবসন্তি বৈ।
মানসানি জ্ঞানজানি পাপানি তান্ শৃণু প্রিয়ে ॥ ৩ ॥
কশ্চিন্নিবর্ত্তকো দেবি কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকস্তথা।
সন্নিকর্ষং বিদূরং বা সহস্রং লক্ষমেব বা ॥ ৪ ॥
পাপানুস্মরণঞ্চৈব আলস্যেনাপি দূষণং।
শোকমোহজরাব্যাধি-তারুণ্যধননাশকম্ ॥ ৫ ॥
কলহং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দুর্ভিক্ষং গৃহসঙ্কটং।
নানাব্রতসমাকীর্ণং ধার্ম্মিকোঽস্মীতি মানসঃ ॥ ৬ ॥
প্রাপ্তশোকস্ত ধর্ম্মস্য করণে হীনপাতকং।
বৃক্ষপত্রঞ্চ তুলসী ধাত্রী বৃক্ষফলং তথা ॥ ৭ ॥
শালগ্রামঃ শিলাখণ্ডং প্রতিমা দারুজং তথা।
মানুষং ব্রাহ্মণঞ্চৈব স্বয়ম্ভুর্বর্ত্তুলং শিবঃ ॥ ৮ ॥
শঙ্খঃ শম্বুকভেদঞ্চ খড়্গঞ্চ মাংসসম্ভবং।
দৃষ্ট্বা দেবান্ ভবেদেবং তীর্থজাতং জলং তথা ॥ ৯ ॥
গঙ্গায়াং বা নদীরূপং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভূমিকা।
ইত্যেতানি চ বিঘ্নানি সংযান্তি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥
মন এবোত্তরেন্নিত্যং মন এবাত্র কারণং।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ১১ ॥

তীর্থযাত্রায়, প্রাসাদনির্ম্মাণে, বিশেষতঃ ধর্ম্মারম্ভে ব্রতারম্ভে যজ্ঞারম্ভে দৈব ও পার্থিব বিঘ্নসকল উপস্থিত হয়। ১। সেই সকল বিঘ্নের প্রবর্ত্তক বা অধিষ্ঠাতা দেবগণকে কর্ম্মারম্ভের প্রথমেই মোদকাদি বলির দ্বারা সম্যক্ পূজা করিবে; অন্যথা অনিবার্য্য বিঘ্নসকল উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ২। এই সকল বহির্বিঘ্ন ভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তার বা সাধকের শরীরেও বিঘ্নসকল বাস করে। সেই সকল আন্তরিক বিঘ্ন জীবের মনকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে এবং জ্ঞানকৃত পাপরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদিগের বিবরণ শ্রবণ কর। ৩। দেবি। এই মানসবিঘ্ন মধ্যে কোন কোন বিঘ্ন নিবর্ত্তকরূপে এবং কোন কোন বিঘ্ন প্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত হয়। (ফলতঃ এই প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক উভয়বিধ বিঘ্নদল পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া কেবল সাধকের পরমায়ু ক্ষয় করে; সুতরাং সে সকল প্রবর্ত্তক বিঘ্নকেও নিবর্ত্তক

বিঘ্নেরই রূপান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্যথা, কার্য্যের প্রবর্ত্তকবৃত্তিকে শাস্ত্র কখনও বিঘ্ন বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। ঐ সকল প্রবর্ত্তকবৃত্তি কেবল সন্দেহদোলার রজ্জুবিশেষ)। বিঘ্ন বিবরণ—সন্নিকটে হউক অথবা অতিদূরে হউক, সহস্র যোজনের অন্তরেই হউক কিম্বা লক্ষ যোজনের অন্তরেই হউক, এতদূর হইতেও সেই সকল পাপের বিষয়সমূহের অনুস্মরণ, আলস্যবশতঃও ধর্ম্মকার্য্যের দূষণ। শোক, মোহ, জরা, যৌবন ও ধনের বিনাশক ব্যাধি। ৪-৫। ভার্য্যার সহিত কলহ, দুর্ভিক্ষ, গৃহসঙ্কট (জ্ঞাতি-বিরোধ পরিবার-বিরোধ ইত্যাদি), নানাব্রত-সঙ্কীর্ণতা (একদা বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠানে সকল ব্রতেরই অঙ্গভঙ্গ দোষাশঙ্কায় ব্যাকুলতা)—আমি ধার্ম্মিক হইয়াছি, এই অভিমান। ৬। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানকালে কোন পাতক পরিলক্ষিত হইতেছে না অথচ সহসা শোকপ্রাপ্তি। তুলসী বৃক্ষপত্র, ধাত্রী বৃক্ষফল, শালগ্রাম শিলাখণ্ড, দেবপ্রতিমা কাষ্ঠ (ইত্যাদি), ব্রাহ্মণ সাধারণ মনুষ্যমাত্র, স্বয়ম্ভু শিব বর্ত্তুল পাষাণমাত্র। ৭-৮। শঙ্খ শম্বুকেরই ভেদবিশেষ, গণ্ডারের খড়্গ মাংসবিকারমাত্র, সাক্ষাদ্দেবতা এবং দেববিভূতিবর্গ দর্শন করিয়া এই সকল দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব। তীর্থসমূহ জলমাত্র, গঙ্গা নদীবিশেষ, পুণ্যক্ষেত্রও সামান্য ভূখণ্ড; এই সকল অবিশ্বাসরূপ মানসিক বিঘ্ন বারম্বার জীবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। ৯-১০। জন্মান্তরীণ সঞ্চিত পুণ্যসূত্রে ধর্ম্মের ঊর্দ্ধ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে দৃঢ়বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ গুরূপদেশ-পরিমার্জ্জিত মনই কেবল এই বিঘ্নসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে নিত্য-সমর্থ। আবার, এই সকল বিঘ্নের আবির্ভাবের প্রতিও দুষ্কৃতিসম্পন্ন মনই কারণ। একমাত্র মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির নিদান। এই সকল বিঘ্নতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধক কার্য্যারম্ভের প্রথমেই মনঃসংযমে বদ্ধপরিকর হইবেন এবং নিজ শক্তি সামর্থ্য লাভের জন্য মহাশক্তির চরণাম্বুজে শরণাপন্ন হইয়া তাহার মঙ্গলাচরণ করিবেন।

এইক্ষণে সাধক দেখিয়া লইবেন, শাস্ত্রে যাহা ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী, জ্ঞানদৃষ্টিহীন অন্ধ আমরা, আমাদিগের চক্ষুতে তাহাই এক্ষণে সাময়িক সূক্ষ্ম সমালোচনা বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ইহা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, এ সকল সূক্ষ্মফল অপেক্ষা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম মূল পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষরূপে আবিষ্কৃত হইয়া আছে। তাই এখন কেবল কাতর প্রাণে কাঁদিয়া বলিবার আছে, জয় মা ত্রিলোচনে! এই একলোচন সমালোচনের গভীর অন্ধকূপ হইতে উঠাইয়া মা! তোমার ঐ দলিতাঞ্জন-পুঞ্জরঞ্জিত সচ্চিদানন্দ-সৌন্দর্য্য-অঞ্জনে কুজুষদৃষ্টি-সন্তানকুলের চক্ষু উদ্ভাসিত করিয়া দাও, একবার ঐ কোটিচন্দ্র-সুশীতল-শ্যামসূর্য্য-সমুজ্জ্বল করুণাকান্তিভরল শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া মা! আমরা মায়ের ছেলে মায়ের কোলে মা বলিয়া পড়ি!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পূজাবিধান

উল্লিখিত প্রমাণে পূজা, জপ, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি আরম্ভ করিবার পূর্বেই শাস্ত্র ভূতাপসারণ ও বিঘ্ন-নিরাকরণের আদেশ করিয়াছেন। কারণ, ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানবের দৌরাত্ম্যে শুভকার্য্যও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, কলিযুগে—তত্রাপি উনবিংশ শতাব্দীতে, তাই কলিদৈত্য নিরাকরণের কল্যাণে উপাসনাতত্ত্বে এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনেক কথাই বলিতে হইল, ইহার সকল কথাই শাস্ত্রীয় না হইলেও শাস্ত্রসম্বন্ধে অসম্পৃক্ত নহে বলিয়াই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কারণ, রামায়ণ মহাভারতের দৃশ্য দেখাইতে হইলেই সুগ্রীব বিভীষণ ভীমার্জ্জুনের অবতারণাও যেমন আবশ্যক, রাবণ কুম্ভকর্ণ দুর্য্যোধন শকুনির অবতারণাও তেমনই প্রয়োজন। পূজাতত্ত্বের প্রামাণ্য-সংস্থাপনে জগজ্জননী-স্নেহজীবন দিগম্বর, রামপ্রসাদ দাশরথির অবতারণাও যেমন প্রয়োজন, আর্য্যজননী ভারতভূমির অঙ্ককলঙ্ক কুতার্কিকদলের অবতারণাও তেমনই প্রয়োজন। অনার্য্য সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত সকল দিন দিন শাস্ত্রের মত এবং সাধকের বাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। এই ভীষণ সর্ব্বনাশ হইতে সরলহৃদয় আর্য্যসমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই বিরুদ্ধপক্ষের সকল কথা শাস্ত্রীয় নহে—ইহা দেখাইবার জন্যই আমাদিগকে সে সকল কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। বুঝিতে পারি না কালের কেমন কুটিল গতি, সকলেই নিজ নিজ মনের মত ধর্ম্মের অনুসন্ধান করেন। এই মন্-গড়া ধার্ম্মিক সম্প্রদায় শাস্ত্রকে দুই চক্ষুর বিষ দেখেন। কারণ শাস্ত্র তাহারই নাম যাহার দ্বারা মানবের উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিসকল শাসিত হয়। শাস্ত্রই বিশ্বরাজ-রাজেশ্বরীর বিশাল রাজ্যশাসনের অমোঘ শস্ত্র-বিশেষ। রাজাজ্ঞার অবমাননাকারী স্বেচ্ছাচারী প্রজার চক্ষুতে সে শাস্ত্র বিষস্বরূপ হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে! ধর্ম্মের আজ্ঞার অধীন হইয়া আমি চলিব, ইহা আজকালকার মতে স্বাধীনতার অপলাপ-বিশেষ; সুতরাং নিতান্তই অরুচিকর। আমার ধর্ম্ম আমার আজ্ঞার অধীন হইয়া থাকিবে, যেহেতু আমি স্বাধীন—ইহাই নিজ নিজ অন্তরের কথা। অলস প্রকৃতি হইলেই লোকে অর্দ্ধেক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উঠে—কিসে কর্ম্ম না করিতে হয় সেইদিকেই তখন তীব্র দৃষ্টি পতিত হয়। তাই সর্বজ্ঞ হইবার জন্য জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য-সংস্থাপক শাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের অচলা ভক্তি; তাই যোগবাশিষ্ঠ ভগবদ্গীতা উপনিষদ্ আমাদিগের যেমন মধুর বলিয়া বোধ হয়, তন্ত্র মন্ত্র যোগ যাগ সাধনা-শাস্ত্রসকলও

তেমনই বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গ, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দন, দেবমন্দির মার্জ্জন, কুশপুষ্পতুলসী-বিল্বপত্রাদি-চয়ন, নদনদী হইতে জলাহরণ, একাহার, নিরামিষ হবিষ্যান্ন, মুহূর্ত্তে দৈব অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ তর্পণ, অতিথিসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, ভূতল-শয্যা, রাত্রি জাগরণ, শ্মশানযাত্রা, তীর্থযাত্রা দৈব পৈত্র অনুষ্ঠানে নিয়ত অর্থব্যয়—সাধনাশাস্ত্রে যদি এ সকল আপদ্ উপদ্রবের কোন কথা না থাকিত তাহা হইলে দৃঢ় নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, গীতা উপনিষদ্ দূরে ফেলিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমরা তন্ত্রমন্ত্রের শরণাপন্ন হইতাম। এত যে জ্ঞানচর্চ্চা, ইহার মূল কেবল—কিসে কি না করিতে হয় সেই চেষ্টা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যাঁহারা ঘোর অলস জড়প্রকৃতি তাঁহারা অনেকদিন হইতেই ধুয়া ধরিয়াছেন, 'কর্ম্মকাণ্ড, বিষের ভাণ্ড'। শৈব সম্প্রদায়েও শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে 'চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ,' শাক্ত সম্প্রদায়েও 'ভৈরবোঽহং শিবোঽহং'। ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান-মন্ত্র শিক্ষিত দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই—তাঁহারা সকল শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত শেষ বুঝিয়াছেন, 'ধর্ম্মের সহিত আবার কর্ম্মের সম্বন্ধ কি'? যে সকল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহারা এই সকল অভিনব সুরুচিসঙ্কুল মনোমত মতের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন, সেই সকল শাস্ত্রের মূলভিত্তি ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-অর্জ্জুনকে কর্ম্মসম্বন্ধে যাহা শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতেও ত বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই, ইহাই বিস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে; বিষয়ী দূরে থাকুন, বিষয়-বিরক্ত যোগীর পক্ষেও কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥

সংসারে মোক্ষসাধনের অধিকার দ্বিবিধ, ইহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; তন্মধ্যে যাঁহারা সাংখ্য শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানাধিকারী তাঁহাদিগের পক্ষেই জ্ঞানযোগ অবলম্বনীয়। আর যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ শুদ্ধি সঞ্চারিত হয় নাই অথচ যোগসাধনায় ব্যগ্রতা আছে, তাদৃশ যোগিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই পুরুষ নিষ্ক্রিয় হয় না, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে (স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে তদবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণও নরকের কারণ হয়)।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

জগতে এমন কেহ নাই যে, কদাচিৎ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে। প্রকৃতির গুণসমূহে বিজড়িত সমস্ত জীবকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

আবার বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় মাত্র সংযম করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎকট তাড়নায় অধীর হইয়া যে বিমূঢ়চেতা মনে মনে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ রস শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি অনুস্মরণ করিয়া কাল যাপন করে, শাস্ত্র তাহাকে মিথ্যাচার বলিয়া উল্লেখ করেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥

কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা এই উভয়বর্গকে সংযত করিয়া যিনি কর্ম্মফলের কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অর্জ্জুন! জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা তাদৃশ কর্ম্মীকেই বিশিষ্ট বলিয়া জানিও।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥

তুমি নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, কর্ম্মত্যাগ (সন্ন্যাস) অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। জীব হইয়া কর্ম্ম করিবে না অথবা কেহ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে, এ কথাই অসম্ভব; কারণ কর্ম্মবিরহিত হইলে তোমার শরীর-যাত্রাই আদৌ নির্ব্বাহিত হইবে না (যেহেতু নিশ্বাস প্রশ্বাসের নির্গমাগমও জীবের শারীর কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত)।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

দেবতার উদ্দেশে (নিষ্কামভাবে) যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মই সংসারে বন্ধনের প্রতি কারণ; কৌন্তেয়! অতএব, ফলের কামনা-পরিশূন্য হইয়া তুমি কেবল তাঁহার উদ্দেশে কর্ম্মের আচরণ কর।

* * * * *

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥

এইরূপে (কেবল দেবোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারে) মৎপ্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তন যে না করে, পার্থ! কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া

সেই কর্ম্মী পাপপূর্ণ পরমায়ু লইয়া পৃথিবীতে বৃথা জীবন বহন করে। আরাও বলিয়াছেন—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

রাজর্ষি জনক প্রভৃতি জগৎপ্রসিদ্ধ সিদ্ধগণও কেবলমাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সম্যক্ সিদ্ধি (বিদেহ-কৈবল্য প্রভৃতি) লাভ করিয়াছেন।

* * * *

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥

পার্থ! আমি ক্রিয়ার অতীত স্বয়ং ঈশ্বর, এই ত্রিলোকে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই, আমার প্রাপ্তব্য কিছু নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই। লোকে কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু কামনা করে, কামনার অভাবেও আমার সে সমস্তই রহিয়াছে—আমি পরিপূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্, তথাপি ভূভারহরণাদির জন্য অবতার পরিগ্রহ করিয়া আমিও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥

কর্ম্মকাণ্ডে অসূয়াপরিহারপূর্ব্বক দৃঢ়বিশ্বাসবিশিষ্ট হইয়া যে সকল মানব আমার এই মতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলেই তাঁহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥

যাহারা অসূয়াবশবর্ত্তী হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় নষ্টচিত্ত বলিয়া জানিও।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞ্ানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

জ্ঞানবান্ পুরুষও বাধ্য হইয়া স্বীয় প্রকৃতির যাহা অনুকূল, তাহার অনুষ্ঠান করেন। জীব সমস্ত স্বভাবতঃই প্রকৃতির অনুগমন করে, বলপূর্ব্বক অবৈধ নিগ্রহ করিলে সে নিগ্রহ তাহাতে কি করিবে?

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

, পরধর্ম্ম (ভিন্নাধিকারে বিহিতধর্ম্ম) যদি সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তদপেক্ষা অঙ্গহীনরূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই (নিজ অধিকারে বিহিতধর্ম্ম) শ্রেষ্ঠ ; স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মৃত্যুও শ্রেয়, তথাপি পরধর্ম্ম ভয়াবহ। চতুর্থাধ্যায়ে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

পার্থ! উপাসকগণ সকাম নিষ্কামভাবে যাঁহারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা, করেন, আমি সেইভাবেই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকি। কারণ, সাধক যেভাবে যে মূর্ত্তিরই কেন উপাসনা না করেন, তাঁহারা সেই সকল-ভাবেরই একমাত্র প্রাপ্য এবং সকলমূর্ত্তিরই একমাত্র অধিষ্ঠাতা আমারই ভক্তিযোগ-পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

ইহলোকেই কর্ম্মের ফলসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া উপাসকগণ দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন ; যেহেতু কর্ম্মজন্যসিদ্ধি মনুষ্যলোকে অতি শীঘ্র সম্পন্ন হয়।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই ত্রিগুণ অনুসারে শম দম প্রভৃতি কর্ম্মের বিভাগে আমি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। এইরূপে তাদৃশ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলেও পরমার্থতঃ আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়াই জান (কারণ, কর্ম্মের বিভাগ ইত্যাদি স্ব স্ব গুণ অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; আমি তাহাতে অনাসক্ত, কাহারও পক্ষপাতী নহি)।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥

কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই ; এইরূপে যিনি আমার নির্লিপ্তভত্ত্ব অধিগত হইয়াছেন, কর্ম্মসূত্রে তিনি কখনও বদ্ধ হয়েন না।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥

এইরূপ কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা কখনও বন্ধনের কারণ হয় না, ইহা অবগত হইয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণ (রাজর্ষি জনক প্রভৃতি) কর্ত্তৃকও কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব, তুমিও সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগযুগান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই আচরণ কর। পঞ্চমাধ্যায়ে—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তিসাধন; তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

তাঁহাকেই নিত্য-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিও, যাঁহার দ্বেষও নাই আকাঙ্ক্ষাও নাই। মহাবাহো! তাদৃশ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ আনন্দসহকারে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্॥

সাংখ্য (জ্ঞান বা সন্ন্যাস) ও যোগ (কর্ম্মযোগ) এ উভয়কে বালকসদৃশ অজ্ঞানগণই পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করে; কিন্তু পণ্ডিতগণের তাহাতে সম্মতি নাই। কারণ, এ উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে আশ্রয় করিলেই জীব সেই এক হইতেই উভয়ের ফল লাভ করেন।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

সাংখ্য—জ্ঞান বা সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানে যে স্থান লব্ধ হয়, যোগের অবলম্বনেও সেই স্থানই গম্য হয়। অতএব, সাংখ্য ও যোগ—এ উভয়কে যিনি একরূপে দর্শন করেন তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

পরব্রহ্মে কর্ম্মসমাধানপূর্ব্বক কর্ম্মজন্য ফলকামনার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র যেমন জলমগ্ন হইয়াও জলে নির্লিপ্ত থাকে তদ্রূপ সেই কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষ কর্ম্মরাশিমধ্যে নিমগ্ন হইলেও কর্ম্মজন্য পাপপুণ্যে নিত্য-নির্লিপ্ত থাকেন।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগিগণ ফলকামনার সঙ্গত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর দ্বারা (স্নানাদি) মনের দ্বারা (ধ্যানাদি) বুদ্ধির দ্বারা (তত্ত্বনিশ্চয়াদি) এবং কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও (শ্রবণকীর্ত্তনাদি) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎস্বরূপে আমাকে অবগত হইয়া জীব শান্তি (মুক্তি) লাভ করে। অপিচ ষষ্ঠাধ্যায়ে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

কর্ম্মফলের কামনাকে আশ্রয় না করিয়া কেবল কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে যিনি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই একাধারে যোগী এবং সন্ন্যাসী। কি নিরগ্নি, কি নিষ্ক্রিয়, কেহই তাঁহার ন্যায় যোগী বা সন্ন্যাসী নহেন।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, পাণ্ডব! তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জান। কারণ, প্রথমতই সঙ্কল্পের (কামনার) সন্ন্যাস (ত্যাগ) না করিলে কেহ যোগী হইতে পারেন না।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যোগ-পদবীতে আরোহণের ইচ্ছুক মোক্ষাভিলাষী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার যোগাবলম্বনের কারণ। এইরূপে যোগপদবীতে আরূঢ় হইলে তখন কর্ম্মের উপশমই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের কারণ হয় (অনারূঢ় অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করাও যাহা, সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া শৈলশৃঙ্গে আরোহণের আশাও তাহাই)।

× × × × ×

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

এইরূপ কর্ম্মযোগী পুরুষ, তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ (সকাম উপাসকগণ) হইতেও শ্রেষ্ঠ। অতএব, অর্জ্জুন! তুমিও সেই কর্ম্মযোগের অনুসরণ কর।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

এইরূপ সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যিনি আবার শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গত-হৃদয়ে কেবল আমাকেই ভজনা করেন, আমি তাঁহাকেই যুক্ততম (সমস্ত যোগিশ্রেষ্ঠ) বলিয়া মনে করি। অষ্টমাধ্যায়ে—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে নিয়ত স্মরণ করে, পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি নিত্য-সুলভ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

নিত্যানন্দস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ আর পুনর্ব্বার এই অনিত্য এবং দুঃখময় জন্ম যাতায়াত ভোগ করেন না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকমণ্ডলের অধিবাসী জীববর্গই জন্ম-জন্মান্তরে পুনরাবর্ত্তনশীল। কৌন্তেয়! কেবল আমাতে উপগত হইলেই জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। নবমাধ্যায়ে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভক্তিপূর্ব্বক যিনি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল যাহা অর্পণ করেন, আমি সংযতাত্মা ভক্তের ভক্তিদত্ত সেই উপহারই গ্রহণ করিয়া থাকি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

কৌন্তেয়! তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

এইরূপ অনুষ্ঠানে শুভাশুভ উভয় ফলের কারণ কর্ম্মবন্ধন হইতে তুমি মুক্ত হইবে এবং সন্ন্যাসযোগে যুক্তাত্মা ও বিমুক্ত হইয়া আমাকে স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হইবে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই, যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন তাঁহারা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন। যেহেতু, আমি তাঁহাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অতি দুরাচার পুরুষও যদি অনন্যশরণ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকেও সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যেহেতু তাহার অধ্যবসায় অতি সাধু।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

সেই ব্যবসিত পুরুষ দুরাচার হইলেও আমার ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং শাশ্বতী শান্তিকে লাভ করে। কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞায় (এই সত্যে) নির্ভর রাখ যে, আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

পার্থ! স্ত্রীজাতি হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক এবং তদপেক্ষা পাপযোনিই বা হউক, আমাকে আশ্রয় করিলে তাহারাও পরমাগতি লাভ করে। পুণ্যযোনি ভক্ত ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষিগণ যে মুক্ত হইবেন, তাহার আবার বলিবার অপেক্ষা কি?

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

এই দুঃখাবহ অনিত্য মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া (এখনও সময় থাকিতে এ জন্ম সার্থক করিবার জন্য) আমাকে ভজন কর। আমাতে অন্তঃকরণ অর্পিত করিয়া আমার ভক্ত হইয়া আমার উপাসক হইয়া আমাতে প্রণত হও। এইরূপে মৎপরায়ণ হইলে আমাতে মনঃসমাধান করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাদশাধ্যায়ে, অর্জ্জুন বাক্য—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥

যে সকল ভক্তগণ সতত-যুক্ত হইয়া এইরূপ সাকার সগুণরূপে তোমাকে উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) রূপে তোমার উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ?

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

যে সমস্ত নিত্যযুক্ত ভক্ত আমাতে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক পরমশ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

ইন্দ্রিয়বর্গসংযমপূর্ব্বক যে সকল সর্ব্বত্রসমবুদ্ধি সর্ব্বভূতহিতব্রত জ্ঞানিগণ আমার ধ্রুব অচল কূটস্থ চিন্তাতীত অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর বিশ্বব্যাপী স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

আমার সেই অব্যক্তস্বরূপের উপাসনার জন্য যাঁহাদিগের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের ক্লেশ অধিকতর; যেহেতু দেহধারী জীবের পক্ষে আমার অব্যক্ত-স্বরূপের লাভ নিতান্ত দুঃখসাধ্য।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

যাঁহারা সমস্ত কর্ম্মের ফল আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে আমাকেই ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, পার্থ! আমাতে সন্নিবেশিতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

আমাতেই মনঃসমাধান কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলেই অতঃপর আমাতেই (আমার ব্রহ্মস্বরূপেই) অবস্থিতি করিবে।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

যদি চিত্তকে স্থিরতরভাবে আমাতে (এই বর্ত্তমান ব্যক্তরূপে) সমাধান করিতে সমর্থ না হও, ধনঞ্জয়! তাহা হইলে অভ্যাসযোগদ্বারা চিত্তসমাধান করিয়াও আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

চিত্তসমাধানের নিমিত্ত অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানপরায়ণ হও। আমার উদ্দেশে কর্ম্মের আচরণ করিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥

আমার ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া এইরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে আত্মসংযমপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ কর।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্‌ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ-স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলের কামনাত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপে ফলত্যাগের অনন্তরই জীব শান্তি (মুক্তি) লাভ করে। অষ্টাদশাধ্যায়ে—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

দেহধারী হইয়া জীব কখনও সর্ব্বথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না; অতএব, যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই কর্ম্মত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়েন।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥

যাহারা কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ না করে, তাহাদিগের কর্ম্ম লোকান্তরে ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফল প্রসব করে। অনিষ্ট ফল নরকবাস, ইষ্ট ফল স্বর্গবাস, ইষ্টানিষ্ট উভয়ের মিশ্রিত ফল মনুষ্যলোকে বাস। কর্ম্মফলত্যাগী ভগবদুপাসক ইহার কোন ফলই ভোগ করেন না। অতএব পাপকার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, এজন্য নরকবাস অসম্ভব; পুণ্যফলও ভগবচ্চরণে তিনি অর্পণ করেন, সুতরাং তাহার ফল স্বর্গাদিও তাঁহার নাই; পাপপুণ্য উভয়ের অভাবে মিশ্রিত ফল পৃথিবীবাস ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই।

* * * *

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥

আমি স্বরূপতঃ যাবৎ (বিশ্বব্যাপী) এবং যাহা (সচ্চিদানন্দঘন) কেবল ভক্তিবলেই জীব তাহা সম্যক্‌ অবগত হইতে পারে। এইরূপে আমার তত্ত্বজ্ঞ হইয়া জীব আমাতে প্রবেশ করে।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥

একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে আমার প্রসাদে জীব অব্যয় শাশ্বত পদ লাভ করে।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥

অন্তঃকরণ দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া বুদ্ধিযোগের অবলম্বনে তুমি আমাতেই সমাহিতচিত্ত হও।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥

আমাতে সমাহিতচিত্ত হইলে আমার প্রসাদে তুমি সমস্ত দুর্গ (দুস্তর সাংসারিক দুঃখ) হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কার-বশবর্ত্তী হইয়া আমার এ উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট (সমস্ত পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট) হইবে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥

যেহেতু অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই তুমি মনে করিতেছ—আমি যুদ্ধ করিব না। তোমার এই ব্যবসায় ব্যর্থ হইবে। কারণ, স্বয়ং প্রকৃতি তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আরম্ভক রজস্তমোগুণ স্বভাবের সাহায্যে তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥

কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বাভাবিক কর্ম্মসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে তাহা করিতে হইবে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

অর্জ্জুন! যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে নিজ মায়াসূত্রে ভ্রামিত করিয়া ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

ভারত! সর্ব্বতোভাবে তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহারই প্রসাদে পরমা শান্তি এবং তাঁহার শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হইবে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যতর এই জ্ঞানতত্ত্ব তোমার নিকটে আমি কীর্ত্তন করিলাম, অশেষ প্রকারে ইহার বিবেচনাপূর্ব্বক তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম এবং আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আবার শ্রবণ কর। তুমি নিতান্ত প্রিয়তম বলিয়াই তোমার হিতকামনায় পুনর্ব্বার বলিতেছি।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

তুমি মন্মনাঃ (আমাতে সমাহিতচিত্ত) হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রিয় বলিয়াই সত্যপূর্ব্বক আমি তোমার নিকটে ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বাপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও অর্থাৎ গুণানুযায়ী অধিকারবিধায়ক শাস্ত্রের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার দাস হও। এইরূপে কর্ম্মত্যাগজন্য যদি কোন পাপের আশঙ্কা কর তাহা হইলে পাপ পুণ্যের একমাত্র ফলবিধাতা আমি তোমাকে বলিতেছি—তোমার যত কেন পাপ হউক না, সমস্ত পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব; তজ্জন্য দুঃখিত হইও না।

সাধকবর্গ এক্ষণে দেখিয়া লইবেন—গীতায় ভগবান্ কর্ম্মত্যাগের অনুমতি করিয়াছেন, কি কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবানের ধার ধারেন না, অথচ ভগবদ্গীতা বলিতে যাঁহারা ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন সেই সকল ভক্তিভানকারী ভাবুকদল গীতা পড়িয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত বা দুঃখিত নই। দুঃখ এই যে, যাঁহারা এই গীতার বক্তাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া উপাসনা করেন এবং তাঁহার শ্রীমুখনির্গত বাক্যপরম্পরা বলিয়াই গীতাকে ভগবদ্গীতা বলিয়া থাকেন তাঁহারাই বলেন কি না কর্ম্মকাণ্ড, 'বিষের ভাণ্ড'। কাহার সাধ্য এ রহস্য ভেদ করিতে পারে? ফল পরিপুষ্ট হইলে ফুল তখন আপনিই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, এই দেখিয়া ফুলের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া ফুল ফুটিতেই যাঁহারা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত তাঁহাদিগের উৎকট আকাঙ্ক্ষারও যেমন প্রশংসা, অসহিষ্ণুতা সত্বরতারও তেমনই বাহাদুরী। কেমন একটা উপাধিরোগে সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারি না; সকল বিভাগেই সর্বোচ্চ উপাধির জন্য একটা বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত। দেবতার উপাসনা করিব, তাহার মধ্যেও প্রধান উপাধিধারী

হইব। কোন বিভাগে ছোট হইব না, উনবিংশ শতাব্দীর এই এক দুরন্তদানবীবৃত্তি উপসনারাজ্যের সাত্ত্বিকবৃত্তিকেও পরাভূত করিয়া নিজ অধিকার সংস্থাপনে উদ্যত। জানি না, ত্রিপুরান্তক বৈদ্যনাথ কতদিনে এ রোগযন্ত্রণা হইতে সমাজকে মুক্ত করিবেন। এ উপাধির পরীক্ষা যদি মহাবিদ্যার সাধনালয়ে না হইয়া অন্য বিদ্যালয়ে হইত তাহা হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিকারী বিদ্বর্গকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে কৈলাসে এতদিন তাহার স্থান সঙ্কুলন হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু রক্ষা এই যে, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী স্বয়ং ভগবান্ ভূতভাবন এ পরীক্ষার পরীক্ষক, তিনি তাঁহার দাসত্বের উপাধি না দিলে কাহার সাধ্য এ জগতে উপাধির দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে? এ উপাধিরোগ আছে বলিয়াই সে উপাধি ঘটিতেছে না, এ উপাধি না ছাড়িলে সে উপাধি পাইবার নহে; অথবা সে উপাধি না পাইলেও এ উপাধি ছাড়িবার নহে। তাঁহার নিকটে উপাধি লইয়া যদি অন্য কাহারও কার্য্যক্ষেত্রে অন্য কোন বিভাগে যাইবার উপায় থাকিত তাহা হইলেও এ সকল জাল উপাধি একদিন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার কথা ছিল; কিন্তু ভক্ত-উপাধিপ্রিয় ভাক্ত ভাই! এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল সেই অনন্ত চরাচরের একমাত্র অধীশ্বরী রাজরাজেশ্বরীর কর্ম্মভূমি, ইহার কোথায় গিয়া তুমি সেই অনন্তলোচনার অনন্তসন্ধানময়ী দৃষ্টির অন্তরালে দাঁড়াইবে? তাঁহার যে মায়াজালে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিয়ত আবদ্ধ, সেই মায়াজালে তোমার জাল উপাধি ধরা পড়িবে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? তাই বলি, জালের মধ্যে জাল সৃষ্টি করিয়া আর এ জঞ্জাল বৃদ্ধি করা কেন? আপনবলে এ জালের কর্ম্মসূত্র যে ছিঁড়িতে যায়, সে জানে না যে, জালের মধ্যেও ছিদ্র কেবল জল ছাড়াইয়া তাহাকে উঠাইবার জন্য বই তাহাকে জালের বাহির করিয়া দিবার জন্য নহে। তত্ত্বজ্ঞানের পথ পরিষ্কার না হইলে মধ্যে মধ্যে সংসারে বা কর্মকাণ্ডে যে বিরক্তি উপস্থিত হয় তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে, ও বিরক্তি কেবল অনুরক্তি বা আসক্তিরই রূপান্তর মাত্র। তাই সে বিরক্তি দেখিয়া যে মূর্খ সংসার বা কর্মকে ত্যাগ করিতে চায়, সে কেবল জালের সূত্রমধ্যে অর্দ্ধনির্গত অর্দ্ধ-আবদ্ধ হইয়া অসহ্য যাতনায় প্রাণ হারায়। সে যে না থাকে জালে, না যায় জলে—একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া অকালে কাল-কবলের অধীন হয়। তাই জাল ছিঁড়িবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া জালের মধ্যে জল আছে, তাহাতেই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য! জলময়ীর প্রসাদে যদি গভীর জলে ডুবিবার বল পাও, ব্রহ্মময়ীর অগাধ অনন্ত সত্তাসাগরে ডুবিতে যদি অধিকার জন্মে, তবে এ জালের সূত্রধর স্বয়ং মহেশ্বর আপনিই তখন জালের মূলবন্ধন খুলিয়া দিবেন, সংসার মমতাবন্ধন দূরে সরিয়া পড়িবে, জীবন্মুক্ত জীব তখন উন্মুক্ত পথ পাইয়া 'জয় জয় জয় তারা' রবে উল্লম্ফনে জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া জগদম্বার সত্তাসাগরে

ডুবিয়া পড়িবে। অসময়ে সে উল্লম্ফন দেওয়া কেবল নির্ঘাতরূপে পুনঃ পতনেরই পূর্ব্বলক্ষণ। উপস্থিত কর্ম্মকাণ্ড-পরিত্যাগও সেই লক্ষণেরই লক্ষণ বিশেষ। কর্ম্মত্যাগ যদি কেবল মুখের কথা না হইয়া কার্য্যের কথা হইত তাহা হইলে আর কর্ম্মত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ লইয়া এত পরামর্শ করিতে হইত না। মৃত্যু যেমন কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করেন না, মুক্তিও তদ্রূপ কোন সমালোচনার অপেক্ষা করেন না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবের দেহে নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বতঃ প্রবাহিত। উদ্বন্ধনের সাহায্যে প্রকৃতির সেই নিত্যনিয়মিত কার্য্যে বাধা দিয়া যে বুদ্ধিমান্ কর্ম্মত্যাগের চেষ্টা করেন, তাঁহার কর্ম্মত্যাগ ঘটুক বা না ঘটুক, দেহত্যাগ ত পূর্ব্বেই ঘটে ; তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মে গুণবিভাগ অনুসারে নিয়মিত নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিবার জন্য যাঁহারা নিয়মিত লালায়িত, তাঁহাদেরও কর্ম্মত্যাগ ঘটুক বা না ঘটুক, ধর্ম্মত্যাগ ত পূর্ব্বেই ঘটে। আজকাল কর্ম্মত্যাগের নাম শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয় যে—কর্ম্মত্যাগ বলিতে সন্ধ্যাবন্দন, নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি এই সকলেরই ত্যাগ বুঝিতে হইবে, তভিন্ন স্ত্রী পুত্র-পরিপোষণ আয় ব্যয় আহার বিহার ইত্যাদি যাহা কিছু, ইহা পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ একতঃ, উহা 'তৎপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ'—দ্বিতীয়তঃ 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' জ্ঞানী হইলে তাহাকে কি সংসার কখনও আবদ্ধ করিতে পারে? যথা—জনক প্রভৃতি। জনকের এই আদর্শ লইয়া আজকাল ধর্ম্মবিপ্লবের রঙ্গভূমি বঙ্গভূমি অনেক রাজর্ষি দেবর্ষি উপর্ষি প্রসব করিতেছেন। মহর্ষি জনক 'জনক' নামে বিখ্যাত হইলেও তিনি কখনও স্বয়ং নিজনাম সার্থক করেন নাই, তাই তাঁহার জনক নাম সার্থক করিবার জন্য ভক্তবৎসলা জগজ্জননী স্বয়ং তাঁহার নন্দিনী হইয়া ভক্তগৌরবগৌরবিত সাধের 'জানকী' নাম ধারণ করিয়া তাহা জগদ্বিখ্যাত করিলেন। কিন্তু এখনকার জনকদলকে সার্থক করিবার জন্য আর জগদম্বার আবির্ভাবের প্রয়োজন নাই, বরং তিরোভাবেরই আবশ্যক হইয়াছে। ইঁহারা ধর্ম্মবীর হইয়া দারপরিগ্রহ-পরাঙ্মুখ জনকের ন্যায় কাপুরুষতা দেখাইতে চাহেন না। ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া সংসারকে দেখিয়া ভয় কেন? তাই জনকের অপেক্ষা ইঁহাদিগের জনকত্ব রাজর্ষিত্ব কোন অংশেই ন্যূন নহে, অনেকাংশেই সমধিক ; তাহাতে আমরা সুখী বই দুঃখী নই—দুঃখ কেবল এই যে, রাজর্ষি জনকের আর একটি নাম ছিল 'বিদেহ', যাহার জন্য মা জানকীরও নামান্তর 'বৈদেহী' ; ইঁহারা কতদিনে সেই নামের অধিকারী হইবেন, আমরা কতদিনে আবার কলিযুগে বসিয়া ত্রেতাযুগের সেই রাজর্ষি জনক বিদেহের পূর্ণ পরিচয় পাইব। জানিনা কতদিনে ইঁহারা ধরাধামে বি-দেহ হইয়া ধরাভার লাঘব করিবেন।

জনকের আদর্শ লইয়া কনক কান্তা পরিহার করিবার কোন কথা থাক্ বা না থাক্, ভোগ করিবারও ত কোন কথা নাই। আর সে জনকও ত সন্ধ্যাবন্দন উপাসনাদি নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই, বরং যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানই করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষাদি কর্ম্মও যেমন তাঁহার অহঙ্কারমূলক নহে, সন্ধ্যাবন্দন উপাসনাদিও তাঁহার তদ্রূপ অহঙ্কারমূলক নহে। রাজর্ষির ত এই কথা, আর আজকালকার উপর্ষিদল আর কিছু ত্যাগ করুন বা না করুন, পূজা পাঠের সময় হইলেই নির্ম্মুক্ত সন্ন্যাসী। কেন ভাই! স্ত্রী-পুত্র-পরিবার অপেক্ষা দেবতাকে কি তুমি এতই ভালবাস যে, মুক্তির সময়ে তোমার সকল বন্ধন ছুটিয়া যাইবে, আর উপাসনার বন্ধনেই ঘটিতপ্রায় মুক্তি তোমার বিঘটিত হইয়া যাইবে? সাংসারিক সমস্ত কর্ম্মে যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তীব্রদৃষ্টি, সেই কি না জ্ঞানাভিমানে অন্ধ হইয়া কর্ম্ম বলিয়া সন্ধ্যাবন্দন পূজা পাঠ পরিত্যাগ করিতে যায়—ইহা কি নাস্তিকতার বিকট আস্পর্দ্ধা নহে? ফলকথা ধর্ম্মের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ সহজ ব্যাপার নহে। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ বলিয়াছেন, 'করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ'—অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তোমাকে তাহা করিতে হইবেই হইবে। প্রকৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হইয়া আমাকে যে কর্ম্মের দাসত্ব করিতে হইবেই হইবে, কিছুতেই আমার যে কর্ম্মের কর্কশ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, সেই কর্ম্মের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আমি তাহার অভয়হস্ত হইতে বঞ্চিত হইব কেন? অবনতমস্তকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতাম, যদি কর্ম্ম আমায় পরিত্যাগ করিত। কর্ম্মের জন্যই কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মিয়াছি, এ জীবনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমি কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব না, তবে কর্ম্ম যদি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার জন্যও দুঃখিত হইব না। আমার কর্ম্ম করিতে আমার সম্পূর্ণ ভয়, কিন্তু মা আমার অভয়া, মায়ের কর্ম্ম করিতে আমার কিসের ভয়? আমি যে আর আমার নাই—আমার কিসের কর্ম্ম ভাই! আমি যাঁর কর্ম্মও তাঁর, আমি মার, মা আমার! কর্ম্ম বলিয়া আমার নিকটে কর্ম্মের গৌরব নাই—মায়ের কর্ম্ম, তাই আমার এত কর্ম্মের গৌরব! মায়ে পোয়ে সম্বন্ধ আমার যতদিন না ঘুচিতেছে, কর্ম্মের এ আনন্দ আমার ততদিন ফুরাইবার নহে। ধন্য আমার জন্ম জীবন যে, কর্ম্মভূমি ভারতে জন্মিয়া আমি আজ মায়ের কর্ম্ম-খড়্গ দিয়া আমার কর্ম্মপাশ কাটিতে বসিয়াছি—ধন্য মায়ের অপার করুণা যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁহার অনুমোদিত কর্ম্মে কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়, সেই চিন্তাতীতা তত্ত্বময়ী করুণাময়ী মা আমার, আমার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার উপাসনাময় স্নেহময় প্রেমময় কর্ম্মের আজ্ঞা নিজমুখে প্রদান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা জীবের সৌভাগ্য জগতে আর কি হইতে পারে? এই স্বতঃসিদ্ধ সৌভাগ্য হইতে জগতে যে বঞ্চিত হয়, তাহার মত দুর্ভাগ্য জীব কে আছে তাহা জানি না। জগদম্বে! রক্ষা কর মা! শতকোটি জন্মজন্মান্তর, ঘোর

নরকে অতিবাহিত করি, সেও শ্লাঘ্য, তথাপি মা! তোমার স্নেহময় উপাসনার অধিকার হইতে যেন কখনও বঞ্চিত না হই। মা! তোমার ব্রহ্মাদিদেবদুর্ল্লভ তত্ত্বচিন্তামণি মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ত্রৈলোক্য-সৃষ্টিস্থিতি-সংহারভূমি মহাযন্ত্রের তত্ত্ব-সাধনায় শিক্ষিত হইয়া মাগো। তুমি মা থাকিতে যেন মা-হারা না হই। মায়ের কর্ম্ম করিব না, তবে আসিয়াছি কিসের জন্য, তুমিই মা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া কৃতার্থ কর।

মা! আমার এ আনন্দ আজ আর ধরায় ধরে না যে, জীব হইয়া আজ আমি শিবের মুখে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি। ধরাধরকুমারি! মা! তুমি আনন্দময়ী, আজ তোমার আনন্দ তুমিই ধর, সদানন্দের বাক্য রক্ষা করিতে সেই সঙ্গে এ নিরানন্দ সন্তানকে তোমার আনন্দ-অঙ্কে উঠাইয়া লও। দীক্ষিত হইয়াছি, এখন শিক্ষিত হইবার উপায় কি, তাহাই বলিয়া দাও। শাস্ত্ররূপে তোমার আজ্ঞা তুমিই প্রচার করিয়াছ, একবার সাধনারূপে সে শাস্ত্রের কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া তোমার তত্ত্ব তুমিই বুঝাইয়া দাও। বল মা! শাস্ত্রে তুমি কি বলিয়াছ? তন্ত্র-সংহিতায়াং—

দ্বিবিধং স্যাল্লব্ধমনো র্ব্বাহ্যান্তরমুপাসনং :
ন্যাসিনাঞ্চান্তরং প্রোক্ত-মন্যেষামুভয়ং তথা ॥

লব্ধমন্ত্র (দীক্ষিত) ব্যক্তির বাহ্য ও অন্তর-ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কেবল অন্তঃপূজায় সন্ন্যাসিগণেরই অধিকার, তদ্‌ভিন্ন অন্য উপাসকগণের সম্বন্ধে অন্তঃপূজা ও বাহ্যপূজা উভয়ই বিহিত। গৌতমীয়তন্ত্রে—

অন্তর্যাগ ইতি প্রোক্তো জীবতো মুক্তিদায়কঃ।
মুনীনাঞ্চ মুমুক্ষূণা-মধিকারোঽত্র কেবলং ॥
অথবা মানসৈ দ্র'ব্যৈঃ প্রকটেনাপি পূজয়েৎ ॥

এই অন্তর্যাগ, জীবিত সাধকের পক্ষেও মুক্তিদায়ক; কিন্তু মুমুক্ষু মুনিগণেরই কেবল তাহাতে অধিকার। অতএব, পূর্ব্বোক্ত অন্তর্যাগে অসমর্থ সাধকগণ মনোময় দ্রব্যাদির দ্বারাও বাহ্যপূজার ন্যায় মানসপূজা সম্পন্ন করিবেন। রাঘবভট্টধৃত সংহিতায়াং শ্রীশিববাক্যম্—

ন গৃহী জ্ঞানমাত্রেণ পরত্রেহ চ মঙ্গলং।
প্রাপ্নোতি চন্দ্রবদনে দানহোমাদিভির্ব্বিনা ॥ ১ ॥
গৃহস্থো যদি দানাদি দদ্যান্ন জুহুয়াদপি।
পূজয়েদ্ বিধিনা নৈব কঃ কুর্য্যাদেতদন্বহম্ ॥ ২ ॥
ন ব্রহ্মচারিণো দাতু-মধিকারোঽস্তি ভাবিনি।
গুরুভ্যোঽপি চ সর্ব্বেভ্যঃ কো বা দাস্যত্যপেক্ষিতং।
নারণ্যবাসিনাং শক্তি র্ন তে সন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩ ॥

পরিব্রাড়্ জ্ঞানমাত্রেণ দানহোমাদিভি র্ব্বিনা।
সর্ব্বদুঃখপিশাচেভ্যো মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥ ৪ ॥
পরিব্রাড়বিরক্তশ্চ বিরক্তশ্চ গৃহী তথা।
কুম্ভীপাকে নিমজ্জেতে দ্বাবুভৌ কমলাননে ॥ ৫ ॥
পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো গৃহস্থাশ্চ মঙ্গলৈর্ম্মঙ্গলার্থিনঃ।
পূজোপকরণৈঃ কুর্য্যুর্দ্দদ্যা-দ্দানানি চার্হণাম্ ॥ ৬ ॥
বানপ্রস্থাশ্চ যতয়ো যদ্যেবং কুর্য্যুরন্বহং।
সংসারান্ন নিবর্ত্তন্তে বিধ্যন্তি ক্রমদোষতঃ ॥
আরূঢ়পতিতা হ্যেতে ভবেয়ু র্দুঃখভাজনম্ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রবদনে। দান হোমাদি কর্ম ব্যতিরেকে গৃহস্থ কখনও কেবল জ্ঞানবলে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গললাভে সমর্থ হয়েন না। ১ ॥ গৃহস্থও যদি দেয় বস্তু দান না করেন, হোম না করেন, বিধিপূর্ব্বক পূজার অনুষ্ঠান না করেন, তবে প্রত্যহ কে ইহা রক্ষা করিবে? ২ ॥ ভাবিনি! ব্রহ্মচারীর দানে অধিকার নাই (কারণ তিনি নিষ্কিঞ্চন), তবে আর গুরুবর্গকে সাধ্যানুসারে দানই বা কে করিবে? অরণ্যবাসিগণেরও দানের শক্তি নাই; বিশেষতঃ, কলিযুগে অরণ্যবাসের (বানপ্রস্থ আশ্রমের) অধিকারই নাই। ৩ ॥ অতএব, কেবল পরিব্রাজকই (সন্ন্যাসী) দানে হোমাদি ব্যতিরেকে জ্ঞানমাত্রের অবলম্বনে সর্ব্বদুঃখযাতনা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ, ইহার অন্যথা নহে। ৪ ॥ পরিব্রাজক হইয়া যে ব্যক্তি কর্মানুষ্ঠানে অবিরক্ত (বৈরাগ্যবিহীন) হয় এবং গৃহী হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্ত (বৈরাগ্যভানকারী) হয়, কমলাননে! ইহারা উভয়েই কুম্ভীপাক নরকে নিমগ্ন হয়। ৫ ॥ পবিত্রচরিত্রা কুলবধূগণ এবং মঙ্গলার্থী গৃহস্থগণ মঙ্গলময় পূজোপকরণ দ্বারা প্রত্যহ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন এবং দেব দ্বিজ ইত্যাদির উদ্দেশে দেয়বস্তু সমস্ত দান করিবেন। ৬ ॥ বানপ্রস্থ এবং যতিগণ যদি এইরূপে প্রত্যহ দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনও সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন না; অধিকন্তু ক্রমদোষে (উত্তরোত্তর বিষয়াসক্তি-দোষে) বিদ্ধ হয়েন। সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া যাহারা গৃহস্থের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত হয় তাহারা আরূঢ়-পতিত (ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া যাহারা নিম্নে পতিত হয়) হইয়া ইহ পরলোকে দুঃখেরই ভাজন হয়। ৭ ॥

বস্তুতঃ, আলস্যবশতঃ বাহ্য পূজাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ বা বিমুখ হইয়া বাহিরে তত্ত্বজ্ঞানের ভান করিয়া গৃহস্থ হইয়াও যাঁহারা বলেন, বাহ্যপূজার কোন প্রয়োজন নাই, উহা লৌকিক মাত্র, আমরা মানসপূজাই করিয়া থাকি; তাঁহাদিগের ঐরূপ সিদ্ধান্ত যে নিতান্তই শাস্ত্রবিগর্হিত এবং স্বেচ্ছানুমোদিত, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচন-পরম্পরাই সে পক্ষে প্রবল প্রমাণ। মানসপূজা মনের দ্বারাই করিতে হইবে, কিন্তু

সে মন যতদিন 'আমার' না হইতেছে, ততদিন আমি মানসপূজা করি কি দিয়া? 'আমার মন' না হইয়া 'মনের আমি' যতদিন আছি ততদিন আমার কেবল মানস-পূজায় অধিকার নাই, ইহা সত্য সত্য সত্য। আমার মনের কর্ত্তা হইয়া আমি যদি সে মনোময় পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে না পারিলাম, স্বাধীন হইয়া মনকে যদি আমি যথাস্থানে নিযুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে আমার সেই অনধিকারের মানসপূজায় মন যে আমার তাঁহার চরণ ভুলিয়া গিয়া সংসারের সুখচিন্তা না করিবে, ইহা কে বলিল? মানবের জীবন-ধারণের যাহা কিছু অমোঘ উপায় নির্দ্ধারিত আছে, দুগ্ধই তন্মধ্যে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; দধি ক্ষীর নবনীত ঘৃত ইত্যাদি যাহা কিছু পদার্থ, সমস্তই দুগ্ধেরই পরিণাম। এজন্য দুগ্ধ হইতে যাহা হয় তাহাই জগতে উপাদেয় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই দুগ্ধ যদি অম্ল বা কটুতিক্তাদি অন্য বস্তুর সংমিশ্রণে কোনরূপ দূষিত পর্য্যুষিত হয়, তবে তাহার পরিণাম যাহা ঘটে, তাহার অন্য পরীক্ষা দূরে থাক, ঘ্রাণ গ্রহণেও বমনের উদ্রেক হয়; আর সে বিকট ঘৃণার সংস্কার যেমন চিরস্থায়ী হয় তেমন আর কিছুই নহে। ইহার একমাত্র কারণ কেবল—দুগ্ধের সর্ব্বোত্তম উপাদেয়তা। দুগ্ধ যদি এত উত্তম না হইত তবে তাহার কুপরিণাম কখনই এত অধম হইত না। যেমন গুড়ের পরিণাম চিনি মিছরি মিষ্টান্ন হইলেও ততদূর পাক করিয়া না উঠিতে পারিলেও মিষ্টান্ন না হয় না-ই হইল, কিন্তু রস চিনি বা গুড় ত আমার ঠিক থাকিয়াই যাইবে। ছানার সন্দেশ না করিতে পারিলেও আম আমড়া কুলের সঙ্গে মিশাইলে অম্লও ত মিষ্ট হইবার কথা—সে মিষ্ট আবার এত মিষ্ট যে, মিষ্টান্নের স্মরণ করিলে অনুপস্থিত মিষ্টান্নের অভাব মাত্রেরই অনুভব হয়। কিন্তু ঐ গুড়মিশ্রিত অম্লের কথা প্রসঙ্গায়ত্ত মনে হইলেও জিহ্বায় জল আসে, তাই ভাষায় 'অম্ল-মধুর' বলিয়া একটি সঙ্কর রসের নামকরণ বা অবতারণা হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, গুড় দুগ্ধের ন্যায় সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। কেবল দুগ্ধপান করিয়া যিনি জীবন ধারণ করিতে চাহেন, ঘটনাক্রমে কোনদিন তাঁহার দুগ্ধের ঐ দুর্গতি ঘটিলে তাঁহার পক্ষে যেমন বিড়ম্বনার সম্ভাবনা, মিষ্টান্নভোজীর পক্ষে তেমন নহে; তদ্রূপ মানসপূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ কথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু যে মন দিয়া সেই মানসপূজা করিতে হইবে সেই মনই যদি দূষিত কলুষিত বা বিকারগ্রস্ত হয়, তবে আমি মানসপূজা করি কি দিয়া? মন দূষিত হইলে তাহা হইতে তখন যে দুর্গন্ধ ছুটিতে থাকে, তাহাতে দেবতা দূরে থাকুন মানুষেরও তথাতে দাঁড়ান কঠিন। দুগ্ধ হইতে নবনীত উঠাইয়া লইতে হইবে, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু সেই দুগ্ধই যদি আদৌ নষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি সে নবনীত উঠাই কোথা হইতে? যে নবনীত দুগ্ধে ছিল তাহা আমি অন্য পদার্থে মিশাইয়া যদি দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া থাকি, মনের যে আসক্তি-শক্তি ছিল তাহা

আমি সংসারে স্ত্রীপুত্রের মমতায় মিশাইয়া দিয়া এখন যদি সেই মন হইতে ভগবানে বা ভগবতীতে পরাভক্তি পাইবার চেষ্টা করি, তবে সে চেষ্টাও যে আমার ইহ-পরলোকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ঘোল খাইবারই চেষ্টা, ইহা ত নিঃসন্দিগ্ধ। তাই সেই সর্ব্বকামদুঘা সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বমঙ্গলা-সুরভিকে যতদিন নিজ হৃদয়মন্দির দ্বারে অবরুদ্ধ করিতে না পারিতেছি ততদিন কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া, দুগ্ধ গুড় মিষ্টান্ন যেদিন তিনি যাহা দেন তাহাতে নির্ভর রাখাই আমার জীবন রক্ষার উপায়। তুমি মহা অম্ল আম আমড়া দেও না কেন, আমি তাহাতে গৌণীভক্তির গুড় দিয়া এমন অম্ল পাক করিব যাহাতে ঘোর-অরুচিগ্রস্ত রোগীও সুরুচিসম্পন্ন হইয়া মিষ্টান্ন পায়স ভোজনেও সুপটু হইয়া উঠিবে—শত শত সন্ন্যাসী সাধু মহন্তেরও জিহ্বায় জল আসিবে। মূলে যদি আমার অরুচি রহিয়া গেল, তুমি তাহাতে দুগ্ধ পায়স মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া আমার কি করিবে? আমার মন যদি না নিশ্চল হয়, তবে তুমি সেই যোগীর আহার মানসপূজা সংসারযোগী—আমাকে উপদেশ দিয়া কি করিবে? অরুচি থাকিতে তুমি যাহা দিবে, তাহা ত আহার করিতে পারিবই না, অধিকন্তু অনাহারে জ্বলিয়া পুড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইব; তাই বৈদ্যনাথের চিকিৎসালয়ে তন্ত্রমন্ত্রে রোগীর আহার আর যোগীর আহার এক নহে। সন্ন্যাসীর কেবল মানস পূজাতেই অধিকার, আর আমি সংসারী, আমার পক্ষে মানসপূজা বাহ্যপূজা উভয়েরই নিত্যাধিকার। যাহাতে প্রথমতঃ আমার অরুচি সারে, তাহাই আমার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদেয়। দুধ দিতে হয় দাও, কিন্তু যতদিন অরুচি না সারে ততদিন কেবল দুধের উপর নির্ভর রাখিও না। আজ অম্লে আমি যে আনন্দ পাইব, দুধে আমার সে আনন্দ ঘটিবে না। বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠানে ধূপ দীপে মণ্ডপ আমোদিত আলোকিত করিয়া ঢাক ঢোল কাঁশর ঘণ্টার বাদ্যরোলে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া হৃদয়ের অন্তস্থলভেদী স্তোত্র-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 'জয় জয় মা। তারা' রবে প্রাণের তন্ত্রী বাজাইয়া আজ মাকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখিয়া আমি যে আনন্দ পাইব, ত্রিনয়নার নয়নতারায় এ দ্বিনয়নের তারা মিশাইয়া আমি ব্রহ্মাণ্ড যেমন তারাময় দেখিব—অনধিকারে কেবল মানসপূজা করিতে গিয়া আমার নয়নে তারা থাকিলেও আজ হৃদয়ে তারার অভাবে আমি সেই শতদীপসমুজ্জ্বল মণ্ডপে বসিয়াও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিব। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেখানে অন্তর্হিত, লক্ষকোটি চন্দ্র সূর্য্য একত্র হইলেও কি সেখানে আলোক দিতে পারে? আমার সেই অখণ্ড অনন্ত হৃদয়াকাশে ব্রহ্মময়ীর জ্যোতির পাশে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য খদ্যোতবৎ উদ্যোতিত হয় না, আবার তাঁহার অন্তর্দ্ধানে ইহারা প্রত্যেকে শতসহস্ররূপে সমুদিত হইয়াও সে অভাবের শতাংশের একাংশও পরিপূরণ করিতে পারে না। যতদিন আমার সে আকাশে নিত্যপূর্ণিমার

প্রতিষ্ঠা না হইতেছে, যতদিন সে নিষ্কলঙ্কসুধাময়ী মন্ত্রমণ্ডল-বিলাসিনী মা আমার এ হৃদয়-উদয়াচলে নিত্যকৌমুদী-হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ না করিতেছেন, যতদিন শুক্ল কৃষ্ণ উভয়পক্ষের উভয়কক্ষে আমি লুক্কায়িত, যতদিন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সাধনা, বাহিরে গার্হস্থ্য ও অন্তরে সন্ন্যাস, এই উভয় পথে উভয় গতি আমার রহিয়াছে, ততদিন এই ঘোর অমাবস্যার মহানিশাতে সেই চন্দ্রচূড়-মনোমোহিনী চন্দ্রমালা সন্দর্শন করিতে হইলেই বাহিরে চন্দ্রমণ্ডল উদিত করিয়া সে চন্দ্রের কৌমুদীমালায় বাহিরের অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া বাহিরের সেই প্রতিবিম্ব-কিরণ হইতেই অন্তরের বিম্ব-কিরণের কেন্দ্রপথ স্থির করিয়া লইতে হইবে। ভূমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল দুর্দ্ধর্ষ দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও প্রস্তরাদি পাত্রে জল রাখিয়া সেই জলের অন্তস্থল হইতে যেমন দৃষ্টির অবিরোধে সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যমণ্ডল লক্ষ্য হয়, তদ্রূপ বাহিরে যন্ত্র মন্ত্র প্রতিমা ইত্যাদি হইতেই তাঁহার সূক্ষ্ম স্বরূপবিভূতিতত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইবে। তাই বাহ্যপূজা-ব্যতীত গৃহীর কেবল মানসপূজা সিদ্ধ হইবার নহে বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সংসারধর্ম্ম কেবল মানুষপূজার সিদ্ধপীঠ, ইহার মধ্যে বসিয়া দেবতার মানসপূজা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। গোশালায় গোমূত্রের কর্দ্দমের মধ্যে অনাবৃত দুগ্ধ স্থির রাখাও যেমন কঠিন, সংসারে স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতার মধ্যে দেবতার প্রেমে মনকে মুগ্ধ রাখাও তেমনই কঠিন। তাই মন যতদিন আমার না হইতেছে ততদিন 'মানসপূজা, মানসপূজা' বলিয়া এ বৃথা চীৎকার কেবল অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে। অন্যের কথা দূরে থাক, সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তে শুনিয়াছি—দীক্ষার পর সাধনার প্রথমাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্য্যাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ নিভৃত পূজামন্দিরে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করিয়া পূজা ধ্যানাদিতে নিয়ত নিমগ্ন থাকিতেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী রাণী কাত্যায়নীর কনককঙ্কণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে একদা রাণীর করদ্বয় কঙ্কণহীন লক্ষ্য করিয়া রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাণীর উত্তরে অবগত হইলেন যে, কঙ্কণ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। পরদিবস তিনি যখন পূজানিরত, সেই সময়ে জনৈক জটাজূটবিমণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহার সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার-রক্ষকগণকে বলিলেন, তোমাদিগের মহারাজা কোথায়? তাঁহাকে গিয়া বল একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত। দ্বাররক্ষকগণ বিনম্রবচনে বলিল, প্রভো। মহারাজ এ সময়ে তাঁহার আহ্নিকের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাতে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই, কোন কথা বলিলেও তাহার উত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, আমি বলিতেছি—যাও। দ্বাররক্ষকগণ সন্ন্যাসীর আজ্ঞালঙ্ঘনভয়ে ভীত হইয়া আদেশের অনুরূপ কার্য্য করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। রাজা রামকৃষ্ণ সে সময়ে ইষ্টদেবতার মানসপূজায় নিমগ্ন ছিলেন,

সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা শুনিয়াও সে কথায় কোন উত্তর করিলেন না। দ্বাররক্ষকগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে যথাযথ নিবেদন করিল, সন্ন্যাসী ঈষদাকুঞ্চিতলোচনে হসিতবচনে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, পূজা সমাপন করিয়া মহারাজ বাহিরে আসিলে তাঁহাকে বলিও—রাণীর কঙ্কণচিন্তা আর ইষ্টদেবতার মানসপূজা এক নহে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দ্বাররক্ষকগণ এ কথার কোন অর্থও বুঝিতে পারিল না, স্বচ্ছন্দচারী মহাপুরুষের গমনেও বাধা দিতে সাহসী হইল না। অনন্তর রাজা রামকৃষ্ণ যথাসময়ে পূজাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বাররক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসী কোথায়? তাহারা সভয়ে সন্ন্যাসীর বাক্য ও প্রস্থান বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করিল। রাণীর কঙ্কণচিন্তা আর ইষ্টদেবতার মানসপূজা এক নহে, এ কথা আজ বিদ্যুচ্চকিতবৎ রাজার কর্ণপথ দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল, স্বকৃত অপরাধভয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র কাঁপিয়া উঠিল, আর্ত্তিগদগদ-ভীতিকম্পিতস্বরে, কোথায় সন্ন্যাসী?—বলিয়া রাজা আজ স্বয়ং রাজপথে ছুটিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী যথায় রাজা তথা হইতে এখনও অনেকদূরে, তাই সন্ন্যাসীর সন্ধান পাওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহাকে যে সন্ধান দিয়া গেলেন তাহাতে ইহার পর রাজার সন্ধান পাওয়াও সকলের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি কখন কোথায় কিভাবে কি অবস্থায় থাকেন, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা রহিল না। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই ধীরস্তিমিতলোচন, সর্ব্বদাই ধারাবাহিক-সমাধিস্রোতে নিমগ্নমূর্ত্তি—এই-ভাবেই তিন বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর পূর্ব্ব নিয়মানুসারে রাজা একদিন পূজাগৃহে পূজায় ব্যাপৃত আছেন, সেইদিন সেই সময়ে আবার সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। দ্বাররক্ষকগণ সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্র তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে রাজার পূজাগৃহ-দ্বারে লইয়া উপস্থিত করিল। রাজা সেদিনও তখন মায়ের মানসপূজায় ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বিশেষ সঙ্কটাপন্ন; রামকৃষ্ণ আজ মনোময় উপাচারে মনোময়ীর পূজায় ব্যাপৃত, রাজকুমার আজ উচ্চকিরীট-সংজুষ্ট মনোময়-মণিমুকুটে মুক্তকেশীর সীমন্ত সুশোভিত করিয়াছেন, তাহার পরেই ভক্তবৎসলার কম্বুকণ্ঠে রক্তজবার মনোময়মালা সাজাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, উভয় হস্তে মালা উদ্বেলিত করিয়া যতবার তাহা মায়ের কণ্ঠে দিতে চেষ্টা করিতেছেন, ততবারই উচ্চকিরীটের শিখরে ঠেকিয়া মালা ফিরিয়া আসিতেছে—বার বার এইরূপে উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া রাজা বড়ই বিষণ্ণ ও বিপন্ন হইয়া ভাবিতেছেন, বুঝি আজ আর মাকে মালা পরাইতে পারিলাম না। অপার দুঃখভরে বিশাল চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া বলিলেন, মা! আমি কি করিব? মন্দিরের বাহির হইতে উত্তর হইল, রামকৃষ্ণ! কাঁদ কেন? মুক্তকেশীর মস্তকে আজ মুকুট

দিয়াই ত এ বিপদ ঘটাইয়াছ, মুকুট উঠাইয়া মালা পরাও। মা রহিলেন, পূজা রহিল, রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া মন্দিরের কবাট খুলিলেন, কেবল বাহিরে মন্দিরের কবাট খুলিলেন, তাহা নহে—অন্তর্মন্দিরেরও কবাট খুলিলেন; চাহিয়া দেখিলেন—ভস্মভূষিততেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসিমূর্ত্তি মহাপুরুষ, চিনিলেন—জন্মান্তরের শ্মশানসাধনার বন্ধু সেই সিদ্ধ সাধক পূর্ণানন্দ গিরি; চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, দাদা! আজ আমার এই দশা। সেই যে তুমি লজ্জা দিয়া কৃপা করিয়া পালাইয়াছ, এ তিন বৎসর আমার কিভাবে গিয়াছে, তাহা মা জানেন আর তুমি জান। পূর্ণানন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নাই ভাই। আমি সেই পালাইয়াছিলাম বলিয়াই এই তিন বৎসর পরে আজ তোমার নিকটে আসিতে পারিলাম—তখন তুমি যাহা ছিলে তাহাতে আমার আসিবার সময় হয় নাই—একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, কোথায় সেই কঙ্কণচিন্তা আর কোথায় এই মালাসঙ্কট। মা তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়াই আমি তোমার জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আবার আসিয়াছি। এই ঘটনার পর হইতেই মহারাজ রামকৃষ্ণ মহারাণী কাত্যায়নীর সহিত ভৈরবভৈরবী যুগলমূর্ত্তিতে আত্রেয়ী-তীরে (বকৃসরে) মহাশ্মশানসাধনায় পূর্ণানন্দ গিরির সহচারী হইলেন।[১]

সাধক এখন একবার মনে করুন, মহারাজ রামকৃষ্ণের ন্যায় সৌভাগ্যশালী সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ এ সংসারে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন? পূর্ণানন্দ গিরির ন্যায় জন্মান্তরের উত্তরসাধক এ জগতে কয়জনকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন? সম্রাট হইয়া বিপুল রাজৈশ্বর্য্য-ভোগবাসনার মধ্য হইতে কয়জন ধর্ম্মবীর এরূপ শ্মশান-সন্ন্যাসী সাজিতে সমর্থ? মৃত্যুকালে অভিন্ন গুরুমূর্ত্তিতে জগদম্বা কয়জন সাধককে সেরূপ দর্শন দিয়া থাকেন? সাধনার প্রথমাধিকারে সেই জন্মান্তরসঞ্চিত-সাধনসম্পত্তি এ হেন রামকৃষ্ণেরও যে মানসপূজায় মাকে ভুলিয়া স্ত্রীর কঙ্কণচিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই মানসপূজায় আজ বিষয়কীট তুমি আমি পূর্ণ অধিকারী, এ কথা মনে করিতেও কি লজ্জা হয় না? পূর্ণানন্দ গিরি আসিয়া রামকৃষ্ণকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার আমার জন্য পূর্ণানন্দ গিরিকে আসিতে হইবে না—সংসারের এ নিরানন্দ গিরির চাপে পড়িয়াও কি তাহা স্মরণ হয় না? মানসপূজায় রমেকৃষ্ণের যতদিন পূর্ণাধিকার না হইয়াছিল ততদিনই তাঁহার সংসারসম্বন্ধ ছিল, তাহার পর পূর্ণানন্দময়ীর কৃপায় পূর্ণানন্দকে পাইয়া যখন তাঁহার সে অধিকার জন্মিল তখন হইতেই তাঁহার সংসারসম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। রাণীকে ছাড়িয়া, কঙ্কণকে ছাড়িয়া, তাঁহার মন যেদিন তাঁহার রহিল, সেইদিন হইতেই তাঁহার সে সুপ্রশস্ত মনঃপ্রাঙ্গণে মনোময়ী

১ মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তে ইহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসকল, সময়ে মা সর্ব্বমঙ্গলার প্রসাদে সাধক সাধিকাবর্গের সমীপে উপহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

রণরঙ্গিনীর উল্লাসতরঙ্গ-নৃত্যের আরম্ভ হইল, তাই তাঁহার মনোময় জবার মালা মায়ের মুকুটে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিতে পার! তোমার আমার মানস-পূজায় কখন কোন একদিনও এমন কোন একটি ঘটনাও কি ঘটিয়াছে? মায়ের সর্ব্বাঙ্গ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে আনিয়া একাধিক্রমে আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় পর্য্যন্ত দান করিয়া তাহার পরে জগজ্জননীকে স্নান করাইয়া বসন ভূষণ সাজাইবার সময়ে এ মুকুটমালাবিভ্রাট। বিষয়াসক্ত জীবের চিত্ত এতক্ষণও কি স্থির থাকে? এতক্ষণ স্থির থাকা দূরে থাক, যতক্ষণ এ কথাগুলি বলিতেছি, এতক্ষণও কি স্থির থাকে? হরি! হরি! উন্মেষে নিমেষে যে মন দণ্ডে দশবার সুমেরু হইতে কুমেরু যাত্রা করে, সেই মনকে সহায় করিয়া তোমার আমার এই বৈকুণ্ঠ-কৈলাস-বৃন্দাবন-যাত্রা! তোমায় আমায় পথে ফেলিয়া মন যাইবে মনের দেশে, আমার না ঘটিল গৃহবাস, না ঘটিল সন্ন্যাস, না ঘটিল বৈকুণ্ঠ, না ঘটিল কৈলাস। মন হারাইয়া প্রাণ লইয়া তখন যে গৃহবাস, সেও এক সর্ব্বনাশ —তাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—সমস্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তখন অর্দ্ধেক ত্যাগ করিলেও যদি অর্দ্ধেক রক্ষা পায় তবে তাহাই শ্রেয়ঃকল্প। তাই শাস্ত্র তোমার আমার এই সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াই অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ, মানসপূজা ও বাহ্যপূজা উভয়েরই আদেশ করিয়াছেন। অসাধিত অশোধিত মনের প্রতি নির্ভর করিয়া যে কেবল-মানসপূজা করিতে যায়, মনের কল্যাণে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেই সময়ে মনের অর্দ্ধেক বাদ দিয়াও যদি বাহ্যপূজার অর্দ্ধেক রক্ষা পায়, তবে সেই আমার যথেষ্ট লাভ—তাই নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সকলেরই অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বিশেষতঃ গৃহস্থের ত তাহা না করিলে সর্ব্বনাশই ঘটিবে; কারণ, বিবেক বৈরাগ্যসাধনার বলে সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ কোন না কোন একদিন বিষয়বাসনাকষায় পরিহার বলিয়া নির্ম্মল বিধৌত স্বচ্ছ সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সাধনাবলে করুণাময়ীর নিতান্ত করুণা না ঘটিলে নিরন্তর স্ত্রীপুত্রাদি-স্নেহপাশ-বিজড়িত জড়জীব গৃহস্থের পক্ষে সে আশা সুদূরপরাহত। ভগবান্ ভূতভাবন গন্ধর্ব্বতন্ত্রেও অন্তর্যাগের পরে তাহা বিস্পষ্টরূপে আজ্ঞা করিয়াছেন—

ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ
এবমেব মহেশানি পূজয়াম্যহমীশ্বরীম্ ॥
যোগিনো মুনয়শ্চৈব পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে।
কেবলং মানসেনৈব নৈব সিদ্ধো ভবেদ্ গৃহী।
সবাহ্যেন তু তন্ত্রেণ সিদ্ধো ভবতি তদ্ গৃহী ॥

মহেশ্বরি! এইরূপে অন্তর্যাগ করিয়া সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়েন, আমিও এইরূপেই ঈশ্বরীর পূজা করিয়া থাকি, যোগিগণ এবং মুনিগণও এইরূপেই নিয়ত পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু কেবল এই অন্তর্যাগে গৃহী কখনও সিদ্ধ হইতে পারেন না, বহির্যাগের সহিত অন্তর্যাগের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহী সিদ্ধ হইয়া থাকেন।

এক্ষণে সাধক একবার মনে করিবেন, যেখানে স্বয়ং মহেশ্বর বলিতেছেন—আমি এইরূপে তাঁহার পূজা করিয়া থাকি এবং যোগিগণ মুনিগণও সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। শিবরূপেই হউক অথবা শক্তিরূপেই হউক তিনি তাঁহার নিজের পূজা নিজে করেন, সে সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই; কিন্তু যোগিগণ মুনিগণের পূজাস্থলেই বলিতেছেন, 'পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে'—যোগিগণ মুনিগণ পূজা করেন তাহাও 'সদা' অর্থাৎ নিয়ত অনুষ্ঠানের অভ্যাস না থাকিলে পাছে অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয়েন এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগেরও 'সদা'। এখন বল, মানসপূজক! যে পূজায় স্বয়ং মহেশ্বর নিজে নিজ পূজার পূর্ণ অধিকারী, যে পূজায় যোগী ঋষিগণের অধিকার থাকিলেও ভয়ে ভয়ে 'সদা' প্রয়োগ, সেই সদা-পূজায় আজ যদা-কদা-তদা-পূজক তুমি আমি অধিকারী, ইহা কি উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ নহে? গৃহস্থের যদি বাহ্যকর্ম্মের কোন সংশ্রবই না থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্র কখনও তাঁহাকে এরূপ কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ করিতেন না, আমরাও গৃহস্থের জন্য এত পুঙ্খানুপুঙ্খ তীব্র অনুসন্ধান করিতাম না। গৃহস্থ! তুমি অনায়াসে তোমাকে বাহ্যকর্ম্মবিরহিত বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু যতদিন তোমার গৃহস্থ নাম রহিয়াছে ততদিন আমি তাহা বিশ্বাস করি কিরূপে? বাহ্যব্যাপার লইয়াই সংসার, সেই সংসারের স্থিতিধর্ম্মই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম লইয়া যাঁহার গৃহস্থ উপাধি, বাহ্যকর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? তবে সেই নিঃসঙ্গ বিবেক বৈরাগ্য যাঁহাদিগের উপস্থিত হইয়াছে, গীতায় ভগবান্ যাঁহাদিগকে কর্ম্মযোগী বা যুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাদৃশ অন্তরে অভিমানশূন্য বাহিরে কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী মহাপুরুষগণকে আমরা অনাসক্ত বা নির্লিপ্ত বলিতে পারি, কিন্তু তথাপি কর্ম্মসম্বন্ধবিরহিত বলিতে পারি না। যদি কর্ম্মসম্বন্ধ-বিরহিতই হইবেন, তবে আর তাঁহার কর্ম্মে আসক্তির সম্ভাবনাই বা কি ছিল, যাহাতে তাঁহাকে অনাসক্ত বলিতে পারি! যোগীর অধিকাংশ মানসিক বৃত্তিই মনোময় উপকরণে চরিতার্থ হইয়া থাকে, তিনি কেবল মানসপূজার অধিকারী হইতে পারেন; আমি বিষয়ী, আমার মনোবৃত্তি বাহ্য বিষয় সকল লইয়া নিত্য চরিতার্থ, তাই কেবল-মানসপূজায় আমার অধিকার অসম্ভব। একদিন বাহ্যস্নান না করিলে গ্রীষ্মের জ্বালায় শরীর আমার ছটফট করিতে থাকে, একদিন আহার না করিলে এ ভৌতিকদেহ অবসন্ন হইয়া

পড়ে। একদিন রাত্রিজাগরণ করিলে পরদিন উত্থানশক্তি থাকে না, এই সকল কারণে কেবল দৈহিক অস্বাস্থ্য ঘটে তাহা নহে, মনোবৃত্তিও অবসন্ন অধীর ও অভিভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় বাহ্যবিষয়বিরহে এক মুহূর্ত্তও যখন আমার মানসিক শান্তি স্বস্তি সম্ভব না তখন কেবল-মানসপূজা করিয়া আমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবার নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থিরতর সিদ্ধান্ত। তবে বাহ্যপূজার সঙ্গে সঙ্গে মানসপূজার অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার রূপে, গুণে, নামে, প্রেমে এমন যদি কখন তাঁহার বিভূতিসাগরে ডুবিয়া পড়িয়া তাঁহাতেই উন্মত্ত মাতোয়ারা হইয়া যাই, ঘোরতর সুরাপানমত্ত পুরুষ যেমন নিত্যসংস্কারসিদ্ধ দৈহিককার্য্যসকল সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিলেও তাহাতে তাহার নিজ কার্য্যের অভিমান থাকে না, তাহার ন্যায় আমি যদি তাঁহার প্রেমভক্তি-সুধাপানে তদ্রূপ উন্মত্ত হইয়া সংস্কারসিদ্ধ সংস্কার-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার স্বরূপে আত্ম-অস্তিত্ব মিশাইয়া দিতে পারি, তবে সেইদিন আমি বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কেবল-মানসপূজার অধিকারী হইব, সেদিন কেবল বাহ্যপূজাই পরিত্যাগ করিব—তাহা নহে অথবা আমি বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিব, ইহাও নহে—বাহ্য বিষয় সমস্তই সেদিন স্বতএব পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন নিজ চেষ্টায় বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করাও মহাপাপ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শারীরিক সাংসারিক বৈষয়িক সমস্ত বাহ্যকর্ম্ম আমি অক্ষুণ্ণরূপে নিয়ত অনুষ্ঠান করিব অথচ তাঁহার উপাসনার সময় হইলেই তখন ভজনাদির মানস নির্ব্বাহ করিয়া ভোজনাদির কায়িক নির্ব্বাহ করিব, দেবতার নিকটে এরূপ প্রতারণা কেবল নরক-যাত্রারই সুপ্রশস্ত রাজপথ। আর ইহাও বড়ই বিস্ময়ের কথা যে, যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কর্ম্মপাশ উত্তরোত্তর বিষম জটিল নিবিড়গ্রন্থিসঙ্কুল হইয়া উঠিবে, যে সকল কর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠান ও আসক্তিবশতঃ সংসারের মায়া মমতায় আমাকে নিয়ত শত শত অকার্য্য কুকার্য্যসাধন কবিতে হইবে, যে কর্ম্মের বাধ্যতাবশতঃ আমাকে অবশ্যম্ভাবী নিজমরণ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া পরলোকের পবিত্র পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হইবে, অনায়াসে আমি সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এ ব্যর্থ-মানবজীবন কালকিঙ্করের কঠোর দণ্ডের অধীন করিব অথচ যে কর্ম্মে জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক-খড়্গের শাণিতধারে সঞ্চিত কর্ম্মপাশ সকল ছেদন করিয়া নিত্যমুক্তজীবনে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া ব্রহ্মময়ীর নিত্যধামে নিত্যবাস লাভ করিব, সেই কর্ম্মভোগ-নিকৃন্তন মহাকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই বঞ্চিত হইব। জলের দ্বারা যেমন জলের নির্গম হয়, কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকের উন্মূলন হয়, কর্ম্মদ্বারাও তদ্রূপ কর্ম্মপাশের ক্ষয় হইয়া থাকে। তাই তন্ত্রে সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ কর্ম্মসাগর-কর্ণধার ভগবান মহেশ্বরের শ্রীমুখের আজ্ঞা—শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং প্রথমোল্লাসে, জ্ঞানভাষ্যে—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে ॥ ১
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥
প্রাক্তনং বলবৎ কর্ম্ম কোঽন্যথা তৎ করিষ্যতি ॥ ২
দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্ত-স্তত্তদ্দেহে প্রতিষ্ঠিতং।
কর্ম্ম যোগানুরূপেণ নির্ম্মলং বিধিমাদিশেৎ ॥ ৩
চরাচরমিদং দেবি সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে।
মাতা কার্য্যং পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমো গুরুঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ ॥ ৪
সুখদুঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পাপৈ র্নিযন্ত্রিতঃ।
তত্তজ্জাতিযুতং দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্ম্মজম্ ॥ ৫
অত্র জন্মসহস্রৈস্তু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি।
কদাচিল্লভতে জন্তু র্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ৬
নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে ॥ ৭
স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি।
স্ত্রীমাতৃধন-পুত্রাদি-সম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ৮
শতং জীবতি অত্যল্পং নিদ্রা তস্যার্দ্ধহারিণী।
বাল্যভোগজরাদুঃখৈ-রর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥ ৯
দুঃখমূলং হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে ॥ ১০
প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ সদা ॥ ১১
দিব্যৌষধং ন সেবেত মহাব্যাধিবিনাশনং।
তদ্ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্ব্বন্তি বহুভেষজম্ ॥ ১২
স্বকর্ম্মফলদেহিত্বে দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ।
কামধেনুং সমাক্রম্য হ্যর্কক্ষীরং স মার্গতি ॥ ১৩
অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ॥ ১৪
অধ্রুবেন শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা।
যো ধ্রুবং নার্জ্জয়েদ্ধর্ম্মং স মর্ত্ত্যো মূঢ়চেতনঃ ॥ ১৫

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতি।
নাপি পুত্রো ন বা জ্ঞাতি-র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥ ১৬
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো ন মুচ্যতে।
পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলিন্যপ্যথ দুর্ব্বলে।
ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা ॥ ১৭
রাজতঃ সলিলাদগ্নে-শ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থকৃতাং নিত্যং মৃত্যোঃ পাপকৃতামিব ॥ ১৮
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্ ॥ ১৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥

কর্ম্মানুসারেই জীব জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মানুসারেই জীবের প্রলয় ঘটে। দেহ বিনষ্ট হইলে জীব কর্ম্মানুসারেই জন্মান্তরে দেহলাভ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মের অনুগত হয়। ১। সহস্রধেনুর মধ্যেও বৎস যেমন তাহার মাতাকে অনুসন্ধান করিয়া লয়, তদ্রূপ জীবের শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই অনন্তকোটি জীবের মধ্যেও নিজ কর্ত্তারই অনুগমন করে। জন্মান্তরসঞ্চিত কর্ম্ম এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ, কাহার সাধ্য তাহার গতির অন্যথা করিবে? ২। জীবের দেহই কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মসমস্ত তাহার দেহেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব কর্ম্মযোগের যাহা অনুরূপ তাদৃশ নির্ম্মলবিধিরই অনুষ্ঠান করিবে। ৩। দেবি! চরাচর সমস্তই কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মই মাতা, কর্ম্মই পিতা, কর্ম্মই জীবের পরমগুরুরূপে তত্ত্বপথপ্রদর্শক। কর্ম্ম দ্বারাই জীব স্বর্গ বা নরক লাভ করে। ৪। সুখদুঃখময় স্বীয় পুণ্যপাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াই জীব সেই সেই কর্ম্মানুযায়ী-জাতিবিশিষ্ট দেহ লাভ করিয়া স্বীয় কর্ম্মজনিত ফলেরই সম্ভোগ করিয়া থাকে। ৫। পার্ব্বতি! সংসারে সহস্র সহস্র জন্ম অতিক্রম করিয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে জীব কদাচিৎ মনুষ্য দেহ লাভ করে। ৬। আহার নিদ্রা স্ত্রীসংসর্গ, ইহা সমস্ত প্রাণীরই সমান; তন্মধ্যে জ্ঞানবান্ বলিয়াই মানব জীবশ্রেষ্ঠ। অতএব মানব হইয়াও যদি জ্ঞানহীন হয়, তবে সেও পশুবিশেষ। ৭। কুলেশ্বরি! মৃত্যুকালে জীব নিজ দেহ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া যায়; তথাপি স্ত্রী মাতা ধন পুত্র ইত্যাদির সম্বন্ধ কেন?—ইহা বুঝিতে পারে না। ৮। মানব শত বৎসর জীবিত থাকে, ইহা অতি অল্প পরমায়ু; কিন্তু এই শত বৎসরের মধ্যে নিদ্রা ইহার অর্দ্ধেক ভাগ হরণ করে, আর যে অর্দ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহাও বাল্যে অজ্ঞান, যৌবনে ভোগ ও জরায় দুঃখ ইত্যাদির দ্বারা নিষ্ফল হইয়া যায়। ৯। দুঃখের মূলই সংসার, সেই সংসার যাঁহার আছে তিনিই দুঃখিত। সংসারকে যিনি ত্যাগ করিয়াছেন,

তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সুখী নহেন। ১০। প্রভাতে মলমূত্রের বেগ, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা ও পিপাসা, রাত্রিতে কাম ও নিদ্রা—ইহার দ্বারাই মানব সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে। ১১। মহাব্যাধির বিনাশক দিব্য-ঔষধ সেবন করিতে রুচি হয় না, কিন্তু সেই ব্যাধিবর্দ্ধন কুপথ্যসকলকে যথেষ্ট ঔষধ মনে করিয়া নিরন্তর সেবা করে। ১২। স্বকর্ম্মফলভোগের জন্য দেহ ধারণ ইহা জানিয়াও সেই দেহে যে আবার দুষ্কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান করে, কামধেনুর অধীশ্বর হইয়াও সে মূঢ় আকন্দ বৃক্ষের ক্ষীর অন্বেষণ করে (অর্থাৎ যে মানবদেহ লাভ করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইয়াও তুচ্ছ বিষয়সুখে লালায়িত হইয়া অধঃপাতে যাত্রা করে)। ১৩। দেহ অনিত্য, বিভবও নিত্য নহে ; কিন্তু জীবের মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত। অতএব সেই নিত্যসন্নিহিত মৃত্যুভয়ভাবনা হইতে নিষ্কৃতির জন্য সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মসঞ্চয়ই কর্ত্তব্য। ১৪। প্রতিক্ষণে বিনাশ-(পরিবর্ত্তন-) শীল, অনিত্য শরীর দ্বারা যে মানব নিত্য ধর্ম্মধনের উপার্জ্জন না করে, সে-ই মূঢ়চেতন। ১৫। পরলোকে সাহায্যের নিমিত্ত কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি জ্ঞাতি, কেহই জীবের অনুগমন করে না, সে কঠোর সময়ে কেবল একমাত্র ধর্ম্মই জীবের কর্ম্মসাক্ষিরূপে অবস্থিতি করেন। ১৬। পুত্রদারস্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া পুরুষ মুক্ত হইতে পারে না। কি পণ্ডিতে, কি মূর্খে, কি বলবানে, কি দুর্ব্বলে, কি আঢ্যে, কি দরিদ্রে, মৃত্যুর সর্ব্বত্রই তুল্য অধিকার। ১৭। রাজা হইতে, জল হইতে, অগ্নি হইতে, চৌর হইতে, অধিক কি, স্বজন স্ত্রীপুত্রাদি হইতেও অর্থসঞ্চয়কারিগণের নিত্য ভয় ; যেমন পাপিগণের মৃত্যুকে দেখিয়া নিয়ত ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। (অর্থের পরিবর্ত্তে মৃত্যুর জন্য যিনি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, অভয়া মায়ের প্রসাদে তিনিই এ জগতে অভয় পুরুষ)। ১৮। অতএব, আগামী দিনে যাহা কর্ত্তব্য, বুদ্ধিমান্ অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন এবং অপরাহ্ণে যাহা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বাহ্ণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া রাখিবেন ; যেহেতু কর্ম্ম কৃত হইয়াছে অথবা অবশিষ্ট রহিয়াছে, মৃত্যু কাহারও সে প্রতীক্ষা করে না। ১৯। কর্ম্ম-মনোবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা কর্ম্মনিরত হইয়াও যাঁহার চিত্ত কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাশূন্য, তিনিই কর্ম্মবলে কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মোক্ষলাভ করেন। ২০।

সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
যদা তুষ্টা জগন্মাতা তদা সিদ্ধিমুপালভেৎ ॥ ১।
বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যা কীর্ত্তিতব্যা চ মায়া নিত্যা নগাত্মজা ॥ ২।
বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়েদ্দেবতাপূজা-জপযাগ-স্তবাদিনা ॥ ৩।

কিমন্যৈরসদালাপৈ র্যদায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ।
তস্মান্ মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্ম্মুখাৎ।
সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৪। (রুদ্রযামলে)

জগন্মাতা পরিতুষ্টা হইলেই সাধক সিদ্ধিকে লাভ করেন। সকাম সাধকের পক্ষে তিনি সুখদা, নিষ্কাম সাধকের পক্ষে তিনি মোক্ষদা। পরমায়ুর কোন এক বিভাগে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে, ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত নহে; যেহেতু তিনি নিত্যা, কোনকালেও তাঁহার সত্তার বিরাম নাই। দূরে আছেন, এই বলিয়া নিকটে আনিবার সময়েরও অপেক্ষা নাই, যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিনী। ১। অতএব, সেই নিত্যসত্যসনাতনী মহামায়া নগেন্দ্রনন্দিনীকে সাধক সর্ব্বদা বন্দন করিবেন, স্তুতি করিবেন, পূজা করিবেন, তাঁহার নাম গুণ রূপ মহিমাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন। ২। দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ দেবতার পূজা জপ যাগ ও স্তবাদির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিবেন। ৩। অন্য অসৎ আলাপ দ্বারা বৃথা পরমায়ুঃক্ষয় ভিন্ন আর কি ফল হইবে? অতএব, শ্রীগুরুমুখে মন্ত্র যন্ত্রাদির তত্ত্বসমস্ত অবগত হইয়া, দেবি! সাধক সুখে ঘোর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। ৪। কুলার্ণবে দ্বিতীয়োল্লাসে শ্রীশিববাক্যং—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিবশাসনে। ১।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগেন ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্। ২।
তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়ারতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ। ৩।
সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাৎ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
রসৈ র্মন্ত্রৈ র্যথা বিদ্ধময়ঃ সৌবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাবিদ্ধস্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে ধ্রুবম্। ৪।

দেবি! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। শিবশাসনে (তন্ত্র-মতে) দীক্ষা ব্যতীত জীবের মোক্ষলাভ হইবে না। ১। যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধ হইবার নহে, মন্ত্র ব্যতিরেকেও যোগ সিদ্ধ হইবার নহে, উভয়ের অভ্যাস-যোগই ব্রহ্ম-সংসিদ্ধির কারণ। ২। অন্ধকারসমাচ্ছন্ন গৃহমধ্যে দীপের দ্বারা যেমন ঘট পট ইত্যাদির দর্শন ঘটে, তদ্রূপ মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন জীবের পরমাত্মার স্বরূপও মন্ত্রবলেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ৩। অতএব ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেই সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ওষধির রস ও মন্ত্র দ্বারা

বিদ্ধ লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব লাভ করে, দীক্ষাবিদ্ধ জীবও তদ্রূপ গুরুকরুণারসে সিক্ত ও মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া জীবত্ব পরিহারপূর্ব্বক নিশ্চয় শিবত্ব লাভ করে। ৪।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—একাদশোল্লাসে—ধ্যানপ্রকরণে—

নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং ত্রিপুরাময়ং।
আত্মাভেদেন সংচিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ। ১।
সাহমিত্যস্য সততং চিন্তনাৎ তন্ময়ো ভবেৎ।
তামেব চিন্তয়েদ্দেবি নান্যৎ কিঞ্চিৎ তয়া বিনা। ২।
তত্তেজোভিরিদং সর্ব্বং পরিপূর্ণং বিভাবয়েৎ।
এবং ভাবনয়া হৃষ্টো দেববদ্ বিহরেৎ ক্ষিতৌ। ৩।
ধ্যানযোগপরস্যাস্য পূজ্যো নাস্তীহ কশ্চন।
স এব সুকৃতী লোকে স পূজ্যো ন তু পূজকঃ। ৪।
যোগাত্মা যোগবিজ্ জ্ঞানী স দেবো ন তু মানুষঃ।
সন্ন্যাসী স চ বিন্যাসী যুক্তাত্মা স মুনির্ম্মতঃ।
নাসাধ্যং বর্ত্ততে তস্য স সিদ্ধো যোগিপুঙ্গবঃ। ৫।
ইন্দ্রিয়প্রীণনৈর্দ্রব্যৈ-স্তোষয়েৎ ভূষয়েৎ সদা।
আত্মানমেব সততং পূজয়েদ্দেবতাধিয়া।
দেববদ্ বিহরেন্নিত্যং কালযোগপরায়ণঃ। ৬।
যৎ পশ্যতি যৎ শৃণোতি গীতনৃত্যাদিকঞ্চ যৎ।
পরিদধাতি যৎ কিঞ্চিৎ স্বয়ং যদনুলিম্পতি।
হস্ত্যশ্বরথখট্টাদি যদারোহতি সাধকঃ।
যৎ করোতি যদশ্নাতি তৎ সর্ব্বং দেবতাধিয়া। ৭।
বিষয়ান্ বিষয়ী ভুঙ্‌ক্তে যানেব স্বমনোরথান্।
তত্তৎ সমগ্রমাসাদ্য তৎ সর্ব্বং দেবতাধিয়া।
জাগ্রদাদি সুষুপ্ত্যন্তং সর্ব্বং তদ্দেবতাধিয়া।
দিব্যভাবো ভবেত্তত্র যেন সিদ্ধো ভবেন্নরঃ। ৯।
দিব্য এব ভবেৎ সিদ্ধো ন চৈবান্যঃ কদাচন।
তস্মাদ্দিব্যপরো যস্তু দেবীমানন্দরূপিণীং।
পূজয়েৎ সততং ভক্ত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরীং।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধ্যানযোগপরায়ণঃ। ১০।

আত্মা ত্রিপুরেশ্বরীর স্বরূপময় নির্লেপ নির্গুণ শুদ্ধ, এইরূপে ইষ্টদেবতাকে আত্মার অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করিবেন। ১। তিনিই আমি (আমার

সত্তা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে) এইরূপ চিন্তায় তন্ময়ত্বসিদ্ধি হইবে। তাঁহার সত্তা ব্যতীত এ জগতে কিছু নাই, এইরূপে নিরন্তর তাঁহাকেই চিন্তা করিবে। ২। তাঁহার তেজোমণ্ডলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ, এইরূপ ভাবনায় সাধক আনন্দময় হইয়া ক্ষিতিতলেই দেবতার ন্যায় স্বচ্ছন্দবিহারী হইবেন। ৩। এইরূপে ধ্যানযোগপরায়ণ সাধকের এ জগতে কেহ পূজনীয় নাই, যেহেতু সেই সুকৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষ এ সংসারে সকলেরই পূজ্য বই কাহারও পূজক নহেন। ৪। সেই যোগাত্মা যোগবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ মনুষ্যদেহধারী হইলেও স্বরূপতঃ মনুষ্য নহেন, সাক্ষাদ্দেবতা; তিনিই সন্ন্যাসী (কর্ম্মত্যাগী), তিনিই বিন্যাসী (কর্ম্মপথবিস্তারকর্ত্তা), তিনিই যুক্তাত্মা, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত মুনি। এ জগতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নাই, তিনিই সিদ্ধ যোগিপুঙ্গব। ৫। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত প্রীতিপ্রদ যাহা কিছু বস্তু, সে সমস্তের দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বদা তোষিত এবং ভূষিত করিয়া দেবতার অভিন্নবুদ্ধিতে উপাসনাপূর্ব্বক কালযোগপরায়ণ (সর্ব্বদা যুক্তাত্মা) পুরুষ নিয়ত দেবতার ন্যায় বিরাজ করিবেন। ৬। নৃত্যগীত ইত্যাদি যাহা দর্শন করিবেন, যাহা শ্রবণ করিবেন, যে কোন বসন ভূষণাদি পরিধান করিবেন, যে কিছু গন্ধচন্দনাদি অনুলেপন করিবেন, হস্তী অশ্ব রথ খট্টা ইত্যাদি যাহা কিছু আরোহণ করিবেন, যাহা ভোজন করিবেন, অধিক কি, সাধক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারই কার্য্য কর্ম্ম কর্ত্তা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই নিজদেবতার অধিষ্ঠান-বুদ্ধি স্থাপন করিবেন। ৭। বিষয়ী পুরুষ যে সকল নিজ মনোরথ-বিষয়ীভূত বস্তুকে আত্মতুষ্টির জন্য উপভোগ করেন, সাধক সেই সমস্ত বস্তুকে লাভ করিয়া তাহাতে দেবত্ববুদ্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্যামিনী দেবতার প্রীতিকামনায় তাহার উপভোগ করিবেন। ৮। প্রভাতকালে জাগরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশায় সুষুপ্তি পর্য্যন্ত সাধক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, সে সমস্তই দেবতাবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ অনুষ্ঠানের অভ্যাসে সাধকের দিব্যভাব উপস্থিত হইবে, যাহার প্রভাবে তিনি সিদ্ধি লাভ করিবেন। ৯। দিব্যভাবসম্পন্ন পুরুষই এ জগতে সিদ্ধ, অন্য কেহ কদাচ সিদ্ধ নহেন (অর্থাৎ তাঁহার অন্য সিদ্ধি থাকিলেও দিব্যভাবের অভাবে সে সিদ্ধি কখনও মুক্তির কারণ হইবে না)। অতএব এই দিব্যভাবপরায়ণ হইয়া যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আনন্দরূপিণী দেবী ত্রিপুরসুন্দরীকে সতত পূজা করেন, সেই ধ্যানযোগপরায়ণ মোক্ষার্থী পুরুষই যথার্থ মোক্ষলাভ করেন। ১০।

ভারতের দুর্ভাগ্যফলে, 'বাহ্যপূজা কনীয়সী', বাহ্যপূজাঽধমা স্মৃতা', 'বাহ্যপূজাঽধমাধমা'—এ সকল বচন আজকাল অনেকেই কণ্ঠস্থ হইয়াছে, কিন্তু কোন্ অধিকারীর পক্ষে বাহ্যপূজা কনীয়সী, অধমা বা অধমাধমা অথবা ঐ সকল বচনের উপক্রম উপসংহার বা পূর্ব্বাপর সমন্বয় কি তাহা অনেকেরই অবিদিত; কেহ কেহ আবার সুবিধাভঙ্গভয়ে তাহার অনুসন্ধানেও পরাঙ্মুখ। সর্ব্বান্তর্যামী

ভগবান্ কিন্তু সাধকের অধিকারভেদে পূজার বিভাগ করিয়া বিস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী।
অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব্বজীবত্বপরিনাশিনী। ১।
বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্ব্বাপৎ-পরিনাশিনী।
সর্ব্বদোষক্ষয়করী সর্ব্বশত্রুনিপাতিনী।
সর্ব্বরোগক্ষয়করী সর্ব্ববন্ধনমোচনী। ২।
ন বীরাণাং পশূনাঞ্চ বাহ্যপূজাধমা প্রিয়ে।
কেবলানাঞ্চ দিব্যানাং বাহ্যপূজাধমা স্মৃতা। ৩। (মুণ্ডমালা তন্ত্রে)

শুদ্ধসত্ত্বময়ী মানসী পূজা মহাসিদ্ধিকরী ও মুক্তিদায়িনী, অন্তর্যাগরূপা পূজা জীবের জীবত্বনাশপূর্ব্বক শিবত্ববিধায়িনী। ১। বাহ্যপূজা রাজসী হইলেও সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী, সমস্ত আপদের বিনাশকারিণী, ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ উভয়ের বিধায়িনী, সর্ব্বদোষক্ষয়করী, সর্ব্বরোগক্ষয়করী, সর্ব্বশত্রুনিপাতিনী ও সর্ব্ববন্ধনমোচনী। ২। প্রিয়ে! আমি যে বাহ্যপূজাকে অধমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা বীরাচার সাধকের পক্ষেও নহে, পশ্বাচার সাধকের পক্ষেও নহে, কেবল দিব্যাচার সাধকের পক্ষেই বাহ্যপূজাকে অধমা বলিয়া জানিবে। ৩।

এক্ষণে সাধক দেখিবেন, দিব্যাচার সাধকের পক্ষেও বাহ্যপূজা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু অধমা অর্থাৎ দিব্যাচার পুরুষ অন্তঃপূজাতেই সম্পূর্ণ অধিকারী, তাঁহার পক্ষে বাহ্যপূজার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিলে দিব্যাচারেও কোন প্রত্যবায় হইবে না। কারণ যে ভাবেই হউক না কেন, সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিয়া তাহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা কাহারও নাই, তবে দিব্যাচার পুরুষ মহামঙ্গলের নিত্যনিকেতন, বাহ্যপূজার অভাব জন্য মঙ্গলের যে অভাব তাহা তাঁহাতে নাই; তাই দিব্যাচার সাধক বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, কিছুতেই তাঁহার কোন প্রত্যবায় ঘটিবে না। নদ নদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হউন বা না হউন, তাহাতে সমুদ্রের ক্ষতিও নাই, বৃদ্ধিও নাই। কিন্তু পশ্বাচার বীরাচারে তুমি আমি বর্ষাভসলিলের হ্রদ বই নই—নদ নদীকে উপেক্ষা করিলে তোমার আমার যে মরুভূমিতে পরিণত হইবার কথা। তাই, যে বাহ্যপূজা নিত্যমুক্ত দিব্যাচারীর পক্ষেও অকর্ত্তব্য বা অশ্রদ্ধেয় নহে, সেই বাহ্যপূজার প্রতি বিরক্তির ভ্রূকুটীভঙ্গী তোমার আমার মুখে কেবল বিকারের লক্ষণ বই আর কিছুই নহে। তথাপি যদি কেবল মানসপূজার নিতান্তই সাধ থাকে, তবে সে সাধ মিটাইবার পথ স্বয়ং ভগবানই করিয়া দিয়াছেন। জগদম্বা করুন, সাধকরাজ্যে সে পথে যেন কাহাকেও কোন

দিন যাত্রা করিতে না হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রতি ব্যবস্থা এই—গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, পঞ্চবিংশ পটলে—

বনদুষ্টে সমুৎপন্নে সিংহব্যাঘ্রসমাকুলে।
পরসৈন্যাগমে বাপি কুর্য্যান্মানসপূজনং।
কারাগারনিবদ্ধো বা পূজাদ্রব্যবিহীনকঃ॥

বনবাসী যদি গৃহস্থ হয়েন এবং সেই বন যদি সিংহব্যাঘ্রসমাকুল হইয়া কদাচিৎ দূষিত হয়, তবে গৃহী সেইদিন মানসপূজা করিবেন। আর যদি গ্রামবাসী বা নগরবাসী হয়েন, তাহা হইলে পরপক্ষীয় রাজার সৈন্যগণকর্তৃক নিজস্থান অবরুদ্ধ হইলে সেই রাষ্ট্রবিপ্লব-সময়ে তিনি মানসপূজার অধিকারী হইবেন। আর বনবাসী হউন অথবা গ্রামনগরবাসী হউন, রাজদণ্ডাদিতে দণ্ডিত হইয়া গৃহস্থ যদি কারাগারে অবরুদ্ধ হয়েন তাহা হইলে সে সময়েও তিনি মানসপূজা করিতে পারিবেন; কিন্তু এই তিন স্থলেও সাধক যদি পূজাদ্রব্যবিহীন হয়েন, তবেই মানসপূজায় তাঁহার অধিকার, অন্যথা নহে। কারণ, তিন স্থলেই বাহিরে আসিয়া পূজাদ্রব্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই বলিয়াই মানসপূজারই অধিকার, অন্যথা তাঁহার অবস্থিতিস্থানে পূজাদ্রব্যাদি সংগৃহীত থাকিতে তিনি যদি বাহ্যপূজা না করেন তাহা হইলে সে অবস্থাতেও কেবল-মানসপূজার অনধিকারবশতঃ সে পূজায় তিনি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।

এখন সাধ করিয়া এ সাধের পূজা যদি কেহ করিতে চাহেন, আমরা বলি—সর্ব্বার্থসাধিকা মা সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার এ সাধ পূর্ণ না করিলেই মঙ্গল। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে চতুর্দ্দশ পটলে—

কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সামান্যেনেদমুচ্যতে।
উক্তানুক্তৈস্তথা পুষ্পৈ র্জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
পত্রৈঃ সর্ব্বৈ র্যথালাভং ভক্তিমান্ সততং যজেৎ।
পুষ্পাভাবে যজেৎ পত্রৈঃ পত্রালাভে চ তৎফলৈঃ।
অক্ষতৈর্ব্বা জলৈর্ব্বাপি ন পূজাং ব্যতিলঙ্ঘয়েৎ।
এতেষামপ্যলাভে তু মানসীং ভক্তিমাশ্রয়েৎ॥

আর অধিক বলিয়া ফল কি? সামান্যত এইমাত্র বলিতেছি যে, শাস্ত্রে উক্তই হউক বা অনুক্তই হউক, স্থলজ ও জলজ উভয়বিধ সমস্ত পুষ্পের দ্বারা এবং যথালাভ সমস্ত পত্রের দ্বারা ভক্তিমান্ পুরুষ নিয়ত পূজা করিবেন। পুষ্পের অভাবে পত্রের দ্বারা, পত্রের অভাবে ফলের দ্বারা, ফলের অভাবে অক্ষত দ্বারা, অক্ষতের অভাবে অন্ততঃ জলের দ্বারাও অনুষ্ঠান করিবেন—নিত্যপূজাকে কখনও লঙ্ঘন করিবেন না।

আর জল পর্য্যন্তের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তখনই কেবল মানসপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। নিরুত্তরতন্ত্রে সপ্তম পটলে—

পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
হোমেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ।
বীরাণাং মানসী পূজা দিব্যানাঞ্চ কুলেশ্বরি॥

ইষ্টদেবতার পূজার প্রভাবে সাধক স্বয়ং জগতে পূজা লাভ করেন (কারণ, যিনি এ জগতে তাঁহার পূজক তিনিই জগতের পূজ্য), জপের প্রভাবে নিঃসংশয় (অণিমাদি) সিদ্ধি লাভ হয়, হোমের প্রভাবে সমস্ত বৈষয়িক সিদ্ধির লাভ, অতএব সাধক পূজা জপ হোম এই ত্রিতয়েরই অনুষ্ঠান করিবেন। কুলেশ্বরি। কেবল বীরাচার ও দিব্যাচার সাধকের পক্ষেই মানস-পূজায় অধিকার। পিচ্ছিলা তন্ত্রে—

বিনা জপান্মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাপি হানিদা।
বিনা হোমৈ র্ন চৈশ্চর্য্যং ন সিদ্ধির্জপনং বিনা।
পূজাং বিনা ন পূজাস্তি সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি॥

মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণ করিলেও জপ ব্যতিরেকে সে মন্ত্রবিদ্যা সাধককে আহত করেন। হোম ব্যতিরেকে ঐশ্বর্য্য অসম্ভব, জপ ব্যতিরেকে সিদ্ধি অসম্ভব, পরমেশ্বরি। ইষ্টদেবতার পূজা ব্যতিরেকে নিজের পূজাও সর্ব্বত্র অসম্ভব। মুণ্ডমালাতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে—

ভক্ত্যা চ ক্রিয়য়া চণ্ডি পূজয়েদ্ যস্তু কালিকাং।
জীবঃ শিবত্বং লভতে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
সদা ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়য়া সিদ্ধিমুত্তমাং।
প্রাপ্নোতি সাধকশ্রেষ্ঠঃ অতএব ন চ ত্যজেৎ॥

চণ্ডি। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়ার দ্বারা কালিকার পূজা করেন, জীব হইয়াও তিনি শিবত্ব লাভ করেন ইহা সত্য সত্য নিঃসংশয়। সাধক সর্ব্বদা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রিয়ার দ্বারাই সাধকশ্রেষ্ঠ উত্তমাসিদ্ধি লাভ করিবেন। অতএব ক্রিয়াকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। যামলে—

স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ধ্যানন্তু দ্বিবিধং ভবেৎ।
সূক্ষ্মং মন্ত্রময়ং দেহং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্॥
করপাদোদরস্যাপি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহং।
সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতে রূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতম্॥
সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি কদাচিন্নহি জায়তে।
স্থূলধ্যানং মহেশানি কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

স্থূল সূক্ষ্মভেদে ধ্যান দ্বিবিধ, তন্মধ্যে দেবতার মন্ত্রময় দেহচিন্তা সূক্ষ্মধ্যান্ ও করচরণাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি চিন্তাই স্থূলধ্যান। পরমা প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ কেবল জ্ঞানময়, অতএব সেই সূক্ষ্মধ্যান জীবের পক্ষে কদাচ সম্ভবে না। মহেশ্বরি। স্থূলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই জীব মোক্ষ লাভ করে।

বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং।
ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ॥

দেবি! উপাসনা ব্যতিরেকে দেবতা কখনও তাহার ফল প্রদান করেন না। জ্ঞানতঃই হউক, অজ্ঞানতঃই হউক, তিনি ধ্যাত, স্মৃত, পূজিত, স্তুত এবং নমিত হইলেই পূজকগণের বিমুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

ঈশ্বর উবাচ।

এবং যঃ কুরুতে পূজাং নিত্যং ভক্তিযুতো বুধঃ।
কন্দর্পসদৃশঃ স্ত্রীষু গৌরীপতিরিবাপরঃ॥ ১॥
স এব সুকৃতী লোকে স এব কুলভূষণঃ।
ধন্যা চ জননী তস্য ধন্যস্তস্য পিতা খলু॥ ২॥
দেবীকলা ভবেত্তত্র মম তুল্যো মহামতিঃ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥
বহ্নিরিব রিপো হন্তা ইন্দোরিব সুখপ্রদঃ।
পি সমঃ শান্তা শুচৌ শুচিসমঃ খলু॥ ৪॥
বৃহস্পতিসমো বক্তা ধরণীসদৃশঃ ক্ষমী।
বক্তে্র সরস্বতী তস্য লক্ষ্মীস্তস্য সদা গৃহে।
তীর্থানি তস্য দেহে বৈ ন চ তস্য পুনর্ভবঃ॥ ৫॥
ধনেন ধননাথঃ স্যাত্তেজসা ভাস্করোপমঃ।
বলেন পবনো স্নেব দানেন বাসবোপমঃ।
গানেন তুম্বুরুঃ সাক্ষান্নিত্যং যেন সমর্চ্চিতা॥ ৬॥
একাহং যদি দেবেশি মহাত্রিপুরসুন্দরীং।
ন পূজয়েত্তদা তস্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥ ৭॥
উপোষ্যৈব চাধিবাসং কৃত্বা পূজাং পরেঽহনি।
গুরুং সম্পূজ্য বিধিবত্তদা পূজাং সমাপয়েৎ॥ ৮॥
কুমার্য্যৈ ভোজনং দত্ত্বা বিপ্রানপি চ ভোজয়েৎ।
অত ঊর্দ্ধং পুনর্দীক্ষাং লক্ষজাপং সমাচরেৎ॥ ৯॥

মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা যোগিনিনাং তথৈব চ।
ত্ব্যহং বাথ ত্র্যহং বাপি পূজাশূন্যং করোতি যঃ।
সিদ্ধিহানি র্ভবেত্তস্য যোগিনীশাপমাপ্নুয়াৎ। ১০।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যাযশোবলং।
তস্য মাংসঞ্চ শুক্রঞ্চ রসং শোণিতমেব চ।
অভীষ্টানপি কামাংশ্চ হিংসন্তি যোগিনীগণাঃ। ১১।
বন্ধুভিঃ কলহো ঘোরঃ কলত্রৈশ্চ বিশেষতঃ।
শস্যশূন্যা ভবেদুর্ব্বী বিঘ্নস্তস্য পদে পদে। ১২
সত্যং সত্যং ভবেদ্রোগী দরিদ্রশ্চোপজায়তে।
ইহৈব দুঃখমাপ্নোতি ত্রিবিধং লোমহর্ষণম্। ১৩
পরে স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষিতৌ ক্ষিতিপনায়কঃ।
অতুলাং ভক্তিমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ততঃ। ১৪।
ব্রহ্মচিন্তাপ্রবৃত্তো যঃ সোঽপহায় চ দৈবতং।
বিনা লয়াৎ প্রবর্ত্তেত ব্রহ্মঘাতী স এব তু। ১৫।
জপধ্যানপরো মন্ত্রী যোগক্ষেমপরায়ণঃ।
স্বয়ং যদি ভবেন্মূঢ়ো গুরুং তত্র নিযোজয়েৎ। ১৬।
জ্ঞানকর্ম্মপরঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
সিদ্ধয়ঃ সকলাস্তস্য গুরুর্যস্য হিতে রতঃ। ১৭।

ভক্তিযুক্ত হইয়া এইরূপে যিনি নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্ত্রীগণের নিকটে কন্দর্প-সদৃশ এবং লোকরাজ্যে শিবসদৃশ প্রভাবশালী হয়েন। ১। তিনি যথার্থ সুকৃতিসম্পন্ন, তিনিই নিজকুলের ভূষণস্বরূপ; তাঁহারই জননী ধন্যা, পিতা ধন্য। ২। দেবীর অংশ তাঁহার শরীরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং সেই মহাজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আমার ন্যায় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হয়েন, ইহা নিঃসংশয়। ৩। রিপুর নিকটে তিনি সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হন্তা, মিত্রের নিকটে ইন্দুর ন্যায় সুখপ্রদ, শাসনে তিনি যমসম, পবিত্রতায় তিনি বহ্নিসম। ৪। বক্তৃতায় তিনি বৃহস্পতিসম, ক্ষমায় ধরণীসম; তাঁহার মুখে সরস্বতী এবং গৃহে লক্ষ্মী নিত্য বিরাজিতা, সমস্ত তীর্থ তাঁহার শরীরে নিরন্তর অধিষ্ঠিত; সুতরাং পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা তাঁহার নাই। ৫। ধনে তিনি ধননাথ (কুবের), তেজে তিনি ভাস্করোপম, বলে পবনসদৃশ, দানে ইন্দ্রোপম, গানে তিনি সাক্ষাৎ তুম্বুরু, যাঁহার কর্তৃক সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বমঙ্গলা সমর্চ্চিতা হইয়াছেন। ৬। দেবেশি! একদিন যদি মহাত্রিপুরসুন্দরীর পূজার বাধ হয়, তবে সাধক সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবেন। যেদিন পূজা বাধ হইবে, সেইদিন উপবাস এবং পরদিন কর্ত্তব্য পূজার অধিবাস করিয়া পর দিনে গুরুদেবের যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক ইষ্টদেবের* পূজা সমাপিত করিবেন এবং কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন

করাইবেন। ৭। ৮। একদিন পূজা বাধ হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই, ইহার অতিরিক্ত হইলে পুনর্ব্বার দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্রের লক্ষ জপ করিতে হইবে। ৯। মহাত্রিপুর-সুন্দরীর এবং যোগিনীবর্গের (শক্তিদেবতা মাত্রের) সাধনাধিকারে দুইদিন বা তিনদিন যিনি পূজা বাধ করেন, তাঁহার সিদ্ধি হত হয় এবং তিনি যোগিনীগণের অভিসম্পাত লাভ করেন। ১০। আয়ু বিদ্যা যশ ও বল—এই চতুষ্টয় তাঁহার নষ্ট হয়। তাঁহার মাংস, শুক্র, রস ও শোণিত এবং অভীষ্ট বিষয়সকলকে যোগিনীগণ হৃত করেন। ১১। বন্ধুবর্গের সহিত, বিশেষত কলত্রগণের সহিত তাঁহার ঘোর কলহ উপস্থিত হয়; তাঁহার পাপের প্রভাবে পৃথিবী শস্যশূন্যা এবং তিনি পদে পদে বিঘ্নগ্রস্ত হয়েন। ১২। সত্য সত্য তিনি রোগী এবং দরিদ্র হইয়া ইহলোকেই (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক অথবা কায়িক, বাচনিক, মানসিক এই) ত্রিবিধ রোমহর্ষণ দুঃখভোগ করেন। ১৩। (সাধকবর্গ অবগত আছেন, সাধনপথে বিঘ্ন হইলে এ সকল ঘটনা সাধকের নিত্যপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে)। যথাবিধি অনুষ্ঠানের অভাবে মুক্তিলাভ না হইলেও মহামন্ত্রের দীক্ষালাভপ্রভাবে সাধক স্বর্গবাসের অধিবাসী হইয়া তত্রত্য সুখভোগের পর পুনর্ব্বার ক্ষিতিপৃষ্ঠে পরিভ্রষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। জন্মান্তর-সিদ্ধ দীক্ষাপ্রভাবে ইহজন্মে জগদম্বার চরণাম্বুজে অতুলা ভক্তি লাভ করিয়া তৎপর কৈবল্যের অধিকারী হইবেন। ১৪। ইষ্টদেবতার উপাসনা উপেক্ষা করিয়া যে মূঢ় উপাসনার চরম ফল চিত্তলয় ব্যতীত ব্রহ্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, সে-ই এ জগতে ব্রহ্মঘাতী। ১৫। জপধ্যানপরায়ণ সাধক, যোগক্ষেমপরায়ণ (অপ্রাপ্ত বস্তুর আদান ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষাবিধানে ব্যাপৃত) হইলে স্বয়ং যদি কদাচিৎ পূজাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে নিজ গুরুকে পূজাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ১৬। জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয় সাধনে তৎপর শুদ্ধান্তঃকরণ অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বদেবস্বরূপময় গুরুদেব যাঁহার হিতানুষ্ঠানে রত, সমস্ত সিদ্ধি তাঁহারই অধীন। ১৭। কেবল ইষ্টদেবতার পূজাবিভাগেই নহে, তন্ত্রোক্ত কার্য্যমাত্রেই স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্র ভিন্ন অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। পিচ্ছিলা তন্ত্রে—

> গুরুর্ব্বা গুরুপুত্রো বা গুরুপত্নী চ সুব্রতে।
> আগমোক্তপূজনে তু অধিকারী গুরুঃ স্বয়ং॥
> গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ॥

তন্ত্রোক্ত পূজায় স্বয়ং গুরুরই অধিকার; গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী, যে কেহ পূজা করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। দেবেশি। গুরুর অভাবে সাধক স্বয়ং পূজাদির অনুষ্ঠান করিবেন (গুরু, গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীর অভাব বলিতে এখানে সান্নিধ্যেরই অভাব বুঝিতে হইবে)। বরদাতন্ত্রে দশম পটলে—

তন্ত্রোক্তানি স্বকল্পোক্ত-কর্ম্মাণি স্বয়মাচরেৎ।
গুরুণা কারয়েদ্ বাপি পুত্রবত্যা স্ত্রিয়া তথা।
অন্যথানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকং।

তন্ত্রোক্ত নিজ ইষ্টদেবতার উপাসনা-অধিকারে বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান সাধক স্বয়ং করিবেন, স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরুর দ্বারা অথবা পুত্রবতী পত্নীর দ্বারা (পতি ও পত্নীর মন্ত্র ও দেবতা যদি এক হয়েন) করাইবেন। ইহার অন্যথা অনুষ্ঠিত হইলেই সমস্ত নিরর্থক হইবে। গুপ্তসাধনতন্ত্রে—

এভির্ব্বিনা মহেশানি তান্ত্রিকৈ র্দৈশিকৈ র্যদি।
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং গ্রস্যতে যক্ষরাক্ষসৈঃ। ১।
অতএব মহেশানি গুরুঃ কর্ত্তা বিধীয়তে।
ব্রহ্মরূপো গুরুঃ সাক্ষাদ্ যদি পূজাদিকং চরেৎ।
তত্তৎ সর্ব্বং মহেশানি শতকোটিগুণং ভবেৎ। ২।
অথবা পরমেশানি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ।
স্বয়ং পূজাদিকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি গুরোরগ্রে নিবেদয়েৎ।
গুরৌ দত্তে মহেশানি সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ। ৩।

অপি তত্রৈব—

গুরুপত্নী মহেশানি যদি পূজাদিকং চরেৎ।
বলিদানাদিকং কার্য্যং তত্র হোমং বিবর্জ্জয়েৎ
হোমীয়-দ্রব্যমানীয় দেব্যগ্রে স্থাপয়েদ্ বুধঃ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
তেন হোমফলং জাতং ন বহ্নৌ হোময়েদ্ বুধঃ।

তথা—

গুরুণা যৎ কৃতং দেবি তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
ঋত্বিক্ পুত্রাদয়ো দেবি স্মৃত্যুক্তা বহবঃ প্রিয়ে।
তন্ত্রোক্তে পরমেশানি পূজাদৌ নৈব কারয়েৎ।
পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদি কারয়েৎ।
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা।

মহেশ্বরি! (গুরু, গুরুপুত্র ও পুত্রবতী পত্নী) ইহাদিগের ব্যতীত অন্য তান্ত্রিক আচার্য্যগণের দ্বারাও যদি পূজাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সে পূজার ফলও যক্ষ রাক্ষসগণ গ্রাস করিবে। ১। অতএব, ইষ্টদেবতার উপাসনায় স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরুই সেস্থানে পূজার কর্ত্তা হইবেন। সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ গুরু যদি পূজাদির

অনুষ্ঠান করেন, মহেশ্বরি। তাহা হইলে সে সমস্তই শতকোটিগুণ ফলজনক হইবে। ২। পরমেশ্বরি। অথবা সাধক যদি স্বয়ং পূজাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে পূজাদি সমাপন করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যাহা কিছু দ্রব্যাদি সে সমস্তই গুরুর অগ্রে নিবেদন করিবেন। কারণ, প্রত্যক্ষদেবতা গুরুদেবে অর্পিত হইলে সে সমস্তই কোটিগুণফলের কারণ হইবে। ৩।

মহেশ্বরি। গুরুপত্নী যদি পূজাদি নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে সে স্থলে বলিদানাদি করিবেন; কিন্তু হোম বর্জ্জন করিবেন। হোমের দ্রব্যসমস্ত সংগ্রহ করিয়া দেবীর অগ্রভাগে স্থাপন করিবেন এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মহাদেবীকে তাহা নিবেদন করিবেন, তাহাতেই হোমফল সিদ্ধ হইবে। সাধক গুরুপত্নীর দ্বারা বহ্নিতে হোম করাইবেন না।

দেবি। শিষ্যের ইষ্টদেবতার পূজা ইত্যাদি যাহা কিছু গুরু কর্ত্তৃক কৃত হইবে সেই সমস্তই অক্ষয়ফলের জনক হইবে। যজমান স্বয়ং অসমর্থ হইলে ঋত্বিক পুত্র প্রভৃতি তাঁহার যে সকল বহুপ্রতিনিধি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই স্মৃত্যুক্ত কার্য্যের অধিকারে; তন্ত্রোক্ত পূজার অধিকারে তাহা কদাচও ঐ সকল প্রতিনিধি দ্বারা করাইবে না। পুরোহিতকে আনয়ন করিয়া তাহার দ্বারা যদি তান্ত্রিক পূজাদি করায়, তাহা হইলে সাধকের সর্ব্বার্থহানি হইবে, অধিক কি, যাঁহার উপাসনার প্রভাবে অভীষ্টফল সিদ্ধ হইবার আশা, সেই নিত্যসিদ্ধ-করুণাময়ী মহাকালবিলাসিনী জগজ্জননীও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইবেন।

পুরোহিত দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজাদির অনুষ্ঠান করিলে সাধক তাহার বিপরীত ফল লাভ করিবেন, ইহা শাস্ত্রের আজ্ঞা হইলেও অনেকের ইহাতে অনেক সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে। বস্তুতঃ গুরু ও পুরোহিতের পরস্পর ভেদ যাঁহারা না বুঝেন তাঁহাদিগের ঐরূপ সন্দেহের সম্ভাবনা। গুরু শিষ্যে ও যজমান পুরোহিতে পরস্পর সম্বন্ধ সম্যক্ অধিগত থাকিলে সন্দেহের কোন কারণ নাই। পুরোহিত, যজমানের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধনের সুযোগ্য প্রতিনিধি এবং নিজতপঃস্তেজে যজমানকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিবার অধিকারী, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যের দেহমন-প্রাণবুদ্ধির অধীশ্বর, পরমদেবতাপদাশ্রয়-পরিপ্রাপক গাঢ়মায়ান্ধকার-বিভীষিকায় মন্ত্রমঙ্গলদীপের উদ্ভাসক, অকূল-সংসারজলধির একমাত্র কূলকর্ণধার। গুরু কখনও শিষ্যের প্রতিনিধি হইতে পারেন না, কারণ শিষ্যের সম্বন্ধে গুরু মন্ত্র ও দেবতা তিনই এক পদার্থ। তবে শিষ্যের কর্ত্তব্য পূজা পুরশ্চরণ ইত্যাদি গুরুদেব নিজে নির্ব্বাহ করিলে এই হয় যে, শিষ্যের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের পূজা তিনি নিজে করিলেন, শিষ্যও সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গুরুদেবে পূজা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, গুরুতন্ত্রে এ বিষয় বিস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্পণ হেতুই সে

পূজার ফল শতকোটিগুণ অতিরিক্ত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন গুরুদেব স্বয়ং পূজা করিলে সে পূজার ফল কোটি কোটি গুণোত্তর হইয়া কিরূপে শিষ্যদেহে সংক্রামিত হইবে তাহাই বুঝিবার কথা। যজমান স্বয়ং অসমর্থ হইলে, যে সকল যাগ যজ্ঞ পূজা পাঠ ইত্যাদিতে পুরোহিতের শাস্ত্রসিদ্ধ অধিকার আছে, তাহার ফল যজমানের ইহপরলোকে ভোগ্য। লোকরাজ্যেই হউক বা স্বর্গরাজ্যেই হউক, যাহা ভোগ্য তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ; কারণ যাহা কিছু ভোগ সে সমস্তই ইন্দ্রিয়ব্যাপার-সাধ্য। এতাবতা ইহা দৃঢ়তর সিদ্ধান্তিত যে, পুরোহিতসাধ্য যে কোন ধর্ম্মকার্য্যের ফল হউক না কেন, তাহা যজমানের ঐহিক বা পারত্রিক দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াই নিরস্ত, তাহার উপরে আর স্পর্শ করিবার অধিকার তাহার নাই। কিন্তু গুরুদেবের দ্বারা যাহা নির্ব্বাহিত হইবে তাহার ফল শিষ্যের আত্মাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। পুরোহিত-সাধ্য শুভকর্ম্ম সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া যজমানের আত্মা লোকান্তর স্বর্গাদিধামে নীত হইতে পারে, কিন্তু সে বন্ধন পরম্পরা সম্বন্ধে কারণদেহ পর্য্যন্তই স্পর্শ করে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। গুরুদেবকর্ত্তৃক যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার ফল ইহ-পরলোক অতিক্রম করিয়া লোকাতীত পরমতত্ত্ব শিষ্যের আত্মায় উদ্ভাসিত করিবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল শিষ্যের আত্মায় নিত্য প্রত্যক্ষ হইবে, লোকাতীত অঘটনঘটন সকল নিত্য সঙ্ঘটিত হইবে। কুলকুহর-কমলকোষবিলাসিনী মূলাধারমৃণালবাহিনী চক্রেশ্বরী কুণ্ডলিনীর প্রতি চক্র-সঞ্চারণে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নৃত্যলীলাতরঙ্গভরে সাধকের আত্মা ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রমধ্যে একবার উন্মজ্জিত, একবার নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। অন্যত্র ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার উপায় নাই। যোগীর দৃষ্টিশক্তি যেমন তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্যকিরণসম্মিলনে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অপ্রতিহত গতিলাভ করিয়া নিজ-প্রখর প্রভাবে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ শিবলোক প্রভৃতি নিত্যধামের নিত্যলীলাসকল নিত্য প্রত্যক্ষ করে, মন্ত্রসিদ্ধ সাধকের আত্মাও তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির অবলম্বনে নিখিলমন্ত্রশক্তির একমাত্র কেন্দ্রভূমি মহাশক্তি-স্বরূপিণী জগদম্বার স্বরূপতত্ত্বসকল ভেদ করিয়া তাঁহারই বিভূতিবিলাস নিখিলধামে লীলানন্দসকল নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন। দীক্ষাপ্রদানকালে গুরুদেব যে শক্তিপ্রভাবে শিষ্যের আত্মায় নিজ-তেজঃ সংক্রামিত করিয়াছেন, অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তির ন্যায় যে শক্তি প্রদীপবৎ তেজোময় গুরুদেহ হইতে গুরুস্নেহসংমুক্ষিত বর্ত্তিকাবৎ শিষ্যদেহে সংযোজিত হইয়াছে, যে শক্তি একবার গুরুদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ও শিষ্যদেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া উভয়দেহে গতাগতির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, সেই শক্তিই আজ পূজা পুরশ্চরণাদিস্থলেও গুরু কর্ত্তৃক সম্পাদিত পূজাদির ফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ শিষ্যদেহে সংযোজিত করিয়া দিতে অদ্বিতীয় পটীয়সী। কারণ যে দেবতার তত্ত্বদিক্

লক্ষ্য করিয়া যে মন্ত্রশক্তি যে গুরুদেহ হইতে শিষ্যদেহে নিজ পথ বিস্তার করিয়াছে, সেই দেবতার সেই মন্ত্রশক্তি সেই গুরুদেহ হইতে সেই শিষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইতে সে পথে যেমন পরিচিত ও সমর্থ, তেমন আর কোন শক্তিই নহে। অন্য সকল শক্তিই সে পথে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং কুণ্ঠিত ও অসমর্থ। অন্তরের সম্বন্ধ যাহার সহিত না আছে, সে যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পায় না, তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়ের ভোগ্যসুখ-সম্পাদক অন্য-নির্ব্বাহিত ক্রিয়ার বাহ্যফলসকলও সাধকের অন্তঃকক্ষ প্রবেশ করিতে পারে না, বাহিরের পরিচিত যাহারা বাহিরেই অবস্থিতি করে। এইজন্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মমূর্ত্তি একমাত্র গুরুদেব গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র স্বয়ং পূজাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল যাহা হইবে, শত সহস্র লক্ষ কোটি পুরোহিত একত্র হইয়াও তাহার একটিও সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। অধিক কি, পুরোহিত যদি যজমানের প্রতিনিধি হইয়া সেই মন্ত্রেই সেই দেবতার পূজাও নির্ব্বাহ করেন (বঙ্গদেশে ৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদিতে যেরূপ হইয়া থাকে) তাহা হইলেও সে পূজার ফল সাধকের আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ গুরুর ন্যায় পুরোহিতের আত্মশক্তি বা মন্ত্রশক্তি যজমানের আত্মায় প্রবেশের তাদৃশ পথ কোনদিন পায় নাই; কেননা, দীক্ষা ব্যতীত সে পথ প্রস্তুত হইবার নহে। এইজন্য পুরোহিত মন্ত্রবলে পূজাকালে দেবতাকে সন্নিহিত করিতে পারিলেও, পূজা সিদ্ধ হইলেও পূজিতদেবতা নিজ সাধককে যে পর্য্যন্ত বাঞ্ছিতফল প্রদান করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সাধকের পূজামন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন, আজ কর্ম্মকর্ত্তার ব্যবস্থার দোষে সেই পর্য্যন্ত ফল তাঁহাকে দিতে না পারিয়া করুণাময়ী অন্তরে ব্যথিত হইয়া প্রস্থান করেন। স্নেহময়ী জননী আজ চিরপ্রোষিত সন্তানকে দিবার জন্য বড় সাধ করিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া অতিদুর্লভ বস্তু যাহা আনিয়াছিলেন, পুত্রের বাসায় আসিয়াও আজ তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহা দিতে না পারিলে, অধিকন্তু স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্যের দ্বারা প্রদত্ত তাহার সেই সকল উপহার দেখিলে, এ অনাদরে মায়ের প্রাণে তখন যে নিদারুণ আঘাত লাগে, মা ভিন্ন জগতে তাহা বুঝিবার কেহ নাই। তাই সন্তান বিদেশে আসিয়াছে দেখিয়াই শাস্ত্রপত্রে মা তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বাছা। পূজা করিবে করিও, আমাকে যাহা দিতে চাও দিও, আমি সন্তানের উপহার গ্রহণ করিতে আনন্দে উপস্থিত হইব, কিন্তু বাপ। এই করিও, দেখিও যেন অন্যের হস্তে আমাকে দিয়া তুমি নিজে অনুপস্থিত থাকিও না, তাহা হইলে সে অনাদর, সে দুঃখ, তোমার সে অদর্শন আমার প্রাণে বড়ই বাজিবে, আনন্দের হাস্যস্থলে আমার দুঃখের অশ্রুধারা বহিতে থাকিবে। বাপ! আমি ত তোর পর নই, হাঁরে! অবোধ সন্তান! আমি যে মা—আমি তোর মা, এই নিখিলকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মা। অনন্তচরাচরের অন্তর্যামিণী আমি, আমার কাছে

তোর কিসের গোপন? মায়ের কাছে গোপন কি বাপ্। তুই গোপন করিবি, ইহা মনে করিবার পূর্ব্বে তোর মনের আগে যে আমি তাহা জানিয়া শুনিয়া বসিয়া থাকি, হাঁরে! সেই আমার কাছে তুই তার কি গোপন করিবি? মায়ে পোয়ে যে সম্বন্ধ, তাহাতে ত গোপনের গন্ধও নাই। তবে তুই অসমর্থ, অপবিত্র, তাই বলিয়া আমার কাছে আসিতে চা'স্ না। হাঁরে। তুই কি ইহা শুনিস নাই যে, আমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী পতিতোদ্ধারিণী ত্রৈলোক্যতারিণী। তুই না হয় অসমর্থই হইলি, আমি যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, আমি নিজশক্তিবলে ধূলিকণায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করি, ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণায় পরিণত করি। শক্তিভাণ্ডারের একমাত্র অধীশ্বরী হইয়া আমি কি শক্তিবলে তোকে সমর্থ করিতে সমর্থ নই? তুই না হয় অপবিত্র, আমি ত পতিতোদ্ধারিণী—আমার নামের বলে জীব পবিত্র হইয়া জগৎ পবিত্র করে, আর আমি কি নিজে তোকে পবিত্র করিতে পারিব না? তুই কতই অপবিত্র হইয়াছিস্ যে, আমি পবিত্র করিতে পারি না। হাঁরে! অপবিত্রতা কতক্ষণ? যতক্ষণ আমার নাম না কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। জীব পতিত হয় সত্য, কিন্তু পতিতপাবনী আমি মা যতক্ষণ কোলে না করি। তুই অপবিত্র বলিয়া আমার কাছে আসিতে চাহিস্ না, কিন্তু আমার কাছে আসিলে কেহ ত আর অপবিত্র থাকে না। জগতে অপবিত্র রাখিব না বলিয়াই আমি শ্মশানবাসিনী, মৃত সন্তানও আমার নিকটে অপবিত্র হয় না, তুই ত মহামন্ত্রে জীবন্ত সন্তান, তোর আবার কিসের ভয়? তাই বলি বাপ্! মায়ের নিকটে সন্তানের আবার সঙ্কোচ কি? তুই যাহা দিবি, আমি অসমর্থ অপবিত্র বলিয়া নিজে আনিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াস্, আমি তোর প্রদত্ত উপহারের সঙ্গে সঙ্গে তোকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া লইব, তোকে সম্মুখে পাইলেই আমি তোকে যা দিবার তা দিয়া যাব তাই বলি বাপ্! অন্যের হস্তে মায়ের ভার দিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা দিস্ না, আমার 'পূজা হইল না' বা 'হইল' বলিয়া আমার কোন সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তোকে যাহা দিতে আসিয়াছিলাম তাহাই যে দিতে পারিলাম না, এই দুঃখই অতি অসহনীয়। এই দুঃখ সহিতে না পারিয়াই করুণাময়ীর ক্রোধের সঞ্চার। এইজন্যই তন্ত্র বলিয়াছেন—

পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদিকং চরেৎ
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা।

মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে বলিয়াই সাধকের সর্ব্বার্থহানি হয়, নইলে সর্ব্বার্থসাধিকার পূজায় সর্ব্বার্থহানি হইবে কেন? সাধকের কালভয় পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে কালদমন কালীনাম ধারণ করিয়াও নিত্যকরুণাময়ী মা কেন ক্রুদ্ধা হইবেন তাই বুঝিতে হইবে—এ ক্রোধ ক্রোধ নহে, প্রগাঢ়করুণারই রূপান্তরমাত্র; কিন্তু মায়ের সন্তান না হইলে, মায়ের খেলা স্বচক্ষে না দেখিলে, মায়ের এ মধুরকুটিল ক্রোধের

তরঙ্গরঙ্গ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইবার অধিকার কখনও ঘটে না। এইজন্যই মা! আমরা তন্ত্রতত্ত্বের মঙ্গলাচরণে তোমার নিসর্গসুন্দর করুণার ধারা উপেক্ষা করিয়া মধুরাদপি মধুরতর দৃষ্টকুটিল তত্ত্বসরল ক্রোধেরই ভিখারী হইয়াছি। দয়াময়ি! তত দয়া কবে করিবে যেদিন ঐ স্নেহমণ্ডিত বদনমণ্ডলে সোহাগের সুহাসি ভুলিয়া একবার কল্পিত ক্রোধের অভিনয়ে আমায় কম্পিত করিয়া কৃতার্থ করিবে? সেইদিন তোমার চণ্ডীনাম সার্থক দেখিয়া আমার দণ্ডের ভয় ঘুচিয়া যাইবে। এমন ক্রোধ যে পায় মা! সেও কি আবার দয়া চায়? ভালবাসার নিভৃতভাণ্ডারের গুপ্তধন ক্রোধ তোমার! তুমি বলিতে পার! তোমার কোপে কয়জন এমন সৌভাগ্যশালী, যাহারা তোমার ক্রোধ স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রোধ করিতে শিখিয়াছে। হায় রে! হাবা মেয়ে! 'ক্রোধ করিলাম' বলিয়া ক্রোধ করিলে সে ক্রোধ দেখিয়া যে হাসি পায়, মা হইয়া আজ এ বুদ্ধিও হারাইয়াছ! ধন্য মা করুণাময়ি! তোমার ধন্য ধন্য ক্রোধের জয়! ক্রোধের জয়! করুণার জয়! আর করুণাবিজয়ী ক্রোধের জয়!

জগদম্বার সেই ত্রিলোকদুর্লভ ক্রোধ, জীবের অদৃষ্টে দূরে আস্তাং শিবের অদৃষ্টেও সুলভ নহে। শাস্ত্রে আমরা জীবের প্রতি তাঁহার যে সকল ক্রোধ ও সন্তোষের উল্লেখ দেখিতে পাই, বস্তুতঃ ইহা ক্রোধ বা সন্তোষ না হইলেও সাধককে কৃতার্থ করিতে ক্রোধ ও সন্তোষের অভিনয়, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। দ্বিতীয়ত এইরূপ সন্তোষ ও ক্রোধ, শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ লইয়া; তাই দুঃখ ও ভয় এই হয় যে, তাঁহার স্বরূপানন্দ ক্রোধের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কল্পিত ক্রোধের প্রচণ্ড অভিসম্পাতে পাছে আত্মসর্ব্বনাশসাধন করিয়া বসি—তাই শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার উপাসনার ভার অন্যের হস্তে বিন্যস্ত করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গুরুদেবের শ্রীচরণে পূজার ভার অর্পণ করিলে তাহা অন্যের প্রতি ভারার্পণ হইবে না, কারণ নদনদীর সহিত সমুদ্রের যে সম্বন্ধ, শিষ্য শিষ্যার সহিত গুরুদেবেরও সেই সম্বন্ধ। পর্ব্বত-নির্ঝর হইতে নিঃসৃত হইলেও নদনদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া তাহার সহিত একতাপন্ন হইয়াছে তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহ কুল জাতি হইতে সংযোজিত হইলেও শিষ্যের আত্মা গুরুদেবের আত্মার সহিত একতাপন্ন হইয়াছে। সমুদ্রের জল বর্দ্ধিত হইলে সমুদ্র যেমন তাহা নিজবেগে নদ নদীতে প্রেরণ করেন তদ্রূপ গুরুদেবের আত্মায় সাধনানন্দ বর্দ্ধিত হইলেও নিজশক্তিপ্রভাবে তিনি তাহা শিষ্যদেহে সংক্রামিত করিতে পারেন। সমুদ্রের জল বস্তুতঃ বর্দ্ধিত না হইলেও পূর্ণিমাতে তিথিসংক্রমে যেমন স্ফীত হয়, নদ নদীর জল তেমন স্ফীত হইবার নহে; তদ্রূপ পূর্ণানন্দ-গুরুস্বরূপে আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি অসম্ভব হইলেও সাধনাশক্তিপ্রভাবে তাহা স্ফীত হইয়া উদ্বেলিত হয় এইমাত্র; কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণানন্দগুরুদেহে সেরূপ উদ্বেল-অবস্থা যেমন সুসম্ভব, নদ নদীর ন্যায় শিষ্যদেহে সেরূপ অবস্থা কদাচও সম্ভবে না—যাহা সম্ভবে তাহা কেবল ঐ

সচ্চিদানন্দসাগর শ্রীগুরুরই শ্রীচরণপ্রসাদাৎ। যদি সমুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিত, তবে নদনদীতে কখনও জোয়ার আসিত না। সমুদ্রের জল বস্তুতঃ বর্দ্ধিত না হইয়া স্ফীত হইলেও যেমন সেই বেগচালিত জলভরে নদনদীর জল বস্তুতঃই বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ পরমার্থত গুরুর নিজনিষ্পাদিত পূজায় নিজ পূর্ণ আনন্দের বৃদ্ধি না থাকিলেও গুরুকৃপাবেগভরে সে আনন্দ সঞ্চালিত হইয়া শিষ্যদেহে বস্তুতঃই সাধনানন্দ বর্দ্ধিত করে। এইজন্যই শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে—

ব্রহ্মরূপো গুরুঃ সাক্ষাদ্ যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
তত্তৎ সর্ব্বং মহেশানি শতকোটিগুণং ভবেৎ॥

এইজন্যই গুরুদেব পূজা করিলে সে পূজা লোকের দৃষ্টিতে অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইলেও পরমার্থতঃ অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় না, গুরু আত্ম-উপস্থিতির দ্বারাই শিষ্যকে সেস্থলে উপস্থিত করিয়া থাকেন। যিনি নিজগুরু নহেন অথচ তান্ত্রিক আচার্য্য, ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ইষ্টদেবতার পূজার ভার অর্পিত হইলেও সে পূজার বিপরীত ফল ফলিবে, কারণ তিনি তান্ত্রিক হইলেও গুরুশিষ্য সম্বন্ধের অভাবহেতু যজমানের পূজাকার্য্যে পুরোহিতও যাহা, তিনিও তাহাই। এইজন্যই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

এভির্ব্বিনা মহেশানি তান্ত্রিকৈ দেশিকৈ যদি
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং গ্রসতে যক্ষরাক্ষসৈঃ।

গুরু পুরোহিতের তারতম্য-প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ভেদ প্রদর্শিত হইল, পুরোহিতকৃত পূজা সিদ্ধ হইলে তবে এ ভেদ সঙ্গত হয়, বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত অধিকারের অভাববশত পুরোহিতের অনধিকারকৃত পূজা আদৌ সিদ্ধই হইবে না। কেবল ইষ্টদেবতার পূজা সিদ্ধ হইবে না তাহা নহে, তন্ত্রোক্ত কোন কার্য্যই পুরোহিতকৃত হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

ঋত্বিক্-পুত্রাদয়ো দেবি স্মৃত্যুক্তা বহবঃ প্রিয়ে।
তন্ত্রোক্তে পরমেশানি পূজাদৌ নৈব কারয়েৎ॥

ইষ্টদেবতার পূজা ভিন্ন অন্য পূজার অনুষ্ঠান তান্ত্রিক আচার্য্য দ্বারা করাইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু গুরু গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের অভাবে ইষ্টদেবতার পূজা সাধক স্বয়ং বা নিজপত্নী দ্বারা নির্ব্বাহ করিবেন, অন্যথা উপায়ান্তর নাই। রুদ্রযামলে—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতং।

পূজা নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ত্রিবিধ (নিয়ত যাহার অনুষ্ঠান না করিলে সাধককে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাহার নাম নিত্য: যথা, সন্ধ্যাবন্দন, শিবপূজা, ইষ্টদেবতার পূজা ইত্যাদি)। ১। যাহার অনুষ্ঠান না করিলে পাপ আছে অথচ যাহা কোন বিশেষ নিমিত্তবশত উপস্থিত হয়, তাহারই নাম নৈমিত্তিক: যথা,

দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা-শ্যামাপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, গ্রহণপুরশ্চরণ ইত্যাদি। ২। যাহার অনুষ্ঠান না করিলে কোন প্রত্যবায় নাই, কিন্তু করিলে বিশেষ ফল আছে অর্থাৎ সেই ফলকামনায় যাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারই নাম কাম্য: যথা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি। ৩। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মে বিশেষ প্রভেদ এই যে, কামনা না থাকিলেও নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে; কিন্তু কামনার অভাবে কাম্য কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। নীলতন্ত্রে—

নিত্যসেবারতো মন্ত্রী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চ্চনং।
নৈমিত্তিকার্চ্চনে সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কাম্যমথার্চ্চনং।
উভয়োঃ কাম্যকর্ম্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥

মন্ত্রী (সাধক) ইষ্টদেবতার নিত্যপূজাতে রত হইলেই নৈমিত্তিকপূজাতে তাঁহার অধিকার জন্মে এবং নৈমিত্তিক পূজাতে সিদ্ধ হইলেই কাম্য পূজার অধিকার হয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় কর্ম্মে যিনি সিদ্ধ (নিত্য নিযুক্ত) তাঁহারই কাম্যকর্ম্মে অধিকার জন্মে, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

বঙ্গদেশের অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা নিত্যপূজাদির কিছুমাত্র অনুষ্ঠান করেন না তাঁহারাও সম্বৎসর মধ্যে একবার দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা বা জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদির যে কোন একটি অনুষ্ঠান লৌকিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াই মনে করেন, এক বৎসরের নিত্য পূজার আঠার আনা শোধ উঠাইয়া লইলাম। তাঁহারা একবার এইস্থলে অভিমান-মুদ্রিত নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিয়া লইবেন, ঐরূপ দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে মূলে তাঁহাদিগের অধিকারই আছে কি না? ঐ সকল অনধিকার-চর্চ্চাময় পূজাদিতে যথাশাস্ত্র ফল ফলিবে, সে কথা দূরে থাক্, অধিকন্তু অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পদে পদে সে সকল 'স্বস্ত্যয়নে অভিচার' ঘটিতেছে তাহা সর্ব্বসাধারণেরই নিত্য-প্রত্যক্ষ। অনুষ্ঠাতার নিজদোষে কর্ম্মের বিপরীত ফল ফলে, কিন্তু সমালোচনায় প্রায়ই শুনিতে পাই 'শাস্ত্রে যত কিছু ফলের নির্দ্দেশ, ও কেবল মিথ্যাপ্রলোভন মাত্র'। আমরা বলি, যদি কোন ফলই না ঘটিত, তবে এ সকল বিপরীত ফল ফলে কেন? অদৃষ্টদোষে প্রত্যক্ষ করিতে পারি বা না পারি, বুদ্ধিমানের ইহা বুঝিয়া রাখা উচিত যে, যাহার অবৈধ অনুষ্ঠানে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠানে যথাশাস্ত্র ফলও অবশ্যম্ভাবী, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

মাসতো বর্ষতো বাপি স্বয়ং পুণ্যাহযোগতঃ।
কুর্য্যাদ্ বৈ মহতীং পূজাং সম্পন্নাঙ্গবিভূষিতাং॥
উপচারৈর্ব্বহুবিধৈ-রলঙ্কৃতসুবিগ্রহাম্। ১।
নিত্যমেবার্চ্চনং দেব্যা নিত্যমেব সমাচরেৎ।

নিত্যাচারপরো মন্ত্রী নৈমিত্তিকবিধিঞ্চরেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকপরঃ সাধুঃ কাম্যং বিচিন্তয়েৎ। ২।
কাম্যান্নৈমিত্তিকং নিত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকাৎ পরং
নিত্যাচারবিলোপী যঃ কাম্যং নৈমিত্তমেব বা।
করোতি স চ মূঢ়াত্মা নাপ্নোতি তস্য তৎফলম্। ৩।
নিত্যাচারমনাদৃত্য যদন্যত্তু সমীহতে।
নিষ্ফলং তস্য তৎ কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা। ৪।
অপি পুষ্পফলৈর্ব্বাপি পূজয়েচ্চক্রদেবতাঃ।
অঙ্গহীনস্তু পুরুষো ন সম্যগ্ যো জ্ঞকো ভবেৎ।
অঙ্গহীনা তথা পূজা ন সম্যক্ফলদায়িনী। ৫।
ধ্যানং পূজা জপো হোম ইতি হ্যস্তচতুষ্টয়ং।
শরীরং ন্যাসজালস্তু আত্মা তজ্জ্ঞানমেব চ।
ভক্তিঃ শিরোঽত্র হৃৎশ্রদ্ধা কৌশলং নেত্রমীরিতং।
এবং যজ্ঞশরীরন্তু মত্বা সাধকসত্তমঃ।
যজ্ঞং সমাপয়েন্নিত্যং সাঙ্গেনৈব খলু প্রিয়ে। ৬।
অঙ্গহীনে মহান্ দোষস্ততোঽঙ্গং নাবধীরয়েৎ।
সর্ব্বাঙ্গপূর্ণপুরুষো যজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
তদীহা পরাশক্তিঃ সিদ্ধিঃ সংযোগতস্তয়োঃ। ৭।
শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ পূর্ণযজ্ঞশরীরকে।
অঙ্গবাধে যথা দোষো নান্যস্য হি তথা ভবেৎ। ৮।
স্ববিভবানুরূপা বৈ পূজা কার্য্যা বিভূতয়ে।
ব্যতিক্রমাত্তু হীনা স্যাদ্ ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।
নাধিকং নৈব চ ন্যূন-মুভয়ং পাপদায়কম্। ৯।
চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টম্যাং পূর্ণায়াং মাসমধ্যতঃ।
মহাভূতদিনে বাপি যজেদ্ বিভববিস্তরম্। ১০।
কৃষ্ণয়াথ চতুর্দ্দশ্যা যুক্তং কুজদিনং যদা।
মহাভূতদিনং তত্তু সর্ব্বভূতবশঙ্করং।
যদি পূজা ভবেত্তত্র তদানন্তফলপ্রদম্। ১১

মাসান্তে অথবা বৎসরান্তে এবং পুণ্যাহযোগে বহুবিধ উপচারে অলঙ্কৃত সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন মহাপূজার অনুষ্ঠান করিবে। ১। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহই অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু ইষ্টদেবতার উপাসনা নিত্যকর্ম্ম। নিত্য আচার রক্ষায় সম্যক্ সমর্থ হইয়া তৎপর সাধক্, নৈমিত্তিক বিচার অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপে নিত্য-নৈমিত্তিক উভয়

অনুষ্ঠানে সুপটু হইলে তৎপর কাম্য অনুষ্ঠানের চিন্তা করিবেন। ২। কাম্যকর্ম অপেক্ষা নৈমিত্তিককর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য; নৈমিত্তিক কর্ম্ম অপেক্ষা নিত্যকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য। নিত্যাচারের বিলোপী হইয়া যে দুর্ব্বুদ্ধি কাম্য বা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হয়, সে কদাচ তাহার ফলভাগী হয় না। ৩। নিত্যাচারকে অনাদর করিয়া নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম সিদ্ধির জন্য যে চেষ্টা করে, বন্ধ্যা স্ত্রীর সহবাসের ন্যায় তাহার সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। ৪। অন্যান্য উপচারের একান্ত অভাব হইলে অন্ততঃ পুষ্প ফল ইত্যাদির দ্বারাও চক্রদেবতার (শিব সূর্য্য গণেশ বিষ্ণু ও শক্তি, এই পঞ্চদেবাত্মক উপাস্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী নিজ ইষ্টদেবতার) পূজার অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু সম্ভাবনাসত্ত্বে এইরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিলে অঙ্গহীন পুরুষ যেমন যজ্ঞের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠাতা হইতে পারে না তদ্রূপ এইরূপ অঙ্গহীন পূজাও সাধকের সম্যক্‌ফলদায়িনী হইতে পারে না। ৫। উপাসনারূপ যজ্ঞের ধ্যান পূজা জপ ও হোম, ইহাই হস্তচতুষ্টয়; মাতৃকা যোঢ়া প্রভৃতি ন্যাস সমস্ত তাঁহার শরীর, ইষ্টদেবতাবিষয়ক স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান আত্মা; ভক্তি তাহার মস্তক; শ্রদ্ধা তাহার হৃদয় এবং অনুষ্ঠানকুশলতা তাহার চক্ষু। সাধক সত্তম এইরূপে যজ্ঞমূর্ত্তির শরীরসংস্থান অবগত হইয়া যজ্ঞকে অঙ্গহীনরূপে খণ্ডিত না করিয়া সাঙ্গরূপেই তাহা সমাপন করিবেন। ৬। যজ্ঞপুরুষ অঙ্গহীন হইলে সাধকের মহা-অনিষ্ট সম্ভাবনা, এজন্য অঙ্গানুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। যজ্ঞপুরুষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইলেই সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি বিধান করিয়া থাকেন। সেই সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানচেষ্টায় যে পরমাশক্তির আবির্ভাব হয়, যজ্ঞপুরুষ তাহাতে সম্মিলিত হইয়াই সিদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকেন। ৭। শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরীর (শক্তি-মূর্ত্তিমাত্রের) এই পূর্ণযজ্ঞশরীরে অঙ্গবাধ হইলে যত দোষ হইবে, অন্য উপাসনায় তত নহে। ৮। সাধক সিদ্ধিবিভূতি লাভের নিমিত্ত নিজ বিভবের অনুরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে পূজার ত হানি হইবেই, অধিকন্তু সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মমূর্ত্তি যজ্ঞদেহের অঙ্গাঘাতজন্য ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। যজ্ঞদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক অনুষ্ঠান করিবে না। কারণ, যজ্ঞের হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ—উভয়ই সাধকের পাপদায়ক। ৯। চতুর্দ্দশীতে, অষ্টমীতে, পূর্ণিমাতে, মাসমধ্যে (উভয় মাসের মধ্যবর্ত্তী দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তিতে) এবং মহাভূত-দিনে বিভববিস্তারপূর্ব্বক মহাপূজার অনুষ্ঠান করিবে। ১০। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর সহিত মঙ্গলবার যুক্ত হইলে সেইদিনের নাম মহাভূত-দিন। সেইদিনে সাধক কোন বিশেষ অনুষ্ঠান করিলে তাহা সর্ব্বভূতের বশীকরণের কারণ হয়। আবার সেইদিনে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয় তবে তাহা অনন্তফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। ১১।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পূজা

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।
নাদেবঃ পূজয়েদ্দেবং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ॥

স্বয়ং দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবে, দেবতা না হইয়া দেবতার পূজা করিবে না; যদি করে, তাহা হইলেও সে পূজার ফলভাগী হইবে না।

বাশিষ্ঠরামায়ণ—

অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ॥

স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া যদি বিষ্ণুকে পূজা করে তাহা হইলে সে পূজার ফলভাগী হইবে না, বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুকে পূজা করিলে সাধক স্বয়ং মহাবিষ্ণুরূপে পরিণত হইবেন।

ভারতে—

নাবিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণু র্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
নাবিষ্ণুঃ সংস্মরেদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণু র্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ॥

স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুকে কীর্ত্তন করিবে না, বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না, বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে না, বিষ্ণু না হইলে বিষ্ণুকে প্রাপ্তও হইবে না।

ভবিষ্যে—

নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চয়েৎ।
নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমাপ্নুয়াৎ॥

স্বয়ং রুদ্র না হইয়া রুদ্রকে স্মরণ করিবে না, রুদ্র না হইয়া রুদ্রকে অর্চ্চনা করিবে না, রুদ্র না হইয়া রুদ্রকে কীর্ত্তন করিবে না, রুদ্র না হইলে রুদ্রকে প্রাপ্তও হইবে না।

আগ্নেয়ে—

রুদ্রস্য পূজনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্বিষ্ণুপূজনাৎ।
সূর্য্যঃ স্যাৎ সূর্য্যপূজনাৎ শক্ত্যাদিঃ শক্তিপূজনাৎ।

রুদ্রের পূজন দ্বারা সাধক স্বয়ং রুদ্র হয়েন, বিষ্ণুর পূজন দ্বারা বিষ্ণু হয়েন, সূর্য্যের পূজন দ্বারা সূর্য্য হয়েন, শক্তির পূজন দ্বারা শক্তি হয়েন এবং গণেশের পূজন দ্বারা গণেশ হয়েন।

ভবিষ্যে—

নাদেবী কীর্ত্তয়েদ্দেবীং নাদেবী তাং সমর্চ্চয়েৎ।

ন্যাসাত্তদাত্মকো ভূত্বা দেবো ভূত্বা তু তং যজেৎ ॥

স্বয়ং দেবী না হইয়া দেবীর কীর্ত্তন করিবে না, দেবী না হইয়া দেবীকে পূজা করিবে না; মন্ত্রন্যাস দ্বারা তদাত্মক অর্থাৎ দেবতাময় হইয়া তবে দেবতার পূজা করিবে।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।

ন্যাসং বিনা জপং প্রাহু-রাসুরং বিফলং শিবে। ১।

ন্যাসাত্তদাত্মকো ভূত্বা দেবো ভূত্বা তু তং যজেৎ।

প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরতা। ২।

দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং অদেব থাকিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না, শিবে। মন্ত্রন্যাস ব্যতিরেকে জপের অনুষ্ঠান করিলে তাহাও আসুর (অদৈব্য) এবং বিফল হইবে। ১। ন্যাস দ্বারা তদাত্মক হইয়া দেবতার পূজা করিবে, প্রাণায়াম, ধ্যান এবং ন্যাস দ্বারা সাধকের শরীর দেবশরীরত্ব লাভ করিবে। ২।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

ভূতশুদ্ধিমৃষিন্যাসং পীঠন্যাসং তথৈব চ।

করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাসমেব চ।

বিদ্যান্যাসং মহেশানি যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ ॥

ভূতশুদ্ধি, ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠশক্তিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস, বিদ্যান্যাস, মহেশ্বরি। এই সকল ন্যাস দ্বারা সাধক স্বয়ং দেবময় হইবেন।

॥ ভাব ॥

অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তিকে আমার নিজ-আয়ত্ত করিতে হইলে, আমি অগ্নিময় না হইলে যেমন তাহা সম্ভবে না, জলের শীতলতা ও মাধুর্য্যশক্তিকে আমার নিজ আয়ত্ত করিতে হইলে আমি জলময় না হইলে যেমন তাহা সম্ভবে না, বায়ুর বেগ ও স্পর্শশক্তিকে আমার আয়ত্ত করিতে হইলে আমি বায়ুময় না হইলে যেমন তাহা সম্ভবে না, পৃথিবীর কঠিনতা ও গন্ধশক্তিকে আয়ত্ত

করিতে হইলে আমাকে যেমন পৃথিবী না হইলে চলে না, তদ্রূপ ভগবান বা ভগবতীর নিত্যশক্তির (অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতির) অণুমাত্র আয়ত্ত করিতে হইলেও আমাকে তন্ময় না করিতে পারিলে আমার তাহা সম্ভবে না। যাঁহার শক্তি আমাতে সংক্রামিত করিতে হইবে তাঁহার সত্তা-সাগরে আমার আত্ম-অস্তিত্ব একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নতুবা তাঁহার সে শক্তি কিছুতেই সংক্রামিত হইবার নহে। যাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন। যতদূর তন্ময়তা সিদ্ধি হইয়াছে, ততদূরই তাঁহার শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে—শক্তিরাজ্যের ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। যে ভাবের প্রভাবে সংসারে ও সাধনায় এই তন্ময়তা সিদ্ধি, সেই ভাবের তত্ত্ব ভাবুকের হৃদয়েই কেবল অনুভূত হইয়া থাকে—অন্যের তাহা বলিবারও ক্ষমতা নাই, বুঝিবারও ক্ষমতা নাই; অধিক কি, স্বয়ং সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি যে ভাবের গতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া বলিয়াছেন, ভাবের স্বরূপ বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার নহে, সে ভাবের স্বভাব বুঝাইয়া দিবার শক্তি আমাদিগের নাই; তবে শক্তিনাথ স্বয়ং যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত প্রদর্শন করাই আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত।

কৌলাবলীতন্ত্রে, একাদশোল্লাসে—

ভাবস্তু মনসো ধর্ম্মঃ স হি শাব্দঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাদ্ ভাবো ন বক্তব্যো দিঙ্মাত্রং সমুদাহৃতং।
যথেক্ষুগুড়মাধুর্য্যং জিহ্বয়া জ্ঞায়তে সদা॥
তস্মাদ্ ভাবো বিভাবস্তু মনসা পরিভাব্যতে। ১।
এক এব মহাভাবো নানাত্বং ভজতে যতঃ।
উপাধিভেদভাবেন ভাবভেদো লয়িষ্যতি। ২।
আনন্দঘনসন্দোহঃ প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্।
রসরূপঃ স এবাত্মা সঃ প্রভুঃ পরমো মহান্। ৩।
শ্রোতব্যঃ স চ মন্তব্যো নিদিধ্যাতব্যঃ স এব হি।
সাক্ষাৎ কার্য্যস্ততো বীরৈ-রাগমৈ র্ব্বিবিধৈস্তথা। ৪।
শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যো মননাদিভিঃ।
সোপপত্তিভিরেবায়ং ধ্যাতব্যো গুরুদেশিতৈঃ। ৫।
তদা স এব সর্ব্বাত্মা প্রত্যক্ষীভবতি ধ্রুবং।
তস্মিন্ দেহে তু ভগবান্ প্রত্যক্ষঃ পরমেশ্বরঃ।
ভাবৈ র্ব্বহুবিধৈশ্চৈব ভাবস্তত্রাপি লীয়তে। ৬।
ভুক্ত্বা নানাবিধং গ্রাসং গবি চৈকো যথা রসঃ।
দুগ্ধাদধ্যাসযোগেন নানাত্বং ভজতে যতঃ। ৭।

তৃণেন জায়তে চৈব রসস্তস্মাৎ পরো রসঃ।
তস্মাদ্দধি ততো হব্যং তস্মাদপি রসোদয়ঃ। ৮।
স এব কারণং তস্য তৎ কার্য্যং স চ কথ্যতে।
দৃশ্যতে চ সদা তত্র ন কার্য্যং নাপি কারণম্। ৯।
তথৈবায়ং স এবাত্মা নানাবিগ্রহযোনিষু।
জায়েজ্জনিয়তে জাতঃ কার্য্যভেদাদ্ধি ভাব্যতে। ১০।
স জাতঃ স মৃতো বদ্ধঃ স মুক্তঃ স সুখী পুমান্।
স স্ত্রী নপুংসকঃ সোঽপি স এবানঙ্গ এব সঃ। ১১।
নানাধ্যানসমাযোগা-ন্নানাত্বং ভজতে যথা।
এক এব স এবাত্মা রসরূপী সনাতনঃ। ১২। ইত্যাদি

+ + +

দিব্যভাবো বীরভাবো যস্য দেহে ব্যবস্থিতঃ।
একেন জন্মনা তস্য পরং প্রত্যক্ষমাপ্নুয়াৎ। ১৩
জীবন্মুক্তঃ স এবাত্মা ভোগার্থমটতে মহীং।
দেবীপুত্রঃ স এবাত্মা ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ১৪।
ভাবত্রয়াণাং মধ্যে তু দ্বৌ ভাবৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ন বক্তব্যৌ মুক্তিমার্গৌঃকুলসারৌ কুলোত্তমৌ। ১৫।
যো ভাবো যস্য বৈ প্রোক্ত-স্তৈ র্ভাবৈ র্নার্চ্চয়েদ্ যদি।
দশাহক্রমযোগেন ভ্রষ্টো ভবতি সাধকঃ। ১৬।
নোপদিশ্যেৎ তত্র ভাবং ন পূজাং তত্র সন্দিশেৎ।
কুলান্ মন্ত্রং গৃহীত্বা তু ভাবশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্ ভাবপরো ভূত্বা দেবীং সম্পূজয়েৎ সুধীঃ। ১৭।

ভাব পদার্থ মনের ধর্ম্মবিশেষ, তাহা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইবে কিরূপে? অতএব ভাব কখনও বক্তব্য হইতে পারে না, বাক্যের দ্বারা তাহার দিঙ্‌মাত্রের নির্দ্দেশ হয় এইমাত্র। যেমন, ইক্ষুগুড়ের মাধুর্য্যের স্বরূপ কেবল জিহ্বার দ্বারাই অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, লক্ষ লক্ষ শব্দের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিলেও সে রসের স্বরূপ কি, তাহা অনুভব করাইয়া দিবার উপায় নাই, তদ্রূপ ভাব ও বিভাব (ভাবের উপকরণ) কেবল মনোবৃত্তি দ্বারাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, শব্দের দ্বারা তাহা কখনও ব্যাখ্যাত হইবার নহে। ১। একমাত্র মহাভাবই উপাধি (বিষয়) ভেদে (ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য ইত্যাদি) নানারূপে বিভক্ত হয়। আবার, ভাবের প্রগাঢ়তা উপস্থিত হইলে ভাবগত সেই সমস্ত ভেদ পরিণামে একমাত্র মহাভাবেই বিলীন হইয়া থাকে। ২। এই ভাবই আনন্দঘনসন্দোহ প্রভু, এই ভাবই প্রকৃতিরূপধৃক্ এবং এই ভাবই রসরূপী আত্মা,

পরম্ ও মহান্। ৩। ভাবরূপে এই আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য এবং বীর সাধকগণ কর্ত্তৃক বিবিধ তন্ত্রোক্ত সাধন দ্বারা সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য। ৪। শ্রুতিবাক্য দ্বারা এই ভাবময় আত্মাই শ্রোতব্য, মননাদি দ্বারা এই ভাবই মন্তব্য, গুরুপ্রদর্শিত প্রমাণ দ্বারা এই ভাবময় আত্মাই ধ্যাতব্য। ৫। এইরূপে শ্রবণ মনন ধ্যান সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলেই সেই ভাবরূপী সর্ব্বব্যাপী আত্মা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। বহুবিধ ভাবকদম্বে বিভূষিতা হইয়া ভগবান্ পরমেশ্বর যখন সাধকের সেই সাধনাসিদ্ধ দেহে নিজ লীলার প্রভাব ব্যক্ত করিতে থাকেন তখন সাধকের সমস্ত ভাবই আবরণদেবতার ন্যায় ভগবদ্দেহে বিলীন হইয়া কেবল এক অখণ্ডভাবময় চিদ্‌ঘনানন্দ ভগবৎস্বরূপেরই অনুভব করায়। ৬। নানাবিধ ঘাস গ্রাস করিলেও গাভীর দেহে যেমন একরূপ রসই সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং দুগ্ধাদি-উপাধির অধ্যাসযোগে সেই এক রসই নানারূপত্ব ভজনা করে ; তদ্রূপ যেরূপ বিভাব দ্বারা যে ভাবেরই কেন সাধনা না হউক, পরিণামে সমস্ত ভাবই পরমদেবতার চিদ্‌ঘনানন্দময়ী মূর্ত্তির স্বরূপে একমাত্র মহাভাবেই পরিণত হইয়া থাকে। ৭। তৃণ হইতে গাভীর দেহে যে রস সঞ্চারিত হয় তাহাই পরিণামে পরম রস দুগ্ধরূপে আবির্ভূত হয়, সেই দুগ্ধেরই প্রকারভেদে রসান্তর দধি এবং দধি হইতে ভিন্ন ঘৃত, সেই ঘৃত হইতেও আবার কোন অনির্ব্বচনীয় রসের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুগ্ধ দধি ঘৃত ইত্যাদি কার্য্যকারণ-ভেদে যতই কেন প্রকার-ভেদ না হউক, তৃণ হইতে মূলেও যে রসের সঞ্চার, পরিণামেও কেবল সেই একমাত্র রসেরই সত্তা, মধ্যে যাহা কিছু সমস্তই প্রকারভেদমাত্র ; তদ্রূপ যে কোন ভাবে তাঁহার সাধনা হউক না কেন, সমস্ত ভাবেরই ভাবরূপে কারণ তিনি, কার্য্যও তিনি, মূলেও তিনি ; পরিণামেও কেবল তাঁহারই একমাত্র মহাভাবস্বরূপ অখণ্ডানন্দ চিদ্‌ঘন, সত্তা বই আর কিছুই নহে। স্বরূপতঃ দর্শন করিতে গেলে তিনি ভিন্ন আর কার্য্য ও কারণ নাই। ৮। ৯। সাধনক্ষেত্রে এই ভাবরূপে তাঁহার যেমন লীলাভেদ, সৃষ্টিরাজ্যেও তাঁহার তদ্রূপই লীলাভেদ। তিনিই একমাত্র পরমাত্মা, দেহভেদে নানা যোনিতে জন্মিয়াছেন, জন্মিতেছেন পরেও জন্মিবেন। তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের অথবা জীবরূপে তাঁহার আবির্ভাবের পর পাপপুণ্য কার্য্যের ভেদে, স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও কখন তিনি জাত, কখন মৃত, কখন বদ্ধ, কখন মুক্ত, কখন সুখী, কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন নপুংসক, আবার কখন স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ক্লীবত্ব উপাধির অতীত অনন্ত অঙ্গবিহারী হইয়াও তিনি অনঙ্গ। ১০। ১১। এইরূপে মহাভাব-রসরূপী সনাতন পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় হইলেও সাধকের নানাবিধ ভাবময় ধ্যানসমাযোগেই তিনি নিজ নানাত্বলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ লীলাময়ীর লীলাও তাঁহারই স্বরূপশক্তি, সেই লীলাভেদে তাঁহার স্বরূপগত একতার কোন ভেদ হয় না। ১২। দিব্য-ভাব অথবা বীরভাব যাঁহার দেহে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধক এক জন্মেই ব্রহ্মময়ীর

পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন। ১৩। আত্মস্বরূপে পরিণত সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল দৈহিক ভুক্তাবশিষ্ট প্রারব্ধভোগের নিমিত্তই ধরিত্রীমণ্ডলে বিচরণ করেন এবং সেই দেবীপুত্র মহাত্মাই ভৈরব নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ১৪। পূর্ব্বোক্ত ভাবত্রয়ের মধ্যে বীরভাব এবং দিব্যভাব, এই দুই ভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত, কুলতন্ত্রের সারভূত এবং কুলসম্বন্ধবশতঃ উত্তম ও মুক্তির সাক্ষাৎ পথস্বরূপ। অতএব সমস্ত অধিকারীর নিকটে এই দুই পথের তত্ত্ব বক্তব্য নহে। ১৫। যে সাধকের পক্ষে যে যে ভাব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই ভাবের অবলম্বনে যদি সাধক পূজা না করেন এবং ক্রমাগত দশাহকাল এইরূপে ইষ্টদেবতার পূজার বাধ হয়, তাহা হইলে সাধনারাজ্যে তিনি ভ্রষ্ট হয়েন। ১৬। এইরূপে যিনি ভ্রষ্ট হইয়াছেন, গুরু তাঁহাকে কোন ভাবের বা পূজার উপদেশ করিবেন না। এই ভ্রষ্ট সাধক যদি কৌল গুরুর নিকটে পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করেন তবেই তাঁহার ভাবশুদ্ধি হইবে। অতএব, সুবুদ্ধি সাধক বিশেষ সাবধানতার সহিত নিজ ভাব-পরায়ণ হইয়া ইষ্টদেবতার পূজাদির অনুষ্ঠান করিবেন। ১৭।

কৌলাবলীতন্ত্রে—

বেদহীনে দ্বিজে চৈব যচ্চ ন শ্রুতিসংক্রিয়া।
বিষ্ণুভক্তিং বিনা দেবি ভক্তি র্ন প্রভবেদ্ যথা॥
শক্তিজ্ঞানং বিনা মুক্তি র্যথা হাস্যায় কল্প্যতে।
গুরুং বিনা যথা তন্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন॥
পতিহীনা যথা নারী সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা।
কুলং বিনা যথা দেব্যা বীরো বা মম সাধকঃ॥
নাধিকারীতি কৌলেয়-তস্মাদ্ ভাবপরো ভবেৎ॥

\+ \+ \+

ভাবাভাবাৎ কুলে শাস্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন।
তেন ভাববিশুদ্ধস্ত সাধকঃ কৌলিকো ভবেৎ॥

বেদহীন দ্বিজে যেমন বৈদিকসংস্কার ফলপ্রদ হয় না, বিষ্ণুভক্তি ব্যতিরেকে ভক্তিতত্ত্বের যেমন পরিস্ফুরণ হয় না, শক্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি যেমন উপহাসের নিমিত্ত কল্পিত হয়, গুরু ব্যতিরেকে কোনরূপেই তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন অধিকার সম্ভবে না, পতিহীনা নারী যেমন সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারবিবর্জ্জিতা, কুলতত্ত্ব ব্যতিরেকে দেবীর অথবা আমার বীরসাধক যেমন নিজ সাধনায় অনধিকারী, ভাবহীন সাধকও তদ্রূপ সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির অনধিকারী। অতএব সাধক সর্ব্বদা ভাবপরায়ণ হইবেন।

ভাবের অভাবে কুলশাস্ত্রে কোনরূপেই অধিকার জন্মে না, সেইহেতু ভাববিশুদ্ধ সাধকই যথার্থ কৌলিক হয়েন।

কৌলাবলীতন্ত্রে—

অথ ভাবং প্রবক্ষ্যামি যথা তন্ত্রানুসারতঃ।
ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
গুরুশ্চ ত্রিবিধশ্চৈব তথৈব মন্ত্রদেবতা। ১।
আদ্যভাবো মহাশ্রেয়ান্ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
দ্বিতীয়ো মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ো বিশ্বনিন্দিতঃ। ২।
বহুজাপাত্তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাত্তু বিস্তরাৎ।
ন ভাবেন বিনা চৈব তন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ। ৩।
কিং বীরসাধনৈর্লক্ষৈঃ কিংবা ক্লিষ্টকুলাকুলৈঃ।
কিং পীঠপূজনেনৈব কিং বিপ্রভোজনাদিভিঃ। ৪।
স্বকুলে প্রীতিদানেন কিং পরেষাং তথৈব চ।
কিং জিতেন্দ্রিয়ভাবেন কিং কুলাচারকর্ম্মণা।
যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা ন স্যাৎ কুলপরায়ণঃ। ৫।
ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলবর্দ্ধনং।
ভাবেন গোত্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ ভাবেন কায়শোধনম্। ৬।
কিং ন্যাসবিস্তরেণৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈঃ।
কিং বৃথা পূজনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে। ৭।
কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা ন বা কেন প্রজপ্যতে।
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবাভাবাৎ প্রজায়তে। ৮।
প্রথমং দিব্যভাবস্তু কথ্যতে তন্ত্রবর্ত্মনা।
স্বর্ণা দেবতা যত্র তত্তেজঃপুঞ্জপূরিতং।
তেজোময়ং জগৎ সর্ব্বং বিভাব্য মূর্ত্তিকল্পনম্। ৯।
তত্তন্মূর্ত্তিময়ৈর্মন্ত্রৈঃ স্বেন স্বেনৈব বা পুনঃ।
আত্মানং তন্ময়ং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং ভাবং তথৈব চ। ১০। ইত্যাদি

তন্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ভাবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছি। ভাব ত্রিবিধ, যথা—দিব্য, বীর ও পশু। এই ভাবানুসারে গুরুও ত্রিবিধ, যথা—দিব্যগুরু, বীরগুরু ও পশুগুরু। মন্ত্রদেবতাও (মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মন্ত্রশক্তি) ত্রিবিধ, যথা—দিব্যমন্ত্র, বীরমন্ত্র ও পশুমন্ত্র অর্থাৎ দিব্যগুরুমুখনির্গত মন্ত্র দিব্যমন্ত্র, বীরগুরুমুখনির্গত মন্ত্র বীরমন্ত্র ও পশুগুরুমুখনির্গত মন্ত্র পশুমন্ত্র। ১। উক্ত ত্রিবিধ ভাব মধ্যে আদ্য অর্থাৎ দিব্যভাব মহামঙ্গলের নিদান ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। দ্বিতীয় অর্থাৎ

বীরভাব মধ্যম, তৃতীয় অর্থাৎ পশুভাবই বিশ্বনিন্দিত। ২। সাধক বহু জপ ও বহু হোম এবং বিস্তর কায়ক্লেশরূপ তপস্যা করিলেও ভাব ব্যতিরেকে তন্ত্রমন্ত্রসকল কখনই ফলপ্রদ হইবে না। ৩। লক্ষ লক্ষ বীরসাধনেই বা কি, বহুক্লেশসিদ্ধ কুলাকুল তত্ত্ববিচারেই বা কি, পীঠক্ষেত্রসমূহে পূজাদিতেই বা কি, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি দ্বারাই বা কি, স্বকুলে প্রীতিদানেই বা কি, পরকুলে প্রীতিদানেই বা কি, জিতেন্দ্রিয় ভাবেই বা কি, কুলাচার কর্ম্মেই বা কি, কুলতত্ত্বপরায়ণ হইয়াও তিনি যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা না হয়েন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই নিষ্ফল। ৪। ৫। ভাবের প্রভাবেই সাধক (নিষ্কাম) মুক্তিলাভ করেন, ভাবের প্রভাবেই (সকাম) সাধকের কুলবৃদ্ধি ও গোত্রবৃদ্ধি হয়, ভাবের প্রভাবেই উভয়বিধ সাধকের কায়শোধন হইয়া থাকে। ৬। ন্যাসের বিস্তারেই বা কি, ভূতশুদ্ধির বিস্তারেই বা কি, বৃথা পূজার অনুষ্ঠানেই বা কি, সাধকের অন্তঃকরণে ভাবের আবির্ভাব যদি না ঘটে। ৭। বিদ্যা (মন্ত্রময়ী দেবতা) কাহার দ্বারাই বা পূজিত না হইয়া থাকেন, কাহার দ্বারাই বা জপ্তা না হইয়া থাকেন, কেবল ভাবের অভাবেই নিয়ত অনুষ্ঠানের ফলাভাব ঘটিয়া থাকে। ৮। তন্ত্রমতে প্রথমত দিব্যভাব কথিত হইতেছে। উপাস্য দেবতার বর্ণ যেরূপ হইবে, সমস্ত জগৎ তাঁহার তাদৃশ তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ, এইরূপ বিভাবনাপূর্ব্বক ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিবে এবং সেই সেই দেবতার সেই সেই মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা অথবা দীক্ষালব্ধ ইষ্টমন্ত্র দ্বারা আত্মাকে এবং পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে তন্ময় দর্শন করিয়া সাধক তাঁহার উপাসনা করিবেন। ইত্যাদি। ৯। ১০

রুদ্রযামলে ষষ্ঠ পটলে—

পুনর্ভাবং পশোরেব শৃণুষ্বাদরপূর্ব্বকং।
অকস্মাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি পশু র্নারায়ণোপমঃ। ১।
বৈকুণ্ঠনগরং যাতি চতুর্ভুজকলেবরঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তো গরুড়বাহনঃ।
মহাধর্ম্মস্বরূপোঽসৌ মহাবিদ্যাপ্রসাদতঃ। ২।
পশুভাবং মহাভাবং ভাবানাং সিদ্ধিদং পুনঃ।
আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদবশ্যকং।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং।
তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্। ৩।

*　　*　　*　　*

পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধবিদ্যামবাপ্নুয়াৎ। ৪।
যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাং।
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। ৫।

যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ।
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ। ৬।

দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্নন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতা-পতয়স্তে ন সংশয়ঃ। ৭।

আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
ভূত্বা বসেন্মহাপীঠং সদাজ্ঞাদো ভবেদ্ যতিঃ। ৮।

কিমন্যেন ফলেনাপি যদি ভাবাদিকং লভেৎ।
ভাবগ্রহণমাত্রেণ মম জ্ঞানী ভবেন্নরঃ। ৯।

বাক্যসিদ্ধি র্ভবেৎ ক্ষিপ্রং বাণী হৃদয়গামিনী।
নারায়ণং পরিহায় লক্ষ্মীস্তিষ্ঠতি মন্দিরে। ১০।

মম পূর্ণতমা দৃষ্টি-স্তস্য দেহে ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং সিদ্ধিমাপ্নোতি সত্যং সত্যং সদাশিব। ১১।

সদাশিব। পুনর্ব্বার সাদরে পশুভাব শ্রবণ কর। পশুও নিজভাবের সাধনবলে নারায়ণসদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অকস্মাৎ ঈদৃশ সিদ্ধিকে লাভ করিতে পারেন, যাহাতে চতুর্ভুজ কলেবর, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত, গরুড়বাহন হইয়া মহাধর্ম্মস্বরূপ সেই সাধক মহাবিদ্যার প্রসাদে বৈকুণ্ঠনগরে গমন করেন। ১। ২। পশুভাবরূপ মহাভাব সমস্ত ভাবেরই সিদ্ধিদায়ক ; যেহেতু সাধক প্রথমে পশুভাবে সিদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ সর্ব্বভাবের উত্তমোত্তম মহাভাব বীরভাবকে অবশ্য আশ্রয় করিবেন। তৎপশ্চাৎ অতি সুন্দর মহাফলজনক দিব্যভাবকে আশ্রয় করিবেন। ৩। পশুভাবস্থিত হইয়াও মন্ত্রী সিদ্ধবিদ্যাকে লাভ করিবেন। ৪। সৌভাগ্যবশতঃ কৌলবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধক যদি পূর্ব্বাপর পরম্পরাক্রমে কুলাচারে উপাসিতা মহাকৌলিক দেবতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পশুভাব ব্যতিরেকে কেবল কুলাচার-পথের পথিক হইয়াও নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিবেন। ৫। অন্যথা, পশুভাবের সাধক যদি সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যার (মন্ত্রশক্তির) প্রসন্নতা (চৈতন্য) লাভ করেন, তবে তিনিই তখন বীরভাবের অধিকারী হইবেন। অনন্তর বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইবেন। ৬। যে সকল নরোত্তম পুরুষগণ দিব্যভাব ও বীরভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা বাঞ্ছাকল্পদ্রুম-লতার অধীশ্বর হয়েন, ইহা নিঃসংশয়। ৭। সাধক আশ্রমী (ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চতুরাশ্রমের যে কোন আশ্রমে অধিষ্ঠিত) ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কোন মহাপীঠের (পীঠমাত্রের) আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক বাস করিবেন। ঈদৃশ সাধক নিজ প্রভাববলে জীবজগতের আজ্ঞাদ (আজ্ঞাদান-কর্ত্তা প্রভু) হইবেন। ৮। সৌভাগ্যক্রমে সাধক

যদি ভাব মহাভাব ইত্যাদির লাভে সিদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে আর তাঁহার অন্য কোন ফলের প্রয়োজন নাই। যেহেতু ভাবগ্রহণ মাত্রেই মানব আমার তত্ত্বের অভিজ্ঞ হয়। ৯। ভাবসিদ্ধ পুরুষের অতিশীঘ্র বাক্যসিদ্ধি হয়, সরস্বতী নিয়ত তাঁহার অন্তর্যামিনী থাকেন এবং বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণকেও পরিহার করিয়া লক্ষ্মী মাতৃবৎ তাঁহার মন্দিরে নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকেন। আমার পূর্ণতমা কৃপাদৃষ্টি নিঃসংশয় তাঁহার দেহে পতিত হয়, তখনই সাধক অবশ্য মহাসিদ্ধি লাভ করেন, সদাশিব! ইহা সত্য সত্য। ১১।

সংসারদৃষ্টিতেও ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীপুত্রাদির ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি তত আত্মহারা এবং তন্ময়; যাঁহার প্রেমে ভাবের এইরূপ প্রগাঢ়তা সিদ্ধ হয়, প্রেমিকের দেহ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিতে তাঁহার প্রেমশক্তিও সেই পরিমাণে সংক্রামিত হয়। এইরূপ উৎকটপ্রেমে প্রেমিক যখন অধীর উন্মত্ত হইবেন তখনই তিনি মদিরা-মদান্ধ পুরুষের ন্যায় সংসারে থাকিয়াও সাংসারদৃষ্টিহীন, বিষয়ে নিত্যমগ্ন হইয়াও বিষয়পাশনির্ম্মুক্ত। যিনি তাঁহার প্রেমের বিষয়, তাঁহার প্রেম-সাধনার প্রয়োজনীয় বলিয়াই সংসার তাঁহার ভালবাসার বস্তু হয়, নতুবা এই মুহূর্ত্তে প্রেমিক যে সংসারকে অতি আদরের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আজ প্রেমের বিষয় যিনি, কাল আবার তাঁহার অভাব হইলেই অমনি সে সংসার তাঁহার চক্ষুতে বিষদিগ্ধ শেলসম বিদ্ধ হয় কেন? পতিপত্নী অথবা পুত্রকন্যা যাহাতে যাহার প্রেমের পর্য্যাপ্তি পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অভাব হইলেই নরনারী তৎক্ষণাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয় অথবা আত্মহত্যা করিয়া প্রেমপাত্রের বিয়োগযাতনা হইতে শান্তিলাভের চেষ্টা করে কেন? সংসারে যে যাহার ভালবাসার পাত্র, তাহার সম্বন্ধ-গন্ধ আছে বলিয়া প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহার সমস্তই প্রেমময় বলিয়া বোধ হয়। প্রেমের পাত্র পতিপত্নী পুত্রকন্যা প্রভৃতি দূরে থাকিলেও তাহাদিগের সম্বন্ধ আছে, এই বলিয়া তাহাদিগের বসনভূষণ খেলার পুতুলগুলি পর্য্যন্তও প্রেমের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; নতুবা পিতামাতা অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা সেইগুলিকেই অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন কেন? এইগুলিই প্রেমরাজ্যের ভাবসিদ্ধির উপকরণ—মৃতপুত্রের পরিহিত বস্ত্রখানি দেখিয়াও পিতামাতা হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হয়েন, প্রোষিতভর্ত্তৃকা সতী পতির পাদুকাদর্শনেও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন না, এ সমস্তও ভাবসিদ্ধিরই প্রকারভেদ। এখন সাধক একবার মনে করুন, এই প্রেম যদি ক্ষণভঙ্গুর সংসারের স্বপ্নদৃশ্য স্ত্রীপুত্রাদিতে না হইয়া সেই নিখিলব্রহ্মাণ্ডপ্রেমের কেন্দ্রভূমি প্রেমময়ী ব্রহ্মময়ী আনন্দময়ী মা জগদম্বার শ্রীচরণাম্বুজে সংস্থাপিত হয়, তবে তাহার ভাবসিদ্ধি তখন কিরূপ হওয়া সম্ভব? পিতামাতা পতিপত্নী পুত্রকন্যার সকল ভক্তি, সকল প্রেম, সকল স্নেহ যে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছে, তাহার ভাব-সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা কোথায় গিয়া সম্ভবে? সাংসারিক জীব! তুমি যদি তোমার

পুত্রকন্যার একটি খেলার সামগ্রী দেখিয়া তাহাতেই ভাবে বিভোর হইয়া কখন হাস, কখন কাঁদ, তবে একবার মনে কর দেখি, যাহার পুত্র বা কন্যার খেলার সামগ্রী এই নিখিলবিশ্বব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড—সে আজ ভাবে বিভোর হইয়া কি না করিতে পারে? তাহার সে ভাবের রাজ্যে যে অভাব বলিয়া কোন পদার্থই নাই। সে এ জগতে যাহা দেখে তাহাতেই যে তাহার ভাবের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। তখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে দিকে চাও, সেইদিকেই যে দিগম্বরীর অন্তরের ছড়াছড়ি। খেলিতে বসিয়া পাগলী মেয়ে কাপড় ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাই ত আজ আকাশময় মায়ের বসন, ব্রহ্মাণ্ডময় মায়ের ভূষণ। বল দেখি আজ ইহা দেখিয়া কোন্ প্রাণে সাধক স্থির থাকিতে পারেন? ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডরূপদর্শী ভক্ত কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অনুরাগের সোহাগে তাঁহার প্রেমের অশান্ত অশ্রু ঝরিতে থাকে, প্রেমের এই পূর্ণভাবের সিদ্ধি যখন উপস্থিত হয় তখনই 'শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং। শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে'—এই শিববাক্য প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতে থাকে। তখনই দিব্যদৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া সাধক দর্শন করিতে থাকেন—যানপাষাণধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতা। জীবজন্তুষু দেবেশি কিং বক্তব্য-মতঃপরং॥ যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে। তখনই তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তর ভেদ করিয়া শিবসঙ্গীতের তরঙ্গলহরী ছুটিতে থাকে—ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং। এই মহাসিদ্ধিরই সাধনা, তাঁহার লীলাময়ী নিত্যমূর্ত্তির উপাসনা। সাধনার সিদ্ধিবলে চৈতন্যময়ী মহামন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের চরণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যখন অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-লীলাতত্ত্বসকল দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ হইতে থাকে তখনই সৌভাগ্যশালী সাধকের সম্মুখে তাঁহার সেই মহাভাবতন্ময়তার বিরাট কবাট খুলিয়া যায়। তাই তখন সাধকের নিকটে মায়ের ঐ ভুবনমোহন রূপের ছটায় তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীরূপে পরিস্ফুটিত সেই বিরাট-লীলার লক্ষণ-সকল যেমন মহাপ্রেমের উদ্দীপন, অনুরাগের আকর্ষণ, নয়নের স্নিগ্ধাঞ্জন, হৃদয়ের আনন্দকানন, প্রাণের অন্তস্তলভেদী অমৃতের প্রস্রবণ তেমন আর কিছুই নহে। এই অনুরাগের অঞ্জনে নয়নরঞ্জিত হইলেই কাদম্বিনীর স্তরে স্তরে মহাকালনিতম্বিনীর দলিতাঞ্জন-পুঞ্জকান্তিকিরণচ্ছটা পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, ময়ূরের নীলকণ্ঠে নীলকণ্ঠমনোমোহিনীর প্রভা তখন প্রতিভাত হয়, বিকচ-নবনীলোৎপলের নিবিড়নীল দলে দলে, অপরাজিতা কুসুমের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামরূপে তখন শ্যামারূপের অনন্ততরঙ্গ ছুটিতে থাকে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই তখন বিশ্বপ্রসবিত্রী মহাপ্রকৃতির গুপ্তলীলার রহস্য দেখিয়া সাধক আত্মহারা হইয়া যান। আমি যাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার গৌরবে গৌরবিত বসন ভূষণ অনুলেপন ইত্যাদি যে কোন চিহ্ন আমার তখন যেমন আদরের গৌরবের সোহাগের

অভিমানের সম্পত্তি, তেমন আর কিছুই নহে। যে চিহ্ন দর্শনে স্পর্শনে আমি তাঁহার, কথা স্মরণ করিয়া পলকে পলকে পুলকে পূর্ণ হই, যে চিহ্ন শূন্য দেখিলে জীবন্ত মানুষের মূর্ত্তি আমার চক্ষুতে পিশাচের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয়, যাহা হারা হইলে এ সংসার নরকেরই রূপান্তর বই আর কিছুই নহে, কৈবল্যধামের সেই দেবদুর্ল্লভ চিহ্নসকল আমাকে সংসারসাগর হইতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার সেই চিদানন্দসত্তা-সাগরে ডুবাইবার একমাত্র অমোঘ উপায়। তাই কেবল পূজার সময়ে নহে, সেই মহাভাবতন্ময়তাসিদ্ধির নিমিত্ত সে চিহ্ন নিয়ত অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য স্বয়ং জগদ্‌গুরু শাস্ত্রে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই আজ্ঞা অনুসারেই শৈব বৈষ্ণব সৌর শাক্ত গাণপত্য পঞ্চ উপাসকের পরিধান পরিচ্ছদ তিলকাদি-ধারণও পঞ্চবিধ প্রকারভেদেই বিহিত হইয়াছে। যথা, শৈবের ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিশূল, বিভূতি, জটাজূট, রুদ্রাক্ষ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ডমরু, নরকপাল ইত্যাদি। বৈষ্ণবের উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র, পীত বা শুক্লাম্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন, তুলসীমালা, গোপীচন্দন ইত্যাদি। সৌরের রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার তিলক, রক্তবস্ত্র, পদ্মবীজমালা ইত্যাদি। গাণপত্যের পীত বা রক্তবস্ত্র, রক্তত্রিপুণ্ড্র, সর্পসূত্র, যোগদণ্ড প্রভৃতি। শাক্তের সিন্দূর-কুঙ্কুম-রক্ত-চন্দনাদিময় অর্দ্ধচন্দ্র, যন্ত্রতিলক, মুক্তকেশ, রক্তাম্বর ত্রিশূল ইত্যাদি। এ সমস্তই কেবল সেই 'দেব এব যজেদ্দেবং' মহাবাক্যের অনুশাসন বই আর কিছুই নহে। কি দৃশ্যতঃ, কি কার্য্যতঃ, কি দেহতঃ, কি শক্তিতঃ সাধককে সর্ব্বতোভাবে সেই উপাস্য দেবতার বিভূতিময় হইতে হইবে। দেবতার পূজা ইত্যাদিকে যাঁহারা বিরুদ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তিলক ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি রক্তবস্ত্র তুলসী রুদ্রাক্ষমালা ইত্যাদিকে তাঁহারা ভণ্ডামীর জ্বলন্ত প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা নিত্যপূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাঁহাদিগেরও অনেকের মনে ধারণা এই যে, তিলক ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি যাহা কিছু, ও কেবল দেবতার নির্ম্মাল্য চন্দনাদি গ্রহণেরই প্রকারভেদ—যে কোনরূপে হউক, একটু গ্রহণ করিলেই হইল, তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বা চন্দন লেপিয়া চিতা বাঘ সাজিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপহাসাস্পদ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ আবার মনে করেন, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরোপাসনা অন্তরের বস্তু, তাহার চিহ্ন আসার বাহিরে আনা কেন? কাহারও কাহারও বিশ্বাস—বাহিরে ফোঁটা তিলক দেওয়াও কেবল আমি ধার্ম্মিক হইয়াছি, ইহাই লোককে শুনাইবার বিজ্ঞাপন-বিশেষ। মতান্তরে, এই তিলক মালাদি ধারণ-ব্যাপার নির্লজ্জতা ও মূর্খতার দৃষ্টান্ত বিশেষ। এইরূপ নানা মুনির নানা মত দেখিয়া, শ্রদ্ধাসত্ত্বেও অনেকে উহা ধারণাদি করিতে সভ্যসমাজে আপনাকে বড়ই লজ্জিত মনে করেন। যাঁহারা এইরূপ লজ্জিত তাঁহাদিগকে লজ্জাশীল বলিয়া আমরা প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগের লজ্জার নির্লজ্জতা দেখিয়া অনেক

সময়েই বিস্মিত হইয়া পড়ি। অথবা তাঁহাদিগের অন্তরে লজ্জাই অতিলজ্জিতা, তাই বাহিরে এত লজ্জার ছড়াছড়ি। ইষ্টদেবতার উপাসনা সময়েও অন্যে কি ভাবিবে, কি বলিবে এই চিন্তায় যাঁহারা ভীত চকিত, বলিহারি তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ও দেবভক্তিতে। অন্যে কি বলিবে, এইটুকুর প্রতিকার বা সহিষ্ণুতার শক্তি যাহাদিগের নাই, সে সকল নির্লজ্জের মুখে আবার সিদ্ধিসাধনার কথা কেন? অথবা সিদ্ধিসাধনা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নহে, সভ্য-সমাজের হিন্দুয়ানী রক্ষাই উদ্দেশ্য—তবে সিদ্ধিসাধনার নাম দিয়া তাহাকে আর একটু উজ্জ্বল করিয়া লওয়া এইটুকু মাত্রই প্রভেদ। কারণ সিদ্ধিসাধনা ইহা সাধন ধর্ম্মেরই কথা। গৌণ মুখ্যভেদে সংসারধর্ম্ম ও সাধনধর্ম্মের প্রকারভেদ; যথা—সংসারসেবার অবিরোধে যতটুকু ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, সেই ধর্ম্মের নাম সংসার-ধর্ম্ম; আর ধর্ম্মানুষ্ঠানই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সংসার তাহার বিরোধে থাকে থাক্, যায় যাক্, তাহাতে যেখানে ক্ষতি নাই, তাহারই নাম সাধন-ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের অধিকারে তন্ত্রে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বজ্ঞের আজ্ঞা—

নিন্দন্তু বন্ধবাঃ সর্ব্বে ত্যজন্তু স্ত্রীসুতাদয়ঃ।
জনা হসন্তু মাং দৃষ্ট্বা রাজানো দণ্ডয়ন্তু বা।
সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে।
ত্বৎকর্ম্ম নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ॥
এবমাপদ্‌গতস্যাপি যস্য প্রজ্ঞা সুনিশ্চলা।
সত্যং সত্যং মহেশানি তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥

বন্ধুবান্ধবগণ নিন্দা করুক, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যায় যাক্, লোক-সকল আমাকে দেখিয়া উপহাস করে করুক্, রাজপুরুষগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত করে করুক্, মা পরমদেবতে! তোমার সেবা করিব, তোমার সেবা করিব, আবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্রিসত্যে বলিতেছি—তোমার সেবা করিব। কি মন, কি বাক্য, কি দেহ ইহার কিছু দ্বারাই তোমার উপাসনা ত্যাগ করিব না (অর্থাৎ তোমার উপাসনা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিব না)। মহাদেব মহাদেবীকে বলিতেছেন, আপদ্‌গত হইলেও এই বুদ্ধি যাহার সুনিশ্চলা থাকে, মহেশ্বরি! সত্য সত্য তাহার সিদ্ধি অদূরে নৃত্য করিতেছে। সাধক দেখিয়া লইবেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মনের অন্তর্যামী যিনি, এই সকল অধিকারীর মনের তত্ত্ব, মনের বল, তাঁহার জানিতে বাকী নাই; তাই তিনি শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, এই মন যদি পাও, তবেই সাধনায় অগ্রসর হও। আজ সেই আপন মন ভুলিয়া পরের মন রক্ষা করিয়া যাহারা সাধন পথে অগ্রসর হয় তাহাদের এ মন যে কি মন, তাহা আর কেমনে বুঝাইব, তাহা জানি না; কিন্তু কেমন করিয়া এমন মন বুঝিব, তাহা ভাবিতেই আমাদিগের মন ব্যাকুল। কেন তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি এত দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়, কাহাকে দেখিয়া এত ভয়?

আর যাহারা ভয় দেখায় তাহারাই বা কে, কেন ভয় দেখায়—তাহাই অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হিংস্রক জন্তুর মধ্যে আমরা এরূপ অনেক জাতি দেখিতে পাই, যাহারা নিরীহ মানুষ দেখিলেও তাহার প্রতি ভ্রুকুটিভঙ্গী তর্জ্জন গর্জ্জন ইত্যাদি বিভীষিকা সকল প্রদর্শন করে। যাহাদিগকে লইয়া তাহাদিগের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবার কথা, মানুষ তাহাদিগের কিছুর মধ্যেই নহে। যাহারা তাহাদিগের সজাতীয়, বাসস্থান আহার বা ভোগ্যবস্তু লইয়া যাহাদিগের সহিত পরস্পর দ্বন্দ্ব বিসংবাদ তাহাদিগের নিত্যসিদ্ধ, মানুষ তাহাদিগের সম্প্রদায় হইতে শত যোজন দূরান্তরে অবস্থিত, তথাপি যাতায়াত পথমধ্যে যদি দৈবাৎ কোন এক সময়েও সাক্ষাৎ হয়—তবেই বিভীষিকা। মহিষের সেই লোহিত নেত্রে বিকট কটাক্ষ, হেলায়িত শৃঙ্গাগ্রে আঘাতের সন্ধান, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পকারী গাঁ গাঁ ধ্বনি। বৃষের সেই গ্রীবাভঙ্গ, অশ্বের সেই পদতাড়না, কুক্কুরাদির বদনব্যাদান লাঙ্গুলবিক্ষেপ, সর্পের ফণাবিস্তার তর্জ্জন গর্জ্জন, বানরের ভ্রুকুটিভঙ্গী লম্ফ ঝম্ফ ইত্যাদি, এ সকল কেন ঘটে? বস্তুতঃই কি ইহারা মানুষকে দেখিলে নিজ নিজ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহে? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের অবশ্যই কোন না কোন স্বার্থের সন্ধান থাকিত —সেই স্বার্থই বা কি? যাহাই হউক, স্থূল প্রত্যক্ষরূপে আমরা দেখিতে পাই বা না পাই—কোন না কোন স্বার্থ তাহার মূলে রহিয়াছেই, ইহা প্রাকৃতিক নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। অবশ্য আমরা সে সিদ্ধান্তকে তাহাদিগের হিংসাবৃত্তি-চরিতার্থতার উপায় বলিতে পারি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হিংসার আবরণে আবৃত তাহা তাহাদিগের আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র। হিংসা—হননের ইচ্ছা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি এবং তাদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন মানব মধ্যেও ঐ হননপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা খাদ্যখাদক সম্বন্ধ স্থলেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, আর তদ্ভিন্নও দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে কোন না কোন স্বার্থের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। অথবা অন্য স্বার্থের ব্যাঘাত না থাকিলেও যে স্থলে আত্মরক্ষা সম্বন্ধে আশঙ্কা বা ভয়ের সম্ভাবনা, সে স্থলেও ঐরূপ বৃত্তি-চরিতার্থতার আভাস পরিলক্ষিত হয়। মানুষকে দেখিয়াও পশু পক্ষী ইত্যাদি জীবজন্তুর সেই আশঙ্কা, মানুষ তাহাদিগের প্রতি কোন বিদ্বেষবৃত্তির পরিচয় না দিলেও তাহারা মানুষকে দেখিয়াই অন্তরে অতি ভীত হয় এবং চেষ্টার দ্বারা ভয় দেখাইয়া সেই ভয়নিরাকরণেরই উপায় করিয়া থাকে; তজ্জন্যই তাহাদিগের লম্ফ ঝম্ফ তর্জ্জন গর্জ্জন ভ্রুকুটিভঙ্গী ইত্যাদি। ধর্ম্মের অমোঘশাসনে এ বিশাল বিশ্বরাজ্য নিয়ত শাসিত এবং যথানিয়মে স্ব স্ব কার্য্যে নিরন্তর পরিচালিত; রাজার রাজদণ্ডে যাহার অন্তঃকরণ ভীত হয় না, সমাজদণ্ডকে যে গ্রাহ্য করে না, অধিক কি, জগতে কাহাকেও যে ভয় করে না, তেমন প্রচণ্ডপ্রকৃতি দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়ও

পরিণামে ধর্ম্মের ভয়ে থর থর কাঁপিতে থাকে। কি জানি ধর্ম্মের কি অতুল্যমহীয়সী বিশ্ববিজয়িনী শক্তি, যাহার নিকটে এই সসুরাসুর চরাচর জগৎ ভীত চকিত কম্পিতভাবে নিরন্তর মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। যে শাসনে জড়জগৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে চিরশাসিত, সেই শাসনে আজ শিক্ষিতসম্প্রদায় শাসিত হইবেন ইহা কিছু বিচিত্রবার্ত্তা নহে। যে যাঁহাকে দেখিয়া ভয় করে, তাঁহার কোন না কোন চিহ্ন দেখিলে তাহার অন্তঃকরণে স্বতএব সেই সকল ভয় বিভীষিকার উদ্দীপনা হইতে থাকে। যিনি ধর্ম্মের নিত্যসেবক, ধর্ম্মের কথা মনে হইলে তাঁহার কখনও আনন্দ ভিন্ন ভয়ের সঞ্চার হয় না। আর মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, মনে মনে ইহা যিনি নিশ্চিত জানেন যে, ধর্ম্মের পথে আমি নিত্য অপরাধী, কাহারও কোন না কোন ধর্ম্মচিহ্ন দেখিলেই তাঁহার অন্তঃকরণ স্বতএব ভীত হইয়া পড়ে। এ ভয়ের মূল কেবল আমার গতি কি হইবে? দ্বিতীয়ত, আমারই সদৃশ হস্তপদাদি আকার-প্রকারবিশিষ্ট, আমারই সজাতীয় অন্য একজন অনায়াসে আমাকে দূরে ফেলিয়া সেই শাশ্বত অভয় পথের পথিক হইতে চলিল, এই ঈর্ষা ও অসূয়া আসিয়া সেই ভয়কে তখন আচ্ছন্ন করিয়া নিজবৃত্তির বিকাশ করিতে থাকে, অধার্ম্মিকের দুর্ব্বল অন্তঃকরণ তখন আত্মহারা হইয়া মূলে সে ভয়ের তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না— ঈর্ষা ও অসূয়ার দাসত্ব করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ মনে করে। ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সেবায় সক্ষম হউক বা না হউক, সংসারে সকলেই অধার্ম্মিক নহে, বরং অক্ষমতানিবন্ধন বিশেষ দুঃখিত, এইরূপ জনসংখ্যাতেই সমাজ ও সংসার পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যে গতি, তাহাতে শতাবধি পুরুষের মধ্যে দশজন অনুষ্ঠায়ী ধার্ম্মিক পাওয়া কঠিন। আমি নিজে অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে না পারিলেও কাহাকেও ঐরূপ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠায়ী দেখিলে তাঁহার প্রতি স্বতএব ভক্তিশ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি এবং কেহ আমার মত হইলেও অনুষ্ঠানবিবর্জ্জিত বলিয়া আমাকে আমি যেমন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি, তাঁহাকেও তদ্রূপই ঘৃণা করিয়া থাকি। এইরূপে শিখা-সূত্র-তিলক-মালাদিধারী অনুষ্ঠায়ী পুরুষ সমাজের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবারই অধিকারী এবং হইয়াও থাকেন তাহাই। অনুষ্ঠানপরাঙ্মুখ উদ্ধতসম্প্রদায়েরও সেই সঙ্গে সঙ্গেই অধঃপতিত হইবার কথা, হইতেছেনও তাহাই। যথার্থ অনুষ্ঠায়ী পুরুষ স্বপ্নেও কখন ইহা অন্তরে স্থান দেন না যে, জনসমাজে আমার সম্মান গৌরব বহুলবিস্তৃত হউক, কিন্তু তথাপি ধার্ম্মিকের দেহে ধর্ম্মের সেই বিশ্ববিমোহিনী মহাশক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নরনারীর কথা দূরে থাক, পশু পক্ষী প্রভৃতিকেও নিজপ্রভাবে অভিভূত করিয়া তুলেন। নরনারীর স্বতএব তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, অনুষ্ঠায়ী স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের চক্ষুতে ইহা শূলস্বরূপ বিদ্ধ হয়, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মের নিরোধের উপায় নাই অথচ পশুপ্রকৃতিতে ইহা সহ্যও হয় না,

তখনই উপায়ান্তর না দেখিয়া শিক্ষিতাভিমানী স্বেচ্ছাচারিদল ধার্ম্মিকের তিলকমালা বসনভূষণ ইত্যাদির প্রতি অযথা কটূক্তিবর্ষণ শ্লেষ ব্যঙ্গ উপহাস প্রভৃতির অভিনয় করিতে থাকেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মচিহ্নের নিন্দাবাদ বা অযথাত্ব প্রতিপাদন করা তাঁহাদিগের ঐ সকল শ্লেষব্যঙ্গাদির উদ্দেশ্য নহে, আমাদিগেরই মধ্য হইতে আমাদিগের মত একজন সংসারে ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানভাজন হইতেছেন, ইহাই তাঁহাদিগের অসহ্য। সুতরাং সেই সম্মাননাশের জন্য, তাঁহার অসারতা প্রতিপাদনের জন্য যদি ধর্ম্মের বা ধর্ম্মলক্ষণাদির নিন্দা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এই শ্লেষব্যঙ্গাদির ভয়ে ধার্ম্মিক যদি ধর্ম্মচিহ্ন পরিত্যাগ করেন অথবা পরিত্যাগ না করিলেও লোকে তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য অপদার্থ বলিয়া মনে করে, তাহা হইলেই ত ব্যঙ্গকারী কৃতার্থ হইলেন, কেননা সব ভাই সমান হইলেই তাঁহাদিগের জয় জয়। কোন সূত্রে কোন লক্ষণে কোন কার্য্যে কেহ আর ধর্ম্মের কথা মনে করিয়া না দেয়, তাহা হইলেই তাঁহারা ভয় বিভীষিকার তাড়না হইতে নিস্তার পান।

এখন জিজ্ঞাসা করি, সাধক! তুমি কি এই সকল বীরপুঙ্গবের ভয়ে নিজ সাধনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাও? পশুবৃত্তির পদলেহন করিয়া যে সকল কাপুরুষ এইরূপে পদে পদে নীচবৃত্তির পরিচয় দেয় তাহাদিগকে কি তুমি সত্য সত্যই মনুষ্য মধ্যে গণ্য কর? পশু যদি ভয় দেখায়, এই ভয়ে কি তুমি মানুষোচিত পরিধান পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে চাও? মানবে ও পশুত্বে যে ভেদ, সাধকে ও সাংসারিক পুরুষে সেই ভেদ, তোমার সেই মানবত্ব লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র তোমাকে দেবত্বের উচ্চসোপানে আরোহণের অধিকার দিয়াছেন। তুমি যদি আজ সেই হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিয়া পশুর দেখাদেখি পশু হও, তবে আর দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া এ বিড়ম্বনা কেন? পরমদেবতার মহামন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া এ অধঃপাত কেন? রাজরাজেশ্বরীর কুমার হইয়া বনে বনে পশুর সঙ্গে এ পর্য্যটন কেন? সত্য তুমি পশুর ভয়ে ভীত, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, যাহা বলিলাম তাহাতে তুমিই পশুর ভয়ে ভীত, কি পশুই তোমার ভয়ে ভীত? সকলেই জানে—কংসের ভয়ে অক্রুর ভীত, কিন্তু একবার মনে কর দেখি, কংসের ভয়ে অক্রুর ভীত, কি অক্রুরের ভয়েই কংস ভীত? অক্রুরের তিলকমালা বসন ভূষণ ইত্যাদি কংসের অসহ্য হইত, ইহা সত্য; কিন্তু কেন অসহ্য হইত, এ কথার উত্তর কি? কালজলধর দেবকীনন্দন কালরূপে কংসের মস্তকে নির্ঘাত বজ্রনিক্ষেপের জন্য গোকুলে নন্দমন্দিরে অবতীর্ণ, কংসহস্তচ্যুতা অচ্যুতসোদরা নগেন্দ্রনন্দিনী নন্দনন্দিনীরূপে যদি ইহা আদেশ না করিতেন, শয়নে স্বপনে অশনে গমনে আসনে উপবেশনে যদি সেই গোপবালকরূপী ভগবান কালদণ্ডধররূপে কংসের নয়নে নয়নে না ফিরিতেন, তবে কি কংস কখনও কাল বলিতে কালভয়ে মূর্চ্ছিত হইত? তবে কি দেবদ্বিজ-হিংসা ও শিশু-হত্যার জন্য

কংসের প্রচণ্ড আজ্ঞা মথুরামণ্ডলে বিঘোষিত হইত? তবে কি প্রশান্ত রাজসিংহাসনে বসিয়াও অকস্মাৎ উদ্ভ্রান্তনেত্রে মার্-মার্ রবে কংস ধাবিত হইত? তাই বলি একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, ভগবানকে এবং ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীকে কংস যে ভয় প্রদর্শন করিত, সে কি ভগবানকে ভয় দেখাইবার জন্য, না ভগবানের ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য? অসুর ভগবানকে ভগবান বলিয়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারিত না, তাই আসুরিক বিভীষিকায় তাঁহার হস্তে অব্যাহতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিত। কংস ভগবানের বিদ্বেষ্টা ছিল, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীও তাহার বিদ্বেষের পাত্র হইয়াছিলেন, কেননা ভক্তের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ভগবানের ভক্তিলক্ষণেই লক্ষিত এবং বিভূষিত। সেই লক্ষণ দেখিলেই অসুরের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু ভক্তচূড়ামণি অক্রূর কি সেই ভয় দেখিয়া ভীত হইতেন? তিনি লোকের ভয়, কংসের ভয়, ভবের ভয় ঘুচাইবার জন্য ভয়ের ভয় ভগবানকে বৃন্দাবন হইতে কংসমন্দিরে উপস্থিত করিয়া কংসের ইহ পরলোকের সকলভয় ঘুচাইবার উপায় করিয়া দিলেন। অক্রূর যদি যথার্থই কংসকে ভয় করিতেন এবং সেই ভয়ের মূলে যদি কংসের প্রতি যথার্থই অক্রূরের বিদ্বেষ থাকিত, তবে কি তিনি বৃন্দাবন হইতে জগদ্বন্ধুকে মথুরায় আনিয়া কংসের এই ইহ-পরলোকের চিরবন্ধুত্ব সাধন করিতেন? তিলকমালা কৃষ্ণনাম শুনিয়া বিদ্বেষ করে করুক, কিন্তু মথুরাতে তাহার ঐরূপ বিদ্বেষভাজন একজন ছিলেন বলিয়াই অসুর হইয়াও কংস দেবদুর্ল্লভ গতি লাভ করিল। তাই বলি সাধক! ধর্ম্মলক্ষণবিদ্বেষ্টা অসুরসম্প্রদায়কে যদি তুমি লৌকিকদৃষ্টিতে বিদ্বেষের পাত্র বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তিলকমালা ছাড়িয়া তুমি তাহার প্রশমনের কোন উপায় করিতে পারিবে না; আর ভগবানের অনুগ্রহে যদি তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিবার অধিকার পাইয়া থাক, তাহা হইলেও তিলকমালার কল্যাণেই তুমি তাহাদিগকে সে কৃপা করিতে সমর্থ হইবে—অন্যথা নহে!

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রদর্শিত হইল, ইহা হইতেই সাধকবর্গের ইহা সম্পূর্ণ অবগত হইবার সম্ভাবনা যে, পূর্ব্বোক্ত তিলক ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি যাহা কিছু সাধকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিগত ধর্ম্মলক্ষণ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই কেবল সেই পূর্ব্বোক্ত মহাভাব-তন্ময়তা-সিদ্ধির প্রধান উপকরণ। যিনি ভাবের প্রগাঢ়তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষের এই সকল বাহ্যলক্ষণের সদ্ভাবে ও অসদ্ভাবে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না হইলেও অপক্কসাধনাশয় সাধনোন্মুখ সম্প্রদায়ের পক্ষে এই সকল লক্ষণের অভাব যে, মহাভাব-কবাট-উদ্ঘাটনের একমাত্র প্রতিবন্ধক ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। এই ভাবেরই পরিপক্ক অবস্থার নাম তন্ময়তা অর্থাৎ মনঃপ্রাণ দেহ আত্মা ইন্দ্রিয় এবং পরিদৃশ্যমান এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বস্তুতত্ত্বে উপাস্যদেবতার স্বরূপবিভূতি-সন্দর্শনে,

আত্মবিস্মৃতি। এই তন্ময়তা-সিদ্ধির একমাত্র মূল, মন্ত্রশক্তি। পূজার উপচার ইত্যাদি যাহা কিছু, সে সমস্তও সেই মন্ত্রশক্তির প্রত্যক্ষতারই উপকরণ। মন্ত্রশক্তির প্রভাবে কিরূপে সাধকের দেহে সেই ভাব-তন্ময়তাসিদ্ধি উপস্থিত হইবে, পূজাতত্ত্বের অভিজ্ঞ সাধকগণ নিশ্চিতই তাহা অবগত আছেন, তথাপি আমরা সাধনোৎসুক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য এস্থলে ইঙ্গিতে তাহার দিঙ্‌মাত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

॥ ১। পূজাগৃহপ্রবেশ ॥

অন্নদাকল্পে, ষষ্ঠ পটলে—

ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ।

অনন্তর (স্নান ও তিলকাদি ধারণের পর) সাধক ইষ্টদেবতার পূজামন্দিরের দ্বারের সম্মুখে সামান্যার্ঘ্য সংস্থাপন করিবেন।

কমলাতন্ত্রে, অষ্টম পটলে—

পুষ্পাঞ্জলিনা দ্বারে চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাং।
ততস্তু সাধকঃ শ্রীমান্ প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপম্॥

মন্দিরের দ্বারদেশে পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিয়া সাধক তদনন্তর যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

নিগমকল্পলতায়াং, ১৪শ পটলে—

পূর্ব্বাদ্বারে চ দক্ষে চ পশ্চিমে চ তথোত্তরে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ততো যন্ত্রান্তরে যজেৎ॥

প্রথমত, পূজাগৃহের পূর্ব্বদ্বারে, তৎপর দক্ষিণদ্বারে, তৎপর পশ্চিমদ্বারে এবং তৎপর উত্তরদ্বারে বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক দ্বারদেবতার পূজা করিয়া তৎপর সাধক যন্ত্রমধ্যে ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

অশক্তৌ দ্বার একস্মিন্ কল্পয়েদ্ দ্বাশ্চতুষ্টয়ং।
অভাবে মনসা কল্প্য দ্বারাণ্যেতৎ সমাচরেৎ॥

চতুর্দ্বারসম্বলিত মন্দির নির্ম্মাণে অসমর্থ হইলে অথবা চতুর্দ্বারে পূজায় অসমর্থ হইলে একদ্বারেই মানসিক দ্বারচতুষ্টয় কল্পনাপূর্ব্বক সাধক চতুর্দ্বারদেবতার পূজা করিবেন।

শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং—

দক্ষিণেনাথ পাদেন প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপং।

দক্ষিণপদকে অগ্রসর করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে।

মেরুতন্ত্রে—

দক্ষপাদং পুরস্কৃত্য প্রবিশেদ্ দেবমন্দিরং॥

দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবে।

সম্মোহনতন্ত্রে, তৃতীয়পটলে—

স্বাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা।

সাধক নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া প্রথমত দক্ষিণ পদদ্বারা পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

গৌতমতন্ত্রে, অষ্টম অধ্যায়ে—

ভূতসঙ্ঘান্ সমুৎসার্য্য দক্ষপাদপুরঃসরঃ।

ধ্যায়ন্ বিষ্ণুং গৃহাভ্যন্তঃ প্রবিশেন্নতকন্ধরঃ॥

ভূতবর্গকে উৎসারিত করিয়া বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দক্ষিণ পদক্ষেপপূর্ব্বক নতকন্ধর হইয়া সাধক সাধনাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন।

তন্ত্রান্তরে—

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরং।

স্মরণ্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥

দ্বারদেশে নিজ বামভাগকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ দ্বারের মধ্যস্থান হইতে প্রবেশ না করিয়া দ্বারের দক্ষিণ অর্থাৎ সাধকের বামভাগকে অবলম্বনপূর্ব্বক বামপদক্ষেপ পুরঃসর দেবীর চরণাম্বুজ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সাধক মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

ত্রিপুরার্ণবে—

বামপাদং পুরস্কৃত্য প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপং।

বামপদকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

॥ ২। বিঘ্নাপসারণ॥

শাম্ভবীতন্ত্রে, অষ্টম পটলে—

ততো দিব্যাংশ্চান্তরীক্ষান্ ভৌমান্ বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ।

দিব্যদৃষ্ট্যা চাস্ত্রতোয়ৈঃ পার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ চ॥

অনন্তর (মণ্ডপ প্রবেশের পর) সাধক দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দিব্যবিঘ্নকে, অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্নসমূহকে এবং পার্ষ্ণিঘাতত্রয় দ্বারা পার্থিব বিঘ্নসমূহকে নিবারিত করিবেন।

সম্মোহনতন্ত্রে, তৃতীয় পটলে—

গৃহং প্রবিশ্য কুর্য্যাচ্চ পূজাদ্রব্যনিরীক্ষণং।
অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ॥
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্।
পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভি র্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ॥

গৃহপ্রবেশের পর দেশিকেন্দ্র পূজাদ্রব্য সমস্ত নিরীক্ষণ করিবেন, তৎপর দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অবলোকনে দিব্যবিঘ্নসমূহকে উৎসারিত করিবেন, অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জল দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্নসমূহকে উৎসারিত করিবেন এবং তিনবার পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা পার্থিব বিঘ্নসমূহকে নিবারিত করিবেন।

দিব্যদৃষ্টিস্তু গন্ধর্ব্বতন্ত্রে, অষ্টম পটলে—

আত্মনঃ ক্রোধদৃষ্ট্যা তু নিরীক্ষ্য সুমনা ভবেৎ।

নিজের ক্রোধদৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণপূর্ব্বক সাধক সুমনা হইবেন।

বিশ্বসারতন্ত্রে, দ্বিতীয় পটলে—

অনিমেষচক্ষুষা দৃষ্টি র্দিব্যদৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা।

নির্নিমেষ চক্ষুর দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহারই নাম দিব্যদৃষ্টি।

মেরুতন্ত্রে, পঞ্চম প্রকাশে—

তির্য্যগ্‌দৃষ্ট্যাবলোকেন দিব্যান্ বিঘ্নান্নিবারয়েৎ।

তির্য্যগ্ দৃষ্টির অবলোকন দ্বারা দিব্য বিঘ্নসমূহকে নিবারিত করিবেন।

এই বচনসমূহের একবাক্যতায় ইহাই ফলিত সিদ্ধান্ত হয় যে, নির্নিমেষ অথচ সক্রোধ তির্য্যগ্ দৃষ্টির নামই দিব্যদৃষ্টি।

কালীকুলামৃত তন্ত্রে—

বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং দত্ত্বা ভৌমান্নিবারয়েৎ।

বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্নসমূহকে নিবারিত করিবেন।

রাঘবভট্টধৃত সোমশম্ভৌ—

দক্ষপার্ষ্ণিত্রিভির্ঘাতৈ র্ভূমিষ্ঠানিতি।
(বামদক্ষিণভেদস্তু দেবদেব্যুপাসকভেদেনেতি)

দক্ষপার্ষ্ণিঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্নসমূহকে নিবারিত করিবেন। (এই পরস্পর বিরুদ্ধ বচনদ্বয়ের সিদ্ধান্ত এই যে—কি দ্বার প্রবেশে, কি পার্ষ্ণিঘাতে দেবের উপাসকগণ

দক্ষিণপাদ প্রসারণ করিবেন এবং দক্ষিণপাদপার্ষ্ণির ঘাত প্রদান করিবেন, দেবীর উপাসকগণ বাম পাদ প্রসারণ করিবেন এবং বামপার্ষ্ণির ঘাত প্রদান করিবেন)।

তন্ত্রসারে—

আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনং।
অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ।

প্রথমে বিঘ্নসমূহের উৎসারণপূর্ব্বক সাধক পশ্চাৎ আসন কল্পনা করিবেন অথবা আসনে উপবিষ্ট হইয়াই বিঘ্নোৎসারণ করিবেন।

॥ ৩। আসন॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সপ্তম পটলে—

আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং ন চোচ্ছ্রিতং।
আসনঞ্চার্ঘ্যপাত্রঞ্চ ভগ্নমাসাদয়েন্ন তু।
কৃষ্ণাজিনে মোক্ষসিদ্ধিঃ শ্রীমোক্ষৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
কাম্যার্থং কম্বলঞ্চৈব-মভীষ্টং রক্তকম্বলে।
কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধি র্মারণে কৃষ্ণকম্বলং।
ত্রিপুরাপূজনে শস্তং রক্তকম্বলমাসনং।
নৈতদ্দ্বিহস্ততো দীর্ঘ সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতং।
ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহেৎ।
যথেষ্টং চার্ম্মণং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধিদায়কং।
ন দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতি র্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রানিম্বকদম্বানা মাসনং বংশনাশনং।
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসে চ হতাঃ শ্রিয়ঃ।
বংশেষ্ট-কাষ্ঠ-ধরণী-তৃণপল্লবনির্ম্মিতং।
বর্জ্জয়েদাসনং মন্ত্রী দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুঃখদং।
নারাচৈ র্বা বিভিন্নং স্যাদ্বিশীর্ণং ভগ্নমেব চ
পর্য্যুষিতং পরেষাস্তদধৌতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গাম্ভারীনির্ম্মিতং শস্তং নান্যদারুময়ং শুভং।
ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ।
কাষ্ঠাদিকাসনং কুর্য্যান্মিতমেবং সদা প্রিয়ে।
চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলেন দীর্ঘং কাষ্ঠাসনং প্রিয়ে।
ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণ-মুচ্ছ্রায়াচ্চতুরঙ্গুলং।

ধরণ্যাং বস্ত্রসংযোগা-দ্দারুজে কম্বলস্য চ।
কৌশে চাজিনসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং।
যথাশক্তিমতো মন্ত্রী শস্তাসনমুপাবিশেৎ॥

অনন্তর সাধক, অতি নীচ না হয় এবং অতি উচ্চ না হয়, এরূপ আসন পরিগ্রহ করিবেন। আসন ও অর্ঘ্যপাত্র ভগ্ন হইলে তাহা কখনও গ্রহণ করিবেন না। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের আসনে সাধকের মোক্ষসিদ্ধি হয়, ব্যাঘ্রচর্ম্মে সম্পদ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধ হয়। কাম্য-কর্ম্মে কম্বলাসনই প্রশস্ত, বিশেষত রক্তকম্বলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধি, মারণে কৃষ্ণকম্বল প্রশস্ত, ত্রিপুরসুন্দরীর পূজায় রক্তকম্বল আসন প্রশস্ত। দুই হস্তের অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়, সার্দ্ধ (১॥) হস্তের অতিরিক্ত বিস্তৃত না হয়, তিন অঙ্গুলীর অতিরিক্ত উচ্চ না হয়, পূজাকার্য্যে এইরূপ আসন সংগ্রহ করিবে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক মৃগচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন সাধকের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিতে পারেন, তাহাতে কোন পরিমাণ-নিয়ম নাই। গৃহী দীক্ষিত হইলেও তিনি কখনও কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিবেন না (যোগিনীহৃদয়ে, বিশেদ্ যতির্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ।—যতি, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ইঁহারা কৃষ্ণসার চর্ম্মে উপবেশনের অধিকারী)। মৃণ্ময় আসনে দুঃখের উৎপত্তি হয়, কাষ্ঠাসনে দুর্ভাগ্য হয়, বিশেষতঃ আম্র, নিম্ব ও কদম্ব কাষ্ঠের আসনে বংশ নাশ হয়। বকুল, কিংশুক ও পনসের (কাঁঠাল) আসনে সম্পত্তিসকল হত হয়। বংশ (বাঁশ) ইষ্টক কাষ্ঠ মৃত্তিকা তৃণ পল্লব এই সমস্তের দ্বারা নির্ম্মিত আসন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখের কারণ হয়। এজন্য সাধক ঐ সকল আসন বর্জ্জন করিবেন। নারাচ দ্বারা (অস্ত্রাঘাতে) বিভিন্ন, বিশীর্ণ, ভগ্ন, পর্য্যুষিত পরকীয় অধৌত এরূপ আসনও বিবর্জ্জিত করিবেন। কাষ্ঠাসনের মধ্যে কেবল গাম্ভারীকাষ্ঠনির্ম্মিত আসনই প্রশস্ত, অন্য কাষ্ঠের আসন মঙ্গলপ্রদ নহে। সাধক পূজাকার্য্যে যথেচ্ছাচারে আসন পরিগ্রহ করিবেন না। কাষ্ঠাদির আসনও যথাশাস্ত্রপরিমাণে নির্ম্মিত করিতে হইবে। কাষ্ঠাসন চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ হইবে, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইবে এবং চতুরঙ্গুল উচ্চ হইবে। মৃত্তিকার আসনে যদি বস্ত্রাসনের যোগ হয় (এতাবতা বোধহয় একান্ত অভাব হইলে তখন মৃত্তিকার আসনও গ্রহণ করা যাইতে পারে), কাষ্ঠাসনে যদি কম্বলাসনের যোগ হয়, আর কুশাসনে যদি চর্ম্মাসনের যোগ হয়, তাহা হইলে সাধকের ভবিষ্যৎ পুণ্য দূরে থাকুক, পূর্ব্বকৃত পুণ্যও হত হয়। এই সকল বিচারপূর্ব্বক সাধক যথাশক্তি প্রশস্ত আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক উপবেশন করিবেন।

হংস মাহেশ্বরে—

লোম্নি চৈব সদাসীন-স্তদা সর্ব্বং বিনশ্যতি।
লোমস্পর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।

লোমে উপবিষ্ট হইলে সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়, লোমস্পর্শমাত্রে সিদ্ধির হানি হয়। এজন্য সাধক চর্ম্মাসন নির্লোম করিয়া লইবেন।

কালিকাপুরাণে—

আয়সং বর্জ্জয়িত্বা তু কাংস্যসীসকমেব চ।
শিলাময়ং মণিময়ং তথা রত্নময়ং মতং।
তৎ সর্ব্বমানসং শস্তং পূজাকর্ম্মণি সাধকে।
সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং।
তত্রাপ্যাসনমাসীনো নোত্থিতস্তু সমাচরেৎ।
তোয়ে শিলাময়ং কুর্য্যাদাসনং কৌশমেব বা।
দারবং তৈজসং বাপি নান্যদাসনমাচরেৎ।
আসনারোপসংস্থানং স্থানে তোয়ে তু পূজকঃ।
আসনং পূজয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে।

লৌহনির্ম্মিত কাংস্যনির্ম্মিত সীসকনির্ম্মিত আসন বর্জ্জন করিবে। সাধকের পূজাকার্য্যে শিলাময়, মণিময় ও রত্নময় আসন প্রশস্ত। জলমধ্যে যদি দেবতাগণের পূজা করে, তাহা হইলেও আসনে আসীন হইয়াই তাহা সম্পন্ন করিবে, উত্থিত হইয়া করিবে না। জলমধ্যে শিলাময়, কুশনির্ম্মিত, দারুনির্ম্মিত অথবা ধাতুময় আসন পরিগ্রহ করিবে; অন্য আসন কল্পনা করিবে না। যদি এ সকল আসনের একান্ত অভাব হয় তাহা হইলে জলেই স্থান কল্পনাপূর্ব্বক মানসিক আসন পূজা করিয়া পশ্চাৎ জলে দেবতার পূজা করিবে।

কামধেনুতন্ত্রে—

তীর্থে আসনং সংস্থাপ্য উপবিশ্য জপেত্তু যঃ।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিষাসুরমেদেন পৃথিবী দৃঢ়তাং গতা।
যদেতচ্চঞ্চলাপাঙ্গি তীর্থাদন্যস্থলেষু তৎ।
ন তীর্থাবাহনং তীর্থে আসনে ন বসেৎ সুধীঃ।

তীর্থে আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিয়া যিনি জপাদি কার্য্য করেন, তাঁহার জপ পূজা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া বৃথা হয়। মহিষাসুরের মেদরাশিতে পৃথিবী দৃঢ়তা লাভ করিয়াছেন (এজন্য অপবিত্রা) এই যে সিদ্ধান্ত, তীর্থ হইতে অন্য স্থলে তাহার অধিকার (মহিষাসুরমেদ এস্থলে মধু-কৈটভমেদ হওয়াই সুসঙ্গত, বোধহয় লিপিকরপ্রমাদে মহিষাসুরমেদ লিখিত হইয়াছে অথবা কল্পভেদে মহিষাসুরমেদই সিদ্ধান্তিত)।

তত্রৈব ত্রয়স্ত্রিংশৎ পটলে—

সিদ্ধপীঠেষু তীর্থেষু আসনে ন বিশেৎ সুধীঃ।
ন তীর্থফলমাপ্নোতি তীর্থত্যাগং তথা ভবেৎ॥

সিদ্ধপীঠসমূহে এবং তীর্থসমূহে সুবুদ্ধি সাধক কখনও আসনে উপবেশন করিবেন না, যদি করেন তাহা হইলে তীর্থফল ত পাইবেনই না, অধিকন্তু তীর্থত্যাগজন্য ফল লাভ করিবেন।

আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্ব্বরোগনিবারণাৎ।
নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

আত্মসিদ্ধিপ্রদানহেতু (আ), সর্ব্বরোগনিবারণহেতু (স) এবং নবসিদ্ধিপ্রদানহেতু (ন), আসন আ-স-ন নামে কথিত হইয়াছে।

গোরক্ষসংহিতায়াং—

আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
এতেষামখিলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্বরঃ।
চতুরশীতিলক্ষাণা-মেকৈকং সমুদাহৃতং।
তথা শিবেন পীঠানাং ষোড়শানাং শতং কৃতং।
আসনেষু সমস্তেষু দ্বয়মেতদুদাহৃতং।
একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনং।

জীবজন্তুর সংখ্যা যত, আসনের সংখ্যাও তত; চতুরশীতি লক্ষ জীবের সংখ্যা অনুসারে এক একটি আসন কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল আসনের সমস্ত ভেদ কেবল স্বয়ং মহেশ্বরই অবগত আছেন। এইরূপে ভগবান মহাদেব ষোড়শ শত সিদ্ধপীঠ নির্ম্মিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চতুরশীতি লক্ষ আসনের মধ্যে দুইটি আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—প্রথম সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় কমলাসন (পূজাদি কার্য্যে এই সকল আসনের কোন উপযোগিতা নাই, এজন্য আমরা এস্থলে উহার লক্ষণাদির উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম)।

রাঘবভট্টঃ—

পদ্মস্বস্তিকবীরাদি-মেকাসনসমাস্থিতঃ।
জপার্চ্চনাদিকং কুর্য্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।

পদ্ম স্বস্তিক বীরাসনাদির যে কোন এক আসনে আসীন হইয়া জপ পূজাদির অনুষ্ঠান করিবে, অন্যথা জপাদি নিষ্ফল হইবে।

রাঘভট্টধৃত তন্ত্রান্তরে—

সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ।

বিষ্টভ্য কট্যো পার্ষ্ণী তু নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতম্ ॥

বামপাদ দক্ষিণপাদের উপরিভাগে বিন্যস্ত করিবে, তদ্রূপ দক্ষিণপাদ বাম-পাদের উপরিভাগে নিহিত করিবে, কটিদ্বয় ও পার্ষ্ণীদ্বয় বেষ্টন করিয়া নাসাগ্রে বিন্যস্তদৃষ্টি হইবে। এই উপবেশন প্রকারই সর্ব্বসাধকপূজিত পদ্মাসন। ১।

গৌতমীয়ে অষ্টমাধ্যায়ে—

ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥

উরুদ্বয়ের উপরিভাগে পাদতলদ্বয় সম্যক্ বিন্যস্ত করিতে হইবে, ইহাই যোগিগণের হৃদয়াভিমত পদ্মাসন। ১।

সম্মোহনতন্ত্রে, দ্বিতীয় পটলে—

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তং প্রচক্ষতে।

জানুদ্বয়ের অভ্যন্তরে পাদতলদ্বয় সম্যক্ বিন্যস্ত করিয়া ঋজুকায় হইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। ইহারই নাম স্বস্তিকাসন। ২।

একং পাদমধঃ কৃত্বা বিনস্যোরৌ তথেতরং।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী বীরাসনমিতীরিতম্ ॥

একপাদ নিম্নে রাখিয়া তাহারই উরুর উপরিভাগে অন্য পাদ বিন্যস্ত করিয়া যোগী ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন। ইহারই নাম বীরাসন। কোন পাদ নিম্নে রাখিতে হইবে, শাস্ত্রীয় প্রমাণে যদিও তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই, তথাপি বামপাদ নিম্নে রাখিয়া বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণ বিন্যাস করাই আচার্য্যপরম্পরার ব্যবহারসিদ্ধি। ৩।

সম্মোহনতন্ত্রে, তৃতীয় পটলে—

তত্রোপসংবিশেদ্দেবি বদ্ধপদ্মাসনাদিকং।
ন যুক্তমন্যথা পাদদর্শনং সুরপূজনে ॥

দেবি! সেই যথাবিহিত আসনে সাধক বদ্ধপদ্মাসনাদি যে কোন আসন বন্ধন করিয়া উপবেশন করিবেন : দেবপূজন সময়ে ইহার অন্যথারূপে পাদপ্রদর্শন যুক্ত নহে।

যোগিনীতন্ত্রে—

নীচৈরাসনমাসাদ্য স্বস্তিকাদিক্রমেণ তু।
বিশেন্নিরাকুল-স্তত্র পাদৌ সংচ্ছাদ্য বাসসা ॥

নিম্নে আসন সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে স্বস্তিক প্রভৃতি বন্ধনক্রমে বস্ত্র দ্বারা পাদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া সাধক উপবেশন করিবেন।

॥ ৪। পূজায় দিঙ্‌নিয়ম ॥

যামলে—

পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যং প্রাচীতি কীর্ত্তিতে বুধৈঃ।
তদ্দক্ষিণং দক্ষিণং স্যা-দুত্তরং চোত্তরং মতং।
পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবং প্রযোজয়েৎ॥

পূজ্য (দেবতা) পূজক (সাধক) উভয়ের মধ্যস্থানই প্রাচী (পূর্ব্বদিক) হইবে; সাধকের দক্ষিণভাগই দক্ষিণ দিক, বামভাগই উত্তর দিক এবং পৃষ্ঠদেশই পশ্চিম দিক। পূজাকার্য্যে সর্ব্বত্রই এইরূপ দিঙ্‌নির্ণয় করিতে হইবে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্ত অনুসারে দিঙ্‌নির্ণয় করিলেও সাধক যে দিকে সম্মুখ হইয়া পূজা করিবেন, তাহাই পূর্ব্বদিক হইবে। কারণ, বস্তুতঃ দিক্ বলিয়া কোন পদার্থই জগতে নাই, সকলেই স্ব স্ব অবস্থানের অপেক্ষায় দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে। 'দিকের দিক' এই নামই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। দিশ্যতে ইতি দিক্—যাহা নির্দ্দেশ মাত্র করা যায় তাহারই নাম দিক্—যেমন, আমি যাহাকে পূর্ব্বদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, আমার পূর্ব্বদিকে যিনি অবস্থিত, তিনি আবার তাহাকেই পশ্চিমদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তবেই স্ব অপেক্ষায় নির্দ্দেশ বই দিক বলিয়া আর মৌলিক কোন পদার্থ নাই, ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত। কিন্তু দার্শনিকতার অভিমানে অন্ধ হইয়া দিক্ শব্দের যৌগিক অর্থ না দেখিয়া কেহ কেহ আবার এই দিক্‌কেই নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরমার্থতঃ দিক্ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, যখন যাহা নির্দ্দেশ হয়, তখন তাহাই দিক্। তবে সূর্য্যের উদয় অস্ত অনুসারে দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিলে তাহা দেশ প্রদেশবাসী সকলের পক্ষেই একরূপ হয়, এক নির্দ্দেশেই সাধারণতঃ সকলের নির্দ্দেশ স্থির হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভাবচূড়ামণৌ—

সাধকেচ্ছাবশাদ্দেবি সর্ব্বদিঙ্মুখদেবতা।
রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্দেবকার্য্যং সদৈব হি।
শিবার্চ্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ॥

দেবি! সাধকের ইচ্ছাবশত দেবতা সকলদিকেই অভিমুখী হয়েন (যিনি বিশ্বব্যাপিনী, তাঁহার সম্মুখ বিমুখ অসম্ভব), তথাপি রাত্রিতে দেবকার্য্য করিতে হইলে তাহা উত্তরমুখ হইয়াই করিবে, বিশেষতঃ শিবপূজায় কি দিবা কি রাত্রি সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইবে। বিষ্ণুবিষয়ে পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজাদি নির্ব্বাহ করাই প্রশস্ত, উত্তরাভিমুখ হইলেও তাহা অবৈধ হইবে না। শক্তিবিষয়েও উত্তরমুখই প্রশস্ত, পূর্ব্বমুখ হইলেও তাহা অবৈধ হইবে না।

বারাহীয়ে—

স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বাচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।

স্নাত এবং শুক্লাম্বরধারী হইয়া সম্যক্ আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিঙ্মুখ হইয়া পূজার্থ উপবেশন করিবে।

গৌতমীয়ে—

প্রাঙ্মুখঃ সংযতাত্মা চ সংবিশেদ্বিহিতাসনে।

সংযতাত্মা সাধক পূর্ব্বমুখ হইয়া বিহিত আসনে উপবেশন করিবেন।

ক্রমদীপিকায়াং—

স্নাতো নির্ম্মলসূক্ষ্মশুদ্ধবসনো ধৌতাঙ্ঘ্রি পাণ্যাননঃ,
স্বাচান্তঃ সুপবিত্র-মুদ্রিতকরঃ শ্বেতোর্দ্ধ-পুণ্ড্রোজ্জ্বলঃ।
প্রাচীদিগ্বদনো নিবধ্য সুদৃঢ়ং পদ্মাসনং স্বস্তিকং,
স্বাসীনঃ স্বগুরূন্ গণাধিপমথো বন্দেত বদ্ধাঞ্জলিঃ॥

স্নাত, নির্ম্মল সূক্ষ্ম শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিধৌত-মুখ-পাণি-পাদ এবং শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে উজ্জ্বল-ললাট হইয়া সম্যক্ আচমন ও সুপবিত্র করমুদ্রা পূর্ব্বক পূর্ব্বদিঙ্মুখ হইয়া সুদৃঢ় পদ্মাসন অথবা স্বস্তিকাসনবন্ধনে সম্যক্ আসীন হইয়া সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ গুরুবর্গকে এবং গণেশকে বন্দনা করিবেন।

হরিভক্তিবিলাসে—

ততঃ কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্ত স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সাধকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের উপাসক দিবসে প্রায়শঃ পূর্ব্বমুখ হইবেন এবং স্থিরমূর্তি সাধক রাত্রিকালে উত্তরমুখ হইয়া পূজাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

আসীনঃ প্রাগুদগ্ বার্চ্চেদর্চ্চায়াস্তথঃ সম্মুখঃ।

উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আসীন হইয়া পূজাদি করিবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতা পশ্চিমাভিমুখী হইলে সাধক পূর্ব্বমুখ হইবেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইলে সাধক উত্তরমুখ হইবেন।

কালিকাপুরাণে—

দিগ্বিভাগে চ কৌবেরী দিক্ শিবাপ্রীতিদায়িনী।
তস্মাত্তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা॥

দিঙ্মণ্ডল মধ্যে কৌবেরী (উত্তরা) দিক্ই শিবার প্রীতিদায়িনী, সেইহেতু সাধক উত্তরমুখে আসীন হইয়াই সর্ব্বদা চণ্ডিকার জাপ্ করিবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাম্—

দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।

দেবীপূজাং শিবস্যাপি সদা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ॥

দিবাভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং রাত্রিতে উত্তরমুখ হইয়া দেবপূজা করিবে কিন্তু দেবীর পূজা এবং শিবের পূজা সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইয়া করিবে।

॥ ৫। পূজাকাল ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে অষ্টাবিংশতিপটলে—

যথাবিধি গুরো দীক্ষাং গৃহীত্বা সাধকোত্তমঃ।

তথৈব চ যজেদ্দেবীং নিত্যং প্রাতরনন্যধীঃ॥

গুরুর নিকটে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ অনন্যহৃদয়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দেবীর পূজা করিবেন।

যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে—

প্রাতঃকালং সমারভ্য যাবন্মধ্যন্দিনং ভবেৎ।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত যঃ সম্যক্ ফলমিচ্ছতি॥

যিনি অনুষ্ঠানাদির সম্পূর্ণ ফল ইচ্ছা করেন, তিনি প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপিত করিবেন।

নিগমকল্পলতায়াং, একাদশপটলে—

প্রথমপ্রহরার্দ্ধঞ্চ ত্যক্ত্বা পূজনমাচরেৎ।

দশদণ্ডে তু সম্পূর্ণে তত্র পূজাং সমাপয়েৎ॥

প্রথম প্রহরের অর্দ্ধভাগ অতীত করিয়া নিত্যপূজার আরম্ভ করিবে এবং দশদণ্ড সম্পূর্ণ হইলে পূজা সমাপ্ত করিবে। প্রাতঃকালে জপাদির অনুষ্ঠান থাকিলে মধ্যাহ্নে পূজা করিলেও তাহা অবৈধ হইবে না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে তৃতীয়োল্লাসে—

প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্রিকালতঃ।

মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বমন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ॥

প্রাতঃকৃত্য প্রাতঃকালে সম্পন্ন করিবে, ত্রিকালে সন্ধ্যাবন্দন করিবে এবং মধ্যাহ্নে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে, ইহাই সমস্ত মন্ত্রদীক্ষার সাধারণ বিধি।

॥ ৬। পূজাস্থান ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সপ্তমপটলে—

কেশকীটাদি-সংযুক্তা ন স্নিগ্ধা নাতিপিচ্ছলা।
ন রুক্ষা নাতিনীচা বৈ নাত্যুচ্চা ন বনান্বিতা।
ন চ বায়ুভিরাচ্ছন্না নান্যপ্রাণি-সমাকুলা।
ধূলীকর্দ্দমসংযুক্তা পশুভি র্ন বিলোকিতা।
বৃক্ষাদিভি-রনাকীর্ণা দূরবারিসমাকুলা।
অনাবৃতা চতুর্দ্দিক্ষু মনসোঽতুষ্টিকারিণী।
উষরে কৃমিসংযুক্তে স্থানে পুণ্যেঽপি নার্চ্চয়েৎ।
যাগভূমি র্নিষিদ্ধৈষা বিহিতা কথ্যতেঽধুনা।
বাপীকূপ-সমীপস্থা সুমনোবনমধ্যগা।
বিচিত্রমণ্ডপৈর্যুক্তা শুদ্ধবেদীপরিষ্কৃতা।
পেয়ৈ র্ভক্ষ্যৈঃ সমাযুক্তা কর্পূরাগুরুধূপিতা।
বালার্কসদৃশী রম্যা মনঃসন্তোষকারিণী।
তন্তদায়ুধপূর্ণাগু-বিভূষিতগৃহান্তরা।
এবমেষা মহাদেবি যাগভূমিঃ সমীরিতা॥

কেশকীটাদিসংযুক্তা, স্নিগ্ধা, অতিপিচ্ছলা, রুক্ষা, অতিনীচা, অত্যুচ্চা, বনবেষ্টিতা, বায়ুবেগে আচ্ছন্না, অন্যপ্রাণিসমাকুলা, ধূলিকর্দ্দমসংযুক্তা, পশুগণ কর্ত্তৃক অবলোকিতা, বৃক্ষাদি দ্বারা অনাকীর্ণা, জলাশয়ের দূরবর্ত্তিনী, চতুর্দ্দিকে অনাবৃতা, মনের অসন্তোষকারিণী—ঈদৃশ ভূমি দেবপূজাদি অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধা। পুণ্যস্থানও যদি উষর বা কৃমি-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে স্থানেও পূজা করিবে না। নিষিদ্ধ যাগভূমি কথিত হইল; অতঃপর বিহিত যাগভূমি কথিত হইতেছে। বাপী অথবা কূপের নিকটবর্ত্তিনী পুষ্পবনমধ্যস্থিতা বিচিত্রমণ্ডপমণ্ডিতা বিশুদ্ধবেদীবিশিষ্টা, পেয় এবং ভক্ষ্য দ্রব্যসমূহে সংযুক্তা, কর্পূরাগুরু ধূপচন্দনাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃতা, প্রাতঃসূর্য্য-কিরণসদৃশ রক্তবর্ণা, রম্যা, মনঃসন্তোষকারিণী উপাস্যদেবতার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং সুসজ্জিত অন্তর্গৃহবিশিষ্টা, মহাদেবি। সাধকের যাগভূমি উক্ত লক্ষণসমূহে লক্ষিত হইবে।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকং।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনং॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্।

অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্ ॥
গুরূণাং সন্নিধানঞ্চ চিত্তৈকাগ্র্যস্থলং তথা।
সর্ব্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জনং পশুবর্জিতম্ ॥
যত্র তত্র নরঃ পূজাং নির্জনে কুরুতে তু যঃ।
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥
শ্রদ্ধাভক্ত্যোশ্চ বাহুল্যাৎ পূজাদ্রব্যস্য বিস্তরাৎ।
দেব্যাঃ সন্নিধিরত্র স্যান্নির্জনে পূজনাত্তথা ॥

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতশিখর, তীর্থস্থানসমূহ, নদীগণের পরস্পর সম্মিলনস্থল, পবিত্র বন, নির্জ্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট (উপত্যকা) তুলসীকানন, গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থমূল, আমলকীমূল, গোশালা, জলমধ্য (দ্বীপ) দেবতার মন্দির, সমুদ্রকূল, নিজগৃহ, গুরুদেবের অধিষ্ঠানস্থান, চিত্তৈকাগ্র্যস্থল (যে স্থলে স্বভাবতঃই চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হয়) পশুবর্জ্জিত নির্জ্জন স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, যে কোন স্থলে সাধক নির্জ্জনে পূজা করিলে তাঁহার নিবেদিত পত্র পুষ্প ফল জল দেবী স্বয়ং গ্রহণ করেন। সাধকের শ্রদ্ধাভক্তির যদি বাহুল্য হয়, পূজাদ্রব্যের যদি বিস্তরতা থাকে, আর পূজা যদি নির্জ্জনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভক্তবৎসলা জগদম্বা সে স্থলে স্বতএব আবির্ভূতা হয়েন।

॥ ৭ ॥ শিবপূজা ॥

তোড়লতন্ত্রে পঞ্চম পটলে—

শৈববৈষ্ণব-দৌর্গার্ক-গাণপত্যেন্দু-সম্ভবঃ।
আদৌ শিবং পূজয়িত্বা পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ ॥
আদৌ লিঙ্গং পূজয়িত্বা যদি চান্যং প্রপূজয়েৎ।
তৎফলং কোটিগুণিতং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
অন্যদেবং পূজয়িত্বা শিবং পশ্চাদ্ যজেদ্ যদি।
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং ভুঞ্জাতে যক্ষরাক্ষসৈঃ ॥

শৈব বৈষ্ণব শাক্ত সৌর গাণপত্য এই পঞ্চোপাসকশ্রেণীভুক্ত যে কোন সাধক এবং চন্দ্রতন্ত্রের উপাসক সকলেই আদিতে শিবপূজা করিয়া পশ্চাৎ অন্য দেবতার পূজা করিবেন। আদিতে শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া পশ্চাৎ যদি অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সেই পূজার ফল সত্য সত্য কোটিগুণবিশিষ্ট হয়, ইহা নিঃসংশয়। আর

অন্যদেবকে পূজা করিয়া পশ্চাৎ যদি শিবপূজা করে, তাহা হইলে তাহার সেই পূজার সমস্ত ফল যক্ষ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভুক্ত হয়।

উৎপত্তিতন্ত্রে চতুঃষষ্টিপটলে শিববাক্যং—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা গাণপোঽথবা।
শিবার্চ্চনবিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধি র্ভবেৎ প্রিয়ে॥
অনারাধ্য চ মাং দেবি যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরং।
ন গৃহ্লাতি মহাদেবি শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্॥
পর্ব্বতাগ্রসমং দেবি মিষ্টান্নাদিক্রমেণ হি।
ফলানি বহুধান্যেব পুষ্পাণ্যেব যথাবিধি॥
সুমেরুসদৃশঞ্চান্নং নানাবিধং মহেশ্বরি।
সূপাদিকং মহেশানি যদি স্যাৎ সাগরোপমং।
যদ্ দত্তং পুষ্পনৈবেদ্যং সর্ব্বং বিষ্ঠাসমং ভবেৎ॥
শিবার্চ্চনবিহীনো যঃ পূজয়েদ্দেবতান্তরং।
বিশেষতঃ কলিযুগে স নরঃ পাপভাগ্ ভবেৎ॥

শাক্ত অথবা বৈষ্ণব, শৈব অথবা গাণপত্য, শিবপূজাবিহীন হইলে তাঁহার সিদ্ধি হইবে কি উপায়ে? দেবি। প্রথমে আমাকে আরাধনা না করিয়া যিনি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সেই অর্চ্চনীয় দেবতা সে অর্চ্চনা গ্রহণ করেন না, অধিকন্তু সাধককে শাপপ্রদান করিয়া নিজপুরে প্রস্থান করেন। দেবি। ক্রমবিন্যস্ত পর্ব্বতাগ্রসমান মিষ্টান্ন, বহুবিধ ফল এবং যথাবিধি সংগৃহীত পুষ্পসমূহ, সুমেরুসদৃশ নানাবিধ অন্ন, সাগরোপম সূপাদি, মহেশ্বরি। শিবপূজা ব্যতিরেকে ইহার যাহা কিছু পুষ্প নৈবেদ্য ইত্যাদি প্রদত্ত হইবে সে সমস্তই বিষ্ঠাসম অগ্রাহ্য হইবে। শিবার্চ্চন বিহীন হইয়া যিনি দেবতান্তরের পূজা করিবেন, কলিযুগে সেই মানব বিশেষ পাপভাগী হইবেন।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথম পটলে—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে॥
প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে॥

পরমেশ্বরি। শাক্ত বৈষ্ণব অথবা শৈব সকলেই আদিতে বিল্বপত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া শিবসন্নিধানে অন্য দেবতার পূজার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ

অন্য পূজা করিবে, মহেশ্বরি। অন্যথা শিবপূজা ব্যতিরেকে সমস্ত মূত্রবৎ অগ্রাহ্য হইবে। পরমেশানি! ধরাতলে যে পর্যন্ত জীবন থাকিবে, প্রত্যহ পরম ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গ পূজা করিবে।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে দ্বাদশপটলে—

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে দেবা-স্তদ্‌বাহ্যে যাশ্চ দেবতাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তি কেবলং শিবপূজনাৎ॥

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে যে সকল দেবতা অবস্থিত, কেবল শিবপূজা করিলেই তাঁহাদিগের সকলের তৃপ্তি সাধন হয়।

মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে—

পার্থিবং নার্চ্চয়িত্বা তু কালীং তারাঞ্চ সুন্দরীং।
অর্চ্চয়েদ্ য স্ত্রিলোকস্থঃ স গচ্ছেদ্ যমযাতনাম্॥

ত্রিলোকস্থ যে কোন সাধকই হউন না কেন, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া যিনি কালী তারা এবং ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা করিবেন, তিনি যমযাতনার ভাগী হইবেন।

ত্রিপুরাকল্পে—

যাবন্ন পূজয়েল্লিঙ্গং পার্থিবং সাধকাধমঃ।
তস্য পূজাং ন গৃহ্লাতি সুন্দরী তারকাঽসিতা॥

যে কাল পর্য্যন্ত সাধকাধম পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা না করে, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার সেই পূজা কি ত্রিপুরসুন্দরী, কি তারা, কি কালী, কেহই গ্রহণ করেন না।

লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—

মহাবিদ্যাং পূজয়িত্বা শিবপূজাং সমাচরেৎ।
অন্যথাকরণাদ্দেবি ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ॥

মহাবিদ্যার পূজার পরেও শিবপূজা করিবে, অন্যথা পূজা নিষ্ফল হইবে।

মেরুতন্ত্রে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যনুলোমজঃ।
পূজয়েৎ সততং লিঙ্গং তন্মন্ত্রৈণৈব সাদরম্॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অথবা অনুলোমজ (বর্ণসঙ্কর) সকলেই আদরপূর্ব্বক তন্মন্ত্রের অবলম্বনে সতত শিবলিঙ্গ পূজা করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াম্—

অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈকপূজনাৎ।
তাম্রী বা স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা।
বেদিকা চ প্রকর্ত্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ।

প্রত্যহং যোঽর্চ্চয়েল্লিঙ্গং নার্ম্মদং ভক্তিভাবতঃ।
ঐহিকং কিং ফলং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥

অন্য কোটি লিঙ্গের পূজা করিলে যে ফল হইবে, মানব একমাত্র বাণলিঙ্গ পূজা করিয়া সেই ফল লাভ করিবেন। তাম্র স্ফটিক স্বর্ণ পাষাণ রজত ইহার যে কোন উপাদানে বেদী (গৌরী-পীঠ) নির্ম্মাণ করিয়া সেই পীঠে বাণলিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক যিনি প্রত্যহ বাণলিঙ্গ পূজা করেন, ঐহিক ফলের কথা আর কি বলিব? মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার করস্থিত হয়।

বীরমিত্রোদয়ে—

লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ।
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্॥
তৎ সপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতং।
সিদ্ধিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং সর্ব্বপ্রাসাদপীঠগম্॥

অতি ক্ষুদ্র অতিস্থূল এবং কপিলবর্ণ বাণলিঙ্গকে গৃহস্থ কখনও পূজা করিবেন না, ভ্রমরের ন্যায় স্নিগ্ধ নিবিড়কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গই গৃহস্থের পূজায় প্রশস্ত। বাণলিঙ্গ সপীঠ (গৌরী-পীঠ সহিত) অপীঠ (গৌরী-পীঠ বিবর্জ্জিত) যেরূপই হউক না কেন, মন্ত্র সংস্কার ইত্যাদি না করিয়াই তাঁহার পূজা করিবে, সমস্ত প্রাসাদে এবং সমস্ত পীঠে অধিষ্ঠিত বাণলিঙ্গমাত্রই সাধকের সিদ্ধিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ।

বাণলিঙ্গানি রাজেন্দ্র ভুবি তিষ্ঠন্তি যানি চ।
ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কার-স্তেষামাবাহনং ন চ॥

রাজেন্দ্র। এই পৃথিবীমণ্ডলে যত বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সংস্কার আবাহন বিসর্জ্জন কিছুই নাই (অনাদিসিদ্ধ ব্রহ্মলিঙ্গে স্বয়ং ভগবান ভূতভাবন নিয়ত আবির্ভূত, তাহাতে আবাহন বিসর্জ্জন দুইই অসম্ভব)।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথমপটলে—

যদ্রাজ্যং লিঙ্গপূজায়া রহিতং সততং প্রিয়ে।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতম্॥
ব্রহ্ম বিট্ ক্ষত্রিয়ো দেবি যদি লিঙ্গং ন পূজয়েৎ।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয়শ্চণ্ডালতামিয়ুঃ।
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদাশূকরবদ্ ভবেৎ॥
শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন্ গেহে বিবর্জ্জিতং।
বিষ্ঠাগর্ত্তসমং দেবি তদ্‌গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং তস্মিন্ বেশ্মনি পার্ব্বতি॥

প্রিয়ে! যে রাজ্য সতত লিঙ্গ-পূজা-বিরহিত, সেই রাজ্যকে আমি বিষ্ঠাভূমির সমান পতিত বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যদি লিঙ্গপূজা না করে, তাহা হইলে এই তিন বর্ণই তৎক্ষণাৎ চণ্ডালতা প্রাপ্ত হয়; আর শূদ্র যদি শিবপূজা না করে, তাহা হইলে সেও শূকরত্ব লাভ করে, দেবেশি! যে গৃহ শিবপূজা-বিবর্জ্জিত তাহা বিষ্ঠাগর্ত্তের সমান, সেই গৃহের অন্ন জল যাহা কিছু সমস্তই বিষ্ঠা মূত্রের সমান পরিহার্য্য।

॥ ৮। পূজাক্রম ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ৭ম অধ্যায়ে—

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ মে।
অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চ প্রকারার্চ্চাং ক্রমেণ কথয়ামি তে॥
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থান-মার্জ্জনং।
উপলেপন-নির্ম্মাল্য-দূরীকরণমেব চ॥
উপাদানং নাম গন্ধ-পুষ্পাদিচয়নং তথা।
ইজ্যা নাম চেষ্টদেব-পূজনঞ্চ যথার্থতঃ।
স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যস্যা স্যানুপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদি-পাঠশ্চ হরিসংকীর্ত্তনং তথা।
তত্ত্বাদি শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈব বিভাবনা।
ইতি পঞ্চ প্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত।
সামীপ্য-সারূপ্য-সাদৃশ্য-সাযুজ্য-ফলদা ক্রমাৎ॥

পূজা পঞ্চবিধ, তাহার ভেদ আমার নিকট শ্রবণ কর; অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় এবং ইজ্যা—এই পঞ্চবিধ পূজার প্রকার ভেদ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে। দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেবতার অধিষ্ঠান স্থান মার্জ্জনা এবং শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গসংলিপ্ত উপলেপন ও নির্ম্মাল্য পুষ্পমাল্যাদি দূরীকরণের নাম অভিগমন। পুষ্পাদি চয়ন ও গন্ধ চন্দনাদি উপচার সংগ্রহের নাম উপাদান, তৎপর যথাশাস্ত্র ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ন্যাস মানস-পূজাদিপূর্ব্বক, মন্ত্রাদি সহকৃত পাদ্যাদি উপাচার প্রদানরূপ ইষ্ট দেবতার পূজার নাম ইজ্যা। কৃষ্ণ এই নাম মহামন্ত্রের যথাশাস্ত্র আনুপূর্ব্বিক জপ, সূক্তপাঠ, স্তোত্রপাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রধান শাস্ত্রের অভ্যাস, ইহারই নাম স্বাধ্যায়। অতঃপর, নিজান্তঃকরণে ইষ্ট দেবতার ধ্যানের নাম

যোগ। সুব্রত। এই পঞ্চপ্রকার পূজা কথিত হইল। ইহারা উত্তরোত্তর সামীপ্য সারূপ্য সাদৃশ্য ও সাযুজ্য ফল বিধান করে। অভিগমন ও উপাদানের ফল সামীপ্য, ইজ্যার ফল সাদৃশ্য, স্বাধ্যায়ের ফল সারূপ্য ও যোগের ফল সাযুজ্য।

(গৌতমীয় তন্ত্র বিষ্ণুপাসনার বিধায়ক, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নাম মন্ত্রের জপ এবং হরি সঙ্কীর্ত্তন উল্লিখিত হইয়াছে, ফলতঃ উহা শাক্ত শৈব প্রভৃতি সকল সাধকেরই নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার উপলক্ষণ, কৃষ্ণনাম জপ এবং হরি সঙ্কীর্ত্তন স্থলে তাঁহারা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার নাম জপ ও স্তোত্র কীর্ত্তনাদি বুঝিয়া লইবেন)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১। পঞ্চশুদ্ধি ॥

কুলার্ণবে—

আত্মস্থান-মনু-দ্রব্য-দেব-শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ॥
পঞ্চশুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্প্যতে।
সুস্নাতৈ র্ভূতশুদ্ধেশ্চ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলৈর্ন্যাসৈ-রাত্মশুদ্ধি-রুদীরিতা॥ ১॥
সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈ-র্দপণোদরবচ্ছুভং।
বিতান-ধূপদীপাদি-পুষ্পমাল্যাদি-শোভিতং।
পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধি-রিতীরিতা॥ ২॥
গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈ-র্ম্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রাণাং শুদ্ধিরীরিতা॥ ৩॥
পূজাদ্রব্যানি সম্প্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রেশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪॥
পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদীনুদকেন চ।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধি-রিতীরিতা।
পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ।

আত্মশুদ্ধি স্থানশুদ্ধি মন্ত্রশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি দেবশুদ্ধি, দেবি! সাধক যাবৎ এই পঞ্চশুদ্ধির অনুষ্ঠান না করেন, তাবৎ তাঁহার দেবপূজা সম্পন্ন হইবে কিরূপে? পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে যে পূজা, তাহা কেবল অভিচারের নিমিত্ত কল্পিত হয়। সম্যক্ স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতি এবং ষড়ঙ্গন্যাসাদি অখিল ন্যাস ইহাই সাধকের আত্মশুদ্ধি। ১। সম্মার্জ্জন অনুলেপন ইত্যাদি দ্বারা দর্পণের মধ্যভাগের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া পঞ্চবর্ণরজঃ আসন চন্দ্রাতপ ধূপ দীপ পুষ্প মাল্য ইত্যাদি মঙ্গল ভূষণে পূজামণ্ডপকে সুশোভিত করাই স্থানশুদ্ধি। ২। মাতৃকামন্ত্রের বর্ণাবলী দ্বারা মূলমন্ত্রের অক্ষরসকল গ্রথিত করিয়া অনুলোম বিলোমে দ্বিরাবৃত্তি জপই মন্ত্রশুদ্ধি। ৩। মূলমন্ত্র এবং অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জল দ্বারা পূজাদ্রব্য সমস্ত সম্প্রোক্ষিত করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শনের নামই দ্রব্যশুদ্ধি। ৪। পীঠে দেবতার মূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গমন্ত্র প্রাণমন্ত্রাদি দ্বারা

তাঁহাতে দেবতার শক্তিসঞ্চার করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা (অনন্তঃ) ত্রিবার স্নান এবং তদনন্তর বসন ভূষণ মাল্য ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সুসজ্জিত করিয়া ধূপ দীপাদি প্রদান, ইহাই দেবশুদ্ধি। ৫। প্রথমে এই পঞ্চশুদ্ধির বিধান করিয়া তৎপশ্চাৎ পূজা আরম্ভ করিবে।

॥ ১০। দ্বাদশ শুদ্ধি ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টমাধ্যায়ে—

অথ দ্বাদশশুদ্ধিস্তু বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ॥
পূজার্থং পত্রপুষ্পানাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনা-মিয়ং শুদ্ধি র্ব্বিশিষ্যতে॥
তন্নাম কীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসব-নিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়ো র্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে॥
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্য-মালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামশ্চ হরেঃ পুনঃ॥
আঘ্রাণং গন্ধ-পুষ্পাদে-নির্ম্মাল্যস্য চ গৌতম।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে॥
পত্র-পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ॥

অনন্তর বৈষ্ণবগণের দ্বাদশশুদ্ধি কথিত হইতেছে। ভগবদ্-গৃহে গমন, যাত্রা উৎসবাদিতে ভগবানের অনুগমন, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রদক্ষিণ, এইরূপ গতিবিধানে পদদ্বয়ের সার্থকতাই বৈষ্ণবের পাদশুদ্ধি। ১। ভগবানের পূজার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ইত্যাদির উত্তোলন জন্য হস্তদ্বয়ের যে শুদ্ধি, তাহাই অন্যান্য সমস্ত করশুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, রূপ গুণকীর্ত্তন, ইহাই বাক্যের শুদ্ধি। ৩। ভগবানের লীলাগুণকথা শ্রবণে কর্ণশুদ্ধি এবং তাঁহার উৎসব নিরীক্ষণেই নেত্রদ্বয়ের সম্যক্শুদ্ধি। ৪। ভগবানের পাদোদক ও নির্ম্মাল্যপুষ্প মাল্য ইত্যাদির ধারণ, ভগবচ্চরণাম্বুজে প্রণাম, ইহাই মস্তকের শুদ্ধি। ৫। নির্ম্মাল্য গন্ধ পুষ্পাদির আঘ্রাণই ঘ্রাণদ্বয়ের শুদ্ধি। ৬। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে সমর্পিত যাহা কিছু

পত্রপুষ্প ইত্যাদি, তাহাই ত্রিলোক-পাবন, তাহার সংস্পর্শমাত্রেই সাধকের দেহ দ্রব্য মন প্রাণ সমস্ত বিশোধিত হইবে। এস্থলেও শৈব শাক্ত প্রভৃতি উপাসকগণ নিজ নিজ ইষ্টদেবতার উপলক্ষণ বুঝিয়া লইবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং ষষ্ঠোল্লাসে—

করশুদ্ধিং সমাসাদ্য কুর্য্যাত্তালত্রয়ং ততঃ।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-মস্ত্রমন্ত্রেণ দিগ্বন্ধমপি দেশিকঃ।
দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভি র্দশভিঃ কারয়েৎ সুধীঃ॥
বিঘ্নমুৎসারণং কৃত্বা ততঃ পুষ্পং বিশোধয়েৎ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং নমেৎ॥

পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা করশুদ্ধি সমাধানপূর্ব্বক অস্ত্র-মন্ত্রে ঊর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয় প্রদান করিয়া দশ ছোটিকা দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবেন, তৎপর বিঘ্নোৎসারণ এবং পুষ্পশোধন করিয়া বামে গুরুত্রয়কে প্রণাম করিবেন।

তন্ত্রে—

গুরুং পরমগুরুঞ্চৈব পরাপরগুরুং তথা।
নত্বা পার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবীং নমেৎ প্রিয়ে॥

বামে গুরু, পরম গুরু এবং পরাপর গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশকে এবং মস্তকে নিজ ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে।

॥ ভূতশুদ্ধি ॥

ভূতশুদ্ধি-ঋষিন্যাসং পীঠন্যাসং তথৈব চ।
করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাসমেব চ।
বিদ্যান্যাসং মহেশানি যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ।
এতদেব হি নিত্যং স্যাৎ কাম্যঞ্চান্যৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ভূতশুদ্ধি ঋষ্যাদিন্যাস পীঠন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস করন্যাস মাতৃকান্যাস বিদ্যান্যাস (মন্ত্রন্যাস) এই সকল ন্যাস প্রভাবেই সাধক দেবময় হইয়া থাকেন, ইহাই নিত্যন্যাস। অতঃপর যাহা কিছু সে সমস্ত কাম্যন্যাস বলিয়া কীর্ত্তিত।

তত্রৈব—

প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈ র্ন্যাসৈ র্দেবশরীরভৃৎ।
ন্যাসানাং প্রচুরত্বেন কলানামপি ভূরিতা॥

স্বভাবতঃ সদাঽশুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
মলমূত্র-সমাযুক্তং সর্ব্বদৈব মহেশ্বরি।
তস্যৈব হি বিশুদ্ধ্যর্থং বায়্বগ্নি-সলিলাক্ষরৈঃ।
শোষদাহৌ তথা ভস্ম-প্রোৎসারামৃতবর্ষণং।
আপ্লাবনঞ্চ কর্ত্তব্যং পূরকেন চ কুম্ভকৈঃ॥
শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনং।
অব্যক্তব্রহ্মসংস্পর্শাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং শিবে।
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থ-মর্ঘ্যাদি-স্থাপনঞ্চরেৎ॥
বিদধ্যান্মাতৃকান্যাসং মন্ত্রন্যাসমনন্তরং।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যা-দৃষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥

প্রাণায়াম ধ্যান এবং ন্যাস দ্বারা সাধক দেব-শরীর লাভ করেন, ন্যাস প্রচুর হইলে পূজার ফলও সমধিক হয়। মহেশ্বরি! সর্ব্বদাই মলমূত্রযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহ স্বভাবতঃই অশুদ্ধ। সেই অশুদ্ধ দেহের বিশুদ্ধির জন্যই বায়ুমন্ত্রে দেহের শোষণ, অগ্নিমন্ত্রে দেহের দাহ ও ভস্মোৎসারণ, চন্দ্রমন্ত্রে অমৃতবর্ষণ, বরুণমন্ত্রে আপ্লাবন এবং উক্ত মন্ত্রসমূহের অবলম্বনে প্রাণায়াম প্রক্রিয়া—রেচক পূরক কুম্ভক দ্বারা শরীরাকারভূত পঞ্চভূতের অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্তসংস্পর্শে যে বিশুদ্ধি, তাহারই নাম ভূতশুদ্ধি। এইরূপে ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিবে এবং তদনন্তর মাতৃকান্যাস মন্ত্রন্যাস প্রাণায়াম ও ঋষ্যাদিন্যাস করিবে।

অন্তর্যাগ ও প্রাণায়াম উভয়ের সংমিশ্রণে ভূতশুদ্ধি সিদ্ধ হয়, তন্মধ্যে অন্তর্যাগের স্বরূপ মূলাধার-কমলকোষ-বিহারিণী জগচ্চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মাকে উদ্বোধিতা করিয়া সুষুম্নাপথে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য—এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া হৃদয়স্থ জীবাত্মার সহিত তাঁহাকে সহস্রারে সহস্রদল-কমল-কর্ণিকা-বিরাজিত পরমশিব-পরমতত্ত্বে সম্মিলিত করিয়া শিবশক্তির পূর্ণব্রহ্মতত্ত্বে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়িক জগতের মায়া-প্রপঞ্চ বা ভৌতিক বিকার—পৃথিবী অপ্ তেজঃ বায়ু আকাশ গন্ধ, রস রূপ স্পর্শ শব্দ, নাসিকা জিহ্বা চক্ষু শ্রোত্র ত্বক্, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, প্রকৃতি মন বুদ্ধি অহঙ্কার, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পরব্রহ্মে বিলীন এবং মায়িক সত্তায় বীজাকারে অবস্থিত—এইরূপ ধ্যান-সমাধান ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া অন্তর্যাগ পূর্ণ করিতে হইবে। তদনন্তর বীজাকারে অবস্থিত বিশুদ্ধ মনঃপ্রকৃতির সাহায্যে মা কুলকুণ্ডলিনীকে শক্তি শক্তিমান্ বা প্রকৃতিপুরুষের পরমযোগ বা অভেদ অদ্বৈততত্ত্ব হইতে পুনর্ব্বার দ্বৈততত্ত্বের উদ্বোধন করিয়া মূলাধারকমলকুলকুহরে তাঁহার স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা এবং স্বয়ম্ভুশিবসম্মিলিতা করিয়া ইষ্টদেবতার স্বরূপে তাঁহাকে বাহ্যপূজা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আবার মন্ত্রময় অর্থাৎ

মন্ত্রশক্তির ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত কেবলই ব্রহ্মবিভূতিময় অভিনব বিশুদ্ধ দেহ বিরচিত করিয়া সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত সেই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক শক্তিসমূহকে জগদম্বার উপাসনার উপাদান উপকরণ স্বরূপে তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দেহে ন্যাস ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার বাহ্য পূজা আরম্ভ করিতে হইবে।

অন্তর্যাগ বা ষট্‌চক্রভেদ ভূতশুদ্ধিরই অন্তর্গত। ইহা জানিয়াও এস্থলে এই সংক্ষিপ্ত পূজাতত্ত্বের ব্যাখ্যা-প্রকরণে আমরা সে সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলাম না, তাহার কারণ একতঃ উহা যেরূপ বিস্তীর্ণ বিষয়, তাহাতে আমাদিগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্ধির যথাসাধ্য ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইলেও তন্ত্রতত্ত্বের সমানাবয়ব আর একখানি গ্রন্থেও উহা পর্য্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহস্থল। দ্বিতীয়তঃ ষট্‌চক্রের তত্ত্বব্যাখ্যা সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব; কারণ, অনুষ্ঠায়ী সাধক ভিন্ন অন্য কেহ ইচ্ছা করিলেই বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে বা সহস্র ব্যাখ্যার সাহায্যেও যে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহা কখনও নহে। তৃতীয়তঃ গুরু শিষ্যের পরস্পর সংবাদেই ষট্‌চক্রের তত্ত্বব্যাখ্যা শোভা পায়, কারণ যিনি নিজ দেহ হইতে শিষ্যদেহে দৈবীশক্তির সঞ্চার করিয়া পরস্পর উভয় দেহের শক্তিসংক্রম-পথ অনর্গল করিয়াছেন, শিষ্যদেহে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মা কুলকুণ্ডলিনীর যাতায়াত-পথ-বিবরণ সেই গুরুদেব যেমন নিজ শিষ্যকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশে দেখাইয়া তাহার অনুভব করাইয়া দিতে পারিবেন, সহস্র ব্যাখ্যাকর্ত্তা একত্র সমবেত হইলেও তাহার শতাংশের একাংশ সাধিত হইবার নহে—সে একাংশ মৌখিক প্রচারে হইলেও বা যাহা হউক, লিখিত প্রচারে ত কস্মিন্ কালেও সম্ভবে না। সেরূপ ব্যাখ্যা অসম্ভব হইলেও স্থূল স্থূল কয়েকটি বিবরণ মাত্র দিতে পারিলেও আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মচরিতার্থতা মনে করিতাম, কিন্তু দেখিতেছি তাহাও অসম্ভব—কারণ ষট্‌পদ্মের স্থিতি-বিবরণ কয়েকটি লিখিতে গেলেও সেই সেই পদ্মের কর্ণিকা কোষ কিঞ্জল্ক নাল পত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্ত্রাদির উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন প্রদর্শন না করিয়া কিছুতেই তত্ত্বস্পর্শ করা যায় না। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা ও নিজজ্ঞান বিশ্বাস মতে প্রকাশ্যভাবে সেই সকল বীজ মন্ত্রাদির উল্লেখ আমরা এ পর্য্যন্ত কখনও করি নাই এবং করিতে পারিবও না। এজন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে তাহাতে সম্পূর্ণ বিরত হইতে হইল। চতুর্থতঃ কেহ সেরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সাধক-সম্প্রদায়ের তাহাতে কোন উপকার-সম্ভাবনা ত নাই-ই, অধিকন্তু ইহ-পরলোকের যথেষ্ট অপকার-সম্ভাবনা আছে, কারণ শ্রীগুরুর শ্রীচরণচ্ছায়া-সাহায্য ব্যতিরেকে ষট্‌চক্র পথে অগ্রসর হইলে পদে পদে তাঁহার বিষম বিপৎসম্ভাবনা। ইহা স্বয়ং তন্ত্রেশ্বর ভগবান্ ভৈরবনাথের নিজমুখ নির্গত আজ্ঞা। আমরা জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মপর-সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিলাম না। ভরসা করি সাধকবর্গ বুঝিবেন যে ইহা তাঁহাদিগেরও মঙ্গলের কারণ। তবে বীজমন্ত্রাদির

উল্লেখ না করিয়া তাহার সাঙ্কেতিক শব্দ চিহ্নাদির ব্যবহার করিয়া আকারে ইঙ্গিতে উহার মূলতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহাতেও একতঃ ধর্ম্মের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সেরূপ গ্রন্থের আয়তন যে কত বড় হইবে, এক্ষণে তাহার নিশ্চয় করাও কঠিন, প্রায়ঃপূর্ণ তন্ত্রতত্ত্বের এই অবশিষ্ট কয়েক পৃষ্ঠায় সেই অনিশ্চিত বিশাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এক্ষণে কেবল বিড়ম্বনার অবতারণা, আর তন্ত্রতত্ত্বের গ্রাহক বা পাঠক হইলেই যে, সকলেই যথার্থ সাধক এ বিশ্বাসও আমাদিগের নাই। বিশ্বস্তসূত্রে এবং গুরুপরম্পরাসূত্রে অবগত কেবল সাধকমণ্ডলীর জন্য ঐরূপ গ্রন্থের প্রচার প্রয়োজন হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে পারিলে এবং মা সর্ব্বমঙ্গলার করুণাকটাক্ষে তাহার সুব্যবস্থা হইলে, সময়ে আমরা সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইব। এক্ষণে উহার অবতারণার অভাব সাধকবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অতঃপর তৃতীয় ভাগ তন্ত্রতত্ত্বে পঞ্চমকার ইত্যাদি ব্যাখ্যার পরে কৌলাধিকারে ষট্‌চক্রতত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে।

গৌতমীয়ে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভশ্চ নির্গর্ভকঃ।
সগর্ভা মন্ত্রজাপেন মাত্রয়া সংখ্যয়া ভবেৎ।
প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ।
প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রাণায়ামাৎ পরং পদং।
প্রাণায়ামাৎ পরং যোগঃ প্রাণায়ামাৎ পরং ধনং।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি কথিতং তব তত্ত্বতঃ।
বৎসরাভ্যাসযোগেন ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ ভবেদ্ ধ্রুবং।
চৈতন্যাবরণং যদ্ যৎ ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
প্রাণায়ামং বিনা মুক্তিমার্গো নাস্তি ময়োদিতং।
প্রাণায়ামং বিনা যচ্চ সাধনং তদফলং ভবেৎ।
প্রাণায়ামেন মুনয়ঃ সিদ্ধিমাপ্নুর্ন চান্যথা।
প্রাণায়ামপরো যোগী ন যোগী শিব এব সঃ।
গমনাগমনং বায়োঃ প্রাণস্য ধারণং তথা।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
প্রাণো বায়ুরিতি খ্যাত আয়াম-স্তন্নিরোধনং।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনং।
আদ্যন্তয়ো র্বিধীয়ন্তে নাসিকাপুটধারিণঃ।
রেচয়েদ্দক্ষয়া নাসা পূরয়েদ্বামতস্ততঃ।
দ্বাত্রিংশদভ্যাসন্ মন্ত্রং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপান-মগম্যাগমনং তথা।
সর্ব্বমাশু দহত্যেব প্রাণায়ামেন বৈ দ্বিজঃ।
ভ্রূণহত্যাদি পাপানি নাশয়েন্মাসমাত্রকে।
প্রাতঃ সায়ং চরেন্নিত্যং ষোড়শ প্রাণসংযমং।
নাশয়েৎ সর্ব্বপাপানি তূলরাশিমিবানলঃ।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতং ॥
স্বদেহস্থং যথা সর্পঃ বর্ম্মোৎসৃজ্য নিরাময়ঃ।
প্রাণায়ামাত্তথা ধক্ষত্যবিদ্যাং কামকর্ম্মজাং।
অথবা কিং বহূক্তেন শৃণু গৌতম মদ্বচঃ।
প্রাণায়ামায় হি পরো যোগিনাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥
প্রাণায়ামং বিধায়েত্থং দেহে পীঠানি বিন্যসেৎ ॥

সগর্ভ ও নিগর্ভভেদে প্রাণায়াম দ্বিবিধ। যাহা মন্ত্রজপপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সগর্ভ, আর যাহা মন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল মাত্রার সংখ্যা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিগর্ভ। সুব্রত। প্রাণায়াম অপেক্ষা পরম তত্ত্ব, পরম তপঃ, পরম জ্ঞান, পরম পদ, পরম যোগ, পরম ধন আর নাই, আর নাই। এক বৎসরকাল নিয়ত প্রাণায়ামের অভ্যাসযোগে নিশ্চয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চৈতন্যরূপ পরমাত্মার যাহা কিছু মায়িক আবরণ, একমাত্র প্রাণায়ামের প্রভাবেই তাহার ক্ষয় হয়, ইহা নিঃসংশয়। প্রাণায়াম ব্যতিরেকে মুক্তির পথ নাই; অতএব প্রাণায়াম ব্যতিরেকে যে সাধন অনুষ্ঠিত হইবে তাহা বিফল হইবে। প্রাণায়ামের অবলম্বনেই মুনিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী, যোগী নহেন—তিনি শিবরূপ। যে অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায় প্রাণবায়ুর গমনাগমন ও ধারণ হয়, যোগশাস্ত্র বিশারদগণ তাহাকেই প্রাণায়াম নামে উক্ত করিয়াছেন। প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু, আয়াম শব্দের অর্থ নিরোধ। যাহার দ্বারা প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করা যায়, তাহাই যোগিগণের যোগসাধন প্রাণায়াম। যোগের আরম্ভ এবং উপসংহারে নাসিকাপুটধারী হইয়া যোগিগণ এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দক্ষিণ নাসার দ্বারা বায়ুর রেচন করিবে, বাম নাসার দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে এবং উভয় নাসা ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশদ্‌বার মন্ত্রজপ দ্বারা বায়ু ধারণ করিবে, ইহারই নাম প্রাণায়াম। ব্রাহ্মণ এই প্রাণায়াম প্রভাবে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান অগম্যাগমন প্রভৃতি সমস্ত পাপ শীঘ্রই দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। ভ্রূণহত্যাদি পাপসমূহ মাসমাত্র প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানেই বিনষ্ট হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে যিনি ষোড়শবার করিয়া প্রাণায়াম করেন, অগ্নি যেমন ক্ষণমধ্যে তূলরাশিকে দগ্ধ করেন তদ্রূপ সেই প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীও ক্ষণমধ্যে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন। সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত প্রাণায়াম।

নিজদেহস্থিত বর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে দেহ যেমন নিরাময় হয়, প্রাণায়াম প্রভাবেও জীব তদ্রূপ কামকর্ম্মজনিত অবিদ্যাকোষ পরিহার করিয়া নিরাময় ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়েন। অথবা গৌতম! আর বহু উক্তির প্রয়োজন কি? আমার বাক্য শ্রবণ কর—যোগিগণের মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণায়াম অপেক্ষা পরম পথ আর কিছুই নাই। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণায়াম বিধান করিয়া সাধক পূজাকালে নিজদেহে ইষ্টদেবতার পীঠশক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন।

বিশুদ্ধেশ্বরে—

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যা-দ্বিদ্যয়া তদনন্তরং।
পূরকং বামনাড্যান্তু কুর্য্যাৎ ষোড়শধা জপৈঃ॥
কুম্ভকং মধ্যনাড্যান্তু চতুঃষষ্টি-জপান্ততঃ।
রেচকং পিঙ্গলায়াস্তু তদর্দ্ধজপসংখ্যয়া॥
বিপরীতং ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাশক্ত্যা তু সাধকঃ।
তদশক্তৌ চতুর্থ্যাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ॥

মূলমন্ত্রের অবলম্বনে সাধক তিনবার প্রাণায়াম করিবেন, তন্মধ্যে ষোড়শ বার জপের দ্বারা বামে ঈড়া নাড়ীতে পূরক, চতুঃষষ্টিবার জপের দ্বারা মধ্য (সুষুম্না) নাড়ীতে কুম্ভক, দ্বাত্রিংশদ্বার জপের দ্বারা দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ীতে রেচক। পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান অর্থাৎ পিঙ্গলায় পূরক, সুষুম্নায় কুম্ভক ও ঈড়ায় রেচক অনুষ্ঠান করিয়া আবার তাহার বিপরীত—ঈড়ায় পূরক, সুষুম্নায় কুম্ভক এবং পিঙ্গলায় রেচক যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ দ্বারাও প্রাণায়াম সম্পন্ন করিবেন।

তন্ত্রান্তরে—

পূরয়েৎ ষোড়শভির্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ।
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ-মেবং প্রাণস্য সংযমঃ॥

ষোড়শবার জপের দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, তাহারই চতুর্গুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি বার জপের দ্বারা কুম্ভক করিবে এবং সেই কুম্ভকের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশদ্বার জপের দ্বারা রেচক করিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহার চতুর্ভাগের এক ভাগ সংখ্যার দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। অর্থাৎ ৮ বার জপে পূরক, ৩২ বারে কুম্ভক এবং ১৬ বারে রেচক। আবার ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহারও চতুর্ভাগের এক ভাগ করিবে। অর্থাৎ ২ বারে পূরক, ৮ বারে কুম্ভক, ৪ বারে রেচক। পরতঃপর সামর্থ্য ভেদে প্রাণায়ামের নিয়ম শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অসমর্থ হইলে ইহা অপেক্ষাও সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে—

ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং সকৃচ্চ মূলবিদ্যয়া।
মধ্যনাড্যা কুম্ভয়েচ্চ বেদসংখ্যা বরাননে॥
নেত্রসংখ্যাক্রমেণৈব রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা।
পুনঃ পুনঃ ক্রমেণৈব যথা বারত্রয়ং ভবেৎ॥
বাহ্যাদাপূরণং বায়োরুদরে পূরকং ভবেৎ।
বহির্যদ্রেচনং বায়োরুদরাদ্রেচকো হি সঃ॥

১ বার মূলমন্ত্র জপের দ্বারা ঈড়ায় বায়ু পূরণ করিবে। ৪ বারে সুষুম্নায় কুম্ভক এবং ২ বারে পিঙ্গলায় রেচক করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে ৩ বার প্রাণায়াম করিবে। বহির্ভাগ হইতে উদরে বায়ুর পূরণের নাম পূরক। আর উদর হইতে বহির্ভাগে রেচনের নাম রেচক।

জ্ঞানার্ণবে—

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ র্যন্নাসাপুটধারণং।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়-স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা॥
প্রাণায়ামং বিনা দেবি পূজনে নহি যোগ্যতা।

তর্জ্জনী ও মধ্যমা ব্যতিরেকে কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসা-পুটের যে ধারণ-প্রক্রিয়া, তাহার নাম প্রাণায়াম। দেবি! প্রাণায়াম ব্যতীত দেবপূজার যোগ্যতাই হয় না।

ন্যাস

॥ ঋষ্যাদিন্যাস ॥

ঋষিচ্ছন্দো দেবতানাং বিন্যাসেন বিনা যদা।
জপ্যতে সাধিতেঽপ্যেবং নহি তৎ সফলং ভবেৎ॥

ঋষি ছন্দ ও দেবতার বিন্যাস ব্যতীত জপের দ্বারা মন্ত্র সাধিত হইলেও তাহা সফল হইবে না।

মহেশ্বরমুখাজ্‌জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাৎ ছন্দ উচ্যতে।
অক্ষরত্বাং পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্॥
হৃদয়াম্ভোজ-মধ্যস্থাং দেবতাং তত্র তাং ন্যসেৎ।

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানাৎ ন মন্ত্রফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্

স্বয়ং মহেশ্বরের শ্রীমুখ হইতে উপদেশ লাভ করিয়া যিনি সেই মন্ত্রকে সম্যক্ সাধিত করিয়াছেন, তিনি সেই দেবতার সেই মন্ত্রের ঋষি। এজন্য গুরুত্বহেতু তাঁহার ন্যাস মস্তকে বিহিত। সমস্ত মন্ত্রতত্ত্বের ছাদন (নিজ অধিকারে সংরক্ষণ) হেতু ছন্দের নাম 'ছন্দঃ'। এই ছন্দের অক্ষরত্ব এবং পদত্ব হেতু তাহার ন্যাস মুখে বিহিত হইয়াছে। আর দেবতা ত নিয়তই সাধকের হৃদয়াম্ভোজ মধ্যে অধিষ্ঠিতা, এজন্য তাঁহার ন্যাস হৃদয়েই বিহিত। ঋষি ও ছন্দের অপরিজ্ঞান থাকিলে সাধক মন্ত্রফলভাগী হইবেন না। আর মন্ত্রের বিনিয়োগ (যে উদ্দেশে যে মন্ত্রের নিয়োগ) যাঁহারা অবগত নহেন তাঁহাদিগের সাধিত মন্ত্রসকল দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়।

তন্ত্রান্তরে—

ঋষিং ন্যসেৎ মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে।
শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ॥

মস্তকে ঋষির ন্যাস করিবে, মুখকমলে ছন্দের ন্যাস করিবে, হৃদয়ে দেবতার ন্যাস করিবে, গুহ্যদেশে বীজের ন্যাস করিবে, পাদদ্বয়ে শক্তির ন্যাস করিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলকের ন্যাস করিবে।

॥ মাতৃকা-ন্যাস ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং—

আদৌ দ্রব্যানি সংস্কৃত্য পশ্চাত্তন্ত্রোদিতান্ ন্যসেৎ।
মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরা চাপ্যপরা তথা।
সুষুম্নান্তঃ পরা জ্ঞেয়া অপরা দেহমাশ্রিতা।

প্রথমে পূজার দ্রব্যাদি সংস্কার করিয়া পশ্চাৎ তন্ত্রোক্ত ন্যাস সকলের অনুষ্ঠান করিবে। মাতৃকা শক্তি দ্বিবিধা—পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে পরা মাতৃকা সুষুম্নার অভ্যন্তর্বর্ত্তিনী এবং অপরা মাতৃকা দেহাবলম্বিনী। এই পরা মাতৃকারই নামান্তর অন্তর্ম্মাতৃকা। ষট্চক্রান্তর্গত ষট্পদ্মের দল মণ্ডলাদি অবলম্বনে অন্তর্মাতৃকার ন্যাস করিতে হয় এবং ললাট মুখমণ্ডল চক্ষু কর্ণ নাসিকা গণ্ডদ্বয় ওষ্ঠ দন্ত মস্তক মুখ হস্ত পদ সন্ধিস্থলের অগ্রভাগসমূহ, পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ নাভি জঠর হৃদয়-অংশ ককুদ্-অংশ হৃদয়াদি করদ্বয়, হৃদয়াদি পদদ্বয় এবং জঠর ও আসনে বহির্মাতৃকামন্ত্রাবলীকে যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবে। এই মাতৃকামন্ত্র আবার বিলোমে বিন্যস্ত হইলেই তাহার নাম সংহার-মাতৃকা এবং শ্রীকণ্ঠাদি মন্ত্রযোগে সম্পন্ন হইলেই তাহার নাম শ্রীকণ্ঠাদি মাতৃকা॥

॥ মাতৃকান্যাসের মুদ্রা ॥

মনসা বা ন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈরেবাথবা ন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাৎ ন্যসেদ্বা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

মানসিক ন্যাস করিবে কিম্বা পুষ্প দ্বারা ন্যাস করিবে অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলীর যোগে ন্যাস করিবে।

গৌতমীয়ে—

চতুর্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং কথয়ামি তে।
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িকা।
সবিসর্গা পুত্রদাত্রী সবিন্দু র্বিন্দুদায়িনী।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কলিকল্মষনাশনং।
যঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসং স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥

মাতৃকা চতুর্ব্বিধা—কেবল মাতৃকা, সবিন্দু মাতৃকা, সবিসর্গ মাতৃকা এবং বিন্দু বিসর্গ উভয়যুক্তা মাতৃকা। কেবল মাতৃকা বিদ্যাকরী, বিন্দু বিসর্গ উভয়াত্মিকা মাতৃকা ভোগদায়িনী, সবিসর্গা পুত্রদাত্রী এবং সবিন্দু মাতৃকা বিন্দু (মোক্ষ) দায়িনী। ধনপ্রদ যশঃপ্রদ ও পরমায়ুঃপ্রদ কলিকলুষনাশন এই মাতৃকান্যাসের অনুষ্ঠান যিনি করেন, তিনি সাক্ষাৎ সদাশিবের বিভূতি লাভ করেন।

॥ বিদ্যান্যাস ॥

মূর্দ্ধি মূলে চ হৃদয়ে নেত্রত্রিতয় এব চ।
শ্রোত্রয়ো র্গলে দেবি মুখে চ ভুজয়োঃ পুনঃ।
পৃষ্ঠে জানুনি নাভৌ চ বিদ্যান্যাসং সমাচরেৎ।
এবং ন্যাসকৃতঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পশুপতিঃ স্বয়ম্ ॥

মস্তকে মূলাধারে হৃদয়ে নেত্রত্রয়ে শ্রোত্রদ্বয়ে মুখে ভুজদ্বয়ে পৃষ্ঠে জানুতে এবং নাভিতে বিদ্যান্যাস করিবে। যিনি এইরূপে ন্যাসের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পশুদেহ (জীবদেহ) বিশিষ্ট হইয়াও পশুপতি পদবীতে আরূঢ় হয়েন।

॥ ষোঢ়ান্যাস ॥

বীরতন্ত্রে—

কৃতেঽস্মিন্ন্যাসবর্য্যে তু সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি।
বিষাপমৃত্যুহরণং গ্রহ-রোগাদি-নাশনং।

দুষ্টসত্ত্বা বিনশ্যন্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাং।
কবিতা লহরী তস্য দ্রাক্ষারস-পরম্পরা।
অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধিস্তু তস্য হস্তে ব্যবস্থিতা।
কায়িকং বাচিকং বাপি মানসঞ্চাপি দুষ্কৃতং।
সর্ব্বং তস্য বিনাশত্বং যাতি ন্যাসস্য চিন্তনাৎ।
পুরস্কৃত্যা ক্ষয়ং যাতি যৎ কিঞ্চিদুপপাতকং।
যদ্রূপং দৃশ্যতে যোঽপি স তদ্রূপঞ্চ গচ্ছতি।
যং নমন্তি মহেশানি ষোঢ়াপুটিতবিগ্রহাঃ।
অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া॥

সর্ব্ব ন্যাস-প্রধান এই ষোঢ়ান্যাস অনুষ্ঠিত হইলে সাধকের সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হয়। ষোঢ়ান্যাস সর্পাদি বিষ ও অপমৃত্যু হরণ করে এবং দুষ্ট গ্রহ ও রোগাদি বিনাশ করে। ষোঢ়ান্যাসের প্রভাবে দুষ্ট সত্ত্বগণ বিনষ্ট হয় এবং শত্রুগণ মিত্রতাপন্ন হয়। ষোঢ়ান্যাস-সম্পন্ন সাধকের কবিতালহরী দ্রাক্ষারস ধারার ন্যায় মধুর প্রবাহিত হয়। অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাঁহার করকমলে অধিষ্ঠিত হয়। কায়িক বাচনিক ও মানসিক যাহা কিছু পাপ ষোঢ়ান্যাসের চিন্তায় তাহা বিনষ্ট হয়। যাহা কিছু উপপাতক, ষোঢ়ান্যাসের অবলম্বনে তাহা ক্ষীণ হয়। ষোঢ়ান্যাস সিদ্ধ হইলে সাধক যে কোন রূপ দর্শন করুন না কেন, ইচ্ছা করিলে তাহাতেই প্রবেশ করিতে পারেন। ষোঢ়ান্যাসে পুটিত-দেহ হইয়া সাধক যাঁহাকে প্রণাম করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অল্পায়ু হইবেন। মানবের কথা দূরে থাক্, ষোঢ়ান্যাসকারী সাধককে দেখিয়া দেবতাও সভয়ে কম্পিত হয়েন।

ঋষ্যাদিন্যাস মাতৃকান্যাস বিদ্যান্যাস তত্ত্বন্যাস ষোঢ়ান্যাস জীবন্যাস অঙ্গন্যাস করন্যাস ব্যাপকন্যাস পীঠন্যাস প্রভৃতি বহুবিধ ন্যাস বহু তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ ভিন্ন প্রয়োগবিভাগ উল্লেখ করা অতি অবৈধ, এইজন্য আমরা তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। সে সকল গুরুগম্য বিষয় সাধকগণ নিজ নিজ গুরুদেবের নিকটে অবগত হইবেন। ন্যাস শব্দের যৌগিক অর্থ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

ন্যায়োপার্জ্জিত-বিত্তানামঙ্গেষু বিনিযোজনাৎ।
সর্ব্বরক্ষাকরত্বাচ্চ ন্যাস ইত্যভিধীয়তে॥

ন্যায় অনুসারে উপার্জ্জিত ধনসমূহ অলঙ্কাররূপে নিজদেহে সন্নিবেশিত করিলে তাহা যেমন আনন্দের এবং বিপদে সম্পদে অভয়ের কারণ হয়, দেবতার বীজসকলও তদ্রূপ সাধকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত হইলে একতঃ তাঁহার ব্রহ্মানন্দের অন্যতঃ তাঁহার ঐহিক পারত্রিক অভয়ের কারণ হয়। ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তের সাদৃশ্য হেতু তাহার

আদ্যক্ষর ন্যা, আর সর্ব্বরক্ষা-করত্ব হেতু তাহার আদ্যক্ষর স, এই উভয় অক্ষরের যোগে ন্যাস 'ন্যাস' নামে অভিহিত।

দেবতাভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির পক্ষে ন্যাসের সমান উপকরণ আর নাই। প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড ন্যাসে নিজ ইষ্ট দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন মন্ত্রশক্তিরূপে সর্ব্বাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বশেষে ব্যাপকন্যাসে পাদ-মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অখণ্ডরূপিণী মন্ত্রময়ী দেবতার স্বরূপের অনুভূতি, ইহাই ন্যাসের চরম তাৎপর্য্য। এই সকল ন্যাসের প্রভাবেই সাধকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। ন্যাসের প্রভাবেই সাধকগণ সুরাসুর-নর-জগতে চির অজর অপরাজিত স্বাধীন অকুতোভয়। যাঁহার অভয় নামের সিংহনাদে ভয় নিজে ভয় পাইয়া পলায়ন করে, সেই ভয়ের ভয়বিধান-করা ত্রিভুবনের ভয়-হরা অভয়া মাকে হৃদয়ে ধরিয়া অথবা সাধক তাঁহারই অভয় কোলে বসিয়া ভয় করিবেন কাহাকে? সুরাসুর চরাচরে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম যক্ষের অধিকারে কাহার সাধ্য তাঁহার অঙ্গে কোন অস্ত্রে বাধা দেয়? ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, কুবেরের নাগপাশ, বায়ুর গদা, ইহার কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হয়?

রাজরাজেশ্বরীকে কোলে করিয়া অথবা রাজরাজেশ্বরীর কোলে উঠিয়া যে বসিয়াছে, সে কি আর রাজ্যের সৈন্য সেনাপতি দেখিয়া ভয় করে। তাই সাধক বিজন বনে, বিকট শ্মশানে, ধ্যান সমাধানে, শব-সাধনে একাকী অভয় অন্তঃকরণে সদর্পে যাত্রা করেন। একদিকে জগৎ, একদিকে জগদম্বা, ইহারই মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জগতে জয়পতাকা উড়াইয়া সাধক জয়জয়ন্তীর কোলে উঠেন। জয় যাঁহার জীবনের মন্ত্র, ভয় তাঁহার অভিধানের বহির্ভূত। তাই সাধক মাতৃদত্ত মন্ত্রময় অক্ষয়-কবচে দেহ আবৃত করিয়া, মায়ের তেজে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, মায়ের কোলে মা-ময় হইয়া মায়ের পূজায় বসিয়া থাকেন; তাই মায়ের পূজায় নিজের দেহে মন্ত্রন্যাস কেবল মায়ের হস্তে সাধকের নিজস্ব (আমিত্ব) ন্যাস (গচ্ছিত) রাখা। এই গচ্ছিত সম্পত্তির যাহা কিছু বর্দ্ধিত অংশ (সুদ) হইবে, তাহাই তাঁহার এ ভব সংসারে একমাত্র শেষের সম্বল।

ন্যাস-তত্ত্বের এই গুরুগভীর দৃশ্য দেখিয়াই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে—

ব্রহ্মময়ীর সকল ব্রহ্মময়।

ও তাঁর, নয়ন ব্রহ্ম দিয়ে, হৃদয় ব্রহ্মে নিয়ে,
চরণ ব্রহ্মে মনন ব্রহ্মাঞ্জলি হয়। (তাঁর)

১। ও তাঁর কর চরণ, শ্রবণ নয়ন,
ভৌতিক ইহার কিছুই ত নয়;
সে যে ব্রহ্মময়মূর্ত্তি, কেবল ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি,
পদাঙ্গুষ্ঠ হ'তে ব্রহ্মরন্ধ্রময়। (তাঁর)

২। তাঁর, দেহ তত্ত্ব, জানেন সত্য,
স্বয়ং বিষ্ণু জগন্ময় ;
যাঁর সুদর্শন চক্রে, একান্ন পীঠ চক্রে,
প্রতি অঙ্গে তাঁর পূর্ণমূর্ত্তি হয় ॥ (দেখ !)

৩। ও তাঁয়, ভজে যে জন, — জানে সে জন,
অঙ্গ যোজন কিরূপে হয় ;
মূল, পূজা সমাপনে, ষড়ঙ্গ পূজনে,
প্রকাশিত নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বচয় ॥ (মা তোমার)

৪। তোমার জন্মভূমি, নিজেই তুমি,
তোমায় তোমার প্রকাশ হয় ;
তুমি, হৃদয় মাঝে তোমার, শিরে শিখায় আবার,
কবচে লোচনে অস্ত্রে তুমিময় ॥ (তোমার)

৫। সাধক, তুমি হ'য়ে, তোমায় ল'য়ে,
তোমায় 'আমি' ডুবায়ে দেয় ;
আবার, পূজাসমাপনে, তোমায় আমায় এনে,
তোমাতে আমাতে মিলিয়ে এক হয় ॥ (তখন)

৬। পূজার, আগে সোঽহং, পরে সোঽহং,
মধ্যে যে ত্বং, সেও অহং-ময়,
নইলে, তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে ?
আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয় ॥ (বল !)

৭। প্রেম, জাগে যখন, আর কি তখন,
তোমায় আমায় সাধনা হয় ?
তখন, অভেদ সম্বন্ধে, মাতি প্রেমানন্দে,
ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময় ॥

৮। তখন, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি-
র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং,
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম,
ব্রহ্মকর্ম্মের মর্ম্ম সমাধি এই হয় ॥

৯। শিব, কেঁদে আকুল, শিবের কি ভুল,
ষড়ঙ্গে নাই শ্রীপদদ্বয় ;
তোমার, সকল অঙ্গে তুমি, পদে কিন্তু আমি,
তাইতে বলি, ওপদ গণনার ভুল নয় ॥

শ্যামা-রহস্য, কালীতন্ত্র, শ্যামার্চ্চন-চন্দ্রিকা, কমলাতন্ত্র, বীরতন্ত্র, মহানির্ব্বাণ, অন্নদাকল্প, তোড়লতন্ত্র, গৌতমতন্ত্র, তারারহস্য প্রভৃতি নানা তন্ত্রে প্রাণায়াম ভূতশুদ্ধি ন্যাস ইত্যাদির ক্রম সম্বন্ধে অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন তন্ত্রে প্রাণায়ামের পর ভূতশুদ্ধি, কোন তন্ত্রে ভূতশুদ্ধির পর প্রাণায়াম, কোন তন্ত্রে অর্ঘ্য-স্থাপনের পূর্ব্বে, কোন তন্ত্রে অর্ঘ্য স্থাপনের পরে এইরূপ বহুবিধ মতভেদ থাকিলেও ভগবান্ ভূতভাবন স্বতন্ত্র-তন্ত্রে স্বয়ংই তাহার মীমাংসা করিয়াছেন যে, পূজা চ বিবিধা প্রোক্তা তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ। নানাতন্ত্রে পূজাক্রম বিবিধ প্রকার উক্ত হইয়াছে, সাধক তন্মধ্যে যে কোন এক তন্ত্রের মত আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠানাদি করিবেন অর্থাৎ যাঁহার ইষ্ট দেবতার উপাসনায় যে তন্ত্র প্রশস্ত, তিনি তাহারই বিধানানুসারে পূজাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

কুলার্ণবে—

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
যো ন্যাসকবচচ্ছন্দো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে।
বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ।
অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়াত্মা প্রজপেন্মনুং।
সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ ব্যাঘ্রৈ র্মৃগশিশুর্যথা।

তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে প্রত্যহ যিনি ন্যাসাদির অনুষ্ঠান করেন, দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়া তিনি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। যিনি ন্যাস কবচ ও ছন্দোমন্ত্রাদি সহকারে নিজের অভীষ্ট মন্ত্র জপ করেন, প্রিয়ে! সিংহদর্শনে গজ-যূথ যেমন পলায়ন করে, বিঘ্নগণও তদ্রূপ সেই সাধককে দেখিয়া পলায়ন করে। ন্যাসসমূহের অনুষ্ঠান না করিয়া যে মূঢ়াত্মা মন্ত্র জপ করে, ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক মৃগ-শিশু যেরূপ আক্রান্ত হয়, সেও তদ্রূপ সমস্ত বিঘ্নরাশির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

॥ মানস পূজা ॥

ন্যাসাদির অনুষ্ঠানের পর মানসপূজার প্রারম্ভে দেবতার ধ্যান শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ধ্যান শব্দের সহজ অর্থ—ঐকান্তিক চিন্তা। কোন্ দেবতার মূর্ত্তি কিরূপ চিন্তা করিতে হইবে, শাস্ত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রের সেই রূপ-বর্ণন ভাগটি বর্ত্তমান সমাজে ধ্যান নামে ব্যবহৃত। পূজা পদ্ধতিতেও ঐ ধ্যান মন্ত্র লিখিত থাকে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ধ্যানকালে ঐ মন্ত্রভাগের অনুস্মরণ করিতে করিতে যথাক্রমে দেবতার চরণ হইতে মস্তক এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত চিন্তার অনেক সাহায্য হয়।

কিন্তু কালক্রমে সে উদ্দেশ্য তিরোহিত হইয়া ঐ ধ্যান-মন্ত্র পাঠ করাই এখন ধ্যান নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হৃদয়ে তাঁহার রূপ-চিন্তা থাকুক্ বা না থাকুক্, অনেকের সংস্কার এই যে, পীঠন্যাসের পর ধ্যানমন্ত্রটি পাঠ করিলেই ধ্যান করা হইল। বস্তুতঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাহা নহে। ধ্যানমন্ত্র পঠিত হউক বা না হউক স্বরূপতঃ তাঁহার রূপ চিন্তিত হইলেই ধ্যান সিদ্ধ হইল। কারণ 'ধ্যায়েৎ' ধ্যান করিবে ইহাই শাস্ত্রার্থ; কিন্তু 'ধ্যানং পঠেৎ'—ধ্যান পাঠ করিবে, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। তাই মন অন্যদিকে রাখিয়া বচনে ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিলে সে ধ্যান দেবতার ধ্যান না হইয়া বরং পূজকেরই ধ্যান হইয়া উঠে। আমরা অনেক সময়ে অনেকস্থলে দেখিতে পাই, অভ্যস্ত ধ্যানটি পাঠ করিতে যেটুকু সময় লাগে পূজক বা পুরোহিতগণ সেই সময়টুকুই মনের অবসরের সময় মনে করিয়া অন্য চিন্তা যাহা করিবার থাকে তাহা করিয়া লয়েন। যাঁহার যেরূপ ধ্যান, তিনি সেই দেবতার পূজায় সেইরূপ সিদ্ধিই লাভ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা নিষ্প্রোয়োজন। কিন্তু ঐরূপ ধ্যানে—পূজা যে সিদ্ধ হয় না, ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

সনৎকুমারতন্ত্রে—

অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহির্চ্চনং।
অন্তঃপূজাং বিনা দেবি বাহ্যপূজা বৃথা ভবেৎ॥

মানস-পূজা না করিয়া বাহ্য-পূজা করিবে না, যেহেতু অন্তঃপূজা ব্যতীত বাহ্য-পূজা বৃথা হইবে।

ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে—

সর্ব্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃ-পূজা বিধীয়তে।
অন্তঃ-পূজা মহেশানি। বাহ্যকোটিফলং ভবেৎ॥
সকৃৎ পূজা মহেশানি! বাহ্যকোটিফলং ভবেৎ।
কিং তস্য বাহ্য-পূজায়াং সর্ব্বং ব্যর্থং কদর্থনম্॥
উপচারাদ্যভাবে চ বাহ্যপূজা কদর্থনম্।
বিনোপচারৈর্যা পূজা সা পূজা ন প্রসীদতি॥

সমস্ত বাহ্য-পূজাতেই অন্তঃপূজা বিহিত। মহেশ্বরি! একটি অন্তঃপূজা, কোটি বাহ্যপূজার ফল প্রদান করে। একবার তৎ-পূজা সম্পন্ন হইলে কোটি বাহ্যপূজার ফল লব্ধ হয়। সেই অন্তঃপূজা যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার আর বাহ্যপূজার প্রয়োজন কি? অন্তঃপূজা সিদ্ধ হইলেও বাহ্যপূজার চেষ্টা ব্যর্থ, আবার উপচারাদির অভাব হইলেও বাহ্যপূজার চেষ্টা ব্যর্থ। কারণ উপচার ব্যতীত যে পূজা, সে পূজা কখনও ফলপ্রদ হইবে না।

তন্ত্রান্তরে—

যদি বাহ্যার্চ্চনদ্রব্য-সম্পত্তিরপি বর্ত্ততে।
অন্তর্যাগং বিধায়েত্থং বহির্যাগ-বিধিঞ্চরেৎ॥

বাহ্যপূজার দ্রব্য-সম্পত্তি যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেও পূর্ব্বরূপ অন্তর্যাগের বিধান করিয়া তৎপর বহির্যাগ-বিধির অনুষ্ঠান করিবে। আজকাল অনেকস্থানে উচ্চাধিকারের অভিমানী অনেক সাধক-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা আমাদিগের সেই পূর্ব্বোক্ত 'বাহ্যপূজাধমাধমা'র দল। বাহিরে পুষ্প চন্দন ধূপ দীপ ইত্যাদির দ্বারায় দেবতার পূজাকে ইঁহারা অপমানবিশেষ বলিয়া মনে করেন, কেননা তাঁহারা সোঽহং ভাবে দয়া পুষ্প ক্ষমা পুষ্প এবং কাম ক্রোধরূপ ছাগ মহিষ ইত্যাদি বলিদান দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আবার বলিয়াও থাকেন—এই পূজাই যথার্থ পূজা অর্থাৎ বাহ্যপূজায় কেবল বৃথা আড়ম্বর, কায়ক্লেশ ও জীব হিংসা ইত্যাদি।

ইহার সকল কথাই আমরা স্বীকার করি অথবা সকল কথাই অস্বীকার করি, তাহা নহে। যাহা শাস্ত্রানুমোদিত আমরা অবনতমস্তকে তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য। তাই একবার দেখিতে হইয়াছে—শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলিবেন।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে—

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা তু সাধকঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈঃ।
হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্তু গন্ধতত্ত্বকম্।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্।
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়া-ক্ষমা-জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্।

ইতি পঞ্চ দশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা।
কুলামৃতঞ্চ তৎ পুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ।
কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।
মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী-সূত্র-মন্ত্রিতা।

*　　*　　*

সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃ পূজাং সমারভেৎ।
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারস্তত্রাদৌ কথ্যতে শৃণু।
যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি।
দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি।

সাধক এইরূপে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে মানস উপচারসমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহাকে নিজের হৃৎপদ্ম আসন প্রদান করিয়া সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবেন। মনকে অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদন করিবেন। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমন ও স্নানীয় প্রদান করিবেন। আকাশ-তত্ত্বকে বসনরূপে, গন্ধ-তত্ত্বকে গন্ধরূপে, চিত্তকে পুষ্পরূপে, পঞ্চ প্রাণকে ধূপরূপে, তেজস্তত্ত্বকে দীপরূপে, সুধা সমুদ্রকে নৈবেদ্যরূপে, অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টারূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামররূপে, দশেন্দ্রিয়ের কর্ম্মসমূহ ও মনোবৃত্তির চাঞ্চল্যকে নৃত্যরূপে নিবেদন করিবেন। অনন্তর নিজের তন্ময়তা ভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত সাধক মনোময় পঞ্চদশ-পুষ্পাঞ্জলি দেবতার চরণাম্বুজে প্রদান করিবেন। যথা, অমায় অনহঙ্কার অরাগ অমদ অমোহ অদম্ভ অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্য্য অলোভ এই দশ পুষ্প, আর অহিংসা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দয়া ক্ষমা জ্ঞান এই পঞ্চ পুষ্প, সমষ্টিতে এই ভাবরূপ পঞ্চদশ পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা দেবতার পূজা করিবেন। অনন্তর মনোময় সুধার সমুদ্র, পর্ব্বতাকৃতি মাংস ও ভর্জ্জিত মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা, ঘৃতাক্ত পায়স, কুলামৃত, কুলপুষ্প, পীঠক্ষালনবারি অর্পণ করিবেন। অনন্তর কামকে ছাগরূপে ও ক্রোধকে মহিষরূপে বলি প্রদান করিয়া মনোময় জপ আরম্ভ করিবেন। এই জপে পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণমালার মণিস্বরূপ স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী, সেই মালার সূত্রস্বরূপিণী; তাহাতেই পঞ্চাশদ্বর্ণমাতৃকা মণিরূপে গ্রথিত।

এই প্রকারে জপ সমর্পণ করিয়া মানসিক অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া এইরূপে অন্তর্যাগ সমাধান হইলে তদনন্তর বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবেন। তাহার প্রথমেই বিশেষার্ঘ্যের

সংস্কার কথিত হইতেছে শ্রবণ কর, যাহা স্থাপনমাত্রেই দেবতা সুপ্রসন্না হয়েন্। অর্ঘ্য-পাত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগিনীগণ, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও ভৈরবগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং পূজার সিদ্ধিফল প্রদান করেন। এই মানসপূজা বা অন্তর্যাগের বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, ইহা সত্য এবং সেই পূজা যে কোটি কোটি বাহ্যপূজার অপেক্ষাও সমধিক ফলের কারণ ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত। কিন্তু অন্তর্যাগ বা বাহ্যপূজা সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইলে তবে তাহা কোটিগুণ ফলের কারণ, ইহাও বুঝিবার বিষয়। হৃৎপদ্ম আসন ও সহস্রারচ্যুত অমৃত পাদ্যরূপে প্রদান করা বলিতে ও শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্পন্ন করিতে কয়জন সমর্থ তাহা ভাবিবার বিষয়। ষট্‌চক্রভেদ-সিদ্ধ-সাধক ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা শুনিতেও ভয়ঙ্কর। আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বকে বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপরূপে প্রদান করা ভাবিতেও কি লজ্জা হয় না? অমায় অনহঙ্কার অরাগ অমদ অমোহ অদম্ভ অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্য্য অলোভ অহিংসা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পের অঞ্জলি যে প্রদান করে, বাহ্য-পুষ্পের অঞ্জলিদান তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন—ইহা সত্য, কিন্তু সাংসারিক জীব মায়ার গর্ভে বাস করিয়া কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্যে বিজড়িত হইয়া অমায় অরাগ অদ্বেষ ইত্যাদিকে পুষ্পরূপে প্রদান করিবে, ইহা ভাবিতেও যে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। ফুল তুলিয়া দিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু তোমার বাগানে যাহার গাছটি পর্য্যন্ত নাই, তুমি সাজি ভরিয়া সেই ফুল তুলিতে চাহ ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? কামকে ছাগরূপে এবং ক্রোধকে মহিষরূপে বলি দিবার বিধি আছে, কিন্তু সাংসারিক জীবের পক্ষে তাহা কি সম্ভব? যে ছাগের উৎপীড়নে, যে মহিষের তাড়নে তুমি দিনরাত্রি অস্থির ব্যতিব্যস্ত, সভয়ে পলায়মান—তাহাদিগকে ধরিয়া বলিদান করা আর সেই বলিদানের অভিমান করা, ইহা কি ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা নহে? তুমি যে কথায় কথায় বল, বাহিরের পত্র পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য বলি ইত্যাদি কিছুই কিছু নহে, কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করি এ সকল যদি কিছুই না হইত, তবে তুমি যাহাকে কিছু না কিছু বলিয়া মনে কর, সে কিছুর কিছু সংবাদও কি পাইবার উপায় ছিল? মূলে যদি সত্য সত্যই পত্র পুষ্প ধূপ দীপ নাই ছিল, তবে তোমার অমায় অদম্ভ ইত্যাদি পুষ্প, কাম-ছাগ ও ক্রোধ-মহিষ ইত্যাদির বলি ব্যবস্থার অতিদেশ আসিল কোথা হইতে? সত্য সত্য মূলে যদি পুষ্পদান না থাকে, তবে অমায় অদম্ভ ইত্যাদিকে পুষ্পরূপে দান করিবার ব্যবস্থা তুমি পাইলে কোথা হইতে। বাহ্যপুষ্পদান ইত্যাদি ত কিছুই নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অমায় অদম্ভ ইত্যাদি পুষ্পদানই কি সত্য সত্য? অমায় অদম্ভ ইত্যাদি ইহারাও কি কখন পুষ্প হয়? বাহ্য-প্রকৃতির উপাদানময় পুষ্পতত্ত্ব কি কখন অন্তরে আসিতে পারে? সত্য সত্য কি বাগানের গাছে অদম্ভের ফুল ফুটে? কাম কি সত্য সত্যই ছাগরূপে বিচরণ করে? ক্রোধ কি সত্য সত্যই মহিষের রূপ ধারণ করিয়া

তোমার সম্মুখে আসে? ইহার কোন একটি পদার্থ কি কখন দানের বিষয় হইতে পারে? এখন বুঝিয়া বল দেখি, বাহ্যপূজাই সত্য সত্য—কি তোমার মানস পূজাই সত্য সত্য? বাহিরের সত্য পূজার ছায়া লইয়া মানস পূজায় এ সকল তাহার প্রতিবিম্ব কল্পনামাত্র। অমায় অবস্থা জীবের যখন আসিয়া দাঁড়ায় তখন কি আর তাহার পূজ্য ও পূজক এই ভেদজ্ঞান থাকে? ব্রহ্ম যাহার জগন্ময়, নিজেও যে ব্রহ্মরূপে পরিণত, সে আবার তখন নিজে ব্রহ্ম হইয়া কিসের জন্য কোন্ ব্রহ্মের পূজা করিবে? বস্তুতঃ মায়া তিরোহিত হয় নাই বলিয়াই আমার পুষ্প দিবার ব্যবস্থা। পুষ্পের কল্পনা করিতে করিতে সেই বলে কালে যদি আমার মায়াবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ইহা তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে মায়ার গর্ভে যিনি নিহিত, শাস্ত্র কখন তাহাকে অমায় পুষ্প প্রদানের অনুমতি করিতেন না। প্রত্যহ পূজাকালে এইরূপ মানসিক ধ্যান ধারণায় জীবের মায়ার আবরণ অনেক অপসারিত হইবার সম্ভাবনা। তাই বুঝিতে হইবে, তুমি আমি সাংসারিক জীব ঐরূপ জ্ঞানময় ধ্যান সমাধিতে আজ সম্পূর্ণ অধিকারী না হইলেও বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে আর পরমদেবতার প্রসাদে কালে ঐ পথে অগ্রসর হইবার কথা আছে। এইজন্যই সাধকের প্রাণে যাহা দিতে চায় অথচ কার্য্যতঃ দিবার সাধ্য নাই, সেই অসাধ্য সাধনেও শাস্ত্রে বলিয়াছেন, সাধক! বাহিরে দিবার শক্তি না থাকিলেও মনোময়ীকে মনে বসাইয়া মনের গোচরে মনের মত সাধ মিটাইয়া পূজা করিবার অধিকার ত তোমার আছে। মনোময়ী মা থাকিতে, তোমার মন তোমার থাকিতে, তুমি কেন তাহার জন্য দুঃখিত হও। একবার সেই মনোমন্দিরের কপাট খুলিয়া, মনোময় সিংহাসনে মনের মন-স্বরূপিণী মাকে তাহাতে বসাইয়া, মন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া ভুবন ভরিয়া পূজা কর। যতদূরে মনের তৃপ্তি হয়, ততদূরই তাঁহার পূজার পূর্ণাহুতি। বিষয়-কামনা ভোগবাসনা যত তোমার সম্ভব হয়, ঐ শবাসনার চরণে তাহা অঞ্জলি দিয়া স্ব-বাসনা পূর্ণ কর। মনের মত মাকে লইয়া মনের খেলা সাঙ্গ কর। মনোময়ী মা তোমার মনোবৃত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইলে বাহ্যপূজা কেন, তখন আর তোমার মানস পূজারও প্রয়োজন হইবে না।

বাহ্যপূজা যতদিন আছে ততদিন ত মানসপূজা করিবারই ব্যবস্থা। কিন্তু বাহ্যপূজার উপকরণের যখন অভাব হইবে, শাস্ত্র বলেন, তখনও মানস পূজাতেই সাধকের পূজা সিদ্ধ হইবে। কেননা যাহাকে লইয়া পূজার ব্যবস্থা, তিনি হৃদয়েরই বস্তু, বাহিরের পূজা কেবল সেই হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক মাত্র।

যামলে—

পূজাভাবে মহেশানি হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিবাং।
সর্ব্বপূজাফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে॥

মহেশ্বরি! বাহ্যপূজার অভাব হইলে হৃদয়েই শিবসীমন্তিনীর পূজা করিবে এবং সেই পূজাতেই সাধক সকল পূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন।

মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি।
যো নরো ভক্তিসংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ।
মাল্যং পদ্মসহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
স্থিত্বা দেবীপুরে শ্রীমান্ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ।
মনসাপি মহাদেব্যৈ যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং।
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকানি ন পশ্যতি।
মনসাপি মহাদেব্যা যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিং।
সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে।
মহামায়াং মহাদেবীমর্চ্চয়ামি চ ভক্তিতঃ।
নানাবিধৈস্তু নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্তু যঃ।
নৈবেদ্যং দেহি নিয়তমিতি যো ভাষতে মুহুঃ।
সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে।

ভক্তিসংযুক্ত হইয়া মানব যদি মহাদেবীকে মানসিক নৈবেদ্য দান করেন, তাহা হইলে তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হইবেন। সহস্রপদ্মনির্ম্মিত মনোময়-মালা যিনি মনোময়ীর কণ্ঠস্থলে প্রদান করেন, শতসহস্র কোটি কোটি কল্প দিন দেবীপুরে বাস করিয়া তিনি (সকাম হইলে) দেহান্তরে ক্ষিতিমণ্ডলে সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করেন। মনে মনে যিনি মহাদেবীকে প্রদক্ষিণ করেন, দক্ষিণার সেই প্রদক্ষিণের প্রভাবে, দক্ষিণদিকে আর তাঁহাকে যাত্রা করিতে হয় না—যমরাজ্যে নরকের দৃশ্যও আর দর্শন করিতে হয় না। ভক্তিভরে অবনত হইয়া যিনি মহাদেবীর চরণাম্বুজে প্রণাম করেন, তিনি এই ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড বিনির্জ্জিত করিয়া জগদম্বার নিত্যধামে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়েন। এইরূপ মানসিক অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া 'নানাবিধ নৈবেদ্যের আয়োজনে মহামায়া মহেশ্বরীকে আমি অর্চ্চনা করিব', এই চিন্তায় যাঁহার হৃদয় আকুল হয় এবং সেই আকুলতা নিবন্ধন 'মা! আমার মনের মত নৈবেদ্য তুমি দিয়া দাও, আমি তোমার নৈবেদ্য তোমাকে দিয়া মনের সাধ মিটাইয়া পূজা করি'—বারম্বার যিনি এই প্রার্থনা করেন অথবা নিজে দিতে অসমর্থ হইলে 'মাকে নৈবেদ্য দাও' বলিয়া অন্যকে যিনি বারম্বার প্রেরিত করেন, তিনিও ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া দেবীলোকে পূর্ণানন্দের অধিকারী হয়েন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং ষষ্ঠোল্লাসে—
আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং।
যস্য যস্য চ দেবস্য যথাভূষণবাহনং॥
তদেব পূজনে তস্য চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি।
অথান্তর্যজনং বক্ষ্যে যেন দেবময়ো ভবেৎ॥
সুখাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বা উদঙ্মুখঃ।
স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্॥
রত্নদ্বীপঞ্চ তন্মধ্যে সুবর্ণবালুকাময়ং।
মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈ র্নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
নানাসুগন্ধকুসুম-গন্ধামোদিতদিঙ্মুখম্॥
উৎফুল্ল-কুসুমামোদ-প্রহৃষ্টভৃঙ্গ-সঙ্কুলং।
কূজৎ-কোকিল-শব্দেন বাচালিতদিগন্তরং॥
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজং।
মৌক্তিকৈঃ কুসুমৈঃ স্রগ্‌ভির্দ্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোমরৈঃ॥
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্দেবি কল্পবৃক্ষং মনোহরং।
চতুঃশাখাচতুর্ব্বেদং গুণত্রয়সমন্বিতম্॥
পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ সুন্দরি।
হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পবিরাজিতম্॥
কোকিলৈর্ভ্রমরৈর্দ্দেবি শোভিতং বহুপক্ষিভিঃ।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্॥
তত্রোপরি মহদ্ব্যাপ্তং চিন্তয়েদ্রক্তমণ্ডলং।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশং রত্নসোপানমণ্ডিতম্॥
ধ্বজাবলী-সমাকীর্ণং চতুর্দ্বারসমন্বিতং।
নানারত্নাদিশোভাঢ্যং রত্নপ্রাকারমণ্ডিতং।
স্ব-স্ব-স্থানস্থিতাবস্থৈর্লোকপালৈরধিষ্ঠিতং।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্বিদ্যাধর-মহোরগৈঃ॥
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভিঃ পরিদিঙ্মুখং।
নৃত্যবাদিত্রনিরতৈরমরস্ত্রীগণৈর্য্যুতম্
কিঙ্কিণীজালসন্নদ্ধ-পতাকাভিরলঙ্কৃতং।

মহামাণিক্য-বিদূর্য্য-রত্ন-চামরভূষিতম্ ॥
স্থূলমুক্তাফলোদ্দাম-লম্বমানৈরলঙ্কৃতং ।
চন্দনাগুরু-কস্তুরী-মৃগমদ-বিলেপিতম্ ॥
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্দেবি মহামাণিক্যবেদিকাং ।
উদ্যদর্কেন্দু-কিরণৈ-শ্চতুষ্কোণ প্রশোভিতম্ ॥
ধ্যায়েৎ সিংহাসনং তত্র ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মকং ।
সিংহাসনে মহেশানি প্রসূনতুলিকাং ন্যসেৎ ॥
পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা স্বকল্পোক্ত-ক্রমেণ তু ।
প্রেতপদ্মাসনে তত্র চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
(আত্মনোঽভীষ্ট-দেবতা-ধ্যানমিহোচ্যতে)
শ্রীরত্নপাদুকে দত্ত্বা নীত্বা তাং স্নানমন্দিরে ।
সিংহাসনোপবিষ্টায়া-মুদ্বর্ত্তনং সমাচরেৎ ॥
কর্পূরাগুরু-কস্তূর্য্যা তথা মৃগমদেন চ ।
রোচনাকুঙ্কুমমিশ্রৈ-র্নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ ॥
দেব্যা উদ্বর্ত্তনং কৃত্বা গন্ধতৈলং বিলেপয়েৎ ।
দেব্যাঃ শতসহস্রস্তু স্বর্ণকুম্ভ-সহস্রকৈঃ ॥
স্নানীয়বারিণা স্নাতাং চিন্তয়েৎ পরদেবতাং ।
দুকূলৈ র্মার্জ্জিতং গাত্রং দুকূলে পরিধে তথা ॥
কঙ্কত্যা কেশং সংস্কুর্য্যাদ্বিধিবদ্বন্ধনং তথা ।
পট্টগুচ্ছং কেশপাশে নানারত্নোপশোভিতম্ ॥
ললাটে তিলকং দদ্যাৎ সিন্দূরং কেশমধ্যকে ।
নাগেন্দ্রদন্তরচিতং শঙ্খং দদ্যান্মনোহরং ॥
হস্তে কেয়ূরকঞ্চৈব কঙ্কণং কটকং তথা ।
পাদাঙ্গুরীয়কং দদ্যান্নানারত্নোপশোভিতং ॥
পাদয়োর্নূপুরং দদ্যান্নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং ।
নিবেদয়েদ্ যথাশক্ত্যা পুষ্পমালাঞ্চ ভূষণম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপনং কুর্য্যাদ্ গন্ধচন্দন-সিহ্লকৈঃ ।
কাঞ্চনাঞ্চিত-কঞ্চুলী শোভিতং হৃদয়োপরি ॥
সমাধৌ চিন্তয়েদ্দেবীং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং দিশেৎ ।
ন্যাসজালং বিধায়াথ সমাধৌ পূজয়েৎ সদা ॥
ষোড়শৈরুপচারৈস্তু হৃ দিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং ।
রত্নসিংহাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ ॥

পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দ্দেবি শিরস্যর্ঘং নিবেদয়েৎ।
পরামৃতমাচমনীয়ং প্রদদ্যান্মুখপঙ্কজে ॥
মধুপর্কং মুখে দদ্যাৎ ত্রিধা আচমনং মুখে।
হেমপাত্রগতং দিব্যং পরমান্নং পরিস্তৃতং ॥
কপিলাঘৃত-সংযুক্তমন্নং ব্যঞ্জন-সংযুতং।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যরাশিং ফলানি চ ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যং তথা লেহ্যং চর্ব্ব্যং চোষ্যং তথৈব চ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং মানসং পরিকল্পয়েৎ ॥
আবরণং ততো দেব্যাঃ পূজনং মনসৈব হি।
ইত্থমন্তঃ সমারাধ্য মনসৈব জপেন্ মনুম্ ॥
সহস্রাদি জপং কৃত্বা দেব্যৈ সোদকমর্পয়েৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ॥
এতদেব মহাদেব্যাঃ পর্য্যঙ্কং সমুদাহৃতং।
পয়ঃফেণনিভাং শয্যাং নানাপুষ্পোপশোভিতাম্ ॥
পুষ্পশয্যাঞ্চ সঙ্কর্য্যাৎ তত্র দেবীং সুরেশ্বরীং।
চিন্তয়েৎ সাধকো যোগী নানাসুখবিলাসিনীম্ ॥
নৃত্যগীতৈঃ সবাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীং।
ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত পূজাসার্থক্যহেতবে ॥
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং লভেৎ।
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ ॥
আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ।
এতদ্রূপস্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ ॥
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াঙ্কিতং।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥
নাড়ীমীড়াং বামভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ ॥

হৃদয়স্থিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাঁহারা দেবতার অন্বেষণ করেন, করস্থিত কৌস্তুভমণি পরিত্যাগ করিয়া কাঁচ লাভের আশায় তাঁহারা ভ্রমণ করেন। ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে বহিঃস্থিত মূর্ত্তি যন্ত্র ঘট পট ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবেন। যে যে দেবতার যেরূপ যেরূপ ভূষণ বাহন, পরিমেশ্বরি। তাঁহার তাঁহার পূজনে সেই সেই রূপ চিন্তা করিবেন, অতঃপর অন্তর্যাগ

কথিত হইতেছে যাহার প্রভাবে সাধক স্বয়ং দেবময় হইবেন। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া সুখাসনে সমাসীন সাধক স্বকীয় হৃদয়ে সুধাসমুদ্র ধ্যান করিবেন। সেই সুধাসমুদ্র মধ্যে স্বর্ণময়বালুকাপূর্ণ রত্নদ্বীপ। সেই দ্বীপ সুপুষ্পিত কল্পবৃক্ষসমূহ এবং মন্দার পারিজাত প্রভৃতি নিত্যপুষ্পফলবিশিষ্ট দিব্য দ্রুমরাজি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত, নানাবিধ সুগন্ধকুসুমগন্ধে তাহার দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত, ঐ দিক্ উৎফুল্ল কুসুমের আমোদভরে প্রহৃষ্ট ভৃঙ্গকুল-সঙ্কুল, কূজৎকোকিলকুলের মধুর কলনিনাদে তাহার দিগন্তর বাচালিত, ঐ দ্বীপের অভ্যন্তরে সরোবরসকল বিকসিত কাঞ্চনপঙ্কজে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত, মুক্তাদাম কুসুমরাশি মালামণ্ডল দুকুলপুঞ্জ ও স্বর্ণতোমরসমূহে সুশোভিত, তন্মধ্যে মনোহর কল্পবৃক্ষের ধ্যান করিবে। সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয় সমন্বিত ঋগ্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ তাহার চতুঃশাখা, পীত কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত হরিত ও বিচিত্র নানাবর্ণ পুষ্পে ঐ বৃক্ষ সুশোভিত ; কোকিলকুল, ভ্রমরমালা ও অন্যান্য বহু বিহঙ্গমণ্ডলীতে ঐ বৃক্ষ পরিপূর্ণ। এইরূপে কল্পদ্রুমের ধ্যান করিয়া, সেই কল্পতরুর মূলে রত্নবেদিকা ধ্যান করিবে ; সেই রত্নবেদীর উপরিভাগে রক্তবর্ণ তেজোময় মহাব্যাপক বিশালমণ্ডল ধ্যান করিবে, ঐ রক্তমণ্ডল উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ রত্নসোপানমণ্ডিত পতাকাবলি-সমাকীর্ণ চতুর্দ্বার সমন্বিত, নানারত্নাদি শোভাঢ্য রত্নপ্রাকারমণ্ডিত, স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত ইন্দ্র যম বায়ু বরুণ প্রভৃতি লোকপালমণ্ডলী দ্বারা অধিষ্ঠিত, সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগ ক্রীড়মান কিন্নর অপ্সরোগণ দ্বারা পরিপূর্ণ দিগ্‌দিগন্ত, নৃত্যবাদ্য নিরত অমরপুরসুন্দরী দ্বারা বেষ্টিত, কিঙ্কিনীজাল সম্বদ্ধ পতাকাকুলে অলঙ্কৃত, মহামাণিক্য বৈদূর্য্য রত্নচামর ভূষিত, স্থূলমুক্তাফল নির্ম্মিত উদ্দাম লম্বিত (ঝালর) মালাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত এবং চন্দন অগুরু কস্তুরী মৃগমদরাগে সুরঞ্জিত ও বিলিপ্ত। দেবি! এই মণ্ডল মধ্যে মহামাণিক্যময় বেদিকার ধ্যান করিবে, সেই বেদীর উপরিভাগে নবোদিত চন্দ্র সূর্য্যের কিরণরাগমণ্ডিত চতুষ্কোণ সুশোভিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিদেবাত্মক দেবীর সিংহাসন ধ্যান করিবে।

মহেশ্বরি! সেই সিংহাসনের উপরিভাগে পুষ্পময়ী শয্যার ধ্যান করিবে, অনন্তর সেই সিংহাসনশয্যায় ইষ্টদেবতার পীঠদেবতাগণের পূজা স্ব স্ব তন্ত্রোক্ত ক্রমে নির্ব্বাহ করিয়া সেই কুসুমশয্যায় সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনে পরমেশ্বরীর ধ্যান করিবে। সাধক এই সময়ে নিজ ইষ্টদেবতার যথাভূষণ বাহন আয়ুধ পরিবার মণ্ডলী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাঁহার চরণাম্বুজে মানসিক রত্নপাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া স্নান মন্দিরে আনয়ন করিবেন, সেইস্থানে তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কর্পূর অগুরু কস্তুরী মৃগমদ গোরোচনা ও কুঙ্কুম একত্র মিশ্রিত এবং নানাগন্ধ সমন্বিত করিয়া দেবীর গাত্র উদ্বর্ত্তন করিয়া তদনন্তর গন্ধতৈল দ্বারা শ্রীঅঙ্গ বিলিপ্ত করিবে, তদনন্তর

শত শত সহস্র সহস্র স্বর্ণকুম্ভসঞ্চিত স্নানীয় জল দ্বারা পরমদেবতার স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দুকূল দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবেন ; অনন্তর উত্তরীয় ও পরিধেয় উভয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া কঙ্কতিকা (চিরুণী) দ্বারা তাঁহার কেশপাশ সংস্কার করিয়া যথাবিধি নানারত্নসুশোভিত পট্টসূত্রগুচ্ছ দ্বারা মুক্তকেশীর কেশপাশ বন্ধন করিয়া ললাটফলকে চন্দনাদি রচিত তিলক প্রদান করিয়া সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু সুশোভিত করিয়া দিবেন, অনন্তর নাগেন্দ্রদন্তরচিত মনোহর শঙ্খ শঙ্করমনোমোহিনীর শ্রীহস্তে বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে কেয়ূর কঙ্কণ কটক অর্পণ করিবেন, শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়ে নানারত্নসুশোভিত নূপুর প্রদান করিয়া শ্রীচরণের অঙ্গুলিদলে চরণাঙ্গুরীয় অর্পণ করিবেন, অনন্তর জগদম্বার নাসাগ্রে গজমৌক্তিক প্রদান করিয়া যথাশক্তি পুষ্পমালা ও অন্যান্য ভূষণ সকল যথাস্থানে সুশোভিত করিয়া গন্ধ চন্দন সিহ্লক দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া কাঞ্চনাঞ্চিত কঞ্চুলিকা হৃদয়োপরি সুশোভিত করিয়া দিবেন। সমাধি সময়ে দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ষোড়শোপচার দ্বারা হৃদয়স্থিতা মহেশ্বর-মহিষীর পূজা করিবে। প্রথমতঃ রত্ন সিংহাসন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয়ে পাদ্যজল প্রদান করিয়া মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, পরমামৃত আচমনীয় মুখপঙ্কজে প্রদান করিয়া মধুপর্ক ও পুনর্ব্বার বারত্রয় আচমনীয় জল প্রদান করিবে, তৎপর স্বর্ণপাত্রে সুরক্ষিত পরিস্তৃত দিব্য পরমান্ন, কপিলাঘৃতসংপ্লুত ও ব্যঞ্জনাদি সংযুত অন্ন, সাগরোপম সুধা, পর্ব্বতাকৃতি মাংস, রাশীকৃত মৎস্য, ফলসমূহ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য চর্ব্ব্য চোষ্য ইত্যাদি সমস্ত নিজের অভিলাষানুরূপ মানসিক প্রদান করিয়া কর্পূরসম্বলিত তাম্বুল প্রদান করিবেন, তদনন্তর দেবীর আবরণ দেবতাগণের মানসিক পূজা করিয়া মানসিক মন্ত্র জপ করিবেন, সহস্রবিধি জপ সমাপন করিয়া অর্ঘ্যপাত্র জলের সহিত জপফল দেবীর বামকরে অর্পণ করিবেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ঈশ্বর ইঁহারা খট্বাঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত, তদুপরি স্বয়ং সদাশিব পর্য্যঙ্কস্থানীয়, এই ব্রহ্মবিভূতিময় পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণনিভ শয্যা নানাপুষ্পে উপশোভিত করিয়া সেই পুষ্পশয্যায় যোগী সাধক সুরেশ্বরীকে নানা সুখবিলাসিনীরূপে ধ্যান করিবেন এবং তদনন্তর নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা পরমেশ্বরীকে পরিতুষ্টা করিবেন, অনন্তর পূজার সম্পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধির নিমিত্ত হোমের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই হোম কথিত হইতেছে, যাহার প্রভাবে সাধক সাক্ষাৎ চৈতন্যময় হইবেন।

অনন্তর মূলাধার-কমল-কুণ্ডে চৈতন্যরূপ অগ্নিতে সাধক হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা—এই আত্মচতুষ্টয়কেই চিন্ময় কুণ্ডের চতুরস্ররূপে চিন্তা করিবেন। আনন্দময়ী মেখলা বেষ্টনে রমণীয় বিন্দুরূপ ত্রিবলয় রেখায় অঙ্কিত অর্দ্ধমাত্রা ব্রহ্মানন্দময় যোনিযন্ত্র। বামভাগে ঈড়া নাড়ী

দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং তাহারই মধ্যস্থলে ব্রহ্মদ্বারস্বরূপিণী সুষুম্নাকে ধ্যান করিয়া সাধক যথাবিধি হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়কে হোমের হবিঃ-স্বরূপে কল্পনা করিবেন।

॥ আবাহন ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা গৃহ্নীয়াৎ কুসুমাঞ্জলিং।
পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবীং নাবাহয়েৎ কদাচন।
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং যথোক্তাং পরমেশ্বরীং।
প্রত্যক্ষীকৃত-হৃদয়ে জিতপ্রাণোঽথ সাধকঃ।
ঐক্যং সঞ্চিন্তয়েদ্দেব্যা বাহ্যান্তর্মূর্ত্তিযুগ্ময়োঃ।
ততস্তু বায়ুবীজেন বহন্ নাসাপুটেন তু।
তচ্চৈতন্যং বিনিঃসার্য্য পুষ্পাঞ্জলৌ নিবিশয়েৎ।
নাসিকাবায়ু-নিঃসারাৎ পুষ্পস্থা দেবতা ভবেৎ।
যাবৎ সংস্থাপয়দ্দেবীং স্বহস্তং ন বিযোজয়েৎ।
কৃতে বিয়োগে হস্তস্য পুষ্পাত্তস্মান্মহেশ্বরি।
গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দেবী পূজকৈর্নাপ্যতে ফলং।
ত্রিখণ্ডমুদ্রয়া তস্মাত্তামাবাহন-বিদ্যয়া।
নির্গমব্যাপ্তি-দীপ্তাভাং শ্রীপাঠান্ত-র্নিধাপয়েৎ॥

তদন্তর প্রাণায়াম করিয়া সাধক পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন, পুষ্পাঞ্জলি ব্যতীত কখনও দেবীকে আবাহন করিবেন না। জিতপ্রাণ সাধক নিজের হৃদয়ে যথোক্তরূপা পরমেশ্বরীকে ধ্যান করিয়া এবং তাঁহারই অনুগ্রহ বলে সেই চিন্ময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে আবির্ভূত সেই মূর্ত্তি ও বাহিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি—এই উভয় মূর্ত্তির একতা চিন্তা করিবেন। তদনন্তর বায়ু বীজের অবলম্বনে নাসাপুটনিশ্বাস-পথে সেই অন্তঃস্থিত চৈতন্যতেজঃ বিনিঃসারিত ও পুষ্পাঞ্জলিতে সন্নিবেশিত করিবেন। নাসিকাবায়ু-বহনে নিঃসৃতা হইয়া দেবতা পুষ্পস্থিতা হইবেন। সাধক সেই পুষ্প, প্রতিমা বা যন্ত্রাদিতে সংযোজিত করিয়া দেবতাকে প্রতিমা বা যন্ত্রাদিতে অধিষ্ঠিত করিবেন। যে কাল পর্য্যন্ত বাহ্যমূর্ত্তি বা যন্ত্রাদিতে দেবীর সংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন না হয়, সাধক সেইকাল পর্য্যন্ত সেই ধ্যাস্য-পুষ্প হইতে স্বহস্ত বিযোজিত করিবেন না। হস্তের এইরূপ বিয়োগ করিলে সেই অবসরে সেই পুষ্প মন্ত্রের অভ্যন্তর্ব্বর্ত্তিনী দেবতাকে গন্ধর্ব্বগণ আসিয়া পূজা করেন। তদনন্তর ঐ পুষ্প-সংযোগে প্রতিমাদির

দেবত্ব সিদ্ধি করিয়া পূজা করিলেও সাধক আর সে পূজার ফলভাগী হইবেন না। এজন্য ত্রিখণ্ড মুদ্রার অবলম্বনে পুষ্পযন্ত্রে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া আবাহন মন্ত্রের শক্তিপ্রভাবে অতিপ্রদীপ্ত-তেজোময়ী জগদম্বাকে পুষ্প যন্ত্র হইতে বিনির্গত করিয়া শ্রীপীঠের অভ্যন্তরে (মূর্ত্তি ঘটপটাদির উপলক্ষণ) তাঁহাকে সংস্থাপিত করিবেন।

মৃণ্ময় মূর্ত্তির উপাসক বলিয়া আর্য্য সমাজকে যাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া ব্যাখ্যা ও ব্যঙ্গ করেন, আমরা বলি তাঁহারা প্রাণের কবাট খুলিয়া নয়নের অন্ধকার দূর করিয়া এই সময় একবার দেখিয়া লইবেন ত্রিজগতের উপাসকমণ্ডলীর কিরীটকোটি-কোহিনূর আর্য্যকুল কুমারগণ মৃণ্ময়ীয় পূজা করেন কি চিন্ময়ীর উপাসনা করেন। মৃণ্ময়ীর পূজা করিতে হইলে তাহার জন্য আর মন্ত্র যন্ত্র যোগ যাগ ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি? মাটির মূর্ত্তিই আছে তাহাতে আবার আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠার আবশ্যক কি? আর মাটিতে মাটি আবাহন করিতে যায়, এমন ভ্রান্তই বা জগতে কে? প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ বিলোড়িত করিয়া ত্রিজগতের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-পথ প্রদর্শনে যাঁহারা অদ্বিতীয় গুরু, তাঁহারা যদি মাটীকে মাটী বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে সে ভ্রান্তির অপনোদন করে জগতে এমন সাধ্যই বা কাহার? আমরা কিন্তু বলি, তাঁহারা মাটি-ই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মাটীই নহে, মা-টি। বলিতে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মাটীর মধ্যে মা-টি আনিয়া যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অনুপরমাণুতে ব্রহ্মময়ীর প্রত্যক্ষ সত্তা দেখিয়া ও দেখাইয়া নিজে কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই বংশধরগণ আজ অনার্য্যরাগরঞ্জিত কুশিক্ষার প্রভাবে অন্ধ হইয়া সে তত্ত্বদৃষ্টি হারাইয়া ভক্তানুকম্পায় আবির্ভূতা নিজমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী মাকে এখন মা না বুঝিয়া মাটী বুঝিয়া নিজেরা মাটী হইতেছে। মা-টির আমার কেমন খেলা। মাটীর খেলায় যাহারা বিভোর তাহারা তাহা বুঝিবে কি করিয়া? জগদম্বে! সন্তানের প্রতি এত কি মা তোর বিড়ম্বনা! এই বিড়ম্বনায় পড়িয়া তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব নিজে হইতে বুঝিবার উপায় না থাকিলেও শাস্ত্রমূর্ত্তিতে তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন তাহা বুঝিবার অধিকার অবশ্যই থাকিবার কথা। কিন্তু দুরদৃষ্টফলে আমরা তাহাতেও প্রায় বঞ্চিত। সদ্‌গুরুর উপদেশ নাই, সাধনার প্রভাব নাই, তাই তাঁহার আজ্ঞা বুঝিয়াও বুঝিবার অধিকার নাই। পৌত্তলিকবাদিন্! বড়ই হাসির কথা যে, দেবতার মূর্ত্তিকে তুমি বল পুত্তলিকা! তোমার মত অনন্তকোটি সজীব মূর্ত্তি যাঁহার এক কটাক্ষেরও পুত্তলিকা নহে, মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা সেই নিত্যচৈতন্যময়ীকে তুমি যে পুত্তলিকা বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় জানিও ইহাও তাঁহার শুভ কটাক্ষের ফল নহে। ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞান বিশ্বাস বলিয়া কিছু বুঝিতে কাতর হইলেও বস্তু-শক্তিকে তুমিও অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাক। তবে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তোমার আমার ইন্দ্রিয় ও মনের

অগোচর কোন অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব তুমি অবিশ্বাস কর কোন প্রাণে ? রোগে দেহ ক্ষয় হয়, কিন্তু ঔষধে সে রোগের উপশম হয়, রোগে দেহের নাশ এই প্রাকৃতিক নিয়ম খণ্ডন করিয়া ঔষধ তখন নিজ অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক শক্তির প্রভাব প্রদর্শন করে। প্রাকৃতিক নিয়মে জল চিরকালই সুশীতল, কিন্তু অগ্নির সংযোগে সেই জল যখন অতি উষ্ণ হইয়া তাপশক্তির সংক্রামণে অগ্নিবৎ হইয়া উঠে, তখন সেই জলই আবার শীতলতার পরিবর্ত্তে নিদারুণ দাহজ্বালা উদ্গীরণ করিতে থাকে। এস্থলেও অগ্নির বস্তু-শক্তির প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম জলের শীতলতা খণ্ডিত হইয়া যায়—ইহা ত তুমিও স্বীকার কর, তবে আর মন্ত্রশক্তি প্রভাবে জীবের হৃদয়স্থ ব্রহ্মশক্তি নিশ্বাসবায়ুর অবলম্বনে দেবতার বাহ্য-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবেন ইহা অবিশ্বাস কর কি বলিয়া ? মন্ত্রের বস্তু-শক্তি প্রভাবে মৃত্তিকার জড়ত্ব ঘুচিয়া গিয়া জলের উষ্ণতার ন্যায় তাহাতে দেবত্ব সঞ্চার হইবে ইহা অবিশ্বাস কর কি করিয়া ? বস্তুতঃ কথায় কথায় প্রাকৃতিক নিয়ম খণ্ডিত হয় বলা উনবিংশ শতাব্দীর এক বিষম রোগ। স্বভাবতঃ জল শীতল হইবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম, অগ্নিযোগে তাহার উষ্ণত্ব হইবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম, মাটী স্বভাবতঃ মাটী থাকিবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম, আবার মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাহা দেবত্বে পরিণত হইবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে আর প্রাকৃতিক নিয়মের খণ্ডন হইল বলিয়া এ আপত্তি কেন ? বস্তুতঃ বিশ্বপ্রকৃতি কখনও এ আপত্তির মূল নহেন, এ আপত্তির মূল কেবল বোদ্ধার নিজ প্রকৃতি। তিনি হয়ত তাঁহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির আয়ত্ত অতি সংকীর্ণ সংস্কার ও ধারণা লইয়া প্রকৃতির স্বরূপতত্ত্ব অতি সংকীর্ণ করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছেন। তাই অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির একমাত্র প্রসবভূমি মহাপ্রকৃতির ক্ষুদ্র জড়বিভাগের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম লইয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া উঠেন—প্রাকৃতিক নিয়ম খণ্ডিত হইল। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম অখণ্ডিত, তাই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ এ আবির্ভাবও প্রকাশমাত্র, নতুবা এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান কোথায় আছে যাহা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মসত্তার বহির্ভূত ? মূর্ত্তি যন্ত্র ঘট পট পুষ্প পত্র যাহাই কেন না বল, ইহার কিছুতেই তাঁহাকে আসিতে হয় না—কেননা, তিনি ইহার সমস্তেই অধিষ্ঠিত অথবা সমস্তই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তথাপি ভক্তগণ, সাধকগণ তাঁহার সে সূক্ষ্ম সত্তার অধিষ্ঠানে সন্তুষ্ট নহেন ; তাই কখন ভগবান্, কখন ভগবতী, কখন বাবা, কখন মা, কখন প্রভু, কখন ঈশ্বরী, সাধকের যখন যাহা ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মা তখন তাহাই পূর্ণ করিতে কখন শ্যাম, কখন শ্যামা, কখন উমা, কখন রমা, কখন পুরুষ, কখন বামা, কখন গণেশ, কখন মহেশ, কখন ধনেশ, কখন দিনেশ, নানা লীলায় নানা মূর্ত্তিতে নানা সাধনায় নানা সিদ্ধিতে একেশ্বর একেশ্বরী হইয়াও তিনি সাধকের হৃদয়েশ্বরী

বলিয়াই বহুরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এইজন্যই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তির অধীশ্বরী হইলেও সাধকের প্রাণ লইয়াই তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, জগতের মা হইলেও সাধক তাঁহাকে নিজের মা বলিয়াই সাধন করিয়া থাকেন—মায়ের অভাবের জন্য মায়ের সাধনা নহে, আমার অভাব পূরণ করিবার জন্যই মায়ের সাধনা। ত্রিজগতের লোকে মায়ের সাধনা করিলেও সে সাধনায় আমার সাধ ত মিটে না, তাই আমার প্রাণের সাধ পূর্ণ করিতে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

তন্ত্রান্তরে—

ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে চ কপোলে শিবশক্তিষু।
হৃদয়ে বিষ্ণুবিষয়ে পাদয়োরন্যদৈবতা-
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা শিবলিঙ্গে শিরে তথা॥

শিব মূর্ত্তি ও শক্তি মূর্ত্তিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে অথবা কপোলে করবিন্যাসপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (কোন কোন তান্ত্রিক আচার্য্য সম্প্রদায়ের মত যে, শিব শক্তি মূর্ত্তিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ললাট ও কপোল একদা এই তিন স্থানেই স্পর্শ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে)। বিষ্ণুমূর্ত্তির হৃদয়, অন্য দেবতার চরণদ্বয় এবং শিবলিঙ্গের মস্তক ভাগ স্পর্শ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

॥ উপচার ॥

সনৎকুমারতন্ত্রে—

প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
তদশক্তৌ তু পূজা স্যাদ্দশোপচারিকা তথা॥
তদশক্তৌ পঞ্চভিস্তু পূজা স্যাদুপচারকৈঃ॥

ষোড়শ উপচারের দ্বারা প্রত্যহ ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে দশোপচার এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে পঞ্চোপচারে নিত্যপূজা নির্ব্বাহ করিবে।

রাঘবভট্টধৃত-জ্ঞানমালায়াং—

অষ্টত্রিংশৎ-ষোড়শার্ক-দশ-পঞ্চোপচারকাঃ।
তান্ বিভজ্য প্রবক্ষ্যামি কে কে তে তৈঃ কৃতৈশ্চ কিং।
আসনং প্রথমং তেষামাবাহনমুপস্থিতিঃ।
সান্নিধ্যমাভিমুখ্যঞ্চ স্থিরীকৃতি প্রসাদনং।

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনে মধুপর্কমুপস্পৃশং।
স্নানং নীরাজনং বস্ত্রমাচামঞ্চোপবীতকং।
পুনরাচামভূষে চ দর্পণালোকনস্ততঃ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চ ততঃ ক্রমাৎ।
পানীয়ং তোয়মাচামং হস্তবাসস্ততঃ পরং।
তাম্বূলমনুলেপঞ্চ পুষ্পদানং পুনঃ পুনঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং স্তুতিশ্চৈব প্রদক্ষিণং।
পুষ্পাঞ্জলি-নমস্কারাবষ্টত্রিংশৎ সমীরিতাঃ।

অষ্টত্রিংশৎ, ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ ও পঞ্চ উপচারের প্রকার ভেদ সংখ্যা—এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কোন কোন প্রকারে কি কি উপাচার এবং তাহার অনুষ্ঠানের ফল কি কি, বিভাগপূর্ব্বক তাহা কথিত হইতেছে। আসন আবাহন উপস্থিতি সান্নিধ্য আভিমুখ্য স্থিরীকৃতি প্রসাদন অর্ঘ্য পাদ্য আচমন মধুপর্ক পুনরাচমন স্নান নীরাজন বস্ত্র আচমন উপবীত পুনরাচমন ভূষণ দর্পণাবলোকন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য পানীয় আচমনীয় হস্তবাস তাম্বূল অনুলেপন পুষ্পাঞ্জলি গীত বাদ্য নৃত্য স্তুতি প্রদক্ষিণ পুষ্পাঞ্জলি ও নমস্কার, ইহাই অষ্টত্রিংশৎ উপচার।

ষট্‌ত্রিংশদুপচারাঃ—নিবন্ধে, পঞ্চপঞ্চাশত্তম-পটলে—
আসনাদৌ দন্তকাষ্ঠমুদ্বর্ত্তনবিরূক্ষণে।
সম্মার্জ্জনং সর্পিরাদি স্নাপনাবাহনে ততঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি স্নানীয়মধুপর্ককৌ।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ নমস্কারোঽথ নর্ত্তনং।
গীতবাদ্যে চ দানানি স্তুতিহোমঃ প্রদক্ষিণং।
আদর্শদর্শনঞ্চৈব চামরব্যজনং তথা।
শয্যানুলেপনং বস্ত্রমলঙ্কারোপবতীকে।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বলিদানঞ্চ তর্পণং।
স্বাভীষ্টাত্মার্পণঞ্চৈব ততো দেববিসর্জ্জনং।
উপচারা ইমে জ্ঞেয়াঃ ষট্‌ত্রিংশচ্ছিবার্চ্চনে॥

আসন দণ্ডকাষ্ঠ উদ্বর্ত্তন বিরূক্ষণ সম্মার্জ্জন ঘৃততৈলাদির অভ্যঞ্জন ঘৃতাদি দ্বারা স্নান আবাহন পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নানীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় নমস্কার নৃত্য গীত বাদ্য অন্যান্য-উপচারদান স্তুতি হোম প্রদক্ষিণ দর্পণদর্শন চামরব্যজন শয্যা অনুলেপন বস্ত্র অলঙ্কার উপবীত গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বলিদান তর্পণ আত্মসমর্পণ ও বিসর্জ্জন এই ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার।

॥ অষ্টাদশোপচারাঃ ॥

শ্যামারহস্যধৃত ফেৎকারিণীয়ে তৃতীয়-পটলে—

আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যমাচনীয়কং ।
স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ ।
গন্ধেপুষ্পে ধূপদীপাবন্নঞ্চ তর্পণং ততঃ ।
মাল্যানুলেপনে চৈব নমস্কার-বিসর্জ্জনে ।
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ ।

আসন আবাহন অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র উপবীত ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন (নৈবেদ্য) তর্পণ মাল্য অনুলেপন নমস্কার বিসর্জ্জন এই অষ্টাদশ উপচার দ্বারা সাধক পূজার অনুষ্ঠান করিবেন ।

॥ ষোড়শোপচারাঃ ॥

শিবার্চ্চন-চন্দ্রিকায়াং—

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং ।
মধুপর্কাচম-স্নান-বসনাভরণানি চ ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা ।
প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ।

আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক আচমন স্নান বসন আভরণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য বন্দন এই ষোড়শ উপচার পূজায় প্রয়োগ করিবে ।

॥ প্রকারান্তর ষোড়শোপচার যথা— ॥

কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকাধৃত-মন্ত্ররত্নাবল্যাং—

পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ ।
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াং ।
প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপাচারাংস্তু ষোড়শ ॥

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমন তাম্বূল অর্চ্চনা স্তোত্র তর্পণ ও নমস্কার ।

॥ দ্বাদশোপচারাঃ ॥

স্বতন্ত্রতন্ত্রে—

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধপ্রসূনকে ততঃ॥
ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং প্রদক্ষিণং নমস্কৃতিঃ।
দ্বাদশৈরুপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ॥

অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রদক্ষিণ ও নমস্কার এইরূপ দ্বাদশ উপচারে মন্ত্রী পূজা করিবেন।

॥ দশোপচারাশ্চ ॥

শ্যামারহস্যধৃত-কালীতন্ত্রে—

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধপুষ্পে ততঃ পরং।
ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং দশোপচারকাঃ স্মৃতাঃ।

অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় মধুপর্ক আচমন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য ইহাই দশোপচার।

॥ সপ্তোপচারাঃ ॥

রাঘবভট্টধৃত-প্রয়োগসারে—

অর্ঘ্যং গন্ধং তথা পুষ্পমক্ষতং ধূপমেব চ।
দীপো নৈবেদ্যং সপ্তাঙ্গী সপর্য্যেত্যপরে জগুঃ॥

অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প অক্ষত ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য ইহাই সপ্তাঙ্গী পূজা।

॥ পঞ্চোপচারাঃ ॥

নিবন্ধতন্ত্রে, পঞ্চপঞ্চাশত্তম-পটলে—

গন্ধপুষ্পধূপদীপ-নৈবেদ্যমিতি পঞ্চকং।
নিবেদয়েৎ সদার্চ্চায়াং পূজা পঞ্চোপচারিকা॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইহাই পঞ্চোপচার। সাধক ইষ্ট দেবতার পূজায় এই পঞ্চোপচার সর্ব্বদা নিবেদন করিবেন।

উপচারত্রিকা জ্ঞেয়া ধূপদীপৌ বিনা যদি।

ঐ পঞ্চোপচার ধূপ দীপ বিরহিত অর্থাৎ গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্য হইলেই তাহা উপচারত্রিক নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতে র্বিদ্যতে ফলম্॥

ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার হইতে উপচারত্রয় পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকার ভেদ কথিত হইল, ইহার প্রথম প্রথম কল্পে সমর্থ হইয়াও ব্যয়কুণ্ঠাবশতঃ শেষ শেষ কল্পের অবলম্বনে যিনি পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন সেই দুর্ম্মতিগ্রস্ত সাধক কখনও যথাশাস্ত্র পূজার ফললাভ করেন না।

॥ জপবিধি ॥

পিচ্ছিলাতন্ত্রে—

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ।
ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য কুল্লুকাং প্রজপেত্ততঃ।
মহাসেতুঞ্চ সেতুঞ্চ জপ্ত্বা মূলং জপেত্ততঃ।
পুনঃ সেতুং মহাসেতুং জপ্ত্বা সমর্পয়েজ্জপং।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা প্রণমেৎ পরমেশ্বরীং।
অষ্টাঙ্গাদিবিধানেন ভূশীর্ষযোগতোঽথবা।

প্রাণায়ামত্রয় করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে, তৎপর ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া কুল্লুকা জপ করিবে, তৎপর মহাসেতু ও সেতুমন্ত্র জপ করিয়া যথাসংখ্যক মূলমন্ত্র জপ করিবে, জপান্তে পুনর্ব্বার সেতু ও মহাসেতু জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে, তদনন্তর পুনর্ব্বার বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া অষ্টাঙ্গাদি প্রণামের বিধান অনুসারে অথবা ভূতলে কেবল মস্তকের যোগ করিয়া পরমেশ্বরীকে প্রণাম করিবে।

সরস্বতীতন্ত্রে, পঞ্চমপটলে—

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি মুখশোধনমুত্তমম্।
অশুদ্ধজিহ্বয়া দেবি যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মুখশোধনমাচরেৎ।

অন্যরূপ (মন্ত্রময়) উত্তম মুখশোধন কথিত হইতেছে। বরারোহে! যাহার অনুষ্ঠান না করিলে জপ ও পূজা বৃথা হইবে। দেবি! অশুদ্ধ জিহ্বার দ্বারা যিনি জপ করেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে মুখ শোধন করিবে।

কুলার্ণবে—

জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকং।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিধ্যতি।
আদ্যন্তরহিতং কৃত্বা মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্ধিয়া।
সূতকদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন ধ্রুবেন পুটিতং মনুম্‌।
অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ।
জপান্তে চ ততো দদ্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে।

জপের প্রথমে সাধকের জননাশৌচ হয় এবং জপান্তে মরণাশৌচ হয়, এই অশৌচ সংযুক্ত মন্ত্র কখনও সিদ্ধ হয় না। এজন্য মন্ত্রকে আদ্যন্ত অশৌচ দ্বয়ে রহিত করিয়া মানসিক জপ করিবে। ঐ অশৌচদ্বয়ে নির্ম্মুক্ত হইলেই সে মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি দান করে। অতএব মূলমন্ত্রকে প্রণবপুটিত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার অথবা নবার চতুর্ব্বর্গ ফলসিদ্ধির নিমিত্ত জপের আদি ও অন্তে জপ করিবে।

যোগিনীতন্ত্রে—

নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ ন তু কাম্যমবোধনাৎ।
কাম্যমপি করে কুর্য্যাৎ মালাভাবে মহেশ্বরি।

নিত্য-পূজার অঙ্গে যে জপ তাহা করে অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু কাম্য জপ করিবে না। কারণ কাম্য জপে কামনা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মালায় জপই বিধিবোধিত মালায় কাম্য জপ শাস্ত্রে উক্ত নহে। কিন্তু মহেশ্বরি! মালার যদি অভাব হয় তাহা হইলে কাম্য জপও করেই করিবে।

স্বচ্ছন্দমাহেশ্বরে—

রুদ্রাক্ষস্য মণিঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবালস্য তথৈব চ।
তথৈবাম্ভোরুহাক্ষস্য কুশগ্রন্থেশ্চ সুব্রতে।
এতন্মণিকৃতা মালা ত্রৈবর্ণিকসুখপ্রদা।
স্ত্রীশূদ্রাণাং বরারোহে প্রত্যবায়শ্চ কেবলং।
এতদন্যমণিকৃতা মালা তেষাং ফলপ্রদা।

রুদ্রাক্ষ প্রবাল পদ্মবীজ ও কুশগ্রন্থি এই সকল মণির দ্বারা নির্ম্মিত হইলে সে রাজা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সুখপ্রদা হয়েন। স্ত্রীজাতি ও শূদ্র জাতি এইসকল মণিনির্ম্মিত মালা গ্রহণ করিলে তাঁহারা কেবল প্রত্যবায় লাভ করিবেন। উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি মণি ভিন্ন অন্য মণির দ্বারা নির্ম্মিত মালাই স্ত্রী ও শূদ্রজাতির পক্ষে ফলপ্রদা।

রুদ্রাক্ষ-শঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ।
স্ফাটিকৈ র্মণিরত্নৈশ্চ সুবর্ণৈ র্বিদ্রুমৈস্তথা।
রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা॥

রুদ্রাক্ষ শঙ্খ পদ্মবীজ পুত্রজীব মৌক্তিক স্ফটিক মণি রত্ন স্বর্ণ প্রবাল রজত ও কুশমূল এই সকল মণির দ্বারা নির্ম্মিত মালাই গৃহস্থের পক্ষে বিহিতা।

বীরতন্ত্রে—

রুদ্রাক্ষমালয়া জাপং রাত্রৌ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
কিঞ্চ ভদ্রে দিবা নৈব রুদ্রাক্ষমালয়া জপেৎ॥

রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা রাত্রিতে যত্নপূর্ব্বক জপ করিবে। কিন্তু ভদ্রে! দিবাভাগে কখনও রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা জপ করিবে না।

রুদ্রযামলে—

দিবা নৈব চ জপ্তব্যং রুদ্রাক্ষমালয়া কচিৎ।
পুরশ্চর্য্যাস্বতে চাত্র দোষো নাস্তি বরাননে॥

রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা দিবাভাগে কখনও জপ করিবে না। কিন্তু বরাননে! পুরশ্চরণের সময়ে দিবাভাগে রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা জপ করিলেও তাহা দোষাবহ হইবে না।

যামলে—

প্রত্যহং পূজয়েন্ মালাং প্রত্যহং জপমাচরেৎ।
উপোষিতায়াং মালায়াং বিপদঃ সম্ভবন্তি চ॥

ইষ্টদেবতাস্বরূপিণী মালাকে প্রত্যহ পূজা করিবে এবং প্রত্যহ জপ করিবে। কারণ, মালা উপোষিতা অর্থাৎ জপপূজাবিরহিতা হইলে সাধকের বিপদ্ সকল উপস্থিত হয়।

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে—

প্রজপেন্নিত্যপূজায়া-মষ্টোত্তরসহস্রকং।
অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টপঞ্চাশতঞ্চরেৎ॥
অষ্টত্রিংশৎ সংখ্যকং বা অষ্টাবিংশতিমেব বা।
অষ্টাদশং দ্বাদশঞ্চ দশাষ্টৌ চ বিধানতঃ॥
হোমঞ্চৈব মহেশানি এতৎসংখ্যাবিধানতঃ।
এবং সর্ব্বত্র দেবেশি নিত্যকর্ম্ম-মহোৎসবে॥

নিত্যপূজাতে অষ্টোত্তরা সহস্র, অষ্টোত্তর শত, অষ্ট পঞ্চাশৎ, অষ্ট ত্রিংশৎ, অষ্টাবিংশতি, অষ্টাদশ, দ্বাদশ, দশ অথবা অষ্ট এই সংখ্যা অনুসারে সমর্থ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্প এবং অসমর্থ হইলে সাধক পর পর কল্পে জপ করিবেন। মহেশ্বরি!

নিত্য কর্ম্মাঙ্গ পূজাদি মহোৎসবে সামর্থ্য অসামর্থ্য ভেদে হোম সংখ্যার নিয়মও সর্ব্বত্র এইরূপ জানিবে।

যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে—

বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈ র্গণেশ্বরে।

ত্রিপুরাপূজনে শস্তা রুদ্রাক্ষৈঃ রক্তচন্দনৈঃ॥

বিষ্ণুর উপাসনায় তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিতা মালা, গণেশের আরাধনায় গজদন্ত নির্ম্মিতা মালা এবং ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনায় রুদ্রাক্ষমালা ও রক্তচন্দনমালা প্রশস্তা।

॥ শাক্তানাং কাষ্ঠমালা ॥

যোগিনীতন্ত্রে—

শোনচন্দন-কাষ্ঠঞ্চ ধাত্রীফল-প্রামণতঃ।

বিল্বকাষ্ঠ-সমুদ্ভূতং মধ্যং বদরকং তথা॥

ধাত্রীফলের পরিমাণে রক্তচন্দনকাষ্ঠের মালা, বিল্বকাষ্ঠ নির্ম্মিতা মালা এবং বদরীকাষ্ঠের মধ্যভাগ (যে অংশ রক্তচন্দনবৎ রক্তবর্ণ) তাহার মালা।

॥ মালাগ্রন্থিঃ ॥

স্বচ্ছন্দমাহেশ্বরতন্ত্রে—

সর্ব্বেষামন্তরে গ্রন্থিঃ কর্ত্তব্যো লক্ষণান্বিতঃ।

অন্যোন্যঘর্ষাসিদ্ধার্থং ঘর্ষো জপবিনাশকৃৎ॥

যে মালায় যত সংখ্যায় মণি থাকিবে, তাহার প্রত্যেক মণির মধ্যে যথাশাস্ত্র গ্রন্থি প্রদান করিতে হইবে। গ্রন্থিদানের উদ্দেশ্যে—জপকালে মণিগণের পরস্পর ঘর্ষণ না হয়। কারণ, মণিসংঘর্ষ জপফলের বিনাশ করে।

রুদ্রযামলে—

গ্রন্থিহীনা ন কর্ত্তব্যা স্পৃষ্টাস্পৃষ্টা ন দুষ্যতি।

মালাকে গ্রন্থিহীনা করিবে না, গ্রন্থিযুক্তা মালা অস্পৃষ্ট স্পর্শেও দূষিত হয় না।

॥ রুদ্রাক্ষে গ্রন্থিনিষেধঃ ॥

যোগিনীতন্ত্রে—

রুদ্রাক্ষৈঃ শক্তিমন্ত্রঞ্চ গ্রন্থিযুক্তৈ র্জপেত্তু যঃ।

স দুর্গতিমবাপ্নোতি নিষ্ফলন্তস্য তজ্জপঃ॥

গ্রন্থিযুক্ত রুদ্রাক্ষমালায় যে সাধক শক্তিমন্ত্র জপ করেন, তিনি দুর্গতিকে লাভ করেন এবং তাঁহার সে জপ নিষ্ফল হয়।

বৃহত্তন্ত্রসারে—

কালিকা ত্বরিতা দেবী চন্দ্রাক্ষী বনবাসিনী।
বারাহী তোতলা চৈব গ্রন্থিহীনাশ্চ দেবতাঃ॥
এতাসাং মালিকায়ান্তু গ্রন্থিমাত্রং ন কারয়েৎ।

কালিকা, ত্বরিতা, চন্দ্রাক্ষী, বনবাসিনী, বারাহী এবং তোতলা, ইহাঁরা গ্রন্থিহীনা দেবতা; ইহাঁদিগের মালায় কখনও গ্রন্থিপ্রদান করিবে না।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে—

সর্ব্বাসামক্ষমালানাং জপে যৎ ফলমুচ্যতে।
তৎ ফলং শতসাহস্রং জপেচ্চাঙ্গুলিপর্ব্বণি।
তস্মাদঙ্গুলিপর্ব্বাণি জপার্থং প্রবলানি চ॥

সর্ব্বপ্রকার মালার জপে শাস্ত্রে যে ফল উক্ত হইয়াছে, অঙ্গুলিপর্ব্বে জপ করিলে সেই ফল শতসহস্র গুণ বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্যই জপার্থ অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহই প্রশস্ত (কোন কোন মতে ইহা কেবল নিত্য জপে)।

কুলার্ণবে পঞ্চমোল্লাসে—

অক্ষমালা দ্বিধা প্রোক্তা কল্পিতাকল্পিতাপি চ।
কল্পিতা মণিভিঃ প্রোক্তা মাতৃকা স্যাদকল্পিতা॥

অক্ষমালা দ্বিবিধা—কল্পিতা ও অকল্পিতা। তন্মধ্যে রুদ্রাক্ষ পদ্মবীজাদি মণির দ্বারা যাহা গ্রথিতা তাহাই কল্পিতা, আর যাহা মাতৃকামন্ত্রময়ী তাহাই অকল্পিতা।

গায়ত্রীতন্ত্রে, পঞ্চমোল্লাসে—

মালয়া ন জপেন্মন্ত্রং পথি গচ্ছন্ কদাচন।
জপ্ত্বা মন্ত্রং যথা মূঢ়ঃ সর্ব্বযোনিষু জায়তে॥
করমালাসু জপ্তব্যং গচ্ছতঃ পথি সত্তম।
মালয়া পথি জপ্ত্বা বৈ তথা হানিঃ প্রজায়তে॥
বেদমন্ত্রবিহীনশ্চ যথা যাতি পরাভবং।
উপবিশ্য জপেন্মন্ত্রং মালয়া নৃপনন্দন॥

পথে গমন করিতে করিতে কখনও মালায় মন্ত্র জপ করিবে না; জপ করিলে সেই মূঢ় সমস্ত যোনিতে অধোগতি লাভ করিবে। পথে গমনকালে কর-মালায় জপ করিবে। বেদমন্ত্রবিহীন ব্রাহ্মণ যেমন মন্ত্রশক্তি হইতে পরাভব লাভ করেন, মন্ত্রমালায় পথে জপ করিলে সেইরূপ হানি হইবে। নৃপনন্দন! অতএব আসনে উপবিষ্ট হইয়াই মন্ত্রমালায় জপ করিবে।

শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—

সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং শতং প্রতিদিনন্তু বা।
বিংশত্যা বা জপেন্মন্ত্রী ততো ন্যূনং জপেন্ন চ॥

সাধক প্রতিদিন নিত্য-পূজাঙ্গ জপ সহস্রসংখ্যায় সম্পন্ন করিবেন অথবা শতসংখ্যায়, তাহাতেও অসমর্থ হইলে বিংশতি সংখ্যা, নিত্য-পূজাঙ্গ জপ তদপেক্ষা ন্যূন কখনও করিবে না।

॥ স্তবাদিপাঠক্রমঃ ॥

মুণ্ডমালাতন্ত্রে, সপ্তমপটলে—

পূজায়িত্বা তু প্রণমেৎ পার্ব্বতীং তন্ত্রজৈঃ স্তবৈঃ।
স্তোত্রস্য কবচস্যাপি পঠনাজ্জগদম্বিকা।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চণ্ডী ভক্তিদা সর্ব্বমঙ্গলা॥

পূজা সম্পন্ন করিয়া তন্ত্রোক্ত স্তবসমূহ দ্বারা পর্ব্বতরাজপুত্রীকে প্রণাম করিবে। স্তোত্রপাঠ ও কবচপাঠের ফলেই জগদম্বিকা চণ্ডিকা সাধকের ইহকালে ভোগ, পরকালে মোক্ষ উভয়ই প্রদান করেন এবং ইহ পরলোক উভয়েরই মঙ্গলবিধান জন্য সর্ব্বমঙ্গলা ভক্তহৃদয়ে ভক্তি প্রদান করেন।

শাক্তক্রমে—

স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা পঠেদ্দেবি কবচং সর্ব্বকামদং।
পঠেৎ সহস্রনামাখ্যং স্তোত্রং মোক্ষস্য সাধনং॥

স্তোত্র দ্বারা স্তব সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ কবচ পাঠ করিবে এবং তদনন্তর মোক্ষসাধন সহস্রনামরূপ স্তোত্র পাঠ করিবে।

বারাহীতন্ত্রে—

পূজাদৌ বা চরেৎ স্তোত্রং পূজান্তে কবচং পঠেৎ।

পূজার আদিতে স্তোত্র পাঠ করিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও কবচ পাঠ পূজার অন্তেই করিবে।

নিরুত্তরতন্ত্রে, দ্বিতীয়পটলে—

ততস্তু কবচং দেবি স্তবঞ্চ প্রপঠেত্ততঃ।

দেবি। পূজান্তে কবচ পাঠ করিবে এবং তদনন্তর স্তোত্র পাঠ করিবে (সাধকের ইচ্ছাবিকল্প)।

শাম্ভবীতন্ত্রে, চতুর্দ্দশপটলে—

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ।

অঞ্জলিপুট সম্বদ্ধ করিয়া স্তোত্রপাঠ এবং কবচ পাঠ করিবে।

বারাহীতন্ত্রে, দ্বিতীয়পটলে—

প্রণবঞ্চাদিমে দত্ত্বা স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।
অন্তে চ প্রণবং দদ্যাদিত্যুবাচাদিপুরুষঃ॥
স্তোত্রে চ সংহিতায়াঞ্চ শ্লোকমন্ত্যং দ্বিরুচ্চরেৎ।
মনসা ন স্মরেৎ স্তোত্রং পাঠদেকাগ্রমানসঃ॥
প্রত্যক্ষরমবিস্পষ্টং কলস্বরসমাযুতং।
ন চ মধ্যে বিরম্যেত যথাবৎ ক্রমযোগতঃ॥
শুদ্ধেনাচলচিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।
ন কার্য্যাসক্তমনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনং॥
ন চ স্বয়ং কৃতং স্তোত্র-মন্যেনাপি কৃতং ন চ।
যস্মাৎ কলৌ ন প্রশস্ত-মৃষিভি র্ভাষিতং পঠেৎ॥
ঋষিচ্ছন্দাদিকং ন্যস্য পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ।
স্তোত্রে ন দৃশ্যতে যত্র প্রণবন্যাসমাচরেৎ॥

আদিতে প্রণব প্রয়োগ করিয়া স্তোত্র ও সংহিতার পাঠ করিবে, অন্তেও প্রণব দ্বারা সমাপন করিবে—ইহাই আদিপুরুষের আজ্ঞা। স্তোত্র এবং সংহিতার অন্ত্যশ্লোক দুইবার পাঠ করিবে। মনে মনে স্তোত্র স্মরণ করিবে না, কিন্তু মনকে একাগ্র করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে। পাঠকালে স্তবাদির প্রত্যেক অক্ষর বিশেষ বিস্পষ্টভাবে কলস্বর সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিবে। স্তব, কবচ ও সংহিতাদির আরম্ভের পর সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মধ্যভাগে কখনও পাঠ হইতে বিরত হইবে না, যাহার পর যাহা যেমন আছে, সেই যথাবৎ ক্রমযোগে বিশুদ্ধ এবং অচঞ্চলচিত্তে প্রযত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবে। অন্য কার্য্যে মনকে আসক্ত করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে না। নিজকৃত স্তোত্র এবং অন্য ব্যক্তির কৃত স্তোত্রও পাঠ করিবে না, যেহেতু কলিযুগে উহা প্রশস্ত নহে। অতএব ঋষিগণ কর্তৃক উক্ত স্তোত্রই পাঠ করিবে।[১] বিচক্ষণ সাধক ঋষি ছন্দঃ দেবতা এবং বিনিয়োগাদি ন্যাসপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করিবে। যে স্তোত্রে ঋষি ছন্দঃ ইত্যাদির উল্লেখ নাই, তাহার পাঠের পূর্ব্বে প্রণব দ্বারা তত্তৎস্থলে ন্যাসপূর্ব্বক পাঠ করিবে।

১। তন্ত্রোক্ত ঋষিশব্দের অর্থ—

মহেশ্বরমুখাজ্ জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ॥

যেমন দুর্গাকল্পে নারদ ভৈরব ঋষি, কালীকল্পে মহাকাল ভৈরব ঋষি ইত্যাদি।

॥ অথ প্রদক্ষিণং ॥

কালীকুলামৃততন্ত্রে, চতুর্থপটলে—

ততঃ প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ দক্ষহস্তেঽম্বুজমুত্তমং।
বামে ঘণ্টাং বাদয়ংস্তু অষ্টাঙ্গপ্রণতঃ স্তুবেৎ ॥

পূজা সমাপনের পর দক্ষহস্তে শঙ্খ (বিশেষার্ঘ) গ্রহণ করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া স্তব করিবে।

তন্ত্রসারধৃত-যামলে—

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ।
দর্শয়েৎ দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্ ॥
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে ॥
চত্বারি কেশবে দদ্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্ ॥

যামলে—

একহস্তপ্রণামশ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণম্।
অকালে দর্শনং বিষ্ণো র্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত-ভাবচূড়ামণৌ—

ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণ-মৰ্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণং।
দণ্ডমষ্টাঙ্গমুগ্রঞ্চ ত্রিধা চ নতিলক্ষণম্ ॥
ত্রিকোণাদি ব্যবস্থা তু যদি পূর্ব্বমুখো যজেৎ।
পশ্চিমাচ্ছাম্ভবীং গত্বা ব্যবস্থা নির্দ্দিশেত্ততঃ ॥
যদোত্তরমুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেবপূজনং।
তদা গচ্ছেত্তু বায়ব্যাং গত্বা কুর্য্যাত্তু সংস্থিতিম্ ॥
দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা তস্যা ব্যাবৃত্য দক্ষিণং।
গত্বা যোঽসৌ নমস্কারঃ সোঽৰ্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্ত্তুলাকৃতিসাধকঃ।
নমস্কারঃ কথ্যতেঽসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ ॥
প্রদক্ষিণং বিনা যস্তু নিপত্য ভুবি দণ্ডবৎ।
দণ্ড ইত্যুচ্যতে দেবৈঃ সর্ব্বদেবোঘমোদদঃ ॥

তন্ত্রসারে—

শিব প্রদক্ষিণে মন্ত্রী সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং—

পশ্চাৎ কৃত্বা তু যো দেবীং ভ্রমিত্বা প্রণমেন্নরঃ।
তস্য চৈবৈহিকং নাস্তি ন পরত্র দুরাত্মনঃ ॥

॥ অষ্টাঙ্গাদি প্রণামঃ ॥

সনৎকুমারতন্ত্রে—

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যা-মুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ গণ্ডাভ্যাং চিবুকেন চ।
নাসয়া চ কপোলাভ্যাং মনসা বচসা তথা ॥
অষ্টাঙ্গক-প্রণামোঽয়ং হরেঃ প্রীতিপ্রদায়কঃ।
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং শিরসা পঞ্চাঙ্গপ্রণতিঃ স্মৃতা ॥
অষ্টাঙ্গ উত্তমো জ্ঞেয়ঃ ষট্‌পঞ্চ মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥

তথা যোগিনীতন্ত্রে—২য় ভাগে, নবমপটলে—

পাত্রান্তরে চ প্রণমেন্মূর্দ্ধা‌েন চ ক্ষিতিং স্পৃশেৎ।
শপন্তি দেবতাস্তস্য বিফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

॥ আত্মসমর্পণম্ ॥

শিবার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত-শ্রীকুলার্ণবে সপ্তমোল্লাসে—

কৃতার্চ্চনাদিকং সর্ব্বমর্ঘ্যোদক-পুরঃসরম্।
ইতঃ পূর্ব্বাদিমনুনা দেবতায়ৈ সমর্পয়েৎ ॥

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে, চতুর্থপটলে—

সর্ব্বশেষে চ দেবেশি সামান্যার্ঘ্যং পদেঽর্পয়েৎ।
সাঙ্গক্রিয়াং পদে দত্ত্বা সামান্যার্ঘ্যং শিবো ভবেৎ ॥

ক্রমদীপিকায়াম্—

গন্ধাদিভিঃ সপরিবারমথার্ঘ্যমস্মৈ,
দত্ত্বা বিধায় কুসুমাঞ্জলিমাদরেণ।
স্তুত্বা প্রণম্য শিরসা চুলুকোদকেন,
স্বাত্মানমর্পয়তু তু তচ্চরণারবিন্দে ॥

॥ বিসর্জ্জনম্ ॥

কুলার্ণবে সপ্তমোল্লাসে—

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তব কৃত্যমিদং সর্ব্ব-মিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে ॥
এবং সংপ্রার্থ্য দেবেশি স্তুত্বা নত্বাতিভক্তিতঃ।
প্রধানদেবতামূর্ত্তৌ পরিবারান্ সমুন্নয়েৎ ॥
ততঃ সাবরণাং দেবী-মুদ্বহেৎ স্বহৃদম্বুজে।

শিবার্চ্চন-চন্দ্রিকাধৃত-শিবরহস্যে—

রশ্মিরূপা মহেশস্য পূজিতা যাশ্চ দেবতাঃ।
শ্রীশিবাঙ্গে বিলীনা-স্তাঃ সন্তু সর্ব্বশুভাবহাঃ ॥
ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা প্রণম্য পরিভাবয়ন্।
দেবস্যাঙ্গে বিলীনস্তদ্রশ্মিভেদং বিশেষতঃ ॥
তেজোরূপং শিবং ধ্যাত্বা ক্ষমস্বেতি পুনঃ পুনঃ।
ক্ষমাপ্যারোপয়েদ্ধীরো হৃদম্ভোজে মহেশ্বরম্ ॥

হংসপারমেশ্বরে—

সংহারমুদ্রাং বদ্ধাথ তেজোরূপাং মহেশ্বরীং।
বিভাব্য পুষ্পেণাহৃত্য নাসাধ্ববায়ুনা শিবে ॥
নিবেশ্য ব্রহ্মরন্ধ্রে স্ব-সহস্রারে সরোরুহে।
বিশ্রাম্য মধ্যনাড্যাস্তা-মানীয় হৃদয়াম্বুজে ॥
সংস্থাপ্য সম্যক্ সংপূজ্য স্বাত্মানং তন্ময়ং স্মরেৎ ॥

বিদ্যানন্দনিবন্ধে—

সূর্য্যে গণপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবেঽথ বৈষ্ণবে।
তেজশ্চণ্ড-মথোচ্ছিষ্ট-মোজমুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাম্ ॥
চাণ্ডালীং শেষিকাং চণ্ডং বিশ্বক্‌সেনং ক্রমাদ্ যজেৎ।
গণেশে বক্রতুণ্ডায় সূর্য্যে চণ্ডাংশবেঽর্পয়েৎ ॥
শাক্তাবুচ্ছিষ্টচণ্ডাল্যৈ শিবে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥

বিদ্যানন্দনিবন্ধে—

লম্বোদরঃ গণেশস্য তেজশ্চণ্ডো বিবস্বতঃ।
বিশ্বক্‌সেনো হরেঃ প্রোক্ত-শ্চণ্ডেশ্বরো মহেশিতুঃ ॥
চণ্ডেশ্বরী ভবান্যাশ্চ মন্ত্রোঽয়ং তাদৃশং চরেৎ।
ইতি নৈবেদ্যশেষন্তু দত্ত্বা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥

———